হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আহাম্মদ আলী ওরফে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রহঃ) প্রণীত গ্রন্থসমূহের সংকলন

সুরেশ্বরী রচনাবলী

সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৪
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৫
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৬
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৭
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৮
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৯
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১০
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১১
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১২
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৩
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৪
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৫
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৬
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৭
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৮
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ১৯
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২০

সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২১
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২২
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৩
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৪
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৫
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৬
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৭
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৮
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ২৯
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩০
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩১
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩২
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩৩
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩৪
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩৫
সুরেশ্বরী রচনাবলী– ৩৬

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফী আহাম্মদ আলী ওরফে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী
(রহঃ) প্রণীত গ্রন্থসমূহের সংকলন

সুরেশ্বরী রচনাবলী

সুরেশ্বর দরবার শরীফ
নড়িয়া, শরিয়তপুর
ফোন : ০১৭১১৩৪৫০৬১

প্রকাশক : সৈয়দ শাহ্ নূরে হাসান দিপু নূরী সুরেশ্বরী
সুরেশ্বর দরবার শরীফ
নড়িয়া, শরিয়তপুর
ফোন : ০১৭১১৩৪৫০৬১

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৮
নভেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ : নাসিম আহমেদ

স্বত্ব : সুরেশ্বর দরবার শরীফ

কম্পোজ : সিফাত কম্পিউটার
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ : ইছামতি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

বাঁধাই : সোহান এন্টারপ্রাইজ
১৪ চৌধুরী মার্কেট, নয়াবাজার, ঢাকা

পরিবেশক : র‍্যামন পাবলিশার্স
২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ২৫০ টাকা

সবিনয় কথন

মহান মোর্শেদ ক্বেবলার পাক দরবারে লাখো শুকরিয়া। দয়াল বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী (রহঃ) বাবার যুগান্তকারী অদ্বিতীয় সূফীবাদের গ্রন্থসমূহ অখণ্ডে প্রকাশার্থে 'সুরেশ্বরী রচনাবলী' পাঠক সম্মুখে নিবেদন করতে পারার সৌভাগ্য যার করুণার ফসল, সর্বপ্রথম আমার মোর্শেদ ক্বেবলা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী কামাল নূরী সুরেশ্বরী বাবার পাক চরণ যুগলে লাখো কোটি ভক্তি চুম্বন জানিয়ে পাঠককুলকে আমার শুভেচ্ছা ও সালাম। কার্যতঃ বাবাজান ক্বেবলা কামাল নূরীর দয়াদৃষ্টি ছাড়া এতবড় মহান কর্ম সম্পাদন আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমার মোর্শেদ বাবা কামাল নূরী, যিনি আমার প্রতিটি মুহূর্তের মালিক, তাঁরই ইচ্ছায় এবং নিশ্চয়ই বাবা সুরেশ্বরীর দয়ায় এই 'সুরেশ্বরী রচনাবলী'র প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আমিতো নিমিত্ত মাত্র, উছিলা মাত্র।

সুরেশ্বরী বাবার লেখাসমূহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভূমিকা বড় করার এবং বিশেষণ দিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র অলীর শান-সৌন্দর্য বাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা হতে বিরত রইলাম। কারণ বাবা সুরেশ্বরী নিজ নামে বিশেষিত। কোনো বিশেষণ তাঁকে আলোকিত করতে পারে না। সেই সাথে তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রশংসা-স্তুতি রচনার যোগ্যতাও আমার নেই। এ আমার সরল স্বীকারোক্তি। বাবা সুরেশ্বরীর জীবনী মোবারক দেওয়ার লোভ সংবরণ করেছি, অলীদের জীবনী লেখা সম্ভব নয়– এটা ভেবে।

হযরত মাওলানা আহাম্মদ আলী ওরফে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী বাবার বিভিন্ন গ্রন্থ বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বারবার প্রকাশ ও মুদ্রণ হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাপক চাহিদার কথা ভেবে প্রায় সমস্ত গ্রন্থ একত্রিত করে 'সুরেশ্বরী রচনাবলী' প্রকাশের প্রচেষ্টা।

সর্বপ্রথম বাবা সুরেশ্বরী নিজেই এর প্রকাশ করে যান। তৎকালীন সময়ে নিজ বাড়িতে প্রেস স্থাপন করে তিনি এই দুরূহ কাজ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে বাবা জান শরীফ শাহ্ সুরেশ্বরী বাবার সুযোগ্য সন্তান হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ওরফে নূর শাহ্ (রহঃ) বাবা, সুরেশ্বরী বাবার ভক্ত ও রূহানীয়াত সন্তান জনাব কাশেম আলী মীর সাহেব বিভিন্ন কিতাব প্রকাশ করেন। ব্যাপকভাবে এর প্রকাশ ও মুদ্রণ করেন বাবা সুরেশ্বরীর নাতি হযরত মাওলানা জালাল নূরী (রহঃ) বাবা। এ কাজে শেষের দিকে তাঁকে শাহ্ সুফী ইকবাল নূরী বাবা সর্বাত্মক

সহযোগিতা করেছেন বলেই জানি। বর্তমানে শাহ্ সুফী সৈয়দ নূরে আখতার হোসাইন ওরফে চুন্নু শাহ্, শাহ্ সুফী বেলাল নূরী সুরেশ্বরী ও শাহ্ সুফী ইকবাল নূরী সুরেশ্বরী ব্যাপকভাবে বাবা সুরেশ্বরীর কিতাবসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করে যাচ্ছেন।

বাবা সুরেশ্বরীর আওলাদবর্গের অনেককেই সুরেশ্বরীর কিতাবসমূহের প্রকাশ ও প্রচার নিয়ে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুনেছি। হয়তো সময় ও অভিজ্ঞতার অভাব অথবা অন্য কোনো কারণে তাঁদের এ কাজে এগিয়ে আসা হয়নি। হয়তো তাঁরাও ভবিষ্যতে সুরেশ্বরীর কিতাবাদি প্রকাশ করবেন। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন।

'সুরেশ্বরী রচনাবলী' গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমার গুরুমাতা লুৎফা আক্তার খাতুন ও আমার সহধর্মিনী শামীমা হাসান (হাস্‌পি) আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বাবা সুরেশ্বরীর আশেক ও বরিশালের ইসমাঈল ফকিরের মুরিদ প্রকৌশলী জাকির হোসেন শিবলীর সহযোগিতা আমাকে প্রকাশনার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে।

এ মহান কাজে যিনি বাবা সুরেশ্বরীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন রেখে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে বাবা সুরেশ্বরীর বিভিন্ন উর্দু-ফার্সী কিতাবসমূহ অনুবাদ করেছেন, তিনি হযরত মাওলানা সাদেক নূরী আল সুরেশ্বরী। বাবা সুরেশ্বরীর খাস দয়া তার নসিব হোক।

এই বইখানার প্রকাশক যদিও আমি কিন্তু এর প্রকাশনা কাজের সমুদয় দায়িত্বটাই সৈয়দ তারিক ভাই সম্পাদন করেছেন। সুফিবাদ প্রকাশনালয়ের অভিজ্ঞতাটুকু নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন নাহিদ শামসেত্তাব্রীজ ভাই। নানা কাজে শরীফুল আলম লিমন, জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়ারী, নিয়ামুল কবীর, আবদুর রহমান ভাই ও আরও অনেকে সহযোগিতা করেছেন।

সবশেষে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির জন্য পাঠকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চাইছি। বাবা সুরেশ্বরীর চরণধূলি শিরে ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার মহান মোর্শেদ ক্বেবলা বাবা শাহ্ সূফী কামাল নূরী সুরেশ্বরী বাবার কাছে দয়া ভিক্ষা কামনা করে শেষ করছি।

সৈয়দ শাহ নূরে হাসান দিপু নূরী সুরেশ্বরী

সূচি

নূরেহক্ব গঞ্জেনূর	৯-১৪৮
সিররেহক্ব জামেনূর	১৪৯-২৩২
মাত্‌লাউ'ল উ'লূম	২৩৩-৩৪২
ছফিনায়ে সফর	৩৪৩-৪২২
আইনাইন	৪২৩-৪৮২
লাতায়েফে শাফিয়াহ্	৪৮৩-৫৩২
মদিনা কল্‌কী অবতারের ছফিনা	৫৩৩-৫৭৫

প্রাপ্তিস্থান

সদর প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা।

বই বিচিত্রা
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা

বিউটি বুক হাউস
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা

পাঠক সমাবেশ
আজিজ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

বিদিত
আজিজ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

ক্যামলট বুক স্টল
কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা

সৃজনী
কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল
১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, (২য় তলা)
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১১১২৮১৬৯
website : www.babajahangir.com

نورحق گنج نور

নূরেহক্ব গঞ্জেনূর

সূচি

নূরেহক্ব গঞ্জেনূর ১৩
মোর্শেদ নবীর পুত্র ১৮
নূরেহক্ব ১৯
নূরেহক্ব তালাস করা ফরজ ২১
এমাম ফখরে রাজির নকল ২৬
মুরীদ কি ৩১
পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে ৩২
দ্রব্যগুণ ৩৫
নূরেহক্ব সঙ্গের সাথী ৩৮
নিজের উপদেশ নিজে দেওয়া কর্তব্য ৩৯
ভক্তিই মূল পদ ৪০
পাগলকে মন্দ বলা কর্তব্য নহে ৪৭
নিয়ত ব্যতীত কোন আমল হয় না ৪৮
নামাজীগণের প্রতি মুক্তি কোথা ৫১
মাদ্রাসা পাশ করে কেহ নবী হন নাই ৫৪
মছনবি ওজনে ছোট পদ ৫৫
আল্লাহ্ লফ্জের অর্থ ৫৬
কাননে পাইবে না কিন্তু ভজনে পাইবে ৫৭
পীর মুরিদ ৫৮
মোর্শেদ অমর ৬২
আল্লাহ্ পাকের উক্তি ৬৪
হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব রাহমে হুমুল্ল্যা ৬৭
মেস্কাত শরীফে লেখা আছে ৭১
তালেবানের দশটি রেজালত পরিবর্তে ৭৩
জেকেরের কিঞ্চিৎ বিবরণ ৭৪
হাস্তিদেশ ও ছুলুক ৭৬
নেস্তিদেশ ৭৮
মোরাকেবা সমূহ ৮০
নেছবত পরীক্ষা ৯৫
কোন ব্যক্তি দূরে থাকিলে তাহার অবস্থা নির্ণয় করা ৯৫
বিমারী নির্ণয় করা ৯৬
তালেবানের লতিফা ও মোকাম নিদর্শন করা ৯৬
নামাজের ফয়েজ ৯৭
কাশ্ফে কবুর ৯৮
দুঃসাধ্য কথার মতলব খোলা ৯৮
খবর আয়েন্দা ৯৯
চিন্তাপতীর মন হইতে চিন্তা বাহির করিয়া দেওয়া ৯৯

পথিকের দেও দূরাচার হইতে রক্ষা ৯৯
দফে বালা ১০০
দফে আজার ১০০
ঝড়ি ও তাহার বালা হইতে রক্ষা ১০০
আছেব হাজের করা ১০১
আছেব ছাড়ান ১০১
ছিনা কবজ ও ফয়েজ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ ১০২
ফয়েজ আবদ্ধ হইলে তাহা খোলার কায়দা ১০৫
কোন আউলিয়ার কবর ও মাজার হইতে ফয়েজ পাওয়া ১০৫
পৃথক পৃথক নূর ও তাজল্লি চিনন ১০৬
জেকের করার নিয়ম ১০৭
মোর্শেদ গায়েব কি দূরে রহিলে ফয়েজ পাওয়া যায় ১০৮
খতমে মোজাদ্দেদী ১০৯
জেকের করিবার সময় তালেবানের যে হাল হয় ১১০
রুজি কম হইবার কারণ ১১১
মুরব্বি বচন ১১৩
ফকির এক প্রকার নহে ১১৪
আবেদ গোলাম আশেক আজাদ ১১৮
খোদা লোকের সনে কেমন করিয়া হইতে পারে ১২০
শবে বরাত ও কদরের নামাজের নিয়ম ১২১
চাঁন্দ দেখিবার নিয়ম ১২৩
এস্তেখারা ১২৩
প্রভুর খেলা ১২৪
সাত ভুমে সাত আদম ১২৬
প্রত্যেক সময়ের পৃথক পৃথক গুণ ১২৮
“খোলাছা মানী” ১৩০
সকল বস্তুর গুণ ও তাহার কারণ জানা আবশ্যক ১৩০
রাখা বস্তু কাজে লাগে ১৩১
বুধবার মনহুছ ১৩৪
সময়ের ফল ১৩৪
বাদলের আলামত ১৩৫
সনের আলামত প্রথমেই পাওয়া যায় ১৩৬
গরকী ও তুফানের আলামত ১৩৭
যোগার পাখীর বিরহ ১৪১
উদাসী ১৪২
ভাব ১৪৩
বিলাপ ১৪৩
বন্ধুর নাম স্মরণ করিলে পাপ মোচন হয় ১৪৫

نورحق گنج نور
নূরেহক্ব গঞ্জেনূর

হাম্‌দ বেহদ নূরেহক্ব নূরুন আলা নূর ।
দরুদ ছালাত নূরে অসীম প্রচুর ॥
সংসারের সার সেই সর্ব্বত্র প্রচার ।
জীবের জীবন সেই সেই সারোদ্ধার ॥
জল স্থল স্বর্গ মর্ত্য সাগর কানন ।
জীব জন্তু নর নারী দেও পরিগণ ॥
শৃগাল কুকুর সিংহ তুরঙ্গ কুরঙ্গ ।
মশা মাছি কুম্ভ মীন কীট ও পতঙ্গ ॥
সেই সে নূরের খেলা জগৎ রৌশন ।
এক নূর হৈতে এক একই ঘোষণ ॥
সকলেরি বীজ নূর ভেবে দেখ সার ।
কাফের মোমেন এতে নহে সুবিচার ॥
পাক নাপাকের কোন নহে সমাগম ।
যথায় ফেকিবে বীজ প্রকাশে বিক্রম ॥
মল সূত্র পঁচা গলা সুস্থান কুস্থান ।
হয় না পবিত্র বীজে হেন কোন স্থান ॥
বীজের সামান্য তেজ নহে গুণ কম ।
সুস্থান হইতে দেখি কুস্থানে সক্ষম ॥
গু-গোবরে রোপে যদি করিয়া যতন ।
মলস্থল চিরকাল প্রকোপ চেতন ॥
ভালকে করিবে ভাল সে কথা কেমন ।
মন্দতে হইলে ভাল প্রশংসা নিপুণ ॥
নাপাক বিক্রমে পাক পাথর ছেদিয়া ।
এক পরিচয় দেয় শির উঠাইয়া ॥
যতই হইবে ফাস চেতে তত ঘাস ।
অল্পকালে চাহে তরু ধরিতে আকাশ ॥
বীজ চাহে ফাস মাটি মাটি বীজে মিশ ।
নির্গুণের গুণ তত্ত্বে গুণী পায় দিশ ॥
দিশাহীনে দিশ আছে সদৃশ ভরমে ।

হীম পদ পাবে তত্ত্বে আছয় গরমে ॥
অন্ধকারে দীপ চাহে দীপ অন্ধকার ।
অন্ধকার বিনা দীপে কিবা লাভ তার ॥
রোগের আরোগ্য লাভে দাওয়ার তালাশ ।
রোগ না হইলে দারু কিসেতে প্রকাশ ॥
পরিষ্কার লাভ হেতু সাবুন দরকার ।
ময়লা বিহনে ফল কি হইবে তার ॥
ভোকেতে আহার চাহে আহারেতে ভোক ।
ভোক না হইলে খাওয়া কি হইত সুখ ॥
বেমানে ঈমান চাহে ঈমানে বেমান ।
বেমান না হ'লে কেবা লইত ঈমান ॥

كلام نظامى
(কালামে নিজামী)

گناه من ارنامد د رشمار
ترانام ك بود امرزگار

(গুণাহ্ মান আরনামুদে দারসুমার
তেরা নাম কায়ে বুদে আমুরজেগার ।)

গুণাগারে নবী চাহে নবী গুণাগার ।
গুণাগার বিনা নবী কিসের দরকার ॥
মুরিদে মোর্শেদ চাহে মোর্শেদে মুরিদ ।
পথহারা না হইলে কিসের মোর্শেদ ॥
নূরে হক্ব নবী হইতে মোর্শেদেই পায় ।
নূরে হক্ব নাহি যাতে মোর্শেদ কোথায় ॥
নূরেহক্ব দানা বীজ যথায় রুপিবে ।
না পাকে ফেলিলে বীজ পাক নিকলিবে ॥
নোৎফা পেটেতে পড়ে নাপাকে নাপাক ।
নাপাক হইতে দেখ হয় কিনা পাক ॥
আজরের মণি হইতে হয় পাক নবী ।
কেন হইল যদি তাতে না রহিত খুবি ॥
মোর্শেদের নূরেহক্ব যথায় বুনিবে ।
সহস্র হইলে পাপ তাতে কি করিবে ॥
যদি শিষ্য নূরেহক্ব জাগা দিতে পারে ।
এক দমে শতপাপ চারপাশে ঝরে ॥

চোর চাহে ভর বাড়ি ঘোর অন্ধকার ।
দীপ জ্বালাইলে চোর কোথা থাকে আর ॥
কি করিবে পাপে তায় কি করিবে তাপ ।
নূরেহক্বে পাপ তাপ নূরেহক্বে ছাপ ॥
জলেতে ঢালিলে চিনি সব মিষ্টময় ।
লোনা তিক্ত কটু কষা কখন না রয় ॥
পানির বৃহৎ গুণ কহন না যায় ।
সকল ধুইয়া ছাফ জলে শুদ্ধ পায় ॥
বাতাসের গুণ কিবা দেখ চূড়ামণি ।
আগুন সমান তনু করে দেয় পানি ॥
আগুনের গুণ কিবা কহন না যায় ।
কঠিন লোহাকে করে মোম সম প্রায় ॥
সাবুনের কিবা গুণ বুঝে উঠা ভার ।
হইলে শাতেক ময়লা করে পরিষ্কার ॥
কি কব সুরের গুণ সুর সুমধুর ।
সুরে বিমোহিত সর্ব আলম প্রচুর ॥
যথা তথা হেরি এই সুর বিনা নাই ।
সুরেই জগৎ মোহ মোহ যে কানাই ॥
মাতঙ্গ মাতিয়া সুরে পদেবি শৃগাল ।
কুরঙ্গে মাতিয়া রঙ্গে গলায় শিকল ॥
ললিত মুধর রবে শরীর অস্থির ।
রণ ভুমে যোদ্ধাগণ ধায় যেন তীর ॥
সুরেতে মাতিয়া বীর রণে দেয় মন ।
গেয়ান থাকে না রণে জিয়ন মরণ ॥
দারুন মধুর সুরে সর্প অজগর ।
সাধিয়া বন্ধনে পড়ে ছাড়িয়া গর্তর ॥
এ খেলা লীলার খেলা খেলা মিষ্টময় ।
সকল পদের মূল নূরেহক্ব হয় ॥
কিসের নামাজ রোজা কিসের কোরান ।
নূরেহক্ব বিনা তাহা সকল বেজান ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তায়ালা)
ان فى ذالك لذكوى لمن كان له قلب
(ইন্না ফি যালিকা লিজিকরি লিমান কানা লাহু কাল্‌বুন)

যাহার কলবে নূর হয়েছে রৌশন ।
কোরান জেকের জান তাহার কারণ ॥
মূল শূন্য বিনা নূরে কি হইবে লাভ ।
মৌখিক কীর্ত্তন রিয়া সকল খাবার ॥
নামাজের সর্ত আদি করিলে আদায় ।
বেগর মানসে বল নামাজ কোথায় ॥
নামাজে মানস যদি হইবে দরকার ।
তবে সে নামাজ বটে খোদা সিদ্ধ সার ॥
খাওনে লজ্জত শুধু পেট ভরা তায় ।
লজ্জত বিহনে পেটে যাইবে কোথায় ॥
অতএব নূরেহক্বে হক্ব দরকার ।
সে নূরে মানস পুরে পাইবে দিদার ॥
অতএব নবী বাক্য সুরস মধুর ।
পাইয়া উচিত ঠাঁই করিল জহুর ॥

(حديث) من عرف نفس فقد عرف ربه
(হাদিস-মানআ'রাফা নাফ্‌সাহু ফাকাদ আ'রাফা রাব্বাহু)

من عرف كاجس دل مين پهچان رهيگا
اس دل من تلا وت سدا قران رهيگا
من كان فى هذه قران مين ايا
سمجهى گانه جواسكووه حيو ان رهيكا
باريك هى نكته يهان سمجها اسى جسنى
كو نين مين دانم وهى انسان رهيگا
(মান্ আ'রাফা কা জিস্ দিলমে পাহচাঁন রাহেগা ।
উস্ দেলমে তালাওয়াতে সদা কো'রআন রাহেগা
মান কানা ফি হাজিহি কো'রআন মে আয়া ।
সামঝোগাঁ না জোঁ উস্‌কো উই হায়রান রাহেগা ॥
বারিক হ্যাঁয় নুকতা এহাঁ সামঝা ইসে জিস্‌নে ।
কাওনাইন মে দাঁয়েমে উহি ইনসাঁন রাহেগা) ॥

নিজেকে চিনেছে যেই চিনিছে খোদায় ।
এই সে রছুল বাণী শুন মনকায় ॥
তুমি যথা আমি তথা কহে আর সাঁই ।
তোমা সঙ্গে আমি আছি তুমি দেখ নাই ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

هومعكم اينما كنتم وفى انفسكم افلاتبصرون

(ওয়া হুয়া মা'আকুম আইনামা কুন্‌তুম ওয়াফি আন্‌ফুসেকুম আফালা তুব্‌সেরুন)

নূরেহক্বে হক্ব আছে হক্ব চিন আগে ।
এবাদত কর যদি পার শেষ ভাগে ॥
না চিনিয়া এবাদত করিবে কাহার ।
ভূতের বন্দেগী হবে হবে না খোদার ॥
নূরেহক্ব জাগা পায় যাহার মনেতে ।
মন আর নামাজেতে যাবে না বনেতে ॥
এলেম হেলেম আর পাগড়ি যুব্বায় ।
কেমনে পাইবে সাঁই না রইলে হিয়ায় ॥
দীর্ঘ মোনাজাত কত দুই চারি হাত ।
বেখুলুছে কিবা ফল ডেকে দিন রাত ॥
খুলুছে জুলুছ চাই মোর্শেদ কাণ্ডারী ।
তবেই মানসপুরে পৌঁছিবারে পারি ॥
ফাওয়াইলুল্ বলে সাঁই কোরানেতে কয় ।
বেনুর মোছল্লি যাবে নরকে নিশ্চয় ॥
কেননা কাহিলী জন্মে সে নূর বিহনে ।
উৎপত্তি হইবে ছুস্তি অন্ধকার মনে ॥
তাহা হইতে রক্ষা দিবে মোর্শেদ সুজন ।
অতএব কহে প্রভু কোরানে আপন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

فاسئلوا اهل الذكر انكنتم لاتعلمون

(ফাস্‌আলু আহলিজ যিক্‌রী ইন কুন্‌তুম লা তা'আলামন)

আমাকে স্মরণ যেই করে নিরন্তর ।
না জানিলে জিজ্ঞাসিবে তাঁহার গোচর ॥
এবে খোদা পাঠাঁইল পীরের সমীপে ।
জানিলে খোদাকে ঝুট সারিবে কিরূপে ॥
খোদাই বান্ধব বটে করিতে নিস্তার ।
গাঁথিল শিষ্যের গলে পীর স্বর্ণহার ॥

মোর্শেদ নবীর পুত্র

মোর্শেদ নবীর পুত্র কেমনেতে হয় ।
ফলে কিন্তু পুত্র বটে মুখে বলা নয় ॥
রূহানী ওজুদ এক বাতেন আছয় ।
জাহেরা শরীরে সেই মূল পদ হয় ॥

حديث - من سلك طرقى فهو الى

(হাদীস- মান সালাকা তারিকী ফাহুয়া ইলা)

সে মূলেতে প্রেম পয়দা তাছির সকল ।
সে তাছির সর্ব অঙ্গ যত দলাদল ॥
সে তাছির সূচনীয় মাখন আকার ।
ধুয়া জোরে খোয়া যেন হয় জলাধার ॥
সে মেঘে বাদল পূর্ণ ঘোর অন্ধকার ।
শত শত জলফোঁটা তাহাতে নির্দ্ধার ॥
কড়া পরে সরা দিয়া জোশ দিলে জল ।
সরা পরে জল ধার করে টল টল ॥
উঠিবে ধুয়ার সঙ্গে জলের কিরণ ।
জলহীনে কড়া শেষে হইবে বিরণ ॥
কিন্তু যে গরম জোরে পানি উর্দ্ধে ধায় ।
বাচ্চাদানি হইতে পানি মুরিদ বানায় ॥
মোর্শেদ শরীর হইতে মুরিদ শরীর ।
একাযুক্ত মিষ্ট যেন পানিতে চিনির ॥
যত পানি সব চিনি মিঠা সমুদয় ।
এখন কোথায় চিনি ভিন্ন বলা হয় ॥
এই সে হুজুরী বিদ্যা মিরাস নবীর ।
কোথায় কাগজে আছে তাহার তাছির ॥
হাজার কাগজ যদি পড়ে যায় তল ।
কি হইবে গুরুজন রহিলে সকল ॥
গুরুজন পৃথিবীতে না রাহিলে আর ।
কি হবে কাগজ তবে রহিলে হাজার
কাগজের সাথে ভেসে যেই বিদ্যা যায় ।
কোথায় এহেন বিদ্যা মোর্শেদ ছিনায় ॥
কমল বিহনে গন্ধ কেবা দিবে আর ।
কিন্তু সেই গন্ধ পাবে গোলাপ মাঝার ॥

খাছনূর ছানাওরি সেই নূরে নবী ।
সেই নূর পীর নূর তাতে ফয়েজ পাবি ॥

مولانا روم رح
(মাওলানা রুমী রঃ)
پیر ره شبریت اخمر امده است
سینه ازبحر خضر امده است
(পিরেরাহ ছাবরিয়াত খামার আমোদাস্ত ।
সিনাহ্ আজ বাহরে খিজির আমোদাস্ত)

পরশ পাথর হেন তরিকত পীর ।
ছিনা তার জান যেন সাগর গভীর ॥
ভয়ানক সমুদ্দুর নাহিক কেনার ।
মাল মাত্তা মনি মুক্তা তাহাতে অপার ॥

নূরেহক্ব

হুজুরী নামেতে যেই এলেম নবীর ।
নূরে খোদা তারে বলে সেই নূরে পীর ॥
হুজুরী শিখিতে হয় হাজেরী দরকার ।
নিজ সনে রূজু হওয়া আবশ্যক তার ॥
চক্ষু মুখ কর্ণ নাসা দরজা সকল ।
বন্ধ করে একান্তই হুজুরী আমল ॥
ইহাই প্রবল ছিল আমল নবীর ॥
শিক্ষিতে ওস্তাদ আর দীক্ষিতের পীর ॥
ওস্তাদ শিখায় বিদ্যা নিরখিয়া দেখ ।
মোর্শেদ কহেন বাপু চক্ষু মুদে থে'ক ॥
চক্ষু বন্ধ বিদ্যা এই খুলিবে কি হবে ।
খোলা জন এই ভেদ কভু নাহি পাবে ॥
তাহাকে ঈমান কহে সেই শরিয়ত ।
তরিকত হাকিকত সেই মারফত ॥
বীজ হইতে বৃক্ষ শাখা ফল ও লজ্জত ।
সারতত্ত্ব এই জাতে সজীব জগত ॥
ফল পে'লে গাছপালা তাহাতে সকল ।
ফল পে'লে ডাল তোড়ে কেমন আজল ॥
ঔষধ তালিকা জান শরিয়ত ঘর ।

পড়ে সদা রাখে না সে দ্রব্যের খবর ॥
পড়নে তালিকা রোগ কোথা হয় দূর ।
ঔষধ তৈয়ার চাই তরিকে দস্তুর ॥
বানাইলে কি হইবে যদি নাহি খায় ।
ঔষধ বানানে রোগ আরোগ্য কোথায় ॥
পড়নিয়া মনে ভাবে পড়নেই ফল ।
ওরক উল্টানে ভাবে এতেই মঙ্গল ॥
এক মন তনে যেই সাধন সাধিবে ।
নফ্ছের পাকিতে মুক্তি কোরানে দেখিবে ॥
কোরান দেখিলে শুধু না হবে নিস্তার ।
কোরানের মূল তত্ত্ব করহ বিচার ॥
কোরানের হাকিকত আছে নিজ মনে ।
পীরেতে পাইবে তাহা পাবে নহে বনে ॥
মূলতত্ত্বে ফল হবে আমল দরকার ।
শরিয়ত উৎপন্নের এই ঘর সার ॥
মাথা হয় মূলতত্ত্ব চুল হবে তায় ।
শিরে শরিয়ত চুল আপনি জালায় ॥
কোথায় বিচারে চুল মাথা যার নাই ।
ঘর বিনা সিঁড়ি তার হইবেক নাই ॥
কেমনে হইবে বেটা শাদী না করিলে ।
বাপ বোলাইবে তারে ছাওয়াল জন্মিলে ॥
খোজা যদি শাদী করে বোঝা হবে তার ।
সন্তান কেমনে হবে করহ বিচার ॥
হাগিবার জাগা ভাই আগেতে বানালে ।
খানা নাহি কি খাইয়া হাগিবে সকালে ॥
চিরদিন নছিহত অন্যকে করিনু ।
নিজ নছিহত আমি কভু না শিখিনু ॥
আমি বলি ঐ বেটা বড়ই খারাপ ।
সেই বলে তার অতি হইবে আজাব ॥
কহিছি অন্যের পাপ গলা দিয়া টানা ।
দেখিতে নিজের পাপ হই বুঝি কানা ॥
নূরেহক্ব যেইজন করিল সাধন ।
এসব অলীক পথে নাহি যাবে মন ॥
তেই সে কহিল প্রভু সার্থক বচন ।
ওয়াবতাগু ঢোর সবে উছিলা আপন ॥

নূরেহক্ব বিনা হক্ব কভু পাবি নাই ।
উছিলাতে নূর আছে নূরেহক্ব পাই ॥

নূরেহক্ব তালাস করা ফরজ

তত্ত্ব করা নূরেহক্ব ফরজ একিন ।
কহিয়াছে খোদা কুনু মায়াচ্ছাদেকিন ॥
পীর ধর যথা পার কহিয়াছে সাঁই ।
পীরের উছিলা বিনা হবে না ভালাই ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তা'আলা)
ياايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين
(ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আসছোয়াদেকিন ।)

ওহে লোক যাহাদের তকলিদি ঈমান ।
ডরাও খোদাকে হও সঙ্গী ছাদেকান ॥
যতেক ফরজ আছে হুকুম আল্লাহ্‌র ।
তরক করিলে তাহা হবে গুণাগার ॥
কিন্তু যে ফরজ আছে রাখন ঈমান ।
রাখন লওন বটে দোনই সমান ॥
কিন্তু সে রাখনে হবে লওনের ফল ।
না রাখিলে লওনেতে ঘটে অমঙ্গল ॥
উজিরানা সাহা যেন দিয়াছিল কায় ।
না রেখে তাঁহার বিধি শেষে মারা যায় ॥
অতএব বলে সাঁই সবার কারণ ।
আমাকে ডরিয়া ধর পীরের চরণ ॥
শুনিয়া ডরিছ বটে দেখিয়া চিনিবে ।
শুনে কিহে দেখা ফল কখন পাইবে ॥
শুনা কথা দুনা হয় না হয় একিন ।
এরূপ একিনে শেষে ঘটায় কুদিন ॥
এমন ঈমান যদি ঈমান হইত ।
কথায় কথায় তবে কেমনে টুটিত ॥
তছদীকি পীরের পাশ যে সব ঈমান ।
টুটিলে ধরিতে পীর হ'ত না ফরমান ॥
তবেই তৌহিদ ঘরে দেখহ সুজন ।

ফরজের ফরজ এই চির মূলধন ॥
ঈমান ফরজ ছেড়ে গুণা নাহি হবে ।
কিন্তু সে বেমান বটে কাফের হইবে ॥
এজন্যে তছদীকি শিখ ছাদেক গোচর ।
তছদীক তকলীদে আছে অনেক অন্তর ॥
শুনে কি কাগজে দেখে তছদীক না হয় ।
তাহাকে তকলীদি কহে জানিবে নিশ্চয় ॥
এমন ইমান ওয়ালা হবে যেই জন ।
যেমন পানির ফোঁটা ফোটে ঠনাঠন ॥
দমেতে মোমিন হয় দমেতে কাফের ।
কখন দিনেতে আর কখন বাহের ॥
এমন ঈমান পরে নির্ভর করিয়া ।
ফকিগণ ফেকা আদি দিয়াছে লিখিয়া ॥
ঈমান যাইবে কিসে রহিবে আবার ।
অনেকের ইহা শুধু মৌখিক বিচার ॥
জানে না তছদীকি কভু টোটা নাহি যায় ।
নিজ ভাবে অন্য জনে মশ্‌রেক বেলায় ॥
তছদীকি একিন বটে একিন মাকুল ।
যেমন আফতাবে কভু নাহি আছে ভুল ॥
ভানুর দলিল দেওয়া একথা কেমন ।
ভানুর দলিল হয় ভানুতে লক্ষণ ॥
আকাশের তারকার তারাই দলিল ।
অন্ধগণে এ দলিলে হইবে মুস্কিল ॥
কোথায় উদিছে তারা কি দেখিবে তায় ।
কোথায় খেলিছে জুনী অন্ধ কোথা পায় ॥
কেবল শুনিলে তাহা দেখা নাহি যাবে ।
শুনে কিহে জুনী পোকা তালাসিয়া পাবে ॥
অতএব কহে সাঁই সার্থক বচন ।
এক মন চিত্তে শুন কোরান কথন ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তা'আলা)
من كان فى هذه اعمى فهو
فى الاخرة اعمى واضلوا سبيلا
(মানকানা ফি হাজিহি আ'মা ফাহুয়া
ফিল্ আখিরাতি আ'মা ওয়াদাল্লু সাবিলা ।)

ইহকালে অন্ধ যেই পরকালে হবে ।
পরকালে খোদা দরশন কোথা পাবে ॥
কিন্তু ভাই শেরেকের ডর রাখে যারা ।
শেরেকের অর্থ কিবা বুঝিয়াছে তারা ॥
মুখেতে শরীক কৈলে শরীক না হয় ।
রুমের বাদশাহী মোর কেহ যদি কয় ॥
তাহাতে বাদশাহী তার হইবে কোথায় ।
হইল মিথ্যুক নিজে কহিল বৃথায় ॥
তেমনি মৌখিক যারা শেরেক যে কয় ।
খোদার বাদশাহী কেবা কেড়ে নিবে তয় ॥
এ কথার বোধশক্তি যার মনে হবে ।
কেমনে মুশরেক সেই বল দেখি এবে ॥
তৌহিদ ঘরেতে হয় হাকীকি ঈমান ।
সে ঘরের আলেফ, বে, খোদা একজন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

ان الظن لايغنى من الحق شيئا

(ইন্নাযজোন্না লা'ইউগ্নি মিনাল্ হাক্কি সাঁইয়া)

একিনী না হলে আর হবে না নিশ্চয় ।
গয়ের একিনী খোদা কভু হক নয় ॥
অতএব কহে সাঁই ছাড়িতে তকলিদ ।
তকলিদ আন্ধার লাঠি ছামনে রসিদ ॥
লাঠি ধরে অন্ধগণ চলে ধীরে ধীরে ।
সার সার সার বলে তবু ঘুরে পড়ে ॥
বিনা কি কানার লাঠি ধরিবে কখন ।
চক্ষু মুদি রবে কিহে যেন অন্ধগণ ॥
চক্ষু মুদে লাঠি ধরা হইবে কোথায় ।
ধরিলে আন্ধার লাঠি চক্ষু খুলে যায় ॥

هردم برسد بعارفن ذوق جديد
خود مجتهد اند نه زاهل تقليد
شرون نخو رد ند جز شكار جودرا -
روباه خورد فتاده لحم قديد -

(হর্‌দম্ বারাছিদ বা আরফানে জোওক জাদিদ ।
খুদ্ মুয্‌তাহাদ্ আন্দ নাহ্ জ'আহ্‌লে তাক্‌লিদ ॥
সিরুন্ নাখোরদান্দ যোযা সিকার যোদারা ।
রূবাহ্ খোরদ্ ফাতাদাহ্ লাহ্‌মু কাদিদ্ ॥)

আরেফের দমে দমে নয়া ভাব হয় ।
নিজে মোজতাহেদ কার মোজহাবে নয় ॥
নিজ শিকার ভিন্ন বাঘ না খায় কখন ।
বাঘ খাওয়া অবশিষ্ট খায় রূবাগণ ॥
হুছুলী এলেম যদি পঞ্চাশ হাজার ।
শিখিলে একিন ঠিক হবে নাকো তার ॥
ছামনে আসিবে এক তাহার নকল ।
ফখরে রাজি এমামের ঘটে অমঙ্গল ॥
দমে দমে হতে সেই পারিবে বেমান ।
তাহাতে উহার আছে অনেক সন্ধান ॥
এমন একীনে তারে শয়তান দেওয়ানা ।
কাড়িবে ঈমান তার দিয়া এক হানা ॥
নহে যেই বাপ, সাপ, বাঘ, চিনে আর ।
বাপ, সাপ, বাঘ, ভোলে কেমন বিচার ॥
চান্দা মৎস্যে ভানু যদি কহে কোন জন ।
পৃথিবীতে বল কেবা করিবে শ্রবণ ॥
মাতাকে করিতে শাদী কেহ যদি কয় ।
কেমনে অচিন হবে বলহ নিশ্চয় ॥
সে কথা রাখিয়া পিছে বলি যে তোমায় ।
সোঁনা রূপা বদলে কে কড়ি নিতে চায় ॥
এমনি কি জোক, পোকা না ভুলে কখন ।
খোদাকে ভুলিয়া যাবো এ কথা কেমন ॥
তেমনি খোদার জাত যে নর চিনিবে ।
চিনিলে কাফের সেই কেমনে হইবে ॥
অতএব মোজাদ্দেদ লেখে মক্তুবাতে ।
কাফের মকবুল বটে জান তরিকতে ॥
দরজা তরক্কি হবে খুলিবে বুরূজ ।
নছিব বলন্দ হবে হইবে উরূজ ॥
মরদুদ হইবে যদি শরিয়তে হয় ।
শরিয়ত বিধানেতে নরকী নিশ্চয় ॥

هرچند کافرشر یعت مرد وده است مستحق عذاب
وکافرطریقت مقبول است مستجب درجات

(হার চান্দ কাফের শরিয়ত মারদার্দ আস্ত মোস্তাহাক আজাব ।
ও কাফের তারিকত মাকবূল্ আস্ত মুস্তাজিব দারজাত ॥)

হর ঘড়ী চূর্ণ হয় তকলীদি ঈমান ।
যেমন কাচের শিশি লাগে যদি শাণ ॥
কিন্তু সেই হকিকতে নাহিক ঈমান ।
ঈমান হইলে কেন হবে বেঈমান ॥
বাজিগর নাহি এই বানরের ছাও ।
খাঁচা ভেঙ্গে বন পশু দৌড় দিতে চাও ॥
ঈমান ছুটিয়া গেলে বলে ধর ধর ।
বেড়া ভেঙ্গে এই পথে ঈমান দিছে লড় ॥
ধাওয়া ধাই করে লোকে ঈমান দৌড়ায় ।
বন পাখী ছুটে গেলে পাইবে কোথায় ॥
মাণিক পীরে দুধ কলায় ঈমান যাবে ভাই ।
মাণিক পীর কোন্ খোদা, খোদা বুঝি নাই ॥
মাণিক উছিলা মোর দুধ কলা তার ।
তাঁহার দোয়াতে মোর হইবে উদ্ধার ॥
পীরানের পরে যদি পৌঁছাব ছওয়াব ।
আশীর্ব্বাদে মাফ মোর হইবে আজাব ॥
তাতে কি শেরেক হবে বল দেখি নর ।
তবে যে মানস তব নামাজের ঘর ॥
সে ঘরে তোমার খোদা নহে কদাচন ।
তবে মান্য নিজ খুতি ভরিবা কারণ ॥
নিজ মান্য নিজে খাই তাতে দোষ নাই ।
এই কি আসিল কাল ফিরিল দোহাই ॥
আসিল অসৎ কাল হরে নিল ধন ।
ডাকাত হইল দেশে নাহি মহাজন ॥
মান্য গণ্য ধন্য দেশে আছিল যখন ।
না খাইলে পীরে কভু খেত না কখন ॥
যদি না খেলাতে পারে খাইবার কালে ।
মনে ভক্তি দোয়া দরূদ পড়িয়া সকলে ॥
পরেতে খাইত যাহা খেলা'ত খোদায় ।

এই সে খাওন ন্যায় পীরে আগে খায় ॥
খাইবার কালে যদি নাহি ভোলে পীর ।
কেমনে না হেন জনে হবে দস্তগীর ॥
যত ইতি অলীগণ পৃথিবী মঙ্গল ।
তাঁহাদের পরে যদি কেহ করে বল ॥
শয়তান তাহার পরে জগতের সার ।
পাঠাবে ঈমান ছিনে লইতে তাহার ॥
একিন রবে না তার মরণ সময় ।
একিন অলীর ঠাঁই মোর্শেদ আলয় ॥
পৃথিবীতে নানা কষ্ট যতেক বালাই ।
হাদিছের কথা এই ঝুট হবে নাই ॥

এমাম ফখরে রাজির নকল

শুনেছি নকল এক পড়িল স্মরণ ।
এক মন চিত্তে শুন আজব কথন ॥
আছিল এমাম এক ফখ্‌রে রাজি নামে ।
বিস্তর জাহেরা বিদ্যা শিখে পরিণামে ॥
প্রধান পণ্ডিত ছিল আলেম ছরদার ।
ছিল নাকি তছনিফাত কতেক হাজার ॥
এতেক কেতাব যার আছিল রচনা ।
এবে শুন কহি তার কিঞ্চিৎ ঘটনা ॥
এক দিন পরকাল করিয়া স্মরণ ।
অলীর নিকটে এক করিল গমন ॥
কাতর বচনে কহে করিয়া বিনয় ।
পরকাল ধন কিছু দিবে মহাশয় ॥
কহিলেন অলি তারে পরম বচন ।
ভুলিলে জাহেরী বিদ্যা দিব সেই ধন ॥
করিব দীক্ষিত বিদ্যা তোমাকে প্রদান ॥
শিক্ষিত ছাড়িলে পাবে আখেরী সন্ধান ॥
একথা বিচার করে মনের ভিতর ।
ছাড়িয়া জাহেরী বিদ্যা লাভ কিবা মোর ॥
এতেক ভাবিয়া মনে ফিরিল এমাম ।
কহিলেন অলী তারে ভেবে পরিণাম ॥

খালি নাম এমামেতে কিবা তার লাভ ।
বুঝিল না পরকালে ললাট খারাব ॥
অতীত হইল যদি কিছু কাল তায় ।
আসিল আসন্ন কাল মরণ সময় ॥
সেকালে রহিত হল অঙ্গে যত বল ।
শয়তান আসিয়া তথা উপস্থিত হল ॥
শয়তান কহিল এবে বল মোর তরে ।
ঈমান এনেছ তুমি কোন খোদা পরে ॥
কহ কোন খোদা পরে এনেছ ঈমান ।
কেবা তোকে সৃজিয়াছে কহ সে সন্ধান ॥
কোন রূপ কোথা ঘর কিবা নাম তার ।
কোথা খায় কোথা সোয় কি তার আহার ॥
পাইয়াছ কভু তারে দেখিয়াছ তায় ।
এক বলে কেমনেতে হইল প্রত্যয় ॥
তুমি কহ এক সাঁই বেটা বেটি নাই ।
ফিরিস্তারা খোদা পুত্র কহিছে ইছাই ॥
তোমা হৈতে ইংরেজের আছয় এলেম ।
শত রূপ বিদ্যাবান প্রবল আলেম ॥
খবরিয়া জুমলা যাহা কাগজেতে হয় ।
ইনসাঁইয়া না হইলে কে করে প্রত্যয় ॥
চক্ষে না দেখিয়া কিসে হইল বিশ্বাস ।
কহ সেই গুপ্ত কথা মোর সমপাস ॥
চক্ষে না দেখিলে তারে খবরিয়া কয় ।
দেখিয়া বিশ্বাস করা ইনসাঁইয়া হয় ॥
খবরিয়া সত্য কভু হইতে না পারে ।
তাহার দলিল আছে কোরান ভিতরে ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

ان اظن لايغنى من الحق شيئا

(ইন্নায্‌জোন্না লাইউগনি মিনাল হাক্কি সাঁইয়া)

একিনী না হলে তাহা হবে না নিশ্চয় ।
খোদা কহে এতবারি কভু হক নয় ॥
কানে কি কাগজে লিখা যে দলিল হয় ।
খবরী এতবারি তাহা বিশ্বাসের নয় ॥

এ সকল কথা যদি কহিল খান্নাছ ।
এমাম শুনিয়া অতি হইল তরাস ॥
মরি বাঁচি বলে দিল হাজার দলিল ।
কিন্তু সে শয়তান আগে হইল জলিল ॥
কোথায় শয়তান আগে রাজির এলেম ।
তার নোক্তা নাহি বোঝে সহস্র আলেম ॥
শয়তানের এলেম যেন সাগর প্রবল ।
পৃথিবীর আলেমগণ এক বিন্দু জল ॥
শয়তানের বরাবরে আলেমান যদি ।
করিবেন পারিবে না কেয়ামতাবধি ॥
কিন্তু সে কাতর আছে এস্কের বিদ্যায় ।
আশেক মাশুক ভেদ পাইবে কোথায় ॥

مقوله سعدى

(মাকুলা শাদী)

ميان عاشق ومعشوق رمزيست -
كراما كاتبين راهم خبر نيست -

(মিয়ানে আসেক ও মাসুক রমুযিস্ত ।
কেরামান্ কাতেবিন রা'হাম্ খবর্ নিস্ত ॥)

আশেক মাশুক আছে যেরাজ অন্তর ।
কেরামান কাতেবিন তাহা রাখে না খবর ॥
কেমনে তাহাতে দাগা দিবেক শয়তান ।
ফেরেস্তা বুঝিতে নারে যাহার সন্ধান ॥
সহস্র এলেম পতি তার কাছে ঘাস ।
আরেফের দমে ভাগে সহস্র খান্নাছ ॥
এবে শুন এমামের হল কি উপায় ।
শয়তানের সাথে যদি দিসা নাহি পায় ॥
কহিল কি শিখেছিনু হায় ধান্দাবাজি ।
খোয়ানু সকল শির ঝুলে গেল আজি ॥
এই বলে ধোকা তার এসে গেল মনে ।
কোথায় ঈমান তার দেখ জনে জনে ॥
হেন কালে শুনে এক গায়েবি আওয়াজ ।
আকাশ হইতে যেন পড়ে গেল বাজ ॥
গায়েব হইতে যেন সেই অলি কয় ।
বেদলিলে খোদা এক দলিলে কি হয় ॥

গায়েবি আওয়াজ শুনে হিম্মত অপার ।
কহিল প্রভুর জাতে দলিলে কি কার ॥
হিম্মত বাতেনি তারে করিল আছর ।
তেই সে রাজির মুখে বলে দরাদর ॥
নহে রাজি পরে বাজি করিত শয়তান ।
সে বাজিতে রক্ষা কোথা পাইত ঈমান ॥

مقوله مولانا روم
(মাকুলা মাওলানা রুম)
شیخ نورانی زراه اگاه کند -
پای سختش نیز همراه کند
(সাঁইখে নূরানী যাঁরাহ্ আঁগা কোন্দ
পাঁইয়ে সাখ্নাস নেজা হামরাহ্ কোন্দ)

জোতির্ম্ময় পীর যারে করে জ্যোতির্ম্ময় ।
কালামের সৃষ্টি মূল তার মধ্যে হয় ॥
একথা শ্রবণে কহে শয়তান দেওয়ানা ।
এমামতি লিয়াছিনু দিয়া এক হানা ॥
কোথায় কেতাব তব কোথায় কোরান ।
কোথা তব তছনিফাত কেমন ঈমান ॥

ازتفسیر مولا نا یعقوب چرخی رح
(আজ তাফসীরে মওলানা ইয়াকুব চারখি (রহঃ)

کرباستد لال کارین بودی -
فخر رازی راز دان دین بودی -
پای استد لالیان چوبین بود -
پای چوبین سختپ تمکین بود -
(কারেবা ইস্তেদালাল্ কারে দিনে বুদে ।
ফাখ্রে রাজি রাজদাঁনি দিনে বুদে ॥
পাঁইয়ে ইস্তেদালালিয়ান চৌবিনা বুদ্ ।
পাঁইয়ে চৌবিনা সাখতেপেঁ তাম্কিন্ বুদ্॥)

দলিলেতে দ্বীনদারী হ'ত যদি শেষ ।
ফকরে রাজি রাজ দান পে'ত উপদেশ ॥
দলিল কাঠের পাও চলা মহা দায় ।
পদ বিনা কাষ্ঠ পদে কোথা চলা যায় ॥
বেগর পীরেতে তব ঈমান কোথায় ।

ভাণ্ড খালি নাম অলি কি হইবে তায় ।
মোর্শেদ ঈমান বটে আমল তোমার ।
মোর্শেদ মরণ কালে হবে রাহাদার ॥
মোর্শেদ কবরে গতি সময় উদ্ধার ।
পিতামাতা যে কালেতে কেহ নহে কার ॥
মোর্শেদ হাসরে গতি খলিফা নবীর ।
শত নবী সাথী নহে কিন্তু নিজ পীর ॥
পোলেতে মোর্শেদ কোলে হয়ে যাবে পার ।
ভক্ত মোর্শেদ জান খোদা পীর তার ॥
হুর নূর সেই পুর ফল ফুল জল ।
মান কান সাঁই পীর দিদার কেবল ॥
ইহ ধাম সেই নাম তার কাম সার ।
পীর মান সেইস্থান তাহাতে উদ্ধার ॥
তুমি যদি খোদা বলে ডাকিবে হাজার ।
না শুনিবে খোদা তাহা হাদিসে প্রচার ॥
পার যদি পীর মুখে ডাক দেও তায় ।
ডাকে ডাকে ডাক পাবে যাবে না বৃথায় ॥
না বল কোদার নাম না বল রসূল ।
এক চিত্তে পীর মুখে বোলাও কেবল ॥
তব জন্য পীর যদি করে আরাধন ।
তবেত সন্তোষ হবে প্রভু নিরাঞ্জন ॥
তুমি পাপী শত পাপী তাতে দোষ নাই ।
নিজে ফানি পীর ধনী তার স্থানে চাই ॥
তবে গতি তার মতি তার স্থিতি পাই ।
স্থিতি যার কিবা তার পীর যার ভাই ॥
ভাব হাদি আহ্মদি নিরবধি পীর ।
অকেলেশে সে মানসে মন রশ ধীর ॥
মাটিতে রুপিলে গাছ হইবে শিকড় ।
ডাল পালা ফল ফুল হইবে তৎপর ॥
শিকড় না হইতে যদি লিবে উঠাইয়া ।
না ধরিবে ফল তাতে যাইবে মরিয়া ॥
সেইরূপ জাহেরান যত আলেমান ।
ফল রহে গাছ তার নাহি পায় স্থান ।
কেহ বলে চল হেন কেহ করে মানা ।
দুই পক্ষে দলাদলি বিষম যন্ত্রণা ॥

একিন গাড়ীতে তারা মাটি নাহি পায় ।
কৃষকে রুপিলে গাছ ছাগলে উঠায় ॥
একিনের গাছ হতে ফল ধরে তায় ।
গাছ না হইলে ফল কিসে জন্ম পায় ॥
জমিনেতে ফল ভাই নাহি কদাচন ।
অবশ্য ধরিবে ফল বরিলে রোপন ॥
মোর্শেদ রুপিলে গাছ হইবে প্রবল ।
উঠাইতে পারিবে না করে মহা বল ॥
ওয়াজ আওয়াজ কভু শুনিবে না কানে ।
রহিবে তাহার নেগা একিন কোরানে ॥
ফখরে রাজি ইমামের ঈমান কোথায় ।
আছিল ফকির দোস্ত তাতে রক্ষা পায় ॥
ইহাতে মালুম হৈল এই বাত সার ।
যাহার নাহিক পীর শয়তান তাহার ॥

العلم حجاب اكبر

(আল্ ইল্‌মু হিজাবু আকবার)

মুরীদ কি

মোর্শেদের ছিনা আহা কি কব বাখান ।
নিরবধি প্রভু নাম তাহাতে আসন ॥
এক নামে তরে পীর এক নামে মরে ।
এক নামের শত গুণ তাঁহার অন্তরে ॥
এক নামের মহব্বত এক নামের জ্বালা ।
দিবা নিশি জ্বলে নামে তনু হয় কালা ॥
এক নামের শত রঙ্গ রঙ্গ ধরে তায় ।
সেই নামে কত নাম কে বুঝিবে হায় ॥
এক ফলে শত ফল দানায় দানায় মূল ।
মূলে মূলে গাছ পালা ডালে ডালে ফুল ॥
ফুলে ফুলে শত ফল তার কোন ফল ।
খাইতে পারিলে ফল তারে শিষ্য বল ॥
হাত ধরে তওবা করে যে হয় মুরিদ ।
সে কভু মুরিদ নহে জানিবে মারিদ ॥
মোর্শেদ পাইলে সেই মুরিদ নিশ্চয় ।

অযথা বলিয়া পীর শুধু ঝুট কয় ॥
এসব অলীক কথা শয়তানি ফিকির ।
মোর্শেদের বদনামি ভুত তার পীর ॥

حديث شريف

(হাদিস শরীফ)

من ليس له الشيخ فشيخه الشيطان

(মান্ লাইসালাহুস্ শাইখু ফাস্‌শাইখুহুস্ সাঁইতোয়ান)

কেতাবেতে আসিয়াছে যার পীর নাই ।
শয়তান তাহার পীর নিশ্চিত বালাই ॥
যে জন পীরের ভাব চাহে বুঝিবারে ।
আহ্‌মদি ভাব বিনা পাইবে না তারে ॥

পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দিগী কবুল হয় না

দীক্ষিত না হয় যেই পীরের সমীপে ।
মন তন বেন্ধে সেই রাখিবে কিরূপে ॥
জংলি ঘোড়া মাঠে ফিরে সহিস বিহনে ।
দেও ভূতে দৌড়াইয়া ফিরে বনে বনে ॥
বিরাণ ঘরেতে হয় দেওয়ের আছর ।
বসতি কঠিন জান তাহার ভিতর ॥
ভূতুম পেঁচকা যথা নিরবধি ডাকে ।
বিরাণ পাইলে জাগা সদা বসে থাকে ॥
যে জাগাতে হয় জান ঘোর অন্ধকার ।
কখন কি হয় তথা লোকের গুজার ॥
চোরের বসতি হয় যে ঘর মাঝার ।
দেশপতি চোর যথা চোর কর্মকার ॥
তথায় বসতি করা হইবে কঠিন ।
বসতি করিলে হবে চোরের অধীন ॥
বক্তেক উজির যার হইবেক পীর ।
দাগাদারি কাম তার করিবে তাছির ॥
নামাজেতে খাড়া যদি খোদা করে মনে ।
পবনের আগে মন চলে যাবে বনে ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

من شر الوسواس الخناس

(মিন্‌সাররিল ওয়াস্ ওয়াসিল্ খান্নাছ)

শয়তান হইতে পানা ধরিবে খোদার ।
পাইতে খোদার পানা পীর দরকার ॥
নতুবা শয়তান পীর হয় তা সবার ।
দমে দমে দাগা দেয় হেন দাগাদার ॥
এ কারণে এবাদতে নাহি পায় মজা ।
করিতে জেকের তার ঘাড়ে চড়ে বোঝা ॥
কিছুতে না ফল পায় যত করে চাষ ।
খোদার জেকের যেন ঠেকে বন ঘাস ॥
অতএব কহিয়াছে কোরানে আপন ।
মন নিবেশিয়া তাহা শুন বন্ধুগণ ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

فى قلوبهم مرض فذاد هم الله مرضا

(ফি কুলু বিহিম মারাদুন ফাজাদা হুমোল লাহু মারাদা)

ওদের মনের মধ্যে বেরাম যখন ।
আরও বেশি করে খোদা বেরাম তখন ॥
যাহার ঘরেতে করে মোর্শেদ আসন ।
খোদা বই কোথা হয় মনেতে স্মরণ ॥
পীর ঘরে প্রভু নাম নিরবধি জমা ।
জল কুপে জল যেন নাহি পায় ক্ষমা ॥
ঝরণার জল যেন করে কল কল ।
নিরবধি বহে যেন করে মহাবল ॥
বেগেতে পবন ধায় হুহু কভু করে ।
ধুম ধুম হুম হুম রবে যেন ঝরে ॥
মহা অগ্নি কোপ যেন ধাঁ ধাঁ ঘোরতর ।
সাগর তরঙ্গ হেন সাঁ সাঁ শব্দে স্বর ॥
মেঘের নাদেতে ধ্বনি শ্বন শ্বন সোর ।
যত বেগে চলে গাড়ি হুহু তত পর ॥
তেমনি পীরের দেহে গভীরতা জল ।

যে ডুবিল সেই জলে পড়িলেক তল ॥
সে জলের তলদেশে খেজের আসন ।
খেজের রক্ষক তথা খেজের শাসন ॥
দূতগণ চৌকিদার খেজের সমীপে ।
ভূতগণ দাগাদারি করিবে কিরূপে ॥
প্রবেশ করিল যেই পাতাল মাঝার ।
জলাকার বিনা কভু দেখিবে না আর ॥
নাক মুখ বন্ধ করে কানে দিয়া তালা ।
জল তলে ডুব দিয়া হিম কর জ্বালা ॥
যে তরীর হবে ভাই মোর্শেদ কাণ্ডারী ।
সেই তরী চালাইতে দাঁড়ি হবে বারি ॥
সোনার পুত্‌লা আগ্ ভোটে ইঞ্জিন চালায় ।
কল ঘরে টেন্ডেল সাঁই টিপ দিলে ধায় ॥
ইষ্টিমের জোর ভারী বাইলেট ডবল ।
পাখা বেগে উজান ধায় হু হু সোরগোল ॥
অন্ধকার ধন্ধকার আর খোয়াকারে ।
ঘুচিবে মোর্শেদ দিলে দিয়াবাতি তারে ॥
খস্ খস্ দিয়া বাতি যখন ঘসিবে ।
ফশ ফশ করে আলো বাহির হইবে ॥
ঘেস কলে ঠেস দিয়া দেখ একবার ।
একই কলের চাপে জ্বলিবে হাজার ॥
যথায় হাজার বাতি জ্বলে দিবা রাতি ।
তথা কি হইবে আর চোরের বসতি ॥
চোর চাহে ভরা বাড়ি ঘোর অন্ধকার ।
হাজার দীপের আগে কোথা চোর আর ॥
খাড়া হও নামাজেতে করহ বন্দেগী ।
হইবে না হইবে না কখন রান্দেগী ॥
যতক্ষণ আছ তুমি নামাজে খোদার ।
আসিবে না আসিবে না কু-ঘটনা আর ॥
কেরাত পড়িবে যদি তাবত কোরান ।
হইবে না হইবে না কভু পেরেশান ॥
রুকু দিয়া দিন ভর যদি তুমি রবে ।
কখন না কখন না মছিবত হবে ॥
ছজুদাতে যেয়ে যদি রাখিবেক মাথা ।
হইবে না হইবে না কখনই ব্যথা ॥

একেলা জামাত পড় ঘরেতে বসিয়া ।
নিজ এমামের তব মোক্তাদি হইয়া ॥
একেলা জামাত করে পড়িবে কোরান ।
একেলার জন্য শত করিও বিছান ॥
এক এক বিছানে কর শতেক কাতার ।
এক এক কাতারে লোক সহস্র হাজার ॥
সহস্র জবান হবে একের জবান ।
এক এক জবান হবে সহস্র সন্ধান ॥
এক এক সন্ধানে যদি পড়িবে নামাজ ।
এক এক নামাজে হবে শতেক মেয়ারাজ ॥

দ্রব্যগুণ

প্রত্যেক বস্তুর হয় নব নব গুণ ।
কেতাব দলিল তাতে নাহি প্রয়োজন ॥
সূর্য্যের পরম তেজ সদা দরশন ।
ভানুর দলিল হয় ভানুতে লক্ষণ ॥
শিয়াল দেখিলে হয় কম্পিত বদন ।
কেতাবের মানা নাহি শুনিবে তখন ॥
যে নর ডুবয় জলে বন্ধ হবে শ্বাস ।
কোথায় কোরানে করে তাহার তালাস ॥
সুগন্ধে মোহিত মগ্ন হইবে যথায় ।
তাহাতে মগজ বাড়ে যে রহে তথায় ॥
যথায় সুমিষ্ট বায়ু করে সঞ্চালন ।
মহাতাপী হইলে তথা পুলকিত মন ॥
শুনিলে মধুর সুর আনন্দ কৌতুক ।
দুঃখে কাল কাটে যার তবু তার সুখ ॥
আঘাত লাগিবে যদি শরীর মাঝার ।
খামোখা আসিবে উহু কি করিবে তার ॥
তামাকের ঘটে যদি আতর রাখিবে ।
সুগন্ধি হইবে নহে খামিরা বনিবে ॥
আতর বিনাশ করে গন্ধ মন্দ চয় ।
সুবাসিত তৈল আদি ফুলে জন্ম হয় ॥
প্রভু নাম গুণ যদি তব মনে রবে ।
নিজ গুণে গুণি তুমি কেতাবে কি হবে ॥

প্রভু নাম গুণ তাহা কে করে স্থাপিত ।
ভাবিয়া তাহাকে নর হলো সশঙ্কিত ॥
জল স্থল যত বল ভূবন মাঝার ।
প্রভু পদে পদ পেয়ে হয়েছে নির্দ্ধার ॥
গজবের নূরে সৃষ্টি হইল আগুণ ।
রহমতি নূরে জন্ম ঠাণ্ডা গুণাগুণ ॥
লতিফ নূরে নরম পয়দা ঝড় ও বাতাস ।
কছিফ নূরে মোটা পয়দা পাহাড় আকাশ ॥
ঘোর নূরে চোর জন্ম ডাকু রাহাজান ।
ধীর নূরে মুনি জন্ম আর মহাজন ॥
যে জন এসব গুণ করিবে সাধন ।
নিজ গুণে গুণি সেই কর নিরূপণ ॥
আপন নিঃশ্বাস পরে বিশ্বাস করিয়া ।
নিজ মন কোরানেতে লহ তালাসিয়া ॥
অতএব কহে নবী হাদিস কথন ।
দেল হইতে তালাসিবে ফতওয়া মুণিজন ॥

حديث - از عين العلم

(হাদিস-আজআইনুল ইল্‌ম)

استفت عن قلبك وان افتك المفتون

(ইস্‌তাফ্‌তা আন্‌কালবিকা ওয়াইন আফ্‌তুকাল মাফ্‌তুন)

মুফতী যদি করে মানা নাহি শুন তায় ।
কি হবে শুনিলে ফতওয়া না রৈলে হিয়ায় ॥
মন ঘরে ধন রৈলে ফতওয়া কিছু নয় ।
কাঁচা মনে সাচা ফতওয়া বৃথায় নিশ্চয় ॥
কেতাবেতে লাইলী নাম আছয় লিখন ।
তবে কি কেতাবে লাইলী আছে কদাচন ॥
লাইলী লাইলীতে আছে কেতাবেতে নাই ।
মজনুতে লাইলী আছে কহিয়া জানাই ॥
ভূতের আছর যদি কার পরে হয় ।
মনুষ্য ছুরত পরে ভূতে কথা কয় ॥
আসেক মাশুক যদি জুদা জুদা হয় ।
হাকিকতে এক দেহ কিন্তু জুদা নয় ॥
পিরিতে পিরিতে আছে এক আলাপন ।
নর হৃদে বাস করে দেহেতে গোপন ॥

অগ্নি যত পৃথিবীতে এক অগ্নি হয় ।
তেমনি মাশুক জান অভিন্ন হৃদয় ॥
একই সকল বায়ু করিবে বিশ্বাস ।
জানিবে সকল দম একই নিঃশ্বাস ॥
দম দম এক দম দম নাহি আর ।
পাইবা দমের ঘরে প্রভুর দিদার ॥
ঝাড়িলেই চক্‌মক্ জ্বলিবে আগুন ।
পুরাণে কোথায় আছে বলত আগুন ॥
তব সনে আছে সাঁই নাহিক কোরানে ।
এহেন প্রভুর বাক্য নাহি শুন কানে ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

نحن اقرب اليه من حبل الوريد

(নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন্ হাবলিল ওয়ারিদ)

সাহারগ হৈতে তব নিকটেতে ঠাঁই ।
কহ সেই স্থান কোথা কোথা আছে সাঁই ॥
মাবুদ চিনিতে যদি চাহে কোন জন ।
সাবুদ করিয়া চিনে নিজ তন মন ॥
প্রেমের অনল হেন মন মাঝে ঘোষে ।
শ্রম করিয়া তায় প্রেমিকেতে তোষে ॥
কাহার শিক্ষিত নহে প্রেম রস ধন ।
এবে যার প্রেম আছে জানে তার মন ॥
অযথা পুরানে কেন করহ ভ্রমণ ।
পুরানে কোরানে নাহি পাবে দরশন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

هومع كم اينما كنتم

(হুয়া মা'আকুম্ আইনামা কুন্‌তুম্)

নিজ সনে আছে সাঁই নিজে জানি নাই ।
এ বড় বিষম বোকা দারুণ বালাই ॥
নিজে কানা অন্যে মানা গলা করে টান্ ।
চোর হাতে ছোরা রাখে বধিতে পরান ॥

নূরেহক্ব সঙ্গের সাথী

নূরেহক্ব বিনা গতি নাহি ত্রিভূবনে ।
সে নূর সঙ্গের সাথী মরণে জীয়নে ॥
মরিলে মোর্শেদ মাল বাড়িবে দ্বিগুণ ।
কম নাহি জান কভু যেমন আগুন ॥
কালাম রব্বানি নামে কেতাব ভিতর ।
নূরেহক্ব সঙ্গের সাথী জান নিরন্তর ॥
বড় পীর কহে নূর সঙ্গী সমুদয় ।
কবরে হাসরে তাহা বিনে গতি নয় ॥
সাথে যাবে নূরেহক্ব আমল তোমার ।
কবরে হাসরে হবে নিত্য দুনা তার ॥
নিত্য দুনা হবে গুণা আমল ততপর ।
মার্জ্জন হইতে রবে লাগাত হাসর ॥
জারিয়া আমল এই মোর্শেদীরে কয় ।
বসে বসে দুনা ফল পাইবে নিশ্চয় ॥
পবিত্রতা নূরেহক্ব করে যদি মন ।
পবিত্র হইলে মন শুদ্ধ হবে তন ॥
শুদ্ধ যদি তন হবে হইবে পাষাণ ।
পাষানেতে কীড়াগণ করে না আসন ॥
আসন করিবে পোকা যাহার অন্তর ।
অন্তরে কি হবে তার পড়িলে মন্তর ॥
মন্তর সামান্য কথা মুখের পাঁচালী ।
পাঁচালী কোরান জান মন যার খালি ॥
মন ভাণ্ড খালি যার খালি সংসার ।
সংসার অসার হবে হলে অন্ধকার ॥
ইহকালে অন্ধকার হবে যেই জন ।
পরকালে কোথা পাবে খোদা দরশন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

ان فى ذالك لذكر لمن كان له قلب

(ইন্না ফি যালিকা লি জিক্‌রি লিমান্ কানা লাহু কাল্‌বুন)

যে জানে কলব ব্যাখ্যা মন আছে তার ।
কোরান জেকের হবে কারণে তাহার ॥

কোরান কলবযুক্ত তবে সে কারণ ।
ইহাই খোদার কথা কোরানে প্রমাণ ॥

নিজের উপদেশ
নিজে দেওয়া কর্তব্য

উপদেশ দিতে চাহি পরের কারণ ।
নিজে উপদেশ নাহি দেই কদাচন ॥
কোরানেতে মোর নাম কোথা লিখিয়াছে ।
স্বর্গীয় বলিয়া আমি কিসে জানা গেছে ॥
নিজে যদি স্বর্গীয় হইতাম ভাই ।
বাঁচাইতে পাতকীরে দিতাম দোহাই ॥
আমি যদি ফেরাউন নাহি হইতাম ।
অনুক্ষণ লায়ান্নত তারে করিতাম ॥
ফছুছ কিতাবে আছে এমত লিখন ।
ফেরাউন হইতে বদ জানহে আপন ॥
নহে ভাল তোমা হইতে ফেরাউন হবে ।
নিজে বুরা, অন্যে ভাল যদি না জানিবে ॥
নবুয়ত আসিয়াছে যাহার উপর ।
সেই কেন বাতাবে না হয়ে পয়গাম্বর ॥
কায়েম মোকামে যেই হইবে নবীর ।
বাতাইলে পাপ নাহি পাইলে তাছির ॥
বেদরকার সেই যদি পারে বাতাইতে ।
সার্থকে মানস যদি নাহি রাখে তাতে ॥
নিজের হইলে হিত অন্যে পাবে হিত ।
হিতাহিত না রহিলে হবে বিপরীত ॥
পরীক্ষা দিবেন ছাত্র শিক্ষক বিচার ।
শিষ্য গুরু কিসে হল কহ নামদার ॥
নিজে শিষ্য হলে শিষ্য করিবে অন্যেরে ।
নিজে পীর হলে পীর হবে তত পরে ॥
যে নর পতিত হয় মহা সমুদ্দুরে ।
কেমন করিয়া সেই বাঁচাবে অন্যেরে ॥
যে জন নিজের কুল পারে না করিতে ।
সে জন অন্যের ভুল পারে কি সারিতে ॥

নিজ তত্ত্ব যেই নর রাখে না খবর ।
নরকে যাইবে কিবা বেহেস্ত ভিতর ॥
কেমন করিয়া সেই অন্যেরে ত্বরায় ।
সক্ষম হইল কিসে হায় হায় হায় ॥
অতএব কোরানেতে কহিয়াছে সাঁই ।
হাস্যভাবে কোন কৌমে না কহ বুরাই ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

يا ايها الذين امنوالا يسخر قوم من قوم عسئ ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولاتنا بزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان من لم يتب فاولئك هم الظالمون -

(ইয়া আইউ হাল্‌লাজিনা আমানু লা ইয়াস্ খার কাওমুম্ মিন্ কাওমিন্ আসা আই ইয়াকুনু খাইরাম মিনহুম ওয়ালা নিসাউম মিন্ নিসায়ি আসা আইয়া কুনা খায়রাম্ মিন্ হুন্না ওয়ালা তালমিজু আন ফুসাকুম্ ওয়ালা তানাবাজু বিল আলকাবি বি'ইসাল ইসমুল্ ফুসুকি বাদাল্ ইমানি মান্‌লাম্ ইয়া তুবু ফাউলায়েকা হুমুজ জালিমুন ।)

ওহে লোক ঈমানদার হও খবরদার ।
হাসি ঠাট্টা নাহি কর অন্য কৌমে আর ॥
কে জানে হইবে ভাল সে কৌম নিশ্চয় ।
হাসি গেল্যা কর নহে বিনা পরিচয় ॥
আর নাহি ঠাট্টা কর বিবিগণ যারা ।
অন্য কোন বিবিগণে জানিয়া মস্কারা ॥
তোমা হ'তে সেই বিবি হ'তে পারে ভাল ।
আপসের মধ্যে আর ফাছাদ না ঢাল ॥
বুরানাম সাথে কার না কর খেতাব ।
বুরাছেড়ে তওবা পড় না জান খাবার ॥
হেন কাজ হ'তে যদি নারলে বারণ ।
নিশ্চয় জালেম সেই কোরানে লিখন ॥

ভক্তিই মূল পদ

ভক্তিতেই সিদ্ধ হবে মনের বাসনা ।
ভক্তিতেই পূর্ণ হবে নানা উপাসনা ॥
ভক্তিতেই তৃণকুটা হইবে পর্বত ।
ভক্তিতেই দূরে যাবে মনের কল্পত ॥

ভক্তিতেই পাপ তাপ মার্জ্জনা হইবে ।
ভক্তিতেই বেগতিক শরীরে না রবে ॥
ভক্তিতেই শক্তি হবে পাষাণ প্রখন্ড ।
ভক্তিতেই খণ্ড করে লিখন নির্ব্বন্ধ ॥
অভক্তিতে মিথ্যা হয় সত্য গুরুজন ।
ঘাসে ভক্তি পাবে মুক্তি রুমের কথন ॥

مولانا روم

(মাওলানা রুম)

پیرمن خس است یقین من بس است

(পিরে মান খাস্ আস্ত । ইয়াকিন মান বাস্ আস্ত ॥)

পীর যদি ঘাস হবে ভক্তি কর তায় ।
ঘাসে ভক্তি পাবে মুক্তি যাবে না বৃথায় ॥
হাফেজ হেন ভক্তি শিখ ভক্তি কর যদি ।
ভক্তি অঙ্গ পাপহীন রবে নিরবধি ॥

حافظ

(হাফেজ)

بمی سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید
که سالك بیخبر نبود ز راه ورسم منزلها

(বামি সাজাদায়ে রাঙ্গিন কুন গুরদ্ পীর মগানে গুয়্যিদ ।
কে সালিকে বেখবার নাবোদ জারাহা ওয়ারেস্মে মোন্জেলাহা ॥)

শরাবেতে "জানামাজ" করহ রঙ্গন ।
"মগগুরু" কহে যদি করিতে এমন ॥
রাহা ঘাট রাখে পীর সকল খবর ।
মদ দুধ এক জান তাঁহার গোচর ॥
কোন জন এ বয়াতে মরম কারণ ।
দেশে দেশে জনে জনে করে অন্বেষণ ॥
কেহ না কহিতে পারে মরম ইহার ।
ঘোরে দেশ অবশেষ হইল লাচার ॥
তত পরে কহে তারে কোন সাধু জন ।
পেতে পার বাক্য মোর করিলে শ্রবণ ॥
বলে ভাল কত কাল করিণু ভ্রমণ ।
তাতেও পরম কথা করি না শ্রবণ ॥

তবে সে কহিল সাধু শুনহ সন্ধান ।
আছে এক গদ্দিনীশি শরাবী মাস্তান ॥
শরাব আফিং গাঞ্জা ভাঙ্গ সারি সারি ।
দিবস রজনী মত্ত কোলে করে নারী ॥
পরীরূপ রেন্ডি কত চতুষ্পার্শে তার ।
রজনী দিবাতে করে নেসা ব্যবহার ॥
ভক্তিরূপে কর যদি উপাসনা তার ।
হাদিসের মর্ম্মে সিদ্ধ পাইবা বিচার ॥

صحیح حدیث

(ছহিহ্ হাদিস)

من اغیر مدفوع بالابواب لوقسم علی الله لایره

(মান্ উগায়্যারা মাদফুউ বিল আবওয়াবে ।
লাও কাসামা আলাল্লাহে লা ইয়ারাহু ॥)

দেখিবে বিশ্রী রূপ কু-আকৃতি তার ।
এহেন পুরুষ যায় দরজাতে যার ॥
গরদানা দিয়া তারে বাহেরে তাড়ায় ।
কছম করিয়া যদি কহিবে খোদায় ॥
সত্য হবে বাক্য তার বৃথা হবে নাই ।
আছেহে এমন অলী পৃথিবীতে ভাই ॥
সর্প মুখে মণি আর জঙ্গলেতে খনি ।
কণ্টকেতে পুষ্প আর কাপুরুষে ধনী ॥
একথা শ্রবণে তার ভক্তি মনকায় ।
নত শিরে রত হয় মস্তানের পায় ॥
মস্তান বলেন তারে হেথা যদি কাম ।
তিন বাক্য পূর্ণ তবে কর পরিণাম ॥
মদে মত্ত বেশ্যাকারী নামাজ ছাড়িবা ।
ইহা হতে কোন কাজ প্রথমে করিবা ॥
ইহাতে বিচার করে যুবক আপন ।
প্রথমে নামাজ হইতে রহিব বারণ ॥
মস্তান কহিল তারে রহ কত দিন ।
করারে রহিবা ঠিক থাকিয়া অধীন ॥
অধীনে রহিয়া ঠিক কত দিন যায় ।
একদা প্রভাতে সেই নামাজ সময় ॥

ছটফট করে তনু নামাজ কারণ ।
কিন্তু যে ফরজ পড়ে লইল তখন ॥
নামাজ পড়িয়া চাহে হইতে বাহার ।
দেখেন রাছুল খাড়া সামনে তাহার ॥
অমাবস্যা রাত্রে যেন পূর্ণিমার চাঁন ।
রাছুল ছিলেন খাড়া দেখিল যোয়ান ॥
ধনহীন পায় যেন মানিকের খনি ।
বোবা যেন কথা শিখে হয় সুবচনি ॥
কিন্তু যে রাছুল কন বিনয় বচন ।
আমার ছুন্নতে কেন রহিলে বারণ ॥
গায়েব হইল নবী এতেক বলিয়া ।
তাজ্জব হইয়া কহে মস্তানে আসিয়া ॥
কহিল মস্তান গুরু শুন মন কায় ।
ফরজ ছাড়িলে আজ দেখিতে খোদায় ॥
যুবকেরে কহে পরে যাইয়া বাজারে ।
টাকা দিনু নিয়া যাও বেশ্যানির ঘরে ॥
আছিল নিশীর কাল চলিল একেলা ।
বেশ্যানি বুড়ির সাথে করে কহা বলা ॥
কত ছুড়ি আছে বুড়ি কহিল আমার ।
দেখিয়া তাহার সনে কর ব্যবহার ॥
একথা শুনিয়া যায় কোঠার মাঝার ।
দেখিল কান্দিছে ছুড়ি হয়ে জার জার ॥
কান্দিয়া আঁচলে ঢাকে আপনার মুখ ।
কহিল যুবক তারে কহ কিবা দুঃখ ॥
এসেছি তোমার কাছে সুখের বিষয় ।
শুনিয়া কাঁদন তব সহ্য নাহি হয় ॥
কি হেতু করিতে আছ এতেক রোদন ।
বিবরিয়া কহ এবে আপনা বেদন ॥
বলিল আমার দুঃখ কহিব কাহায় ।
শিকার বাঘের কাছে কোথা রক্ষা পায় ॥
আছিল কপালে লেখা ঘটে অমঙ্গল ॥
তাতে বিধি ঠেকাইল বাঘের জঙ্গল ।
যুবক বলিল তারে শুনহ সুজন ।
কেবা তুমি কোথা ঘর কহ কোন জন ॥
কহিল অমুক দেশ মোর বাড়ি ঘর ।

পিতা মাতা শ্বশুরাদি নাহি আছে মোর ॥
ছিল কিন্তু স্বামী এক বয়াত লইয়া ।
মর্ম্ম অন্তে বার সাল গেছে গুজরিয়া ॥
তাহার শোকেতে কাঁদি হইয়া কাতর ।
তাহাতে বিপদ মম ঘটে বহুতর ॥
আমাদের গ্রামপতি পড়িয়া পশ্চাতে ।
কৌশলে বিক্রয় করে বেশ্যানীর হাতে ॥
কিন্তু আমি আজ হতে ঠেকিয়াছি দায় ।
অতএব কাঁদি আমি করে হায় হায় ॥
যুবক করিল যদি একথা শ্রবণ ।
বেহুঁস হইয়া হইল মাটিতে পতন ॥
সতর্ক হইয়া কহে আমি সেই নর ।
আছিনু বিদেশগামী তোমার সওহর ॥
গলাগলি হয়ে তারা কাঁদে দুইজন ।
শুনিয়া বিনয় করে মৃত্তিকা গগণ ॥
করিয়া যুবক কত বিনয় বচন ।
চলিনু পীরের আগে রহ কতক্ষণ ॥
যাইয়া পীরের পায় করিল প্রকাশ ।
করহ গ্রহণ পীর আমি তব দাস ॥
একে একে প্রকাশিয়া কহিল সকল ।
মোর্শেদ কহিল বাপু হইবে মঙ্গল ।
বেশ্যানি বুড়ির তরে আপনি মাঙ্গায় ॥
পুছিল সতীর হাল একে একে তায় ॥
কহিল বেশ্যানি বৃদ্ধা মোর্শেদ ছামনে ।
অবিকল প্রকাশিল না রেখে গোপনে ॥
কহে পীর বেশ্যানিগো যাও না ত্বরায় ।
হেফাজতে এনে এবে দেখাও আমায় ॥
এ কথা শুনিয়া ধায় যেমন পাগল ।
পৌছিল পীরের পায় ভাবিয়া মঙ্গল ॥
পীর তারে স্থির করে সন্তোষ বচনে ।
নিরবধি রাখে তারে আপনা ছামনে ॥
পীর যারে স্থির করে চিনিবে খোদায় ।
হারামে হালাল তারে মদে দুধ পায় ॥

তাহারা চিনিয়া পীর পাইল খোদায় ।
না ভজি মোর্শেদ পদ হায় হায় হায় ॥
অতীত হতেছে কাল আসিবে না আর ।
পীর বিনা পরকালে কি গতি আমার ॥
বেশ্যানি পীর পেয়ে হল সাবধান ।
বুড়াকালে পীর গুণে পেল পরিত্রাণ ॥
তুমিও ভজহ গুরু হইবে মঙ্গল ।
না ভজিলে কোন হেতু হইবে না ফল ॥
গুরু যদি প্রদানিবে মুর্দ্দার আমায় ।
খাইব সে মুর্দ্দা আমি ভক্তি করে তায় ॥
শতেক কেতাবে যদি মানা করে তারে ।
মানিয়া পীরের বাক্য রে'খে দিব ধারে ॥

مولانا روم

(মাওলানা রুম)

صد کتاب وصد ورق درنارکن
جان ودلرا جانب دلدارکن

(সোয়াদ্ কিতাবো ওয়া সোয়াদ্ ওয়ারাক্ দার নারেকুন ।
জান্ও দিলেরা জানিব্ দিল্দার কুন ॥)

শত কেতাব ফিকে মার আগুন ভিতর ।
এক মনে ভক্তি কর তরফে দেলবর ॥
পরেতে যুবক মদ চলে খাইবারে ।
মদে মধু পায় শুধু মদের ভাণ্ডারে ॥
একে একে যত মদ করেছিল ক্রয় ।
খাইবার কালে তাহা মধু বিনা নয় ॥

مولانا روم

(মাওলানা রুম)

ملت عشق از همه دینها جداست
عشقا نراملت ومجهب جداست -

(মিল্লাতে ইস্ক আজহুমা দিনাহা জুদা আস্ত ।
আসেকানেরা মিল্লাত ও মাজহাব জুদা আস্ত ॥)

আসেকান মোজাহাবে কেহ কার নয় ।
নিজ্ নিজ্ মোজাহাব তাদের নিশ্চয় ॥

قول عارف

(কাওল আরেফ)

عقشق رابا کافر ومؤمن نباشد احتیاج
اینسخن در مسجد وبت خانه بایدمی نوشت -

(এস্কেরা বা কাফিরো মোমিন নাবাসাদ এহতেইয়াজ ।
ই সাখুন দার মাসজিদো বুতখানা বায়েদ মিনোইস্ত ॥)

এই কথা লেখা চাই মছজেদ মন্দিরে ।
প্রেম পাশে সমতুল্য মমিন কাফিরে ॥

چه موسئ چه عیسئ چه پیرمر سلان احمد
چه ترساومغا انجاهمه گست برابربین -

(চেঁ মূসা চেঁ ইসা চেঁ পিরে মারশালানে আহাম্মদ ।
চেঁ তারসা ও মোগাঁ আজাঁ হামা গাস্ত বরাবর বিন্)

মুছা ইছা হবে কিবা শেষ পয়গাম্বর ।
ফেরেঙ্গি ও মগ হেথা এক বরাবর ॥
সকল আগুন বটে একই আগুন ।
আগুনে আগুনে নহে হবে গুণাগুণ ॥
এস্কের শরাব যেই খাবে এক জাম ।
বেহুঁস হইবে ভোলে নিজ নিজ কাম ॥

توحید نشنا خت هر کراحالی نیست
درراه طلب همت اوعالی نیست
خوش انکه میان خویش حق رابشنا خت
اودر همه جااستهیچا جاخالی نیست -

(তওহিদ নাশানাখ্ত হরকেরা হালে নিস্ত ।
দাররাহ্ তলব্ হিম্মাত আও আলা নিস্ত ।
খুস আ'কে মিয়ানে খোয়িস হাকঁরহ্ বা সানাখ্ত ।
ওদর হামা জাঁআস্ত হিচ্ জাঁ খালি নিস্ত ॥)

হালাত না আসে যার তৌহিদ মাঝার ।
কোথায় খোদার রাহে হিম্মত তাহার ॥
নিজ সনে চিন তারে সন্তোষ বিষয় ।
ত্রিভূবনে তার ভিন্ন কোন জাগা নয় ॥
অন্ধ জনে করে যদি এভব ভ্রমণ ।
আকাশের শশী কিহে দেখিবে কখন ॥

পাগলকে মন্দ বলা কর্তব্য নহে

পাগল আগল বটে পাগল জাগল ।
কোথায় পাগল আগে দোজখ গরল ॥
পাগল উপরে হবে দোজখ হারাম ।
ঝুট নহে জান এই হাদিছ কালাম ॥
বায়ুতে পাগল যেই তার হবে মাফ ।
খোদার পাগল বটে কিন্তু কাল সাপ ॥
তাঁহাদের সনে যেই করিবে বেজায় ।
সহে না তাঁহার দুঃখ আপনি খোদায় ॥
তাহার নকল এক পড়িল স্মরণ ।
হাছানাতোল আরেফিনে আছয়ে লিখন ॥
ফরাহির বেটা কহে ছিলাম নৌকাতে ।
নদী আরোহণ ছিল জুন্নুনের সাথে ॥
হেন কালে এক নাও আলেম ছওয়ার ।
ফকিয়া পণ্ডিতগণ যায় তরাতর ॥
তাহা হইতে কোন জন কহে জুন্নুনেরে ।
যাইতেছে আলেমান বাদশার দরবারে ॥
কাফের বলিয়া তোকে সাক্ষী দিবে তারা ।
ডোব্ বলি জুন্নুন তায় করিল ইসারা ॥
ডোব শব্দ সম্পূর্ণ নাহি হয়েছিল ।
আলেমের নৌকা ডুবে সকল মরিল ॥
কহিনু আলেম তায় ছিল গুণাগার ।
মাল্লাগণ ডুবে কেন মরিল আবার ॥
কহিলেন মাল্লা কেন হেন ঝুটাগনে ।
লইয়া চলিতেছিল নৌকা আরোহণে ॥
আলেম বাহেছ করে কেতাব কোরানে ।
পাগল বাহেছ করে বধিয়া পরানে ॥
ধন তন বিধ্যা আদি রূপ সুরেশ্বর ।
ইহার গৌরব হয় আলম ফখর ॥
ধন জন রূপ রঙ্গ ত্যাগিয়া ফকির ।
প্রেম বায়ু সঞ্চালনে সদাই অস্থির ॥
তাহাকে কাফের কহে আলেম বেহুঁস ।
অক্ষর কীর্ত্তনে শুধু এত বড় যোস ॥
নিশ্চয় প্রেমের বিদ্যা পেত যদি হায় ।

ফকিহ্ আলেমগণ কেন মারা যায় ॥
প্রেমেতে মগ্ন সদা মানস খোদার ।
প্রেমিকের কটু বাক্য মিঠা লাগে তার ॥
পিরীতের পেরত যদি কটু কথা কয় ।
কটুবাক্য মধু হেন সন্তোষ হৃদয় ॥
অপ্রেমিক নরগণ সরা সরা করে ।
সার সার অদ্ভুত খোদা কহে তারে ॥
খোজা কি প্রেমের রস পারে বুঝিবারে ।
আগুন কাপড়ে বেন্ধে কে রাখিতে পারে ॥
গোলাব হেন ঠোঁট যার শুধু মিষ্টময় ।
মিঠা লব চাটে যার মিঠা লব হয় ॥
যে নর তুতীর কথা পারে বুঝিবারে ।
ছলেমান বিনা কেবা আজ্ঞা দিল তারে ॥

قوله عارف ربانی

(কাওল আরিফ রব্বানি)

مرد میباید که باشد حق شناس -

تشنا سد شاه رادر هر لباس -

(মর্‌দমি বায়েদ কেহ্ বাসাদ হক সাঁনাস ।
তাস্‌নাসাদ শাহেরাহ্ দর হর লেবাস ॥)

যেই জন চিনিবারে পারিবে খোদায় ।
পাইবে সাহার দেখা প্রত্যেক জামায় ॥
অন্ধজন করে যদি এ ভব ভ্রমণ ।
আকাশের শশী কি হে দেখিবে কখন ॥

নিয়ত ব্যতীত কোন আমল হয় না

حاديث

(হাদিস)

انما الاعمال بالنيات

(ইন্নামাল আমালু বিন্ নিয়াত)

আমল কারণে খালী মানস দরকার ।
কোথায় মানস বিনা আমল তোমার ॥
আমল করিতে যদি চাহ কোন জন ।

মানস নিয়ত চাই করিতে সাধন ॥
বেগর মানসে যদি করিবে সাধন ।
সাধন বিফল হবে যাবত জীবন ॥
একিনে হালাল হবে হারামে ছওয়াব ।
করিলে হালাল দান ঘটিবে আজাব ॥
রেয়াতে দানের ফল কিছু না রহিবে ।
দেখা যদি রেয়াকার আমল করিবে ॥
পাইবে রেয়ার ফল নরকেতে ঠাঁই ।
নিয়তে হইবে ফল নাপাকেতে পাই ॥
নাপাক পায়খানা দেখ হাগিবার কালে ।
নিয়ত করিয়া দান পোকাগণে দিলে ॥
যত বেশী মল মুত্র হইবে তোমার ।
ততই ছওয়াব পাবে খেলায়ে আহার ॥
চালাকিতে মল মুত্র না দিলে পোকায় ।
কি হল ভালাই তব খোদার বান্দায় ॥
প্রভু যারে সৃজিয়াছে পোকা নাম তার ।
তোমার পেটেতে রৈছে আহার পোকার ॥
কি হেতু তাহারে তুমি বালু চরে নিয়া ।
না খিলাও পোকাগণে ধুপে শুখাইয়া ॥
যদি তব মনস্কাম হইত সাধন ।
প্রভু যারে খাওয়াইছে করি তা সেবন ॥
তবেই প্রভুর মন হইতো সন্তোষ ।
আমার সৃজন ব'লে কেবল মানস ॥
ভাবরে ভাবুকগণ মনে রাখ ভাব ।
পোকাগণে তব মনে না জান খারাব ॥
পোকা হেন ব'লে যদি তব মনে রবে ।
কিসে হ'ল পোকাগণ পাইয়াছ ভাবে ॥
কি আছিল পোকাগণ আসিল কোথায় ।
কিসেতে হইল পয়দা কহ দেখি তায় ॥
দেখিতে ঘৃণিত যদি দেখ হেন পোক ।
নাহিক প্রভুর জাতে তব ভাবটুক ॥
একই জাতের সৃষ্ট হইল সকল ।
অজাত স্বজাত কিসে বল দেখি বল ॥
নিজেই নিজের রূপে এক নানারূপ ।
একই ভাবের পদ কহিছে ভাবুক ॥

তোমার পেটেতে পোকা পেটে তুমি তার ।
দেখহে তৌহীদ ঘরে খুলিয়া কেওয়ার ॥
শত পোকা তব পেটে খাইছে তোমায় ।
তুমিও পোকার পেটে মল-মুত তায় ॥
সেই মল মুত ঠাঁই তোমার শরীর ।
আব, আতশ, খাক, বাদ, তাতে পোক স্থির ॥
পোকের শরীরে আছে এই চারি চিজ ।
তোমার ভাণ্ডারে আছে মূলপদ বীজ ॥
তুমি আমি এক ভাণ্ড ভাণ্ড আর নাই ।
যথা তথা জল কুপ তাতে জল পাই ॥
জল পেটে স্থল আছে স্থলে আছে জল ।
জলেতে কানাই করে জলুস কেবল ॥
তেইসে কহিছে সাঁই সার্থক বচন ।
আলমেতে খোদা বটে কেবল রৌশন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

(سورة نور) - الله نور السماوات والارض -

(সূরাতু নূর)- আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদ্ ।

আলো আলো এক আলো আলো নাহি আর ।
শতেক প্রদীপে দেখ এক আলো সার ॥
শতেক প্রদীপ যদি এক ঘরে হবে ।
প্রত্যেকের আলোগুলি এক আলো তবে ॥
আলো আলো মিশে যে'য়ে এক আলো হয় ।
দেখিতে সকল দীপ যদি ভিন্ন রয় ॥
ঘড়াতেই ভরা জল প্রত্যক্ষ দেখায় ।
একত্র করিলে জুদা হইবে কোথায় ॥
সেনা রূপা জুদা জুদা যত অলঙ্কার ।
গালাইলে এক ঠাঁই ভিন্ন কোথা আর ॥
উখে রস জুদা জুদা দেখিতে সরল ।
চিপে রস এক ঠাঁই কোথা ভিন্ন বল ॥
নকলেতে জুদা জুদা ভিন্ন ভিন্ন তায় ।
আসলেতে ভিন্ন পদ হইবে কোথায় ॥

নামাজীগণের প্রতি মুক্তি কোথা

আউজ পড়িতে হয় শয়তান কারণ ।
দাগা দিয়া নষ্ট যেন নাহি করে মন ॥
আল্লাজি ইউওয়াছবেছু পড়ে ছুরে নাছ ।
পাগলেরে সাঁকোলারা কহিছে খান্নাছ ॥
ওরেরে মুছল্লিগণ মৌখিক নামাজি ।
পাগলের সাঁকোলারা মনে পড়ে আজি ॥
ভাল কথা দাগা দিতে ভুলে ছিনু আগে ।
স্মরণ দিয়াছ তাহা বোলাইয়া রাগে ॥
হেলাইব সাঁকো আজি মনের মতন ।
কেনরে আউজ তুই পড়িলি এখন ॥
কেমন আউজ তব দেখিব এবার ।
এহেন মন্ত্রেতে এবে কি হয় আমার ॥
তোমার মন্ত্রেতে আমি নাহি যাব দূর ।
করিব মন্ত্রিতে আমি আজি সাঙ্গ চুর ॥
চিরস্থায়ী আছে যার সঙ্গে অদ্ভুদ ।
কোথায় তাহার মন্ত্রে পালাইবে ভুত ॥
সামান্য মন্ত্রেতে যদি জ্বীন ধরা যায় ।
তবে কেন ভুত ভয়ে চলনা রাহায় ॥
ভুতে দুতে কখন কি হইবে সমান ।
তাতেই দেখিয়া ভুত উড়িবে পরাণ ॥
আচানক ভুত দেখে তারা মারা যায় ।
কেমনে খান্নাছ তবে দৌড়াইবে হায় ॥
এক খান্নাছ ভয়ে শত ভুত ধায় ।
কেমনে খান্নাছ তবে দৌড়াইবে তায় ॥
তোমার আউজে যদি খান্নাছ ডরিত ।
নামাজেতে ওছওয়াছ কভু না হইত ॥
এবাদতে দাগাদারি করে যেই জন ।
সামান্য চক্ষেতে যদি হত নিরীক্ষণ ॥
ভুরূকুটি দিতে তার হুস হারাইত ।
কেমনে নামাজীগণ কেরাত পড়িত ॥
মুছল্লি কেরাতে শুধু গলা করে সার ।
নহে কি কেরাতে ভুত ডড়িত না আর ॥
ভুতান্তি রোগীতে যদি শুনিত কেরাত ।

শুনিয়া শতেক ভুত যাইত তফাত ॥
পালাইবে দূরে থাক নিজ থাকা দায় ।
এবাদতে ভুত দৌড়া হইবে কোথায় ॥
এবাদতে দাগা দেয় নহে ছোট ভুত ।
দেখে তায় নামাজীর পরে যেত মুত ॥
শরীর কম্পিত কেন একেলা ঘরেতে ।
যখন নিরালা হয় নামাজ পড়িতে ॥
একেলা নামাজ পড় অরণ্য ভিতর ।
দেখিব মনেতে তব আসে কিনা ডর ॥
অতএব মোজাদ্দেদ কহে সুবচন ।
মহাসুখি ইবলিছেরে দেখে কোন জন ॥
বলে আয় বেকারেতে কেন আছ ভাই ।
কহে সেই আলেমানে দিয়াছে রেহাই ।
আলেমান বদ যারা আমার সঙ্গতি ।
তাহারাই আজ বটে মম কাজে গতি ॥
তবে নাকি কহিয়াছে প্রভু করতার ।
মনুষ্যও জ্বীন হতে তারা দাগাদার ॥
অতএব আলেমের কাহেলী কীর্ত্তন ।
পড়হ নামাজ খালি কি করিবে মন ॥
মন যদি বনে যায় তাতে দোষ নাই ।
কেবল নামাজে খালি কেরাতই চাই ॥
বলে আয় আলী যবে পড়িত নামাজ ।
আসিত বেহুদা বাত তার মন মাঝ ॥
তবে হায় ছোট বড় করহ বিচার ।
পড়হ আউজ তবে কেন বারে বার ॥
তবে কি আউজ তব বেহুদা কীর্ত্তন ।
হায় আলী আউজে কি ছিলেন বারণ ॥
নহে নহে তিনির যে আছিল কল্পনা ।
যেই কালে মন পুরে ছিল না বাসনা ॥
যে কালেতে মনপুরে করিলেন বাস ।
গুরু সিদ্ধ ধর্মে মন করে পাশ পাশ ॥
যেকালে বিষাক্ত তীর বিন্ধিল পদেতে ।
কোন হেতু হইল না তীর নিকালিতে ॥
নামাজেই হেতু হল তীর খুলিবার ।
ফকিরি ধর্ম্মের পরে প্রণয় তাঁহার ॥

ইবলিছের দাগা হতে হয়ে গেল দূর ।
তেইসে খোদার পানা আউজ প্রচুর ॥
পানা পেতে মানা কোথা প্রভুর বচন ।
পানাহীন পড়া শুধু একথা কেমন ॥
ভ্রমেতে মানির পরে দৃষ্টি করে নাই ।
মৌখিক পাঁচালি শুধু কি হবে ভালাই ॥
তবে কি করিল সাঁই কোরানেতে ভুল ।
নামাজে কাহেলী যত তাই ফাওয়াইলুল ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

فويل للمصلين الذين هم عن صلواتهم ساهون -

(ফাওয়াইলুল্ লিল্ মুসাল্ লিনাললাজিনা হুম
আন্ সালাতিহিম সাহুন)

নামাজেতে মন সিদ্ধ হইবে না যার ।
তাহার কারণে করে দোজখ প্রচার ॥
করার না হলে মন হবে না নামাজ ।
দেখহ নামাজিগণ কোরানের মাঝ ॥

سورت نساء

(সূরাতু-নিসা)

فاذا قضيتم الصلوة فاذكرو الله قيما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اتما
نلتم فاقيموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا -

(ফয়েজা কাজায় তুমুস ছালাতা ফাজকুরুল্লাহা কিয়ামান ওয়াকু'উ দান' ওয়া আলা জুনু বিকুম ফাইজা
ইত্মানান্তুম ফা'আকিমুছ ছালাতা ইন্নাস্ ছালাত কানাৎ আলাল্ মো'মিনিনা কিতাবাম্ মাওকুত ॥)

প্রকাশ্য নামাজ যবে করিবে আদায় ।
খাড়া বসে শুয়ে কর জেকের খোদায় ॥
এহা তক কর সবে জেকের খোদার ।
শান্তশীল হ'য়ে যাবে মন একাকার ।
এখন কায়েম কর নামাজ সকলে ।
ওক্ত মকরর এই বিহান বিকালে ॥
পাঞ্জেগানা কহে এই নামাজের তরে ।
এরূপ নামাজ পড়া হুকুম সবারে ॥
এছাই খোদার বাক্য আকিমুচ্ছালাত ।
বার বার কোরানেতে কহে এই বাত ॥

মাদ্রাসা পাশ করে কেহ নবী হন নাই

করে না মাদ্রাসা পাশ কোন নবীগণ ।
এলেমেতে নবী নাহি হল কোন জন ॥
বিদ্যা শিখে নবী-অলী নিশ্চয় হইলে ।
কোরানেতে প্রভু তবে কেন ইহা বলে ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

هوالذى بعث فى الاميين رسولامنهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم -

(হুয়াললাজি বায়াসা ফিল উম্মিয়িনা রাসুলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়াইউ জাক্কিহিম)

উম্মিদেরে পাঠাইনু উম্মি নবীবর ।
উম্মি পরে উম্মি ভেজা আশ্চর্য খবর ॥
শুনান কোরান নবী উম্মিদের তরে ।
হুজুরী শিখাত তিনি পাক হইবারে ॥
ছাফাই করিতে হয় হুজুরি দরকার ।
তেইসে ছিনার বিদ্যা নবী সবাকার ॥
নহেত নবীর বয়েস চল্লিশ সাল ছিল ।
কারো উছিলাতে খোদা এলেম না দিল ॥
জাহেরী বিদ্যায় নবী আছিলেন আম ।
বাতেনী এলেম সিদ্ধ ছিল মনস্কাম ॥
চল্লিশ বৎসর কালে হযরত জিব্রাইল ।
সুরে একরা সহ তিনি হ'লেন নাজিল ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق -

(ইক্রা বিস্মি রাব্বিকাল্ লাজি খালাক্ খালাকাল্ ইন্সানা মিন্ আলাক্)

এ আয়াত নবীবরে দিলেন যখন ।
বলে নবী পড়া আমি না জানি কখন ॥
বিবেচনা কর এবে ওহে বন্ধুজনা ।
জাহেরী এলেম হতে চান তিনি পানা ॥

حديث - درشرعت الاسلام

(হাদিস-দরশারাআ তিল ইসলাম)

وقد كان رسول الله صلعم يتعوذ بالله من العلم لا ينفع ويقول لعلم علمان علم القلب فذلكعلم النافع وعلم اللسان فذالك حجة الله على ابن ادم -

(ওয়াকাদ্ কানা রাসূলআল্লাহ্ (সঃ) ইয়াতাআউয়াজু বিল্লাহি মিনাল্ ইল্মে লা ইয়ান্ ফা'উ ওয়াইয়া কুলুল্ উলমু ইল্মনি, ইল্মুল কাল্বি ফাযালিকা ইলমুল নাফ্ই ওয়া ইল্মুল লিসানি ফাজালিকা হুজ্জাতুল্লাহি আলা ইবনে আদামা ।)

মছনবি ওজনে ছোট পদ

জবানি এলেম নাম হল যার ।
তাহা হতে পানা মাঙ্গে পয়গাম্বর ॥
খোদার দলিল বনি আদম পর ।
তাতে ধরা যাবে আদম নর ॥
হুজুরি এলেম নাফা তাহা চাই ।
মুনাফার বিদ্যা মোরে মিলা সাঁই ॥

در احياء - حديث

(দরএহিয়া হাদিস)

روى الحسن عن رسول الله صلعم انه قال العلم علمان فال علم الباطن فى القلب فذ الك هوالنافع –

(রাবিউল হাসান আন্ রাসূলআল্লাহ (সঃ) আন্নাহু কালা আল্ইলমু ইল্মানি ফাল্ ইল্মু আল্ বাতিনু ফিল্ কুল্বি ফাযালিকা হুয়ান্নাফিয়ি ॥)

হাছেন রেওয়া নবী হ'তে করিল ।
দুবিদ্যার বাতেন বিদ্যা সে ভাল ॥
এলমে নাফা কলবেতে জাগা তার ।
শব্দ অর্থ সাথে সাথে লাগা যার ॥
কোরান কলবে আছে সে এলেম ।
নিজ ছিনা পড়া লিতে মোয়াল্লেম ॥
মোয়াল্লেম মোর্শেদ বটে ছিনা তার ।
ছিনা হতে ছিনা শিষ্য পরিস্কার ॥
দশ ঘর আঠার বাতী ছিনা স্থল ।
কুটি ঘরে শও নগরে চিনাকল ॥
এক দীপে শত দীপ আলো পায় ।
এক দানায় শত দানা গাছ তায় ॥
গুরু বাতি শিষ্য দীপে লাগিল ।
ছত্রিশ কোটি নিবা বাতি জ্বলিল ॥

লাগিছে লাগিছে আগুন লাগিছে ।
অন্ধ ঘর তাজাল্লিতে ভরিছে ॥
কত রূপ তাজাল্লির আলোতে ।
রূপ রঙ্গ নানা ঢঙ্গ হেরিতে ॥
আগুন্দানে আগুনের গরম ভাপ ।
শীতে রক্ষা পাবে তার কিছু তাপ ॥
বেহুস দারু সোঙ্গাইতে বেহুসির ।
দারূ হেন মনে জান ছিনা পীর ॥
মাতা স্তনে দুগ্ধ টুপ টুপ রয়েছে ।
খেয়েছে অনেক মজা পেয়েছে ॥
ছেলে কাল হতে ভাল স্বাদ পায় ।
প্রিয় স্তন হতে যেবা দুধ খায় ॥
আহা কি সুন্দর বাণী মিঠাময় ।
শুনে মন রশিকের রসোদয় ॥
তবে যে জাহেরী বিদ্যা পড়া চাই ।
জাহেরে বাতেনে আছে মিলা সাঁই ॥

আল্লাহ লফ্জের অর্থ

ازفصوص

(আজফছুছ)

আরবী জবানে আল্লাহ্, ইব্রাণী জবানে বাদ্দুহে, ফারসি জবানে খোদা, ফছুছে দেখুন; এবং ইংরাজী জবানে গড্,
বাংলাতে ঈশ্বর অথবা প্রভু প্রভৃতি ॥

بمعنى صاحب حيبت وماله

(বামানি সাহেব হায়বাত ওয়ামালাহু)

আল্লামানী হায়বত কর্তা ও বেহুঁশ

নামেতে বেহুঁশি যার, যাতে কি বেহুঁশি তার আছে না ।
সুধা মন প্রিয় সন, মোহন রূপে ভুলায় মন বাঁচে না ॥
এস্ক ভরা মেস্ক গাও, শরাবের জাম পেলাও ছাকিয়া ।
ছাকি গুরু কল্প তরু দেওগো শিশি মদ ভরো বাকিয়া ॥
শিশি রূপ কলব রূপে, মদ পূর্ণ প্রিয় রূপে ভুলাদে ।
কলব খানি আর্শ জানি, প্রভু বারাম তথা ধ্বনি মিলাদে ॥

কাননে পাইবে না কিন্তু ভজনে পাইবে

কাননে পাবে না যারে পাইবে ভজনে ।
জাগনে পাবে না যারে পাইবে স্বপনে ॥
জাগন যাহার হেন হইবে স্বপন ।
ভজন ব্যতীত মন জানিবে কানন ॥
জীবনে পাবে না যারে পাইবে মরণে ।
রচনায় পাবে না যারে পাইবে স্মরণে ॥
জীবন যাহার হেন হইবে মরণ ।
রচনা সকল ভুল না রলে স্মরণ ॥
স্মরণে পাবে না যারে ভুলে পাবে তায় ।
বাচনী পাবে না যারে পাইবে বোবায় ॥
স্মরণ রহিতে যেই হবে বিস্মরণ ।
পাইবে রহিত মুখ হলে অবচন ॥
আন্ধারে পাবে না যারে পাইবে পশরে ।
মন্দিরে পাবে না তায় পাইবে গর্ত্তরে ॥
চক্ষু না মুদিলে কোথা হবে অন্ধকার ।
গর্ত্তর ব্যতিত কোথা দেখিবে আনওয়ার ॥
আরসে পাবে না যারে পাইবে ফরাসে ।
কোরানে না পাবে যারে পাইবে বাতাসে ॥
ফরাস অজুদ যার আরস আকার ।
বাতাস কোরান দম ঘর জান তার ॥
বেহেস্তে পাবে না যারে পাইবে দোজখে ।
দুঃখেতে পাবে না যারে পাবে তারে সুখে ॥
এস্ক আগুন যার নরক আকার ।
নরকে গরক সদা তবু সুখ তার ॥

حديث شريف

(হাদীস শরীফ)

الدنيا سجن المؤمنين -

(আদ দুনিয়া সিজ্জিনুল মো'মিনিন ।)

দুনিয়া মমিন জান পিরীত আগুন ।
আগুন দ্বিগুণ আর কষ্ট গুনাগুণ ॥
কঠোর হাটর তার নহে সে আরাম ।
কোথায় কঠোর তার আগুন হারাম ॥

প্রভুতে না প্রভু পাবে পাবে পীর সনে ।
পীরেতে পাইবে কোথা পাবে নিজ তনে ॥
কোথায় নিজের তন এক তন তাঁর ।
এক বিনা জগতেতে কোথা তন আর ॥
তন মাঝে মন আছে মন মধ্যে ধন ।
সে ধনের কুঞ্জি তালা জানিবে স্মরণ ॥
স্মরণেতে ভুল জন্ম ভুলে আছে মুল ।
সে মুলের স্থুলতত্ত্বে নাহি পাবে কুল ॥

পীর মুরিদ

যদ্যপি হউক জান শরীফ নিশ্চিত ।
পাক বলে জানে কহা নহে হরষিত ॥
হাকিকতে আহাম্মদ আলি যে মোকাম ।
সাধিতে পারিলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম ॥
যে কাজের আরম্ভেতে ফতে নাম হবে ।
ফতে বই কোথা হবে পরকাল ভবে ॥
বিছমিল্লার শির পুঁঞ্জি এই ফতে নাম ।
ফতে বিনা ফতে নাহি হবে মনস্কাম ॥
আজলেতে সাহা নাম আছিল স্থাপন ।
পৃথিবীতে ছুফি নাম হইল কীর্ত্তন ॥
আজলে আশেক ব্যাখ্যা ছিল সুবিকাশ ।
ভুবনে মাশুক ব্যাখ্যা পাইল প্রকাশ ॥
আজলে মহেব নাম নিজ সিংহাসনে ।
মহীতে মহ্‌বুব বলে রঞ্জিত বচনে ॥
আজলে আরেফ ব্যাখ্যা ছিল প্রকাশিত ।
ভবেতে মারূফ পদে ভুবন রঞ্জিত ॥
আদি মূলে ছিল যথা রূহের বাসর ।
সে বাসরে নিজে ছিল খোদ পয়গাম্বর ॥
টাকা সঙ্গে আনা যুক্ত আছিল যথায় ।
মধু মদ্যে মিষ্ট ভাব যাইবে কোথায় ॥
বাজারেতে আছে শত মধুর পশারী ।
পশারীতে নহে মিষ্ট মধু সারি সারি ॥
যে বলে এমন খালি মুখের পাঁচালি ।
নহে কোথা মিষ্ট বিনা গুড় হয় খালি ॥

مولانا روم
(মাওলানা রোম)

چونکه ذات پیررا کردي قبول -
هم خدا درذات امد هم رسول -
درمدان ودرمبین ودر مخوان -
خواجه رادر خواجه خود محودان -
کر جدا بینی زحق این خواخثرا -
گم کنی هم منن وهم دبها جه را -
اولیا وانبیا راحق بدان -
سومخفی باتو کر دم من عیان -
دربشر رویر ش امد افتاب -
فهم کن والله اعلم بالصواب

(চুকে জাতে পীরেরা কারদি কবুল ।
হাম খোদাদার জাতে আমাদ্ হাম্ রছুল ॥
দোর মাদান ও দোর মোবিন ও দোর মাখোয়ান ।
খাঁওয়জারা দর খাঁওজা খোদ মোহ্দান ॥
করে জুদাবিনি জাহক্ক এঁখাওয়াজারা ।
গাম্ কুনি হাম্ মানান্ অহাম দিবাজারা ॥
আওলিয়া ও আম্বিয়ারা হক্ক বোঁদান ।
ছের্‌রে মুখ্‌ফি বাতো কারদাম মান্‌ইয়া ॥
দার বাসারো রোয়েরাস আম্‌দ আফ্‌তাব্ ।
ফাহাম্ কুন ওয়াল্লাহু আলাম বেস্‌ছোয়াব ॥)

যখন কবুল তুমি কৈলে পীর ধন ।
তাহাতে প্রভুর জাত আর নবী তন ॥
খাজাতেই রাজা আছে মহা সমুদয় ।
দেখ শুন পড় তারে জুদা হেন নয় ॥
নবী অলী হক্ব নামে হক্ব জান তায় ।
ভেদ বাক্য প্রকাশিয়া কহিনু তোমায় ॥
মানুষের রূপান্তরে আসিল আফতাব ।
বোঝাহ খোদার বুঝ অনেক ছাওয়াব ॥
কোতব এর্শাদ ছিল মুল পদ যার ।
ভবেতে মোর্শেদ নাম হইল প্রচার ॥
জবরুত বাগানে সাহা আছিলেন অলী ।
ভবেতে উদয় ভানু সাহে ফতে আলী ॥
উদয় হইতে ভানু তারকা সকল ।

আমল আসিতে তারা করে টল টল ॥
উদয় হইতে রাত হইল বিদায় ।
আন্ধারে নিদ্রিত ছিল জাগিল সবায় ॥
কিন্তু যে আজলি মরা রহিল স্বপনে ।
উদয় হয়েছে ভানু কেমনে সে জানে ॥
উদয় হইয়ে দিন করিয়া রৌশন ।
আসিল সামের কাল হইল গোপন ॥
গোপন হইয়া যদি গেল সেই ধনী ।
পাইয়া মণির খনি রহে যেয়ে মণি ॥
কিন্তু সে মানিকে বটে চটক অপার ।
ছেদিয়া চটক হল খনির বাহার ॥
কিন্তু সে চটক নহে এলাহির নূর ।
মাণিকতলা দেল্লিবাগ হইল জহুর ॥
কলিকাতা মণিকতলা দেলওয়ার বাগ ।
মাজার গোলজার যিনি রৌশন চেরাগ ॥
আকাশ পর্যন্ত নূর উঠে দীপ্তিমান ।
অকাতরে দেখে লোক তাজ্জবে হয়রান ॥
মশাল চৌগুণ নূর হেন পরিষ্কার ।
কেহ না দেখিয়া হবে জগত মাঝার ॥
চন্দ্ররূপ হতে অতি দেখিতে সুস্থির ।
বাতিরূপ নহে সেই আগুন শরীর ॥
পরলোক হল যবে পৃথিবী ছাড়িয়া ।
কবরে এহেন নূর উঠে চমকিয়া ॥
কতবার হেন রূপ হইল প্রকাশ ।
দেখিল অনেক যারা ছিল আশ পাশ ॥
এখন পস্তায় লোক হায় কি করিনু ।
থাকিতে জীবনে মোরা হায় না চিনিনু ॥
হেলায় পরশ মনি হাত হতে যায় ।
হায়রে নছিব মোর মরিলে পস্তায় ॥
লোকান্তরে অকাতরে এই কেরামত ।
জীবনেতে কেরামত ছিল শত শত ॥
জ্বীন ও মানুষ্য শিষ্য ছিল অগণন ।
দেখিতো শতেক লোক ভাবুক যেজন ॥
এত্তেহাদি তাওয়াজ্জুতে করেন তালিম ।
এক তাওয়াজ্জুতে ফল যুগের আজিম ॥

দৃষ্টিপাতে ঝরে পাপ অজুদ বিমল ।
কলব দর্পন রূপ জ্যোতি ঝলমল ॥
এক নজরেতে ছিল যুগের হাছেল ।
পরলোক হয়ে লোকে করিল কামেল ॥
এখনও ভাবুক যদি জেয়ারতে যায় ।
অপূর্ব্ব মাণিক পায় মাণিক তলায় ॥
পেয়ারের গাছ পাশে মেন্দীর তলায় ।
পেয়ারে মেন্দীর রঙ্গ ভাবুকে লাগায় ॥
এমন মেন্দীর রঙ্গ পাতার তাছির ।
লাগাইবা মাত্র লাগে যেমন আবির ॥
কুসুমের রঙ্গ তার নহে সমতুল ।
গন্ধরাজ বিমোহিত সুগন্ধে আকুল ॥
এইসব মেন্দী পাতা হয়ে হরষিত ।
সুরেশ্বরে নানাবিধ গাইতেছে গীত ॥
সে গীতে উদাস হয় ভাবুকের মন ।
সে ভাবে সতত হয় ভাবের কীর্ত্তন ॥
ভাবুকের সেই মেন্দী লাগাইবা কালে ।
পড়েছিল এক বিন্দু লাগানু কপালে ॥
কপালে লাগাতে মেন্দী মাথা ধরে তায় ।
সে দরদে কাঁদি আমি করে হায় হায় ॥
সকল ভাবুক চাহে সে মেন্দী লাগাই ।
আমি বলি বাঁচি নহে কেমনে ছাড়াই ॥
ছাড়াইতে চাহি বটে লেগে বসে দাগ ।
আচম্বিতে সে দরদে ফুটিল দেমাগ ॥
দেমাগ হইল খালি রহে মাত্র খোল ।
সেই খোলে রোদনেতে বাজাই তবল ॥
শুনিয়া তবল মম কেহ পেরেশান ।
রোদন দেখিয়া কত হাসিয়া হয়রান ॥
আমিও হাসিনু কত কান্দনে আমার ।
আমার কান্দনে লোক কান্দে জারে জার ॥
কতেক হাসিনু আমি করে খলখল ।
সে হাসনে কাঁদি শুধু চক্ষে বহে জল ॥
সে জলে আগুন জ্বলে ধাঁ ধাঁ ঘোরতর ।
সে অনলে জ্বলে যায় সাগর লহর ॥
জ্বলিল সকল জল আর কিছু নাই

কেবল রহিনু আমি একেলা কানাই ॥
তখন ভাবিনু আমি আমি একজন ।
আমি নাহি আমিতে যে, সে আমি কেমন ॥
একা আমি ছিনু আমি হৈনু দুইজন ।
দুই আমি একাযুক্তে হনু তিন তন ॥
চতুর্থ আমির মধ্যে যখন আমি যাই ।
সব আমি খ্যান্ত দিয়া হইনু কানাই ॥

মোর্শেদ অমর

একদা বিরলে বসি দুঃখানল মন ।
গুরু শোকে সে বাগানে করেছি রোদন ॥
ঝরিছে চক্ষের জল করে ঝর ঝর ।
হেন কালে দেখি হেথা এসে এক নর ॥
করুণা বচনে কত করেছে আলাপ ।
বিনয় কথনে শত করিছে বিলাপ ॥
হে রাজন মহাজন মম পানে চাও ।
দয়া করে অধমেরে ভূবন ত্বরাও ॥
দয়াকর দয়াকর দয়াকর যদি ।
দয়াগুণে পার তবে হব ভব নদী ॥
এতই সকালে তুমি ছাড়িবে সংসার ।
এ কথার লেশ মনে না ছিল আমার ॥
মস্তক উপরে কভু হাত মারে জোরে ।
মাটিতে রাখিয়া শির চারি পাশে ঘোরে ॥
অনেক বেতাবে শেষে দাঁড়ায়ে উঠিয়া ।
হেন কালে কেহ যেন আমায় ডাকিয়া ॥
কহিলেন শুন সখা কর না রোদন ।
আদেখা আশেক পানে করহ গমন ॥
বল তারে রুজু হয়ে বসে মম পানে ।
পিলাব সরাব জাম তাহাকে এখনে ॥
একথা শুনিয়া যাই নিকটে তাহার ।
কহি সাবধানে হও রুজু একবার ॥
শুনিয়া পরম কথা হরষিত মনে ।
আদবে বসিল গিয়া কবর সামনে ॥
অতীত মিনিট দশ হয়েছিল তার ।

জজবাতে এসে সেই হল বেকারার ॥
খুলিল ঝাপটে তার কলবের দ্বার ।
যথায় আগুন ধুয়া নিশান তাহার ॥
বেহুঁসী নিশান শুধু সরাবের হয় ।
সাগরে নিশান ঢেউ পবনে নিশ্চয় ॥
অতীত কিয়ত কাল জোশ নিবারণ ।
আশীর্বাদ দিল কত আমার কারণ ॥
মানসিক রস পরে করিল প্রচার ।
শুনিয়া হইল মম সুখের সঞ্চার ॥
দেখিনু বিশেষ জন এই মহীতলে ।
পীরহীন পীর পায় মম কৃপা বলে ॥
পীর বিনা হল যেই বিশাল কাতর ।
কৃপা বলে পীর ভাই হইলে অমর ॥
জীবন থাকিতে ভাই হইবে আমার ।
সত্যমিথ্যা এবে এসে দেখ একবার ॥
যে কেহ অমর গুরু চাহে সাধিবারে ।
আহাম্মদি ভাব বিনা পাইবে না তারে ॥
এমন অমর গুরু হয় কদাচন ।
মরিয়া দেখায় পথ সে নর কেমন ॥
আসেক বিহনে কোথা হইবে অমর ।
না হইবে আসেকে কভু কবর হাসর ॥

ديوان حضرت خواجه معين الدين پشتئ رح

(দিওয়ানে হযরত খোয়াজা মাইনুদ্দিন চিস্‌তী (রাঃ)

حساب عمر صد عاقل بمحشر بگذر د يكدم

حساب يكدم عاشق بصد محشر نميگنجد -

(হিসাবে উমর শোয়াদ আকেল বা মাহ্‌সার বাগুজারদ ইয়ক্ দম্ ।
হিসাবে ইয়াকদম্ আসেক বাসোয়াদ মোহাসর নমি গন্‌জদ্ ॥)

হাসরেতে নিকাসের আমল কিতাব ।
এক দমে হবে শত আবেদ হিসাব ॥
আসেকের এক দম, হিসাব যাহাই ।
শত হাসরেতে তাহা হবে না সামাই ॥
এস্কের আগুন যার বুকের ভিতর ।
দোজখের অনল তথা নহে কার্যকর ॥

প্রভুধন যার মনে করিবে আসন ।
শ্মশান ভসান দাহ সব নিবারণ ॥
পীরের কদমে কোথা লাগিবে অনল ।
হয় হউক মধু তুল্য বন্ধুর গরল ॥
দেওয়ান ওয়েছি পীর করিল তছনিফ ।
আসেকের ভাব আর দেখহে তারিফ ॥
হাসিয়া করিল পীর দেওয়ান্ হাফেজের ।
তাহাতে বুঝিবে ভাব কিবা আসেকের ॥
যে হবে আসেক জন ভাব বোঝে তার ।
আসেক না হবে যেই করিবে ইঙ্কার ॥
শতে শতে পাইয়াছে হেন প্রাণ দান ।
তুমিও অমর হবে পাইলে সন্ধান ॥

আল্লাহ পাকের উক্তি

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

واذ كرربك اذانسيت -

(ওয়াজকুর রাব্বাকা ইজা নাসিতা ।)

ভুলিলে স্মরণ তারে চাহি অনুক্ষণ ।
প্রত্যেক দমেতে কর প্রভুর স্মরণ ॥
যাহার কলব হয় ভুলেতে পতিত ।
স্মরণ কারণে তারে করেন তুরিত ॥
ভুলে মূল পেলে ভোল ভুল সর্ব্বদায় ।
মূলে ভুল হলে ভুল না ভোল বৃথায় ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

ولا تطع من اغفلنا قلبه من ذكرنا -

(ওয়ালা তুতেমান আগ্‌ফাল্‌না কাল্‌বোহো মিন্‌জেক্‌রে না ।)

নাহি শুন তার কথা হও খবরদার
প্রভুর স্মরণে মন গাফেল যাহার ॥
প্রভুর স্মরণে মন যাহার গাফেল ।
শুনিলে তাহার কথা হইবে মস্কেল ॥

প্রত্যেক দমেতে হয় স্মরণ যাহার ।
পীর বই সেই ভেদ কোথা পাবে আর ॥
পীর বিনা গাফলত কোথা যাবে দূর ।
ওয়াব্‌তাগু তবে কেনে কহিল গাফুর ॥
গাফলত ছুটিলে শেষে হইবে তছকিন ।
ভ্রম যাইবে দূর ফিরিবে কুদিন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

هوالدى انزل السكينة فى قلوب المؤمين ليزدادوا ايمانا امع ايمانهم

(হুয়াল লাজি আনজালাস সাকিনাতা ফি কুলুবুল মো'মিনিনা লিইয়াজ্‌দাদু ইমানাম্‌ মা'ইমানুহুম)

খোদা পাক মমিনের অন্তর মাঝার ।
উতারে তছকিন শুধু ভরসাই সার ॥
ঈমানের সাথে বেশী হইবে ঈমান ।
সন্তান যুবক যেন ছিল সে সন্তান ॥
এহাতে জেকের মর্ম্ম বুঝে লহ সার ।
বেগর জেকেরে মন হবে না করার ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

الابذكر الله تطمئن القلوب

(আলা বেজেক্‌রেল্লাহে তাত্‌মাইনাল কুলুব ।)

হুসিয়ার হয়ে শুন কোরান কথন ।
জেকেরেতে শান্তশীল হবে কিনা মন ॥
মন যদি পরিষ্কার হইবে তোমার ।
একমাত্র ভরসাই মানসিক সার ॥
মানস যাহার হবে প্রভু আজ্ঞা চয় ।
আবেদ মাবুদ ভাবে ভাবকু নিশ্চয় ॥
কিন্তু যে জেকের আছে জান দুই প্রকার ।
একিনীতে সার পদ এতবারি উসার ॥
যেমন নামাজ শুধু জেকের এতবারি ।
পাইবে এতবারি ফল কহি ব্যাখ্যা করি ॥
বহুতর আছে যেন নামাজ নফল ।
এক এক রেকাত তার কত হজ্ব ফল ॥

তবে কি হইল হজ্ব মক্কা না যাইয়া ।
হজ্ব রেখে পড় তবে নামাজ বসিয়া ॥
একিনী হবে না হজ্ব এতবারি হবে ।
একিনী হইলে হজ্ব মক্কা কেবা যাবে ॥
এমন জেকের যত এতবারি হয় ॥
অতএব দেল তার করার না রয় ॥
একিনী জেকের যেন আপ্তারে ধূপ ।
তাতে প্রভু কহিয়াছে মোৎমাইন্যাল কুলুব ॥
মোৎমাইন হবে ভাই কলব যাহার ।
দুজাহান হইতে চক্ষু উঠে যাবে তার ॥
তাতেই কহিল সাঁই সার্থক বচন ।
খুলিয়া দিয়াছি আর দেখিছ রৌশন ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

لقد كنت فى غفلة من هذا

فكشفنا عنك غطا ئك فبصرك اليوم حديد

(লাক্‌াদ কুন্‌তা ফি গাফ্‌লাতিন মিন্‌হাজা ফাকা সাফ্‌না
আন্‌কা গিতা আকা ফাবাস্‌সোরুকাল্‌ ইওমা হাদিদ্‌)

শুধু গাফলাতে পড়ে আছিলা ভরমে ।
খুলিছে তোমার চক্ষু আমার করমে ॥
অতএব দৃষ্টি তব তেজ অতিশয় ।
মোকাসেফা তেজ এই আর কিছু নয় ॥
খোদার জেকেরে মন করে জাগরণ ।
ফাড়িয়া বাতেনী পর্দ্দা দেখিছে রৌশন ॥
সেই যে রৌশণ বাতি মনপুরে জ্বলে ।
বুঝিবে না অন্ধগণ আহাম্মদি বলে ॥
একিন অন্ধল ভবে হবে যেই নর ।
সহস্র এলেম পতি পাবে না পসর ॥
এরূপ ভাবুকে সখা হয়ে নিরাঞ্জন ।
আদরে ডাকিছে ডাক শুনহ বচন ॥

قوله تعالى

কাওলাহু তা'আলা

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজিনা আমানু ইখ্‌রিজুহুম

মিনাজ্ জুলুমাতে ইল্লান্ নূর ॥)

খোদাই বান্ধব বটে মমিন সকল ।
নিকালিছে নূর পানে করিয়া বিমল ॥
ঈমান তকলিদী বটে অন্ধকার ঠাঁই ।
হবে না মোর্শেদ বিনে ঈমান রোশনাই ॥

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব রাহমে হুমুল্ল্যা আপন মকতুবাতে লিখিয়াছেন-

ای دریغا کین شرعیت ملت اعامئی ست -
ملت ما ملت کافروهم ترسائی ست -
کفروا یمان زلف روی اپری زنبائی ست -
کفروایمان هر دواندر راه مایکتائی ست -

(এদারিগাঁ কি শারিয়াত মিল্লৎ আমা ইস্ত ।
মিল্লাত মা মিল্লাত কাফেরো হাম্ তারসা ইস্ত ॥
কুফরো ইমান জুলফ্ রুয়্যি আপরে জেবা ইস্ত ।
কুফরো ঈমান হরদু আন্দর রাহ্ মাইয়াকতা ইস্ত ॥)

অন্ধ মাজহাব এই শরিয়াত হয় ।
তরছাই মুজহাব মম কাফেরী নিশ্চয় ॥
কাফেরী আন্ধার বটে ঈমান রৌশন ।
কাল কেশ আলো মুখ পরীর যেমন ॥
ঈমান কুফরী মোর দোন সমতুল ।
দুই রাস্তা কোথা হবে যাতে এক মুল ॥
অনেক পীরিতি এবে করহ খোদার ।
তবেই পাইবে ভেদ এহেন কথার ॥

قوله تعالى

কাওলাহু তা'আলা

والذين امنوا اشد حبا الله -

(ওয়াল্লাজিনা আমানু আসাদ্দু হুব্বাল্ লিল্লাহ ॥)

ওরে, রে, মমিনগণ কি ভেবেছ মনে ।
বেহদ করহ প্রেম আল্লা পাক সনে ॥
বেহদ কহিল আল্লাহ হদ নাহি তার ।
মহব্বতে যাবে খোলা মনের দুয়ার ॥
দুয়ার খুলিলে আর দেখা নাহি দায় ।
আমরে রব নিজ রূপ দেখিবে তথায় ॥

قوله تعالى

কাওলাহু তা'আলা

قال الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الاقليلا

কালাররুহু মিন্ আম্‌রি রাব্বি ।

(ওয়ামা উতিতুম্ মিনাল্ ইল্‌মে ইল্লা কালিলা ॥)

কহ নবী রুহু বটে হুকুম রব্বানী ।
কিঞ্চিৎ এমন লোক পেয়েছে রুহানি ॥
না দিছি এলেম কথা নহে কদাচন ।
কিঞ্চিৎ দিয়াছি রুহু চিনিবার কারণ ॥
তাহা যদি নাহি হবে কেমন করিয়া ।
রুহুগণ আদমের শরীরে থাকিয়া ॥
নিকালিছে রুহু সব বনি আদমের ।
করিছে ফিরিস্তাগণ রুহের জেকের ॥
এই যে বিমল রুহু অতি পরিষ্কার ।
নবী অলী হবে এ'রা ভবের মাঝার ॥
ঐ যে কুরঙ্গ রুহু কালা সমুদয় ।
ভুবনে পাতকি এরা হইবে নিশ্চয় ॥
ফলে যদি রুহুগণ না আসে গঠনে ।
ধলা কালা দূতগণ দেখিল কেমনে ॥
তবে যে হুকুম বলে কহে নিরাঞ্জন ।
এহুদি উত্তরে এই খোস ছিল মন ॥
এর বেশি এহুদির এলেম না ছিল ।
অতএব প্রভু বাক্যে সন্তোষ হইল ।
নহে কি এমন কথা হইবে কখন ।
রুহের শরীর নাই নাহিক গঠন ॥
নিজ হতে বেখবর হল যেই জন ।

কেমনে চিনিবে সেই প্রভু নিরাঞ্জন ॥
হে মানব যে না জানে নিজ পরিচয় ।
কেমনে চিনিবে সেই অন্যের হৃদয় ॥
কাফের হইল কেবা কে হবে মমিন ।
অন্যেরে চিনিবে রুহু নিজে চিন হীন ॥
দেখ যত ফকিরান ছায়ের সোগলে ।
মোকাসেফা হয় যবে আলম মেছালে ।
তখন দেখিতে পায় রুহু কোন নর ।
অন্ধজন কি জানিবে প্রদীপ খবর ।
ফানা ফিস্বেখে এবে নজর করিয়া ।
দেখ তায় রুহু মর্ম্ম গিয়াছে লিখিয়া ॥
নিজ রুহু যেই জন পাবে পরিচয় ।
প্রাণের প্রাণ তবে দেখিবে নিশ্চয় ॥
প্রাণের প্রাণ সেই অসীম আকার ।
অসীমের সীমা নাই সীমা ঘর তার ॥

حديث قدسى

(হাদীসে কুদ্‌সী)

لايسعنى ارضى ولا سمائى
ولكن يسعنى قلب عبد المؤمنين

(লা ইয়াস্ আনি আরদু ওয়ালা সামায়্যি ওয়ালা
কিন্‌না ইয়াস্ আনি কুলুব আব্‌দুল মোমেনিন)

قوله تعالى

(মাওলানা রুম)

گفت پيغمبر كه حق فرمو ده است
من نهمى گنجم دو ان بالا وپست
در زمين وآسمان وعرش نيست
عن نه گنجم تو يقين دار اى عزيز
دردل مؤ من بگنجم اى عجب
گو تومى جونى در ان د لها طلب.

(গুফ্‌তা পয়গাম্বারকে হক্ব ফরমুদাস্ত ।

মান্‌নামি গুন্‌জাম দারানে বেলা ওপস্ত ।
দর জমিনো আসমান ও আর্‌স নিস্ত ।
মান্‌না গুন্‌জাম তু ইয়াকিনে দারাই আজিজ ॥
দর্‌দিলে মো'মিন বা গাঞ্জম আয় আজিব্
গোতুমি জোয়্যি দার্‌য়া দিলহা তালেব ॥)

আকাশ পাতালে মম হয় না সামাই ।
মমিনের দেল ঘর জান মোর ঠাঁই ॥
মমিনের দেলে থাকি একথা মস্কিল ।
তুমি যদি চাহ মোরে ঢোড় সেই দেল ॥
মনুষ্যের ভেদ মর্ম প্রভু নিরাঞ্জন ।
মানব খোদার ভেদ হাদিস কথন ॥
অতএব কহে প্রভু চিকন রচনা ।
দেখহে মানস তার মানব ঘোষণা ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

فاذكرونى اذكركم

(ফাজকুরুনি আজকুরুকুম)

আমার জেকের এবে করহ সকল ।
আমিও জেকের তব করিব কেবল ॥
আরেফ জেকের যদি করিবে আল্লার ॥
নিরাঞ্জন মোরাকেবা করিবে বান্দার ॥
আসেকের লতিফাতে মাবুদ স্মরণ ।
মাবুদের দেহ তত্ত্ব বান্দা দরশন ॥
আসেকের আখি ঝরে বিনয় কথন ।
মাবুদ রোদন করে করুণা বচন ॥
তাঁহা দুঃখে ফেটে যায় প্রেমিকের বুক ।
মাবুদ মালেক তাতে পাইতেছে দুঃখ ॥
প্রেমিক বিরলে বসে ডাকে যদি তায় ।
নিঘোরে মালেক মোর করে হায় হায় ॥
প্রভু যবে উচাটন দহিয়া শরীর ।
তখন প্রেমিক ভাবে হইবে অস্থির ॥
তার ভাব না হইলে কোথা ভাব আর ॥
ভাবুক বিধুর ভাবে ভাব গতি তার ॥
পৃথিবীতে নাহি কিছু তাহার সেওয়ায় ।

কোথা হইতে আসে ভাব কহ দেখি তায় ॥
আবেদ ফানা মাবুদেতে মাবুদ একজন ।
মাবুদে না হবে ভাব একথা কেমন ॥
ভাবহীন নরগণ তারা হেন নর ।
মাটির মুরতে যেন কহা যায় নর ॥
তাতেই রছুল বাণী করিছে প্রচার ।
দো-বাশুন এলেম এক বলিব না আর ॥

মেস্কাত শরীফে লেখা আছে

حديث شريف
(হাদিস শরীফ)

وعن ابى هريرة قال حفظت من رسول الله صلعم
وعائين فاما احد هما بثثته فيكم واما الاخر فلوفبثثته
(ওয়া আন্ আবি হোরায়রাতা কালা হাফেজাতে
মিন্ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ওয়াইন্ ফামা আহাদুহামা
বাসাস্তুহু ফিকুম ওয়ামাল আখিরু ফালও ফাবাসাস্তুহু ।)

কহে আবু হোরেরা রাখিনু স্মরণ ।
দো-বাশুন বিদ্যা বলে রাছুল কথন ॥
তাহা হইতে এক বিদ্যা সবে গেছে বলা ।
দ্বিতীয় কহিলে মোর কাটা যাবে গলা ॥
এইত সর্তক করে রাছুল সভায় ॥
বাতেনের বিদ্যাগুলি আছে না তোমায় ॥
তোমরা বাতেন যদি নিশ্চয় জানিতা ।
কখন আমার তরে গলা না কাটিতা ॥
এই সে ইসারা কথা আল্লা রাছুলের ।
ভাবহীন সে বিদ্যার কোথা পাবে টের ॥
মনছুরের ভাব কথা যারা না বুঝিল ।
পশু হেন সমতুল অলীকে মারিল ॥

مولانا روم
(মাওলানা রুম)

كاريا كافر اقياس ازخود ميگر -
گرچه باشد درنوشتن شير شير -

(কারেইয়া কাফেরা ক্যায়াস আস্ খুদ মিগার ।
গারচে বাসদ্ দারনু ইস্তান শেরো শির ॥)

মুনি হেন নিজ কাম না জান গভীর ।
সমান অক্ষরে যদি লেখে শের শির ॥
দূতে ভুতে কখন কি হইবে সমান ।
আবেদ আসেকে আছে অনেক দৌড়ান ॥
মুনি জন দমে দমে খোলে শত ভেদ ।
পশু তুল্য নরগণ করে সুধু জেদ ॥

بيخردى چند زخود بيخبر
عيب پسنديد زبرعم هنر
بادشد اندر چراغ مى رسند
دودشد اندر دماغ مى رسند
(বেখরদি চান্দেজা খোদ্ বেখবর ।
আয়েব পসন্দিদ যা বর্ আম্ হুনর ॥
বাদেসাদ আন্দার চেরাগ মিরাসিন্দ ।
দোদাসোদ আন্দার দেমাগ্ মিরাসিন্দ ॥)

কতেক নাদান নিজে রাখে না খবর ।
আয়েব গেয়ান করে দেখিয়া হুনর ॥
বাদ হয়ে চেরাগ গোল করিতে ইচ্ছুক ।
ধুয়া হয়ে দেমাগ নষ্ট করিবার উজ্জুক ॥
আছে না গেয়ার যার কোরানের ভাব ।
কোরানের নামে খালি করে পেচতাব ॥
দেখ শক্ত কহে প্রভু করিতে জেকের ।
তবে পোক্ত গুণ তার হইবে বাহের ॥
নরম খেলাপ যাহা সেই শক্ত নাম ।
তাহাতে তোমার হবে কেমনে বদনাম ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তা'আলা)

ولذكر الله اكبر
(ওয়ালা জিক্রুল লাহে আক্বার ।)

বড় করে কর, নহে বেশী কর যদি ।
কোরানেতে কহে ভাল না হইবে বদী ॥

পৃথিবীতে আছে যত সৃজন আল্লাহর ।
সবাকে হুকুম হইল ডাকিতে অপার ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তাআলা)

واذ كر الله زكراكثيرا -

(ওয়াজ কুরুল্ লাহা জেক্‌রান কাছিরা ।)

যত পার তত কর জেকের খোদাই ।
খোদাকে ডাকিলে তব কিছু দোষ নাই ।
নিজ নিজ ভাবে ডাকে নবী অলীগণ ।
দেখনা মাইনদ্দিন চিস্তি করিল কেমন ॥
দেখ বাবা শেখ ফরিদ মাথা নীচে ঝোলে ।
ছত্রিশ সাল পরে নাকি তবে খোদা মিলে ॥
ওয়ায়েজ করনি দেখ যাবত জীবন ।
পাগলের বেশে করে প্রভুর কীর্ত্তন ॥
এই মতে কত অলী কত নামদার ।
প্রভুর ডাকেতে জান করিল নেছার ॥
তুমিও খোদার ডাকে লাগাইবা মন ।
যত পার তত কর প্রভুর কীর্ত্তন ॥
হযরত দাউদ এত করিত জিকির ।
জবুর পড়িত কভু হইয়া অস্থির ॥
বেহুস হইয়া তিনি এতই কাঁদিত ।
শত জন সেই রোলে পরান ত্যাগিত ॥
কাঁদিয়া মাটিতে কত হইত পতন ।
আছাড় পাছাড় কেহ কেহ হুতাশন ॥
জল বিনা মীন যেন করে ধড় ফড় ।
অস্থিরে মস্তির ভাবে করে থর থর ॥

তালেবানের দশটি রেজালত পরিবর্তে দশটি লতাফত হাসেল হওয়া চাই

রেজালত এই–
(১) হারাম (২) মিথ্যা (৩) রেয়া (৪) হাছাদ (৫) কেনা (৬) আদাওয়াত (৭) সাহাওয়াত (৮) গীবত (৮) তকাব্বরী (১০) তহমত ।

ঐ দশটি বুরা হইতে তালেবান দূরে থাকিলে তার পরিবর্তে দশটি লতাফত হাছেল হইবে । যথা– (১) তৌবা (২) এনাবাত (৩) জোহদ (৪) রেয়াজাত (৫) অরা (৬) কেনায়াত (৭) তাওয়াক্কুল (৮) তাছলিম (৯) ছবর (১০) রেজা ।
নিম্নে তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া লেখা গেল ।
১ । তৌবা অর্থাৎ গুনা হইতে বাঁচিয়া থাকা ।
২ । এনাবাত অর্থাৎ আল্লাতায়ালার নিকট রুজু থাকা ।
৩ । জোহদ অর্থাৎ পৃথিবী হইতে বেরগবতি হইয়া থাকা ।
৪ । রেয়াজাত অর্থাৎ এবাদতে পরিশ্রম করা ।
৫ । অরা অর্থাৎ পরহেজ করণ ।
৬ । কেনায়াত অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট হওয়া ।
৭ । তাওয়াক্কুল অর্থাৎ আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করা ।
৮ । তছলিম অর্থাৎ আপনা কাম খোদাকে সঁপে দেওয়া ।
৯ । ছবর অর্থাৎ দুঃসময়ে আপনাকে থামিয়া রাখা ।
১০ । রেজা অর্থাৎ খোদার খুশিতে খুশি থাকা ।

জেকেরের কিঞ্চিৎ বিবরণ

প্রথমে জেকের কথা পরেতে ফিকির ।
ছুলুকের মোরাকেবা তার অন্তে স্থির ॥
অজুদেতে দশ জন আছয় ফকির ।
তাহারাই নিরবধি করেন জিকির ॥
লতিফা বলিয়া কেহু রাখে তার নাম ।
হরফ বলিয়া কেহু কহে পরিণাম ॥
অজুদ বলিয়া ঘর সে ঘর আপনা ।
আছয় কুঠরি দশ কেহু কহে থানা ॥
যে নিয়মে মোজাদ্দেদ সে ঘর সাজায় ।
কতিপয় প্রকাশিয়া কহিব এথায় ॥
সে হরফের নাম এবে শুন কহি তায় ।
কলব, রুহু, ছের, খফি, আখফা, নফস্ হয় ॥
আব, আতশ, খাক, বাদ্ এই দশ জন ।
নিজ স্থানে বসে করে প্রভুর কীর্ত্তন ॥
ডাহিন বামে দো পেস্তান দো অঙ্গুল তলে ।
দক্ষিণে লতিফা রুহু কলব্ বামস্থলে ॥
ছের খফি দো পেস্তান উপরেতে হয় ।
দো আঙ্গুল উপরেতে জানিবা নিশ্চয় ॥

নীচু স্থানে ছিনা মধ্যে আখফার বাসর ।
দুই ভোয়ার মধ্যে খানে আছে নফস্ ঘর ॥
আব, আতস, খাক, বাদ্ অজুদ মাঝার ।
সর্বস্থানে আছে তারা নাহিক নির্দ্ধার ॥
মোর্শেদের তাওয়াজ্জুতে লতিফা সকলে ।
মনে মুখে একিনেতে আল্লা আল্লা বলে ॥
মন মুখ নাম কাম চার অলঙ্কার ।
চারিপদে এক পদ আল্লা নাম সার ॥
শিকারী বন্দুক তার পড়িবে শিকার ।
বারুদ গোলা এই চারি তার অলঙ্কার ॥
লতিফা ফকির যারা অজুদ মাঝার ।
তাহারাই দেশ পতি ঘরের মোক্তার ॥
তাহারাই বাধ্য যদি হইবে নিশ্চয় ।
মুল্লুক আবাদ হবে না রহিবে ভয় ॥
যার পরে হইয়াছে রাজত্বের ভার ।
তাঁহার আধারে হয় মুল্লুক আন্ধার ॥
অজুদ মুল্লুকে যেই মালেক ফকির ।
তারা যদি রত হবে করিতে জিকির ॥
শরীর পাতল হবে কাগজ আকার ।
কখন ছুটিবে নূর দেখে চমৎকার ॥
বিজলী মাফিক কভু দেখিবে নজরে ।
পৃথিবী রৌশন কভু পাইবে অন্তরে ॥
দম তার মোটা হবে থামা নহি যায় ।
বেতাব হইয়া কভু করে হায় হায় ॥
রোনাজারি করে কভু আছাড়ে পাছাড় ।
হালেতে আসিয়া কভু করে হাহাকার ॥
লতিফা আতশে যবে ছালেক বসিবে ।
গরম হইবে দেহ আগুন দেখিবে ॥
আবেতে বসিবে যবে করিতে জেকের ।
পানি কি বাদল ন্যায় পাবে তাতে টের ॥
যেমন লতিফা গুণ তেমনি পাইবে ।
যেমন মোর্শেদ শিষ্য তেমনি হইবে ॥
ছরিওল আছর বটে হবে যেই পীর ।
বসা মাত্র পাবে তায় এরূপ তাছির ॥
হইবে এমন পীর পৃথিবীতে কম ।

দো চার মিলিতে পারে তামাম আলম ॥
তার পরে একাযুক্ত দশ লতিফায় ।
করিলে জেকের কহে সুলতানী তাহায় ॥
সুলতান জেকের হবে হেন আস্বাদন ।
ধনহীনে পায় যেন অমূল্য রতন ॥
কাঁপিবে বদন তার করে থর থর ।
আল্লা আল্লা রোমে রোমে নিরবধি স্বর ॥
শুনিলে এমন লোক আল্লাহর কোরান ।
বেচইন হবে আর শুনে যদি গান ॥
নামাজে হইলে খাড়া এসে যাবে জোস ।
কোন জন একেবারে হইবে বেহুস ॥
লেখিয়া সে সব কথা কে করে তামাম ।
এবে শুন ছুলুকের কিঞ্চিৎ কালাম ॥

হাস্তিদেশ ও ছুলুক

উপরেতে মূল যার তাহার প্রত্যাশি ।
তলেতে পতিত হয় ভরে দুই রশি ॥
দোরশা ফানোস কসা দমে করে ভর ।
দমে আসে দমে যায় দমে রইছে ঘর ॥
যেমন ফানোস ঢোলে রশির উপর ।
তেমন ফানোস জান পৃথিবীতে নর ॥
সে ফানোসে দশ গাছি আছয় জিঞ্জির ।
উপরেতে টান তার চৌদিগেতে ঘির ॥
উপরেতে পাঁচ গাছি টানা পাঁচ ঠাঁই ।
নীচু পানে পাঁচ রশি জিঞ্জির এছাই ॥
সেই ডোর দশ গাছি যাহার উত্তম ।
কোন কালে হেন জন হবে না অধম ॥
সে রশি উত্তম ভাই হইবে না যার ।
ছিড়িয়া পতিত হবে চূর্ণ হবে হাড় ॥
উপরেতে পাঁচ রশি নাম শুন তার ।
কলব, রুহ, ছের, খফি আখফা জান আর ।
একেক রঙ্গের হয় একেক জিঞ্জির ।
পৃথিবীর রঙ্গ তাতে হইয়াছে স্থির ॥
সে রশির মূলদেশে আছে যেই সুত ।

তাহা হইতে এই রশি হইল প্রস্তুত ॥
প্রত্যেক রশির সুতা অন্য রঙ্গ ধরে ।
কোন ডোরের কিবা রঙ্গ শুন কহি তারে ॥
হরিদ্রা কলব আর রূহু লাল হয় ।
কাল রূপ ছের, আর খফি সাদাময় ॥
সবুজ বরণ নূর জানিবে আখ্‌ফার ।
ত্রিভূবন রঙ্গে মোহ রঙ্গে সারদ্বার ॥
আকাশ মঞ্জিল রঙ্গে তারকা সকল ।
বাগান রঙ্গেতে মোহ ফুটিল কমল ॥
রঙ্গেতে মাতিয়া অলি করে রঙ্গ গান ।
ভবের বাজারে যত রঙ্গের দোকান ॥
রঙ্গেতে বেরঙ্গ আছে, আছে মধ্যে নাই ।
নাইতে সকল আছে পাইয়াছে ঠাঁই ॥
পাঁচ ডোরে ছয় নবী আছে আমলদার ।
তাহারাই রশি মূলে করেন কারবার ॥
এ মোকাম সাধিবারে ইচ্ছুক যে জন ।
তাঁহাদের পদ সেবা কর অনুক্ষণ ॥
নবীগণ নাম এবে কহিয়া জানাই ।
যাহার তোফায়েল হইতে নিজ দেশ পাই ॥
ইছা মুছা ইব্রাহিম নুহু নবী আর ।
প্রথম আর শেষ নবী এই হয় সার ॥
প্রভুর করুণা হয় হজরত উপর ।
যাদের মহিমা ক্রমে যাব নিজ ঘর ॥
কিন্তু সে রশিতে খিচা সকল জাহান ।
যেন সর্বস্থানে আছে অজুদে পরান ॥
এক বালু পরিমাণ রশি ভিন্ন নাই ।
আপনাতে অতএব সকল সামাই ॥
যেমন শরীরে রগ সকল জুড়িয়া ।
বাকি নাহি কোন ঠাঁই দেখ বিচারিয়া ॥
আব আতশ খাক বাদ শরীর মাঝার ।
আছে কিন্তু দেখি নাই বড় চমৎকার ॥
যেমন দুধেতে ননি দেখা নাহি যায় ।
তেমন চক্‌মকে আলো আছে পুসিদায় ॥
যেমন মাকড় পেটে আছে কত আশ ।
যত লয় তত হয় একি সর্ব্বনাশ ॥

লতিফাতে দেখা যায় কুদরত আল্লার ।
এক দানা মূল পদে শত দানা তার ॥
এহাকে ছুলুক কহে আর তরিকত ।
দূরে যেয়ে নিজ ঘরে পায় হাকিকত ॥
কোন জন জ্বর পীড়া তালাস করয় ।
ধাবিত বিক্রম চোটে তার পীড়া হয় ॥
নিজ ঘরে পীড়া আছে ঢোড়ে অন্য ঠাঁই ।
স্বপন দেখিল যেই পোছ তারে ভাই ॥
আমরা না বুঝি তাহা কেমন স্বপন ।
দেখি নাই উপরেতে মনেতে রৌশন ॥
এই যে ছুলুকে আছে আঠার মোকাম ।
বুঝাইতে তালেবেরে বটে মনস্কাম ॥
কুণ্ডলীর ঘর সেই দ্বায়রা কহে তারে ।
সে ঘর নিজের ঘর যে বুঝিতে পারে ॥
ফানা ফিস্বেখ নামে রেছালা ভিতর ।
লেখা গেল দ্বায়রা সব করহ নজর ॥

নেস্তিদেশ

আরস উপরে যত মুল্লুক আছয় ।
হাস্তি ও আমর বলে তার নাম হয় ॥
নিচু পানে আরসের আছে যত দেশ ।
নেস্তি ও খাল্‌ক নামে জানিবে সন্বেশ ॥
সে দেশের পাঁচ রশি মনুষ্যের স্থির ।
ফানোষেতে নিচু পানে যেমন জিঞ্জির ॥
সে জিঞ্জিরে রাখে সিধা ফানোষের ভার ।
পবনেতে নাহি ঢোলে রহিবে কারার ॥
সে রশির পাঁচ নাম শোন মন কায় ।
আব, আতস, খাক, বাদ, নফছ লতিফায় ॥
বেগুনি রঙ্গের তারা যেন জ্যোতির্ম্ময় ।
নফছ ডোরে সেই রঙ্গ জানিবে নিশ্চয় ॥
আগুনের কাল রূপ নিলা রূপ পানি ।
পবনে সবুজ রূপ, মাটি রূপ ধানি ॥
আছয় এ ছয় নূর অজুদ মাঝার ।
এক নুরে শত পাবে খুলিলে সে দ্বার ॥

দরজা খুলিতে যদি চাহে কোন জন ।
খোদার জেকের চাহি করিতে সাধন ॥
খোদাকে বোলাও এবে না বোলাও নাম ।
নাম কভু জাত পাক হবে না মোদাম ॥
নাম কভু খোদা নহে খোদ একজন ।
নাম কাম এক হবে একথা কেমন ॥
খোদার কালাম যদি পড়িবে সদায় ।
খোদা না পড়িলে খোদা পাইবে কোথায় ॥
কালাম পড়িয়া সবে কাল কাটাইল ।
জনমেতে কোন জন খোদা না পড়িল ॥
কালাম পড়িতে আছ দেখিয়া কালাম ।
কেমনে দেখিবে রূপ দেখে যেবা নাম ॥
অদেখা প্রভুকে আমি কভু দেখি নাই ।
তাকিয়া চিনিতে তারে পারিবেক নাই ॥
অক্ষরেতে প্রভু ধরা যাবে না কখন ।
ধুমপানে পেট পূর্ণ হবে না যেমন ॥
তবে কি কালাম খালী ছরঞ্জাম তার ।
এছেম শুনিলে হবে জেছেম দরকার ॥
জেছেমে দরকার যদি হবে কোন জন ।
কালাম পড়িতে কর কলীম কীর্ত্তন ॥
কলীম কীর্ত্তন যদি চাহে কোন নর ।
আশ্রয় লইবে তার রাখে যে খবর ॥
আশ্রয় প্রদান যদি করে গুণমণি ।
প্রক্যেক কালাম এক হবে মণি খনী ॥
তবেই সর্ব্বদা সেই করিবে জেকের ।
সক্ষম হইয়া করে জেকের ফেকের ॥
তেইসে সক্ষমে প্রভু কহিছে বচন ।
খাড়া বসা শুয়ে কর আমার স্মরণ ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তাআলা)

الذين يذكورن الله قيا ماوقعودا وعلى جنوبهم
(আল্ লাজিনা ইয়াজ কুরুনাল লাহা কিয়ামাও ওয়াকুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম ।)

খাড়া হালে চলা ফিরা সকল সামাই ।
বসা হালে খাওয়া দাওয়া কিছু ছাড়া নাই ॥

সোয়া হালে চিত কাইত নিদ্রা আদি যত ।
প্রভুর স্মরণ তাহে কর অবিরত ॥
সর্ব্বদা স্মরণে প্রভু খুলিবে হালাত ।
তাঁর নাম মোরাকেবা জেকেরের সাথ ॥
মোরাকেবা জারি হয় যে সব জাগায় ।
কিন্তু মন ভানু হয় তাহাতে উদয় ॥
মন সূর্য্য উদয়ের কলব আকাশ ।
তাহার বুরুজে হয় সুরুজ প্রকাশ ॥
কতেক মকাম হয় বুরুজ আকার ।
তাহাতে স্মরণ ভানু হয় নমুদার ॥
মুল্লুক পশর করে গরম স্বভাব ।
কিন্তু সেই গরমেতে আছে শত ভাব ॥
যেখানে যে ভাব হয় সেই নাম তার ।
সেই নামে মোরাকেবা হইবে প্রচার ॥
লতিফাতে মোরাকেবা পাইবে যখন ।
তাহাকে ছুল্লুক বলে ডাকে কত জন ॥
ছুলুকে খুলিবে ভাব যখন তোমার ।
শত মোরাকেবা হবে তাহাতে নির্দ্ধার ॥

মোরাকেবা সমূহ

প্রথম মোরাকেবা

অকুফে কলবী

অকুফের মানি এবে সুনহ খবর ।
নিরবধি নেগাদারি কলব উপর ॥
কলব প্রভুর নাম করিছে স্মরণ ।
হর হালে তার পরে ধেয়ান রাখন ॥
তবেই কলব ঘর জন্মিবে খেয়াল ।
সে খেয়ালে মন ভাব হইবে উজ্জ্বল ॥
মোরাকেবা হবে তায় খুলিবেক নূর ।
রঙ্গ রঙ্গ মোকাশেফা হইবে জহুর ॥
মোশাহেদা হবে তার হয়ে গেলে ফানা ।
তখন প্রভুর জাত পাইবে ঠিকানা ॥

দ্বিতীয় মোরাকেবা
অকুফে আদদী ও পাছ আন্‌পাছ

ভাটা উজান দুই দম আসে আর যায়।
ভাটাতে আল্লার নাম 'হু' নামে উজায় ॥
ভাটা উজান দুই ধার করিলে সাধন।
তাহাতে প্রকাশ পাবে গোপন রতন ॥
উঠাইতে মণি মুক্তা দোন দরিয়ার।
কোরানে ইশারা কথা আসিয়াছে তার ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তাআলা)

ويخرج منهما اللؤلؤوالمرجان
(ওয়াইয়াখরুজু মিনহুমা লু'লউ ওয়াল্ মারজান)

كرنگاه دارى پاس انفاس -
به سلطانى رسا ندت ازبن پاس -
ترايك پند بس دوهود عالم -
كه پرنيايد زجانت بسى خدادم -

কার নেগা দারি পাছ্ আনফাছ্।
বে সুলতানি রেঁছানাদাত আজইয়ে পাছ্ ॥
তেরা এক পান্দে বাছ্ দোহুদ্ আলম।
কে পর না ইয়া ইদ্ জাঁ জান্নাত বাছে খোদ আদম ॥
যদি তুমি নেগা রাখ পাছ আন পাছ।
ফানা ফিল্লায় পৌঁছাইবে সেই আনপাছ ॥

তৃতীয় মোরাকেবা
অকুফে জমানী

সম, সম, দম, দম রাখন খেয়াল।
স্মরণ করিনু কত ভুলি কত কাল ॥
হায় ভুলে গিয়েছিনু আপনা মাবুদ।
ভুলে দুর স্মরণেতে মাবুদ মৌজুদ ॥
এহাতেও মোরাকেবা খুলিবে উহার।
কিন্তু ভুল হতে চাই রতে হুসিয়ার ॥

চর্তুথ মোরাকেবা
নফি এছবাত

লা-ইলাহা নফি বটে ইল্লাল্লাহ্ এছবাত।
নাহিক দ্বিতীয় সাঁই সার এক জাত ॥
ঘুমাইবে পেচ দিয়া লতিফার পর।
নহে কলবেতে শুধু মারিবে টক্কর ॥
তাহাতে হালাত যত হইবে বাহের।
মোশাহেদা হবে জাত পাইবে জাহের ॥
পথিকের ডাহিন পদ চালাইবা কালে।
নফি শব্দ কহে আর বামে এছবাত বলে ॥
আসেক পথের পরে যায় সপাসপ।
প্রত্যেক কদমে নফি করে দপাদপ ॥
পদের পৃষ্ঠের পরে তাহার নজর।
এহাতে তাজাল্লি তার হয় বহুতর ॥
তাহাতে হইবে ফানা চিনিবে মোকাম।
যত চলে তত তার বাড়িবে আরাম ॥

পঞ্চম মোরাকেবা

উচা পরে চলে কিবা নিম্ন দিক যায়।
নফি ও এছবাত শুধু করিলে তাহায় ॥
ছালেকের যে মোকাম আছয় উরুজ।
এরূপ জেকেরে তার খুলিবে বুরুজ ॥
ঘোরে যদি ছালেকান নিজ পদ ভরে।
আজব তাজল্লি হবে তাহার উপরে ॥
পথিকের চলা কালে ঢোলে যদি হাত।
তাহতেও ছালেকান পাইবে হালাত ॥

ষষ্ঠ মোরাকেবা

মধ্যস্থল দুই চক্ষু গুরুর যথায়।
খেয়ালি নজরে যদি চলিবে রাহায় ॥
খুলিবে তাহার পরে শত কেরামত।
উর্ধ্বপানে ভেদাভেদ জানিবে আলবৎ ॥
পসর উদয় হবে পিছ পানে তার।
দ্বীপ তুল্য পাবে তারে আরসের সার ॥

মাহমুদা মাকামের খুলিবে দুয়ার ।
আরসের রাজধানী প্রকাশ ভাণ্ডার ॥
মোখালেফ পরে সেই আসিবে গালেব ।
ফলিবে অদন্য ফল যাহার তালেব ॥
হাটিলে দৌড়িয়ে তার কেবা লাগ পায় ।
রাখিনু ভেদের কথা খুলিব কোথায় ॥

সপ্তম মোরাকেবা

ছাওয়ারিতে ছালেকান হইলে ছাওয়ার ।
নিমিষে মোকাম খোলে তাজল্লিল দ্বার ॥
গুরু রূপ দীপ তত্ত্ব করিলে তখন ।
ঘোর যাবে নূর পাবে দেখিবে রৌশন ॥
প্রদীপ পসর যেন করে অন্ধকার ।
চক্ষু বিনা অন্ধ নহে আর কিবা তার ॥
শশীর আলোক জ্যোতে রাত্রে পূর্ণিমার ।
পুলকে পথিক যেন বিনাশে আন্ধার ॥

অষ্টম মোরাকেবা

করাল পাথর কিবা নগীনা উপর ।
এক দৃষ্টে ছালেকান করিলে নজর ॥
জেকের তরক্কি হবে ছাড়িবে ফিকির ।
প্রকাশ্য নজর তার হয়ে যাবে ধীর ॥
তেনকালে মন চক্ষু হইবে রৌশন ।
দেখিবে ত্রিজগন্নাথ তাজল্লি মগন ॥
পাইবে আণ্ডার খোলে এ সাত ভাণ্ডার ।
গহন কানন আছে পেটেতে মশার ॥
মাছের বয়জার পেটে সাত সমুদ্দুর ।
নানাবিধ মীন আদি হাঙ্গর ডঙ্গুর ॥
খুজিলে পুতের পেটে মাতা দুধ খায় ।
পুত্র গতি বিনে মাতা করে হায় হায় ॥
ফলেতে রয়েছে মিষ্ট মিষ্টে আছে ফল ।
জলেতে রয়েছে মীন মীনে আছে জল ॥
খুজিলে স্ত্রীর পেটে পতির জনম ।
শেষেতে প্রথম আছে নাস্তিতে আলম ॥

আন্ধারে আনওয়ার আর কুফরেতে নূর ।
বেহেস্তে ইবলিস আর দোজখেতে হুর ॥
ইবলিছের গলে গাথা পেগাম্বরী হার ।
তেকারণে তার দমে ফাঁসিল সংসার ॥
সকলে কি বুঝে হেন চিকণ রচনা ।
কেমনে অন্ধল পাবে প্রদীপ ঠিকানা ॥

নবম মোরাকেবা

গহন কানন কিবা পাতায় পাতায় ।
ছালেকান করে যদি দৃষ্টিপাত তায় ॥
হেরিবে রঙ্গের ফুল রঙ্গের কানাই ।
হইবে তাজল্লি কত লেখা জোখা নাই ॥
নজর হইবে ফানা কল্পনা সকল ।
হইবে শরীর ফানা হৃদয় বিমল ॥
দেখে বটে নজরেতে ফানা সমুদয় ।
ভাব বিনা বদনেতে রবে না নিশ্চয় ॥
আহারে এহেন ভাব হইবে যাহার ।
কি ভয় তাহার বল জগত মাঝার ॥

দশম মোরাকেবা

মহীপরে শূন্য ভরে আকাশের তলে ।
একদৃষ্টে রবে যদি ভাবুক সকলে ॥
হেরিবে কদম্ব ফুল গোলাকার চাক ।
হৃদয় আসন তান দেখিয়া অবাক ॥
দেখিবে মস্তক নূর তাজল্লির ভাবে ।
দেখিবে মস্তকে শুধু যত ইতি ভবে ॥
হেরিয়া যইবে ফানা তাহার ভিতর ।
ফলিবে বাকা ফল ফানা আগে কর ॥

মজমুয়া ফাতুয়াতে

اما التجلى فى صورة الانسان
فهوا جمع وافضل تجليه -

(আম্মাত্তাজ্জাল্লি ফি– ছুরাতিল্ ইনসানো
ফাহুয়া আজমাউ ওয়া আফজালু তাজাল্লিহা ।)

মানব ছুরত পরে যে তাজল্লি হয় ।
উত্তম তাজল্লি তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
যে ভাব উত্তম হবে তাজল্লির ফল ।
ফানাওল ফানা সেই জানিবে কেবল ॥
মোর্শেদের জ্ঞান ভাব করহ শাসন ।
হইবে নিজের ভাব প্রভুর আসন ॥

একাদশ মোরাকেবা

আকাশের শশী কিবা তারকা সকল ।
হেরিবে তালেব যদি তার ঝলমল ॥
এক ভাবে নজরেতে রবে কতক্ষণ ।
ভাবুক ভাবেতে যেন পতঙ্গ বিরণ ॥
ইশারাতে শশী তার শুনিবে বচন ।
আসিবে নিকটে তার স্বভাব যেমন ॥
শশীর উপরে আছে জহুর খোদার ।
প্রকাশ্য জ্যোতিকে চাহি ফানা করিবার ॥
তবেই পাইবে ফল খুলিবেক হাল ।
নহে হবে চন্দ্র পূজা ঘটিবে জঞ্জাল ॥
পাইবে শশীর সাথে পরম আলাপ ।
হৃদয় আসনে পাবে পরম বিলাপ ॥

(سعدی ره)
(সাদী রহঃ)

ابروبادو مه وخورشید وفلك درکاراند -
تاتوانی بکف اری و بغفلت نخوری -
همه ازبهر توسر کشته وفرمان بردار -
شرط انصاف نباشد که توفر مان نبری -
(আব্‌রো বাদো মো-হো খুর্‌শিদ ও ফাল্‌কে দারকার আন্দ ।
তাতোয়ানী বাকাফ্‌কে আরি ও বা গাফ্‌লাতে না খোরী ॥
হামা আজ্‌ বাহ্‌রে তু সার গুস্‌তা ও ফার্‌মান বার্‌দার ।
সার্‌ত ইন্‌শাফ্‌ না বাছাদ্‌ কি তুফার্‌মান নাবারি ॥)

মেঘবান চন্দ্র সূর্য্য আকাশ মণ্ডল ।
নিজ কামে নাহি খাও ভুলিয়া কেবল ॥

তাহাদের দৌড় বটে প্রভু অন্বেষণ ।
মানব ভ্রমেতে করে খোরাক কীর্ত্তন ॥
তোমার খোরাক মূল প্রভু করতায় ।
তাঁরে না ডাকিলে খোরাক পাইবে কোথায় ॥
যে জন তোমায় পালে করিয়া যতন ।
যার হাতে রহিয়াছে পৃথিবীর ধন ॥
তাঁহাকে না ডেকে তুমি ডাকিছ খোরাক ।
ছাড়িয়া খোরাক ডাক ডাক নিজ ডাক ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তাআলা)

وما من دابتفى الارض
الاعلى الله رزقها فى الارض
(অমা মিন্‌ দাব্বাতিন্‌ ফিল্‌ আরদে
ইল্লা আলাল্লাহে রিজ্‌কুহা ফিল্‌ আরদে ॥)

দ্বাদশ মোরাকেবা

মাটিতে শয়ন যদি করে ছালেকান ।
মকাশেফা ভাব তাতে হইবে গেয়ান ॥
হইবে ভাবেতে রত মৃত্তিকার সনে ।
খুলিবে মোকাম লাল মৃত্তিকা পতনে ॥
কেবল মানস তাঁর শুইবারে হয় ।
নিদ্রা কি জাগনে শুধু ভাবের বিষয় ॥
জাগরিত কালে মন রহিবে জাগিয়া ।
নিদ্রা কি জাগনে ভাব পাইবে শুইয়া ॥
কিন্তু যে স্বপনে খোলে বাতেনী দুয়ার ।
চল্লিশ ভাগ নবুয়ত নবী সাক্ষী তার ॥
স্বপনেতে ফল শুধু পাইবে আপন ।
ছালেকের ভাব জান জাগিতে স্বপন ॥
কি ছার জাগনে হয় এক মনকায় ।
স্বপনে গোপন ভাব জাগনে কোথায় ॥
স্বপন দেখিতে যদি করিবে বাসনা ।
করহ কিয়ত কাল পীর উপাসনা ॥

ত্রয়োদশ মোরাকেবা

নিজ ছায়া কায়া হেন আরশী দরশনে ।
এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত্ করে তার পানে ॥
নিজ রূপ ঘোল হয়ে যাবে একবার ।
দেখিবে অরূপ শুধু ফানা হবে সার ॥
করিলে সকল নেস্তি হাস্তি পদ তায় ।
হাস্তি বিনা নেস্তি পদ আছিল কোথায় ॥
খালী আরশী দেখা কভু নাহিক ছুন্নত ।
কিন্তু তার কারণেতে নবী ছিল মত ॥
এ হেন গৌরব কথা রসিকেতে জানে ।
নিজ তত্ত্ব নিজে কর পাবে নহে বনে ॥

চর্তুদশ মোরাকেবা

আপনার নাক পরে লাগাইবে তাক ।
তাকিতে তাকিতে দেখা নাহি যাবে নাক ॥
তখন হালাত এক হ'য়ে যাবে তারি ।
সকল হইবে ফানা কিন্তু জাত বারি ॥
রবে না খেয়াল তাঁর রূপ রাশি যত ।
হইবে আজব ফানা কর না গলত ॥
নামাজেতে এই জন্য নাক দেখা হয় ।
না করিলে ফানা কিন্তু সেরেক নিশ্চয় ॥
মকাম মাহমুদা যেই চাহে সাধিবারে ।
আহম্মদি ভাব বিনা পাইবে না তারে ॥

পঞ্চদশ মোরাকেবা

সুর ধন কোন জন করিলে যতন ।
পাইবেন ছালেকান তাহাতে রতন ॥
মোহিনী আওয়াজ হয় শুনিতে মধুর ।
পাইবেন ছালেকান তাতে বহু নূর ॥
আওয়াজেতে খোলা যাবে তাজল্লির দ্বার ।
ছুটিবে জজবার সৈন্য বলে মার মার ॥
হা হুতাসে অবশেষে হইবে মস্তান ।
নহে শুধু ফানা হবে যোগ্য আরেফান ॥

লোহা যেন আগুনেতে গরম বিশাল ।
আন্ত্রীক গরম আর রূপ হবে লাল ॥
কি সাধ্য থামিয়া তারে রাখে কোন জন ।
আগুন প্রবল হইলে কে করে বারণ ॥
গরমে সরম তার সব যাবে দূর ।
কেবল মানস তার আল্লাহু গফুর ॥
গান শুনে তান তার আসিবে না কানে ।
মদহুস হবে ভাব থাকিবে কেমনে ॥
কিন্তু যদি আসেকানে হবে রস গান ।
শ্রবণেতে আসেকের বাঁচে না পরাণ ॥
কোরান কালাম যদি শুনে সুমধুর ।
পদ্য গদ্য রসযুক্ত বাজা আদি সুর ॥
বচন রসের মূল সুর ও সঞ্চার ।
প্রতি সুর অন্তরেতে আছে এক সার ।
কোথা হইতে আসে সুর আছিল কোথায় ।
কোথা সুর সার মণি কে সৃজিল তায় ॥
না পাইলে তাঁহে আজি দিব হে পরান ।
সুরে সার না পাইলে কিবা ছার গান ॥
সংসারেতে নানাবিধ যত আছে সুর ।
কেবল জেকের শুধু নহে কিছু দূর ॥

قوله تعالى
(কাওলাহু তা'আলা)

وان من شئى الايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم
(ওয়াইম্মিন সাঁইয়িন ইল্লা ইউসাব্বেহু বিহামদিহি
ওয়ালা কিল্লা-তাফকাহুনা তাসবিহা হুম ॥)

سعدى رح
(সাদী রহঃ)

بدكرش هر چه بينى درخروش است
ولى داند دين معنى ك گرش است -
(বা জিকিরাস হারচেঁবিনীদার খোরোস্ আস্ত ।
ওয়ালি দানদ্ দিন্ মানি কে গোরাসআস্ত ॥)

জেকেরে যাহারে পাবে আওয়াজেতে তারে ।
কিন্তু যদি রাখে কান অর্থের ভিতরে ॥

যতেক আওয়াজ আছে সংসার মাঝার ।
আছয় তাহার মাঝে মানী পরিষ্কার ॥
দোতারা ছেতারা দফ জগ ঝম্প খোল ।
নাকারা টিকারা ঢাক হারমণি ঢোল ॥
এসরাজ সারেঙ্গী বাঁশি বেগুলি সাঁনাই ।
তবল কর্ত্তাল বেল মন্দলি জলাই ॥
এ সব আওয়াজে আছে আওয়াজের মূল ।
হাকিকতে পাবে তারে না করিলে ভুল ॥
এরূপ সুরেতে খোলে তাজল্লির দ্বার ।
তাজল্লি হইলে ফানা জাত পাক সার ॥
আরেফের মারফত প্রভু দরশন ।
পাইবেন মোরাকেবা করিলে যতন ॥
হইবে খোদার সাথে ভাবের আলাপ ।
এ হেন কথন বটে এলহামি বিলাপ ॥
টুক টুক ঢুক ঢুক হুঁ হুঁ সমুদ্দুর ।
ভেন ভেন পেন পেন মশা মাছি সুর ॥
ঠন ঠন ঢন ঢন ঝন ঝন থাল ।
স্বর স্বর গর গর কল কল খাল ॥
আঁহা উঁহু হাঁ হাঁ হুঁ হুঁ কাকা কুকু সুর ।
এ সবার মোরাকেবা খুলে যাবে নূর ॥
যতেক আওয়াজ আছে সংসার মাঝার ।
সকলেতে প্রভু নাম নামে আছে সার ॥
তাতেই গানের ব্যাখ্যা বিখ্যাত আরেফে ।
শতেক প্রশংসা লিখা দেখ আওয়ারেফে ॥
যে জানে আওয়াজ মূল শুনা চাহি তার ।
অপরে শুনিলে তাহা হবে গুনাগার ॥

ষষ্ঠদশ মোরাকেবা

লতিফা সকল আর অজুদ তামাম ।
রাত দিন মোরাকেবা তাহাতে মোদাম ॥
শরীরের নেগাদারি শরীরে রাখিবে ।
শরীরেতে মোসাহেদা হুজুরি পাইবে ॥
বদনে রাখিলে নেগা ফানা হবে তায় ।
সে নেগা হইলে ফানা বদন কোথায় ।
ফানাওল ফানা এই বাকা নাম তার ।

নাম কাম হবে ফানা এক আল্লা সার ॥
তুমি আমি খেয়াল আদি মিটিবে যখন ।
কহিবে আনাল হক মিশে গেলে তন ॥
কিন্তু যদি মকামাতে করিবে তাছির ॥
কল্পনা করিতে দূর করিবে তদবির ॥
কল্পনা বিষম বালা মনের ভিতর ।
তাহার দরুনে দেলে হয় না আছর ॥
তিন প্রকার কল্পনা শুন মনকায় ।
হামতুল সহওয়াত জান তেসরায় ॥
কত শত কল্পনা মনের ভিতর ।
নিরবধি মন মাঝে করে ধড় ফড় ॥
মন কল্পনায় লোক চারি পাশে যায় ।
নহেত বসিয়া রইত আপনা জাগায় ॥
লইত প্রভুর নাম, হইত স্মরণ ।
স্মরণ লাগিত মিঠা নহে উচাটন ॥
দৈয়মেতে তুল নামে খাতরাত আর ।
ক্রমে ক্রমে আয়েন্দাতে বড় আশা তার ॥
এইক্ষণ না হইলে আগে পরে হবে ।
কার পরে কি করিবে মনে মনে ভাবে ॥
তেছরাতে মনে বদ চক্ষের নজর ।
অন্য নারী দেখে লোভী হয় তার পর ॥
এ তিন ফিকির রোজ সত্তর হাজার ।
রাত দিন নয়া জন্মে মনের মাঝার ॥
এতেক ফিকির যদি মন ঘরে হবে ।
প্রভুর স্মরণে বল জাগা কোথা পাবে ॥
জাগা রহে আমল নামা হইবে দপ্তর ।
সে দপ্তরে শত পর্দ্দা কলব উপর ॥
খাতরাত শয়তানি বলে এর নাম ।
ফিক্‌রে রহমানী তাই হবে না আঞ্জাম ॥
এ সব কল্পনা যদি হয়ে যাবে দূর ।
কল্পনা রহমানী পরে করিবে জহুর ॥
এইত আল্লার ভেদ মনের কল্পনা ।
লূলূ ওয়াল মারজান, এই অন্যে জানে না ॥
এইত গোপন ভেদ হিস্যা আরেফান ।
নবীদের মন উক্তি হাদিছ বয়ান ॥

প্রত্যেহ উৎপন্ন হয় মনের মাঝার ।
নব নব হর দিন সত্তর হাজার ॥
তাতেই ভাবের সাথে ফকিরী বচন ।
অলীক লোকেতে কহে গায়েবী কথন ॥
গায়েবী বুঝেছে তারা ফকিরি আলাপ ।
লাঠি দেখে বলে বাপ এই কাল সাপ ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

كل يوم هوفى شان

(কুল্লু ইয়াওমা হুয়া ফিশান ।)

ঘড়ি ঘড়ি এক সাঁন আয়াত কোরান ।
দমে দমে কাল যায় কালে কালে সাঁন ॥

كلام اولياء

(কালামে আওলিয়া)

اصوفى ابن الوقت

(আছ্ সুফি ইব্নুল ওয়াক্ত ।)

আচ্ছুফি এব্নোলওয়াক্ত কহে কোন অলী ।
সময়ের পুত্র বটে আরেফ সকলি ॥

সপ্তদশ মোরাকেবা

আগুন চেরাগ আদি যত জ্যোতির্ম্ময় ।
এক দৃষ্টে নজরেতে রহিলে নিশ্চয় ॥
হইবে তাজল্লিময় ভাবুক অন্তর ।
জেকেরে তরক্কি মন কাঁপে থর থর ॥
বেশীক্ষণ করে যদি মোরাকেবা তাঁর ।
গরমি হইতে পারে রবে হুশিয়ার ॥
যদি সে গরমি তাঁর হইবে ত্বরিত ।
মোরাকেবা পানি জামে কর আচম্বিত ॥

অষ্টদশ মোরাকেবা

রাখিয়া পানির জাম ছামনে আপন ।
এক দৃষ্টে রবে চেয়ে গলা করে টান

মোর্শেদের কুঞ্জি হতে খুলিবে দুয়ার ।
নহে কর ইউছাব্বেহু জপ কত বার ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তাআলা)

يسبح لله ما فى السموت والارض

(ইউসাব্বেহু লিল্লাহি মা ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আর্দ ।)

তাহাতে পাইবে নূর গুপ্ত আলামত ।
পানিতে আগুন পাবে নূর হাকিকত ॥

উনবিংশ মোরাকেবা

দুই ঘড়ি দিন যবে হইবে উদয় ।
রহিবে পশ্চিমে খাড়া এক দৃষ্ট হয় ॥
দৃষ্টিতে সৃজিত হবে নানাবিধ নূর ।
শত শত রঙ্গে হবে তাজল্লি জহুর ॥
ঘড়ীতে ঘড়ীর ফল দিনে দিনে পায় ।
বৈকালে দ্বিপ্রহর ফল কোথা পাওয়া যায় ॥
অসমে সমের ফল যদি হতে পারে ।
সোম শুক্র বলে তবে ডাকিবে কাহারে ॥
দিবা গেলে রাত্রি আসে অন্ধকারময় ।
রাত্রেতে দিবার ফল আর কিহে হয় ।।
গরম দিবার ধুপ রজনী শীতল ।
পাঞ্জেগাঁনা পাঁচ সমে যার যে আমল ॥
দোহা, চাস্ত, ঈদ, জুম্মা, হজ্ব ও রমজান ।
যার যেই সময়েতে তাহার সম্মান ॥
বুড়া কালে নাহি পাবে জওয়ানির ফল ।
সময় থাকিতে কর যার যে আমল ॥

বিংশ মোরাকেবা

চাঁন্নি রাত হয় কিবা দ্বিপ্রহর পর ।
দেখহে লতিফ ছায়া করিয়া নজর ॥
নিজ ছায়া দৃষ্টি করে রবে সাবধানে ।
পরেতে নজর করে আকাশের পানে ॥
নজর আসিবে এক সাদা ছায়া তায় ।

করহ তাহাকে ফানা এক মন কায় ॥
হইবে তাহাতে ফানী আতশে গরম ।
তাজল্লি ধরিবে জোর ছুটে যাবে দম ॥
করিতে গরম দফা যদি চাহে নর ।
দরুদের মোরাকেবে রবে না জরর ॥

একবিংশ মোরাকেবা

হইলে আধাঁর ঠাঁই অতি ঘোরতর ।
তাহাতে তাজল্লি শুধু হইবে পরশ ॥
আধাঁর না হইলে কোথা হইবে পরশ ।
জ্যোতি না হইলে কোথা হইবে নজর ॥
নজরের চক্ষু ঘোর কেবলি আধাঁর ।
আধাঁরে পাইলে ঠাঁই রৌশন বাজার ॥
আধাঁরেতে জ্যোতির্ম্ময় চাহ যদি ভাই ।
ঘেষ কলে বাতি বই কোথা সে রৌশনাই ॥

দ্বাবিংশ মোরাকেবা

চক্ষু মুখ কর্ণ নাসা অর্থে পঞ্চদ্বার ।
কুম্ভক ভরিয়া দম না হয় বাহার ॥
পরেতে যাইয়া বস নিজ সিংহাসনে ।
পাঠাও তাহুতিগণ তালাসিবে বনে ॥
যথায় মণির খনি রয়েছে গোপনে ।
পাঠাও তাহুতিগণ উঠাবে যতনে ॥
কাচারি অফিস যত বানান দরকার ।
করিবে উত্তমরূপে রাস্তা ঘাট তার ॥
করহ আবাদ দেশ শহর বাজার ।
পুকুর পুষ্করিনী আদি কর পরিষ্কার ॥
চাকর নৌকর যত কামরাণীগণ ।
উচিত মাফিক দিবে যার যে বেতন ॥
মুল্লুক রাখিবে তাজা করে আদালত ।
দুষ্টেরে দিবেন সাজা বুঝিয়া তাবত ॥
বসতির ঘরে যবে করিবে প্রবেশ ।
অন্ধকারে বাতি দিবে নানা উপদেশ ॥
করিবে সাজন ঘর অতি পরিষ্কার ।

বাতি ও মশালে ঘর করহে গোলজার ॥
খোরপোষ বস্ত্র আদি নানা উপহার ।
লইবে ভক্ষণ বস্ত্র নানান প্রকার ॥
খাওয়া পিয়া বস্ত্র আদি সুখের সঞ্চয় ।
মাশুক ব্যতীত ঘরে কিছু সুখ নয় ॥
রহিবে মাশুক সনে কহিবে বচন ।
আসেক মাশুক রস করিবে পুরণ ॥
এসব কুম্ভক জোরে খুলিবে যাহার ।
চিন্তিয়া তাহার কুঞ্জি আবশ্যক তার ॥

ত্রয়োবিংশ মোরাকেবা

হইবে পীরেতে ফানা স্বরূপ অন্তরে ।
জলেতে মিশিলে জল কে চিনিতে পারে ॥
দ্বিতীয় রাছুল ফানা এক মন চিত ।
কেমনে করিবে জুদা জলে কোথা শীত ॥
পরে হওয়া ফানা ফিল্লা এক মনকায় ।
বারুদে আগুন দিলে বারুদ কোথায় ॥
তার পরে বাকাবিল্লা এমন প্রকারে ।
আগুন গরম কোথা জুদা হতে পারে ।
অপরে আগুন হয়ে করে যত কাম ।
জ্বালা পোড়া মশালাদি প্রদীপ আঞ্জাম ॥
যথায় আগুন পাবে একই আগুন ।
আগুনে আগুনে কিহে আছে গুণাগুণ ॥
আজ কাল মাস আদি বৎসর যাবত ।
একই সময় জান সময় তাবত ॥
একই সময় নাম ভিন্ন ভিন্ন হয় ।
একই শরীর অঙ্গ জুদা জুদা নয় ॥

مولانا روم
(মাওলানা রুম)

مرحباشد جملگی امیخته -
گور هادریك لكن در ریخته -
زافكه خود ممدوح جزیك بیشنست -
كیشهای زین روی یك كیشنست -

(মার হাবা শোদ জুম্ লাগি আমেখ্তা ।
গোরহাদর এক লেকেন দর্ রেখ্তা ॥
জাফাকা খুদ্ মামদোহ্ জুজা এক্ বেশ্নিস্ত ।
কেশাহি জাঁইনরোবি এক কেশনিস্ত ॥)

একাযুক্ত ঘোলময় তাবৎ নিশ্চয় ।
সাবাসি খাঞ্জার পরে শত খোরা হয় ॥
একই প্রভুর জাত বেশি নাহি আর ।
সকলি মোজাহাব এক বেশী কোথা তার ॥
কদমিয়া তালা এই না করিবে বাদ ।
নিশ্চয় জানিবা কুঞ্জি সাহে আমজাদ ॥
আছিল ললাটে লেখা মিলাইল সাঁই ।
বঙ্গদেশে হেন তালা আর হয় নাই ॥
আহাম্মদী ভাবে ভাব প্রবেশে আমজাদ ।
দুধ ও মাখন এক ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ॥

নেছবত পরীক্ষা

আমেল কামেল কিবা বাতেন ফকির ।
মজজুব আব্দাল কিবা আউলিয়া পীর ॥
ছালেক তালেব কিবা মহেব্বান নবী ।
প্রভুর মহেব কিবা গুরু ভাবে ভাবি ॥
শরিয়ত ধার্মিক কিবা দেল কালা তার ।
মৌখিক লব্বাকি কিবা ফলে দাগাদার ॥
এ সবার পরীক্ষাতে দিবে যবে মন ।
এক চিত্তে হবে ফানা তাহাতে আপন ॥
নিজ রূপ ঘোল করে রূপে যেয়ে তাঁর ।
নিজ ভাব দূর করে তাঁর ভাব সার ॥
যে ভাব উদয় হবে তাঁহার হৃদয় ।
এই সে উহার ভাব জানিবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু এই ভাব তাঁর হবে নিরূপণ ।
পীরের দীক্ষিত ভাবে শিক্ষিত যে জন ॥

কোন ব্যক্তি দূরে থাকিলে তাহার অবস্থা নির্ণয় করা

দূর স্থানে কোন খানে যদি কোন জন ।
ব্যারামি কি ভাল মন্দ করা নীরিক্ষণ ॥

দোন চক্ষু বন্ধ করে মন পরিষ্কার ।
কহিবে দেখাও সাঁই চিন্তা করি যার ॥
তখন হেরিবে যারে সরল অন্তরে ।
নিশ্চয় জানিবে বাপু চিন্তা করে যারে ॥
কিন্তু তব মন যত হবে পরিষ্কার ।
ততই সকালে তাহা হইবে নির্দ্ধার ॥
রহিলে অন্যের চিন্তা মনের ভিতরে ।
কুওত কাহারি ফায়েজে দূর কর তারে ॥
পাইবে এস্কের ঘরে ইহার সন্ধান ।
পরেতে ধেয়ানে তব হইবে গেয়ান ॥
বসা চাই ঘণ্টা ভর কিবা আধা তার ।
দো এক মিনিটে কেহ বোঝে নিবে সার ॥
চক্ষু মুদে রবে কেহ কেহ উন্মিলীত ।
কেহ জানে সহজেতে কেহ আচম্বিত ॥
কাস্ফ যার ভাল হবে দেখিবে সত্ত্বর ।
বিনা কাস্ফে জানা উহা হইবে দুষ্কর ॥

বিমারী নির্ণয় করা

যাহার ব্যারাম তুমি করিবা নির্ণয় ।
তাহার শরীর ভাব আপনি নিশ্চয় ॥
রহিবে কিয়ত কাল এমত প্রকার ।
তাহার ব্যারাম পাবে শরীরে তোমার ॥
দরদ ছরদ আদি যথায় তাহার ।
বদনে তথায় তব হইবে নির্দ্ধার ॥
তাতেই জানিয়া নিবে বিমার উহার ।
যেই স্থানে যথা আছে বলে দিবে তার ॥

তালেবানের লতিফা ও মোকাম নিদর্শন করা

আপন মোকাম সাথে তালেব মোকাম ।
রাবেতা করিলে পরে লতিফা মোদাম ॥
মিলাবে লতিফা পীর নিজ লতিফায় ।
করিবে লতিফা নিজ ফানা সমুদয় ॥

তার পরে যে তাছির পাবে নিজ মনে ।
উহাই তাছির তার জেনে নিবে মনে ॥

নামাজের ফয়েজ

নামাজ পড়িতে যদি চাহে কোন জন ।
পীর হতে নূর তার চাহি যে লওন ॥
তবেই লাগিবে মন পাবে তার ফল ।
কবুল করিবে সাঁই এইত আমল ॥
মমিনের মেয়ারাজ জান এ নামাজ ।
পীরের কলবে ভেদ রহিবে না বাজ ॥
নামাজেতে ফল পাই এই মানসেতে ।
লইবে নামাজ নূর পীর নিকটেতে ॥
তবেই পাইবে ফল খুলিবে নয়ান ।
কোরানের ফয়েজ পাওয়া এমনি সন্ধান ॥
কোরান হাদিছ কিবা কালামাদি যত ।
ফয়েজ লওয়া আবশ্যক আর তাবিজাত ॥
তাবিজের ফল পাওয়া চাহে যেইজন ।
রাবেতা পীরের সাথে চাহি কতক্ষণ ॥
নহে ফজরেতে যবে খতম পড়িবে ।
তখন তাবিজ মনে খেয়ালে বসিবে ॥
কিন্তু যে নিচেতে এক তাবিজ লেখা যায় ।
আম খাছ এ তাবিজ দিবেক সবায় ॥

لاحول ولاقوة الا بالله -

(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্)

গদ্য – কোন ব্যক্তির জ্বর পীড়া হইলে এহার দুইটি তাবিজ দোন হাতের কব্জায় কিছুতে ভরিয়া লেপ বা মালশির সূতা দ্বারা বান্ধিয়া তিন কি পাঁচ দিনের মেয়াদে দিবেন। যদি ঐ মেয়াদের মধ্যে জ্বর না ছুটে ডাহিন হস্তেরটি বাম হস্তে এবং বাম হস্তেরটি ডাহিন হস্তে দেওয়া আবশ্যক। যদি আল্লাহর ফজলে আরোগ্য হয় তবে ঐ তাবিজ পানিতে ফেলিয়া দিবেন। কাস রুগীর গলায় বান্ধা আবশ্যক। বায়ুর জন্য মাথায় এবং পেটের ব্যারামে ও দরদের জন্য কমরে বান্ধিতে হইবে। সময় বিশেষে চীনের বর্ত্তনে বা কলার পাতায় বা পানের উপর লেখিয়া ধুইয়া এবং পানসহ খাওয়াইতে হয়। দ্বিতীয় তাবিজ প্রসব বেদনার জন্য। কিন্তু এই তাবিজটি বান্ধনের সময় কিঞ্চিৎ নজর মান্য করিয়া খালাস হইলে কোন গরীবকে দেওয়া আবশ্যক।

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

واذنت لربها وحقت واذالارض مدت
والقت مافيها وتخلت واذنت لربها وحقت -

ওয়াআজিনাত্ লি রাব্বিহা ওয়া হুক্কাৎ ওয়া ইজাল আরদু মুদ্দাৎ।
ওয়া আল্‌কাত্ মা ফিহা ওয়া তাখাল্লাত্ ওয়া আজিনাত্ লি রাব্বিহা ওয়া হুক্কাত।
তৃতীয়-আছেব ছাড়ইবার কিম্বা বদ নজরের জন্য ছুরে এখলাছ লেখিয়া যার গলায় দিতে হইবে তার নাম লেখিবে। তাহাতে যদি না মানে চারকুল দিয়া তাবিজ লেখিয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি ফয়েজ পাওয়ার নিয়ম না জানেন তিনি হর রাতে ৩০০ বার দরুদ শরীফ পড়িবেন কিন্তু মানসিক লক্ষ্য তাবিজের দিকে রাখিবেন।

কাশ্‌ফে কবুর

কবরেতে কোন জন আছয় মুরদার ।
সুখ দুঃখ নেক বদ নিদর্শন তার ॥
নর নারি ছিল কিবা যুবক সন্তান ।
করিলে জেকের কিছু পাইবে সন্ধান ॥

ياروح الروح

(ইয়া রূহুররূহ)

"ইয়া রূহুররূহ" শব্দ কলব উপর ।
মারিবে টক্কর যদি পাইবে খবর ॥

ياصمد

(ইয়া ছামাদ)

কিম্বা কর ছামাদের জেকের কত বার ।
সহস্র করিবে নহে শেষ তিন হাজার ॥
শত হেতু আছে তার হেতু যেই জানে ।
জিজ্ঞাসিলে পাবে ভেদ তাহার সামনে ॥

দুঃসাধ্য কথার মতলব খোলা

ياهو

(ইয়াহু)

"ইয়াহু" জেকের করে আখফার উপর ।
জরব্ টক্কর কত মারে দড়াদড় ॥

হাজার করিলে যদি খুলিয়া যাইবে ।
নহে দুই হাজার যে জরব করিবে ॥
তাতে যদি নাহি খোলে তিন হাজার কর ।
খুলিবে তাহার ভেদ খাতিরজমা ধর ॥

খবর আয়েন্দা

খবর আয়েন্দা যেই চাহে জানিবার ।
করিবে জেকের কিছু রূহের উপর ॥

ياروح الروح
(ইয়ারূহুর রূহ)

কিম্বা সে লতিফা রূহে কর এ জিকির ।
"ইয়ারূহুর রূহু" কর জরবেতে স্থির ॥
জরব জেকের করা জোরেতে মারণ ।
হেলিবে ঝাকিতে তার সকল বদন ॥
ঊর্ধ্বে মন জরবেতে করিবে গমন ।
কেবল উপর পানে মানস আপন ॥
করিলে কিয়ত কাল হইবে এল্‌হাম ।
পাইবে আয়েন্দা বাত বলি আচ্ছালাম ॥

চিন্তাপতীর মন হইতে চিন্তা বাহির করিয়া দেওয়া

চিন্তাপতী হবে যদি নর-নারী বর ।
পুত্র শোকে যদ্যপিও হইবে কাতর ॥
কুওত কাহারী ফয়েজ দিবে তার মনে ।
শোক স্থান উৎপত্তি রাবেতার সনে ॥
ঠেলিয়া ফয়েজ জোরে করিবে বাহের ।
ফয়েজ পরে ফয়েজ দিবে করিবে না দের ॥
কিম্বা জরব আল্লাহু করে এক হাজার ।
তিন হাজারে সিদ্ধ হবে এক মন সার ॥

পথিকের দেও দূরাচার হইতে রক্ষা

জ্বীন ভুত কার আগে হইলে রুদাত ।
কলব জেকেরে তাহা হইবে তফাত ॥

তাতে যদি নাহি ভাগে পীরে হবে ফানা ।
দশ চৌক্ষা ভুতগণ হয়ে যাবে কানা ॥
ঝিল বিল নাল নদী পাহাড় পর্বত ।
ফানা পীরে কোথা রহে তাহার আফত ॥

দফে বালা

যে বালা হৌক দেশে ওবা গুটি যত ।
রুহু কি কলবে কর জেকের এই মত ॥
চার জরবি জেকেরেতে চারাসন বস ।
মোর্শেদে হইয়া ফানা বালাগণে কস ॥
তিন হাজার ইল্লাল্লা তাতে ভাব টুক ।
লা-ইলাহা কাল্‌মা ধর ভরিয়া কুম্ভক ॥
এক দিনে ফতে হলে পোরে মনস্কাম ।
সাপ্তাহিকে না হইলে বড় বদনাম ॥

দফে আজার

কলব আটিয়া ধর ব্যারামীর পরে ।
কুওত কাহারী ফয়েজ মার কসে জোরে ॥
মার মার সার সার কর না গো ভয় ।
দেখিবে কমিতে রোগ রহিবে নিশ্চয় ॥
কিন্তু যদি মরণ বেরাম হইবে তাহার ।
কর না তাহার পরে কভু অত্যাচার ॥
তা হইলে তোমা পরে আসিবে আঘাত ।
অতএব বুঝে তাহা রহিবে তফাত ॥
আছয় অনেক পদ ছোলব বিমার ।
এহাকে ছোলব কহে তরিক মাঝার ॥

ঝড়ি ও তাহার বালা হইতে রক্ষা

দুর্জ্জন বন্যা আদি তুফান সকল ।
রক্ষা কুলে এক দেলে রাবেতার ফল ॥
বন্যা রোখে হজরত উমর ভাবে স্থির ।
ডাহিনে হজরত আলী বামে বড় পীর ॥
মোর্শেদ সামনে ভাবে ফয়েজ এলকাতার ।

কুদিবে কাহারী ফয়েজ বলে মার মার ॥
সে জোরে তুফান সুর হইয়া যাবে ঘোর ।
কলবের ফয়েজ চাহি করা অতি জোর ॥
যখন জহুর হবে তাজল্লির ফল ।
ছুটিবে বন্যার পরে করে মহাবল ॥
ফয়েজ উছিলা পীর চাহি এ লাগিয়া ।
ফয়েজ দূত বন্যা ভুত ধরিবে কসিয়া ॥
দেখিবে ফয়েজ দূত থামাইবে ভুত ।
কেমনে চলিবে হাতী বেগর মাহুত ॥

আছেব হাজের করা

আছেব জাদার পরে রাবেতার সনে ।
ঢালিবে কাহারী ফয়েজ খোদা করে মনে ॥
কুওতের ফাঁসি এক আছেব গলায় ।
দেখে কিবা জ্ঞান করে লাগাইবে তায় ॥
আছেবির পানে কস নাহি দিবে ভার ।
দেখিবে হাজের হবে বড় চমৎকার ॥

আছেব ছাড়ান

কুওত কাহারী ফাঁসি গলে লাগাইবে ।
জালালি ফয়েজ দ্বারা নহে জ্বালাইবে ॥
মরা পোড়া গন্ধ হেন পাইবে তখন ।
উচ্চস্বরে কাঁদিবেন করিতে বারণ ॥
যদি সেই দুরাচার করয়ে প্রস্থান ।
কর না তাহার পরে আর অভিমান ॥
যদি ঝুট করে টুট আপনা বচন ।
করহ ফয়েজ জোরে তাহাকে বন্ধন ॥
বন্ধী লয়ে নরক হয় কিবা অন্য ঠাঁই ।
রাখ তারে ধরে জোরে ছাড়াছাড়ি নাই ।
কিন্তু যেন দৃষ্টি শক্তি রহিতে না পারে ।
এমন আড়ালে তারে রাখ নিদ্রা ঘোরে ॥
যাবত আরোগ্য লাভ করে না প্রকাশ ।
বন্ধন হইতে তায় করা না খালাশ ॥
সতত বন্ধনে আর রাখ না তাহারে ।

জ্বীন হইলে তরিকত শিখাইতে পারে ॥
মানব মুরিদ যেন হইবে তোমার ।
জ্বীনেতে বিশেষ তব হবে ওফাদার ॥
যে জন পাইছে ধন পোছহ তাহারে ।
আমুরিদা কদাচিৎ বুঝিতে না পারে ॥

ছিনা কবজ ও ফয়েজ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ

মোর্শেদের ছায়া জান তাহাও মোর্শেদ ।
ছায়াতে আছয় অতি গোপনের ভেদ ॥
কেমন মুরিদ তাতে পদ রাখে হায় ।
সুজন মোর্শেদ ছায়া রাখিবে মাথায় ॥
ঝাড়ী পরে ঝড়ে মুখ মোর্শেদ সুজন ।
সে ঝাড়িতে ঝাড়ে মুখ সে জন কেমন ॥
জানিল না গুরু সেই চিনিল না মুখ ।
পারো যদি খাও থুক কোথা ফেক থুক ॥
ঘোড়া জোড়া জুতা আদি খড়ম তাঁহার ।
পদ স্থলে মাথা তব রাখন দরকার ॥
মুছাফেহা নাহি কর মুরব্বির সনে ।
হাতে হাত সমতুল মুরব্বি চরণে ॥
পড় না নফল কভু ছামনে তাঁহার ।
কোরান কিতাব কিবা কালামাদি আর ॥
বিছানাতে কভু তার নাহি রাখ পাও ।
দেখিলে খড়ম জুতা আদাব জানাও ॥
নহেত হইবে বন্ধ ফয়েজ তোমার ।
আর কিছু ছিনা বন্ধ কহি বারে বার ॥
হাট ঘাট গোল বন্দি কর না পছন্দ ।
মুছল্লির জুলমতে ছিনা হবে বন্ধ ॥
বসনা নিকটে তার বলি যে তোমায় ।
যার কাছে গেলে বুক বন্ধ হয়ে যায় ॥
জুব্বা, আবা, পাগড়ী, আর তছবি রেয়াকার ।
উপরেতে বানাউট ভিতরে আন্ধার ॥

سعدی رح

(সাদী (রহঃ)

بساقامت خوش که زیر چادر باشد

چون تاز کنی مادر مادر باشد -

(বাছা কামত্ খুশ্‌কে জেরা চাদার বাশাদ্ ।

চুঁ তাজ্ কুনি মাদার্ মাদার্ বাশাদ্ ॥)

চাদরের নীচে হেন পরীরূপ রাণী ।
সে চাদর খুলে দেখ মার মাতা নানী ॥
যার ঠাঁই গেলে জেকের খুলিবে তোমার ।
পাইলে এমন জন ভক্তি কর তার ॥
কহেন আছহাবে নবী এমত কালাম ।
তোমা মধ্যে নেক কেবা শুন তার নাম ॥

ثیحیح حدیث

(ছহী হাদীস)

وعن اسماء بنت يز يد - انها سمعت من رصول الله صاعم يقول الا انبئكم بخيار كم قلوا بلى يارصول الله صلعم قال خيار كم الذين اذا روٗا ذكر الله راواه ابن ماجه -

(ওয়াআন্ আস্‌মায়ে বিন্‌তে ইয়াজিদ আন্নাহা ছামেয়াতু মিন্ রাসুলাল্লাহে (সাঃ) ইয়া কুলু আলা আমবা'আকুম বেখেয়ারেকুম ॥

কালু বা'লা ইয়া রাসূল আল্লাহ (সাঃ) কালা খেয়ারুকুম আল্লাজিনা ইজারাআও জেকরুল্লাহা রাওয়াহু ইব্‌নে মাজা ॥)

খোদার জেকের হয় দেখিয়া যাহায় ।
সেই জন ভাল আর নেক জান তায় ॥
নিরবধি অজু আর কথা কহ কম ।
মন্দকে না জান মন্দ কেহুকে অধম ॥
অন্য মন, চক্ষু বদ করিবে না আর ।
তাহাতে যেকের বন্ধ হইবে তোমার ॥
রেয়া, কেনা হাছাদ আদি যতবুরা কাম ।
তাহাতে কলব ফয়েজ ঘাটে পরিণাম ॥
ছোল্‌ব করিলে ছিনা করিবে ছাফাই ।
অন্য ভাল নিজ বুরা হতে পারে ভাই ॥
নাছুতি আবেদ হইতে রহিবে কেনার ।

না জেনে নাছুতিগণ করয় এনকার ॥
জাহেরান সরাওলা হবে যত নর ।
নাছুতি তাহার নাম জানহে খবর ॥
আরেফের চার দরজা শুন মনকায় ।
নাছুত, মলকুত, জবরূত, লাহুত চৌথায় ॥

در خلاصة المز هب

(দার খোলাছাতুল মাজহাব)

در جه عرفان چهار اند ناسو تو ملكوت -
وجبووت ولاهوت ناسوت درجه شريعت -
است ملكوت در جه طريقت جبروت درجه -
حقيقت لاهوت در جه معرافت چون صوفيان -
از در جه ناسوت بگذر ندز تعد يلش -
لحاظن دار ند هور كشف چيز ها گويند وبعبور
درجهالى تقرب چيز ها يعمل رند
جيسا تفسير احمدى مين هى
امال ان الكلام فى اولياء فخارج عن البحث

(দারজায়ে আরেফান চাহারান্দ নাছুত্ ওয়া মালকুত ওয়া জাবরুত্ ওয়া লাহুত্ । নাছুত্ দারজায়ে শরিয়াত্ আস্ত । মালকুত দারজায়ে তারিকাত্, জাবরুত্ দারজায়ে হাকিকত্, লাহুত দারজায়ে মারফাত্ । চুঁ সুফিয়াঁও আজ দারজায়ে নাসুদ বা গোজারান্দ দরতাদিলাশ॥ লেহাজ নাদারান্দ হুর কাশ্‌ফে চিজহা গুয়েন্দ ওয়াবাআবুর দরজাহালি তাকারুফ চিজহা ইয়ামাল আরান্দ । যেয়সা তফসির আহাম্মাদি ম্যায় হ্যাঁ আম্মাল ইন্নাল কালামু ফি আউলিয়াই ফাখারাজ আনিল বাহছে ।)

আরেফ নাছুত যবে গুজারে নিশ্চয় ।
শরিয়াত তাদিল তার লেহাজ না রয় ॥
মকাশেফা হয় যবে তাহার উপর ।
নয়া নয়া অতএব কহে নিরন্তর ॥
বহুতর নিকটেতে হওনে খোদার ।
বিশেষ চিকন বাক্য করেন প্রচার ॥
তাতে কিছু শরা পরে নাহি হবে দোষ ।
তফছির আহাম্মদি এবে শুনরে মানুষ ॥
বাহেছেতে অলী বাক্য হয় না সামাই ।

কেমনে তাঁহার সাথে করিবে লড়াই ॥
আউলিয়ার কথা জান বাহেছ খারেজ ।
তেকারণে তার ঠাঁই রহিবে আজেজ ॥
এ সব কথার মর্ম্ম নাহি যার ঠাঁই ।
না যাও তাহার আগে এ বড় বালাই ॥
আর যদি এতেকাদে হইবে খলল ।
কভু না পাইবে ধন ঘটিবে জহল ॥

ফয়েজ আবদ্ধ হইলে তাহা খোলার কায়দা

যখন আবদ্ধ হবে ফয়েজ কাহার ।
পীর ঠাঁই মাফ আর কর আস্তাগফার ॥
রাবেতা করিবে অতি একিনের সনে ।
কুওতের ফয়েজ পরে বসিবে তখনে ॥
ছাফাই মানস সদা রাখহ সবায় ।
দেখিবে ছাফাই হয়ে যাইবে ত্বরায় ॥
কিন্তু যদি কেহ ভুত করিবে আছর ।
এমন মালুম হবে ছিনার ভিতর ॥
কুওত কাহারী জোরে ঢাল নিকলিয়া ।
নহেত মস্কিল হবে পিছেতে চলিয়া ॥

কোন আউলিয়ার কবর ও মাজার হইতে ফয়েজ পাওয়া

প্রথম ছাওয়াব কিছু করিয়া রেছাই ।
এক পাশে কবরের বসে যাওয়া চাই ॥
রাবেতা তাহার পরে করে কত কাল ॥
কলবে কলব সাথে মিলা এত্তেছাল ॥
যে প্রকারে মোরাকেবা মানস করিবে ।
বুঝিতে পারিলে তাহা সকলে পাইবে ॥
তাজল্লি আফাল কিবা আনফোছের হয় ।
বেলায়েত কোবরা কিবা উলিয়া নিশ্চয় ॥
ফায়েজে বেলায়েত কিবা ফায়েজে নবুয়ত ।
কুওত কাহারী কিবা হায়বাতে আজমত ॥

দরুদের নূর কিবা নূর কোরানের ।
হাদিছের নূর কিবা নূর কালামের ॥
আরশি ফরিশ কিবা নূর মোকামের ।
নবুওয়তের নূর কিবা নূর বেলায়েতের ॥
আরশি যদি ছাফ হবে মুখ পরিষ্কার ।
লিবে দিবে দোন জন চক্ষু রহে যার ॥
দুধ যদি বেশী হবে শিশু বেশী খায় ॥
শিশু যদি না খাইবে খেলাবে কাহায় ॥
কিন্তু যে মোর্শেদ চাই উছিলা আপন ।
নহেত রহিবে বন্ধ শুন দিয়া মন ॥
বৈঠা যদি ঠিক রবে শত হইলে দাঁড় ।
নৌকা রহিবে ঠিক চলিবে বাহার ॥
মাঝি যার ঠিক নাই দাঁড়ে করলে বল ।
ঘোরে ঘোরে মারা যাবে করে হিয়ব্বল ॥
অলী হইতে কোন ফয়েজ পাইবে যখন ।
তাহাই মোর্শেদ ফয়েজ জানহে আপন ॥
জলেতে মিশিলে জল জান এক জল ।
জোয়ারের জোরে পানি করে মহা বল ॥
যে জন আসল পীর নাহি রাখে ঠিক ।
পাবে না মতলব কভু খেয়াল অলীক ॥
মোর্শেদ এরশাদ বিনে জেয়ারতে যায় ।
নিজ ধন হারাইবে গেলে চাটগাঁয়
মক্কা গেলে কি হইবে হবে মক্করবাজ ।
তাজ বিনা তক্ত কোথা করলে শাহী সাজ ॥
এক ঘটে দুই বস্ত্র রহিতে না পারে ।
শুর্মাদানে লজ্জা বস্ত্র রাখে কি প্রকারে ॥

পৃথক পৃথক নূর ও তাজল্লি চিনন

নূর ও তাজল্লি কার হইলে জহুর ।
রহমানি শয়তানি তা চিনন জরুর ॥
রহমানি নূর আদি যে রঙ্গের হয় ।
খাতরাহীন সরল মন লাগিবে নিশ্চয় ॥
মনে যদি কল্পনা ছিনা হবে ভার ।
রস শূন্য লাগে কিবা হইবে আন্ধার ॥

দেখিলে এ সব নূর আস্তাগফার পড় ।
রাবেতা করিবে খুব হয়ে খবরদার ॥
রাবেতার গুণে তাহা পালাইবে দূর ।
হইবে তাজল্লি নূর করিবে জহুর ॥
জালালীর তাজল্লিতে হবে চমৎকার ।
ছেফাতি তাজল্লি কিবা জাত পাক সার ॥
বামে ও পিছের পানে যত নূর পায় ।
তাহার পরীক্ষা রক্ষা জান রাবেতায় ॥

জেকের করার নিয়ম

প্রথম কলব পানে করহ খেয়াল ।
পীরের কলব সাথে কর এত্তেছাল ॥
কলবে কলবে যদি রাখ মিলাইয়া ।
প্রদীপে প্রদীপে যেন উঠিবে জ্বলিয়া ॥
থর থর করে তায় হইবে জেকর ।
আল্লা আল্লা জপে যেন করহ ফেকের ॥
তার পরে রুহু সাথে রুহু মিলাইবে ।
এই মত ছেরে যদি জেকের পাইবে ॥
খফিতে জেকের পরে করিবে মোদাম ।
দশ লতিফাকে হেন করিবে তামাম ॥
আখফা আর নফছ পরে হাওয়া লতিফায় ।
আব আর আতশেতে খাকেতে চৌথায় ॥
এই দশ একে একে হইলে তামাম ।
ছুলতান আজকারে শেষে করিবে আঞ্জাম ॥
লতিফা সকল মেলে জেকের একবার ।
করিলে তাহারে কয় ছুলতান আজকার ॥
দশ লতিফাতে হয় অজুদ সামাই ।
রোম রোম কোন জাগা ছাড়া ছাড়ি নাই ॥
আল্লা আল্লা করে কিবা আল্লাহু জেকের ।
কিম্বা করে হু হু নাম সতত ফেকের ॥
নিরবধি ঝংকার মারে বদনেতে ।
চলিতে ফিরিতে কিবা জাগিতে শুইতে ॥
রোম রোম এক সাথে প্রভুকে বোলায় ॥
এক মুখে কত তুমি বোলাইবে তায় ॥
তুমি যদি শুয়ে রবে তারা না শুইবে ।

শয়নেতে নিজ নাম সকলে জপিবে ॥
প্রভুর নাম জপ তারা করিবে সদাই ।
তুমি যদি নিদ্রা যাবে তারা যাবে নাই ॥
তুমি যদি কর কভু মুল্লুক ভ্রমণ ।
করিবে তাহারা সবে প্রভু আরাধন ॥
সভাতে বসিয়া তুমি করিলে বচন ।
প্রভু সাথে লতিফারা করিবে কথন ॥
তুমি যদি ভুলে রবে ভুলিবে না তারা ।
তুমি যদি মরে যাবে জেন্দা লতিফারা ॥
এমন জেকের হয় সতত বন্দেগী ॥
না জানিলে এই ভেদ হইবে রান্দেগী ॥
এমন জেকের যার শোওনে তাহার ।
অন্যের বন্দেগী হতে বেশী মরতবার ॥
আম এবাদত এবে রাখহে কেনার ।
আলেম বন্দেগী নহে বরাবর তার ॥
আলেমানে এক মন হওন দুস্কর ।
নানাবিধ ধার্য্য সহ শত কলেবর ॥
আলেমান এলেম আদি নানা মাছায়েল ।
মাছলাতে কভু ঠিক রহিবে না দেল ॥
কিন্তু যদি মনোভাব রহিবে তাহার ।
সে ভাব জেকের খোলে বন্দেগীর দ্বার ।
শুন গো দয়াল বারি হইয়া দয়াল ।
পরিষ্কার করে সবে খুলে দেহ হাল ॥
উঠাও হুজ্জতি পরদা খুলুক নয়ন ।
অন্ধ জনে আচম্বিত দেখে লউক চাঁন ॥
পুথি দেখে পুথি লেখে কি বুঝিবে তায় ।
তাতে কি পাইবে মর্ম্ম হায় হায় হায় ॥
বিদ্যা না জানিয়া লেখে সে লেখা হারাম ।
নফছানি খাহেস এই নহে মনস্কাম ॥

মোর্শেদ গায়েব কি দূরে রহিলে ফয়েজ পাওয়া যায়

মোর্শেদ রহিলে দূরে কোন অলী জন ।
তাহাতেও ফয়েজ পাওয়া আছয় কারণ

রাবেতা করিবে যদি লতিফার সনে ।
পাইবে গায়েবী ফয়েজ যেমন ছামনে ॥
রাবেতা মিলান দেল ছুরত খেয়াল ।
পষ্টরূপে যদি তার খুলিবে জামাল ॥
পাইবে ফয়েজ আর জেকের খুলিবে ।
যথায় উরুজ তথায় ছবক পাইবে ॥
তাছাউফ কেতাবেতে করহ নজর ।
লেখে সাহা অলিউল্লাহ দেখ বেরাদর ॥

واذاغاب الشيخ عنه ليتخيل صورته فتفيد صورته ماتفيد صحبته

(ওয়াইজা গাবাসাঁইখু আনহু লাইতাখইয়ালু ছুরাতিহি
ফাতাফিদু ছুরাতিহি মাতাফিদু সাহব্বাতাহু)

দূরেতে রহিলে পীর খেয়াল ছুরত ।
পাইবে তাহাতে ফয়েজ নিকটে যেমত ॥
কিন্তু যদি তালেবান হইবে আল্লার ।
নহেত বিফল হবে কহি বারে বার ॥

খতমে মোজাদ্দেদী

ফজর নামাজ প'ড়ে যথায় বসিবে ।
কাবা পানে এক মনে বাক্য না করিবে ॥
দরূদ করিয়া জপ এক শত বার ।
পাঁচ শত জপ করে লাহাওলা আবার ॥

اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتى اليك واله وسلم

(আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাঁইয়্যাদিনা মোহাম্মাদি ওয়াসিলাতে ইলাইকা ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম ।)

لاحول ولاقوة الابا الله

(লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্)

তার পরে শতবার পড়িবে দরূদ ।
জেকের ফেকেরে পরে রহিবে মৌজুদ ॥
এশা বাদে দরূদ পড়া পাঁচ শত বার ।
নাগা নাহি হয় কভু খুব খবরদার ॥

জেকের করিবার সময় তালেবানের যে হাল হয় তাহার কতেক হাল ও কৈফিয়ত

তাওয়াল, লাওয়ামে, অজদ ও তাজ্‌রিদ ।
মোহ, ছোহ, জজ্‌বা, ছোকোর ও তাফরিদ ॥
এসব জজ্‌বার নাম শুন মন কায় ।
চল্লিশ কেছেম হবে জজ্‌বা পরায় ॥
প্রত্যেক জজ্‌বাতে হয় প্রত্যেক তাছির ।
বদনেতে হাল তার হইবে জাহির ॥
শরীর গরম কভু বড় হবে দম ।
চেহারা মলিন কভু রবে না শরম ॥
হুতাস হইবে কভু চক্ষে বহে জল ।
বদন কম্পিত কভু করে টল টল ॥
গভীরতা সুরে কভু করিবে আওয়াজ ।
বেখোদ হইয়া চিখে পড়ে যেন বাজ ॥
নাচ কুদা করে কভু হইয়া বেহুঁশ ।
তাতে কিছু সরা পরে না হইবে দোষ ॥

سيدى رح

(শাদী রহঃ)

مكن عيب درويش مد هوش ومست
كه غرقست ازان مى دند پاودست

(মিকোন আয়েব দরবেশ মদহুস ওয়ামাস্ত ।
কে গরকাস্ত আজইমি দান্দ পাওদস্ত ॥)

আয়েব না কর কেহ মদহুশ জনের ।
হাত পাও মারে হালে মস্তির খাতের ॥
মাটিতে পতন কভু কভু খাড়া রয় ।
মরা হেন কভু যেন রহিবে নিশ্চয় ॥
যাহার উপরে হবে গোলবার তাছির ।
মগলুব তাহাকে কয় বড়ই অস্থির ॥
নবী অলী আছহাব মহেব খোদার ।
তাহারই হালে মগ্ন ছিল চমৎকার ॥
বেহুঁশ হইত নবী আছহাব জবর ।
হাছানাতুল আরেফিনে করহ নজর ॥

করিলে খোদাই দাবি হালে কথা কয় ।
করে যদি হাল হীনে কাফের নিশ্চয় ॥
হাল যার মাল তার হালে মাল পায় ।
হালেতে আছহাব কত কেহ খুন খায় ॥
হালাত অমূল্য ধন উত্তম কারণ ।
আওয়ারেফ কেতাবেতে কর দরশন ॥
যুগফল এক হালে খুলিয়া যাইবে ।
ছেরাতুল মোস্তাকিমে দেখিয়া লইবে ॥

রুজি কম হইবার কারণ

ঘরে খায় বাহিরে পাও রাখে যেই জন ।
উন্নাতলে ঘরকোণে করিলে ভক্ষণ ॥
তাম্বু ডুবিবার কালে যদি কেহ খায় ।
খায় আর বাক্য করে হাটিয়া বেড়ায় ॥
চাল খড়ি হতে খেলাল করিলে আবার ।
বাসি শয্যায় কোন জন করিলে আহার ॥
না পাকিতে খায় যদি না করিয়া কুলি ।
রজনীতে ঘর হ'তে কুড়াইলে ধূলি ॥
ঘর হ'তে ছিটা পানি বাহিরে ফেলায় ।
পাতিল হইতে যদি নারীগণ খায় ॥
বারে বারে মুখে দেয় চাউল কিবা খই ।
খাই খাই ব'লে আর কিছু খে'য়ে লই ॥
বাসনেতে বাসি পানি মুখ ধোয়া থালে ।
খাম খাম বলে খায় রাখে কিছু গালে ॥
রাত্রিকালে আরশি কাঁঙ্গি অন্ধকার ঘর ।
শামকালে ঘরে যদি না দেখায় পশর ॥
মাঝ থালে হাত দিয়ে প্রথমেই খায় ।
যত খায় তত চায় পায় নাহি আয় ॥
ফুঁক দিয়া গরম খানা খেও না কখন ।
আকাঙ্খা না বেশী কর খে'তে কদাচন ॥
পথ মারা কাঁটা দেওয়া, আইল খোদা আর ।
নিজ বুকে কপালেতে কাঁটা চোবে তার ॥
হইবে রেজেক কম ঘটিবে অসুখ ।
অলীগণ দিলে দোয়া হবে চির দুঃখ ॥

দুঃখ পেয়ে শাপ দিলে মুনি মহাজন ।
হইবে ভুবন দুঃখী ঘটিবে মরণ ॥
পথিকেতে পায় দুঃখ কাঁটা বসে পায় ।
রক্ত বিন্দু কাটা ঘাতে পড়িবে যথায় ॥
হইবে কহর খোদা সেই জাগা পরে ।
কলিকালে দুঃখী তাতে দেখিবে সবারে ॥
পরা বস্ত্র হ'তে কভু নাহি মোছ মুখ ।
প্রদীপ না কর গোল আর দিয়া ফুঁক ॥
স্বামীর ছায়ার পরে যদি রাখে পদ ।
হইলে শতেক পদী জানিবে আপদ ॥
মুরব্বির ছায়া পরে পদ রাখা নাই ।
এ বড় বিষম কথা দারুন বালাই ॥
মুরব্বির ঘোড়া জোড়া তৃণ আদি যত ।
ইস্তিমাল নাহি কর মণি হ'লে শত ॥
নিজ জুঠা মুরব্বিরে খেলাও না আর ।
খাও যদি তার জুঠা ভালাই তোমার ॥
গুরুজনের হাতে হাত দিও না কখন ।
পার যদি পদধুলি করিও সেবন ॥
এক আনা আয় হ'লে ব্যয় দুই আনা ।
দুঃখী হইবার এই প্রবল নিশানা ॥
গুরুজন দিকে কভু থুক না ফেলিও ।
না খেলায়ে তারে আর নিজে না খাইও ॥
প্রথমে ছালাম কর যদি তুমি পার ।
অহংকারী কথা নিট কভু নাহি কর ॥
গিবত, চুগলী, মন্দ সদা রাষ্টহাস ।
পর মন্দ গোপনীয় না কর প্রকাশ ॥
খাড়া হ'য়ে পায়জানা নাপাকিতে পরা ।
কোরান কালাম যাহা নাহি যায় ধরা ॥
যাহাকে মানিবে গুরু মন্দ নাহি জান ।
হইলে শতেক মন্দ নিজে মন্দ গণ ॥
পীরের উজান কিম্বা সমান সমান ।
নাহি চল আজ্ঞা হ'লে রাখিও সম্মান ॥
মধু বাক্য ধীর তর কহিবে সদায় ।
প্রণয়ে রাখিয়া কথা কহিবে সবায় ॥
খাইবে খোরাক কম রেজেক বাড়িবে ।
খাওয়া কম রোখদম হায়াত পাইবে ॥

মুরব্বি বচন

গদ্য– দিসা ভুলায় পাইলে-চাদর কি কাপড় উল্টাইয়া পরন। পাও পিছলনে- যার সঙ্গে অত্যন্ত দুস্তি তার নাম স্মরণ করণ; "মোরাক্কা শরিফে" দেখ। নতুন বৌর পদ ধোয়া পানি নওশার ঘরে ছিটান; সরাঃতল ইসলামে আছে। ভুত পেরেতে ধরিলে আজান, কাপড় টুপী উল্টান, নতুন কুটম্বকে মিঠা বস্তু খাওয়ান। মেস্কাতে দেখ– ঘরসুতের দড়ি, বেত, কাজে লাগান নিষেধ। ঢেকির পূর্ব্বরোখ মানা। চুলার উত্তর মুখ মানা। সূর্য্যমুখী বাড়ী মানা। বাড়ীর গলন দক্ষিণ রোখ মানা। গায় ঝুরিয়া পড়ন দোষ। কাপড়ের আঁচল উড়াইয়া চলন নিষেধ। দপ দপ চলা মানা। নিশ্বাস বড় দোষ। শনি মঙ্গলবারে প্রাত, সন্ধ্যা, দ্বিপ্রহর দোষণীয়। কোন দোয়ার সময় চিড়াফাড়া কাপড় এবং খালি মাথা ও জুতাহীন ভাল। পীর বোজর্গের গোরস্থানে খালি পদ চলা ভাল। গরুর ঘরে ঘোড়া বান্ধা নিষেধ। মাটিতে আঁক দেওয়া মানা। খামাখা হাত পা হিলান মানা। ছায়ার উপর কুলি ফালান নিষেধ। ভূমিকে লাথি দেওয়া দোষ। কাহারো উপর দিয়া দেওয়া নেওয়া দোষ। খামাখা লাঠিতে টোকাইয়া বাজান দোষ। এক কাপড় দুইজনে পরণ দোষ। সকালে বাড়ী ঝাড়ু না দেওয়া দোষ। থালাবাসন না মাজন দোষ। হস্তিনী নারী দোষ। বেড়ায় উল্টা বান দেওয়া দোষ। কোন জীব সঙ্গমের সময় মারণ দোষ। নিজ বাড়ীর পাখী শিকার করা দোষ। ভুতুম পেঁচা বাড়ীতে জায়গা দেওয়া বা পোষ করা দোষ। সকালে বানর বা কুলোকের নাম লওয়া দোষ। লাল মেঘ দেখিয়া কিছু না পড়ন ভাল না। ইহার দলিল মেস্কাত শরীফে দেখ। লম্ফ দিয়া খাল নালা পার হওয়া ভাল না। পিয়াজ রসুনের ছিলকা চুলাতে জ্বালান ভাল না। পানিতে নামিয়া কিম্বা পানিতে প্রস্রাব করা ভাল না। কাকের বদ আওয়াজ ভাল না। তারুয়া পাখীর কেচকেচিয়া শব্দ দোষ। পায়ের বন্ধন দাঁতে খোলন নিষেধ।

ওলা উঠা ও গুটির রোগীর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকা ভাল নয়। পা ধোয়া বাচা পানি দিয়া মুখ ধোয়া বা কুলি করা ভাল নয়। বন্দ ছাড়া ঘর দোষ। স্ত্রী লোকের গদ গদিয়া আওয়াজ ভাল নয়। নবী অলীর নামে নাম রাখিয়া ঐ নামকে অপরিষ্কার মতে বোলান দোষ। যথা নামকে অবহেলা করা দোষ। এমন কি শয়তানের নামকেও ঠিক করিয়া বোলান ভাল যাহাতে "মোখারেজ" ঠিক হয়। একজনের জুতা অপরজনে পরন ভাল না। উল্‌টা ঘোড়ায় চড়া দোষ। কলম দোয়াতের মধ্যে খাড়া রাখা নিষেধ। নাপিতের আয়না দেখা ও নাপিতের ঘরের দ্বারে বসিয়া খেউরি হওয়া গরিবির লক্ষণ। মঙ্গলবার দিবসে নখ কাটিলে শারীরিক সুস্থ্যতা নষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্তে নানা প্রকার রোগ শরীরে প্রবেশ করে। ঐ দিবসে গোছল করিলে হায়াত কমিয়া যায়। "অকুলে অশরা" কেতাব ও "মোখজানোর রেজেক" প্রভৃতি কেতাবে দেখুন। হাট বাজারে যথা নাপিতেরা খেউরি করিয়া চুল গয়রহ ঘাস কুটার মত ফালাইয়া রাখে তথা খেউরি হওয়া ভাল না। ঘরের মধ্যে এক প্রকার সাপ থাকে, ঘনিয়া সাপ বলে তাহাকে এবং সাপনি-সাপ মারণ নিষেধ। "মেস্কাতে" লিখা

আছে। ঐ ঘরের সাপকে তিনবার যা, যা, বলিয়া কহিবে তাহাতে যদি না যায় তবে তাকে মারিবে। মাকড় মারণও নিষেধ আসিয়াছে, কারণ যখন নবী ছাহেব গুহার মধ্যে পলায়ণ করিয়াছিলেন তখন মাকড়ে আস দিয়াছিল এবং তাহার উপর কবুতর বাসা করিয়া ডিম দেওয়াতে কাফেরগণ ফিরিয়া যায়। "মোজারেবাতে দায়রবিতে" দেখুন– রজনীতে গরু মহিষের সিঙ্গে দড়ি লাগাইয়া বান্ধন দোষ এবং সকালে গোবর না ফালান দোষ। পায়খানাতে ছেফ কফ ফালান দোষ। দোষী গরু ঘোড়া পালন দোষ। নেড়ে গাভী মাত্রই ভাল না।

বদ আওয়াজকারি কুকুর বাটীতে রাখা ভাল না। মুরগি মোরগের মত বাক দিলে তাহাকে পালন ভাল না। মোরগ অসময় বাক দেওয়া দোষ। পুস্কারিণীর জলে কিম্বা তদরূপ কোন বাঁধা জলে কফ থুক ফালানো দোষ। বহুদিনের পালের গাভী জবেহ করা ভাল নয়। রজনীতে বিড়ালকে ঘর সোহাগি বলা ভাল।

ফকির এক প্রকার নহে

(ত্রিপদি)

শতরূপে শত অলী, জনে জনে এক বলি,
মানসেতে একই সকল।
এক ভাব নিরাঞ্জন, প্রভুর প্রত্যাশিগণ,
তাতে মন সদাই চঞ্চল ॥
তাতেই বৈরাগী বেশে, ফেরে কেহ দেশে দেশে,
করে কেহ কাননেতে বাস।
বিরহ হইয়া পষ্ট, নফছেরে দেয় কষ্ট,
লোক ঠাঁই হয় অবিশ্বাস ॥
দাড়ি চুল বড় রাখে, তাতে দুঃখ পায় মুখে,
ছাই ভস্ম মাখে কেহ গায়।
কুড়ালি কান্ধের পরে, জট কেহ রাখে শিরে,
কেহ অঙ্গে শিকল লাগায় ॥
জানানা পোষাক গায়, কান্দে কেহ হায় হায়,
পায়ে রশি ঝোলে ডাল পর।
কেহ রহে নিরবেতে, বাক্য নাহি কার সাথে,
কেহ থাকে বানায়ে কবর ॥
মালামতি দেখ যারে, রোজানামাজ নাহি পড়ে,
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ।
তাজকেরাতোল ফোকারেতে, লিখিয়াছে পাতে পাতে,
তাতে সন্ধে কর নিবারণ ॥

تر خمة در عوارف

(তরজমা দরআওয়ারেফ)

واین طائفه ازجحت عدم ریا باصلا متیه مشابحت دار ندوفرق میان
سان انست که ملامتیه بجمیع فصالل ونوافل تمسك جویند ولیکن انرا
ازنظر حالق پنها دارند اماقلند ریه ازحد فرائض در نگذ ارند ویا
اظهار واخفاء اعمل ازنظر خلق مقید نباشند -

(ওয়াই তোইফা আজজিহাত আদম রিয়া বাসালা মুতাইয়া মুসাবাহা দারান ওয়া ফরক মিয়ানে শানে আনাস্ত কে মালামাতেয়া বাজামায়্যি ফাসাল্লিল ওয়ানাফেল তামাস্সাকা জোয়েইন ওয়ালা কিন আলা আজ নজরে হালাক পানহাদারান্দ আম্মা কলন্দরিয়া আজহদ্দে ফরায়েজ দর নিগাদারান ওয়াইয়া আজহার ওয়া আখফা আমাল আজ নজর খোলক মুকাইয়েদ না বাসান্দ)।

কলন্দরি গোর যারা, রেয়া হ'তে পাক তারা,
মেছালেতে মালামতি যেন।
ফরজ নফল যত, মালামতি আছে রত,
আমল আদি করেন গোপন।
কিন্তু যারা কলন্দরী, ফরজ লইছে পড়ি,
ছুন্নতেতে রহে তারা দূর।
নফল ছুন্নত যত, করে নাহি অবিরত,
ঢোড়ে খালি হুজুরের নূর।
শত শত শত ভাবে, আছেন ফকির ভবে,
রঙ্গে রঙ্গে যেমন খোরাক।
একই পেটেতে যায়, নয়া নয়া স্বাদ পায়'
বলিষ্ঠতা একই বেবাক।
মাদারি ফকির যারা, ঝান্টা নিয়া নাচে তারা,
মোতাসাবা চাহে খালি হাল।
কেহত পাগল ন্যায়, চলে ফেরে নাচে গায়,
নানা মত মজনুন মিছাল।

حدیث

(হাদিস)

واذکر الله حتی یقول انه المجنون

(ওয়াজকুরুল্লাহ হাত্তা ইয়াকুল্ আন্নাহুল মাজুনন)

খোদার জেকেরে তয়, লোকে যে পাগল কয়,
কর তুমি এমন প্রকার।
মজ্জুব মহবুব বলে, দেখহ নবীর কৌলে,

হাদিছেতে ফরমায় আবার।
কত চোর এই বেশে, রুজি করে দেশে দেশে,
তাতে জানে ফকির খারাব।
তাতে কত মূর্খ চয়, সবাকারে মন্দ কয়,
কভু যেই নাহি জানে ভাব।
ফকিরে ফকির চিনে, মোল্লা লোকে কিবা জানে,
জানে যাহা কেবল গিবত।
না জানিয়া লেখে পুথি, তাতে কি ফকীরের ক্ষতি,
এই মানেতে রহে ছালামত।

شهید خنجر الفت هواهون -
سالمت هی سالمت هی سالمت
جماعت مین پریر ویونکی تجهکو -
امامت هی امامت هی امامت
مگر ناچی کوقربان تجه قدم پر -
ندامت هی ندامت هی ندانت
سارج اب عشقکی درپنکا صیقل
ملامت هی ملامت هی ملامت
مین وه نهین هون که تجهه بت سی دلمیر ایهر جا
پهرون مین تجهسی تومیرا خداپهرجا
الهی وه نه پهری جس کی غم مین مرتاهو
بلاسی حلق پر کوخنجر جفایهرجا
یهر کی زمانه یهر کی اسمان هواپهر جا
بتونسی نه پهر ون همسی کر خدا پهرجا
وه صنم حال میرا کیا جانی
هو مین کسفکر مین خدا جانی
هم توروتی هین هنستی هین
اغیار قدربلبل کی زاغ کیاجانی
نهٹه چاٹا کر وه ساری عمر
لب شرین کاجومزا جانی

سنکی احوال میرا کھنیلگا
ایسی جھگرا میرا بلا جانی
ایسی سفاکسی ذرةیارو
خون عاشقان جوخنا جانی
کب حق پرست زهد جنت پرست هی
حورن پرمووها هی یاشهوت پرست هی
دل صاف هوتو چاهی معنی پرست هی
أینه خان صاف هی صورت پرستهی
جززلف توسوچهتا نهین ایمر ده دل تجهی
صفا کیش نحی که ظلمت پرست هی

(শাহিদ খঞ্জার উলফাত হুয়া হোঁ
ছালামাত্হি ছালামাত্হি ছালামত্ ।
জামায়তমে পরিরো কি তুঝ্কো
ইমামত্হি ইমামত্হি ইমামত্ ।
মাগার নাচিকো কোরবান তুঝ কদম পর
নেদামাত্হি নেদামাত্হি নেদামত্ ।
সেরাজ আব এস্কেকি দার পাঁকা ছিকাল
মালামাত্হি মালামাত্হি মালামাত্ ।
ম্যায় ওহ্ নেহিহুঁ কি তুঝ বাত্ছি দিল মেরা ফির যায়ে
ফেরো ম্যায় তুঝ্ছে তু মেরা খোদা ফেরযায়ে
এলাহিও না ফেরে জিসকি গাম্মে মারতাহু
বালাছে হালাক পর গো খাঞ্জার জাফা ফির যায়ে
ফিরে জামানা ফিরে আসমা হাওয়া ফির যায়ে
বাতু'ছে হাম না ফিরু হামছে গার্ খোদা ফির যায়ে ।
ওছানাম হাল মেরা কেয়া জানে
হু ম্যায় কিছ ফিকেরমে খোদা জানে ।
হামতো রোতেহি, হাছতেহি
আগিয়ার কাদার বুল বুল কি জাগ কেয়া জানে
হো নাটা চাটা করে ও ছারি উমর
লাব শিরিনকা জো মজা জানে
শুনকে আহওয়াল মেরা ক্যাহ্নে লাগা
এয়্যেসে ঝাগড়া মেরা বালা জানে

এয়্যেসে ছাফ্ফাকিছে ডরো ইয়ারো
খুন আশেকান জো খানা জানে
কাব হাক্ পারাস্ত জাহিদ জান্নাত পারাস্ত হ্যাঁয়
হুরোঁ পার মারোহা হ্যাঁয় ইয়া শাহুত পুরাস্ত হ্যায় ।
দিল ছয়াবহো তু চাহে ম্যায়নি পুরাস্ত হ্যাঁয়
এহ্খানা ছয়াবহ্যাঁয় ছোরত পুরাস্ত হ্যাঁয়
জোঁজ জালফা তো ছুস্তা নেহী এ মুর্দাদিল তুজ হ্যাঁয়
ছবফা ক্যায়েস নেহী কে জুল্মাত্ পুরাস্ত হ্যায় ।)

আবেদ গোলাম আশেক আজাদ

গোলামের গোলামিতে নাহিক সন্তোষ ।
ঠেকিয়া গোলামী করে হবে ব'লে দোষ ॥
নহে যদি পারিতেন করিতে বাদশাই ।
মারিত বাদশার ঘাড় ছাড়াছাড়ি নাই ॥
তেমনি আবেদগণ করে এবাদত ।
পাপ ডরে আদা করে ফরজ ছুন্নত ॥
ক্ষমতা রহিত যদি কখন তাহার ।
লইত খোদার কষ্ঠ নফ্ছ দুরাচার ॥
গুণ যদি নাহি হ'ত কিসের এবাদত ।
হুকুমের তাবেদার আবেদ তাবত ॥
আশেক মাশুকে ভেদ আছে পুশিদায় ।
গোলামে কছুর শুধু সেরাজ কোথায় ॥
আশেক মাশুক করে আরাম যথায় ।
গোলাম নওকর রহে চৌকিদার তায় ॥
আশেক মাশুক রহে যেই স্থান পর ।
গোলাম কোথায় করে তাহাতে নজর ॥
গোলামে নজর করা তাহাতে হারাম ।
প্রকাশ করিলে ভেদ ভরিবে গুদাম ॥
গোলামেতে সরমগাঃ রাজাকে দেখায় ।
তখন লইবে কল্লা এই মহা দায় ॥
মাশুকে দেখায় যদি বুঝিবে আলাপ ।
রঙ্গ পরে ঢঙ্গ করে লাফ পরে লাফ ॥
আশেকেতে চাহে সদা মাশুকের তরে ।
শতেক হাশরেতে তার নেগা নাহি করে ॥

নজর করেন সদা মাশুক উপর ।
হায় কি বিষম ভাব ভরে না নজর ॥
এহেন প্রেমের ভাবে প্রভু করতার ।
গাথিল প্রেমিক গলে প্রনয়ের হার ॥

حديث قدسى

(হাদিসে কুদসী)

الانسان سرى واناسره

(আল ইনসানু সির্‌রি ওয়ানা সির্‌রুহু)

মানুষ আমার মর্ম্ম, মর্ম্ম আমি তার ।
তাতেই খলিফা বলে আদম প্রচার ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'আলা)

انى جاعل فى الارض خليفه

(ইন্নি জায়িলুন ফিল্ আরদি খলিফা)

تحقيق گرد اننى والاهون زمين مين ايك خليفه

(তাকিক গর্‌দে ইন্নানি ওয়াইল্লাহু জমিনমে এক খলিফা)

সিংহাসন যোগ্য হ'লে খলিফা নিশ্চয় ।
বসিবে না সে আসনে সমশ্রেণী তয় ॥
তাতে সমরূপ চাই খলিফা কারণ ।
মানুষে অহুঁসে কোথা হইবে মিলন ॥

حديث

(হাদিস)

خلق الله ادم على صورته

(খালাক্বাল্লাহু আদামা আলা ছুরাতিহি)

হাকিকতে একরূপ আদম খোদার ॥
ভাবুকের প্রণয়েতে সেইরূপ সার ॥
সেই ভাব মিষ্ট খাদ্য করিছে চাবণ ।
চাবাইছে তবু সেই চাহিছে মিলন ॥
সে ভাবে মহেব যেই খোদার প্রেমিক ।

ভাবের করঙ্গ হাতে মাগে খোদা ভিক ॥
দ্বারে দ্বারে ফিরে সেই শহর নগরে ।
মুঠি মুঠি ভিক লয় করঙ্গা ভিতরে ॥
যেই যাহা দেয় লয় মুসুর মটর ।
এক মুঠ চাউল চিনা মিশাল কঙ্কর ॥
ধূলা বালি চিটা মিস জোওয়ার বাজাল ।
তিল তিশী মুগ মাস পারা ছোলা ডাল ॥
প্রেমের বিরহ ভিক তুম্বার ভিতর ।
লইয়া ভ্রমণ করে শহর নগর ॥
অলোভা হইয়া লোভী হ'ল মহাদায় ।
প্রদানিল ভিক যিনি তারে ভিক চায় ॥

খোদা লোকের সনে কেমন করিয়া হইতে পারে

কেহ বলে খোদা যদি লোক সনে রয় ।
মরণ জীবন নাকি লোক সনে হয় ॥
তাহার উত্তর এই শুন বন্ধুগণ ।
বুঝিতে পারিবে র'লে বাতেন রৌশন ॥
তৌহীদ মুল্লকে যার গরম বাজার ।
বুঝিতে পারিবে নহে সব অন্ধকার ॥
কিন্তু তার এক বিন্দু কহিয়া জানাই ।
কোরানেতে কহিয়াছে দেখ পাক সাঁই ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তা'য়ালা)

وهو معكم اينما كنتم

(ওয়াহুয়া মাকুম আইনামা কুন্‌তুম্)

সকলের সনে খোদা আছেন একেলা ।
কেমনে আছেন তিনি শুন এই বেলা ॥
দেখহ আগুন যত পৃথিবী মাঝার ।
একই আগুন বটে সয়াল সংসার ॥
পানি যত এক পানি সকল জাহানে ।

শীত কি বাতাস আদি ভিন্ন কোন স্থানে ॥
প্রকাশ্য ভাবেতে আছে যতেক আগুন ।
দীপ কি মশাল আদি চুলাতে চৌগুণ ॥
গুণ ভাগ আগুনের নাহি পরিমাণ ।
অল্পেতে অনেক হয় আকাশ সমান ॥
দেখা ভাবে আছে আর অদেখা জাগায় ।
গোপনে সকল ঠাঁই আছে পুসিদায় ॥
কাষ্ঠে কাষ্ঠে কোন জন করিলে ঘর্ষণ ।
গরম হইয়া অগ্নি নিকলে তখন ॥
জল পরে জোরে যদি আঘাত লাগিবে ।
আচম্বিতে সেই ঠাঁই আগুন উঠিবে ॥
জল তলে অগ্নিময় একি চমৎকার ।
মীন পেটে জীর্ণ করে আগুনে আহার ॥
দেখ যারে সৃজিয়াছে প্রভু নিরাঞ্জনে ।
প্রকাশ্যে গোপনে আছে সকল জাহানে ॥
যে জন সৃজন করে আগুনের তরে ।
লোক হৃদে সেই কিহে থাকিতে না পারে ॥
আব, আতস, খাক বাদে লোকের শরীর ।
কেহ নাহি মরে শুন রৌসন জমির ॥
যখন মরেন লোক নিকলে পরাণ ।
আব, আতস, খাক, বাদ যায় নিজ স্থান ॥
শরীরের মাটি মিশে যায় মাটি সাথে ।
আব, আতস, চ'লে যায় আপনা জাগাতে ॥
কেহ না মরিল তারা এক তত পর ।
পরাণ মরে না কভু সদাই অমর ॥
মরে না জীবের দেহ যবে কদাচন ।
খোদায় মরিয়া যাবে একথা কেমন ॥
না জানিয়া লেখে পুথি বরসন গালি ।
অন্ধজন ধুন্দে কহে মুখের পাঁচালি ॥

শবে বরাত ও কদরের নামাজের নিয়ম

গুজরিলে চৌদ্দ দিন বৈকালে নিশ্চয় ।
শাবানের চান্দ মাঝে শবে বরাত হয় ॥
বৎসরের ফলাফল যত হবে যার ।

পাইবেন সকলেতে সে রাত মাঝার ॥
যে জন রাখিবে হুশ পুরুষ হইয়া ।
পাইবে পরম ধন রহিলে জাগিয়া ॥
হাজের রহিবে যদি থাকিয়া জাগনে ।
প্রভুর নিকটে রুজু রবে না স্বপনে ॥
নিদ্রাই বিষম বালা ভুল সমুদয় ।
ভুলে রয়ে ঘড়ি কালে চির দুঃখী হয় ॥
জানা ভুলে ভুল জন্ম হইবে যাহার ।
নিদ্রাই বিষম ভুল ভালাই কি তার ॥
যে নর জাগনে রবে ভুল যাবে দূর ।
দিশা ভুল পালাইবে পাবে নিজ পুর ॥
আপন আসন পরে রহিবে জাগিয়া ।
স্মরণের হালে দিবে রাত কাটাইয়া ॥
এক রাত ওয়াদার করহ জাগন ।
এক রাতে প্রভু নাকি দিবে শত ধন ॥
এক রাত জেগে রহ নিদ্রা নাহি যাও ।
জেকের ফেকেরে রাত বসিয়া কাটাও ॥
জাকের খোদার নাম করিবে স্মরণ ।
আবেদান এবাদতে রহিবে আপন ॥
আশেকান এস্করসে রজনী যাপন ।
করিবে ভাবুক রসে প্রভুর স্মরণ ॥
নামাজ পড়িবে যেই পড়িবে নফল ।
নফল নিয়ত চাই নহে গণ্ডগোল ॥
দোরেকাতী হয় কিবা চার রেকাতি হয় ।
যে ছুরা রহিবে মনে পড়িবে নিশ্চয় ॥
নহে পড় কুলহুআল্লাহ হরেক রেকাতে ।
তিন পাঁচ সাত নয় বেজোড় যাহাতে ॥
কিম্বা কোন দোয়া দরুদ তছবী তেলাওত ।
যে যাহা জানুক পড়ে বসিয়া তাবত ॥
এ প্রকার কদরেতে এবাদত কর ।
গরজ রাখিবে মনে কাহিলীকে ছাড় ॥
রমজানে একুশা রাতে প্রথম কদরে ।
তেইশা পঁচিশা আর সাতাশেতে পড়ে ॥
উনত্রিশ তারিখেতে কদর আছয় ।
সাতাইশ তারিখ পরে এজমা সবে কয় ॥

সেই দিন হ'তে পারে আসল কদর ।
অতএব সেই রাতে রাখিবে খবর ॥
নফল বলিয়া খালি বান্ধিবে নিয়ত ।
কদর বরাত আদি নফল তাবত ॥

চাঁন্দ দেখিবার নিয়ম

কিঞ্চিৎ উপরে চাঁন্দ দেখিলে সন্ধ্যায় ।
দো-এক ঘড়ি উঁচা পরে যদি দেখা যায় ॥
তবেত জানিবে চাঁন্দ ঐ রাতের হবে ।
যে সন্ধ্যাতে চান্দ দেখ সেরাতে ধরিবে ॥
আর যদি দেখ চাঁন্দ উপরে নিশ্চয় ।
চার, ছয় দণ্ড কিবা পহর আদি হয় ॥
তবে সেই চাঁন্দ জান উদিত সে দিনে ।
লোকে কিন্তু দেখে নাই ধুপের কারণে ॥
চাঁন্দের তাছির আর চাঁন্দের কারণ ।
আকাশেতে কোন হেতু রবে না বারণ ॥
চাঁন্দের দৌড় আর হিসাব লগন ।
যার যে বুরুজ মাঝে হইবে পূরণ ॥
ইহাতে সন্ধান মর্ম্ম আছে পুসিদায় ।
বক্তে যার আছে তার আপনি মিলায় ॥
ইহার প্রত্যাশী যেই উচিত তাহারে ।
আগে পরে দুই দিন শবে বরাত করে ॥
কদর এমনি ধারা হিসাব সকল ।
তালেব বুঝিয়া ভেদ করিবে আমল ॥

এস্তেখারা

ياخنير

(ইয়া খাবির)

"ইয়া খাবির" শতবার পড় সাবধানে ।
বেশ কম নাহি হয় রাখ খুব মনে ॥
কিন্তু আস্তাগফার আগে পড় দশবার ।
দশ বার দরূদ শরীফ পড়িবে আবার ॥
খোদার নিকটে অতি কাতর হইয়া ।
দোয়া মাগ মনস্কাম নিয়ত করিয়া ॥

যে কাম করিতে চাই শুন পরওয়ারে ।
ভাল বুরা নেকবদ জানাও আমারে ॥
এক রাতে দুই রাতে তিন রাতে হয় ।
সাত রাতে খোদা চাহে দেখিবে নিশ্চয় ॥
শোয়া মাত্র কোন জন দেখে আচম্বিতে ।
ইস্তিমাল করে যেই দেখিবে ত্বরিতে ॥

প্রভুর খেলা

খেলে মগ্ন মন সদা চিন্তা কিছু নাই ।
কে খেলে এমন খেলা বলিহারি যাই ॥
এই সে মাবুদ খেলা খেলনা লইয়া ।
খেলিছে রঙ্গের খেলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ॥
খেলনা গড়িল কত কতই চুরিল ।
তবু কি রঙ্গের খেলে সাধ না পুরিল ॥
তৈয়ার খেলনা যবে চোরহ আবার ।
খেলনা বিরহে কত করে হাহাকার ॥
ভাঙ্গিয়া পাঁজর অস্থি হয়ে চুরচুর ।
তখন বিনয় করে চরণে প্রভুর ॥
আঁখি নিরখিয়া করে কতেক রোদনা ।
দুঃখেতে কাতর হ'য়ে মাটির খেলনা ॥
মাতাপিতা শু'নে তার বিনয় বচন ।
অসীম রোদন করে ভাই বন্ধুগণ ॥
রক্ষা কর রক্ষা কর সর্ব্বজনে কয় ।
তবু না তোমার মনে দয়া প্রকাশয় ॥
কতই বেতাবে তারা ক'রেছে রোদন ।
তবু না হইল দয়া না কর শ্রবণ ॥
শত শত মহানর এই ভূমিতলে ।
পতিত হইল তারা কাঁদিয়া সকলে ॥
কাহার বিনয় যদি না করিলে শ্রবণ ।
অখিল ভুবন কেনে কহে জগজ্জন ॥
যখন আমার পীর চলে নিজ দেশ ।
কত না কাঁদিনু তোরে দিয়া উপদেশ ॥
কত না দুঃখেতে আমি কাঁদি জারেজার ।
তবু কি করুণা তুই শুনিলি আমার ॥

কাড়িয়া লইয়া গেলি দরিদ্রের ধন ।
কাড়িতে কি এত খুশি হয় তব মন ॥
শিশুকালে, ছিল যবে মাতা দয়াবান ।
তখন কাড়িয়া নিলি দুঃখীর পরাণ ॥
তখন কি তোর ঠাঁই নাহিক কান্দিনু ।
কাননে, পর্ব্বতে মাঠে নাহিক ভ্রমিনু ॥
পাগল হইয়া আমি ফিরি বনে বনে ।
হায় প্রভু সেই দুঃখ নাহি তব মনে ॥
পিতাজন আত্মগণে করিলি বেগানা ।
আত্মজন বন্ধুগণ কেহই কার না ॥
এক দুঃখে বাঁচি নহে শত দুঃখ তায় ।
সেই দুঃখে পীর দুঃখ কোথা সহা যায় ॥
আছিল ভুবন লক্ষ্য এক গুরুধন ।
তাহাকে হরিতে হায় র'লে না বারণ ॥
কাহার বাসরে বন্ধু করিব তালাস ।
কাহার মন্দিরে যে'য়ে পাব মন আশ ॥
পাহাড় কানন আদি সাগর লহর ।
ঠাঁই ঠাঁই ঢুড়ি তাহে শহর নগর ॥
জঙ্গলে জঙ্গলে ঢুড়ি তাবত কানন ।
পাতায় পাতায় ঢুড়ি ছিল যত বন ॥
আকাশ পাতাল আদি সকল ঢুড়িয়া ।
রজনী যাপন করি রোদন করিয়া ॥
শুনে সেই হাহাকার ফে'টে যায় বুক ।
তবু প্রভু তোর মনে নাহি লাগে দুঃখ ॥
যাহার কাঁদনে করে আকাশ রোদন ।
তবু কি বিনয় তার কর না শ্রবণ ॥
পৃথিবীতে জীব-জান যতেক সৃজিলী ।
জম দম্ভে চূর্ণ প্রভু কারে না করিলি ॥
নিজে যদি চূর্ণ তুই করিতি আবার ।
সাফল্য জনম তবে হইত আমার ॥
কহ দেখি আগেকার আদম সকলে ।
কেমনে করিলি নাশ এই মহীতলে ॥
সাত ভূমে সাত জন আদম আছিল ।
একে একে তারা এবে কোথায় রহিল ॥
আর ছিল এই ভূমে যতেক আদম ।
কাহার আদেশে তারা খাইল গন্দম ॥

সাত ভুমে সাত আদম

ছিল নাকি এই সব আদম তোমার ।
যদি ছিল তার এবে নাহি কেন আর ॥
মজমুয়া ফতোওয়াতে ফেকার কেতাব ।
তাহাতেও সাত আদম লেখা গেছে সব ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তায়ালা)

ومن الارض مثلهن - وجاء فى الحديث ان الله خلق سبع سماوات
والارضين فى كل ارض ادم كاد مكم ونوح كنو حكم وابراهيم كابرا
هيمكم وموسى كمسى اكم وعيسى كعيسى كم و نبى كنيكم -

(ওয়ামান আরাদা মুসলিহুন ওয়াজাফিল হাদিসে ইন্নাল্লাহা খালাকা সাবায়া সামাওয়াতি ওয়াল আরদিনা ফি কুল্লি আরদি আদামা ক্বাদ মাকুম ওয়া নুহু কানুহুকুম ওয়া ইব্রাহিমু কা ইব্রাহিমুকুম ওয়া মুছ কা মুছাকুম ওয়া ইছা কা ইছাকুম ওয়ান্নাবিও কান্নিবিউকুম)

সাত ভূম সৃজিয়াছে প্রভু করতার ।
প্রত্যেক ভূমেতে আছে আদম তোমার ॥
এই যে আদম ন্যায় প্রত্যেক ভূমেতে ।
মুছা, ইছা, ইব্রাহিম, নুহু নবী তাতে ॥
তারিখ তেবরী হতে মতলাওল উলুমে ।
লিখিয়াছেন শুন তাহা কেন আছ ঘুমে ॥
একদিন মূসা নবী নিকট খোদার ।
জিজ্ঞাসিল জন্মকাল আলম প্রচার ॥
হুকুম হইল কোন ময়দানে যাইতে ।
কূপ এক আছে তাতে কঙ্কর ঢালিতে ॥
তখন হজরত মুছা সে ময়দানে যায় ।
ইটা এক ফেকে মারে ভিতর কূয়ায় ॥
আওয়াজ হইল এক কূপের ভিতর ।
কঙ্কর ফেকিলে কেবা কহ কোন নর ॥
কহিলেন মুছা, আমি মুছা পয়গাম্বর ।
আদম আওলাদ হ'তে বটি এক নর ॥
বাপগণ দাদা আদি আদম যাবত ।
একে একে প্রকাশিয়া কহিল তাবত ॥
আবার আওয়াজ হয় কূপের ভিতর ।

কালে কালে এই কূপে আসে এক নর ॥
তোমা হেন নাম ধাম তাহায় কহিল ।
এক এক ঢিলা এই কূপেতে মারিল ॥
তাহাতে অর্দ্ধেক কূপ হইল পূরণ ।
সাচা মিছা ভালা বুরা জানে নিরাঞ্জন ॥
সাচাও তাহার খেলা মিছাও তাহার ।
কভু সাচা কভু মিছা খেলা করতার ॥

قوله تعالى

(কাওলাহু তায়ালা)

قل كل من عند الله

(কুল্ কুল্লু মিন্ ইন্দাল্লাহি)

যেমন যায়েদ নামে আছে এক নর ।
কাহার এগানা সেই কাহার অপর ॥
কার সেই বাপ হয় কার হয় বেটা ।
কার হয় খালু মামু কার হয় জেঠা ॥
কেহ যাকে ঘৃণা করে কেহ তাকে খায় ।
কেহ তারে মান্য করে কেহ হাসে তায় ॥
সত্য কেহ জানে তারে কার কাছে ঝুট ।
কার আগে সাদা সেই কার আগে ফুট ॥
কাহার বান্ধব সেই কাহার দূষমণ ।
কখন সে ঠাণ্ডা আর কখন আগুন ॥
কাহাকে সে মারে বটে কাহাকে বাঁচায় ।
কেহ দেখে কাছে আসে কেহ দেখে ধায় ॥
নাপাক কখন যেই, কখন সে পাক ।
গম্ চিন্তা করে কভু খুশীতে অবাক ॥
একই সে নানা জন নানা ব্যবহার ।
এক বিনা নাহি কেহ জগতের সার ॥
কহিছে ভাবের কথা বুঝিবে ভাবুক ।
ভাব ভিন্ন দুঃখী যেন লাগিবে চাবুক ॥
কার কাছে ভাব এই, কার কাছে নয় ।
কেহ করে বিড়ম্বনা কেহ করে হায় ॥

مولانا روم (رح)

মাওলানা রুম (রঃ)

چون توچشم دل نداری ای عنود -
که نمی دانی توهی رم رازعود
چون گهگنج هست در عالم مونج -
هیچ وبران خالی مدانی زگنج

(চুঁ তু চশম্যা দিল নাদারি আই উনুঁদ
কে নমিদানি তোহিরোম রাজেউদ্
চোঁকে গঞ্জেহস্ত দর আলম ম্যারাঞ্জ
হিজ অপোরানে খালি মিদানি জ্যা গঞ্জ)

যে সকল গোমরা জন মন চক্ষু নাই ।
কাষ্ঠ হ'তে চন্দনেরে চিনিবে কি ছাই ॥
খালি কভু নাহি জান বিরান জঙ্গল ।
ছাড়া বনে ভরা আছে গঞ্জ পূর্ণস্থল ॥
উপরেতে কালা যেই ভিতরে সুন্দর ।
কালির হরফে এবে করহ নজর ॥
উপরে সুন্দর, কালা ভিতরেতে তার ।
আঙ্গার দেখিয়া চিন আগুনের সার ॥
কালির হরফ ন্যায় ঢোড় অলী পীর ।
পাইবে তাহাতে ধন করিলে ফিকির ॥
দেখিয়া আলোক জ্যোতি পতঙ্গ পোকায় ।
আগুনে পড়িয়া শেষে নিজে মারা যায় ॥
সুন্দর দেখিবে যারে কহিছে মধুর ।
বচেনেতে মধু বটে মধু বহুদূর ॥

প্রত্যেক সময়ের পৃথক পৃথক গুণ

গদ্য– প্রত্যেক যুগ, বৎসর, মাস, হাপ্তা, দিন ঘড়ি, মিনিট ছায়াত করণের এক এক গুণ ও ক্ষেন নির্দ্ধারিত আছে, তাহার দলিল কোরান শরীফে আসিয়াছে দেখুন–

قوله تعالى

(কাওলাহু তায়ালা)

كل يوم هوفى شان

(কুল্লু ইয়াওমা হুয়া ফি শান)

প্রত্যেক দিন অর্থাৎ প্রত্যেক জমানার এক শান ও ক্ষেন আছে।
হাদিছ শরীফে আসিয়াছে যথা–

حديث

(হাদিস)

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

(খায়রুল কুরুনি কুরুনি ছুম্মাল্লাজিনা ইয়ালাওনাহুম ছুম্মাল্লাজিনা ইয়ালাওনাহুম)

দমে দমে এক হাল পৃথিবী অন্তর।
এক যায় এক হয় ঘোরে নিরন্তর ॥
সময়ের ফলফলে ভাল মন্দ হয়।
অসময়ে ভাল ফল কভু হয় নয় ॥

قوله سعدى (رح)

কাওলু শাদি (রঃ)

بروز هما يون وسال سعدى بتا ريخ فرخ ميان دوعيد -

(বারুজ্ হুমাইউ ওছালে ছা'দি বা তারিখ্ ফরখ্ মিয়ান্ দুইদ্)

দিন ভাল নেক সাল মোবারক চান।
হপ্তা সাল মাস ভাল দু'ঈদ দরমিয়ান ॥
সাত দিনের এক দিন হয় জুম্মাবার।
বৎসরে কদর হয় বরাত আবার ॥
বৎসরেতে বার মাস বুরুজেতে রয়।
প্রত্যেকের তাছিরাদি ভিন্ন ভিন্ন হয় ॥
বারটি তাছির আছে বার বুরুজের।
ছায়াত নহুচ তাতে নেক বদ ঢের ॥
ভাল আর বড় ভাল নেক পরে নেক।
নেক বদ বড় ছোট এক পরে এক ॥
বুরুজেতে ছেতারার তাছির সকল।
নজ্জুমের মানি এই মঙ্গলামঙ্গল ॥
না বুঝিয়া কত লোক ঝগড়ে নিশ্চয়।
অতএব খোদাতালা কোরানেতে কয় ॥

قوله تعالى سورة كهف

(কাওলাহু তায়ালা-সূরা : কাহাফ)

ولقد صرفنا فى هذالقران للناس

من كل مثل وكان الانسان اكثر شئ جدلا

(অলাক্বাদ সোরাফ্না ফি হাজাল কো'রআনি লিন্নাছে মিনকুল্লে মিসলু ওয়াকানাল ইনছানা আকছারু সাইয়িন জাদালা)

"খোলাছা মানী"

যত ইতি এলেম আদি হাল আলামত।
কেয়াফা নজ্জুম কাস্ফ কোরানে তাবত ॥
বয়ান করিয়া দিছি লোকের কারণ।
না বুঝিয়া ঝগড়িছে বহু লোকগণ ॥
কিন্তু যে নজ্জুম হাল মন্ছুখ এখন।
এতএব চলাচল রহিল বারণ ॥
কিন্তু যত আলামত নজ্জুম কোথায়।
মারফত দপ্তর দেখ পাতায় পাতায় ॥

قول حضرت سعدى شيرازى

(কাওলু হযরত সাদী সিরাজী)

بركدر خرختان وسبز درنظر هوشيار

هرودق دفتريست ازمعرفت كرد گار

(বরকি দর্খরখতানে ওসব্জ দর নজর হুশিয়ার
হর্ওয়ারকে দপ্তরিয়াজ্ আজ্মারেফাত্ কার্দেগার)

সকল বস্তুর গুণ ও তাহার কারণ জানা আবশ্যক

সকল বস্তুর গুণ পৃথক নিশ্চয়।
কারণ জানিবে তার দানা যেবা হয় ॥
বিশেষ বস্তুর যেই জানিল কারণ।
তাহারাই নবী অলী আর মুণি জন ॥
হাকিম বলিয়া তারা উপাধি পাইল।
আফ্লাতুন লোকমান পৃথিবীতে ছিল ॥
সাধারণ লোকে জানে সামান্য কারণ।

প্রত্যেক লোকের তাহা হয় প্রয়োজন ॥
দিবা রাত্র মেঘ বান অন্ধকারময় ।
জোয়ার ভাটা আসে যায় সর্ব্ব লোকে কয় ॥
শীত গ্রীস্ম কারে কয় সকলেতে জানে ।
হলাহলে প্রাণ বধে কেবা নাহি মানে ॥
মিঠা, তিতা, কটু, কষা, না চিনিলে ঝড় ॥
সমুদ্দরে মারা পড়ে এহেন বর্ব্বর ॥
অমাবশ্যা প্রতিপদ পূর্ণিমাশি যত ।
তারা দেখে তারা রাতি চিনে অবিরত ॥
চিনিয়াছে তারা যেই ফল পে'ল তারা ।
আকাশেতে লক্ষ লক্ষ দেখা যায় তারা ॥
তেমনি বীজের গুণ কাল নিরূপণ ।
কোন্ দিনে কোন্ বীজ করিবে রোপন ॥
তিল, তিশী, মুগ, মাস, মুসুর, অড়ল ।
দিনে কালে না রোপিলে ধরিবে না ফল ॥
যদ্যপি ধরিবে ফল কম হবে দানা ।
কলা,কচু অদিনেতে ছোট হবে ফানা ॥
এমনি জীবের দেহ আলামত যত ।
সাধারণ লোকে জানে ভাল বুরা কত ॥
গরু ঘোড়া যুবা বুড়া পেট পিঠ রান ।
রঙ্গ-ঢঙ্গ রোম, দোম, নাক, মুখ, কান ॥
গোয়ালেরা গরু দেখে কহিছে ব্যারাম ।
যেই যাহা চিনে তাহা বলে খাছ আম ॥
এই মত ফল ফুল যেবা যাহা চিনে ।
ক্রমাদিনে ফল পাবে রাখে যদি মনে ॥

রাখা বস্তু কাজে লাগে

حضرت سعدی رح

(হররত সাদী (রঃ)

داشته اید بکا رکرچه باشد سرمار

(দাস্তা আইয়িদ্ বা কারে কার্‌চে বাসাত্ সের্‌মার্)

রাখা বস্তু কাজে লাগে যদি যত্ন করে ।
সাপ মুণ্ড হইলেও কামে লাগে পরে ॥

এমনি মনুষ্য দেহ চিনন নিশ্চয় ।
আঙ্গট দেখিয়া তার ভাল মন্দ কয় ॥
হস্ত রেখা পদ রেখা কপাল নিশান ।
ভাল মন্দ চিনা যায় যার যেই শান ॥

مقوله حضرت سعدی رحمت الله

(মাকাওলাহ হযরত সাদী রহঃ)

باالای سرش ز هوشمندی

می تافت ستاره بلندی

(বালাইয়ে সেরাজ জাঁ হুসমন্দি)

মাতাফাত সেতারাহ বলন্দি-হাদিস শরীফ)

ছেতারা বলন্দি যার কপালেতে জ্বলে ।
উচা মাথা রহে তার হুঁশ মন্দির ফলে ॥
যেইজন পৃথিবীতে হ'ল নবাকার ।
মার পেটে সেই নর ছিল নাহেঞ্জার ॥

حدیث شریف

(হাদিস শরীফ)

من شقی فی بطن امه

(মান সাকিউ ফি বাতনি উম্মিহি)

দজ্জালে মনহুছ দেখ মেস্কাতে প্রমাণ ।
না বরকত হল সেই নবী ফরমান ॥
ছাইয়াদ বলিয়া নাম যাহার নিশ্চয় ।
মসহুর দজ্জাল কিন্তু ভূমণ্ডলে হয় ॥
আবার যে দণ্ডসহ জন্ম হয় তার ।
তাতে না বরকত লেখে হাদিছ মাঝার ॥
আজরাছ বলিয়া তারে আরবেতে কয় ।
মার পেট হতে যেবা দন্তসহ হয় ॥
উচা দাঁত লম্বা কদ চিক চিকে আওয়াজ ।
দজ্জাল মনহুছ তাতে মেস্কাতের মাঝ ॥
আছিল তাহার মাতা অতি কুলক্ষণ ।
লম্বা চৌড়া মোটা অতি ছিল যার তন ॥

পুত্র কন্যা দজ্জালের ব্যতীত আবার ।
ত্রিশ বৎসর মধ্যে জন্মিল না তার ॥
তিরিশ সালের পর হইল ছাওয়াল ।
কি ভেদ তাহাতে সে হইল দজ্জাল ॥
তিরিশেতে কোন ক্ষণ কোন রাশি পায় ।
দানা লোকে সে সন্ধান পেয়েছে উপায় ॥
সে ভেদে করিলে জেদ পাইবে না ফল ।
জেদ ছাড় পথ ধর ঘুচিবে চঞ্চল ॥
দেখ বাপ লম্বা কদ আছিল তাহার ।
পাখীর ঠোটের ন্যায় নাক নাহেঞ্জার ॥
মেহিন আছিল বুক সরু অতিশয় ।
এহুদি কমতারিন গোলাম নিশ্চয় ॥
মাতাপিতা নাহেঞ্জার পূত্র নাহেঞ্জার ।
দিন ক্ষণ নাবকারে ফল নাবকার ॥
মদিনাতে নবী সাহেব দেখেন ছাওয়াল ।
আংগট চিনিয়া কহে এই সে দজ্জাল ॥
মাতার আংগট আর পিতার আকার ।
বয়ান করিয়া দিছে হাদিছ মাঝার ॥
এবে অন্য হাদিতে করহ লক্ষণ ।
আকৃতির ব্যাখ্যা নবী করিল কেমন ॥

حديث شريف

(হাদিস শরীফ)

كل طويل احمق كل قصر فتنة

(কুল্লু তবিলুন আহমাকু কুল্লু কাসরু ফেতনাতু)

যত খাট তত নট হাদিছ বয়ান ।
লম্বা যত হবে তত হেমাকত শান ॥
হস্ত রেখা পদ রেখা শরীর নিশান ।
হাদিছেতে পাওয়া যায় আংগট প্রমাণ ॥
হস্ত পদ ছোট বড় নাক মুখ চুল ।
চক্ষু কর্ণ শির আদি পিণ্ডলী আঙ্গুল ॥
এ সবার পরিমাণ কেতাব মাঝার ।
ভিন্ন ভিন্ন সারি সারি কাতারে কাতার ॥

ছোট বড় শরীরেতে কেবলি অজুদ ।
নহে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে প্রত্যেক মৌজুদ ॥
যাহার অজুদ বড় অন্য স্থান ছোট ।
খালি সে আহমক নহে কিন্তু সেই নট ॥
কোন জন নাটা কদ দীর্ঘ অন্যস্থান ।
হেকামত তারি মধ্যে আছে বিদ্যমান ॥
কিন্তু যদি রাস্ত হয় কোন অঙ্গ তার ।
রাস্তি তাহার মধ্যে পাইবে নির্দ্ধার ॥
এই সে কেয়াফা বিদ্যা বড় ভয়ঙ্কর ।
মোল্লাগল মানা করে শিখহ সত্বর ॥

বুধবার মনহুছ

(তফছিরে ফতেহুল আজিজিতে আছে)

১। হজরত নূহ্ (আঃ)-এর জামানায় তুফান হইয়াছিল বুধবার
২। পয়গম্বর আলায়হেচ্ছালামের দান্দান মোবারক শহীদ ঐ
৩। হজরত ইউসুফ (আঃ) কূপেতে পড়েন ঐ
৪। হজরত ইউনুস (আঃ) মৎস্যের পেটে যান ঐ
৫। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আগুনে পড়নে ঐ
৬। হজরত আলী (রাঃ) এর পায় তীর বিদ্ধ হয় ঐ
৭। হজরত আমির হামজা (রাঃ) শহীদ হন ঐ
৮। হজরত দাউদ (আঃ) বালায় পতিত হন ঐ
৯। হজরত হোসেন (রাঃ) কারবালায় রওয়ানা হন ঐ
১০। হজরত মুছা (আঃ) ও ফেরাউনের লড়াই ঐ
১১। হজরত ওছমান (রাঃ) শহীদ হন ঐ
১২। হজরত ছোলেমান আলায়হেচ্ছালাম ছাখরা দেওয়ের হাতে আজিজ হন ঐ

বাংলা ১২৮৩ সনে নোয়াখালী ও বরিশাল জেলার দক্ষিণাংশে ভয়ানক তূফান ও বন্যা হয় বুধবার ।

সময়ের ফল

সময়ের ফলে ফল ভূবন মাঝার ।
ডাল পাল ঘাস পাত হয় বারে বার ॥
ধান, পান, মুগ, মাস, পারা, ছোলা ডাল ।
আম, জাম, নারিকেল, খেজুর, কাঁঠাল ॥
কোন সনে হয় জন্ম কোন সনে নয় ।

পোক জোক কোন সনে ভূমণ্ডলে হয় ॥
কোন সনে বেঙ্গ জন্মে কোন সনে সাপ ।
কোন সনে বর্ষা হয় কোন সনে তাপ ॥
যেই সনে যার জন্ম ভূমণ্ডলে হয় ।
তার গুণে ঐ সন পৃথিবীতে রয় ॥
তাহার আজমাস যেবা রাখিবে স্মরণ ।
কালে কালে সেই নর হয় মুনি জন ॥
মেঘ বান আবরেতে ঝড়ীর সঞ্চার ।
মেঘ দেখে ধাওয়া ধাই বলে সার সার ॥
মেঘেতে হইবে ঝড়ী কেবা কোথা জানে ।
আলামত দেখে তায় সর্ব্বলোকে মানে ॥
চক্ষু, মুখ আলামতে খুনী চিনা যায় ।
লাঠি হাতে একারণে ডরিছে সবায় ॥
আলামত দেখে যেই নাহি চিনে খুনী ।
খালি সে বাচনি নর নহে সেই মুনি ॥
সাপ দে'খে লাভ দেয় বলে এই সাপ ।
বাঘ দেখে ধেয়ে যায় বলে বাপ বাপ ॥

বাদলের আলামত

পূর্ব কি দক্ষিণে বায়ু শীতকালে হয় ।
উত্তর পশ্চিম কোণে পবন নিশ্চয় ॥
চাতক পাখীর ডাক ঘন ঘন কয় ।
জল তীরে মাছি মক্ষি উড়ে সদাচয় ॥
কটি পোকা রাত্রি ভাগে ঝিঝিট বচন ।
উচ্চৈঃস্বরে জল ডাকে ডাকে ঘন ঘন ॥
ফলং উড়িতে দেয় নিশির আওয়াজ ।
পিপীলিকা গাড়া হ'তে ধরে যদি সাজ ॥
উলানি কি পোকা আদি মক্ষি ভয়ঙ্কর ।
ভেড়ি দুম্বা নাচে দে'খে মেঘর সঞ্চার ॥
মরিচ ফসল হবে সেই সন অতি ।
পাখীগণ ডাকিবার নিশা কালে গতি ॥
আকাশেতে ধনু উঠে গ্রীষ্ম অতিশয় ।
হুদ হুদ ডাকিলে রাতে মেঘের সঞ্চয় ॥

ধুম ধুম বয়রা কান কফাশ্রিত বাই ।
একাবধি পাখীগণ করে নাওয়া নাওই ॥
আবাবিল জলতীরে ঘুরিয়া বেড়ায় ।
গাও পর ঝাড়ে পাখী ঘন ঘন নায় ॥
শৃগাল কানন হতে আবাদে আসিয়া ।
দিবা ভাগে শিবা ডাকে গলা উঠাইয়া ॥
শেষ রাতে গাধা ডাকে ছাড়িয়া হুতাস ।
রাত্রকালে ডাকে কিবা না খাইয়া ঘাস ॥
পানি চাক চন্দ্র ডিম্বে হবে পষ্টময় ।
প্রদীপের আলো কম যেই রাতে হয় ॥
দাদ যদি চুলকাইবে মেঘের লক্ষণ ।
কিম্বা দেহ ভার লাগে পাগল উচাটন ॥
জো-লক্ষণে মেঘ লাল খোলা সদা রয় ।
শরীরের মেঘ রাণী পৃথিবীতে হয় ॥
মেঘ গুণে শরীরের বায়ু অনুরাগ ।
বেঙ পেটে মৌজ মারে ডাকে বাগ বাগ ॥
নিজামদ্দিন আউলীয়ার নিজ মলফুজাতে ।
এসব লক্ষণ ঢের লেখে পাতে পাতে ॥

সনের আলামত প্রথমেই পাওয়া যায়

(সরে মেস্কাতে লিখিয়াছে আজমাসি আলামত)

যে সনে বালকগণ আনন্দ হৃদয় ।
খেলিবারে ইচ্ছা মন সদা সুখচয় ॥
ঐ সন ধান্য আদি নানান ফসল ।
দেশে দেশে নানাস্থানে ফলিবে সকল ॥
ব্যারাম হইবে কম আরাম বাড়িবে ।
সুদিনের আলামত আলমে পাইবে ॥
লাঠি সোটা বানান আর রণের পোষাক ।
আলমেতে হুর ডাঙ্গা হবে অনুরাগ ॥
পালাইয়া ফিরে বনে কিবা ছেপে রয় ।
ঐ সনে সেই দেশে হবে চোর ভয় ॥
ডাকিলে কুটুম্ব পাখী কুটুম্ব আসিবে ।
খবর পাইবে নহে জ্ঞানী বুঝিবে ॥
নবীবর আগমনে শুনে সুবচন ।

আনন্দে দিতেন ফাল পুলকিত মন ॥
মোবারক নাম আদি কবিতা আসার ।
মধুস্বর পাখীরব নেক ফাল সার ॥
সুবচনে শুভ ফাল লইতেন আলী ।
মেস্কাত সরাতে লেখে তাই যাই বলি ॥
কহিছে এমাম সাফি এমত খবর ।
শুনে যদি ভাল সের ভাল পাবে নর ॥
ভাল দেখে ভাল হবে ভালতে সংসার ।
ভাল ভাল সর্ব্বকালে জগতের সার ॥
যেই সন সাপ, মৎস্য, ইঁদুর সেওয়ায় ।
অন্য জন্তু ধরে ধরে নিজ জাত খায় ॥
মনুষ্য বিহনে যদি জীবন ভূবনে ।
সঙ্গম করয় যদি অন্য জাত সনে ॥
ভানুর উদয় কালে কুকুর কান্দন ।
আকাশে প্রদীপ শশী দক্ষিণে ধারণ ॥
যেই সন বড় বেঙ হবে অগনন ।
ওলাউঠা ভয় কিন্তু হরিদ্রা বরণ ॥
পাইবে সনের ফল প্রথম সনেতে ।
পাইবে কাজের ফল কাজ আরম্ভেতে ॥
পাইবে শরীর ভেদ শরীর মাঝার ।
রোগ শোক বাচন মরণ জান আর ॥
পাইবে দমের ঘরে মরণ বাচন ।
দুই দম এগার ঘাট বার নিরূপন ॥

গরকী ও তুফানের আলামত

হুমহুম ধুমধুম কুরকুর ডাক ।
মৃত্তিকা কম্পিত আর ডাকে যেন বাঘ ॥
আশ্বিন কার্ত্তিকে গরকী পূর্ব্ব রোকে ভয় ।
কুরকুর ডাক ডাকে ঝিলি মিলি হয় ॥
নানা দিকে নানা রঙ্গ বিজলি দেখায় ।
ডাইয়া জুইয়া পোকা জোকা রাশি ধায় ॥
ঝাকে ঝাকে চিল পাখী যায় তাড়াতাড়ি ।
পশু পক্ষী রব করে ধায় সারি সারি ॥
পতঙ্গ পোকার হবে আলো অনুরাগ ।

ধে'য়ে পড়ে ঝাকে ঝাকে দেখিয়া চেরাগ ॥
সাগর দেখিবে যদি করিতেছে রঙ্গ ।
এক পরে এক আসে তিনের তরঙ্গ ॥
আলামতে বুঝা যায় হইবে তুফান ।
ঘোরতর বন্যা আদি কিবা ছুটে বান ॥
এসব আজমাশি কথা জিনিষের গুণ ।
হারাম শেরেক কহা বড়ই জবুন ॥
হাকিম হেকমতে হাওয়া করে নিরূপণ ।
কোন সমে কত বায়ু হবে কত গুণ ॥
হঠাৎ বলিয়া দেয় দেখিয়া আরক ।
জাহাজ আদি রেখে দেয় না হয় গরক ॥
তবে কি কাফের হৈল জাহাজি সকল ।
নাহক মরিল মাল্লা না বুঝিল কল ॥
হলাহলে প্রাণ বধে চোত্রা পাতে ধক ।
আলামত হারাম কহে কাফের মতলক ॥
এসব আজমাশি কথা হাল আলামত ।
হবে কি না হবে সব খোদার কুদরত ॥
সর্ব্বস্থানে এক বারে না হয় তুফান ।
কোথায় তুফান হয় কোথায় আমান ॥
যে কাম বেদাত নহে কিম্বা সে হারাম ।
নাহক নিষেধ করা নহে ভাল কাম ॥
বেদাত বলিয়া কেহ করিছে ওয়াজ ।
হুলুস্থুলু ঢেলে দিছে আওয়ামের মাঝ ॥
শত শত নেক কামে রেখে দিছে বাজ ।
বাধিক করিয়া দিল গরীব সমাজ ॥
মৌলুদ, কেরাম আদি সামাদান ফুল ।
বেদাত বলিয়া কত লাগাইল গোল ॥
সাজিতে ঘরের সাজ পালকিতে ছাওয়ার ।
রেওয়াজি ফাতেহা কিন্তু নেক বেশুমার ॥
মুরদা মরিলে রোজ ধার্য্য চাহারাম ।
খেলান দেলান তাতে আছিল খতম ॥
যে তারিখ মকরর প্রত্যেক জায়গায় ।
ছ'মাসী বৎসরি দশে কিবা চাল্লিশায় ॥
সে তারিখে এসে রূহ হইয়া হাজির ।
ভিক দোয়া মাগে সে ফরমান নবীর ॥

দোয়া পেলে দোয়া দিয়া হইয়া বিদায় ।
কেন্দে কেন্দে রূহুগণ নিকলিয়া যায় ॥
কে আছে আমার হায় কে আছে আমার ।
একা চলে এনু আমি নাহি ইয়াদগার ॥
একা গিয়াছিনু আমি একা চলে যাই ।
কোথা মাতা-পিতা রল কোথা রল ভাই ॥
পড়েছে আমার পরে বিশাল তুফান ।
তারিখে তারিখে মম হও আগুয়ান ॥
সময় স্মরণ রাখ পড়িবে স্মরণ ॥
স্মরণে স্মরণ হবে আপনা মরণ ॥
মরণ স্মরণ যদি রহিবে তোমার ।
শমন ভবন তবে স্মরিবে আমার ॥
প্রত্যহ করিতে হয় মকররি কাম ।
হারাম বলিছে যারা নাহি লয় নাম ॥
হারাম বলিয়া তারা পাইল আরাম ।
একেবারে ভু'লে গেছে আখেরের কাম ॥
দুই চারি রেছালা দেখিছে নজরে ।
তাই সে হারাম বলে বাতায় সবারে ।
কোথায় হারাম আর কিসের হারাম ॥
বেদাত কাহাকে কহে নাহি জানে নাম ॥
আউলিয়ার গোরস্থানে শহীদ লোকের ।
দেওয়ার চেরাহ দেওয়া জাগা হায়বতের ॥
সরাতে ছওয়াব কিন্তু নাহি অনুরাগ ।
আনওয়ার ছাতেয়া নামে দেখহ কেতাব ॥
মক্কা মদিনার মুফ্‌তি আলেম বিস্তর ।
আনওয়ারে ছাতেয়া সত্য লেখিছে সুন্দর ॥
হাজার তারিফ হয় মোছান্নেফ তরে ।
করিলেন মরাদ্বীন জেন্দা একেবারে ॥
শত শত নামি নামি দলিল কেতাব ।
ছাতেওয়াতে লেখা সত্য দেখহ কেতাব ॥
হারাম বেদাত বলে লেখেছিল যারা ।
ওহাবি খেতাব কিন্তু পাইলেন তারা ॥
আনওয়ারে আহ্‌মদী এবে দেখহ সকলে ।
দোভাষী বাঙ্গালী ভাষে আহ্‌মদী বলে ॥
বহু যত্নে তায় রত্ন গাথা গেল হার ।

রত্নকর পেলে যত্ন করিবে তাহার ॥
সাদি মধ্যে ঘর সাজ যে বলে হারাম ।
কাবা আবা বোটে কেন বঙ্গের বারাম ॥
দুই চাল আট চালা বন্ধ ছন্দ মিল ।
কোন হাদিছেতে নাহি তাহার তমছিল ॥
বেদাত এরূপ ঘন বানান নিশ্চয় ।
মাদ্রাসা বেদাত সত্য হাদিছেতে নয় ॥
তরতিব কোরান ছুরা এরাব সকল ॥
জবানে নিয়ম পড়া নামাজে কেবল ॥
বেদাত জুম্মাতে দেওয়া প্রথম আযান ।
জেল বন্দি সোনা চান্দি কোরানে লাগান ॥
তছবিতে দানা আর ঈদগাতে মিম্বর ।
ফেকার কেতাব আদি যত পরস্পর ॥
বেদাত বলিতে হয় মুজহাব সত্বর ।
বহুকাল পলে ধার্য্য হয় পয়গাম্বর ॥
নাক ছিদ্র কাণ ছেদ নানা জেওয়ারাত ।
শাড়ী ধুতি আওরতের পরণ বেদাত ॥
রেল আর হাওয়া গাড়ী নানা বস্ত্র কল ।
রেওয়াজ জানিয়া মন্দ হল অমঙ্গল ॥
বেদাত রেলের গাড়ী চড়নাক তায় ।
হারাম হইয়া পরে কি হবে উপায় ॥
রেওয়াজে নাকর ঘিন রেওয়াজে মাকুল ।
ফেকা বলে কহ যারে রেওয়াজ তার মূল ॥
মৎস্য বলে কেহ যারে রেওয়াজ ভিতরে ।
ফেকাতে হালাল লেখে সেই মৎস্য তরে ॥
যে দেশে দস্তুর আছে জ্যাফত যেমত ।
সেইত রেওয়াজ বটে তাহাই ছুন্নত ॥
নবী বাদে যে আমল জারি ক্রমাদিন ।
তাহাকে বেদাত কহে না করিবে ঘিন ॥
সরার খেলাপ যদি হয় কোন কাম ।
তবে সে বেদাত জান বেদাত হারাম ॥
নহে মোবাহ পরে সেই হামেসা রহিবে ।
ভাল হলে হাছনা সওয়াব পাইবে ॥
আট রকমের আছে বেদাত তামাম ।
একই বেদাত তাতে কেবল হারাম ॥

মক্কা মদিনাতে যারা জেয়ারতে যায় ।
দালান কবর পরে দেখে কিনা তায় ॥
চক্ষু মুদে তারা নাকি ফিরে আসে ভাই ।
কবরে চেরাগ তাতে কভু দেখে নাই ॥
মক্কা মদিনাতে কিবা রুম আর সাম ।
কবরে রৌশন করা নাহিক হারাম ॥
কেবল কতেক লোক ঢাকা বাঙ্গালার ।
হারাম জানিয়া নিছে হালাল খোদার ॥
যত নবী পয়গাম্বর ভেজিয়াছে বারি ।
তাঁহাদের ছুন্নত আছে সংসাররেতে জারি ॥
পুরানা ছুন্নত আছে অনেক প্রচার ।
আওয়ামে আকিদা তাই বেদাত তাহার ॥
আনওয়ারে আহ্‌মদী রেছালা ভিতর ।
এসব বেদাত রদে দলিল সুন্দর ॥
হকেরে নাহক বলা নহে সমুচিত ।
অতএব খোদা শীঘ্র করাও মুদ্রিত ॥

যোগার পাখীর বিরহ

একদা নিশির কালে করিতে ভ্রমণ ।
শাখা পরে কাঁদে শুনি পাখীর নন্দন ॥
টেরে টেরে শব্দে পাখী কাঁদে সারা রাত ।
অসীম রোদনে করে রজনী প্রভাত ॥
প্রত্যহ বিরলে বসি দুঃখাকুল মন ।
ডাক পরে ডাক ছাড়ে করে না ভোজন ॥
সামান্য বৃক্ষের এক ডালির উপর ।
প্রভু নাম জপ নাকি করে নিরন্তর ॥
আহা কি প্রভুর নামে লাগিয়াছে মন ।
অতএব করে নাকি এতেক রোদন ॥
কে জানে মনেতে তার কি হইল তাপ ।
কি দুঃখ পাইয়া জানি এতেক বিলাপ ॥
একই দমের পরে জপে কার নাম ।
কি শোকে কাহার দুঃখে এত পরিণাম ॥
সে দুঃখে অন্যের দুঃখ ফেটে যায় বুক ।
আহা কি যোগার পাখি ত্যাগিয়াছে সুখ ॥

কি সাধ মনেতে তার ভবের বাসনা ।
ত্যাজিয়া কাহার নাম করহ ঘোষণা ॥
সে নামের সাধ বুঝি হ'ল না সাধন ।
কি হেতু করিতে আছ এতেক তাপন ॥
কে জানে কাহার নাম জপে তার মনে ।
আহার ত্যাগিল পাখি কোন নাম গুণে ॥
রসনা জলেতে বুঝি করিল না তর ।
তবু কি সাধের নাম ডাকে নিরন্তর ॥
মাতা পিতা পুত্র জন ছাড়িলে সংসার ।
তবু নাহি করে কেহ এত হাহাকার ॥
যে হেতু তোমার মন করিছে বিরাজ ।
তুসিয়া কি তার দেখা পাইয়াছ আজ ॥
ডালে ডালে পাখীগণ শুয়ে নিদ্রা যায় ।
প্রভু নাম জপে যোগী রজনী পোহায় ॥
আনন্দে জালির পরে খেলে পাখীগণ ।
প্রভু নাম জপে যোগী বিরস বদন ॥

উদাসী

উদাসী কি সহ্য করে তুতি সুবচন ।
মহানন্দে কাঁন্দে শুনে পরের কাঁদন ॥
আসিয়া না পরে পাখী গায় জবে গীত ।
ভাবুকের মন ভাব ভাবেতে কল্পিত ॥
সুরসী মধুর সুরে মধু গান করে ।
ভাবুকের মন ভাব নব ভাব ধরে ॥
নব পত্র সারি সারি হেরিলে নয়নে ।
শত নব চিন্তা হয় প্রেমিকের মনে ॥
বসন্ত রসের কাল ধাইল পবন ।
রসিকের মন রস হয় উৎপাদন ॥
কুহু কাহা রবে যদি পাখী রব করে ।
আহা আহা উচ্চঃস্বরে সুধা ভাব ধরে ॥
নিরাশ্রয় পথিকেরে হেরিয়া নয়নে ।
আশেকেতে সদা রহে দুঃখাকুল মনে ॥
দেখিয়া পরের দুঃখ নিজে দুঃখী হয় ।
থামিয়া নিজের বুক মনে চিন্তে রয় ॥

জবালয়ে করে যদি জবেহ দরশন ।
শতেক রোদনে দেহ করে জ্বালাতন ॥
শুনিয়া গভীর সুর উর্ধ্বমনে ধায় ।
ছট ফট করে তনু পাগল পরায় ॥
বিচ্ছেদে বিরস সদা বালক হেন গতি ।
নিঘোরে ত্বরাশ হয়ে বৃদ্ধি হেন মতি ॥
বৃক্ষমূলে করে কভু যামিনী যাপন ॥
উর্ধ্ব মনে করে কভু মাটিতে শয়ন ॥
বাঁশী সুরে উঞ্চলীতে পবনে গমন ।
বেহাল বেগর হয় বেহালেতে মন ॥
তিনটি লক্ষণ আছে আশেকে প্রধান ।
চক্ষু লাল জল বহে দম ছাড়ে টান ॥

ভাব

কমলের অলিগণ মধু পান তরে ।
মধু রবে গুণ গুণ কাননেতে করে ॥
মহানন্দে অলিদল মধু গান গায় ।
কুঞ্জবনে গুঞ্জ রবে পাতায় পাতায় ॥
সুগন্ধেতে বিমোহিত কুসুম কানন ।
ফুলের মক্ষিকা তাতে ক'রেছে তারণ ॥
পবনে হেলায় যবে কুসুম বাঁগান ।
ভ্রমর সকলে গায় গুণ গুণ গান ॥
মধু মক্ষী মধু স্বরে উড়িয়া বেড়ায় ।
পাখে পাখে উড়ে পাখী পবনেতে ধায় ॥
মধু কাল বিনা কোথা সুখের সঞ্চার ।
সে কাল অতীতে অলি আসিবে না আর ॥
মধু গেলে মধু মক্ষী রহিবে কোথায় ।
ফুল বিনা মাছি কভু আসিবে না হায় ॥

বিলাপ

পৃথিবীতে যে সুন্দর, যথা যে হেরিছে নর,
অঙ্গ যেন সুরূপ কমল ।
নাক মুখ কর্ণ বাটী, সারি সারি পরিপাটি,
তারা চক্ষু করে টলমল ।

বচন কহিছে সুরে, লাটিমের মত ঘুরে,
কতক্ষণ রহে উর্ধ্বমান ।
কিছুকাল পরে তায়, ঘুমতী বল সোদ পায়,
হটায়তে উড়িল পরাণ ।
পরাণ ত্যাগিবে যবে, কেবা তব এই ভবে,
সে কালেতে কেহ নহে কার ।
কিবা পুত্র কিবা জায়া, সকলে ত্যাজিবে মায়া,
মিছা মায়া জান এ সংসার ।
পিঞ্জিরা হইতে পাখী, পালাইলে দিয়া ফাঁকি,
খালি ঘর রহিবে বিরান ।
খসিয়া যাইবে ছানি, পচিয়া পড়িবে পানি,
তাই ভাবি হও সাবধান ।
কীট পোকা খাবে ঘর, অস্থি মাংস এ পাঞ্জর,
চক্ষু তারা খাইবে পোকায় ।
মাটিতে পতন হবে, কেবা তোকে উঁঠাইবে,
কোথা বন্ধু আছে হায় হায় ।
সে কালেতে বন্ধুগণ সাথে না যাইবে ধন ,
উচ্চৈঃস্বরে যতই ডাকিবে ।
মস্তক ধুনিবে তায়, কেহ না ফিরিয়া চায়,
বাটি ছেড়ে মাটিতে কাঁদিবে ।
বিপদে কাঁদিলে হায় কেহ কি ফিরিয়া চায়,
মৎস্য পরে করহ নজর ।
জল হতে স্থল পরে, মৎস্যকে লইলে ধরে,
কত সেই করে ধড়ফড় ।
তাতে কি শিকারীগণ, মীন দুঃখে দেয় মন,
বধিবারে রহে কি বারণ ।
সে রোদন শুনিলে হায়, কার না বুক ফেটে যায়,
তবু নর করে না শ্রবণ ।
জমদুত এ প্রকারে, যখন ধরিবে জোরে,
দয়া শূন্য নিষ্ঠুর বিরস ।
ঘাটে ঘাটে নানা ঠাঁই, কবর হাশর ভাই,
উখচিবে খাবে যেন রস ।
যাহারে কুমীরে খায়, মুখ পানে নাহি চায়,
জল তলে লইবে ধরিয়া ।
বন্ধুগণ আত্মজন, সকলে ফিরাবে মন,

ভাই বন্ধু রহিবে চাহিয়া ।
কুটুম্ব এগানা যারা, সুখে সুখী হবে তারা,
দুঃখে দুঃখী নাহি কোন জন ।
নিজ দুঃখে দুঃখী হবে, দুঃখে দুঃখী কেবা এবে,
সুখে সুখী হবে বন্ধুগণ ।
প্রভু যার হবে গতি, পীর তার হবে মতি,
দুঃখ হতে করিতে নিস্তার ।
দুঃখে দুঃখী পীর হবে, সাথে সাথে তারে পাবে,
সঙ্গে সঙ্গে সাথের ইয়ার ।

বন্ধুর নাম স্মরণ করিলে পাপ মোচন হয়

নবীগণ ছাহেবান অলী বন্ধুগণ ।
স্মরণেতে পীর পাই সূরুয রৌশন ॥
পশর হইয়া শাম আসে যদি তায় ।
তারা ও শশীতে রাত রহে জ্যোতির্ম্ময় ॥
শশী হেন মাতা মম পীর আম্মাজান
বেলায়েত নূর যেন পূর্ণিমার চান ॥
পৃথিবী ত্যাজিয়া মাতা ফকির হইয়া ।
পরকালে গঞ্জেপুরী নিছেন ভরিয়া ॥
করিবে আকাশ ব্যাখ্যা কেমনে বাউন ।
জগত মাতা যেন তিনি ফাতেমা খাতুন ॥
বাক্য সিদ্ধি পৃথিবীতে দেখ যদি ভাই ।
সুবচনি আম্মা হেন আর বুঝি নাই ॥
ওয়ালফাজরে অ-লায়ালিন কোরান মাঝার ।
পীর আম্মা দুই তন পাইয়াছি সার ॥
সকাল বৈকাল মধ্যে যতেক সময় ।
পীর ভাই কত তাহা কে করে নির্ণয় ॥
চন্দ্র সূর্য্য বিনে যেন ছেতারা প্রধান ।
স্থানে স্থানে আকাশের তাহারা সম্মান ॥
কামেলান আরেফান কত সাহাবাজ ।
বলন্দি মুল্লুকে সদা করেন পরওয়াজ ॥
তাহাতে কোতোব এক বহিন আমার ।

হলেন রাবিয়া ছানি জগত মাঝার ॥
আউলিয়ার ব্যাখ্যা করা নহে থোড়া কাম ।
লুদুনী এলেম যার ছিনাতে তামাম ॥
কাশ্‌ফের ডানাতে করে জাহান পরওয়াজ ।
নেগাদারী পৃথিবীর বটে যার কাজ ॥
তৌহীদের নেগা রাখা বসে এক ঠাঁই ।
সর্ব্বস্থান এক স্থান ভিন্ন ভিন্ন নাই ॥
অবিরত চক্ষু যার রৌশণ উজ্জ্বল ।
কভু না ঢাকিছে মেঘে মাশুক জামাল ॥
তৌহীদের নদী সনে বাদলের ফোট ।
মিলিছে সকলে যেয়ে করে এক জোট ॥
যখন বরষে মেঘ সাগর মাঝার ।
করিবারে জুদা সাধ্য কভু নাহি তার ॥
সে মেঘ সাগর পেটে অমূল্য রতন ।
মণি মুক্তা সাগরেতে আছে বহু ধন ॥
সাগরের মণি এক না করিবে বাদ ।
ঢাকার বাসেন্দা পীর সাহে আমজাদ ॥
কলিকাতা শহরেতে মণি এক তার ।
জোনাব সাহা বাকাউল্লাহ চব্বিশ পরগণার ॥
আর এক রত্ন যিনি হুগলী ভূমে ধনী ।
জোনাব মৌলভী সাহা গোলাম ছোলেমানি ॥
কলিকাতা শহরেতে আলিয়া মাদ্রাসায় ।
ফিল হাল জোনাবের মোদারেছি তায় ॥
ফুরফুরা নামেতে দেশ হুগলীর অন্তর ।
আছেন তাহাতে ধনী আলেম জবর ॥
জোনাব ছুফি আবুবকর আলেম ফাজেল ।
শরীয়াত নেগাবান আরেফ কামেল ॥
আর সাহা দিদার বক্স মহেব খোদার ।
হাবড়া জেলার অন্তর্গত মোকাম তাঁহার ॥
চট্টগ্রামে সাহাবাজ হাফেজ ইব্রাহিম ।
কামেল আরেফ ধনী ছেফাতে করিম ॥
আছেন মুর্শিদাবাদে এলাহির নূর ।
একরামূল হক পীর আলমে মসহুর ॥
আর সাহা ওয়াজেদ আলী তৌহীদের নূর ।

ছৈয়দ কুলেতে জন্ম ঘর ফরিদপুর ॥
ফিল হাল কলিকাতা তাঁহার বারাম ।
পিতা তাঁর জজ উকিল বড় গুণধাম ॥
জোনাব মুনসী ছলেমান মম পীর ভাই ।
কোরবান নামেতে তাই কলিকাতা ঠাঁই ॥
হিন্দুস্থান আসামেতে নানাদেশে আর ।
কত ঠাঁই কত নূর কে করে সুমার ॥
মখদুম মকাররম পেশওয়ায়ে দ্বীন ।
রাহবরে আশেকান আহলে একিন ॥
ছৈয়েদোল ওলামা রফিকে ফকির ।
তালেবের মদদগার আর দাস্তগির ॥
আশরাফ কুলেতে জন্ম দোস্ত দেল বর ।
নোয়াখালি শহরেতে ফকিরটোলা ঘর ॥
তাঁহায় কৃপায় হয় পুস্তক তৈয়ার ।
ছহি করিলেন কত সাধ্য যাহা তাঁর ॥
পড়ুক আর্শের ছায়া তাঁহার উপর ।
খোদার মেহের আর পীরের নজর ॥
জোনাবের নাম এবে শুন গুণধাম ।
মুন্সি আবদুল জব্বার তায় সহস্র সালাম ॥
আজিজুল আকাবের তাতে স্তান পায় ।
নেয়াজিবে মাফ দিবে আপনি খোদায় ॥
খাক ছার হই আমি সবার গোলাম ।
আদাব আরজ আর সবাকে ছালাম ॥
আগেতে বন্দিনু পীর পরে চাচা পীর ।
আগে পরে দুই নামে আরেফান স্থির ॥
আছন পিতার কূলে যেই নামদার ।
এ দোন ভুবন বিন্দু নিকটে তাহার ॥
সয়াল সংসার মাঝে যতেক সৃজন ।
কমলেতে গন্ধ আর ভানুতে কিরণ ॥
হাকিকতে আহ্‌মদী যাতে সিদ্ধ পায় ।
তাহার মগজ সার জানিবে চাচায় ॥
চাচা নহে কাঁচা সোনা চির ফল ধন ।
শারদা গমনে যার ডাহিনে রতন ॥
তিনিই কোতাব এক সুধারাম দেশ ।

যার যে মিলন ভাগ্য তান উপদেশ ॥
খলিল পুর সাকিনেতে আনাছেরি বাস ।
লাহুত মূল্লুক তান দাপটে হুতাস ॥
আবদুচ্ছামাদ সাহা এছেম কেবলার ।
মুন্সি নামে নবরেখা ভুবন গোলজার ॥
কেবলার এরশাদ আমি ছাড়াইতে নারি ।
দু'চার হরফ তায় লেখি তাড়াতাড়ি ॥
তাঁহার এরশাদে মোর জানিবে সকল ।
সমাধা হইল লেখা আল্লা আল্লা বল ॥

-তামাম শোধ-

সিররেহক্ব জামেনূর

সূচি

কালামে এলাহি তথা নূরের বিবরণ ১৫১
নূরের প্রকৃতি ১৫২
আধ্যাত্মিক তথা পরকালের অভিভাবক ১৫৯
ঈমানের বর্ণনা ১৬৩
শরিয়তের বর্ণনা ১৬৫
ঈমানে তাকলিদী ও ঈমানে তাহ্‌কিকী ১৬৬
জিকিরের বিবরণ ১৭০
প্রকৃত জিকির ১৭২
অজ্‌দ ও তার উপকারিতা ১৭৯
কুদ্‌রত ১৮৪
তকদীর ১৮৫
সুরের আলোচনা ১৮৭
প্রত্যেক ইবাদতে আনুগত্যের নিয়ত শর্ত ১৯০
সিজ্‌দার বিবরণ ১৯৪
সালামের বিবরণ ১৯৫
খেলাফতের বিবরণ ১৯৮
সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ ২০৩
ব্যর্থতার বিবরণ ২০৪
'উর্‌স' এর বিবরণ ২০৫
শাইখে কামেল পাপ হতে পবিত্র ২০৮
কেরামতের একটি ঘটনা ২০৮
সুফি পরিভাষা (জাওহারে গোবী) ২০৯
বিবিধ উপকারিতা ২১০
মোকামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ২১২
নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার লতিফাসমূহ ২১৩
ফয়েজের বিশদ বিবরণ ২১৪
দৃষ্ট নূরের বিবরণ ২১৫
বেলায়েতের বিবরণ ২১৫
কাদেরিয়া ত্বরিকার পার্থক্য ২১৬
চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার কতিপয় লতিফার বিবরণ ২১৬
ধর্মের শৃঙ্খলা ২২০
দুনিয়াদার আলেমের পরিচয় ২২১

بسم الله الرحمن الرحيم

কালামে এলাহি তথা নূরের বিবরণ

কালামে এলাহি قل من أنزل الكتاب الذى جاءبه موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا (কুল্ মান্ আন্‌জালাল্ কিতাবাল্লাজি যাআ বিহি মূসা নূরান্ অ হুদাল লিন্ নাসি তাজ্ আলুনাহু কারাতিসা তুবদুনাহা অ তুখফুনা কাছিরা)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে হোসাইনীতে বলা হয়েছে– "'বল' মূসা কর্তৃক মানুষের জন্য আলোদায়ক ও পথপ্রদর্শকরূপে আনীত কিতাবটি তথা তাওরাতকে, কে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তাকে পৃষ্ঠাবলি সংবলিত নিছক গ্রন্থে পরিণত করেছ, তোমরা তা থেকে যা খুশি প্রকাশ কর আর অধিকাংশ গোপন রাখ।"

আমি ফকিরের মতে, এখানে 'নূর' অর্থ ক্ষিপ্রগতি সূক্ষ্ম ঝলক। প্রদীপ, চন্দ্র, সূর্য ও তারকার আলোর সাথে এ তুলনীয়। এ বর্ণহীন অতি সূক্ষ্ম ও নির্মল আলো, আয়নার ঝলকের সাথে তুলনীয়। এ সাবান জাতীয় পদার্থের মধ্যকার সর্বাধিক পরিষ্কার ও পবিত্রকারী শক্তি বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। এগুলো সবই নূরের মৌলিক ও কল্যাণকর বৈশিষ্ট্য। এ নূরই অন্ধকারের মোকাবিলায় আলো, অস্বচ্ছতার মোকাবিলায় স্বচ্ছতা, পর্দার মোকাবিলায় পর্দা উন্মোচনকারী, অপবিত্রতার মোকাবিলায় পবিত্রতা এবং গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতার মোকাবিলায় হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনকারী। এ নূরই হচ্ছে কালামে নূরীর মূল ও তার স্বাদ। কালামুল্লাহ্ ও আম্বিয়া এবং অলিগণের বাণী এ নূরেরই অভিব্যক্তি এবং তাঁদের নূরী অভিজ্ঞতা উপলব্ধির ফলশ্রুতি ও নির্যাস মাত্র। নবী-অলিগণ এ নূরের সাহায্যেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টির রহস্য অবলোকন করেন। নূরী অন্তরই কেবল এ নূরের আস্বাদন, ফলাফল ও বরকত লাভ করতে পারেন। এ নূরই সত্য সন্ধানী এবং আরিফ বিল্লাহর উপায় অবলম্বন ও মাকছুদ। সাধক ছাড়া কেউই এ নূর সম্পর্কে অবহিত ও পরিচিত নন। তাই আল্লাহপাক তাঁর আপন কালাম পাকে জানিয়ে দিচ্ছেন– جاءبه موسى نورا (যাআ বিহি মূসা নূরান)। অর্থাৎ, তাওরাতের সারবস্তু 'নূরই' মূসার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এখানে 'নূর' শব্দ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য নয়। বরং নূর হল কালামে এলাহি তাওরাতের স্বাদ ও সৌরভ এবং সৌন্দর্য ও সারবস্তু। এ নূরই হল পথ প্রাপ্তদের অবলম্বন ও হাতিয়ার। হেদায়েত প্রাপ্তির পর এ নূরই আবার মারেফাত ও মাকছুদে পরিণত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম 'নূর'। সকল বাধা ও বিচ্ছিন্নতার পর্দাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এ নূরে অবগাহন পূর্বক এর সাথে নামে কামে রঙ ও রূপে একাত্ম হওয়ার নামই মারেফাত ও মাকছুদ। এ মাকছুদ হাছিলের জন্যই আল্লাহ্ পাক কোরানে তাওরাত শব্দটি সাক্ষীরূপে বর্ণনা করেছেন

এবং বলেছেন, جاء به موسى نورا وهدا للناس (যাআ বিহি মূসা নূরান্ অ হুদাললিন্ নাস) অর্থাৎ, মূসার ওপর 'নূর'ই অবতীর্ণ করা হয় এবং এ নূরই গোমরাহদের জন্য হেদায়েত ও মারেফাতপন্থীদের মাকছুদ। কারণ নূর অর্থ স্বাদ ও শক্তি প্রভৃতি। যেমন প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও তৃপ্তি থাকা প্রয়োজন, তা না হলে স্বাদ ও শক্তিহীন বস্তু পানাহারের যোগ্য হয় না। এ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও লোকেরা তাওরাতকে– تجمعلونه قرا طيس (তাজ আলু নাহু কারাতিসা) পৃষ্ঠাবলি সম্বলিত গ্রন্থ ও তাবিজ তুমারে পরিণত করেছে। অর্থাৎ কালামে এলাহি কোনো কাগজ এবং তাবিজ ও পুস্তকের নাম নয় বরং প্রত্যেক কালামে এলাহি এক একটি নূরময় সাগর। এ নূরের সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তিগণ হলেন এ সাগরের মাছ। এ দুর্বল মানুষের মধ্যে যখন নূরের শক্তির সৃষ্টি হয় তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় এবং শ্রবণশক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং বেহেশত ও বেহেশতবাসীগণ তাঁর গোচরীভূত হয়। কেননা বেহেশত প্রভৃতি নূরী ও সূক্ষ্ম জিনিস, তাই এ সাগরের মাছ নূরময় হলেই নূরময় জিনিসগুলো দেখতে পান। তখন নূরের ভাণ্ডার তথা আল্লাহর সাথেও দিদার লাভ হয় এবং তিনি তাঁকে দেখতে সক্ষম হন। কারণ তাঁর এক নাম নূর। জাত ও সেফাত এবং মহত্ত্ব ও মহিমা সব দিক দিয়েই তিনি নূর। আর এ নূরই কালামে এলাহির সারবস্তু। এতদসত্ত্বেও تبـد ونها وتخفون كثيرا (তুবদুনাহা অতুখফুনা কাছিরা) অর্থাৎ, "যা ইচ্ছা প্রকাশ কর এবং অধিকাংশ গোপন রাখ।" সত্তাগত নূর যখন আপন বৈশিষ্ট্যের স্তরে স্তরে সকল বস্তুর মূল বলে স্বীকৃত তখন তোমরা তা গোপন করছ। প্রকৃতপক্ষে এ নূরই শরিয়তের সার ও নির্যাস তথা ত্বরিক্বত। কেননা শরিয়ত হল নির্দেশ সংক্রান্ত শব্দ ও কালাম। আর যখন এর গহীনে নূর থাকে তখন তাকে বলা হয় কালামে নূরী। নূরহীন শব্দ ও বাক্য মাত্রই অকেজো ও অনর্থক। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শব্দগুলোকে তাওরাত ও কোরান বুঝেছেন, তিনি এর গূঢ় তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত নন। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এ ভুল ভেঙে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন– "তোমরা আপন আপন অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কালামে এলাহির অর্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাক।" সকল আহলে কিতাবের জন্যই এ সতর্ক বাণী প্রযোজ্য।

নূরের প্রকৃতি

নূর দু প্রকার–সেফাতি (গুণগত) ও জাতি (সত্তাগত)। সেফাতি নূর প্রাকৃতিক ও অতি প্রাকৃতিক উভয় জগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত, একে নূরে ইমকানীও বলা হয়। প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তরে এ নূর মিশে আছে। সে স্তর আলমে খালক বা সৃষ্টি জগতের হোক অথবা আলমে আমর বা অদৃশ্য জগতের হোক। দ্বিতীয় প্রকারের নূর হচ্ছে 'নূর-এ-জাতি' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার মূল ও সত্তাগত নূর। এ নূর সমস্ত নূরের উৎস। অর্থাৎ জাত হতে সেফাত, লামাকান হতে মাকান, বর্ণহীন হতে বর্ণ, আকারহীন হতে আকার এবং বেনিশান হতে নিশান। কিন্তু মূল এককের একাকিত্বে কোনো

অংশীদারিত্বের অবকাশ নেই। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, الله نورا لسموات والارض (আল্লাহ্ নূরুস সামাওয়াতে অল আরদে) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা আকাশ ও জমিনের নূর। আকাশ ও জমিন সমূহের উৎসের নামই নূর এবং তাই আল্লাহ্। আল্লাহ্ তায়ালার জাত বা মূল প্রত্যেক সৃষ্টির মূলেই ভাস্বর। যেমন কোনো বস্তু থেকে উৎপাদিত জ্বলন্ত আগুনে সে বস্তুটি নিক্ষিপ্ত হলে তৎক্ষণাৎ সে আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে এবং সবই রূপান্তরিত হবে আগুন আর আগুনে। তখন আগুন ছাড়া কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু এ আগুন যখন কোনো বস্তুর মধ্যে স্বরূপে সুপ্ত ছিল তখন আপেক্ষিক অর্থেই তা সুপ্ত ছিল। অন্যথায় প্রকৃত অর্থে আগুন তার সত্তা, গুণ ও পূর্ণতা নিয়ে সদা বর্তমান রয়েছে। আগুন কখনো তার স্বীয় সত্তায় উজ্জ্বল আবার কখনো স্বীয় নফসের জুলমত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এভাবেই শীতলতা ও উষ্ণতা উভয়ই তার সত্তার জাতে অন্তর্ভুক্ত। আগুনের প্রকাশ ও গোপন হওয়া উভয়ই তার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে আগুন গোপন বা প্রকাশ হওয়া কোনোটাই হয় না বরং সর্বদাই বর্তমান। কিন্তু যিনি দেখছেন, তার দৃষ্টিশক্তির অভাবেই এত কথা। কেননা তিনি জানেন না যে, কাঠ ও পাথর থেকে যে আগুন উৎপাদিত হয়, সে কাঠ ও পাথর ঐ আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে কিভাবে তা সম্পূর্ণ আগুনে রূপান্তরিত হয় এবং বৃহদাকার কাঠ ও পাথরগুলো কিভাবে আগুনের রূপ ধারণ করে। অনুরূপভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা স্বীয় সত্তা ও গুণে, আগুন এবং সকল বস্তুর মধ্যে সদা বর্তমান ও ব্যাপ্ত। কিন্তু রঙ ও রূপের বিচারে সেফাতি নূর একটি ভারী ও স্থূল গুণ। যেমন ফুল ও ফল, বৃক্ষ ও প্রস্তর এবং চন্দ্র-সূর্য ও তারকা প্রভৃতি। এদের দেখা যায় চক্ষু দ্বারা, এগুলোর গন্ধ পাওয়া যায় নাসিকা দ্বারা, শব্দ শোনা যায় কান দ্বারা, স্বাদ পাওয়া যায় জিহ্বা দ্বারা, এদের স্পর্শের জন্য রয়েছে হাত প্রভৃতি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত প্রকাশ্য নূরের কতিপয় অবস্থা জানা গেল। নূর স্বাদের মতো রূপহীন হলেও প্রকৃতপক্ষে মূলের তুলনায় এগুলো নূরের প্রতিচ্ছায়া। অর্থাৎ, নূর-এ-জাতি সকল নূরের মূল ও উৎস এবং সকল বস্তুর উৎসই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম হয়। যেমনি সূক্ষ্ম ফল, বৃক্ষ, ডালপালা, পাতা ও ফুল প্রভৃতির উৎস বীজ ও অঙ্কুর। একটি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যেই বর্তমান থাকে গোটা বৃক্ষটি, তার ডালপালা আকৃতি প্রকৃতি ফুল-ফল সব কিছু নিয়ে। মোট কথা রঙিন রঙহীন সব নূরই আল্লাহ্র সত্তায় বর্তমান। তাঁর পবিত্র সত্তাই সকল বস্তুর মূল ও সারবস্তু এবং রূপ ও আকৃতি। স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেন, صبغة الله ومن احسن من الله صبغة (ছিব্গাতুল্লাহি ওয়া মান্ আহসানু মিনাল্লাহি ছিবগাহ্) অর্থাৎ, "আল্লাহর রূপের চেয়ে উত্তম কোনো রূপ নেই।" তাঁর অন্যতম নাম নূর। এর মধ্যে তাঁর জাত, সিফাত এবং মহত্ত্ব ও মহিমা সবই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিতে বিদ্যমান রূপ ও আকৃতি সবই তাঁর জাতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্র কালামে বর্ণিত আছে– هو الأ ول والاخرو الظاهر والباطن وهو على كل شئ محيط (হুয়াল্ আউয়ালু ওয়াল্ আখেরু ওয়াজ্ জাহেরু ওয়াল্ বাতেনু ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িম্

মুহিত)। অর্থাৎ "আল্লাহ্ তায়ালাই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত, বাহির ও ভিতর এবং আল্লাহ্ সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত।" আল্লাহ্ স্বীয় জাত ও সিফাত এবং পরিপূর্ণতা সহকারে সকল বস্তুতে বর্তমান। তিনি স্বীয় সত্তায় মজুদ না থাকলে তাঁর সর্বত্রই ব্যাপ্ত থাকার কোনো অর্থ হত না। যেমন আগুন দুনিয়ার সব কিছুতেই ব্যাপ্ত রয়েছে– এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আগুন নেই। দুটি কাঠকে ঘর্ষণ করলে তৎক্ষণাৎ সে কাঠ থেকে আগুন বেরিয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে পাথর বা অন্য কোনো জিনিসেও সজোরে আঘাত করলে সেখান থেকে আগুন বেরিয়ে আসবে। আগুন এমন এক বস্তু যার বিভাজন ও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে আগুনের উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি তার সত্তার মধ্যেই বর্তমান এবং আগুন নিজেই আপন সূক্ষ্ম রূপকে ভারী রূপে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হয় এবং কখনো দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুরূপভাবে প্রদীপ জ্বালানো নিভানোর মাধ্যমেও আগুনের প্রকৃতি অবহিত হওয়া যায়। আল্লাহর পূর্ণ নূর যা আগুন, পানি, মাটি এবং বায়ুর উৎস, তা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে কখনো স্বীয় সত্তার বিকাশ ঘটায় আবার কখনো অদৃশ্য হয়ে নাস্তি রূপ প্রদর্শন করে। কখনো স্বীয় সত্তার উষ্ণ ভাবকে পরিবর্তন করে ঠাণ্ডা ও শীতলতাকে স্বীয় সত্তায় ধারণ করে, আবার কখনো সাকারের সিফাত ত্যাগ করে নিরাকার রূপ ধারণ করে। কোথাও ভূগর্ভে তিনি বৃক্ষ এবং বীজ প্রভৃতির উৎকর্ষতা ও সজীবতা এবং ফল-ফলাদি পরিপুষ্ট ও মিঠা-খাট্টার উৎস। কখনো জলবায়ুর অবস্থার সাথে সংযুক্ত হয়ে স্বর্ণ রৌপ্য খনির স্রষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার ঊর্ধ্ব জগতের উত্তাপের সাথে সংযুক্ত হয়ে সকল বস্তুর মূল রূপ ধারণ করেন। কখনো জল বিন্দু, ঠাণ্ডা বায়ু ও অগ্নিশিখায় নূররূপে সংযুক্ত হয়ে দৃশ্যমান বিশ্বের অস্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, কখনো উক্ত সূক্ষ্ম নূর-নূরের দেহও সম্মানিত ফেরেশতার আকার ধারণ করেন, কখনো তিনি বিরাট আরশ, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্তের আধার হয়ে যান। কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আল্লাহ্র নূরের এ বর্ণনা– مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فى زجا جة الزجاجة كانها كو كب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشر قية ولا غربيه (মাছালু নূরিহি কামিশকাতিন্ ফিহা মিসবাহুন্ আল্ মিস্বাহু ফি যুজা যাতিন্ আয্ যুজাযাতু কা'আন্ নাহা কাউকাবুন দুররিইউ ইউকাদু মিন শাজারাতিম্ মোবারাকাতুন যাইতুনাতুল্লা শরাকিয়্যাতুন অলা গারবিয়াহ্) অর্থাৎ তাঁর নূরের উপমা – "কুলঙ্গি যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এ প্রজ্জ্বলিত হয় পূত পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল হতে যা প্রাচ্যেরও নয় প্রতীচ্যেরও নয়।" অর্থাৎ যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেখানেরও নয় এবং যেখানে সূর্য অস্তমিত হয় সেখানেও নয়।

আল্লাহ্র জাতপাকে মৌজুদ গুণাবলিসমূহ বিশিষ্ট ও সাধারণ, এ দু রকম। তবে 'সিফাতে মাশিয়্যাৎ' যাকে ইরাদা বা ইচ্ছা বলা হয়, তাই আল্লাহ্র সকল গুণের সেরা। অবশিষ্ট সকল গুণ তার অধীন। আল্লাহ্ কোনো কাজের ইচ্ছা করা মাত্র তা

হয়ে যায়। কোনো কাজ হওয়ার পূর্বে তা শুরু হয় এবং সে কাজের পরিপূর্ণতায় তার সমাপ্তি ঘটে। যেখান থেকে কোনো কাজ শুরু বা আরম্ভ হয় তারই নাম উক্ত আয়াতে 'শারক' বা প্রাচ্য এবং যেখানে কাজের সমাপ্তি ঘটে তাকেই বলা হয় 'গারব' বা প্রতীচ্য। জয়তুন বৃক্ষটি প্রাচ্যেরও নয়, প্রতীচ্যেরও নয়। যে জিনিসের শুরু ও সমাপ্তি আছে তা স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। সুতরাং ইচ্ছা গুণও স্থায়ী এবং চিরন্তন নয়। কিন্তু এছাড়াও আল্লাহ্‌র একটি বিশিষ্ট গুণ রয়েছে। এ গুণ ইচ্ছার অধীন নয়। বরং এর কাছে ইচ্ছা একেবারেই বেকার হয়ে যায়। সে গুণটি হল 'সিফাতে-হুব্বি' তথা প্রেম গুণ। এ একটি আদি নূর। উক্ত আয়াতে বিবৃত জয়তুন বৃক্ষ দ্বারা এ প্রেমকেই বোঝানো হয়েছে। যার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য তথা আরম্ভ ও শেষ, কোনোটাই নেই। একেই আল্লাহ্ জয়তুন বলেছেন। এটাই ইশক বা প্রেম। তাই প্রেমের স্থলে ইচ্ছার কোনো কার্যকারিতা নেই। কারণ অন্য সব গুণই প্রেমের অধীন। এমন কি প্রেমের মোকাবিলায় অন্য সব গুণের অস্তিত্বই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, لاشرقية ولاغربية (লাশার্‌কিয়ীতু অলা গারবিয়া) অর্থাৎ, "প্রাচ্যেরও নয় এবং প্রতীচ্যেরও নয়।" অর্থাৎ, প্রেম এমন একটি শাশ্বত নূর সে পবিত্র সত্তায় বর্তমান ও ক্রিয়াশীল। যার স্তুতিকার স্বাদানেবশীই আদিম সত্তার শাশ্বত প্রেমিক।

এ জন্যই প্রেমকে জয়তুনের তৈল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ রহস্যের কারণেই আশিক ও মাশুকের মধ্যে প্রেমই হচ্ছে প্রকৃত মণিরত্ন, যা উভয়েরই মধ্যমণি ও মৌলবস্তু। এ প্রেম আপন প্রেমিকের ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার যাবতীয় গুণাবলি একে একে বিলুপ্ত করে রহস্যালোকে আবৃত করে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন স্বাদ আস্বাদন করিয়ে আপন সত্তায় মিলিয়ে এক করে নেয় এবং দ্বৈত সত্তার বিলুপ্তি ঘটায়। তখন প্রেমিক নিজেকে প্রেমাস্পদের রূপে এবং প্রেমাস্পদ নিজেকে প্রেমিকের রূপে দেখেন এবং এ দুয়ের যে কোনো পক্ষ থেকেই "আনাল হক্ব" আওয়াজ উঠুক না কেন তা উভয়েরই অভিব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে উম্মতের আশ্রয় হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেন, ان الله خلق ادم على صورته (ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা ছুরাতিহি) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা আদমকে আপন রূপে অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার হাকিকী সুরতে বানিয়েছেন। অন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– من رأنئ فقد رأى الحق (মান রাআনি ফাকাদ রা আল হাক্কা) অর্থাৎ, "যে আমার প্রকৃতরূপ দেখেছে অবশ্যই সে আল্লাহকে দেখেছে।" তবে এ পর্দার বা স্থূলচোখে তা দেখা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে শামসুল হক তাবরেজী বলেন, "দ্বৈত সত্তার বিলোপ ঘটিয়েছি, তাই দুবিশ্বকে একই দেখি, এককেই দেখি, একেরই অন্বেষণ করি, এককেই জানি, একেরই আকাঙ্ক্ষী। হে শামস তাবরিজি, এখানে কিসের উন্মাদনা! মগ্নতা ও আসক্তি ছাড়াতো কিছুই হয় না।"

মোট কথা উক্ত আয়াতে বৃক্ষ দ্বারা উদ্দেশ্যপ্রেমিক, তৈল তার প্রেম ও সলিতা তার প্রেমাস্পদ। স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এখানে প্রেমাস্পদ। প্রেমিকের প্রেমে আল্লাহ্ তায়ালা অন্তরে খুশি ও আরাম অনুভব করেন এবং এ খুশি নূরে এলাহির আভায়

বিশেষভাবে প্রদীপ্ত ও আলোকোজ্জ্বল হয়। কালামে রব্বানীর ভাষায় এর সৌন্দর্যকে তৈল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বলা হচ্ছে– يكاد زيتها يضئ (ইয়া কাদু যাইতুহা ইউযিউ) অর্থাৎ, "অচিরেই এ গাছের তৈল প্রদীপ্ত হবে।" ولو لم تمسسه نار (ওলাও লাম্ তামসাস্‌হু নারুন) "যদিও আগুন তাকে স্পর্শ করেনি।" এতে এতই চমক ও স্বচ্ছতা এবং ঔজ্জ্বল্য রয়েছে যে আগুন ছাড়াই তা প্রদীপ্ত হয়। এ কারণেই বলা হচ্ছে, نور علي نور (নুরুন্ আলা নুর) অর্থাৎ, "নূরের উপরে নূর।" জয়তুনের স্বচ্ছতা প্রদীপের শিখায় মিশেছে, নূরাধারের দীপ্তি নূরের ঝলককে আরও প্রখরতর করেছে– যেমনি আলোকিত হয় বিজলী বাতির দ্বারা ধরণী। ফানুস রঙিন হলে প্রদীপের আলোও অনুরূপ রঙিন হয়, সুতরাং ফানুস যখন প্রদীপের আলোকে স্বরূপে রূপান্তরিত করতে পারে এবং এর বিচ্ছুরণে প্রতিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়, তখন প্রেমিকের অন্তর তো এ নূরে এলাহির জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ অনন্ত সত্তা, তাঁর জাতি নূর দ্বারা কামেল মানুষের অন্তর আলোকিত। অনন্ত সত্তার গুণাবলির শুরু এবং শেষ কিছুই নেই। তা সদা সর্বদা বর্তমান। সুতরাং প্রেমিকের অন্তরের নূর নিঃসন্দেহে আদি-অনন্ত নূর। এ প্রাচ্যেরও নয় প্রতীচ্যেরও নয়। আর এর পতনও নেই এবং নেই ক্ষয় আর বৃদ্ধি। এ স্বীয় সত্তায় স্বয়ং বৃদ্ধি পায় এবং নিজেই সংকুচিত হয়। সাদা, কালো, মিঠা, লবণাক্ততা, আলো, অন্ধকার, ছোট, বড় হওয়া, সবই তার সত্তাগত। যেমন– বীজরূপে একটি দানা ক্ষুদ্র হলেও বৃক্ষ ও ডাল-পালার বিচারে তা-ই বৃহৎ। এক হিসাবে তিনি এক, অন্যরূপে তিনি একক। যথা-একটি প্রদীপ হতে যতই প্রদীপ জ্বালানো হবে তাতে প্রদীপের সংখ্যা বাড়বে কিন্তু মূল প্রদীপের কোনোই ক্ষয়-বৃদ্ধি হবে না। তবে একে একটি মূল প্রদীপই সর্বসমন্বয়ে একক প্রদীপরূপে গণ্য হয়। সুতরাং তিনি কখনো আহাদ তথা এক আবার কখনো ওয়াহেদ তথা একক। অতএব তাতে বিদ্যমান ভালোমন্দ সমস্ত গুণাবলিতেই তাঁকে ডাকা যায়। যেমন একই ব্যক্তি সময় বিশেষে পবিত্র, অপবিত্র, শান্ত, অশান্ত, সন্তুষ্ট, অসন্তুষ্ট প্রভৃতি ভালো মন্দ যখন যে গুণ তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে তখন সে সেই গুণে ভূষিত হয় এবং অনুরূপ নামে তাকে ডাকা হয়। যথা– রহিম, করিম এবং কাহ্‌হার প্রভৃতি। করিম ও রহিমের বিপরীত নাম হলো কাহ্‌হার। প্রতীয়মান হচ্ছে যে আপন সত্তায় আত্মবিরোধী গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একই সত্তায় আত্মবিরোধী গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এ সব গুণই রূপক ও আপেক্ষিক। উদাহরণস্বরূপ লাল রঙের সাথে হলুদ মিশানো মাত্রই তা কালো হয়ে যায়, অনুরূপ এক রঙের সাথে অন্য রঙ মিশালে তা নূতন রং ধারণ করে। এভাবে এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তু মিশ্রিত করলে ভিন্নরূপ ও গুণ সৃষ্টি হয়, যথা-ঔষধ, বারুদ এবং দিয়াশলাই প্রভৃতি। তবে সৃষ্টি হওয়ার বৈশিষ্ট্য তার সত্তাগত। এ জন্যই তিনি আপনা আপনি সৃষ্টি হন। আর এ নূরী বৈশিষ্ট্যই তার মূল সত্তা। এ কারণেই কোরান মজীদে ঘোষণা করা হচ্ছে, ماخلقت هذا باطلا (মাখালাকতা হাযা বাতিলা) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তায়ালা কোনো কিছুই অনর্থক ও

অকারণে সৃষ্টি করেননি।" অতএব বলা হচ্ছে- يهدى الله لنوره من يشاء (ইয়াহদি আল্লাহু লিনুরীহি মাইয়াশাউ) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আধ্যাত্মজ্ঞান ও ঈমানের আসল নূর দেখান অর্থাৎ নূরের অন্তরকে জাতি নূরে নূরময় করেন।" যদিও অন্তরের আকৃতি সানুবর বৃক্ষের মতো। হাদীস শরীফে আছে– القلب هى مضغة اللحم فيها بطن حتى سبعة بطن (আল্‌কালবু হিয়া মোজগাতুল লাহমে ফিহা বাতনুন্ হাত্তা ছাব্‌য়াতা বাতনুন্) অর্থাৎ, "অন্তর হচ্ছে এক টুকরা মাংস, তাতে একটি পেট রয়েছে, এমনিভাবে সাতটি পেট রয়েছে। অর্থাৎ একটি পেটের ভিতরে আরেকটি এবং তার ভিতরে আর একটি, এভাবে সাতটি পেট রয়েছে। এর মধ্যে যেটি সর্বশেষ এবং অন্য সব কটির গভীরে রয়েছে তাকে কলবে মোদাব্বির ও মূল মানব সত্তা বলা হয়। মাথার তালুর সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। সেখানেই চিরন্তনের রত্ন ভাণ্ডারের বিরাজস্থান। তিনি তাঁর যাবতীয় সত্তাগত গুণসহ তথায় বিদ্যমান। তাই আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কালামে এরশাদ করেন, نحن اقرب اليه من حبل الوريد (নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন্ হাবলিল ওয়ারিদ) অর্থাৎ, "আমি তার ঘাড়ের সাহারগ হতেও অতি নিকট।" সাধারণত মানব সত্তা ও আল্লাহর সত্তার ব্যবধান অনেক। তবে মানুষের সৎগুণাবলির প্রেক্ষিতে তিনি মানুষের অতি নিকটে। বস্তুত, মানুষ নিজের নফস থেকে যেমনি নিকটে তেমনি দূরেও। তাই তো রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, من عرف نفسه فقد عرف ربه (মান্ আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু) অর্থাৎ, "যে নিজের নফসকে চিনেছে, সে তার প্রভুকেও চিনেছে।" অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর সত্তাগত নূর বিদ্যমান, সেখানেই মানব সত্তা দৈহিক মানুষের সাথে সহাবস্থান রত। নিম্নোক্ত হাদিস শরীফ এরই দৃষ্টান্ত– هم جليس الله (হুম্ জালিছাল্লাহ) অর্থাৎ, আল্লাহপ্রেমিকগণ আল্লাহর সাথে এক স্থানে অবস্থানকারী, আলাপকারী এবং উভয় পক্ষই স্বীয় প্রেমের মাধুর্যস্বাদ আস্বাদনকারী, যেমন আস্বাদন গ্রহণ করে কোনো সুস্বাদু ও মজাদার বস্তু আহারকারীর মুখ ঐ বস্তুর স্বাদ ও মজা।

মুখ একটি বিশেষ অঙ্গ। এর একটি স্বাদ গ্রহণকারী শিরা রয়েছে। তা না থাকলে কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করাই সম্ভব হত না। প্রকৃতপক্ষে স্বাদ আস্বাদনকারী শিরার মূলেই রয়েছে মিঠা, খাট্টা ও বিভিন্ন অবস্থা নির্ণয়ের উৎসস্থল। আসমান ও জমিনে যত বস্তু রয়েছে সব বস্তুর সঙ্গেই রয়েছে রঙ-বেরঙের স্বাদ। কিন্তু এসব কিছুর স্বাদ আস্বাদন করার শক্তি একই স্বাদ আস্বাদনকারী শিরার মূলে নিহিত রয়েছে। এর দ্বারাই বিভিন্ন প্রকার স্বাদ উপলব্ধি করা যায়। উক্ত শিরার এক স্থান দ্বারাই মিঠা খাট্টা প্রভৃতির স্বাদ অনুভূত হয়। যেমন 'আলিফ' একটি অক্ষর। এক হিসেবে তা কোনো দোয়াতের কালি এবং সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে একটি সংখ্যা, অন্য হিসেবে তা একটি নকশা এবং এর অর্থের বিচারে বহু অর্থবোধক। অনুরূপভাবে উক্ত রগ বা শিরা এক হিসেবে রক্ত ও মাংস, আরেক হিসেবে জায়গা বা স্থান, এক হিসেবে সমুদ্র বা নদী, অন্য হিসেবে তা উর্ধ্বলোক ও অধঃলোক, এক

হিসেবে তা চার পদার্থ (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) এবং তার সার। কোনো অবস্থায় তা নিকটে এবং দূরে, আবার কোনো অবস্থায় হাজের ও গায়েব। এক হিসেবে তা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এক হিসেবে তা পাক ও নাপাক অন্য হিসেবে তা তৃপ্ত ও অতৃপ্ত। এক হিসেবে তা গুণ ও বিকাশ, অন্য হিসেবে তা নূর ও সত্তা, এক হিসেবে তা বহুর সমাহার, এক হিসাবে তা স্থায়ী ও অস্থায়ী। কোনো বিচারে তা এক ও একক এবং কোনো বিচারে তা আশিক ও মাশুক। এ রহস্য অদ্ভুত ও সীমাহীন। কিন্তু যে বিষয়টি সূক্ষ্ম ও জটিল তা উপলব্ধি ও অনুধাবন করাও জটিল। বস্তুত প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি দুভাগে বিভক্ত। যথা– স্থূল ও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ মোটা ও মিহিন। এত হল মুখ ও জিহ্বা দ্বারা গৃহীত স্বাদের বিবরণ। তবে চোখেরও ঠিক একই অবস্থা। চোখের মধ্যে একটি পর্দা ও শিরা রয়েছে। তাই চোখ উপভোগ ক্ষমতা ও দৃষ্টি শক্তির উৎস। এসব হয় পর্যায়ক্রমে যেমন বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি। অর্থাৎ জাহেরী চোখ দ্বারা দেখা ও অন্তরের চোখ দ্বারা দেখা। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখাকে হাজার হাজার রকমে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন এর মধ্যে রয়েছে খাব, কাশফ, বোধি ও ইলহাম, বিশ্বাস ও ঈমান, এরফান, অধ্যাত্মজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান। যাকে আরবিতে বলে 'আনা', ফারসিতে 'মান' এবং হিন্দিতে 'ম্যায়'।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সামগ্রিক সত্তাই আমি ও আমাদের মূল সত্তা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব যেখানে মূল সত্তা বর্তমান সেখানে তার গুণাবলিও যথারীতি বর্তমান। আর যেখানে গুণাবলি থাকে সেখানে মূলের প্রেক্ষিতে তার ছায়াও থাকে। সুতরাং যেখানে ছায়া সেখানে তার কর্মও রয়েছে। এজন্য আল্লাহ্ কালামে পাকে এরশাদ করেন, والله على كل شئ محيط (ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি সাইয়িম মূহীত) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তায়ালা সকল বস্তুতে পরিব্যাপ্ত।" এখানে বস্তু অর্থ সাময়িক বা অস্থায়ী বস্তু। আল্লাহ্ পাক বলেন, كل شئ فان (কুল্লু শাইয়িন্ ফান্) অর্থাৎ "সাময়িক সমস্ত বস্তুই ধ্বংসশীল।" এখানে উল্লেখ্য যে, হাস্তির ও নিস্তির তথা স্থায়ী ও অস্থায়ীর সম্পর্ক শাব্দিক ও প্রেক্ষিক। কারণ ধ্বংসশীল শব্দটিও সাময়িক। আসলকে বোঝা গেলে তা জাতে হাকিকী দ্বারা পরিব্যাপ্ত বোঝা যাবে। অর্থাৎ, সত্তাগত নূরকেই কখনো সত্তা আবার কখনো নূর বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের রূহ্ ইত্যাদি সত্তাগত নূর। কিন্তু কোনো হিসেবে তা নূর আবার অন্য হিসেবে তা বীর্য, কখনো তা রক্ত, কখনো অস্থিমাংস এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নামে আখ্যায়িত। কিন্তু রূহ্ যখন ইন্দ্রিয়াদি ও সব রকম গুণাবলিসহ বিদ্যমান থাকে তখনই তাকে রূহ্ বলা হয়। অনুরূপভাবে রূহ সকল জৈবিক গুণের সমষ্টি। অর্থাৎ ভালোমন্দ উভয় প্রকার গুণাবলি রূহে বর্তমান থাকার নামই রূহ্। বস্তুত তা-ই-নূর। এ থেকেই সকল বস্তুর জীবন ও স্থায়ীত্ব। এ জন্য তার নাম হয়েছে 'হাইউন' ও 'কাইয়ুমুন্' অর্থাৎ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। সুতরাং জাতে পাকের সত্তায় সদা মজুদ নেই এমন কোনো বস্তু নেই। অতএব জাতে পাকের সত্তা ছাড়া কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং জাতেপাকই সত্য। তাই لا اله الا الله (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এর অর্থ হচ্ছে–

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো সত্তা নেই, তিনিই একমাত্র সত্তা। প্রাধান্যতার কারণে সব কিছুর মধ্যেই 'জাতেহক্ব' বর্তমান রয়েছে। অতএব কোনো কিছুই আল্লাহর সত্তার বাইরে রইল না। কিন্তু যারা এর বিপরীত অর্থ বুঝেছে তারা ভুল বুঝেছে এবং ভুল করেছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ ব্যক্তি মোমেনই নয়। কালেমার 'লা' শব্দ ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুকেই মিটিয়ে দিতে পারে না। কিন্তু এ অস্তিত্ব মিটানো তাও কাল্পনিক অর্থে। অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোনো শরীক থাকলে নিছক 'লা' শব্দের ভয়ে কোনো অংশীদার তার অধিকার ছেড়ে দিত না। কালেমার আসল প্রতিপাদ্য এবং উদ্দেশ্যই এর অর্থ। কোনো অক্ষর বা শব্দ এর উদ্দেশ্য নয়। কারণ কাগজে খচিত কালেমাকে কেউই গ্রহণ করে না বরং এর প্রতিপাদ্য ও সারই সকলের নিকট গ্রহণীয়।

আধ্যাত্মিক তথা পরকালের অভিভাবক

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (ওয়াল্ মোমিনুনা ওয়াল্ মোমিনাতি বা'জু হুম্ আউলিয়াউ বা'জিন্ ইয়া'মুরুনা বিল্ মা'রুফি অয়ানহাওনা আ'নিল মুনকার) অর্থাৎ, "মোমেন নরনারীগণ একে অন্যের বন্ধু ও অলি বা অভিভাবক। নিজেদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার খাতিরে তাঁরা একে অন্যকে সৎকর্মের আদেশ করেন এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখেন।" অলিদের আন্তরিক প্রতিফলন দ্বারা অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্যন্ত কারও মধ্যে সৎকর্ম করা এবং অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা জন্মায় না। এ আন্তরিক প্রতিফলনশক্তিকেই বেলায়েত বা আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্ব বলা হয়। এতেই নিহিত রয়েছে, আল্লাহ্র প্রেম ও মহব্বত এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঐশীজ্যোতি প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ও সাধারণ তথা মুর্শিদ ও মুরিদ রয়েছে। যিনি এদের মধ্যে বিশিষ্ট তিনিই অলি। বিশিষ্টদের প্রতি সাধারণদের বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা ওয়াজেব বা কর্তব্য। আর সাধারণদের জন্য বিশিষ্ট অলিদের বন্ধুত্ব থেকেই বেলায়েতের সূত্রপাত হয়। এ জন্যই সকল বেলায়েতের উৎস হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেন, لايؤمن احد كم حتى أكون احب اليه من نفسه وما له و ولده و والده الناس أجمعين (লাইউ'মিনু আহাদুকুম্ হাত্তা আকুনা আহাব্বু ইলাইহি মিন্ নাফসিহি ওয়া মালিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি অননাছি আজমাঈন) অর্থাৎ, "তোমরা কেউই মোমেন হবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানব গোষ্ঠী হতে আমার সাথে অধিক বন্ধুত্ব রাখ।" এতেই প্রমাণিত হয় যে, বিশিষ্ট অলিদের প্রতি বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাবোধই সাধারণ অলিদের জন্য বেলায়েত স্বরূপ। এজন্য আল কোরানে এরশাদ হচ্ছে– كونو امع الصادقين (কুনূ মাআ'সসাদিকীন) অর্থাৎ, "সৎ তথা অলিদের সাথী হয়ে যাও, তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব

ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাঁদের অনুগত হয়ে যাও।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত খাজা আহারাব কুদ্দুস ছেররুহু স্বীয় 'ইছবাতে রাবেতা' পুস্তকে 'কুনু' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন 'কুনু' আদেশাত্মক ক্রিয়া। আর আদেশ দ্বারা ওয়াজেব প্রমাণিত হয়। এখন কুনু 'হয়ে যাও' এ আদেশটি দুভাবে পালন করা যেতে পারে– প্রথমত তাঁদের প্রকাশ্য প্রশংসিত গুণাবলির অনুসরণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক গুণাবলি আয়ত্ত করা এবং তাঁর সুরত দৃষ্টিতে ধারণ করার মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আরও জানতে চাইলে পরবর্তী আয়াত লক্ষ করুন। আল্লাহ্ বলেন, واصبر نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغد اوة والعشى يوريدون وجهه (ওয়াছবির নাফ্-সাকা মাআল্লাজিনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম্ বিল্ গুদুওয়াতি ওয়াল আশিয়্যে ইউরিদুনা ওয়াজহাহু) অর্থাৎ, 'যারা সকাল সন্ধ্যা তথা সব সময় নিজেদের প্রতিপালকের স্মরণে লিপ্ত এবং তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টায় রত; তোমরা নিজেদেরকে তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর।' দেহ-মনে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল বিষয়ে তাঁদের গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত হও এবং তাঁদের সত্তা ও গুণাবলির আলোকে নিজেদের সত্তা ও গুণাবলিকে আলোকিত কর। তবেই সম্ভব হবে অভিভাবকত্ব। সত্তার জন্য সত্তার, গুণাবলির জন্য গুণাবলির, দেহের জন্য দেহের এবং আত্মার জন্য আত্মার। এভাবে যখন এক পলকের জন্যও পরস্পরের মাঝে দূরত্ব ও বিস্মৃতি ঘটবে না, তখনই পূর্ণতা পাবে সৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উক্ত আদেশটি।

প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদের এ রূপক অস্তিত্বেই মৌল হাকিকত নিহিত রয়েছে। কারণ রূপক অস্তিত্ব মাত্রেরই অন্তর অস্তিত্ব আবশ্যক আর অন্তর অস্তিত্বের জন্য হাকিকত আবশ্যক। সুতরাং হাকিকতের ধারকও নিঃসন্দেহে হাকিকত। অতএব অলিদের প্রতি প্রেম মূলত আল্লাহ্রই প্রতি প্রেম। আল্লাহ্ বলেন, من يطع الرسول فقد اطاع الله (মাইউতিউর রাসূলা ফাক্বাদ আতা আল্লাহ্) অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য। আর আনুগত্য তখনই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, যদি অলির জাহেরের সাথে নিজের জাহেরকে, অলির বাতেনের সাথে নিজের বাতেনকে এবং হাকিকতকে মূলের সাথে ফানা বা বিলীন করা যায়। প্রথমটি দৈহিক ফানা–এটাকে বলা হয় 'ফানা ফিশ্ শাইখ', দ্বিতীয়টি বাতেনী ফানা তথা 'ফানা ফির রাসূল' এবং তৃতীয়টির নাম 'ফানায়ে রূহ' তথা 'ফানাফিল্লাহ'। সংখ্যায় ফানা তিন, চার বা যতই হোক না কেন ফানার লক্ষ্যবিন্দু যাতে ফানাহ্ সম্পন্ন হবে, শাইখে নূরানীর মধ্যে তাঁর উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'শাইখে নূরী' তথা নূরময় মুর্শিদ 'পয়গম্বরেনূরীর'ই নূর। এটাই আল্লাহ্র নূর। এ জন্যই আল্লাহ্ ও নবীর এক নাম নূর। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ জাতিতে শাইখগণ নবী স্থানীয় বটে। হাদিস শরীফে আছে– الشيخ فى قومه كالنبى فى أمته (আশ্ শাইখু ফি কাউমিহি কাননাবিয়্যে ফি উম্মাতিহি) অর্থাৎ, "শাইখ তার জাতির মধ্যে– যেমন নবী

তাঁর উম্মতের মধ্যে।" প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের নূরী সত্তা সদা বিদ্যমান, অন্যথায় ফানা সম্ভব নয়। মাওলানা রুমী বলেন,

"চুঁকে জাতে পীরেরা কারদি কবুল,
হাম খোদা দর জাতাশ আমদ হাম রাসূল।"

অর্থাৎ, পীরের অন্তরই মুরিদের ঈমানের স্থান, সেখানে জাহেরী গুণাবলি ও সত্তাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ স্বরূপে বিদ্যমান। এগুলো ঈমান স্থানের প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া দ্বারাই মুরিদের অন্তর ও সর্বসত্তা প্রভাবিত হয়। আল্লাহ্ বলেন, بعضهم اولياء بعض (বা'জুহুম্ আউলিয়াউ বা'জিন্) অর্থাৎ, "তারা একে অপরের বন্ধু।" এখানে "বা'জ" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এ শব্দ দ্বারা নারী-পুরুষ সকলকে বোঝানো হয়েছে। নারীর জন্য পুরুষ এবং পুরুষের জন্য নারী মুর্শিদ হওয়াতে কোনো বাধা নেই। এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আন্তরিক যোগ সম্পর্ক থাকা প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ স্বীয় অন্তর হতে দ্বিতীয় সম্প্রদায় (মুরিদ) প্রথম সম্প্রদায়ের (মুর্শিদ) মহব্বত কোনো অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করবে না এবং স্বীয় দৃষ্টি হতে তাঁর সুরতকে দূরে সরাবে না। কেননা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের বেলায়েত হচ্ছে প্রথম সম্প্রদায়ের মহব্বত ও তাজিম করা এবং তার সত্তা ও সুরতকে পবিত্র নজরে দেখা গোস্তাখী বা অসম্মানের দৃষ্টিতে কোনো অবস্থাতেই না দেখা। কেননা অসম্মানের দৃষ্টি গোনাহগার ও অকৃতকার্য বানায়, আর যে ব্যক্তি সুলতানী বা পবিত্র নজরে অবলোকন করে সে পুণ্যবান ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। যেমন মা-বোনদের প্রতি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখাকে সুলতানি নজর বলে। সুলতানি নজরের নিকট গোস্তাখী নজর পরাজয় বরণ করে এবং এ কারণে নফ্সানি চোখ সুলতানি নজরের নিকট বেকার হয়ে যায়। হযরত মা হাওয়া বেহেশতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা হুর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম শুনলে কোনো নিকৃষ্ট ব্যক্তিরও অসৎ ইচ্ছা জাগে না। অনুরূপভাবে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও অনুরূপ অন্যান্যদের নাম শ্রবণ করলেও যে অবয়ব ও চেহারা খেয়াল হয় তা নিচু ব্যক্তিত্বের খেয়ালকেও দূষিত করে না, বরং এ সময় যে আকৃতি ও চেহারা খেয়াল হয় তা উৎকৃষ্টতর হয়। আর তাঁদের প্রতি কারও অকৃত্রিম আন্তরিক মহব্বতের কারণে তাদের কেউ যদি গায়েব হতে কাকেও দর্শন দান করেন তাহলে তা সৌভাগ্য আনয়ন করে এবং এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি তাদের কাউকে স্বপ্নে দেখে তা হারাম নয় বরং সৌভাগ্যের বিষয় এবং শুভ লক্ষণ। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কাউকে স্বপ্নে দেখে যে, তাঁরা তাকে নিজ স্তন থেকে দুধ পান করাচ্ছেন, তাহলে সে ব্যক্তি রুগ্ন থাকলে রোগ থেকে মুক্তি পাবে অথবা মহা বিপদ থেকে মুক্ত হবে অথবা অলি বা কামেল হয়ে যাবে। দেখা তিন প্রকার– চক্ষু দ্বারা দেখা, স্বপ্নে দেখা এবং কাশ্ফ দ্বারা দেখা। চোখের দেখা হলে তখনই হারাম যদি তাতে অপরাধের আশঙ্কা

থাকে। এ ক্ষেত্রে মা, বোনকে দেখাও হারাম, অন্যথায় হারাম নয়। যেমন কোনো ছোট শিশু বা বৃদ্ধ পুরুষ যারা ফেৎনা হতে পাক এবং কামমুক্ত, তাদের কোনো বেগানা নারীর প্রতি নজর করা দোষের নয়। স্বপ্ন বা কাশ্ফ দ্বারা দেখা হারাম নয় কিন্তু অপরাধ মনে দেখা অন্যায়। তবে কাশ্ফের অবস্থায় অপরাধ চিন্তা থাকেই না।

এছাড়া প্রয়োজনে অপরিচিত কোনো নারীর মুখোমুখি হওয়া বা কথা বলা বৈধ। যেমন কোনো নারী যদি ওস্তাদের কাছে নামাজ, রোজা, কোরান প্রভৃতি শিখতে চায়, তাহলে তার উচ্চারণ ও বাগধারা শিক্ষার জন্য তাকে উচ্চঃস্বরে ওস্তাদের সাথে কথা বলতেই হবে। তা না হলে তার পড়া শুদ্ধ হবে না। অনুরূপ পাক-পবিত্র, মাসিক ও গর্ভ, মণি-মজি এবং সাবালকত্ব ও নাবালকত্ব সম্পর্কে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে কোনো মামলা-মোকদ্দমার জন্য হাকিম বা শালিসের দরবারে হাজির হওয়া ও মুখোমুখি কথা বলা বৈধ। তেমনি পরকালের অভিভাবক বা নিজ মুর্শিদের সামনাসামনি হওয়া কোনো অন্যায় নয়। কারণ শিক্ষার্থী সর্বদাই পীরের সামনে থাকে। শারীরিক-মানসিক কোনো অবস্থাতেই বাতেনী অলির দৃষ্টি থেকে আড়াল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং জাহেরী দৃষ্টিতে দেখা কেন অপরাধ হবে? দেখো! সকল দৃষ্টির আড়াল হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদই হলেন পরকালের অভিভাবক এবং হাকিকী পিতা। জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা হাকিকী পিতা তথা মুর্শিদের মর্যাদা অনেক বেশি। তোমাদের মধ্যে দুনিয়াদার বহু মুত্তাকি ও পরহেজগার আছে, কিন্তু এমন কেউ নেই যে, খেয়ালের দৃষ্টিতে সব কিছুর চিন্তা করে না। সুতরাং চোখের দৃষ্টিকে তখনই অন্যায় জ্ঞান করা হবে যখন সে দেখার সাথে বদখেয়াল সংযুক্ত থাকে। এটাই "হল্লত-এ-গাই" বা দোষের কারণ। সুফিদের জন্য অন্যায় চিন্তা মরণবিষতুল্য। জাহেরী শরিয়তের বিধানে এটা নিষেধ ও হারাম। এজন্য নিজ বিবির সাথে সহবাস করার সময় যদি স্বীয় স্ত্রীকে অপর কোনো স্ত্রীলোকের মতো খেয়াল করে তাহলে তাও হারাম।

আওয়াজমাত্রই হারাম নয়। কোনো কোনো সময়ে আরবে নারীরা উলুধ্বনি প্রদান করে এবং অসংখ্য পুরুষ তা শোনে, এটাকে তো হারাম করা হয়নি। স্বয়ং হযরত মা ফাতেমা (রাঃ) থেকে উলুধ্বনি প্রমাণিত। বোখারী শরীফে এর প্রমাণ রয়েছে। মুত্তাকিদের জন্য হৃদয়গ্রাহী এবং মধুর আওয়াজ প্রয়োজনীয়।

যদি নারীর সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী আওয়াজ পরিত্যাজ্য হয়ই, কিন্তু উলুধ্বনি ও অয্দের আওয়াজে তা নেই। আর থাকলেও অয্দের অবস্থা শোরগোলের আকারে এবং উলুধ্বনি হয় সম্মিলিতভাবে, এ জন্য ব্যক্তিগত সুন্দরের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। আর ধরা পড়লেও উলুধ্বনি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। নারী পুরুষ উভয় হতেই অপরাধ ঘটে এবং এ উভয়ের কামভাবই অপরাধ ঘটায়। সুতরাং নারীদের জন্য উচ্চ আওয়াজ করা হারাম হলে তাদের জন্য অন্য পুরুষের আওয়াজ শোনা হারাম হবে না কেন? অপর পুরুষের প্রতি তাকানোও তো নারীদের জন্য হারাম হবে।

এর উত্তর কী? তাহলে কি পুরুষের জন্যও পর্দা ফরজ হবে, না কু-প্রবৃত্তি হতে বাঁচা ফরজ হবে? কিন্তু পুরুষদের জন্য লজ্জা নিবারণ ছাড়া অন্য কোনো পর্দা ফরজ নয়। তেমনি আল্লাহর অলিদের জন্যও নিয়ম আলাদা চাই সে অলি নারী বা পুরুষ হোক। জাহেরী শরিয়তের দৃষ্টিতে তাঁদের কোনো কাজ যথা উচ্চ আওয়াজ নিষিদ্ধ বলে মনে হলেও মূলত এগুলো নিষিদ্ধ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মহব্বতে অথবা পরকালীন শাস্তির ভয়ে নামাজে উহ্-আহ্ শব্দ করে অথবা উচ্চস্বরে কাঁদে তাহলেও নামাজ নষ্ট হবে না। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। এতে কারোরই গুনাহ্ হবে না বা নামাজ বাতিল হবে না বরং বিশেষ পুণ্য হবে এবং নামাজ হবে পরিপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র জিকির ইত্যাদিতে অনুরূপ কাজ হলে কী ক্ষতি আছে? যারা বলে যে, নারীদের উচ্চ আওয়াজ করা নিষিদ্ধ, এ কারণে তাদের জন্য আজান ও এক্বামত প্রয়োজনীয় হয়নি। তাদের স্মরণ থাকা উচিত, প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের জন্যও আজান-এক্বামত সর্বদা ওয়াজেব নয়। শুধু জামাতের জন্যই তা ওয়াজেব এবং জামাত ছাড়া মুস্তাহাব মাত্র। আর মুস্তাহাব ফরজ ও ওয়াজেবের মোকাবিলায় দলিল হতে পারে না। বরং এ থেকে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা শরিয়ত বিরোধী, ধোঁকা এবং আল্লাহর প্রেমিকদের বিভ্রান্ত করার শামিল।

ঈমানের বর্ণনা

ঈমান অন্তরের এক অবিচ্ছেদ্য প্রত্যয় বা বিশ্বাস। এ বিশ্বাস ঈমানদারের অন্তর থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। যে প্রত্যয় বা বিশ্বাস হৃদয় থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হয় তা ঈমানের সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত। ঈমানদারের হৃদয় ও অন্তরই ঈমানের স্থান। এখানেই বিশ্বাস ও ঈমান অবস্থান করে। ঈমানের স্থানেই সব রকম বিশ্বাস বিকাশ লাভ করে। বিশ্বাসের বিকাশের পরিপূর্ণতার পার্থক্যের দরুনই ঈমানের স্তরে মানসগত পার্থক্য অনুভূত হয়। বিশ্বাস ঈমানের স্থানে আবর্তিত হলে তাকে ঈমানভুক্ত বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঈমান একটি পবিত্র বিশ্বাস। এতে অজ্ঞতা ও বিস্মৃতির কোনো অবকাশ নেই। ঈমান তৌহিদে বিশ্বাসী মো'মিনের অন্তরকে 'যাতে ইলাহী'র বা 'ঐশী সত্তা'র সঙ্গে মিলনে মিত্রতা ও বন্ধুত্বময় করে তোলে। এটা না কোনো কলেমা ও বাক্য, আর না কোনো মৌখিক স্বীকৃতি, না কোনো কোরান-কিতাবের নাম না কোনো ইজমা-কিয়াছও। এর বৃদ্ধি কম হয় না। বরং ঈমান একটি 'তাওহীদী' নূর। জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতে তা ঈমানদারের সঙ্গে অবস্থান করবে এবং হাশরেও তা তার সাথেই থাকবে। তার স্বীয় কৃতকর্ম এরই সাথে যুক্ত হবে। কিন্তু হাশরে যে আমলনামা আবেদদেরকে দেয়া হবে তা বিচারের নিয়ম অনুযায়ী, দীনদারীর নিয়ম অনুযায়ী নয়। দীনদারী প্রমাণের জন্য যদি আমলনামা প্রদান করা হত তাহলে নবী ও অলিগণকে তা দেওয়া হত। হিসেব কিতাবের জন্য আমলনামা প্রয়োজন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবী-অলিগণ হিসেব থেকে

মুক্ত। আমলনামা হোক আর নাই হোক বরং সুরক্ষিত ফলকে অলৌকিক অক্ষরে সমস্ত কর্ম বিস্তারিত লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাগজ ও কিতাব হচ্ছে এর অবয়ব ও পরিচিতি। অক্ষর ও শ্রুতলিপি হচ্ছে এর চরিত্র ও গুণাবলি। ঈমানদার ব্যক্তি নিজের মধ্যেই তাঁর ঈমান ও আমলের সন্ধান পাবে। কাগজ ও কিতাব ঈমান দ্বারা তাঁর কোনো বিশ্বাস লাভ হবে না এবং শ্রবণ করে বা সাক্ষীর দ্বারাও ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। বরং বান্দা তার স্বীয় সত্তা ও তৎক্রিয়াদির দ্বারাই ঈমানদার হবে। মৌখিকভাবে স্বীকার করা, অন্তরে তা' সত্য জানা ঈমানের রোকন নয়। কেননা তাসদিক (আন্তরিক বিশ্বাস) নিজেই ঈমানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তা হলে কী করে তা ঈমানের রোকন হতে পারে? এ অসম্ভব। এখন অবশিষ্ট রইল মৌখিক স্বীকৃতি, এটাও ঈমানের কোনো সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত নয়। লক্ষ করুন, যার মৌলিক স্বীকৃতি আছে কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস নেই সে আল্লাহর নিকট কাফের। সুতরাং মৌখিক স্বীকৃতি কী করে ঈমানের রোকন হতে পারে? অতএব রহস্যময় অবস্থাসমূহ ও কামালিয়াত বা পরিপূর্ণতাই ঈমানের রোকন হিসেবে গণ্য।

তাস্‌দিক বা আন্তরিক বিশ্বাস দু প্রকার। প্রথমত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা। এ তাস্‌দিক বা বিশ্বাস আল্লাহ্‌র গুণাবলির সাথে সংযুক্ত হলে ঈমানদার ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়। এ সময়ে সে মুমেন। বিশ্বাসের জ্ঞানের সিফাতের বৃত্তের মধ্যে সে অবস্থান করে। একারণেই এ ধরনের ঈমানকে 'তাসদিকে ইল্লাল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বলা হয়। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালার মহিমার সাথে এ ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এ জন্য এ ঈমানকে, 'ঈমান বিল গা'য়েব-এ-শুহুদী' বলা হয়। আল কোরানে ঈমান বিল গায়েবের যে বর্ণনা আছে তার দ্বারা 'ঈমান বিল গায়েব-এ-শুহুদী' বোঝানো হয়েছে। এটা 'ঈমান বিল গায়েব-এ-তাকলিদীর' বিপরীত। তাকলিদী ঈমানের ভিত্তি শোনা খবর। সত্য সংবাদদাতার আহ্‌বানের ভিত্তিতে ঈমান গঠিত। সে সংবাদে আল্লাহ্ তায়ালার ওপর ঈমান লওয়ার জন্য ইশারা করা হয়েছে। এ জন্যই একে তাকলিদী ঈমান বলা হয়। অথচ ঈমানে তাকলিদী যথার্থ ঈমান হয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র সাথে তাস্‌দিক। এ তাস্‌দিক একাত্মতার ভিত্তিতে অর্জিত এবং তা স্বয়ং সত্তার প্রতিষ্ঠিত। সত্তার সঙ্গে গুণাবলি থাকলেও স্বয়ং সত্তাই এর লক্ষ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বক্তব্যের দ্বারা কেবল স্বয়ং সত্তার ওপরই ঈমান আনার কথা বোঝানো হচ্ছে তা নয় বরং ঐকাত্ম ঈমানের মধ্যে অনুভূত ও অননুভূত উভয় জগৎ অন্তর্ভুক্ত। কোরান শরীফ এবং অলিদের কিতাবও এর মধ্যে শামিল। কারণ এ দৃঢ় ঈমান সঠিক বিশ্বাসসূত্রে অর্জিত।

একাত্মতা প্রাপ্তির পর ঈমানের স্তর অতিক্রম করে যায় এবং একীন অবশিষ্ট থাকে। এ স্তরেই হাকীকতপন্থীদের ইবাদত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন, وأعبد ربك حتى يأ تيك اليقين (ওয়া'বুদু রাব্বাকা হাত্তা ইয়া' তিকাল ইয়াক্বীন) অর্থাৎ "বন্দেগি কর তোমরা রবের একীন অর্জিত হওয়া পর্যন্ত।" এর পর 'ইর্‌ফান' তথা

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের স্তর। আরিফদের জন্য ইরফান ব্যতীত কোনো ইবাদত নেই। আরিফদের কোনো কাজ, বাহ্যত ইবাদত মনে হলেও তার মমার্থ তাওহীদ। আর তাওহীদ অর্জনের পর ইবাদত করা কুফ্‌রী। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন্‌হা)। এ জন্যই হযরত গাউছুল আজম বলেন, من اراد العبادة بعد الوصال فهوكافر (মান্ আরাদাল ইবাদাতা বা'দাল্ বিছালি ফাহুয়া কাফিরুন্)। আবেদদের ইবাদাতের লক্ষ্য অজ্ঞাত অজানা আল্লাহ্। এজন্য আবেদদের নাম জাহেল বা মূর্খ। আরিফদের লক্ষ্য মা'রেফাত বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও তাওহীদ বা ঐকাত্মতা। এ জন্য তাদের আরিফ বলা হয়।

শরিয়তের বর্ণনা

শরাহ্ বা ধর্মের রীতিনীতি তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যথা– ঈমান, ইসলাম ও এহ্‌সান। ঈমান হল এমন এক ধরনের প্রত্যয় বা বিশ্বাস যাতে কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ নেই। ইসলাম হল দ্বীনের বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বাহ্যিক রূপ। অর্থাৎ ইসলাম বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উল্লিখিত ইসলাম দ্বারা বাহ্যিক রীতিনীতি বোঝায়। এ ইসলাম মুসলিমদের বিভিন্ন মাজহাব দ্বারা বিভক্ত। কিন্তু মূল ইসলামে কোনো দ্বিধা-বিভক্তি নেই। একেই এহ্‌সান বলা হয়। এখানেই ইসলামের পূর্ণতা ও মহত্ত পরিস্ফুটিত। এর বিষয়বস্তু হল, অন্তর ক্রিয়া। তাই অন্তর ক্রিয়া দ্বিধামুক্ত এবং সন্দেহের অতীত। কারণ এর লক্ষ্য তাওহীদ এবং তাওহীদের প্রকৃতি হল তাকওয়া। সুতরাং এ পথে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের স্থান নেই। এর স্তর ও পদ্ধতিতে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হলেও এহ্‌সানই হচ্ছে এর মূল। এহ্‌সানের সমগ্র ভূমিকাই কল্যাণকর এবং পবিত্র। এরই নাম কামালিয়াত ও বুজুর্গি। সুতরাং এতে দ্বিধার স্থান নেই। তবে এ ক্ষেত্রে স্তরে স্তরে পার্থক্য হতে পারে। এ কারণে এহ্‌সানওয়ালাদের মৌল উপাদান অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আপসে একই ব্যক্তি তুল্য। এহ্‌সান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কর্ম বিশুদ্ধ হতে পারে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই এহ্‌সান 'ফরজে ওয়াজিবী'। যাতে করে ইসলামের দ্বিধা বিভক্ত বিদূরিত হয়ে যায় এবং এতে পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পায় এবং গূঢ় সত্তাকে সে নিজের মধ্যে অনুভব করে। এ জন্যই 'শামী' প্রভৃতি কিতাবে এহ্‌সান শিক্ষাকে ফরজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি কাফের হয়ে মরার আশঙ্কা রয়েছে, এবং যে তা অস্বীকার করে সে ব্যক্তিও কাফের। জিব্‌রাঈলের এ বাণী দ্বারাও এর ফরজ প্রমাণিত হয়। যথা– ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (আন্ তা'বুদাল্লাহা কা আন্নাকা তারাহু ফাইঁল্লাম্ তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইউরাকা) অর্থাৎ, "তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগি কর যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ।" এর অর্থ হল বান্দা যখন ছায়ারূপে আল্লাহ্‌র নৈকট্য গুণের সান্নিধ্যে পৌঁছে তখন কাশ্‌ফের দৃষ্টি দিয়ে সে যেন স্রষ্টাকে

অবলোকন করে, আর এ দৃষ্টি মৌল, অমৌল কোনোটাই নয়। আর তা না হলে তিনি তো তোমাকে দেখছেনই। অর্থাৎ, বান্দা যখন মগ্ন অবস্থায় থাকে তখন কাশ্‌ফ শক্তি তাকে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের দিকে আকৃষ্ট করে। এ অবস্থায় বান্দার প্রতি যখন আল্লাহ্‌র দয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন যে ব্যক্তি অযোগ্য সে এ মহাক্ষণকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। আর বান্দা যখন ইবাদতের স্তর অতিক্রম করে যায়, তখন আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে শুধু তাঁর 'নজরে নফ্‌সি' বাকি থেকে যায়, যা ঈমান ও এহ্‌সানের বহির্ভূত। এর নামই মুত্তাহিদ বা একাত্ম্য।

ঈমানে তাকলিদী ও ঈমানে তাহ্‌কিকী

ঈমানে তাকলিদীকে ঈমানে ইসলামি বলা হয়। এটা নামের ঈমান, আসল ঈমান নয়। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, (২৬ পারা, সূরায়ে হিজরত)– قالتالا عراب امنا قل لم تؤ منوا (কালাতিল আ'রাবু আমানা কুল্‌লাম্ তু'মিনু) অর্থাৎ, "বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি; বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি।" কেননা ঈমান শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নয় বরং আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাসই ঈমান। সুতরাং তোমরা মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছ, কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস কর নি। অথচ বল যে, ঈমান এনেছ। ولكن قولوا اسلمنا (অলাকিন কূলু আস্‌লামনা) অর্থাৎ, "বলুন যে, তোমরা বল ইসলাম গ্রহণ করেছ।" জাহেরী শরার নিয়মকানুন অনুযায়ী তোমরা ঈমানদার। কিন্তু কতিপয় মুসলমানী চাল-চলন, কিছু হারাম-হালালের মসলা শিক্ষা করা অথবা বাহ্যিক ইবাদত দ্বারা ঈমানদার হওয়া যায় না। মুসলমান ছাড়াও হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছে– যারা অনেক মুসলমান রীতিনীতি অনুসরণ করে। বহু নাপাক ও হারাম বস্তু পরিহার করে চলে এবং অনেক ভালো কাজ করে। যেমন– দান খয়রাত করা, অনাথ ও বন্দীদের প্রতি দয়া দেখানো, মিথ্যা কথা না বলা, ন্যায়ের লক্ষ্যে কাজ করা, অন্যায়কে ঘৃণা করা, চুরি, ব্যভিচার পরিহার করে চলা এবং অহঙ্কার ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা না করা প্রভৃতি। অনুরূপ পানাহারের ক্ষেত্রেও বহু সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন– মুসলমানদের মতো তারাও শূকর, কুকুর প্রভৃতি খায় না। এভাবে পাক নাপাকের ব্যাপারেও তারা মুসলমানদের অনুসারী। যেমন– নাপাক দূরীকরণের সাবানের ব্যবহার করা এবং অপবিত্র অবস্থায় গোছল করা, পায়খানা-পেশাব করে শৌচ করা, পোশাক-পরিচ্ছদ পাক পবিত্র রাখা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা প্রভৃতি। মুসলমানরা যা খায় তারাও তা খায়। যেমন– রুটি, দুধ, ঘি, তরিতরকারি, ডাল, ফল-মূল ইত্যাদি। এমন কি মুসলমান যে যে মাছ খায় তারাও সে সে মাছ খায়। বিবাহশাদির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের সাথে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মুসলমানদের জন্য যে সকল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহশাদি নিষিদ্ধ তারাও সে সকল আত্মীয়দের বিবাহশাদি করে না। মুসলমানরা যেমন জবানি কিতাব বা আম্বিয়া ও রাসূলদেরকে উত্তম জ্ঞান করে, তারাও তাঁদেরকে উত্তম জ্ঞান করে এবং

মুখে কলেমা পাঠ করে। সুতরাং তোমরাও অনুরূপ ইসলাম গ্রহণ করেছ। কেননা ولما يدخل الايمان فى قلوبكم (অলাম্মা ইয়াদ্ খুলুল্ ঈমানু ফি কূলূবিকুম) অর্থাৎ, "তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।" অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান অন্তরে প্রবেশ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুধু মুসলমান নামে আখ্যায়িত হবে, মুমেন হবে না। সুতরাং ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ব্যবধান অনেক। 'ঈমান বিল গায়েব' তথা অদৃশ্যে বিশ্বাসকে ঈমানে ইসলামী বলা হয়। তাই এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন– يا ايها الذين امنوا امنوا (ইয়া আইউহাল্লাজিনা আমানু আমিনু) অর্থাৎ "হে লোক সকল! যারা ঈমান এনেছ ঈমান লও।" তথা 'ঈমান-এ-তাকলিদী' অতিক্রম করে ঈমান-এ-তাহ্কিকী তথা আসল ঈমান অর্জন কর। কেননা অদৃশ্যে বিশ্বাসী প্রাথমিক মোমেন, সে এখনও চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেনি। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেন, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب (হুদাল্লিল্ মোত্তাকী নাল্লাজিনা ইউ'মিনুনা বিল্গায়িব) "অর্থাৎ, সে সকল মুত্তাকী তথা সাবধানীদের জন্য হেদায়েতকারী বা পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে ঈমান এনেছে।" সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে অদৃশ্যে বিশ্বাসীগণ এখনও হেদায়েত পায় নি। কারণ অদৃশ্যে বিশ্বাসীদের অন্তরে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস নেই। কোরানের সাহায্যে তারা হেদায়েত বা পথের সন্ধান পাবে-কি করে ঈমান অন্তরে প্রবেশ করাতে হয়, অন্তর কি, অন্তরের বিশুদ্ধতার জন্য কোন জ্ঞান প্রয়োজন ইত্যাদি। এ কথার সমর্থনে আল্লাহ্ বলেন, قد افلح من تزكى (ক্বাদ আফলাহা মান্তাজাক্কা) "অবশ্যই কল্যাণ লাভ করেছে সে ব্যক্তি, যে স্বীয় নফ্সকে পবিত্র করেছে।" অর্থাৎ, হুজুরী ইল্মে সরঞ্জাম দ্বারা স্বীয় কল্ব তথা অন্তরকে পরিষ্কার ও প্রশস্ত করে, তাতে ইল্মে আহওয়াল ও কাশ্ফ হাছিল করেছে, সে-ই কল্যাণ লাভ করেছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه (অমান্ তাজাক্কা ফাইন্নামা ইয়াতাজাক্কা লিনাফ্ছিহি) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি পবিত্র হয়েছে গুনাহ্ ও অন্ধকারাচ্ছন্নতা হতে, সে তা হয়েছে শুধু নিজের নফ্সের জন্য।" আল্লাহ্ বলেন– الى الله المير (ইলাল্লাহিল্ মাছীর) অর্থাৎ, "আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" একেই বেলায়েত তথা সাধকের পথ বলে। এ পথে পরম সত্তার প্রতি নিমগ্ন হতে হয়। কিন্তু এতে সাধনা ও কর্মাদির প্রয়োজন রয়েছে, যথা– নফ্সের বিশুদ্ধায়ন অর্থাৎ নফ্সের মধ্যে আনুগত্যের চরিত্র সৃষ্টি করা এবং নফ্সের প্রকৃতি হতে সাবধান হয়ে যাওয়া। আর এরই নাম নফ্সকে মেরে ফেলা। এটাই ত্বরিকতের জাহেরী বিধানের আসল ও বাতেন। সব ভিত্তিহীন ও তাৎপর্যহীন কাজই নিষ্ফল। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন– فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب (ফাইজা ফারাগ্তা ফান্ছাব্, অইলা রাব্বিকা ফার্গাব্) অর্থাৎ, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আইন কানুনের প্রচার হতে অবসর হলে চিত্তকে স্থির করে তোমার প্রতিপালকের দিকে মনোযোগী হও।" অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট ও নিমগ্ন হয়ে যাও। এটাই ত্বরিকতের পথ। এ আয়াতে "ইল্লা" শব্দ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অভ্যন্তরীণ গুণাবলির দিকে নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে প্রেম, আলোবাসা,

জয্বা, মা'রেফাতের চেতনা ও দোজাহানের কাশ্ফ বিকশিত। অন্তরের জ্ঞান এবং নবীদের উত্তরাধিকার ও পরকালীন সম্বল এটাকেই বলা হয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিপালক। অর্থাৎ, "ফানাফিল্লাহ্" এবং "বাক্বাবিল্লাহ্" বা আল্লাহ্তে অধিষ্ঠান।

অতএব জাহেরী শরীয়তের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই ত্বরিকতের শুরু। অন্যের সমাপ্তি বা শেষান্ত থেকে যার সূচনা তার সীমানা অনেক ব্যাপক ও বিশাল। ভূকেন্দ্রের সীমা যেখানে শেষ আকাশের সীমা সেখান থেকে শুরু। এ জন্যই দুনিয়ার তুলনায় আকাশ অনেক প্রশস্ত। এ নিকটস্থ আকাশের তুলনায় তার উপরের আকাশ আরও অনেক বড় ও বিশাল। এ সকল আকাশের তুলনায় আর্শে আজিম আরও বিশাল ও প্রশস্ত। প্রকৃতপক্ষে আরশ, কুরসী, আকাশ, পৃথিবী এবং যা কিছু আকাশে রয়েছে এসব মিলিয়েই সৃষ্টিজগৎ। আরশের সীমা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই শুরু হল আলমে আমর যাকে 'আলমে মালাকুত' তথা ফেরেশ্তার জগৎ বলে। এর তুলনায় আলমে খালক্ তথা সৃষ্টিজগৎ একটি বিন্দুর মতো। এরপর শুরু হচ্ছে আলমে জব্রূত তথা রূহের জগৎ। রূহের জগতের তুলনায় ফেরেশ্তার জগৎ একটি বিন্দুর মতো। অনুরূপভাবে যে জগৎ যত বড় তার আকৃতি প্রকৃতি ততই ব্যাপক ও বিশাল হবে। আর তার কর্মকাণ্ড, নিয়ম-কানুন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও ব্যাপক এবং বিস্তৃত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলেন– (শেখ সাদীর ভাষায়)

আগার একছের মোয়ে বরতরাম,
ফরুগেতাজাল্লি বছুজাদ পরাম।

অর্থাৎ, উক্ত স্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এরও প্রবেশের অধিকার নেই এবং অধিকার নেই তাঁর ঐশী জ্যোতির এলাকাকে অতিক্রম করার আর তথাকার অবস্থা জানার। তাই জিব্রাঈল (আঃ) থেকে গেলেন এবং অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। অতএব জাহেরী নবুয়ত ও তার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবগত আছেন, যাকে 'নবুয়তে জিব্রাঈল' বলে। তাই ইল্মে ছফিনার সঙ্গে সংযোগ রাখে। নবুয়ত, বেলায়েতের শাখা- প্রশাখা। বেলায়েতের তুলনায় 'নবুয়তে জিব্রাঈল' একটি রূপক বিন্দু বিশেষ। এ কারণেই বেলায়েতের দ্বারা অন্যান্য নবী, রাসূল এবং অন্যান্য পয়গম্বরদের কিতাব রহিত হয়ে যায়। কিন্তু বেলায়েত রহিত বা মানসুখ হয় না। কেননা বেলায়েতই হল নবুয়তের মূল ও হাকিকত। তাই নির্দেশ হল– اهد نا الصرط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم (ইহ্দিনাছ্ ছিরাতাল্ মুছ্তাকীমা ছিরাতাল্লাজিনা আন্আম্তা আলাইহিম্) অর্থাৎ, "দাও আমাদেরকে এমন সরল ও উত্তম পথ, যে পথে আমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে নিয়ামত দান করেছ, যে পথ পরিত্যক্ত ও বাতিল হয় না বেলায়েতের দিক হতে।" কেননা এটাই তাওহীদ। আর তাওহীদের ক্ষয় লয় নেই। সকল নবী ও অলিদের তাওহীদ একই এবং এ পথেই ঈমানে হাকিকী তথা প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয়। এ জন্যই ইল্মে একীন এবং ইল্মে ঈমানের ক্রিয়াদির যথার্থ স্থান হচ্ছে অন্তর।

অন্তরের বিশুদ্ধায়ন ছাড়া আন্তরিক কর্মতৎপরতা অসম্ভব। আর অন্তর বিশুদ্ধ না হলে তাতে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না। অপর দিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম ছাড়া অন্তরের বিশুদ্ধায়ন ও পবিত্রকরণ অসম্ভব। আর মুর্শিদের উছিলা ও শিক্ষা ব্যতীত উপকরণ ও সরঞ্জামাদি পাওয়া যায় না। তাই তো আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ হল– فا سئلو هل الذكر انكنتم لا تعلمون (ফাস্আ'লু আহলিজ জিক্রি ইন্কুন্তুম লা তা'লামুন) অর্থাৎ, "যদি তোমরা না জান তাহলে জিকিরকারীদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র জিকিরই হল অন্তরের বিশুদ্ধায়ন ও পবিত্রকরণের উপকরণ এবং সরঞ্জাম। রাসূল পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন, لكل شئ صيقلة وصيقلة القلب ذكر الله (লিকুল্লি শাইয়িন ছাইক্বালাতুন অ ছাইক্বালাতুল– ক্বলবি জিক্রুল্লাহ) অর্থাৎ, "প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কার করার জন্য রেত রয়েছে। অন্তর পরিষ্কার করার রেত হল আল্লাহ্র জিকির।" যেহেতু কোরানে আল্লাহ্ বলেছেন, জিকিরকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করার জন্য সেহেতু তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে নিজ ইচ্ছায় জিকির করাও যথেষ্ট নয়। এখানে জিজ্ঞাসা করার অর্থ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। অলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। মুর্শিদের প্রতি আকৃষ্ট হলে তিনি তাকে পথ দেখাবেন এবং ঈমানে তাকলিদী থেকে উতরিয়ে নিয়ে যাবেন।

অন্তরের গভীরে অবস্থিত ঈমানের স্থানে ঈমান প্রবিষ্ট না হলে তা চিরস্থায়ী হয় না। স্থানে স্থানে ঈমান বাতিল হয়ে যায় এবং কখনো কুফরির পর্যায়ে পৌঁছে। ঈমান সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ। আর এ কারণেই মোকাল্লিদ তথা জাহেরি ঈমানদারেরা ঈমান নষ্ট হওয়া ও কুফরির মাছলাসমূহ জোরেসোরে বর্ণনা করেছেন।

আক্ষেপ! ঈমান যাওয়া সহজ কথা নয়। অন্তর ভ্রান্ত ধারণা মুক্ত হলে ঈমান নষ্ট হওয়ার চিন্তাও আসতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, ولايشرك بعبادة ربه احدا (অলা ইউশ্রিক্ বি– ইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা) অর্থাৎ, "আল্লাহ্র ইবাদতে অন্যকে শরীক করো না।" তোমরা যখন জেনে গেছ যে, আল্লাহ্র কোনো শরীক নেই, তখন তাঁর শরীক হবে কী করে? শরীক হতে হলেতো সমকক্ষ ও সমশক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় সৃষ্টি যাকে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন সে কি করে স্বয়ম্ভু সত্তার তথা আল্লাহ্র শরীক হতে পারে? এটা তো সম্ভব নয়। যদি মন থেকে বল যে, আল্লাহ্র শরীক হওয়া সম্ভব, তাহলে তুমি জাহান্নামী। তা না হলে মুখে বললেই শরীক হয় না।

সৃষ্টির এমন কোনো শক্তি নেই যা দিয়ে নিজের শক্তিবলে আল্লাহ্কে পরাজিত করবে। এটুকু যে বোঝে না কী করে সে আবেদ হয় এবং ইবাদত করে, এটাই আশ্চর্যের কথা। ইবাদতে শরীক করার অর্থ হচ্ছে, ঈমানের স্থানে ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশ– যাকে শরিয়তের ভাষায় অন্ধকার, রোগ ও পাপ বলে। এদের অন্তর্দৃষ্টি তথা ঈমানের স্থানটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই এদের মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা

পাওয়া যায় না। এ জন্য তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে। যার চক্ষু নেই তার কাছে আলোময় বিশ্বও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন, وما أمروا آلا ليعبد الله مخلصين له الدين (অমা উমিরু ইল্লা লি ইয়া'বুদুল্লাহা মুখ্লিছীনা লাহুদ্দীন) অর্থাৎ, "তাদেরকে কি হুকুম করা হয়নি? তারা যেন আল্লাহ্র ইবাদত করে।" এখলাছ তথা আন্তরিকতার সহিত যারা ইবাদত করে তাদের জন্যই ধর্ম। এ জন্য নিষ্ঠা ব্যতিরেকে কোনো ইবাদত সঠিক হয় না। যদিও বাহ্যদর্শীরা তা জায়েজ তথা সঠিক মনে করে। তাদের কোনো পার্থক্য বোধ নেই। কেননা তারা ইরফান তথা মারেফাত থেকে বঞ্চিত। গোটা বিশ্ব সৃষ্টি অবলোকন করে অসংখ্য সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে তারা মনে করে যে, এতে তাওহীদ অর্জিত হয় এবং কিতাব পাঠে আল্লাহ্ পাওয়া যায়। এটা ভুল, কারণ সকল বস্তু থেকে দৃষ্টি ও চিন্তাকে মুক্ত না করতে পারলে একের ধ্যান করা যায় না। আর একক সত্তার উপলব্ধির জন্য এক এর খেয়ালই যথেষ্ট। আর এটাই তাওহীদ। এতে করে এক প্রতিষ্ঠিত হবে। এককে চেনা যাবে এবং এক-ই পরিদৃষ্ট হবে। অতঃপর তা থেকে শত সহস্র দৃষ্টি প্রসারিত হবে। কেননা একের সত্তা থেকে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা। তাই এক থেকে বহুর প্রমাণই তাওহীদ। বহু দ্বারা এক প্রমাণিত হয় না। কারণ সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। সুতরাং যে ব্যক্তি বহু দ্বারা এককে প্রমাণ করে একেশ্বরবাদী হতে চায় সেও নশ্বর তথা ধ্বংসশীল। এ কারণেই এক নশ্বর অন্য নশ্বরকে অনন্ত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। এখানে লক্ষণীয়, আল্লাহ্ যদি অন্য কোনো বস্তু সৃষ্টি না করে কেবল মানুষ সৃষ্টি করতেন অথবা চক্ষুহীন অন্ধ মানুষ সৃষ্টি করতেন তাহলে কী দেখে কিভাবে তারা আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনতো! চিন্তা করুন ইব্রাহীম (আঃ) যখন বিভিন্ন বস্তু দেখছিলেন এবং বলছিলেন لا أحب الافلين (লা উহিব্বুল আফিলীন) অর্থাৎ, "আমি এসব চাই না, যা ধ্বংস হয়ে যায়।" অতঃপর একের সন্ধান পেয়ে তিনি বললেন, এসবই তোমার সৃষ্টি। এখন চিন্তা করা প্রয়োজন, যারা বস্তুসমূহের খেয়ালে নিমগ্ন তাদের ঈমান ও একীন উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। তাদের ঈমান হাওয়ায় ভাসমান ও সদা পরিবর্তনশীল, যখন তখন যত্রতত্র উড়ে বেড়ায়, অসংখ্য চিন্তায় আক্রান্ত এবং গ্রন্থরাজির মধ্যে বিচরণশীল। তারা কী করে একের সন্ধান পাবে? তাদের তো কোনো চেতনাই নেই। এ কারণেই জাহেরি মুসলমানদের কোনো প্রকৃত তাওহীদ নেই। আর থাকলেও তা রূপক। এ কারণে এ সব নিরস মুসলমানগণ তাওহীদের কথা শুনলেই জ্বলে উঠে।

জিকিরের বিবরণ

প্রথমত জিকির দু প্রকার– মৌখিক জিকির ও অন্তরের জিকির। মৌখিক জিকির আবার দু প্রকার, যথা– জলী তথা সরব ও খফি তথা নীরব। সরব জিকির হল জোরে জোরে মুখে শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে জিকির করা। জলী তথা সরব জিকির আবার দু প্রকার– প্রথমত যথাসাধ্য উচ্চস্বরে জিকির করা। দ্বিতীয়ত মৃদু শব্দে

জিকির করা। খফি তথা নীরব জিকিরও দু প্রকার– প্রথমত শব্দ মুখের ভিতর রেখে এমনভাবে উচ্চারণ করা যাতে কেবল জিকিরকারী নিজেই শুনতে পায় এবং অন্যে শুনতে না পায়। আর দ্বিতীয় হল নিজেও যেন শব্দ না শোনে। অন্তরের জিকিরও দু প্রকার– প্রথমত 'হালী' তথা আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রসূত। অর্থাৎ অন্তরের ভাষায় জিকির করার ফলে সৃষ্ট অবস্থার ঝংকারে দেহ ও মুখ প্রকম্পিত হওয়ার মাধ্যমে শব্দ উচ্চারিত হবে। এর ফলে কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের শব্দ শোনা যায়। প্রেম, জজ্‌বা এবং আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাই এর উৎস। দ্বিতীয়ত 'গায়ের-এ-হালী' যা আধ্যাত্মিক অবস্থা প্রসূত নয়। এ জিকিরও অন্তরে হয়, তবে জিকিরকারী তা নিজে শোনে ও বোঝে। এজন্যই এ জিকিরের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেম যুক্ত থাকে এবং জিকিরকারী নিজের হাল সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়।

তবে সাধারণভাবে জিকিরের অর্থ স্মরণ করা। মন ও অন্তরই স্মরণের স্থান। আর মুখ হল বক্ষের দরজা ও নির্গমন পথ। অন্তরের উপরের আবরণকে ছদর তথা বক্ষ বলা হয়। যখন সজোরে ছদরের জিকির করা হয় তখন মুখ থেকে তার উত্তাপ বা প্রেমাবেগ বের হয়। এ কারণেই অনেক সময় শাব্দিক তথা মৌলিক জিকির কষ্টকর হয়। 'জিকিরে ছদরিয়া' তথা বক্ষের জিকির মুখ দ্বারা নিঃসৃত হয় বলে এ ক্ষেত্রে জলী তথা সরব জিকিরই উত্তম। এ জিকির দ্বারা অন্তরের উপরের আবরণ খুলে যায়, তাই এর কোনো সীমা নেই। কেননা বক্ষের অবস্থার সাথে মুখের আওয়াজ উচ্চ ও তীব্র হবে আর আওয়াজ অনুযায়ী শক্ত ও কঠিন মনে হবে। কারণ সকলের আওয়াজ এক প্রকার নয়। যেমন যার আওয়াজ মোটা ও ভারী সে যদি আস্তেও জিকির করে তবুও তা জোরে শোনা যাবে। কিন্তু অন্তরের উপাদান স্তরক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের জন্য নির্ধারিত। এ জন্য অন্তরই হল সমস্ত কাজ ও নির্দেশাবলীর নির্ধারিত লক্ষ্য। সুতরাং অন্তর ছাড়া কোনো ইবাদত ও জিকির হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, ان فى ذالك لذ كر لمن كان له قلب اوالقى السمع وهو شهيد (ইন্না ফি যালিকা লাজিক্‌রুল্ লিমান্ কানা লাহু ক্বাল্‌বুন আও আল্‌ক্বাস্ সামা'অহুয়া শাহীদ) অর্থাৎ, "যার অন্তর আছে অবশ্যই কোরান তার জন্য জিকির। তার কান খোলা আছে এবং আন্তরিকতার সহিত হাজির আছে।" অর্থাৎ জাগ্রত অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কোরান হচ্ছে প্রকৃত জিকির ও দলিল। অনুরূপভাবে জাগ্রত অন্তরসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য নামাজও হচ্ছে জিকির– الصلوة لذكرى (আচ্ছালাতু লিকিক্‌রি) অর্থাৎ "নামাজ আমার জিকিরের জন্য" আল্লাহ্‌র এ বাণীর মর্মার্থ উপরের বক্তব্যকেই প্রমাণিত করে। নামাজের মূল লক্ষ্য আল্লাহ্ তায়ালাকে পাওয়ার উছিলা হচ্ছে, কল্‌বে তথা অন্তরে স্মরণ করা। তা কোনো মৌখিক কালেমা ও বাক্য নয়। যদিও নামাজের মধ্যে মৌখিক ক্বেরাত প্রভৃতি পড়া হয়। কিন্তু কোরানের প্রত্যেক শব্দ আল্লাহ্‌র নাম নয়। সুতরাং কোরানের ক্বেরাত পড়া নিতান্তই বিশ্বাসের জন্য। কেননা সম্পূর্ণ কোরান জিকির নয়। কোরান পাকে হাজারো জিনিসের নাম ও বিবরণ রয়েছে। কেউ যদি সে সব নামের কোনো নাম জপ করে,

তাহলে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র জিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ বলে গণ্য হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোরানে গাভী ও পিঁপড়ার কথা রয়েছে। এখানে কেউ যদি হে গাভী, হে পিঁপড়া বলে আল্লাহ্‌র নামের মতো জপ করতে থাকে এবং নিজের খেয়ালে গাভী ও পিঁপড়ার ধ্যান করতে থাকে তাহলে এগুলো কোরানের শব্দ হওয়া সত্ত্বেও এতে তার কোনো পুণ্য তো হবেই না বরং সে কঠিন শাস্তির মধ্যে ডুবে যাবে। কোরানের মধ্যে তো শয়তানের নামও রয়েছে। তবে কোরান আল্লাহ্‌র বাণী, এ চিন্তা করে তা পাঠ করলে তা আনুষ্ঠানিক ও রূপক জিকির হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা রূপকেরও রূপক। কারণ সমস্ত কোরান বার বার পাঠ করা বাকপটুতার বাহাদুরী এবং সময়ের অপচয়ও বটে। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেন, الصلوة لذكرى (আচ্ছালাতু লিযিক্‌রি) অর্থাৎ, "নামাজ আমার স্মরণের জন্য।" এর অর্থ হল নামাজের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্, জিকিরের মাধ্যমে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া তথা 'আল্লাহ্' অথবা 'হু' জপ করতে করতে এর লক্ষ্য স্বয়ম্ভু সত্তায় মিশে যাওয়া এবং নিজ অন্তরের প্রজ্ঞার সাহায্যে সত্তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করা ও তাকে জানা, এরই নাম জিকির। আর উক্ত সত্তার সঙ্গে যুক্ত গুণাবলি ও ক্রিয়াদির প্রতি মনোনিবেশ করার নাম ফিকির বা ধ্যান। সুতরাং জিকিরের সঙ্গে যুক্ত ফিকিরই যথার্থ ক্রিয়া কর্ম। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বাণী মোবারক– تفكر الساعة خير من عبادة سبعين سنة (তাফাক্-কারুস্‌সাআতা খাইরুম্ মিন্ ইবাদাতি সাব্‌ঈনা সানাতান্) অর্থাৎ, "এক ঘণ্টা ধ্যান করা সত্তর বৎসর ইবাদতের চেয়েও উত্তম।" কারণ উক্ত ইবাদত রূপক। আরও অন্যান্য হাদিস শরীফে আছে, এক রাকাত নফল নামাজে দশ অথবা বিশ হজের পুণ্য পাওয়া যায়। অবশ্য এরও দুটি রূপ রয়েছে। যদি ঐ নফল নামাজ প্রকৃত হয় তা হলে দশ হজ কেন একশত হজের পুণ্যলাভ করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু নামাজ যদি এ'তেবারী তথা রূপক হয়, তা হলে পুণ্যও রূপক হবে। ছওয়াব বা পুণ্য অর্থ ফজল বা মর্যাদা। এর বহু বচন, ফাজায়েল বা মর্যাদাসমূহ। এর অধিক অর্থবোধক ক্রিয়া আফজাল তথা উচ্চ মর্যাদা। সুতরাং মর্যাদা কখনো আইন হতে পারে না। যদি আইন হত তাহলে এক রাকাত নামাজে দশটি হজ সম্পন্ন হত এবং হজে যাবার প্রয়োজন হত না। অনুরূপভাবে কোরান পাঠ ও আনুষ্ঠানিক নামাজও রূপক জিকির, প্রকৃত জিকির নয়। সারারাত কোরান তেলাওয়াত ও নফল নামাজে লিপ্ত থাকলেও প্রকৃত জিকির হবে না।

প্রকৃত জিকির

প্রকৃত জিকিরের উপকারিতা এবং প্রকৃত জিকির ব্যতীত নামাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না– এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা সূরা নেছার চৌদ্দ রুকুতে বলেন, فا ذا قضيتم الصاوة فاذكرو الله قيا ما وقعوداو على جنوبكم فاذا اطما نتم فاقيموا الصلوة ان الصلوة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا (ফাইজা কাজাইতুমুচ্ছালাতা ফাজ্‌কুরুল্লাহা কিয়ামা'উ অকুয়ুদাও অআ'লা জুনুবিকুম ফাইজ ইত্‌মানান্‌তুম্ ফা

আক্বীমুচ্ছালাতা, ইন্নাচ্ছালাতা কানাত আলাল মো'মিনীনা কিতাবাম্ মাওকুতা) অর্থাৎ, "তোমরা নামাজ সম্পন্ন করে দাঁড়ানো, বসা ও পার্শ্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র জিকির কর। যখন ইত্‌মিনানে কল্‌ব অর্থাৎ, হৃদয়ের প্রশান্তি হাসিল হল তখন তুমি নামাজ কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয় সময়মতো নামাজ ফরজ। নামাজ আদায়ের পর জিকিরের যে হুকুম রয়েছে তারও নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে– দাঁড়ানো ও বসা, জাগ্রত ও নিদ্রিত, আহার-বিহার এমন কি পায়খানা-পেশাবের অবস্থাতেও তোমার আল্লাহ্‌র জিকির কর। তবেই ইত্‌মিনান কল্‌ব তথা প্রশান্ত হৃদয় লাভ করতে পারবে। সুতরাং প্রশান্ত হৃদয় লাভ করার জন্য 'দায়েমী' তথা সর্বক্ষণ অন্তরের জিকির প্রয়োজন। তা এমনই জিকির যে, নিদ্রাও তাকে ব্যাহত করতে পারে না এবং পেশাব-পায়খানাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এ জিকিরই 'জিকির-এ-কল্‌বি' তথা আন্তরিক জিকির। অন্তরের শক্তিশালী বাকশক্তিকে রোধ করার ক্ষমতা কোনো বস্তুরই নেই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কল্‌বের সাতটি মোকাম রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি গুপ্ত মোকামেরই আলাদা অস্তিত্ব, ভিন্ন ভিন্ন বাকশক্তি, ভাষা ও বিদ্যা এবং বিদ্যার জন্য স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু রয়েছে। অন্তঃকরণের এসব উপকরণাদির সমন্বয়েই অন্তরের জিকির সম্পাদিত হয়। আর এ কল্‌ব তথা অন্তরই প্রশান্তির কেন্দ্র। আল্লাহ্ বলেন– الا بذكر الله تطمئن القلوب (আলা বিযিক্‌রিল্লাহি তাত্‌মা ইন্নাল্ কুলুব) অর্থাৎ, "হুঁশিয়ার হয়ে যাও– আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা ইত্‌মিনান কল্‌ব তথা প্রশান্ত হৃদয় অর্জিত হয়।" অন্যত্র বলা হয়েছে, فاذا اطما ننقم فاقيمو االصلوة (ফাইজা ইত্‌মানান্‌তুম ফা আকীমুস সালাতা) অর্থাৎ, "তোমাদের অন্তর যখন শান্ত হয় তখন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।" তাই নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরের প্রশান্তি বা শান্ত মন আবশ্যক। এ জন্য কোরানে বিরাশি বার "আকিমুছ্ সালাত" তথা নামাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যখন তুমি নামাজ আদায় করেছ, এখন এ নামাজকে প্রশান্ত হৃদয়ের সাথে পড়। এরই নাম হচ্ছে নামাজ প্রতিষ্ঠা। অতএব নামাজ ও অন্যান্য সকল ইবাদতের জন্য মনের প্রশান্তি প্রধান স্তম্ভ এবং সার্বক্ষণিক ফরজ। এ জন্যই উক্ত আয়াতে 'ক্বাজাইতুম' শব্দটিকে 'কেয়ামে নামাজ' বাতিল করে দিয়েছে এবং 'মিছদাককেও' নামাজের শর্ত হতে বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ 'ক্বাজাইতুম' দ্বারা আদায় করার যে অর্থ বোঝা যায়, অতঃপর নামাজ কায়েম করার হুকুমের ফলে তাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। কেননা এ আদেশটি নব মুসলিম ও মুসল্লিদের জন্য। যেমন ছোটদের জন্য অ, আ। আর ওটাকে নামাজে ইসলামি বলা হয়। অর্থাৎ তারা এখনও মোমেন হয়নি। সুতরাং এটা আদেশী নামাজ। আর যারা মোমেন তাদের নামাজ হচ্ছে হাকিকী তথা প্রকৃত। সুতরাং আদেশী নামাজ সর্বক্ষণিক নয়। তা অতিক্রম করে আসল নামাজে রত হওয়া ফরজ। এছাড়া নিস্তার নেই। আসল নামাজ এমন এক মূল্যবান কর্ম যা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কোনো মন্দই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এমন কি তা প্রতিষ্ঠাকারীকে সব রকম মন্দ হতে রক্ষা করে ও পবিত্র করে। সূরা আনকাবুতে

বলা হয়েছে– واقيموا الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر (ওয়া আকীমুচ্ছালাতা ইন্নাচ্ছালাতা তান্‌হা আনিল্ ফাহ্‌শায়ি ওয়াল্ মুন্‌কার) অর্থাৎ, "নামাজ প্রতিষ্ঠা কর; অবশ্যই নামাজ পাপ হতে বিরত রাখে।" এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ক্বল্‌ব, রূহ্, ছের, খফি ও নফ্‌স প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক নামাজ রয়েছে। আর সে নামাজই অন্যায় থেকে বিরত রাখে। দেহের নামাজ পাপ, খেল ও তামাসা থেকে, অন্তরের নামাজ অলসতা থেকে, নফ্‌সের নামাজ মন্দ কথাবার্তা ও মন্দ স্বভাব থেকে এবং মাথার নামাজ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখে। এটাই আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নামাজ। আর এ অন্তরওয়ালার নামই যাকের। জিকির ছাড়া অন্তর প্রসারিত হয় না। অন্তর প্রসারিত হওয়াকে 'নূর-এ-ইসলাম' বলা হয়। আর এ নূরের দ্বারাই ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও ভিত্তি পরিপূর্ণ হয়। আল্লাহ্ বলেন– افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه (আফামান শারাহাল্লাহু ছাদরাহু লিল্ ইস্‌লামি ফাহুয়া আলা নূরিম্ মির্ রাব্বিহি) অর্থাৎ, "যার বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করা হয়েছে– এটাই মারেফতের নূর।" যে ব্যক্তি জিকিরকারী নয়, তার মন কালিমাযুক্ত ও অন্ধকার থাকার দরুন ইসলামের নূর হাসিল করতে পারে না। তাই আল্লাহ্ সূরা জমরের দ্বিতীয় রুকুতে বলেন– فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك فى ضلل مبين (ফাওয়াইলুললিল্ ক্বাসিয়াতি কুলূবিহিম্ মিন্ যিক্‌রিল্লাহি উলায়িকা ফী দলালিম্ মুবীন) অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র জিকিরবিমুখ কঠিন অন্তরের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ তারা স্পষ্ট ভ্রান্ত পথে রয়েছে।" এজন্যই তাদের নামাজ তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত করে না। পথভ্রষ্ট অবস্থায় নামাজ পড়াতে কোনোই উপকার নেই। এ পথভ্রষ্ট লোকদের নামাজের নিন্দা প্রসঙ্গে সূরা নেছার কুড়ি নম্বর রুকুতে বলা হচ্ছে– واذاقاموا الى الصلوة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله الاقليلا (অইজা ক্বামু ইলাচ্ছালাতি ক্বামু কুসালা ইউরাউনান্‌নাছা অলা ইয়াজ কুরুনাল্লাহা ইল্লা ক্বালীলা) অর্থাৎ, "তারা অলসভাবে নামাজে দাঁড়ায় লোকদের দেখাবার জন্য। কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র জিকির করে না। সুতরাং জানা গেল যে অলসতার সাথে কোনো ইবাদত হয় না। কারণ অলসতা একটি অন্ধকার এর ফলে অন্তরচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। চোখে পর্দা পড়লে যেমন চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, তেমনি অলসতা ও একাগ্রহীনতায় অন্তরের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে থাকে। এ অলসতার বীজ থেকে উৎপাদিত গাছের ডালপালা থেকে যে ফল হয় প্রকৃতপক্ষে তা ফল নয় বরং প্রাণনাশক বিষ। তা বেহেশ্‌তের পরিবর্তে দোযখই খরিদ করে। জাহেরপন্থী আলেমগণ অলসতা অর্থে অসময়ে বা সংকীর্ণ সময়ে নামাজ আদায় করা বোঝান। 'লোক দেখানো' কথা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীদের হীনম্মন্যতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যদিও নামাজী নিজেদেরকে শুদ্ধ মনে করে– এটা শুধু তাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্নতার কারণে। যদি দুনিয়ার সকল মুসল্লিকে প্রশ্ন করা হয় তোমরা কি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ইবাদত করছ, না

মানুষকে দেখাবার জন্য? তখন সবাই বলবে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ইবাদত করছি। অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ বলছেন, "ইউরাউনান্ নাছা" অর্থাৎ, "মানুষকে দেখবার জন্য।" তাহলে এখানে মিথ্যাবাদী আল্লাহ্ না মুসল্লি? কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তো আর মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এসব লোকদের যদি প্রকৃত জ্ঞানের অংশবিশেষও আয়ত্ত থাকত, তাহলে আত্ম ও মা'রেফতের রহস্য তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হত। তারা জানতে পারত, তাদের ত্রুটি কোথায়, তারা বুঝতে পারত, তাদের এ অহংকারের পোশাকের আড়ালে এবং জায়নামাজে বসার মধ্যে নিহিত তাদের অধঃপতন অবস্থার কথা। আর তা থেকে পরিত্রাণ পেত, নিজেদের বর্তমান আত্মতুষ্টিমূলক অবস্থাকেও পদদলিত করত এবং এ দলনকে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে গ্রহণ করত।

জিকিরের ফলে সৃষ্টি প্রতিক্রিয়া ও অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা আন্‌ফালের প্রথম রুকুতে বলা হয়েছে, انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلتقلوبهم (ইন্নামাল মো'মিনুনাল্লাজিনা ইযা জিক্‌রাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম) অর্থাৎ, "সে-ই মোমেন; আল্লাহ্‌র জিকির শুনলে যার হৃদয় ভীত হয়।" অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নাম শুনলে অন্তর ভীত হবে– আল্লাহ্‌র জ্যোতি ও মহত্ত্ব অথবা তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরে বিদ্যমান প্রেমাকর্ষণ এবং আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সদা সর্বদা যুক্ত থাকার কারণে। তাই মাশুকের নাম শোনামাত্র তার প্রেমরশ্মি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। উক্ত রশ্মি, বা নূরের মোকাবিলায় প্রেমিকের অন্তর নেহায়েত দুর্বল ও হালকা হয়ে পড়ে। তখন অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্তরে ভাবের সৃষ্টি হয়। এ সময় যদি উক্ত মোমেন শারীরিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে এ ভীতিকে পাপ ভীতি বলা হয়। আর যদি সে আশিক অন্তরের বিনয়ী অংশের সঙ্গে সংযোগ রাখে তাহলে সে ভীতিকে রশ্মি বা জ্যোতি এবং প্রেম উন্মাদনা বলা হয়। এটা প্রেমযুক্ত ভীতি, অর্থাৎ সে ভয় পায় এ জন্য যে, এত মহব্বত সত্ত্বেও মিলন ও দর্শনতৃষ্ণার আকাঙ্ক্ষাতে কোনো অবসর মিলে না।

আল্লাহ্‌প্রেমিক যদি অন্তরের বাতেনের সঙ্গে সংযোগ রাখে তাহলে তার মধ্যে যে ভীতি সঞ্চার হয়, সে-অবস্থার নামই "রাহাতুল ক্বল্‌ব" তথা হৃদয়ের প্রশান্তি অর্থাৎ আশিক ও মাশুকের দিক হতে নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে একে অপরকে আকর্ষণ করে। যাকে জয্‌বা ও এনজেবাব তথা আকর্ষণ করা ও আকর্ষিত হওয়া বলে। আল্লাহ্‌র প্রতি আশিকের আসক্তি বা মোহকে জয্‌বা আকর্ষণ বলে। আর প্রেমিকের প্রতি মাশুক বা আল্লাহ্‌র যে আসক্তি তথা মোহ তাকে এনজেবাব বা আকর্ষণ করা বলে। আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দার মধ্যে এ আকর্ষণ, সর্বক্ষণিক হলেও অবস্থার পরিবর্তনে এ আকর্ষণ বা হালত বিভিন্ন রূপ লাভ করে, যা ভাষায় বর্ণনাতীত। প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার অবস্থার সৃষ্টি এবং নতুন নতুন নানা রকম ভাবের উদয় হয়। আর এ ভাবের প্রভাবে আশিকের সমস্ত শরীরে প্রকম্পন, দাহ, উত্তাপ, অস্থিরতা, আহ ও বিরহশ্বাস, অশ্রুসিক্ত, ঘর্মযুক্ত, প্রেমনৃত্য, হুতাশন ও বেহুঁশী আর তালি বাজান প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই নাম 'গালবাহ্' তথা

অভিভূত হওয়া। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াসমূহ একই রূপ হয় না– সূরা জমরের দ্বিতীয় রুকুতে বলা হয়েছে– تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله (তাক্‌শাইরু মিন্‌হু জুলুদুল্লাজিনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম ছুম্মা তালিনু জুলুহুম অকুলূবুহুম ইলা জিক্‌রিল্লাহ্) অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করেন তাদের লোম শিহরিত হয়– আবার জিকির শুনলে তাদের ত্বক ও অন্তর বিগলিত ও নরম হয়ে যায়।" তথা সারা শরীর প্রকম্পিত হয়। আবার অনেক সময় এমন কম্পন সৃষ্টি হয় যেন সে জ্বরে আক্রান্ত এবং তার দেহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন সে অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করে, তার অন্তর নরম হয়ে যায় ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সূরা হাদীদের রুকুতে আল্লাহ্ বলেন– الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله (আলাম ইয়ানি লিল্লাজিনা আমানু আন্‌তাখ্‌শায়া কুলূবুহুম লিজিক্‌রিল্লাহ্) অর্থাৎ, "ঈমানদারদের জন্য সে সময় কি আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র জিকিরের জন্য ভয়ে নরম হয়ে যাবে?" এখানে ভয় অর্থ আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জ্ঞান, যা ভয়যুক্ত প্রেম সৃষ্টির কারণ। সুতরাং যেখানে ভয় সেখানেই সন্তুষ্টি। যদি সন্তুষ্টি না থাকত তাহলে ভয় দ্বারা কী লাভ হত? আর যেখানে সন্তুষ্টি রয়েছে সেখানে পুরস্কারও রয়েছে। যেখানে পুরস্কার রয়েছে সেখানে তৃপ্তিও রয়েছে। যেখানে তৃপ্তি আছে, সেখানে উদ্দেশ্য ও মাকছুদ তথা লক্ষ্যও রয়েছে। আর তাই হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্। যেখানে আল্লাহ্ আছেন জ্ঞানও আছে। আর সত্তার জ্ঞান থেকেই জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। হাজার হাজার শাখা প্রশাখা আবার এ জ্ঞানে বিদ্যমান। এ জ্ঞান অনন্ত অসীম। কারণ সত্তা যখন অসীম তখন সত্তার জ্ঞান এবং প্রজ্ঞাও অসীম। আল্লাহ্ বলেন, قل ربى زدنى علما (কুল রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মা) অর্থাৎ, "হে নবী বলুন– প্রভু আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" অর্থাৎ তোমার সত্তা হতে আমার সত্তা যে জ্ঞান লাভ করে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে দাও। এ জন্যই এ জ্ঞানকে নফ্‌স-তত্ত্বের জ্ঞান বলা হয়। এ নফ্‌স-তত্ত্বের জ্ঞান ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য বিশেষ উপলব্ধি এবং তা অবলোকনের জন্য বিশেষ দৃষ্টিশক্তি প্রয়োজন। এ দৃষ্টিশক্তি যা কিছু দেখবে তা নিজের মধ্যে দেখবে এবং নিজের মধ্যেই সব কিছুর অস্তিত্ব পাবে আর যা কিছু জানবে তা নিজের মধ্য দিয়েই জানবে। যেমন সূরা আনআ'মের দ্বাদশ রুকুতে আছে– قد جائكم بضائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمئ فعليها (ক্বাদজায়াকুম্ বাছায়িরুম্ মির্‌রাব্বি কুম ফামান আব্‌ছারা ফালিনাফ্‌ছিহি অমান্ আময়া ফাআলাইহা) অর্থাৎ, "তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, তোমরা যদি দর্শন কর তাহলে তা তোমাদেরই জন্য। আর যদি অন্ধ হয়ে থাক তার পরিণামও তোমাদেরই জন্য" অর্থাৎ, সে নিজের নফ্‌সকে জানতে পারবে না, যে পর্যন্ত ইলমে হক তথা সত্য জ্ঞান হতে বঞ্চিত থাকবে। হযরত মাওলানা রুমি বলেন,

ইলমে হক দর ইলমে সূফীগম শাওয়াদ
হঁ সোখান কায় বাওরি মরদাম শাওয়াদ

আল্লাহ্ বলেন– وما انا عليكم بحفيظ (অমা আনা আলাইকুম বিহাফিজ) অর্থাৎ, "আমি কি তোমাদের ওপর নেগাহ্বান নই? হাদীস শরীফে এর বিশদ ব্যাখ্যা মিলে। من عرف نفسه فقد عرف ربه (মান্ আরাফা নাফ্সাহু ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু) অর্থাৎ, "যে নিজের নফ্সকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে।" প্রভুত্ব পরিচয়লাভকারী স্বীয় নফ্সে যতটুকু প্রভুত্ব বিকাশিত হয় তথা উপলব্ধি করতে পারে, অন্য কারো মধ্যে ততটা পারে না। যেমন– নিজের চোখ দ্বারা যেভাবে কোনো জিনিসকে অবলোকন করা যায় সেরূপ অন্য কারো চোখ দ্বারা অবলোকন করা যায় না। অনুরূপভাবে নিজের কান ও নাকের ব্যাপারে তাই মনে করা উচিৎ। আসল কথা হলো, আল্লাহ্ তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে নিজ বন্ধুর বক্ষকে মনোনীত করেছেন। এ জন্যই এ জ্ঞনকে ইল্মে সিনা তথা বক্ষজ্ঞান বলা হয় এবং এ জ্ঞান এক বক্ষ হতে অন্য বক্ষে প্রসারিত হয়। খেলাফতের পদ্ধতিতে প্রেমিকের বক্ষ আরশ হিসেবে গণ্য। হাদীস শরীফে আছে– قلوب المؤمنين عرش الله (কুলূবুল্ মো'মিনীনা আর্শিল্লাহ্) অর্থাৎ, 'মোমেনের কল্ব আল্লাহ্র আরশ।" আল্লাহ্র সত্তার ভাণ্ডার আরশ বলে গণ্য এবং ঐ আরশ তথা অন্তরই আসল ও স্থায়ী আরশ। দ্বিতীয় স্তরে খেলাফতের পদ্ধতিতে যে কল্ব বা অন্তর, তাও প্রকৃত এবং খাছ। এজন্য খলিফার অর্থ হচ্ছে পরবর্তী অনুগামী ব্যক্তি। ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি– আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির যোগ্যতার সমপর্যায়ের হওয়া আবশ্যক। এতে করে 'ইলমে জাতি' তথা সত্তার জ্ঞান একে অপরকে সম্বন্ধযুক্ত করে রাখে। সুতরাং উভয়ের ইল্মে জাতি যখন একই পর্যায়ের হয় তখন জাত বা সত্তার রূপও একই হয়। একইভাবে সত্তার অবস্থার অনুরূপ অবস্থা তাদের চোখ ও দৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন– قد جائكم البصائر (ক্বাদ জায়াকুমুল বাছায়েরু) অর্থাৎ, যে বিশিষ্ট চোখ তুমি লাভ করেছ, সে চোখ দ্বারা নিজের নফসের দিকে নজর করেছ, তখন নিজের হাকিকত, আল্লাহ্ তায়ালার হাকিকত উভয়কে চিনে নিয়েছ। এ স্থানটিতে কোরান শরীফের অনেক ব্যাখ্যাকার 'বাছায়ের' অর্থে দলিলসমূহ বলে লিখেছেন। তারা ভুল বুঝেছেন।

এ সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে নিঃসৃত জ্ঞানই ফিকির, গাওর ও মাকাশেফা নামে পরিচিত। যদিও সালেকগণের ফিকির ও কাশফের পরেই সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান অনুভূত হয়। যেমন মানুষ জন্মগ্রহণের পর নফসের জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে অবহিত হয়। অনুরূপভাবে ধ্যানকারীর প্রসারিত অন্তরে বিদ্যমান কাশ্ফ প্রভৃতির সমর্থনে আল্লাহ্ বলেন– يتفكر ون فى خلق السموات والارض (ইয়াতাফাক্কারুনা ফী খাল্কিস্ সামাওয়াতি অল্আরদ) অর্থাৎ, "আসমান ও জমিন সৃষ্টি সম্বন্ধে যারা চিন্তা করে।" অর্থাৎ, হাকিকত সম্বন্ধে যখন আহলেদের মোশাহেদা করেন তখন প্রত্যেক জিনিসের মূল ও সূক্ষ্মতম অংশ মোশাহেদাকারীর

নিকট প্রকাশিত হয়।" তখন প্রার্থনার সুরে তাঁরা বলেন– ربنا ماخلقت هذا باطلا (রাব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাতিলা) অর্থাৎ, "হে আমার প্রভু! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।" সৃষ্টি বস্তুসমূহের মধ্য হতে কিছু সৃষ্টিকে মানুষ পবিত্র ও অপবিত্র, খারাপ ও বাতিল প্রতিপন্ন করে। এ বাতিলটা হচ্ছে অপ্রাকৃত সন্দেহ। এ কারণেই ধ্যানমগ্ন অন্তরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আল্লাহ্ সাধারণ লোকদের জন্য অনুস্মরণীয় করেছেন। যাতে করে জাহেরপন্থীদের উপলব্ধি হয় যে, তাদের এ অজ্ঞতার কারণ তাদের অন্তরের অন্ধকারাচ্ছন্নতা বা মালিন্যতা। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, কাশ্ফ অর্জন এবং ধ্যানসাধনা ছাড়া স্রষ্টার রহস্য কখনো জানা সম্ভব নয়।

সত্যকে অসত্য আর অসত্যকে সত্য মনে করা মারাত্মক অপরাধ। চিন্তা করুন– মানুষের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই অপবিত্র। অথচ এ অপবিত্র বস্তু থেকেই গোটা দেহের সজীবতা, শক্তি ও শান্তি। এ পেটের ভিতর হতে যদি এসব অপবিত্র বস্তুসমূহ বের করে দেওয়া হয় তাহলে এ দেহের কোনো পবিত্র অংশই থাকবে না বরং সঙ্গে সঙ্গে দেহ ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের বীর্য কি অপবিত্র নয়? তা থেকে কী করে পবিত্র মানুষ সৃষ্টি হয়! সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তা অপবিত্র নয় বরং এর অপবিত্রতা কৃত্রিম বা রূপক। মূলত তা বৈধ ও পবিত্র। সুতরাং যার ধ্যানশক্তি ও কাশ্ফ নেই, তার প্রকৃত জ্ঞান নেই। বিভিন্ন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বস্তু অপবিত্র ও পবিত্র হয়। যেমন– পবিত্র বস্তুর মিশ্রণেই মদ তৈরি করা হয়, পরে মাদকতার কারণে তা হারাম হয়। কিন্তু এতে লবণ প্রভৃতি মিশ্রিত করলে আবার পবিত্র হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ওয়ালাগণের হেকমতময় সংস্পর্শে অতি তুচ্ছ ও অপবিত্র বস্তু মহামূল্যবান ও পবিত্র হয়ে যায়। সাধারণের এ পার্থক্য বোধ নেই। কোনো জিনিসের কারণ জানলেও প্রকৃতপক্ষে এসবের মূল সত্তার পার্থক্য বের করতে পারে না। যেমন প্রথমে শূকর হালাল ছিল। কিন্তু এখন কেন হারাম হল তারা তা জানে না। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণদের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানই প্রয়োজন। তাদের কাছে আসল জ্ঞান প্রকাশ করলে তারা তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করবে।

চিন্তা করুন, যিনি বক্ষজ্ঞান এবং নফ্সের জ্ঞানের মাধ্যমে নিজকে চিনেছেন তিনি শ্রেষ্ঠতর নিয়ামতের অধিকারী হয়েছেন। সুতরাং এখন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তাই আল্লাহ্ বলেন– ومن شكر وانما يشكر لنفسه (অমান্ শাকারা অইন্নামা ইয়াশ্কুরু লিনাফ্ছিহী) অর্থাৎ, "যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, সে তো কেবল নিজের নফ্সের জন্য তা করেছে।" অর্থাৎ, নিজের নফ্সের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে আল্লাহ্র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। কেননা নফ্সের মূল স্বয়ং আল্লাহ্। সৃষ্টির রহস্যের দিক থেকে স্রষ্টার চিরস্থায়ী হাকিকত বান্দার মধ্যে বর্তমান। এ কারণেই মুরব্বি শ্রেণীর শাইখগণ বলেছেন, যে নফ্সকে চিনেছে সে আল্লাহ্কে চিনেছে আর যে আল্লাহ্কে চিনেছে সে নিজের নফ্সকে চিনেছে।

অজ্‌দ ও তার উপকারিতা

অজ্‌দ বা আল্লাহ্‌প্রেমে আবিষ্ট অবস্থার মধ্যে পরম সত্তার বিশেষ নূর নিহিত রয়েছে। এতে প্রেমের সম্পর্ক ও তাওহীদের গুপ্ত রহস্য রয়েছে। আর এটাই আল্লাহ্‌ দর্শনের আয়না এবং জীবনের সান্ত্বনা ও লক্ষ্যে উপনীত হবার সরল পথ। উক্ত নূর থেকে অজ্‌দের অবস্থায় একটি দাহিকা নূর তৈরি হয়। তা সব কিছুর উপরে শক্তিশালী এবং নফ্‌স ও শয়তানের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ করে নিজের মধ্যে মিশিয়ে নেয়। এ কারণেই আহলে অজ্‌দ তথা আল্লাহ্‌প্রেমে মোহাবিষ্টদের দেহ সবসময় গরম ও পরিবর্তনশীল থাকে। সালেক তথা সিদ্ধ-সাধক, এর ফলাফলে সদা সন্তুষ্ট থাকেন। এহেন মহাপুরুষের কাছে দুনিয়ার আরাম ও লজ্জা তুচ্ছ। অজ্‌দ আল্লাহ্‌প্রেমিকের বন্ধু এবং তা তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছায়। আল্লাহ্‌ প্রেমিকের মূল লক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্‌। এ জন্য আল্লাহ্‌প্রেমিক অন্য সব কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র সাথে একাকার হয়ে যায় এবং ভুলে যায় জাহেরী শরিয়ত ও তার কর্মগুলো। কেননা আল্লাহ্‌ ছাড়া সব কিছু ভুলে যাওয়া মহা গুপ্ত রহস্য। আল্লাহ্‌তে আসক্ত হওয়ার গুণাবলির মধ্যে মহব্বত তথা প্রেম ছাড়া আর কিছুই নেই। এ জন্যই অজ্‌দের অর্থ হচ্ছে মোহিত এবং মোহাবিষ্ট হওয়া। এখানে জয্‌বা ও অজ্‌দের প্রতিক্রিয়াই এর মর্ম এবং কোনো শাব্দিক অর্থ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্‌প্রেমিকের প্রেম উন্মাদনা ব্যতীত প্রভুত্বের প্রভাব অর্জিত হয় না। গোলবা ও ছোকরের জন্য আহওয়াল প্রয়োজন, আর আহওয়ালই হচ্ছে তার কাম্য। এ অবস্থার নামই ফয়েজ। ফয়েজ অর্থ পুরস্কার ও জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া অর্থাৎ, আল্লাহ্‌প্রেমে প্রেমিকের দেহ ফয়েজের বন্যায় আপ্লুত হয় আর জাত ও সিফাতের মিলনই ফয়েজ বা পুরস্কারের কারণ। প্রকৃতপক্ষে ফয়েজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তা হতে বান্দার ওপর একটি আছর তথা প্রতিক্রিয়া বা তাছির। যার ওপর এ ফয়েজ বা তাছির আবর্তিত হয় সে স্পষ্টভাবে তা উপলব্ধি করতে পারে। যদিও ফয়েজ দ্বারা কাশ্‌ফের উন্মেষ বোঝায় কিন্তু এর প্রকৃতি অগণন। সালেকের দেহের মোকামগুলো ফয়েজের প্রভাব লাভ করে। ফলে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন। এ ফয়েজের কারণ হচ্ছে ফেরেশতা ও আমলকারীদের এবং আউলিয়া আম্বিয়াদের রূহ্‌ মোবারক প্রভৃতি। অর্থাৎ ছোট বড় সকল বিশ্ব রূহ্‌ ও ফেরেশ্‌তা দ্বারা কুয়াশার মতো ছেয়ে যায়। তবে সে সকল ফেরেশ্‌তা একইরূপে আবদ্ধ নন।

এ জগতে সাধকদের উছিলায় অধিকাংশ ফয়েজ বর্ষিত হয় এবং সত্তার জগৎ থেকে ফয়েজ সত্তার শক্তিতে বর্ষিত হয়। আবার ফয়েজপ্রাপ্তগণ অনেক সময় প্রত্যেক জীব এবং পোকামাকড় থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হন আর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এজন্য ফয়েজপ্রাপ্তগণ সৃষ্টি জগতের নিম্নস্তরের ফেরেশ্‌তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ ফয়েজ আল্লাহ্‌র সত্তা থেকে প্রেমিকের সত্তায়,

আল্লাহ্‌র গুণাবলি থেকে প্রেমিকের গুণাবলিতে, আল্লাহ্‌র বিভিন্ন অবস্থা থেকে প্রেমিকের বিভিন্ন অবস্থায় বর্ষিত হয়। এটা আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির মতোই। আকাশে যেমন পানি ছিল, বর্ষিত হওয়ার পরও ঠিক তেমন পানি আছে। কিন্তু সে আকাশের পানি যার উপর বর্ষিত হয় তাকে সজীবতা দান করে। সুতরাং ফয়েজ এমন একটি পুরস্কার প্রথমত যার বরকতে মানুষ সকল জাগতিক দিক হতে স্বীয় মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ, দ্বীনি ও দুনিয়াবি হুকুম আহকাম ও কর্মের কারণে যখন সে সত্তার মহিমাতে বিস্মৃত হয়েছিল, এখন আবার ফয়েজের বরকতে তা স্মরণ হয়েছে। অর্থাৎ, তার নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেল। এর অর্থ হল, যখন 'অজ্‌দ' হয় তখন পুনরায় স্মরণ হয় যে আমি আমার প্রতিপালককে কেন ভুলে গিয়েছিলাম! এ জন্যই অজ্‌দের অর্থে ভুলে যাওয়া বস্তুকে স্মরণ হওয়াও বলা হয়। তাই 'অজ্‌দ' আরও বেশি লোভনীয় হয়ে উঠে। জয্‌বা ও গোলবাহ তথা প্রেমাকর্ষণ ও আত্মহারা হওয়ার মধ্যে যে করুণা রহস্যের সূক্ষ্মতা গোপন রয়েছে সে দিকে আগ্রহান্বিত হওয়ার নাম তথ্য উদঘাটিত হওয়া। অতঃপর এ গুণও লোপ পায় এবং হালসমূহের দ্বারা বাতেনী তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। যেমন– টেলিগ্রামের 'তার' নিজের মধ্য দিয়ে গোপন সংবাদ সরবরাহ করে কিন্তু 'তার' নিজে কিছুই বোঝে না। 'তারের' দ্বারা যখন টেলিগ্রাম করা হয় তা থেকে তখন টক্‌টক্‌ শব্দ শোনা যায় এবং এর মধ্যে টেলিগ্রামের বক্তব্য নিহিত থাকে। অনুরূপভাবে প্রেমিকের অজ্‌দ তথা ভাবাবিষ্ট অবস্থা টেলিগ্রাম ও ইঞ্জিনের মতোই। কল-কারখানায় ইঞ্জিনের ভীষণ শব্দ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভীতিজনক মনে হয়। আবার অনেক দ্রুতগতিতে ও প্রবল শব্দ সহকারে গাড়ি এবং জাহাজ চলে। তদ্রূপভাবে আল্লাহ্‌ প্রেমিক চিৎকার ও শোরগোলের সঙ্গে টেলি ও বিদ্যুতের মতো পথ অতিক্রম করে যায় জয্‌বা ও হালতের কারণে। আল্লাহ্‌ প্রেমিকগণ আল্লাহ্‌র স্মরণে আরাম ও শান্তি অনুভব করেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তায়ালা সুসংবাদ প্রদান করে সূরা জুমারের দ্বিতীয় রুকুতে বলেন, تقشعر منه جلودالذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلو بهم الى ذكر الله (তাক্বশা'য়িরু মিন্‌হু জুলুদুল্লাজিনা ইয়াখ্‌শাওনা রাব্বাহুম ছুম্‌মা তালিনু জুলুদুহুম ওয়া কুলুবুহুম ইলা জিক্‌রিল্লাহ) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে তার শরীর শিউরে উঠে এজন্য সে আরাম ও আনন্দ অনুভব করে তার ত্বকে ও অন্তরে– তার প্রভুকে স্মরণ করার জন্য।" অর্থাৎ, যখন অজ্‌দ অবস্থা হয়– আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ভয়ের কারণে অথবা আরাম, প্রফুল্লতা ও উচ্চাশায় সাধকের ত্বকসহ সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। কারণ এ অজ্‌দের অবস্থায় উভয় দিকের প্রেমরশ্মির যোগাযোগ স্থাপন হয়। মহব্বত ও আশাহত হওয়ার ভীতির সৃষ্টি হয় আল্লাহ্‌র জালালিয়াত তথা মহত্ত্বের শানে এবং শান্তি ও প্রফুল্লতা হয় আল্লাহ্‌র জামালিয়াত তথা সৌন্দর্যের শানে।

প্রেম একটি ব্যাপক শব্দ। এতে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার সরল পথ। এতেই ভয়, সন্তুষ্টি, দান, অনুগ্রহ তথা স্বয়ংসত্তা ও তাঁর গুণাবলি বর্তমান। প্রেম

হচ্ছে পবিত্রতার একটি নাম আর এটাই হচ্ছে মোহাবিষ্ট ও উন্মত্ততার কারণ। এ থেকে অজ্‌দ প্রভৃতি অবস্থার উদ্ভব হয়। এ কারণেই 'ফচুছ' কিতাবের রচয়িতা 'আল্লাহ্' শব্দের অর্থ বেহুঁশী ও ভীতি বলে লিখেছেন। অতএব উন্মাদনা বা বেহুঁশী আল্লাহ্‌র স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, এটা কোনো শব্দের প্রভাব নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র সত্তার প্রেমিক সত্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং গুণের প্রেমিক প্রভাবিত হয় গুণ দ্বারা। তালেব অর্থাৎ, প্রেমিক বা সাধক শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। প্রার্থনাকারীর যে প্রার্থনা সেটা তার অন্তরের ক্রিয়া। এ ক্রিয়া মৌলিক। রূহ্ যখন তার মূলের প্রতি ধাবিত হয় তখন মানবিক বিষয়াদি এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। তাই প্রেমিকের শরীর প্রকম্পিত হয়। কেবল নফ্‌সের বাধা ও কালিমার কারণে এ প্রকম্পনের সৃষ্টি হয় না। বরং জীবন রহস্য উদঘাটিত হওয়ার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের ফলেই রূহ্ সহকারে সারা শরীর কম্পনের সৃষ্টি হয়। যেমন অহি তথা প্রত্যাদেশবার্তা প্রাপ্তির সময় হযরত আম্বিয়া (আঃ) গণের মধ্যেও অনুরূপ কম্পনের সৃষ্টি হত; তাঁদের সমস্ত শরীরে প্রকম্পিত হত এবং তাঁরা অস্থির হয়ে যেতেন।

অহি প্রাপ্তির সময় আমাদের শেষ নবী রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যে অবস্থা হত তার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ। যথা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট অহি এলে, জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁকে পেষণ করে একেবারে দুর্বল করে নিয়ে বললেন, পাঠ করুন। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না, এভাবে তিনবার পেষণ করার পর তিনি পড়তে শুরু করলেন। অতঃপর পড়তে পেরেও তিনি গুহা থেকে ঘরে গিয়ে হযরত খোদেজা (রাঃ)-কে বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও– কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও! তখন রাসূল (সঃ) জ্বর ও উত্তাপে কাঁপছিলেন। তাঁর উভয় ঠোঁট মোবারক কাঁপছিল। অতএব জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর পেষণের মধ্যে উম্মতের জন্য বিরাট শিক্ষা ও অনেক দলিল-প্রমাণ রয়েছে।

প্রথমত জিব্‌রাঈল (আঃ) এর স্বেচ্ছাকৃত পেষণের ফলেই বেলায়েতের উৎস রাসূল (সঃ)-এর অনিচ্ছাকৃত অস্থিরতার সৃষ্টি হত এবং এ অস্থিরতা তথা ভাবাবিষ্টতার মধ্যে তিনি অহি প্রাপ্ত হতেন। এ জন্যই নবুয়ত এবং বেলায়েত উভয়ের জন্যই ভাবাবিষ্টতা আবশ্যক। তা না হলে অহি প্রাপ্তির সময় নবীগণ অস্থির হতেন না। এ কারণেই ভাবাবিষ্টতা সকল নবী ও অলিদের পথ প্রদর্শক ও মৌলিক বস্তু এবং অহি সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বলে গণ্য। দ্বিতীয়ত, হস্ত সঞ্চালন নফ্‌সের প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। তৃতীয়ত, এখানে অহি অর্থ কেবল ঐশীবাণী নয়, আত্মার প্রভাব তথা মূল বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই যে বস্তু আত্মার প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করতে নারাজ তাকে পেষণ করে ঘর্মাক্ত অবস্থায় তা বের করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সঃ)-এর বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য এটাই। বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রক্ত বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে গভীর জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এর নাম রাখা হয়েছে ইলমে সিনা তথা বক্ষের জ্ঞান।

এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে যেমন কিছু ঢেলে দেওয়া হয়, এ জ্ঞানও তেমনি এক বক্ষ থেকে অন্য বক্ষে ঢেলে দেওয়া হয়। মুর্শিদ ও মুরিদের মধ্যকার এ যোগাযোগকে অন্তরের যোগাযোগ বলা হয়। অহির অবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে 'বোখারী শরীফ' ও ইতিহাসগ্রন্থ 'তাজকেরাতুল কিরাম' প্রভৃতি দেখুন।

মোট কথা কল্‌ব অন্তর উত্তেজিত হয়ে প্রকম্পিত হলে চমকিত হয়ে যায়। তাই সমস্ত শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি প্রতিভাত হয়। এর ফলে অন্তর নরম হয়ে গলে যায় এবং আরাম অনুভব করে ও আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট হয়। ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পায়, শক্তিশালী হয়, আর তা থেকে রকমারী অসংখ্য অবস্থা বিকশিত হয়। তবে সুফিগণ নিজ নিজ অবস্থার আলোকে একে ঊনচল্লিশ বা চল্লিশ ভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। যথা– তাওয়ালে, লাওয়ামে, অযুদ, যুদ, তাওয়াজ্জু, ছোকর, গোলবাহ, রায় মহাজেরা, মোকাশেফা প্রভৃতি। 'তায়ারুক' ও 'আওয়ারেফ' প্রভৃতি মারেফতের কিতাবে এর বর্ণনা রয়েছে। এ সমস্ত অবস্থার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী তার অন্তরে এর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। এ দ্বারা তিনি হাজারো কল্যাণ ও বরকত লাভ করেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কল্যাণ সৃষ্টি হয়। যখন কোনো কঠিন হৃদয় হতে হালত প্রকাশিত হয়, তখন তা থেকে তেলের ফোরঙ্গের ধোঁয়ার মতো অন্তরের ময়লা বের হয়ে যায়। এতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং আরাম অনুভূত হয়। সুতরাং অন্তর জ্বালা একটি উত্তাপ, এটা চিৎকার, আনন্দ ও অশান্তভাবের সঙ্গে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে এবং হালপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীর হালকা ও নরম হয়ে যায়। এ নম্রতার ফলেই প্রেমিক অস্থির ও অচেতন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা আট, দশ দিন বা কম বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে। মোট কথা তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। চিন্তা করলে এর উপকারিতা কারও না বোঝার কথা নয়। কোনো ব্যক্তি চিন্তাগ্রস্ত বা দুঃখপ্রাপ্ত হলে কিছু দিন পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো কাজ তার কাছে ভালো লাগে না। জাগতিক চিন্তা যখন জাগতিক কাজকর্ম থেকে মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে, তখন আল্লাহ্‌র চিন্তা জাগতিক কাজকর্মকে নিরুৎসাহিত করবে না কেন?

কষ্টের কারণে চিৎকার ও ক্রন্দন দ্বারা কলিজার জ্বালা দূর হয়। এ জন্যই ক্রন্দন অবস্থায় চিৎকার করে চিন্তার জ্বালাকে বের করে দেওয়া হয়, যাতে কলিজা ফেটে না যায়। বন্দুকের সাথে তুলনা করে এ অবস্থা বোঝা দরকার। আওয়াজ না হওয়া পর্যন্ত গোলাবারুদ ভর্তি বন্দুকের অস্থির অবস্থা বৈ আর কি থাকে। বটম টিপার পর বন্দুকের গুলি বেরুতে না পারলে বন্দুক ফেটে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতো হল বাহ্যিক উদাহরণ। কিন্তু বাতেনী অবস্থা, হালপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউই জানে না। এ কারণেই রাসূল (সঃ)-এর ইন্তেকালের দিন কেঁদে অস্থির হয়নি এমন কেউ ছিল না। আল্লাহ্‌র বান্দারা তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন। সাহাবাগণ তাদের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন এবং কাপড় রুমাল দ্বারা তাদের চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়েছেন। বদর সঙ্গীদেরও রাসূল (সঃ) এভাবে দয়া

প্রদর্শন করেছেন। কারণ বদরের সাহাবিগণ গভীর প্রেমাসক্ত ছিলেন। আর প্রেমাসক্তদের প্রতি দয়া দেখানো ওয়াজেব। তাই তো আউলিয়া কেরামগণ বলেন, অজ্‌দ তথা গভীর প্রেমাসক্ত ব্যক্তিগণ যদি পাগড়ি, জামা কাপড় খুলে ফেলেন, ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন বা নাচতে থাকেন তাহলে তোমরাও তাই করো। সম্ভব হলে তোমরাও প্রেমনৃত্য করো। নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালে বড় বড় সাহাবাগণ এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে অকাতরে কেঁদেছেন, অনিচ্ছায় ছটফট করেছেন, চুল ও মাথা উলঙ্গ করে কপাল চাপড়িয়ে দুঃখ করেছেন, মাটিতে মাথা কুটেছেন এবং আপন মনে চিৎকার করে গড়াগড়ি করেছেন ও নেচেছেন। এমন কি হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমার সামনে কেউ যদি বলে যে, রাসূল (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ্‌র কছম আমি তাকে হত্যা করব। হুজুর পাকের ইন্তেকালের পর বেশ কিছুদিন এ অবস্থা বিরাজ করে এবং তাঁর ইন্তেকালের শোকে অনেক লোক মারা যায়। ইতিহাসের কিতাবে এর প্রমাণ রয়েছে।

যে সব লোক কান্নাকাটি করতে একেবারে নিষেধ করে তারা অজ্ঞ। কারণ নবী (সঃ) বলেছেন, অনুরূপ কান্নাকাটি থেকে যে বারণ করে সে পাষাণ হৃদয়। আর নারীগণ কোমল প্রাণ হওয়ার দরুন দুঃখ এবং আঘাত সহ্য করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কারবালা সংক্রান্ত হাদিসে প্রমাণ আছে, শোক করা পুণ্যের কাজ। আরও উল্লেখ আছে যে, শোক ও মাতম কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। তবে নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কথা বানিয়ে বার বার ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যথায় সর্ব অবস্থায় ক্রন্দন করা কল্যাণকর এবং এতে অন্তর সজীব হয়। এ কারণে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا (ইব্‌কু ফাইঁল্লাম্ তাব্‌কু ফাতাবাকু) "অর্থাৎ, "কাঁদ, যদি কান্না না আসে কান্নার চেষ্টা কর" এবং মনকে নরম করার চেষ্টা কর। তাহলে কান্নার সাথে আল্লাহ্‌র যে রহমত থাকে তুমি তা পাবে। শেষ নবী (সঃ) নিজের অন্তর্ধানের কথা অবগত হওয়ার পর বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বান্দা আছেন যিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, খুব সম্ভব তিনি অচিরেই দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ ইঙ্গিত বুঝেছিলেন এবং তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। বড় বড় সাহাবাগণ ও উপস্থিত সকলেই কেঁদেছিলেন। রাসূল (সঃ)ও তাঁদের সঙ্গে কেঁদে কেঁদে জর্জরিত হয়েছিলেন। কান্নায় আল্লাহ্‌র কৃপা যুক্ত না থাকলে হুজুর (সঃ) কখনো কাঁদতেন না। তিনি তো অযথা কোনো কাজ করতেন না।

কেউ কেউ বলে যে, নবীগণ আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতেন। এটা কিসের ভয়? তারা তো অবশ্যই বেহেশ্‌তবাসী এবং আজাব ও ক্রোধ থেকে মুক্ত। তাঁরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পূর্বেই লাভ করেছেন– তার পর তো সন্তুষ্টি কামনা ও শান্তির ভয় ঠিক নয়। কারণ এতে অনুমোদন নষ্ট হয়ে যায়। অনুমোদন পাওয়ার পর আজাবের ভয় কুফ্‌রি মাত্র। (নাউজুবিল্লাহ্ মিন্‌হা)। অনুরূপভাবে উম্মতদের জন্যও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মঞ্জুরি লাভের পর শাস্তির ভয় ঠিক নয়।

কুদ্‌রত

কুদরত তথা দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া একটি সত্তাগত শক্তি যা আল্লাহ্‌র সত্তার গভীরে বর্তমান। একে অস্তিত্বহীনও বলা হয়। আল্লাহ্ তাঁর আপন সুপ্ত সত্তা থেকে ইচ্ছা ও কুদরত সৃষ্টি করেছেন, একেবারে অস্তিত্বহীন হতেও নয়। কারণ একেবারে অস্তিত্বহীন কিছুই নেই (সারহুল ফুছ)। মোট কথা কুদরত আল্লাহ্‌র অভ্যন্তরীণ শক্তি। এটা আল্লাহ্‌র সত্তাগত প্রকৃতি। উদাহরণস্বরূপ, উত্তাপ ও উজ্জ্বলতা আগুনের একান্ত বৈশিষ্ট্য, যা আগুনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আগুন যখন কোনো বস্তুকে জ্বালাতে উদ্যত হয় তখন তার কুদরত প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যও অনুরূপ। তা যখন এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে সৃষ্টি ও জ্যোতি বলা হয়। যথা– খনিতে সৃষ্ট সোনা ও রূপা প্রভৃতি। এর অর্থ এই যে, সমস্ত পদার্থের বাষ্প যখন মাটির নিচে জমা হয় তখন তা থেকে বিভিন্ন প্রকার ধাতু এবং জমিতে নানা রকম উদ্ভিদ জন্মায়। কোনো কোনো সময় উক্ত বাষ্পে পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হলে ভূমিধস ঘটে এবং আগুন বের হয়। মোট কথা এটা পদার্থের বৈশিষ্ট্য। ভারী পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণের উৎস সূক্ষ্ম পদার্থ। আর এ সূক্ষ্ম পদার্থই মূল সত্তার বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে প্রত্যেক বস্তুই স্তরে স্তরে বিকশিত হয়। আর এরই নাম রাখা হয়েছে সৃষ্টি। জাহেরপন্থীগণ কুদরত অর্থে একেবারে শূন্য বোঝাতে চান এবং হাদিস পেশ করেন যে, আল্লাহ্ প্রথমে এক মুষ্টি সক্রিয় নূর সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে সৃষ্টির নূর এবং সৃষ্টির নূর দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

আচ্ছা, আল্লাহ্‌র সত্তার বাইরে কি কোনো বস্তু আছে? যদি তাই হবে তাহলে তার 'ওয়াজেবুল ওজুদ' তথা স্বয়ম্ভু হওয়া কী করে সম্ভব? কারণ স্বয়ম্ভু সত্তা থেকেই সমস্ত শক্তি ও নতুন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে; কোনো সৃষ্টি বস্তু থেকে নয় এবং কোনো অস্তিত্বহীন জগৎ থেকেও নয়। বরং স্বয়ং সত্তাতে সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা নিহিত রয়েছে, তা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যুক্ত হলেই উক্ত সত্তায় সৃষ্টিক্রিয়া জাগরিত হয়। তাকে তাজাল্লী বা রশ্মি বলা হয়। 'কুন' শব্দের তাৎপর্য এটাই। এ দ্বারা 'কুন' শব্দ উদ্দেশ্য নয়, বরং এর অর্থের মধ্যে নিহিত তাৎপর্য যা বিশ্ব সত্তার ইচ্ছার সাথে যুক্ত রয়েছে– যার প্রভাবে সারা জগতের সৃষ্টি, তাই এর প্রতিপাদ্য। তা কোনো বচন বা বাক্য নয়। এখানে 'কুন' শব্দ দ্বারা প্রকৃত কালাম ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বোঝানো হয়েছে। কালামে হাকিকী তথা প্রকৃত কালাম আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে যুক্ত। সত্তা থেকে গুণের উদ্ভব আর গুণাবলির সংখ্যানুপাতেই বিভিন্ন বস্তু ও জগতের সৃষ্টি। এ সৃষ্টির অনুপাতেই আল্লাহ্‌র সমস্ত নাম হয়েছে। ক্রমান্বয়ে যা কিছু সৃষ্টি হবে তাও সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইচ্ছার জগতে যে সমস্তের অস্তিত্ব নেই তা সৃষ্টি নয়। তাই আল্লাহ্‌র সত্তায় বিদ্যমান লক্ষ কোটি গুণাবলির প্রেক্ষিতে তাঁর অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে। এ কারণেই সকল শাইখ প্রধান হযরত সুলতানুল আশেকীন

আকবর (রহঃ) 'ফসুস' গ্রন্থে সমস্ত সৃষ্টির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র নাম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জনক ও জননীর সৃষ্টি রহমান ও রহিম নাম হতে। আল্লাহ্‌র সমস্ত নাম ঐ গুণাবলির সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং গুণ যত হবে, ক্রিয়াও সে অনুপাতে হবে। এ হিসাবে কোনো বস্তুই তাঁর সত্তার বাইরে নয়। অতএব প্রত্যেক বস্তুর জন্যই প্রকাশ হওয়ার স্থান প্রয়োজন। সুতরাং স্থানও উক্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর স্থানের মধ্যে সময় বা কালও নিহিত। সুতরাং কালও বস্তুর মধ্যে শামিল। অতএব উক্ত সত্তা থেকে সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত বস্তুর নাম তাতে নিহিত। সকল কর্মেই তাঁর কর্ম এবং তাঁর কর্মেই সকল কর্ম নিহিত। সুতরাং সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যই সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে তিনি সর্বকালে বর্তমান এবং সমগ্র কাল তাঁর চিরন্তন সত্তার সাথে সদা যুক্ত। তাই তো আল্লাহ্ বলেন, فاينما تولوا فثم وجه الله (ফাআইনামা তুয়াল্‌লু– ফাছাম্মা ওয়াজ্‌হুল্লাহ্) অর্থাৎ, "যেদিকেই তাকাও সেদিকেই আল্লাহ্‌র মুখ" অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সত্তার আওতাভুক্ত। এ কারণেই আল্লাহ্‌র জ্ঞান সবকিছুতেই ব্যাপ্ত। আর এটাই গুণগত জ্ঞানের উৎস। সত্তার জ্ঞান সত্তা থেকে আসে আর গুণাবলির জ্ঞান উৎসারিত হয় গুণাবলি থেকে। কিন্তু একক সত্তায়– সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান, কুদরতের বিভিন্ন রূপান্তর, জীবন, মৃত্যু, উত্থান ও পতন, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য বিলীন ও প্রকাশ এবং সৃষ্টির সবই এক।

তকদীর

তকদীর তথা ভাগ্য একটি আজলী বা চিরন্তন পরিমাপ। উভয় জগতে যে সকল বস্তু মজুদ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে জন্মাবে, সব কিছুর পরিমাপ এতে নির্ধারিত। এ পরিমাপ তিন প্রকার, যথা– জিসমী (বস্তুগত), রূহী (আধ্যাত্মিক) ও হাকিকী (মৌলিক)। এ তিন প্রকার তকদীর বা পরিমাপ সদা চিরন্তনের সত্তার মূলে সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যমান। এ তকদীর সকল বস্তুর সাথেই যুক্ত রয়েছে। এমন কি উভয় জগতের সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য, সকলের সাথেও এ তকদীর যুক্ত আছে। অর্থাৎ জড় জগতে জড় বস্তুর সাথে যে তকদীর সম্পর্ক রাখে সে তকদীরকে জিসমী ও নাসুতী তথা দৃশ্য ও জড় তকদীর বলা হয়। আর অদৃশ্য জগৎ ইত্যাদির সাথে যে তকদীর সম্পর্কযুক্ত সে তকদীরকে রূহী তকদীর বলে। 'আলমে মাশীয়ত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জগতের সাথে যে তকদীর ও বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত সে তকদীরকে তাকদীরে হাকিকী তথা মৌলিক বা আসল তকদীর বলে। অতএব এ তিন প্রকার তকদীরের নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি দপ্তর বর্তমান ও নির্দিষ্ট আছে। প্রথমত, বস্তু ও স্থান, দ্বিতীয়ত, লাওহে মাহ্‌ফুজ তথা সুরক্ষিত দপ্তর, তৃতীয়ত, আলমে জাত তথা সয়ম্ভু সত্তার জগৎ। সুতরাং মানব ও সমগ্র বস্তু সত্তাই হলো এ তিন দপ্তরের মূল। অতএব সত্তাসমূহ নিজ নিজ সত্তায় তথা সৃষ্টির জন্য স্বয়ং সত্তার

কৌশল হতে এক একটি সিন্দুক স্বরূপ। অনাদি অনন্ত সকল বস্তুই এ সিন্দুকের ভিতরে রয়েছে। এর বাইরে কোনো কিছুই নেই। সুতরাং বের হবার সময় যা তাতে মজুদ রয়েছে তাই বের হয়। অর্থাৎ সে অস্তিত্বের মধ্যে অনুভূত, অননুভূত, মৌলিক, রূপক, সত্তাগত বা গুণগত সমস্ত বস্তুই গুণগত বৈশিষ্ট্যের সাথে বাস্তবরূপে রয়েছে। কেননা যাকে আলামত বলা হয়, নিঃসন্দেহে তাকেই অজুদ তথা অস্তিত্ব বলা যায়। অর্থাৎ হাত, মুখ, পেশানী, শরীর, চোখ ও কানের আকৃতিতে এবং আঙ্গুলের মসৃণতায় রয়েছে সে আলামত।

এসব তা হল শুধু জাহেরী ব্যাপার। কিন্তু আধ্যাত্মিক এবং বাতেনী বৈশিষ্ট্যও সে অজুদের মধ্যে সংযুক্ত। যেমন– আস্বাদন শক্তি, স্মৃতি শক্তি, বোধ শক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষা, হায়াত-মউত, শক্তি, কর্ম ও অবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর পরিমাণ, তালিকা ও সংবাদ অজুদের আওতাভুক্ত। এ জন্যই এগুলো প্রথম দপ্তরের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাকি সব দপ্তরেও অনুরূপ তালিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এগুলোকেও লাওহে মাহ্‌ফুজে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। লাওহে মাহ্‌ফুজ শুধু নামযুক্ত বস্তুর বাক্যলিপি নয়, বরং যে বস্তুর হরফ দ্বারা পরিচিত মিলে না, যেমন– ইন্দ্রিয়াদি প্রভৃতিও তাতে রয়েছে। সুতরাং এ সকল বস্তুর পরিমাপ অনুধাবন করার জন্য অলৌকিক অক্ষর ও নিক্তি রয়েছে। এ সবেরই নাম দেওয়া হয়েছে লাওহ তথা ফলক। কিন্তু যে লাওহে মাহ্‌ফুজ আরশের উপর রয়েছে সেটাই প্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রথম দপ্তর যা হচ্ছে অস্তিত্বময় লাওহে মাহ্‌ফুজ, জড় জগতের মধ্যে জড়জগতিদের তা প্রয়োজন। যেমন– সৃষ্টি এবং মানব ও তার অবস্থার পরিচয় লাভ করা। আলামত দ্বারা ভালোমন্দ অনুভব করার জন্য আর্‌শে অবস্থিত লাওহে মাহ্‌ফুজ দেখার প্রয়োজন হয় না বরং যার যার নিজের অস্তিত্বের লাওহে মাহ্‌ফুজ দ্বারাই তা অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য দপ্তরের ব্যাপারও অনুরূপ। অভিজ্ঞ মহলের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। আয়তন, আকৃতি ও পরিমাণবিহীন কোনো বস্তু বা কর্ম মজুদ হয় না। কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে তকদীর নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়, তবে তার সেই মনে করাও তকদীর হতে আগত। যদি কেউ মনে করে যে, তকদীরে যা আছে তাই হবে, তাহলে এটাও তার তকদীর হতে। আর যদি কেউ মনে করে বিনা চেষ্টায় কিছু হয় না, তাহলে এটাও তার তকদীর হতে। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে তকদীরের ওপর ঈমান আনা এবং তার ওপর নির্ভর করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে তার এ বিশ্বাসটিও তকদীর হতে আগত। আবার যদি কেউ মনে করে যে, 'তকদীর-এ-মোব্‌রাম' অপরিবর্তনীয়, তবে এটাও তার তকদীর হতে।

'মোবারক-এ-হাকিকী' কখনো রদ হয় না। যে তকদীর পরিবর্তন হয় তাও হরফে হাকিকীতে আযলি কিসমতে লেখা আছে। অনেকে তকদীরের পরিবর্তন সম্বন্ধে এ গল্পটি বলে থাকে– হযরত খাজা উস্‌মান হারুনী (রহঃ)-এর নিকট এক নিঃসন্তান ব্যক্তি এসে পুত্র সন্তান কামনা করে দোয়া চায়। তিনি মোরাকাবায় যেয়ে

দেখলেন যে, 'তকদীর-এ-মোব্‌রাম' এ তার কোনো সন্তান নেই। এ কথা শ্রবণ করে উক্ত ব্যক্তি খাজা সাহেবের নিকট বার বার প্রার্থনা করছিল। বারংবার তার অনুরোধে খাজা সাহেব আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দরখাস্ত পেশ করলেন। দরখাস্তের জবাবে আওয়াজ এল, যখন তার 'তকদীর-এ-মোব্‌রাম' এ কোনো সন্তান নেই, তখন কী করে সন্তান হবে? তখন খাজা রাগান্বিত হয়ে অজ্‌দের হালে মন্দিরে কালির সম্মুখে চলে গেলেন, এ জন্য যে, কালির নিকট সন্তান চাইবেন। এ সময় কাশ্‌ফের মাধ্যমে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রাঃ)র সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। তিনি হযরত খাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর– আমি তোমার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সন্তান চাচ্ছি। তখন হযরত খাতুনে জান্নাতের দোয়ায় আল্লাহ্ তাঁকে পুত্র লাভের হুকুম দিলেন। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির একটি পুত্র হবে। এ ঘটনা সত্য হলে এর বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হযরত খাজা যে তকদীর সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, আসল তকদীর তার ওপরে। কেননা হযরত খাজার এ ধরনের রাগ ও অজ্‌দ হওয়াও তো আল্লাহ্‌র তরফ হতেই, অন্য কিছু হতে নয়। আর তকদীর পরিবর্তন হওয়া এটাও তকদীর হতে। অর্থাৎ তাকদীরে মোয়াল্লাক তথা পরিবর্তনশীল তকদীর তা প্রকৃত তকদীর নয় বরং রূপক। এটা তকদীরের অনুরূপ একটি রূপ প্রকাশ করে। যেমন আকাশের মেঘ যখন অতিরিক্ত বারিসিক্ত হয় তখনই বর্ষণ করে, তা ছাড়া নয়। তেমনই পরিবর্তনশীল তকদীর সৎ কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত হয় তথা মন্দের বদলে পুণ্য ও ভালো হয়। التقدير لايرد (আত্‌তকদীরু লা–ইয়ারুদ্দু) অর্থাৎ, "তকদীর পরিবর্তিত হয় না" এ হাদিস দ্বারা 'তকদীর-এ-হাকিকী' বোঝানো হয়েছে। সমগ্র তকদীরের চূড়ান্ত ফলাফলই তকদীর-এ-হাকিকী। এটাই আসল ও অপরিবর্তনীয় তকদীর। এ তকদীরের কোনো পরিবর্তন নেই। মূলত আসল তকদীর একটিই, বাকি সব এর শাখা-প্রশাখা বা ডাল-পালা।

সুরের আলোচনা

অন্তরওয়ালাগণ শুধু গানের সুর শোনান না বরং এর দ্বারা তাঁরা তাঁদের মনকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। এতে তাদের মনে কোনো পর্দা পড়ে না ও তাদের কোনো পাপ হয় না। অজ্ঞরা সুর ও মধুর কণ্ঠকে পাপ ও অন্তরে আবরণ সৃষ্টির কারণ মনে করে। আবেদ তথা জাহেরী ইবাদতকারীগণ নিজেদের অবস্থার আলোকে মনে করে যে, মধুর কণ্ঠ তাদের জন্য পর্দাস্বরূপ বটে। কারণ জাহেরী ভাবে তারা নামাজ, রোজা ও কোরান পাঠে লিপ্ত থাকে কিন্তু এতে তাদের মনের কালিমা দূর হয় না। অথচ এগুলোকে তারা আসল ইবাদত বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন এর পুণ্য পাবে। কিন্তু তারা জানে না যে, মধুর কণ্ঠ ও মিষ্টি সুর মনের পর্দা ও কালিমা দূর করে এবং শ্রোতা মগ্ন চিত্তে তা শ্রবণ

করে আর স্রষ্টার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। সে স্রষ্টার পথের সন্ধান পায় ও তার মন প্রসারিত হয়। এমনকি সে এ সুরের স্রষ্টাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। এ মধুর সুরে তার মন নরম হয়ে যায় ও মানসিক স্বচ্ছতা অর্জিত হয়। হৃদয়গ্রাহী সুর যা অন্তরে ভাবের সৃষ্টি করে তা কোনো ত্বরিকার জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেকোনো আহ্‌লে দেল তথা অন্তরওয়ালাগণের জন্যই এ সুর বা গজল। হৃদয়গ্রাহী মধুর আওয়াজ আল্লাহ্ তায়ালার একটি সূক্ষ্ম শান এবং নূরী অন্তরের শানও সূক্ষ্ম। তাই উভয় সূক্ষ্ম শানই একে অপরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। অতএব যারা এ মহামূল্যবান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য সুর মাকরূহ্ ও হারাম হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ মহামূল্যবান নেয়ামত যারা পেয়েছেন এবং যারা এ সম্পর্কে জানেন মধুর সুর তাদের জন্য পরশতুল্য ও অতি প্রয়োজনীয়।

'এহিয়াউল উলুম', 'কিমিয়ায়ে সায়াদাত', 'তায়ার্‌রুফ' প্রভৃতি গ্রন্থে হাদীস ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'তোহ্‌ফা-এ বর্জখী' পুস্তিকা পড়লেও এ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। আমরা এখানে মেশ্‌কাত শরীফ থেকে দু একটি হাদীস উদ্ধৃত করব, জাহেরপন্থীদের জন্য। অন্তরওয়ালাদের দলিল স্বয়ং সুরের মধ্যেই নিহিত আছে। তাঁরা নিজেরাই অনুভব করতে পারেন যে, সুর শ্রবণে তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ হয় কিনা। যদি আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ হয়, তাহলে তাতে ছওয়াব ও পুণ্য আছে আর যদি নিবদ্ধ না হয়, তাহলে সুর মোবাহ তথা অনুমোদিত বলে গণ্য হবে। আর এতে যদি কোনো খারাপ ভাবের সৃষ্টি হয় তাহলে শোনা পাপ। আর এ পাপও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– মাকরূহ, হারাম, অথবা 'গুনাহ-এ-কবীরা' ইত্যাদি। কিন্তু অন্তরওয়ালাদের এ সব পাপ স্পর্শ করতে পারে না। মেশ্‌কাত শরীফে আছে– وعن عائشة (ض) قالت ان ابابكر دخل عليها وعندها جاريتان فى ايام منى تدففان وتضربان وفى روايت تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث والنبى (ص) متغش بثوبه فانتهر هما ابوبكر فاكشف النبى صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال لدهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وفى رواية ياابابكران لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه (ওয়া'আন্ আয়েশাতা (রাঃ) ক্বালাত্ ইন্না আবাবাক্‌রিন্ দাখালা আলাইহা ওয়াইন্‌দাহা জারিয়াতানি ফী আইয়ামি মিনা তুদাফ্ ফিফানি অতাদরিবানি ওয়াফী রাওয়াইয়াতিন্ তুগান্‌নিয়ানি, বিমা তাক্বাওয়া লাতিল আনসারি ইয়াওমা বুয়াছিন, ওয়ান্ নাবীয়্যু (সঃ) মোতাগাশ্‌শিন বিছাওবিহি ফান্তাহারাহুমা আবুবাকরিন ফাকাশাফান্ নাবীয়্যু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামা আন্ ওয়াজহিহী ফাক্বালা দা'হুমা ইয়া আবাবাকরিন ফাইন্নাহা আউয়্যামু ঈদিন্ অফী রাওয়াইয়াতিন্– ইয়া আবাবাকরিন ইন্না লিকুল্লি কাওমুন্ ঈদুন–ওয়াহাজা ঈদুনা মোত্তাফিকুন্ আলাইহি) অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– একদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর নিকটে আসেন। তখন আন্‌সার গোত্রের দুটি যুবতী মেয়ে তাঁর সম্মুখে

ছিলেন। দিনটি ছিল ঈদুজ্জোহা ও আইয়্যামে তাশরীকের দিন। তারা দফ বাজাতে ছিল। দফ বাজানোর স্থলে গান গাইতে ছিল বলে অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে।

তারা বোয়াজ যুদ্ধের গান গাইতেছিল। রাসূল (সঃ) কাপড়ে মুখ আবৃত করে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের ধমক দিলেন, তখন হযরত (সঃ) মুখের আবরণ খুলে হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললেন, হে আবু বকর! ওদের ছেড়ে দাও, আজ ঈদ অর্থাৎ খুশির দিন। অন্য বর্ণনায় আছে, হুজুর (সঃ) বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক কাওমের আনন্দের দিন রয়েছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)। অনেকে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলে থাকে, তারা নৃত্য ও ভাব বিহ্বলতার সঙ্গে দফ বাজিয়েছিল। এ বাজানো প্রসঙ্গে দ্বিমত রয়েছে। অনেক বলে, এটা মোবাহ। অনেকে বলে, এটা হারাম। সঠিক মত হল যে, বিবাহ-শাদী ও অলিমার মধ্যে এটা করা তাঁর হুকুম আর ঈদের দিন মোবাহ। সহি বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলেছেন, ওহে! পয়গাম্বরের সামনে মেজ্‌মার বাজাচ্ছ? মেজ্‌মার এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র যা গায়ক গানের মধ্যে বাঁশি, দফ এবং রবাবের মতোই বাজিয়ে থাকে। মেজ্‌মারকে শয়তান এজন্য বলা হয়েছে যে, তা মনকে খেলতামাসায় লিপ্ত করে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। স্মরণীয় যে, গান বাদ্য শ্রবণকারীরা এ হাদীসের ভিত্তিতেই গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজানো মোবাহ হওয়ার পক্ষে দলিল পেশ করে থাকেন। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে এ হাদীস থেকে যা বোঝা যায় তা হল এই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) গান বাদ্য করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তিনি ধমক দিয়েছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তিনি ভেবেছিলেন, নিছক গান বাদ্য ও তামাশা নিষেধ ছিল এবং তিনি মনে করেছিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শায়িত বা অন্যমনস্ক থাকার দরুন এ ঘটনার প্রতি লক্ষ করেননি, তাই তিনি উক্ত কাজ থেকে নিষেধ করেননি। আর হযরত আবু বকর জানতেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদের দিনে সামান্য গান বাজনা করা ও শোনার অনুমতি দিয়েছিলেন। মোট কথা হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যাপারটি ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তিনি নিষেধ করেছিলেন। অতএব উক্ত হাদীস দ্বারা ঈদের দিনে এবং যে সকল স্থানে উৎসব করা অনুমোদিত সেসব স্থানে সামান্য গানবাজনা জায়েজ প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা সর্বতোভাবে গানবাজনা জায়েজ প্রমাণিত হয় না। বুর্জুগ ব্যক্তিগণ বলেছেন যে, এর দ্বারা গানবাজনা শোনা নিষেধ প্রমাণিত হয় না বরং এর অনুমোদনই প্রমাণিত হয়। এমন কি তাঁরা রিপুর তাগিদে হলেও গান শোনাকে বৈধ মনে করেন। কারণ উৎসবের দিনে গানবাজনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং মেয়েদের গান শোনা রিপুর চাহিদার বাইরে নয়। যেসব মেয়েরা গানবাজনা করে তাদের সুর ও কথা অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী হবে। অতএব খুশির দিনে আত্মতৃপ্তির জন্য মেয়েদের গানবাজনা শোনা নিষেধ নয়। এমতাবস্থায় মেয়েদের অনুপস্থিতিতে এবং নিছক আত্মতৃপ্তির উদ্দেশে নয়, এরূপ

গানবাদ্য নিষেধ হতে পারে না বরং অধিকতর অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং আত্মার বিশুদ্ধায়ন ও আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য গানবাজনা পরকালের সম্বল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) যে বাদ্যযন্ত্রকে শয়তানের হাতিয়ার বলেছেন, যদি হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ও কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে যদি শত্রুকে ঘায়েল করা যায়, তাতে ক্ষতি কী? বরং উত্তম। শত্রুর তলোয়ারেই শত্রু ধ্বংস হল। সুতরাং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যদি গানের হাতিয়ার দ্বারা শত্রু ধ্বংস করেন তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং উত্তম। শত্রুর অস্ত্রেই শত্রু নিধন হল। এভাবেই আল্লাহওয়ালাগণ গান বাজনা দ্বারা শয়তানকে মেরে থাকেন। এ গানের মাধ্যমে যখন জিকিরের উন্নতি, মহব্বত, মনের নম্রতা, মোকামাতের উন্নতি, কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম প্রভৃতি লাভ হয় তখন উক্ত হাতিয়ার তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়। এর ফলে নফ্‌সও ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব যে কাজে নফ্‌সের কোনো চাহিদা নেই এবং শয়তানের অনুপ্রবেশ নেই, সে কাজ নিষেধ হবে কেন? এ কারণেই বাহ্যদর্শী আলেমগণের হারাম, মাকরূহ ফতোয়ার প্রতি আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ কর্ণপাত করেন না। এ জন্যই হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ), হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) এবং খাজা জুন্নুন মিসরী (রহঃ) গানবাজনার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা গানকে রূহের খোরাক বলে আখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)ও রাগরাগিনীকে রূহের খোরাক বলেছেন। একইভাবে অসংখ্য অলিয়ে কামেলগণ থেকে গানবাজনা জায়েজ প্রমাণিত রয়েছে। কোরান শরীফ এবং কবিতাদি শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও কোনো কোনো সাহাবা বেহুশ হয়ে যেতেন, কেহ কেহ মারাও গিয়েছেন। 'কাউলুল কেরাম' গ্রন্থে কোরান হাদিস ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পড়ে দেখুন।

প্রত্যেক ইবাদতে আনুগত্যের নিয়ত শর্ত

ইবাদতের জন্য নিয়ত করা প্রয়োজন ও ফরজ। নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদত হয় না। নিয়ত ছাড়া ইবাদাত অর্থহীন। এতে যেমন কোনো পুণ্য নেই তেমনি কোনো পাপও নেই। আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ইবাদত করা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উদ্দেশে ইবাদত করা পাপ ও শাস্তিযোগ্য। আর কোনোরূপ উদ্দেশ্যহীন ইবাদতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই। তাই তো হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– انما الاعمال بالنية (ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাতি) অর্থাৎ, "নিয়ত ব্যতীত কোনো ইবাদত হয় না।" সুতরাং যে কাজে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য নেই, তা ইবাদত হিসাবে গণ্য নয়। নামাজ, রোযা, রুকু, সিজ্‌দা, দাঁড়ানো ও বসা সবক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি জমিনে মাথা রাখে, তবে সে সিজ্‌দা ও ইবাদত জমিনেরও হবে না আল্লাহ্‌রও হবে না। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি রুকু অথবা ক্বিয়াম করে তাতে পাপ পুণ্য কিছুই হয় না। ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত না হলে,

নামাজ পড়লে লোক কাফের হয়ে যেত। কারণ নামাজে মাটিকে সিজ্‌দা করা হয়, আল্লাহ্‌কে নয়। অর্থাৎ সিজদাকারীর কপাল মাটিতে ঠেকান হয় আল্লাহ্‌তে যুক্ত হয় না। কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নিয়ত থাকে বলেই তা ইবাদত বলে গণ্য হয়। এ কারণেই এর নাম ইবাদত, আর ঐ সিজ্‌দা আল্লাহ্‌ই পেয়ে থাকেন, যদিও তা মাটিতে করা হয়। কিন্তু জমিন বা মাটি কিছুই পায় না। হাজার হাজার লোক দিনরাত মাটিতে সিজ্‌দা করে, কিন্তু তা নিয়তের কারণে আল্লাহ্‌তে পৌঁছে। এমন কি মানুষ হাত, মুখ, নাক ও কপালসহ মাটির নিকটবর্তী হয় কিন্তু কেবলমাত্র নিয়তের ফলে তাতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়।

এ জন্য 'ফতুয়ায়ে তায়াছ্ছুরীতে' বলা হয়েছে, السجدة اثنان سجدة العبادة والسجدةا لتحية سجدة العبادة لله تعالى خاصة والسجدة التحية بد وان الله تعالى لو جه التكريم فى خمسة حال جاز للقوم ان يسحد للنبى و المريد للشيخ والر عية للملك والو لد الوا لد ين والعبد للمولى فى كل حال يرخص فتوى سر اجى اذاسجد الانسان سجدة تحية لايكفر وفتوى خانى وان سجد الرجل للسلطان وكان قصده التعظيم والتحية دون الصلوة لايكفر فتوى كافى قال صد رالشهيد من سجدبغير لله تعالئ وير يد التحية دون العبادة لايكفر(আস্‌সিজদাতু ইছ্‌নানে সিজ্‌দাতুল ইবাদাতি ওয়াসসিজ্‌দাতুত্‌ তাহিয়্যাতি, সিজ্‌দাতুল ইবাদাতিল্লাহি তা'য়ালা খাচ্ছাতুন্‌ ওয়াস্‌ সিজ্‌দাতুত্‌ তাহিয়াতি বিদুনিল্লাহি তায়ালা, লিওয়াজ্‌হিত্‌ তাক্‌রীমি ফীখাম্‌ছাতি হালিজাজা লিল্‌ ক্বাউমি আই ইয়াসজুদা লিন্‌ নাবীয়্যে ওয়ালা মুরিদু লিশ্‌-শাইখি ওয়ার রায়তুলিল্‌ মালিকে ওয়াল ওয়ালাদু লিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল্‌ আব্দু লিল্‌ মাওলা ফী কুল্লিহালি ইউরখাচ্ছু। ফতুয়ায়ে সিরাজী– ইজা সাজাদাল ইন্‌সানু সিজ্‌দাতুত তাহ্‌ইয়াতু লাইয়াকফুরু। ফতওয়ায়ে খানী– ওয়া ইন্‌ সাজাদার রাজুলু লিস্‌সুল্‌তানি অকানা কাছদুহুত্‌ তাজিমি অত্‌তা-হিয়াতু দুনাছ্‌ ছালাতি লাইয়াকফুরু। ফতুয়ায়ে কাফী– ক্বালা ছাদরুশ্‌ শাহীদু মান সাজিদা বিগাইরিল্লাহি তায়ালা ওয়াইউরিদুত্‌ তাহিয়াতু দুনাল ইবাদাতি লাইয়াকফুরু) অর্থাৎ, ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, সিজ্‌দায়ে তাহিয়া তথা– সম্মানসূচক সিজ্‌দা সালামের মতোই। 'যাওহারে গবিতে' বলা হয়েছে, সিজ্‌দা পাঁচ প্রকার। যথা– (ক) সিজ্‌দায়ে অবুদিয়াত (ইবাদতের সিজ্‌দা) (খ) সিজ্‌দায়ে তাহিয়্যাত (সম্মানসূচক সিজ্‌দা) (গ) সিজ্‌দায়ে যাওয়াজ (বৈধ সিজ্‌দা) (ঘ) সিজ্‌দায়ে ইবাহাত (অনুমোদিত সিজ্‌দা) (ঙ) সিজ্‌দায়ে ফরজিয়ত (ফরজ সিজ্‌দা)।

সম্মানসূচক, বৈধ ও অনুমোদিত সিজ্‌দা আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্মানসূচক সিজ্‌দা সালাম হিসেবে গণ্য। অন্য দু প্রকার সিজ্‌দা সর্বদা মোবাহ হিসেবে গণ্য। ইবাদতসূচক ও ফরজ সিজ্‌দা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এবং এ সিজ্‌দার জন্য অজু করা শর্ত। বিনা অজুতে অনুরূপ সিজ্‌দা বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র

ছাড়া অন্যান্য সিজ্‌দার ক্ষেত্রে অজু করা শর্ত নয়। অতএব অজুবিহীন সিজ্‌দা ইবাদত নয়।

এজন্য মোজাদ্দেদ আলফেসানী তাঁর মাকতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডে বিরানব্বই পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "কোনো কোনো ফেকাহ শাস্ত্রবিদ বাদশাহকে সিজ্‌দায়ে তাহিয়্যা করা জায়েজ বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে বাদশাহদেরও বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যেন তারা লোক দ্বারা সিজ্‌দা গ্রহণে জোর-জবরদস্তি না করেন।" আবার অনেকে হারাম লিখেছেন। কিন্তু কেউ-ই শির্‌ক লিখেন নি। অবশ্য যদি কেউ লিখে থাকে, তবে সেটা তার জন্যই শির্‌ক। এ সিজ্‌দার মধ্যে শরীক করার মতো কোনো কারণ সে নিজের জন্য পেয়ে থাকবে। তা না হলে বিভিন্ন জনে অবনত হয়ে সালাম করা অর্থাৎ মাথা রুকুর মতো করে সালাম করাকে হারাম লিখেছেন। এটা কেন লিখেছেন? এটা তাদের জ্ঞান ও বুঝ অনুযায়ী লিখেছেন, তা নইলে কোথায় হারাম আর কোথায় শির্‌ক। এখানে চিন্তা করা দরকার যে নামাজে সিজ্‌দা, রুকু এবং দাঁড়ান– এ তিনটি ফরজ। সিজ্‌দা অথবা রুকুর ন্যায় অবনত হয়ে সালাম বা আদাব করা যদি শির্‌ক অথবা হারাম হয়, তাহলে কিয়ামের মতো দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম বা আদাব করাও তো হারাম এবং শির্‌ক। কারণ নামাজে দাঁড়ানো ফরজ এবং তা ইবাদতও বটে। নামাজে হাত বাঁধা কোনো ফরজ নয় বরং নামাজে দাঁড়ানো ফরজ এবং ইবাদত। অতএব দাঁড়িয়ে সালাম করাও তো হারাম এবং শির্‌ক হবে এবং যে কোনো কিছুর সামনে দাঁড়ানো তো নিরেট হারাম ও শির্‌ক হবে। এর উত্তর কী হবে? প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো শির্‌ক নয়, শুধু কথার কথা মাত্র। এতে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি নেই।

যার মধ্যে 'সিফাতে উলুহিয়্যাত' তথা পরম সত্তার শ্রেষ্ঠত্বগুণ এবং 'হুইয়াত' তথা একত্বের জ্ঞান প্রস্ফুটিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত নেই। এ জন্য জ্ঞানী ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের নিকট শির্‌ক বলতে কিছু নেই। ঈমানে তাকলিদী ও ঈমানে তাহ্‌কিকী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কেউ যদি কোনো ওস্তাদ ও পীর কিংবা অন্য কারও আদবের জন্য জমিনে মাথা রাখে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন যে, সে কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের উদ্দেশে মাথা নত করেছে, না সম্মানের জন্য? যদি সে উত্তরে বলে যে, সে ইবাদতের উদ্দেশে সিজ্‌দা করেছে, তাহলে তার দুটি দিক রয়েছে। যদি উক্ত ব্যক্তি জাহেরপন্থী হয়, তাকে মুশরিক বলা যেতে পারে, আর যদি আরিফ হয়, তাহলে তাকে যে মুশরিক বলবে, সে নিজেই মুশরিক এবং কাফের হয়ে যাবে। কেননা যে ব্যক্তি কাফের নয় তাকে যে জোর করে কাফের বলে সে-ই কাফের হয়ে যায়। আরেফ বিল্লাহ জানেন, যে জিনিসের মধ্যে 'সিফাতে হুইয়াত' এবং 'সিফাতে উলুহিয়াত' নেই তা আল্লাহ্‌ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে 'হওয়ার' প্রশ্ন তাঁর মহিমা বহির্ভূত। কারণ আল্লাহ্‌ তায়ালা স্বয়ং অনাদি অনন্ত, নূতন আবিষ্কৃত নন। অতএব কেউ যদি আল্লাহ্‌ নন এমন কিছুকে আল্লাহ্‌ মনে করে তাহলে তার এ

ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত হবে। এতে আল্লাহ্ বাতিল হয়ে যাবে না বা দ্বিতীয় কোনো আল্লাহ্ সৃষ্টি হবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি এ তাওহীদ সম্পর্কে অবহিত তার কাছে শির্ক এর কোনো আশঙ্কা নেই। কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, আমরা 'কিব্লামুখী' হয়ে আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশে মাটিতে সিজ্দা করি। অপরদিকে পীরকে সিজ্দা করার সময় পীরের দিকে মুখ করেই সিজ্দা করা হয়, এটা কেমন করে বৈধ হতে পারে? এর উত্তর হল যে, সম্মানসূচক সিজ্দার জন্য কেবলামুখী হওয়া ও অজু করা শর্ত নয়। কারণ এ সিজ্দা কারও ইবাদতের উদ্দেশে নয়, নিছক সম্মান প্রদর্শনই এ সিজ্দার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সম্মান প্রদর্শনের জন্য কেউ যদি কারও সামনে, মাটিতে অথবা চৌকিতে মাথা কিংবা মুখ লাগায় অথবা মাথা ও চোখের দ্বারা পদধূলি গ্রহণ করে তাতে কোনোই ক্ষতি নেই। কারণ সম্মান প্রদর্শন করা প্রকৃতপক্ষেই ইবাদত নয়। নামাজের তাশাহ্হুদের মধ্যে যখন "আস্সালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান নাবীয়্যু অরাহ্ মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" পড়া হয়, তখন নবী করীম (সঃ) এর সুরত সামনে আছে বলে মনে করা অবশ্য প্রয়োজন। অন্যথায় সালাম সম্বোধন করা প্রতারণা হবে। অনুরূপ 'এহিয়াউল উলুম' ও অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মুখে উপস্থিত বলে কল্পনা করা যখন হারাম বা শির্ক নয় বরং পুণ্যের কাজ, তখন নামাজ বহির্ভূত সম্মান প্রদর্শন নিষেধ হবে কেন?" নামাজের সিজ্দা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই উদ্দেশে করা হয় কিন্তু এতে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের তাজিমও শর্ত রয়েছে। যেমন– কেবলামুখী হওয়া ও মাটিতে সিজ্দা করা। এখানে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের তাজিম করা হলেও এটাই যথার্থ ছাওয়াব বা প্রকৃত পুণ্যের কাজ। সম্মান প্রদর্শন পুণ্যহীন কাজ নয়। কিন্তু ইবাদতের ধরনে কারও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অবৈধ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পীরকে সম্মানসূচক সিজ্দা করা কোনো মতেই পুণ্যহীন কাজ নয়। হযরত ইমামে রাব্বানী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রহঃ) তাঁর 'মাব্দা ওয়া মা'দ' গ্রন্থে মুর্শিদের অধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন, "মুরিদের জন্য মুর্শিদই হচ্ছে রাসূলে হাকিকী বা প্রকৃত আল্লাহ্র দূত এবং তাঁর হক অন্যের হকের সাথে কোনো সম্বন্ধ রাখে না।" পীর বা মুর্শিদের হুকুম-আহকাম এবং কর্মপদ্ধতি অনুসরণই মুরিদের জন্য প্রকৃত শরীয়ত। মুরিদ যদি পীরে কামেলের সম্মানার্থে তাঁর সামনে মাথা অবনত করে এবং তিনি যদি তাকে নিষেধ না করেন তবে তা বৈধ হওয়ার জন্য এ প্রমাণই যথেষ্ট। মুরিদের জন্য দ্বিতীয় কোনো দলিল বা প্রমাণ সন্ধান করার প্রয়োজন নেই। জাহেরি শরিয়তগ্রন্থে সম্মানসূচক সিজ্দা প্রসঙ্গে যদিও ভিন্ন মত আছে তবে তা অত্যাচারী শাসক, ধনী ও মাতব্বর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু পীরে কামেলকে সম্মানসূচক সিজ্দা প্রসঙ্গে এতে কোনো নিষেধ উল্লেখ নেই। সুতরাং পীর এবং বাদশাহ্ ও অন্য কারও যদি ইসলামের ইতিহাসে সম্মানার্থে সিজ্দা হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তা জায়েজ

বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এতে কিয়াস করা সম্পূর্ণ ভুল। আর যদি এ কথা সর্বসম্মত হয় যে, এ সম্মানসূচক সিজ্দা বাদশাহ্ বা অন্যের জন্য জায়েজ নয়, তবে এতে একথা প্রমাণ হয় না যে, তা পীরের জন্যও জায়েজ নয়। যেহেতু এ সম্মানসূচক সিজ্দাতে মুরিদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ফায়দা রয়েছে, তাই ত্বরিকতপন্থী মাশাইখগণ এ সিজ্দাকে জায়েজ বলেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দিছে দেহ্লবী (রহঃ) এবং তরিকতপন্থী অন্যান্য উলামাগণও এ সিজ্দাকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। মাওলানা সাহেব তাঁর স্বরচিত 'ইন্তিবাহু ফি সালাসিলে অলিআল্লাহ্' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'মুর্শিদের আকৃতিকে নিজের সামনে কল্পনা করে অতঃপর জিকির করবে।' অনুরূপভাবে হযরত কাজী ইউসুফ নাসেহ্ (রহঃ) মুর্শিদের সুরতকে 'জালুয়ায়ে হক' বা 'আল্লাহ্র তাজাল্লি' বলেছেন।

সিজ্দার বিবরণ

আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশে আপাদমস্তক অবনত করার নাম সিজ্দা। কারণ আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট হওয়াই ইবাদতের উদ্দেশ্য, নিছক মাথা নত করা ইবাদতের উদ্দেশ্য নয়। অতএব আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবনত করার নামই সিজ্দা। শুধু যদি মাথা অবনত হয় এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবনত না হয় তথা এর বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাকে আল্লাহ্র ইবাদত বলা যায় কী করে? সুতরাং সমস্ত অঙ্গের জন্যই সিজ্দার নির্দেশ, আর সিজ্দার দ্বারা উদ্দেশ্য একাগ্রতা অর্জন। দেহ মন ও দৃষ্টি ধ্যানের সমন্বয় ছাড়া প্রকৃত একাগ্রতা অর্জন অসম্ভব। আর একাগ্রতা ছাড়া ইবাদত শুদ্ধ হয় না। এ জন্যই সিজ্দায় প্রত্যেক অঙ্গ ও দেহের একাগ্রতা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এটাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ কারণেই প্রত্যেক অঙ্গের জন্য আলাদা সিজ্দার বিধান রয়েছে তা মাথার মতো মুখ, পা ও বক্ষ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও ভিন্ন ভিন্ন সিজ্দা রয়েছে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সিজ্দায় স্ব-স্ব মাথা অবনত করে। এ সব সিজ্দা শেষ হয় মাটিতে। কিন্তু যে সব সিজ্দায় পূর্ণ একাগ্রতা বিদ্যমান তাকে 'সিজ্দায়ে তাজাল্লি' বলা হয়। সে সিজ্দায় আল্লাহ্র জ্যোতি বিকশিত হয় এবং সিজ্দাকারীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একাগ্র হয়ে আল্লাহ্র প্রতি অবনত হয়ে পড়ে। তখন সে ব্যক্তি মাটিতে অথবা নিজের অবস্থায় দাঁড়িয়ে বা বসে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তাকেই সিজ্দা বলা হয়। রুকুসহ সব ক্ষেত্রেই অনুরূপ একাগ্রতা প্রয়োজন। কিন্তু স্তরে ও পূর্ণতায় বিভিন্নতার কারণের জন্য বিভিন্ন অবস্থার নাম আলাদা আলাদা তথা রুকু, দাঁড়ান ও বসা প্রভৃতি রাখা হয়েছে। এ সব কিছুরই উদ্দেশ্য হচ্ছে আদব, তা'জিম, ইবাদত ও ইরাদাত। অভিধানে সিজ্দার অর্থে লেখা হয়েছে মাথা মাটিতে রাখা ও আল্লাহ্র সম্মুখে মাথা ঝুঁকানো। এর বৈশিষ্ট্যও উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য হতে আলাদা নয়।

সালামের বিবরণ

সালাম একটি প্রশংসাসূচক শব্দ। শাব্দিক অর্থের বিচারে তা আশীর্বাদজ্ঞাপক বাক্য। ভাবার্থের ক্ষেত্রে এর শাব্দিক অর্থ বিবেচ্য নয়। ভাবের বিচারে এর তাৎপর্য আলাদা। এ অর্থে সালামের মধ্যে দোয়া, প্রশংসা, অভ্যর্থনা ও সম্মান অবশ্যই নিহিত রয়েছে। এ সবই সালামের অন্তর্ভুক্ত। আর এর অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর প্রতি নিষ্ঠা ওয়াজেব। প্রকৃতপক্ষে সালামের মধ্যে অনিবার্যরূপে অন্তর্ভুক্ত সব কিছু এর লক্ষ্যের মধ্যে শামিল। এটা ওয়াজেব। সালামের জবাব দেওয়া যেমন ওয়াজেব, তেমনি ওয়াজেব হচ্ছে আদব ও সম্মানের স্থানে সালাম করা। দাড়ি রাখা যেমন সুন্নত, তেমনি সালাম দেওয়াও সুন্নত। উভয় কর্মেরই মূল ব্যাপার হচ্ছে আদব বা সম্মান প্রদর্শন। আম্বিয়া ও আউলিয়া এবং পিতা-মাতার প্রতি আদব তথা সম্মান প্রদর্শন সর্বসম্মত ওয়াজেব।

অতএব যা সম্মানীয় তার প্রতি যত্নবান হওয়াও ওয়াজেব। প্রকৃতপক্ষে শাব্দিক সালামের সম্মানীয় ক্ষেত্র রয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রধান সাহাবাগণ তাঁর আগমনে দাঁড়িয়ে যেতেন, এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করতেন, নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করতেন এবং পিছিয়ে যেতেন বা এক পাশে সরে যেতেন। এ সব কর্মাদি সম্মানসূচক কাজ বলে গণ্য করা হয়। এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য ও অর্থ রয়েছে তাই সালামের মূল লক্ষ্য। সুতরাং 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এ দোয়াসূচক বাক্যটি অনেক উদ্দেশ্য ও অর্থবোধক। সালাম একটি প্রশংসাসূচক শব্দ হলেও কখনো এর ভাবার্থ হয় দোয়া, কখনো এর উদ্দেশ্য প্রশংসা ও অভিবাদন, কখনো সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা প্রদান। ছোটদেরকে সালাম ও তার জবাব দানের অর্থ হচ্ছে দোয়া এবং প্রশংসা। বুজুর্গ ও মুরুব্বিদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে আদাব, সম্মান ও তাজিম এবং বন্ধু বান্ধব, সহপাঠী ও সমবয়সীদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে সম্ভাষণ ও ভদ্রতা। মোট কথা অবস্থার প্রেক্ষিতে সালামসূচক বাক্যটি উচ্চারিত হবে। যদিও হাদিস শরীফে সালাম শব্দের পূর্বে বহু বচনের আলিফ ও লাম যুক্ত হয়েছে, কিন্তু কোরান শরীফের দোয়া ও সুসংবাদ প্রসঙ্গে আলিফ ও লাম ছাড়াই এসেছে এবং সালামুন আলাইকুম বহু বচন ব্যবহৃত হওয়া ব্যাকরণ দৃষ্টে কোনো ভুল নয়। সালামের ভাষা বা শব্দ আরবি না হলেও তা হারাম কিংবা দোষণীয় হবে না। বরং যে শব্দ দ্বারা সালামের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাই সালাম হিসেবে গণ্য হবে। সালাম আরবি ভাষাতেই হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কারণ আল্লাহ্‌র বাণী সকল ভাষাতেই প্রচলিত। এমন কি আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশ্‌তাদের অনেককে নিজের তরফ থেকে সত্তর হাজার ভাষা প্রদান করেছেন, আর অনেককে তার চেয়েও বেশি। হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ্ যে জ্ঞান ও ভাষা শিখিয়েছিলেন তা কোনো ফেরেশ্‌তাও জানে না। বর্তমানে আদম সন্তানদের মধ্যে যেসব জ্ঞান ও ভাষা প্রচলিত, তা সবই আদম (আঃ) থেকে; সুতরাং সকল ভাষাই পৈতৃক ভাষা। কেবল অজ্ঞরাই তা অস্বীকার করে। এ বিষয়ে

চিন্তা করা দরকার যে, সব আসমানী কিতাবই কি আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, না অন্য ভাষায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থই যার যার এলাকার ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন– তাওরাত ইব্‌রানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং গঠন পাঠনও ইব্‌রানী ঢংয়ে সম্পাদিত হয়। আমাদের আরবি কোরান শরীফে আজও কিছু কিছু ইব্‌রানী শব্দ দেখা যায়। সুরা ফাতিহার শেষে আমিন শব্দটিও ইব্‌রানী। এতে কি ক্ষতি হয়েছে? যে ব্যক্তি যে ভাষায়, যে ঢংয়ে কথা বলে তার ব্যাকরণ ও রচনা শৈলীও সে ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী তৈরি হয়। এতদসত্ত্বেও কোরান মাজীদে বহু অনারবী নাম রয়েছে যথা– ইব্রাহীম, মূসা ইত্যাদি। এতে ক্ষতি কি? বক্তব্যের উদ্দেশ্য তো ঠিকই আছে। আসল কথা হচ্ছে সম্মানীয়কে সম্মান প্রদর্শন করা।

আদব বা শিষ্টাচার দু প্রকার– জাহেরি ও বাতেনী। বাতেনী আদাবের জন্য বাতেনী অবস্থা আবশ্যক। যাকে ইল্‌হা তথা অনুনয় বিনয় বলে। এ এমন একটি সূক্ষ্ম অবস্থা যাতে উক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুরুব্বি ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে তৃপ্তি, বিনয় ও নম্রতা অনুভব করে এবং সমবয়সীদের সঙ্গে প্রীতি ও ভালোবাসা বোধ করে। কোনো ব্যক্তির সারা দেহ যদি অনুরূপ অবস্থা দ্বারা আবিষ্ট হয়, তাহলে তার গোটা দেহে এর ফলশ্রুতি প্রকাশ পায় এবং তার হাত-পা নাড়াচাড়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে আদব অথবা শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয়। এটাই বাতেনী অবস্থা। অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আদাবসম্পন্ন ও শিষ্টাচারী হন। প্রকাশ্য ইল্‌হাম প্রাপ্ত ব্যক্তিও ভদ্র হন। আহ্‌লে আদব তথা শিষ্টাচারী ব্যক্তিদের এটাই স্বভাব। এজন্য ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সালাম শব্দের পরিবর্তে এর সমার্থবোধক ও একই ভাব প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। যথা– আদব, তাসলিমাত, বন্দেগি ইত্যাদি। বর্তমান যুগে সালামকে শুধু দোয়া হিসেবেই গণ্য করা হয়। অথচ অভিধানে সালামের স্থলে আদাব শব্দ লেখা হয়েছে। তাছাড়া দরখস্ত ও চিঠিপত্রে সব সময়ই আদাব, তাকরীম, নিয়াজ, বন্দেগি প্রভৃতি লেখা হয়। এতে কোনো পুণ্যহানি হয় না। অথচ নিছক সালামের সময় 'আস্‌সালামু আলাইকুম' না বললে যদি পুণ্যহানী ও পাপ হয়, তাহলে চিঠিপত্রে সালাম শব্দের পরিবর্তে উক্ত শব্দাবলি ব্যবহারে পাপ বা পুণ্যহানী হবে না কেন? সালামের জবাবে মুরব্বিগণ যদি বলেন, বেঁচে থাক, সুখে থাক ইত্যাদি তাহলেও সালামের জবাব হয়ে যাবে। কারণ অনুরূপ কাজ শরিয়তের বহির্ভূত নয়। সালাম ও এর জবাবের কতিপয় ভালো আনুষঙ্গিক দিক রয়েছে। যথা– হাত উঠানো, হাত দ্বারা ইশারা করা অথবা দেহ ও মাথা অবনত করা ইত্যাদি। এ সব আনুষঙ্গিকতা পালন না করে সালামের বিধান ও রীতি এবং আদাব পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে মাথা নত করার সময় রুকু, সিজ্‌দা তথা আল্লাহ্‌র ইবাদতের নিয়ত করা চলবে না। কারণ ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের ইবাদতের নিয়ত করার কারণে এ সমস্ত ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ্য অন্যায় ও কুফ্‌রি হবে।

অন্যথায় ইবাদত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে হাত উঠান বা দেহ অবনত করা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। কারণ বহু ক্ষেত্রেই এ সব কাজ করতে হয়। এসব ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত ইহ ও পরকালীন কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। তাহলে সালামের সময় মাথা নত করলে তা কেন রুকু, সিজ্‌দা অথবা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং হারাম ও মাকরূহ্ বলে সাব্যস্ত হবে?

প্রকৃতপক্ষে এরূপ বাধা-নিষেধারোপ করা শরিয়ত বিরোধী কাজ। এতে ধর্মীয় মূলনীতির সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। তবে হাত উঠানো বা ইশারা করার সময় হাতে কোনো হাতিয়ার বা লাঠি প্রভৃতি যেন না থাকে, তাতে বেয়াদবী হবে। দূর থেকে ইশারা করার সময় রুমাল এবং অন্য কোনো প্রতীক দ্বারা ইশারা করা– যাতে সালামের জবাব বোঝা যায়, তা জায়েজ। আর এক ধরনের সালাম রয়েছে যাকে প্রচলিত সালাম বলে। এ সালাম সব সময়ের জন্য সুন্নত– انما المؤمنون اخواة (ইন্নামাল্ মো'মিনুনা ইখ্‌ওয়াতুন্) অর্থাৎ "মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" উক্ত বাণী দ্বারা এ সালাম প্রমাণিত। দেশি-বিদেশি, চেনা-অচেনা যে কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে একে অন্যকে সালাম করবে এবং ইসলামি রীতি অনুযায়ী তার জবাব দেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ শ্রেণীর সালামে ছোট-বড় পার্থক্য করা হয় না। কেবল ইসলামি রীতি ও সওয়াবের প্রতি লক্ষ রেখে মুসলিম মুসলিমকে ইসলামের মহত্ত্বের জন্য প্রথম সালাম করা অনেক পুণ্যের কাজ। এ সালামের জবাবদানকারী অবশ্যই কম পুণ্যের অধিকারী। কারণ সালামদাতা এর মাধ্যমে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে থাকেন, এজন্যই এতে দ্বিগুণ পুণ্য পাওয়া যায়।

সমজাতিত্বের আরও এক ধরনের সালাম রয়েছে যাকে সামাজিক সালাম বলা চলে। সহচর ও সহাবস্থানকারীদের মধ্যে এ সালাম প্রচলিত। এ সালামেও পুণ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কারও যদি অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কোনো মাঠে ময়দানে বা পাহাড়ে জঙ্গলে, অথবা একই গন্তব্যস্থলের কোনো ভ্রমণকারী হিসেবে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যেখানে সচরাচর মানুষের যাতায়াত নেই অথবা জায়গাটি অত্যন্ত ভয়াবহ, তাহলে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার বেশ সৌহার্দ ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। সে ব্যক্তি যদি ভিন্ন জাতির তথা হিন্দু, খ্রিষ্টান অথবা মগও হয়, তাহলেও তাদের মধ্যে স্বভাবতই ভালোবাসা জন্মে। এ ভালোবাসাকে মানবতা বা সমজাতিত্বের ভালোবাসা বলা হয়। এ সমজাতিত্বের উপাদান অনেক। তন্মধ্যে হৃদয়াকর্ষণ, করুণা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, শক্তি, প্রজ্ঞা অন্যতম। এ সকল জৈবিক প্রভাবে একে অপরকে আপন ভাবে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রভাব সময়ের প্রেক্ষিতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে তা সাধারণভাবে বর্তমান। একেই মানুষের মনুষ্যত্ব বলা হয়। এ জৈবিক প্রভাবে জঙ্গল অথবা প্রান্তরে একের সঙ্গে অপরের প্রেম ভালোবাসা ও শুভাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, তখন তাদের পরস্পর সালাম ও সম্মানবোধ জন্মায় আর তা সর্বদাই শুভ। এতে কোনো দোষ নেই। অনুরূপভাবে সম শ্রেণীর মুরব্বি ও পরিচিতদেরকেও সালাম করা প্রয়োজন। কারণ এক্ষেত্রে জাতিত্ব, মানবিকতা ও

সম্পর্কসূত্রই প্রধান বিবেচ্য। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল প্রকার ওস্তাদ ও মুরব্বিকে সর্বদা সমজাতিত্বের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কেউ যদি কোনো হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যদের কাছে শিক্ষা লাভ করে, যেমন– কোরান বা দ্বীনি এলেম প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করে তাহলে তাকেও সমজাতিত্বের আদাবের ভিত্তিতে সালাম ও তাজিম করা প্রয়োজন। অন্যথায় শিক্ষার মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নিজের বাদশাহ্ ও মহাজন এবং মা-বাবাকেও সম্মান দেখানো প্রয়োজন। তারা বিজাতি ও বিদেশি হলেও তাদের সম্মান করতে হবে– যেমন ইংরেজ, হিন্দু প্রভৃতি। এ কারণে বাদশাহ্‌র অধিকারের সমর্থনে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– السلطان ظل الله فمن اكر مه اكرمه الله ومن اهانه فاهانه الله (আস্‌সুলতানু জিল্লুলাহি ফামান আকরামাহু আকরামাহুল্লাহু অমান আহানাহু ফাআহানাহুল্লাহ্) অর্থাৎ, "বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র ছায়া, তাকে সম্মান করা আল্লাহ্‌কেই সম্মান করা এবং যে তাকে অপমান করে আল্লাহ্ তাঁকে ধ্বংস করেন।" যেহেতু বাদশাহ্ আল্লাহ্‌র ছায়া, সেহেতু তাঁর থেকে কোনোরূপ অভদ্র আচরণ প্রকাশ পেতে পারে না। অনুরূপ গর্হিত কাজ আল্লাহ্‌ওয়ালা ব্যক্তির মর্যাদার পরিপন্থী। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ পিতৃতুল্য। প্রজাদের উচিত আপন বাদশাহ্‌কে বাপের মতো সম্মান করা এবং বাদশাহ্‌র উচিত প্রজাদেরকে সন্তানের মতো ভালোবাসা। তাহলে আল্লাহ্ আপন পরিবারের সদস্যদের উভয়কেই শান্তিতে রাখবেন।

আর এক ধরনের সালাম রয়েছে যা কুফ্‌রি। এ সালাম কাফেরদের আবিষ্কার, এ সালামে কুফ্‌রি করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ সালামে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যের ইবাদতের প্রেরণা রয়েছে। এ সালামে ভিন্ন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নোক্ত হাদিস তার প্রমাণ– من تشابه بقوم فهو منهم (মান্ তাশাব্বাহা বিক্বাউমিন্ ফাহুয়া মিন্‌হুম্) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুকরণ করে সে তাদেরই দলভুক্ত।" এখানে শর্ত হল, এ কাজে তার স্বধর্ম ত্যাগের নিয়ত থাকতে হবে। কুফ্‌রি পদ্ধতিতে সালাম দেওয়া এবং নেওয়া কুফ্‌রি ও হারাম বা অনুরূপ। এ ধরনের সালামের প্রচলন বর্তমানে খুবই বিরল। এ ধরনের সালাম এবং সম্মান করায় মুসলিমদের জন্য অবশ্যই ক্ষতি রয়েছে। সকলকেই তা পরিহার করা উচিত। শোনা যায়, হিন্দু আমলে কোনো কোনো সময় হিন্দুরা মুসলমানদেরকে ধরে নিয়ে কুফ্‌রি পদ্ধতিতে নিজেদের দেবতাকে সিজ্‌দা ও সালাম করাতো, অন্যথায় দেবতার সামনে তাকে বলি দিত তথা তাকে হত্যা করত।

খেলাফতের বিবরণ

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর সুযোগ্য কামেল সন্তানদেরকে স্বীয় পবিত্র গুণাবলিমণ্ডিত করে দোজাহানের রত্নভাণ্ডাররূপে সৃষ্টি করেছেন। উভয় জগৎ তাঁদের দ্বারা সমৃদ্ধ এবং পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁদের দ্বারাই প্রকাশিত

হয়। সময়ের পরিবর্তনে মাটির উপরে রকমারী বৃক্ষ ও ফলফলাদি এবং নানা প্রকার জীবজন্তু পোকামাকড় সৃষ্টি হয়। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে এগুলো অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু এ সকল বস্তু চার পদার্থের (পানি, আগুন, মাটি ও বায়ু) মাধ্যমে প্রকাশিত ও সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এগুলোকে সময়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সময় আল্লাহ্‌র অন্যতম সত্তাগত বৈশিষ্ট্যেরই নাম। এ বৈশিষ্ট্য থেকেই অন্যান্য রঙ বেরঙের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পূর্ণ মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে এবং তাঁর অসীম সত্তায় দোজাহানের হেকমত তথা রহস্য বর্তমান। উভয় জগতের ভালো-মন্দ, দয়া-নির্দয়া, শক্তি, আহার্য সব কিছুই কামেল মানুষের সত্তা থেকে উৎসারিত হয়। কাশ্‌ফওয়ালাদের নিকট এ সত্য মোটেই গোপন নয়। এমন কি সকল মানুষ ও বস্তুসত্তার আবেষ্টনকারী মহা সত্তাও উক্ত কামেল মানুষের সত্তাবৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। খলিফার সম্পর্ক খেলাফত দাতার সাথে অবশ্যই এক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হয়। সুতরাং খলিফাকে প্রকৃতপক্ষেই খেলাফত দাতার সমজাতীয় হওয়া প্রয়োজন। 'এক সূত্র' কথাটি সমজাতীয়তার মধ্যমণি ও মূলেরই ইঙ্গিত বহন করে।

মোটকথা আল্লাহ্‌র সত্তাতে উভয় জগতের সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান। 'আকলে হাকিকী' তথা প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুভূতি এখানে অকার্যকর। এ প্রকৃত জ্ঞান আপন সকল বৈশিষ্ট্যে সচেতন। একজন নিদ্রিত ব্যক্তি অচেতন থাকলেও তার অন্তর সচেতনভাবে রূহের জগতে বিচরণ করে, স্বপ্ন দেখে এবং সে অনেক রহস্যের সন্ধান লাভ করে; কেবল নশ্বর দেহটি নিদ্রার সুখ অনুভব করে। এ অবস্থায়ও প্রকৃত জ্ঞান সতেজ এবং সচেতন থাকে। অন্যথায় তার সামনে কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটিত হত না।

এক কথায়, তাওহীদি চিন্তায় সকল বস্তুই অবশ্যম্ভাবীরূপে এক ও অভিন্ন। যখন এ সম্পর্কে উপলব্ধি হবে, যার আল্লাহ্ তত্ত্বের জ্ঞান নসীব নেই, সে প্রতারক যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে সত্যানুসন্ধানীদের সত্বর তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। অন্যথায় তাঁদের ওপর ঐ হতভাগার সাথে মেলামেশার কারণে তার প্রভাব পড়বে। এ কারণেই এ যুগে মানুষ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চিনতে পারে না এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সান্নিধ্য লাভের পরম সৌভাগ্য দুনিয়াদারদের নসীব হয় না। বাণী ও ইঙ্গিত ইশারার গূঢ় অর্থ তারা বোঝে না এবং গুপ্ত বিষয়ে কথার তাৎপর্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু আশিক ও আরিফগণই কেবল তা উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ নূরানী অন্তরকে নূরানী কথায় আলোকিত করে আর মরমীপন্থীদের জন্য এটা খোরাক অর্থাৎ এর দ্বারাই তারা আল্লাহ্‌কে লাভ করেন। আল্লাহ্‌কে লাভ করার এটাই সরল পথ। আশিকানদের প্রেম উন্মাদনাই তাঁদের জন্য কোরানের মর্মার্থ বা এর চেয়েও অধিক। কেননা খনি বা ভাণ্ডার হতে যা বের হয় সেটাই তার অর্থ, অর্থাৎ মণি, মুক্তা, সোনা, রূপা, যা বের হয় সেটাই তার অর্থ। এর থেকে যদি কোনো অসার পদার্থ বের হয় তাও তারই অর্থ। আর যদি কিছুই না বের হয় তা হলে তা অর্থহীন। অনুরূপভাবে যে বাক্যে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আবেগ

সৃষ্টি হয় সেটাই সে বাক্যের অর্থ। আর যে বাক্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না তা অর্থহীন প্রলাপ, যদিও তা কোরান হয়। মোটকথা 'তাওহীদের অজুদী' এবং 'তাওহীদের ইত্তেহাদী' থেকেই আশিকের হৃদয়গ্রাহী বাণী উত্থিত হয়। বাহ্যত এ সব কথা অর্থহীন মনে হলেও গূঢ়ত এগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও রহস্যপূর্ণ। যার বদৌলতে আশিক মাশুকের মধ্যকার গুপ্ত রহস্যের সারতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সব অদ্বিতীয় বাণীর বর্ণনা সম্ভব নয় বরং এর এক একটি অক্ষর মুক্তার চেয়েও মূল্যবান। কিন্তু অজ্ঞান লোকেরা এ মহামূল্যবান বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝে, নিজেদের আত্মঅহংকারবশত যে সব মহাপুরুষ এ সব কথা বলেন, তাদের কুৎসা করে এবং লাঞ্ছনা দেয়। ফলে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের তরফ থেকে হজবে পতিত হয়। আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীর হেফাজতের জন্য আদম (আঃ) ও তাঁর আওলাদদেরকে খলিফা করেছেন। হযরত শাইখ আকবর ইব্‌নুল আরাবী (রহঃ) স্বীয় 'ফচুছ' কিতাবে বর্ণনা করেছেন– فا ستخلفه فى حفظ العالم فلا يزال العالم محفوظا مادام فيه هذه الانسان الكامل (ফাস্‌তাখ্‌লাফাহু ফি হেফ্‌জিল্ আলামে ফালইয়াজালুল্ আলাম মাহ্‌ফুজান মা দামা ফীহি হাজিহিল ইন্‌ছানুল্ কামিল) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পৃথিবীর হেফাজতের জন্য বুজুর্গ তথা কামেল মানুষকে খলিফা বানিয়েছেন। যতদিন এ পৃথিবীতে কামেল মানুষ বর্তমান থাকবেন ততদিনই এ পৃথিবী হেফাজত ও নিরাপদে থাকবে।" কামেল মানুষগণ দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পদ এবং আখেরাতের রত্নভাণ্ডারের স্থায়ী মোহর। এ জন্যই বলা হয়েছে, فكان ختما علئ خزانته الاخرة ختما ابديا (ফাকানা খাতামা আলা খাজানাতিহিল্ আখিরাতি, খাতামা আবাদিয়া)। এর পরে বলা হয়েছে– فظهر جميع مافى الصورة الالهية من الاسماءفى هذه النشاته الانسانية (ফাজাহারা জামিউ মাফীহ্ ছুরাতিল ইলাহিয়াতি মিনাল আছমায়ি ফীহাজিহিন্ নিশায়াতিহিল্ ইন্‌ছানিয়াহ) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "মানব দেহে তাই আছে যা এলাহির সুরতে ছিল।" এর নিদর্শন আলা হযরতের লেখায়ও পাওয়া যায়, فها زقر تبة الاحاطة والجمع بهذه الوجود (ফাহাজাত রুত্‌বাতুল আহাতাতে ওয়াল্‌জামিউ বিহাজিল্ অজুদ) "এলাহির অবয়ব (ছুরত) ও গুণাবলি, এ ইন্দ্রিয়ের দেহে সঞ্চিত ও পরিবেষ্টিত।" অর্থাৎ, এলাহিয়াতের সমস্ত গুণে গুণান্বিত হয়ে বুজুর্গ ও কামেল মানুষ প্রকৃত গুণের অধিকারী হয়েছেন। অধস্তন ফেরেশ্‌তা এ বুজুর্গির রহস্য অবগত নয়। আল্লাহ্ যখন আদম সৃষ্টির কথা ফেরেশ্‌তাদের জানান, তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাতে আপত্তি করে এবং বলেন যে, কোনো প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই, আমরাই তোমার গুণগান ও পবিত্রতা বয়ান করব। এ ক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তাগণ মানব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ্‌র রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত। 'তাবিলুল মাহকাম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে– অধস্তন ফেরেশ্‌তারা যেরূপ অজ্ঞতাবশত মানুষ সৃষ্টির প্রতিবাদ করেছিল, সেরূপ অজ্ঞতাবশতই একদল লোক তথা জাহেরি শরিয়তপন্থীরা শরাকেই ধর্ম মনে করে এবং উক্ত মহাপুরুষ তথা আল্লাহ্

ওয়ালাগণের বিরোধিতা করে এবং তাঁদের সম্পর্কে প্রতিবাদ তোলে। তাদের এ প্রতিবাদের কোনো মূল্য নেই। এ প্রতিবাদ করা হারাম এবং বড় কুফরী। কারণ জাহেরি বিদ্যা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান একটা ধারণা মাত্র এবং ধারণাই হচ্ছে সত্যের বাধাদানকারী পর্দা। আল্লাওয়ালাগণ এ জ্ঞানকে নশ্বর মনে করেন এবং ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। তখন তাঁদের সামনে কোনো বাধা থাকে না বলেই আল্লাহ্‌র নিরাকার সত্তা তাঁদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। কারণ সত্য জ্ঞান দ্বারা সত্যকে চেনা যায়। তাই শেখ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) তাঁর ফুছুছ গ্রন্থে বলেন, ان العلم تابع للمعلوم (ইন্নাল ইল্‌মা তাবিউল্ লিল মা'লুম) অর্থাৎ, "জ্ঞান ধারণার অধীন।" সুতরাং যে জ্ঞান ধারণা ও অনুমানপ্রসূত তা ক্ষণস্থায়ী ও যবনিকা আচ্ছাদিত। একে কাল মাকাল তথা তর্ক বিতর্ক বলে। তাবিলাতের চতুর্থ শিক্ষায় আছে– বর্ণনাকারী হিসেবে জাহেরি বিদ্যা ও হাদীছ শরীফের রাবি ছিলেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। এ বর্ণনা থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা বাহ্যিক জ্ঞান। আর এ বাহ্যিক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত অবস্থা, যা নবী-রাসূলদের মিরাছ তা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় না– যা দ্বারা রূহ্ জীবিত হয়। রাসূল (সঃ) এর কারামাত, চরিত্র ও সৃষ্টির সুপারিশের ক্ষমতা এর মধ্যে নিহিত এবং এ থেকেই প্রকাশিত হয়। এর নামই বেলায়েত। হযরত শাইখ কুদ্দেসা সির্‌রুহুল আজিজ বলেন, وكذ الك خاتم الاولياء ما كان وليا الا بعد تحصيل شر ائط الولاية من الاخلاق الالهية فى اتصاف بها من كونه الالهية يسمئ بالولى الحميدة - (অকাজালিকা খাতিমুল আউলীয়াই, মাকানা অলীয়ান ইল্লা বা'দা তাহছিলি শারায়িতিল্ বেলায়েতে মিনাল্ আখ্‌লাকিল্ ইলাহিয়াতি, ফী ইত্তেছাফি বিহা মিন্ কাওনিহিল্ ইলাহিয়াতি ইউছাম্‌মা বিল্ অলীয়্যিল্ হামিদ) অর্থাৎ, "এভাবে খাতেমুল আউলিয়া অলি ছিলেন যখন আদম পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত কোনো অলি ছিলেন না। কিন্তু আখলাকে ইলাহী ও বেলায়েতের শর্তাদি লাভ করে সৎ আখলাকের অধিকারী হওয়ায় তাকে অলিয়ে হামিদ তথা প্রশংসিত অলি নামে আখ্যায়িত করা হয়।" কিন্তু ঈসা মসীহ্ বেলায়েতের সমাপ্তকারী। অর্থাৎ হযরত মেহদী (আঃ) এর যুগে হযরত ঈসা মসীহ্ আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং মানুষকে বেলায়েত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবেন। এটা হবে তাঁর বিশেষ আহ্বান। এর পর বেলায়েতের ধারা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রে তাওহীদের রহস্যাবলি এক ও অভিন্ন। আখেরাতে আল্লাহ্‌র অলিদের কাছে যে সব রহস্য ও অবস্থা উদ্ভাসিত হবে দুনিয়াতেও তাঁদের কাছে তা প্রকাশিত হয়ে যায়। কেননা আদম রহস্যই আল্লাহ্‌র রহস্য। সুতরাং নফস্‌তত্ত্বের জ্ঞান প্রকৃতই তাওহীদের জ্ঞান। তাই তো আল্লাহ্ তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন, قد جائكم البصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن اعمى فعليها (ক্বাদ জায়াকুমুল্ বাছায়েরু মির্ রাব্বিকুম ফামান–আব্‌ছারা ফালিনাফ্‌ছিহী অমান আ'মা ফা আলাইহা) অর্থাৎ, "তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে দৃষ্টিশক্তি এসেছে, যে এর দ্বারা দেখেছে সে

নিজের জন্যই দেখেছে, আর যে অন্ধ হয়ে রয়েছে তার ফলও সে-ই ভোগ করছে।" অর্থাৎ, যে নিজের নফসের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে নি, তার দৃষ্টিতে রয়েছে আত্মগৌরবের কালো যবনিকা, যার জন্য দৃষ্টি বক্রপথে গমন করে ভ্রষ্ট হয়ে যায়। পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম, যারা স্বীয় গুণে সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন এ বাণীর তাৎপর্য – يدالله فوق ايد يهم (ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম) অর্থাৎ, "তাঁদের হাতের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র হাত।" – তারা সত্যিই কত ভাগ্যবান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, স্বীয় নূরের ঝলকে মহামানবদের পাক রূহ্‌সমূহ দোজাহানের সমস্ত এলাকা উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, নবী ও অলিদের আত্মা স্বীয় সত্তা ও জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাই হাদিসে কুদসীতে মহানবী (সঃ) বলেন, "সকল সৃষ্টির মৌল সত্তা এক ও অভিন্ন" এবং জল ও কাদা কোনোটাই স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা নয় বরং অদ্ভুতরূপে এক। خلق الله ادم على صورته (খালাক্বাল্লাহু আদামা আলা ছুরাতিহী) অর্থাৎ, "আল্লাহ আদমকে স্বীয় রূপে সৃষ্টি করেছেন।" এ হাদিসটি উক্ত তত্ত্বেরই সমর্থক। এর অর্থ হল, আদম সত্তার সারই আল্লাহ্‌র সামগ্রিকতা। মানুষের বিভিন্ন গুণাবলি তথা ভ্রান্তি ও নিদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত দাবি অযৌক্তিক বা ভ্রান্ত মনে হতে পারে। কারণ এগুলো আল্লাহ্‌র শানের সাথে বেমানান। কিন্তু এটাও সত্তারই এক গুণের নাম। তবে ভুল ইত্যাদি তাঁর সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহ পরকালে যা কিছু বর্তমান সবই 'যাতে-ইলাহি' থেকে উদ্ভুত, অন্য কিছু হতে নয় (নাউজুবিল্লাহ্)। যেমন– সাপের মুখে বিষ রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজে সুস্থ রয়েছে, অন্য দিকে স্তনে দুগ্ধ থাকে এবং তা শিশুর আহারের জন্য কিন্তু দুগ্ধধারিণীর নিজের জন্য নয়। তবে দুগ্ধবতী তার দুগ্ধ উপভোগ করে ভিন্ন পদ্ধতিতে। স্তনের দুধ থেকে সে উপকৃত হয় এভাবে– দুধ থেকে মাখন, মাখন থেকে ঘি, আর তা থেকে শক্তিশালী রক্ত, যা দেহের মৌল শক্তি এবং উৎস রূহ্। রূহ্ সর্বগুণে জীবিত এবং এতে সমস্ত বস্তুর উপভোগ ক্ষমতা বিদ্যমান এবং নিজ গুণাবলি উপভোগের ক্ষমতাও এতে রয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেকেই যেন ভিন্নতর মনে করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আয়নায় নিজের হাত, মুখ ইত্যাদি দেখে নিজের চক্ষু খুশি অনুভব করে এবং নিজের স্বর বা কণ্ঠ শুনে কান আনন্দিত হয়, অনুরূপভাবে নিজের গুণাবলিতে নিজেই আনন্দিত হতে দেখা যায়। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যে সব কিছু বিদ্যমান এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সবেরই অস্তিত্ব উক্ত সত্তায় বর্তমান। স্বয়ং সত্তার তুলনাহীনতা শানে কুদ্‌সী তথা পবিত্র মহিমার একটি নাম, যা নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক বস্তু সত্তায় রয়েছে। যেমন– বীজ ও দানায় যে পর্যন্ত গুল্ম ও শাখা বের না হয় সে পর্যন্ত এ অবস্থাটাকে 'শানে কুদ্‌সী' বলা হয়। এ মর্যাদা তার পবিত্রতার মর্যাদার দিকে ইশারা করে। এ পবিত্রতার দিকে সংযুক্ত করাকে পবিত্রতার বর্ণনা বলে।

আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তুর মূল সর্বদাই পাক। তাই আল্লাহ্ তায়ালা যেহেতু সমস্ত বস্তুরই পবিত্র মূল, সুতরাং এ পবিত্রের শাখা-প্রশাখার দিক থেকে তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্ট বস্তু দ্বিতীয় স্তরে। কিন্তু প্রথম স্তরের জন্য দ্বিতীয় স্তর প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তরের রহস্য ও বাতেন। অনুরূপ দ্বিতীয় স্তরের জন্য প্রথম স্তরের প্রয়োজন এবং এটাই তার রহস্য ও বাতেন। সুতরাং বান্দার মধ্যে যা ঘটে সেটা আল্লাহ্র রহস্য ও বাতেন হতে এবং আল্লাহ্র সত্তায় যা ঘটে সেটা বান্দার রহস্য ও বাতেন হতে।

সৃষ্টি রহস্যের বিবরণ

সৃষ্টির প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যেকটি কাজই বিস্ময়কর ও রহস্যময় এবং প্রত্যেকটি মাখলুক সত্তা ও গুণের প্রেক্ষিতে বিস্ময়কর। রূহ আরেক বিস্ময়কর তার রহস্য ও মহিমা নিরূপণের দিক থেকে। এ কারণেই এর নাম আমরে রব তথা প্রভুর আজ্ঞা রক্ষাকারী। মূল সত্তায় যে সব গুণ ও শান রয়েছে দ্বিতীয় স্তরে রূহের মধ্যেও তা রয়েছে। যা মহিমাময় গভীর রহস্য ও মহাবিস্ময়। এ রহস্যময়তার মধ্যে পবিত্র মহাসত্তা বিদ্যমান। যা সকল সময় ও মহিমায়, প্রত্যেক সত্তায় ও গুণে, আকৃতি ও চেহারায় প্রত্যেক আরম্ভ ও শেষের মূল বা অঙ্কুর। উভয় জগতে যা কিছু বর্তমান সবই সে জাতের বিকশিত রূপ। এ সত্তার ক্ষেত্রে নিকট বা দূর কথাটি প্রযোজ্য নয়। কেননা স্থানের প্রেক্ষিতে নিকট বা দূর নির্ধারিত হয়। যিনি সর্বত্র বিরাজিত তার কাছে দূরত্বের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ক্ষুদ্র ও মহা জগতের বাইরে যখন কোনো স্থানই নেই, যা তার আওতাভুক্ত নয়, তখন তার ক্ষেত্রে নিকট বা দূরের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সবকিছুতেই তিনি এবং তিনিতেই সবকিছু। অনুরূপ রহস্যে রূহও বিশ্ব থেকে বিশ্বময়। তার জন্য সত্তা ও গুণাবলি, আকৃতি ও অবয়ব, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, নিকট ও দূর, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণীত ও অনির্ণীত সব স্বীয় সত্তা ও নফ্সের মহিমা ও বিকাশ। তাই মহানবী হাদিসে কুদ্সীতে যথার্থই বলেছেন, من رانى فقد راءالحق (মান রায়ানী ফাক্বাদ রায়াল হাক্কা) অর্থাৎ, "যে আমাকে দেখেছে অবশ্যই সে হক্বকে দেখেছে।" এর অর্থ হল, রূহ্গত উপলব্ধি দ্বারা দেখার অর্থ নবীকে দেখা আর সত্তাগত উপলব্ধি দ্বারা দেখার অর্থ হবে স্বয়ং আল্লাহ্কে দেখা। আর সামগ্রিক উপলব্ধির দ্বারা দেখার অর্থ হবে আল্লাহ্ ও রাসূলকে দেখা। সাধারণভাবে হক অর্থ ঠিক ও যথার্থ। সুতরাং এখানে যে নবীকে দেখেছে সে হক বা ঠিকই দেখেছে। তার অর্থ হল নবীকে যে দেখেছে সে যদি পাপী বা মিথ্যাবাদী হয় তাহলেও সে নবীকে দেখে থাকলে তা ঠিকই দেখেছে। কারণ নবী (সঃ) এর রূহ্ মোবারক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিকশিত। সুতরাং খাব বা কাশ্ফ অথবা জাগ্রত যে অবস্থায়ই তাঁকে দেখা যাক না কেন, তাই সত্য। এ জন্য

ভাবাবিষ্টগণ স্বীয় সাদৃশ্যময় নূরের আলোকে তাঁদের মাহ্বুবকে অবলোকন করেন। যে মাহ্ফিলে মাশুকের আলোচনা হয়, সেখানে তিনি প্রেম শক্তির নূরের সাথে সকল রহস্যময়তা নিয়ে হাজির হন। মিলাদ মাহ্ফিলে যখন ধ্বনিত হয় "খোদ বদৌলত জরুর হ্যায় শামিল মাহ্ফিলে মিলাদ মে।" এখানে মিলাদ অর্থ পয়গম্বরী সুবাস, এ দ্বারা নবীর পূর্ণতা বোঝানো হচ্ছে। এটা বুঝতে অন্তরের প্রসারতা প্রয়োজন। মূক ও বধির অন্তরের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে অন্তরওয়ালাদের জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু অনভিজ্ঞদের উচিত সর্বদাই অন্তরবানদের অনুসরণ করা, নিজেদের গোঁড়ামির প্রশ্রয় না দেওয়া এবং পয়গম্বরী উপস্থিতিকে নেয়ামত মনে করা।

ব্যর্থতার বিবরণ

যে পর্যন্ত মানুষের বেসালে কামাল তথা পূর্ণ মিলন নসীব না হয়, সে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে কোনো না কোনো কথায় অস্বীকৃতি, সন্দেহ ও অহংকার থেকে যায়। এর কারণ হচ্ছে যে, মানুষ এমন বিশ্বাস চায়, যার মাধ্যমে 'জাত-এ-হক্ব' এর সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু এ জাত পর্যন্ত পৌঁছুতে মঞ্জিল তথা গন্তব্য স্থল ও চলার পথের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ঊর্ধ্বারোহণ ও পথ অতিক্রমের সময় আবর্জনা, ধূলিকণা ও অন্ধকার তাকে গ্রাস করে। এ সম্বলহীন সময়ে ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় তার নফ্স নিম্নগামী ও অহংকারী হয়ে যায়। এটা ঘটে তার বাহাদুরী, আত্মগরিমা ইত্যাদির কারণে। কাফের ও ফাসেকের প্রকৃতমূলে আবর্জনাময় কঠিন পর্দা থাকার কারণে তার সৎ ক্রিয়াদি জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। যে শিক্ষার্থী লালসা ক্রোধ হতে সংশোধন হয়, সে বেঁচে যায়। লোভ-লালসার উৎস মোহ ও মায়া এমন একটি সূক্ষ্ম ও গোপন অবস্থা, যাকে আলাদা করে চেনা খুবই কঠিন। দ্বীনদারদের জন্য এটা অত্যন্ত মারাত্মক। তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছে এবং নিজকে দ্বীনদার ও পবিত্র ব্যক্তি বলে মনে করে। তখন আদাজল খেয়ে অন্যকে উপদেশ দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণার পোশাকে সজ্জিত হয়ে মোহ-মায়ার লবণ চাটতে থাকে অর্থাৎ কেউ পোশাকে সজ্জিত, কেউ সিজ্দা তাছবীহ্ ও নামাবলির ভক্ত, কেউ পরহেজগার আলেম, কেই সুন্নাতের অস্বীকারকারী, কেউ ধর্ম ও জ্ঞানের অন্বেষণকারী, কেউ কম কথা বলে, কেউ শিশুদেরকে শিক্ষাদানে রত, আর কেউ পীর সেজে আল্লাহ্র ধ্যান শিক্ষা দেয়। কিন্তু এরা নিজেদের বিরুদ্ধে কাউকে দেখলে প্রত্যকেই বাঘের মতো গর্জন করে উঠে। এটা তার আত্মগরিমা ও নফ্সের প্রবঞ্চনা তাই এর স্বাদ অপরিবর্তনীয়। কিন্তু নফসে আম্মারা এতে বিভিন্ন রকম স্বাদ পায়। নফ্সের বিরোধী ব্যক্তি এখানে চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু যে এটা বোঝে না সে বলবে যে, সত্য কথায় নীরব হয়ে যাওয়া

ব্যক্তি অবশ্যই শয়তান। দুঃখের বিষয় জাহেরি ইবাদতকারী আজও হক্ব কথার অর্থ কি তা বোঝে নি। কেননা বেসাল বা মিলনের পরই হক্ব-নাহক্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্ওয়ালা বলে দাবি করে অথচ এখনও তার অহংকার এবং মন্দ স্বভাব বর্তমান রয়েছে, সে একজন অজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। সন্দেহ বা দ্বিধাই তার পছন্দ।

কলন্দরিয়া, নিজামিয়া, আবুআলি ও খিজিরিয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যত ত্বরিকা প্রচলিত রয়েছে, প্রত্যেকের একই মত যে, গোটা বিশ্ব এক আল্লাহ্রই বিকশিত রূপ এবং সে একই বীজ থেকে এসব ফলফলাদি। এর মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ হলেন তাঁর নূরের বিকশিত রূপ ও প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত। যাঁদের অন্তর আছে কেবল তাঁরাই তাঁদের চিনেছেন ও পেয়েছেন। যারা তাঁদের অস্বীকার করে তারা একেবারেই অবুঝ শিশুর মতো অথবা তারা জাহেল, ফাসেক এবং কাফের। ধর্মকে ধ্বংস করাই এদের লক্ষ্য। সৃষ্টির এককতা কামেল অলির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের নবীসহ সকল নবী ও বিশিষ্ট সাহাবাদের এ একই বৈশিষ্ট্য ছিল। পূর্বে এর আলোচনা হয়েছে। যে ব্যক্তি নামও জানে না কাজও করে না সে ব্যক্তি মূর্খ। প্রবাদ আছে– "মূর্খ পশুর সমান।" এহ্সানকে যে অস্বীকার করে সে কাফের। কেননা এটা একত্বের আইন বা তাওহীদের বিধান।

'উর্স' এর বিবরণ

বুজুর্গদের ছাওয়াব রেসানীর জন্য 'উর্স' একটি নির্ধারিত দিন ও পর্ব। এতে দেশ বিদেশ থেকে বহু সাধারণ ও অসাধারণ লোক এসে একত্রিত হয়। এক সাথে মিলেমিশে শিন্নি ও হাদিয়া প্রভৃতি বণ্টন করে। কেউ দোয়া ও অজিফা পাঠে লিপ্ত থাকে এবং নিজের বুজুর্গদের থেকে ফয়েজ বা অনুপ্রেরণা লাভের চেষ্টা করে। কেননা, এ দিনটি অত্যন্ত রহমতের দিন। কারণ, যে স্থানে কোনো অলিআল্লাহ্র সওয়াব রেসানী করা হয়, সে স্থান আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মহিমান্বিত রূহসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এটা আউলিয়াদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মহিমা। এটা হয় সহাবস্থান ও নূর নৈকট্যের কারণে। অপর দিকে তাঁদের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি উৎসের পবিত্রতা। যা সততা, দয়া ও রহমতের লক্ষ্যবিন্দু। এ জন্যই নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত আকিদাবান জনতা অশেষ ফজিলত লাভ করেন। কারণ সেদিন আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মহিমান্বিত রূহ্সমূহ আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ফয়েজ বর্ষণ করেন। এমন কোনো জায়গা বাকি থাকে না যেখানে সেদিন ফয়েজ বর্ষিত না হয়। যেন মুর্শিদের ফয়েজের সূর্য বিশ্বে উদিত হয় এবং সে নূরের টানে ফেরেশ্তাগণ কবুতরের মতো তথায় অবতরণ করেন। অর্থাৎ, ফেরেশ্তাগণ উক্ত নূরের ঝলকে আত্মহারা হয়ে সে মাহ্ফিলে অবতরণ করেন। এজন্যই নবী (সঃ) বলেছেন, "জ্ঞান

সাধকের সম্মানার্থে আকাশ থেকে ফেরেশ্তা অবতরণ করেন।" এখানে জ্ঞান অর্থ নূরী জ্ঞান। অতএব যে জিনিসের ওপর বা যে স্থানের আউলিয়াগণের দোয়া ও সওয়াব রেসানী হয়, সেখানে স্বর্গীয় প্রেমের নূরের ঝলক সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশ্তা ও রূহ্সমূহ তথায় এসে হাজির হয়। এটাই রহমত বর্ষণের কারণ। এর বরকতেই অন্তরবান ব্যক্তি নববধূর মতো পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেন। আর উর্স এর অর্থও পরিণয়। উর্স এর স্থান যখন রহমতের বর্ষণে প্লাবিত হয়ে যায় তখন এর মাছগুলো এতে বিচরণ করতে থাকে এবং নতুন নতুন রকমারি স্বাদ উপভোগ করতে থাকে। যাদের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আছে, তাঁরা এর স্বাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত। অভিনব নূতন নূতন নেয়ামত এতে থাকার দরুন যদি কেউ একে বেদাত বলে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং যার অন্তরে নূতন অবস্থান সৃষ্টি না হয়, সে তো মৃত। আর নূতন নূতন হালই হচ্ছে আম্বিয়াদের মিরাস বা উত্তরাধিকার– كل يوم هو فى شان (কুল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফি শান) অর্থাৎ, "প্রত্যহ তিনি নূতন অবস্থায় বিদ্যমান।" এ কথার সারমর্ম এটাই।

প্রত্যেক যুগে নূতন নূতন অলি, আওতাদ, আম্বিয়া, গাউছ, ইমাম ও মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হন, নূতন নূতনভাবে যুগকে পরিপূর্ণতা দান করেন এবং ধর্মকে নূতনভাবে ঔজ্জ্বল্য দান করেন। এসব কোনো কথার কথা নয় বরং তা বিশেষ হালের অর্জিত নেয়ামত। এটাকেই বেদাত-এ-হাসানা বলা হয়। ধর্মে এ ধরনের রীতি না থাকলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যেত। যেমন– বৃক্ষে প্রত্যেক মৌসুমে নূতনভাবেই ফলন হয়। ধর্মের হুকুম আহ্কাম বা ফিকাহ্ আকায়েদ তাসাউফ প্রভৃতি নামে পরিচিত এবং এর সংকলনকে বর্তমানে কিতাব নামে আখ্যায়িত করা হয়। এও ঐ গুলোর একটা নূতন অবস্থা। যদি নূতন নামের সাথে সত্যতা বর্তমান থাকে, সেটা নেয়ামতস্বরূপ। যুগপত্রে এ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ও নির্দেশনা সূচিত ও খচিত হয়। যারা এ নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করেন তারা সহজেই এর উপকারিতা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেন। নূতন নিয়ামত ও নূতনত্বের সাথে হাকিকতযুক্ত বিধায় তা বেদাতে হাসানারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ভিত্তিতেই অলিয়ে কামেলগণ উর্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। এটা আল্লাহ্ এবং নবী (সঃ) এর খেলাপ কিছু নয় এবং এতে ধর্মেরও কোনো ক্ষতি নেই, বরং এতে আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং যুগের চাহিদার সাথে সম্পর্ক থাকে। এটা কোনো কিতাবী বা সমালোচনার বিষয় নয়। যার মিলন নসীব নেই তথা এ বিষয়ে জ্ঞান নেই তার তো কিছুই নেই।

কিতাবপন্থীরা কিতাব ছাড়া কিছুই বোঝে না। এ জন্যই তাদের কাছে তর্ক-বিতর্ক ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। অন্যথায় উর্স– عرف الله كل لسانه (আরাফাল্লাহু কুল্লুলিসানিহি) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ সব ভাষা শিখিয়েছেন" এ বক্তব্যের পরিপন্থী নয়। হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ সাহেব (রাঃ) হাদিস দ্বারা উরসের

মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছেন। সে হাদিস 'দাররে মানসুর', 'তফ্ছিরে কবীর' ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে। হাদিসটি নিম্নরূপ– وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأتى قبو راشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الاربعة هكذا يفعلون (ওয়াআন রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লাম ইন্নাহু কানা ইয়াতি কুবুরাশ শোহাদায়ি আলা রাসে কুল্লু হাওলিন ফাইয়াকুলু ছালামুন আলাইকুম বিমা ছাবার্তুম ফানে'মা উ'ক্বাদ্দার, ওয়ালা খোলাফাউল আর্বাআতু হাকাজা ইয়াফআলুন) অর্থাৎ, বর্ণিত আছে যে, "হযরত রাসূল (সঃ) প্রতি বৎসরে (নির্দিষ্ট) দিনে শহিদদের কবরে এসে তাঁদের প্রতি সালাম প্রেরণ করতেন এবং তার পর চার খলিফাও অনুরূপ করতেন।" তাছাড়া শাহ্ সাহেব তাঁর পিতা শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেবের উর্স করতেন। এতে মৌলভী আব্দুল করিম পাঞ্জাবী সাহেব লিখেছেন যে, আপনারা উর্সকে ফরজ মনে করেছেন এবং প্রতি বৎসর উর্স এর আয়োজন করেন। এর উত্তরে শাহ্ সাহেব 'জুব্দাতুন্ নাছেয়েহ্' গ্রন্থে (৪৪ পৃঃ ১২১৬ সন) লিখেছেন যে, "এ অভিযোগ ঠিক নয়। আমরা উর্সকে ফরজ করি নি আমরা একটি বিশেষ দিনে বুজুর্গদের মাজারে সমবেত হই, কোরান তেলাওয়াত করি, দোয়া করি, শিন্নি ও খানা বিতরণ করি এবং সওয়াব রেসানী ও বরকত হাসিলের চেষ্টা করি। এটা তাবেঈন এবং বিশিষ্ট ওলামাদের দ্বারা আমরে মুস্তাহাসান তথা বিশেষ বরকতময় কাজ বলে সমর্থিত। বিশেষ দিন সেটাই, যে দিন বুজুর্গগণ ইহজগৎ থেকে পর জগতে পদার্পণ করেন, এটাই উর্সের দিন।"

মনে রাখতে হবে যে, উর্স মাহ্ফিলে সমাগত সকলের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে খানা না পৌঁছে এবং খানার আয়োজনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ার অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া আরম্ভে অপেক্ষা করা উচিত। কারণ এটাই নবী (সঃ) এর আদর্শ। এমনিভাবে অনেক সময় অপেক্ষা করায় আহার ঠাণ্ডা হয়ে যেত আর এটাই সুন্নত এবং বরকত। এভাবে যে পর্যন্ত সাহেবে কেবলা ও স্বীয় মুর্শিদ কোনো শুভ কাজে অনুমতি না দেন, সে পর্যন্ত সে কাজে বরকত হয় না, বরং সে কাজের মধ্যে যে সব বরকত ও ফজিলত গুপ্ত রয়েছে তা থেকে মুরিদ বঞ্চিত থেকে যায়। এ জন্য এ ধরনের মানুষের কোনো ফজল ও বরকতও নসীব হয় না। এটা একটা অধঃপতনের লক্ষণ। খাবার সময়, খাবার পূর্বে বুজুর্গদের উদ্দেশে সওয়াব রেসানীপূর্বক 'বিসমিল্লাহ্' বলে আহার শুরু করাতে বরকত রয়েছে। নিজের হাতের দিক থেকে খাওয়া ও ছোট লোকমায় খাওয়ার মধ্যেও বরকত রয়েছে। মুখ বেশি বড় করে হা করা উচিত নয়, কারণ পশু ও ভূত-প্রেতরা এরূপ করে। এ কারণে এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। অভাবী ও ফকির-মিসকিনদের প্রতি যত্ন নেওয়া এবং আউলিয়াদের উদ্দেশে সওয়াব রেসানী করাও উত্তম এবং বরকতের কাজ যাকে লোকেরা ফাতেহা বলে আখ্যায়িত করেছে। এটা মোটেই

কোনো মন্দ কাজ নয়। যাদের কাশ্ফ লাভ হয়েছে তাদের কাছে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার।

শাইখে কামেল পাপ হতে পবিত্র, মহাসাগর তুল্য ও তাদের পাপের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার বর্ণনা

আল্লাহ্র আশিক ও কামেল ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র 'সিফাতে কুদ্সী' তথা মহা পবিত্রতা গুণের সংগে মিশে যান তখন বাইরের কোনো আকস্মিকতা ও অন্যায় তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। অর্থাৎ পাপ ও অপবিত্রতা দ্বারা তিনি কলুষিত হন না। কেননা পবিত্রতা গুণের এটাই বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাও এ পবিত্রতা গুণের বদৌলতেই সব কিছু থেকে পবিত্র আছেন। আর এ পবিত্রতা গুণ আল্লাহ্র অন্যান্য গুণের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। এ পবিত্রতা গুণকে আগুনের সাথে তুলনা করা যায়। এতে যতই ইন্ধন নিক্ষেপ করা হোক না কেন সাথে সাথে সবই জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে অথবা এটি একটি সাগরের মতো– যত অপবিত্রতাই এতে নিক্ষিপ্ত হোক, সবই তাতে বিলীন হয়ে যাবে এবং এর সাথে মিশে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত যদি এমনিভাবে নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করতে থাকে তাতেও সাগর অপবিত্র হবে না বরং যা কিছু তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তা সবই সাগর জলে মিশে সাগরে পরিবর্তিত হবে। হাদিস শরীফে এর প্রমাণ মিলে– "কোনো মোমেন পাপ করে না, যে পাপ করে সে কি মোমেন?" এর সারমর্ম এই যে, প্রকৃত মোমেন তথা আশিক তার মাশুকের পবিত্রতা গুণে একীভূত হয়ে যান। তাই তিনি সর্বদাই পবিত্র। আর তিনি অপবিত্র হলে আল্লাহ্র পবিত্রতা গুণটির তৎপর্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে। (নাউজুবিল্লাহ মিনহা)। এর দ্বারা রেযা, তাসলিম এবং ইর্ফান বাতিল হয়ে যায় এবং এটা অসম্ভব। কারণ এটা স্বয়ং আল্লাহ্র সত্তারই বাতিলের শামিল। কেননা 'সিফাতে কুদসিয়া' তথা মহাপবিত্রতা গুণ সকল গুণের উৎস বা মূল। তা থেকে 'সিফাতে হুব্বি' বা মহব্বত উৎসারিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় গুণই এক। এ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা নূরের প্রকৃতি অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। বস্তুত 'ফানাফিল্লাহ'র মাধ্যমে আশিক-মাশুক একীভূত হয়ে যান। ফানাফিল্লাহ হলে আশিক-মাশুকের আলাদা অবয়ব বা অস্তিত্ব বহাল থাকে না। তাইতো মাওলানা রুমীর একটি কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাজী এমদাদ উল্লাহ (রহঃ) বলেন, "তুমি যদি ফানাফিল্লাহ হতে না পার, তাহলে ফানাফিশ্ শাইখ হও, এতে করে ফানাফিশ্ শাইখ হওয়ার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহর গৌরব অর্জন করতে পারবে।"

কেরামতের একটি ঘটনা

হযরত বুআলী কলন্দর একজন আরিফ ও বেলায়েতপ্রাপ্ত আউলিয়া ছিলেন। তিনি প্রায়ই জাহেরি শরিয়ত বিধান গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতেন না। যেমন–ছতর না ঢাকা

এবং গোঁফ না কাটা ইত্যাদি। সে সময় জাহেরি শরার কাজীদের গভর্নরের মতোই ক্ষমতা ছিল। শরার কাজী হযরত কলন্দরের লম্বা গোঁফ দেখে গোশশা হয়ে যায় এবং তাঁর গোঁফ কাটার জন্য জনতাকে নির্দেশ দেয়। কারণ ঐ ধরনের গোঁফ রাখা জাহেরি শরিয়তে নিষেধ ছিল। কিন্তু কেউই কাজীর নির্দেশে হযরত কলন্দরের গোঁফ কাটতে এগিয়ে আসে নি। অতঃপর কাজী তার আদরের ছেলেদের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পেয়ে তার এক ছেলে কাঁচি হাতে হযরত কলন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। হযরত কলন্দর তাকে বললেন, অগ্রসর হবে না– মারা যাবে। তবুও সে অগ্রসর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বর্ণিত আছে– এভাবে তার সাত ছেলে মতান্তরে আঠারো ছেলে মৃত্যুবরণ করে। সব শেষে কাজী স্বয়ং কাঁচি দ্বারা হযরত কলন্দরের গোঁফ কাটতে আরম্ভ করে কিন্তু এক একটি গোঁফ কাটার সঙ্গে সঙ্গে দরদরিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রক্ত দেখে কাজী গোঁফ কাটা থেকে বিরত হয়। তখন হযরত কলন্দর কাজীকে লক্ষ করে বললেন, তোর মতো কুকুরের গোঁফ আমার নয় বরং আমার গোঁফ জীবিত। কাজী তাও অগ্রাহ্য করল। এক বা দুছেলে মারা যাবার পর কাজী নিজেই বুঝতে পেরেছিল যে, এরপর যে যাবে সেও মারা যাবে। এর পরও তার এরূপ জেদ করা হারাম নয় কি? এ অন্যায় খুনের জন্য কাজীর ফাঁসি হওয়া উচিত নয় কি? তাহলে শরিয়ত কী চায়, ন্যায় না অন্যায়? শরিয়তের বিধান কি অন্যায়কে সমর্থন করে? এর জবাব কী? বর্তমানে যে সব জাহেরপন্থী কাজীরা এ অন্যায় নির্দেশকে অবলম্বন করে শরা তৈরি করেছে এবং ফকীর তথা আল্লাহ্ওয়ালাদের তুচ্ছজ্ঞান করে, এটা কোন শরিয়ত?

সুফি পরিভাষা (জাওহারে গোবী)

সুফি পরিভাষায় আরেফ-এ-কামেল কে বুতকাদাহ, বুতখানা, সারাবখানা, দায়ের, খারাবাত এবং আলম বলা হয়। মুর্শিদকে পীর মগাঁ, পীরে খারাবাত, খাম্মার ও বাদাহ ফরুশ বলা হয়। সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত রূহানী অবস্থাকে তরছামরদ্ এবং ওয়ারেদাতে গাইবীকে তরছা-এ-বাচ্ছা বলা হয়। যিনি একত্ববাদের সাগরে নিমজ্জমান অর্থাৎ একত্ববাদীকে গোবরাহ ও কাফের বলা হয়। জওককে বলা হয় মায় ও সারাব অর্থাৎ আবেগ ও অনুরাগ তা সাধকের অন্তরের প্রেমাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দ্বারা রিপুকে দোষক্রটি ও কদর্যমুক্ত করে। অদৃশ্য নূরের অবলোকন এবং আধ্যাত্মিক স্তরের উপলব্ধিকে ছাগের ও পায়মানা বলা হয়। একই উদ্দেশ্য ও এক রঙে রঙিনকে ষুন্নার বলা হয়। গুণাবলির বিচ্ছুরণকে ইয়ার, দিলবর, মাহ্ববে সনম ও দোস্ত বলা হয়। বাতেনী জয্বাকে গম্যাহ্, বুসা ও ফয়েজ বলা হয়। জীবন বৈশিষ্ট্যকে লব্বে দাহান বলা হয়। এল্হামের বাণীকে 'চেস্মে আবরু ও জামাল' বলা হয়। আহলে তুয্ক্ তথা বিশুদ্ধ ও পবিত্রকে কালাশ ও কলন্দর বলা হয়। জয্বা ও অনুরাগপন্থীদের শায়দা বলে। প্রেমকে সারাব ও বাদাহ্ বলা হয়।

আশিকের খুন তথা মহব্বত বা প্রেমাশ্রুকে মায়লাল বলা হয়। এস্তেগ্রাককে মস্তি ও খারাব বলে। প্রেমকে একামতে গোলবাহ বলা হয়। নিয়মের বাইরে সব কিছু পরিত্যাগ করে কঠিন হয়ে যাওয়াকে রুজায়াত বলে। সাফা, তুয্ক্ ও ফানাপন্থীদেরকে কলন্দর ও কালাশ বলা হয়। 'নূরে-হক্ক'কে শামা তথা প্রদীপ বলা হয়। দীলে মুতাজাল্লা বা আলোকিত অন্তরকে কাবাব ফরুশ বলা হয়। বিচ্ছেদকে ছাবুহী, মহাদেছা এবং ইন্ফেরাক বলা হয়। প্রকৃত কাজের উপযুক্ত সময়কে ছুবেহ্ তুলু বলা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারাকে বে-এমদাদে মোকাম বলা হয়। অন্ধকারকে কুফর বলা হয়। প্রেমাস্পদের বাসনাকে বুত, মোশাহেদা ও মুয়ানী বলা হয়। আল্লাহ্র প্রকৃত স্তরকে কাশ্ফ ও শহুদ বলা হয়। তাবায়ে তথা স্বভাবকে চলিপা বলা হয়। মনুষ্যজগৎকে দায়ের বলা হয়। আলমে ছওদা তথা লাভের জগৎকে কুল্লিয়া বলা হয়। আরিফদেরকে তোয়ামাত বলা হয়। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে একাত্ম হয়ে যাওয়া এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে জাফায়ে জামাল বলা হয়। জালাল, কলক ও প্রত্যাবর্তন করাকে যুদে তাজাল্লিয়াত বলা হয়। তাজল্লিয়ে বাছেদ ও সিফাতে বাছেদকে দিলদার বলা হয়। সিফাতে কাবেজীকে দিলবুর বলা হয়। অদৃশ্য সত্তাকে জুলফ্ বলা হয়। জাহেরপন্থীকে গেছুবি বলা হয়। আল্লাহ্র জগৎকে মায়খান বলে। প্রেমকে বাদাহ্ বলে। স্বয়ং নূর প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে মূল সত্তার প্রাপ্তিকে অছলুন বলা হয়। এনায়েতে আজলিকে 'ওফা' বলা হয়। সফ্ফে রহমানী ও তাজাল্লীয়ে জামালিকে 'গমগেছারী' বলে। 'খালেছিয়াহ' এলমে গায়েবকে বলা হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে 'তাফাররুদ' বলা হয়। ইবাদাতে আল্লাহ্র দিদার লাভ করা ও পবিত্র হওয়াকে 'এত্তেহাদ' বলে। আল্লাহ্ বিমুখতাকে 'সাকওয়াত' বলে।

বিবিধ উপকারিতা

'কল্বে সানুবরী'র সাতটি অংশ ও পেট রয়েছে। যথা–ছদর, নশর, শামছী, নূরী, কুর্ব, মকীন ও নফ্সী। উপরের অংশের নাম ছদর এবং এর মগজের নাম নশর এবং এর বাতেনী অংশকে শামসী বলা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সমস্ত অংশই শয়তানের শয়তানি থেকে মুক্ত এবং নিরাপদ। তবে ছদরে শয়তানের প্রভাব রয়েছে। এ জন্যই আল কোরানে বলা হয়েছে, يوسوس فى صدور الناس من الجنة والنا[a] (ইউওয়াছবিছু ফী ছুদুরিন্নাছ মিনাল জিননাতি ওয়াননাছ) অর্থাৎ, "জ্বীন ও মানুষ, মানুষের বক্ষে প্ররোচনা দেয়"। অর্থাৎ, বক্ষকে কেন্দ্র করেই খান্নাছ ও শয়তানের শয়তানি চলে। এ মোকাম তথা বক্ষ সত্য ও অসত্যের নিকটবর্তী স্থান। এটা মানব প্রকৃতির সংলগ্ন। দুনিয়াদারদের বক্ষ সর্বদা সত্য-মিথ্যা বেষ্টিত থাকে তথা সত্য ও অসত্য বেষ্টন করে আছে মানব প্রকৃতিকে। ছাহেবে নাছুত বা দুনিয়াদার সর্বদাই আত্মকলহে লিপ্ত থাকে। বায়ুর প্রভাবে সাগর যেমন তরঙ্গায়িত

হয় তেমনিভাবে দুনিয়াদার নফ্স এবং শয়তানের অসত্য জ্ঞানের কার্যক্রমের পর্দার মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়। সালেক বা সাধকগণ যখন এ স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ফেরেশ্তার মর্তবা ও রহমানী প্রভাবের হেফাজতে চলে আসেন। তখন তাঁর মধ্যে রহমানী স্বভাব প্রকাশ পেতে থাকে এবং জাহের হতে থাকে তাঁর কাছে স্তরে স্তরে গোপন রহস্য ভাণ্ডার। মোট কথা কাশ্ফের অভিজ্ঞতার উপরই 'মোকামে নশরী'র গতিবিধি নির্ভরশীল। অর্থাৎ এ মোকামে সাধক খালেকে হাকিকী বা স্বয়ং সত্তার ছামাদ নামে রহস্যজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। এর পর মোকামে শামসীর অবস্থান বা স্তর– যাকে বলে মোকামে 'কলবে তনদুর'। এর মধ্যে জালালী ফয়েজের আগমনে আল্লাহ্র সত্তার প্রতিচ্ছায়া বিকশিত হয়।

এরপর সাধক মোকামে নূরীতে প্রবেশ করেন। এখান থেকেই পরম সত্তার কাশ্ফ তথা জ্ঞান লাভ শুরু হয়। নূরানী কাশ্ফের নজরে এ স্তরে যা কিছু উপলব্ধি হবে তা পরম সত্তার প্রতিচ্ছবি বা অস্তিত্বের প্রমাণ। এ স্তরে সাধক ফানা-ফিল্লাহ্ তথা আল্লাহ্তে আত্ম বিলুপ্তির মাধ্যমে পরম সত্তায় অবস্থান করেন। এ স্তরেই আল্লাহ্র সাধকের অন্তর আলো ও উজ্জ্বল হয়। এমনকি নূরময় অন্তর আলোকে ও উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর সাধক আল্লাহ্র অনুগ্রহসিক্ত হয়ে নৈকট্য স্তরে সহাবস্থান করেন। অর্থাৎ বন্ধুত্বের বন্ধনে আমিত্ব ও তুমিত্বের অবসান ঘটে এককার হয়ে যায় এবং এটাকে 'কুর্ব' বা নৈকট্য বলা হয়। এটা 'ফানায়ে তাজাল্লী'র শান বা মহিমা, যার নাম হচ্ছে 'মকীন'। এ স্তরে পৌঁছলেই মানুষ মোমেন হয় এবং এটাকে ঈমানে প্রবেশ বলে। অর্থাৎ এ স্তরেই ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে, এর পরই সাধক মানুষ আরিফ হয়। অর্থাৎ এর পর সাধক ঈমানদার থাকে এবং ঈমানের স্তর অতিক্রম করে যায়। এ জন্য পাক কালামে বলা হয়েছে– واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (ওয়াবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াক্কীন্) "অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হওয়া পর্যন্তই ইবাদত করো।" অতঃপর বিশ্বাসের প্রশ্ন নেই এবং ইবাদতের প্রয়োজন নেই। একীন তথা বিশ্বাসের ফল হলো ইত্তেহাদ ও এরফান এবং এটাই একীনের মূল। এর দ্বারাই সন্তুষ্টি ও সমর্থন লাভ হয়। তাই কেউ কেউ বলেছেন, الايمان بين الخوف والرضاء (আল্-ঈমানু বাইনাল্ খাওফি অর্‌রিদায়ি) অর্থাৎ, "ভীতি ও সন্তুষ্টি এ দুয়ের মধ্যস্থলে ঈমানের অবস্থান।" এখানে মোকামে কুব্বকেই খাওফ বা ভীতির স্থান বলা হয়েছে। কারণ 'কুরবত' বা নৈকট্য অর্জিত হওয়ার সময় অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং স্থিরতা আসে। একেই খাওফ তথা ভয় বলা হয়েছে। মকীন বা মোকামে ঈমানের উপরে মোকামে নফ্সী অবস্থিত। এখানে পূর্ণ তৃপ্তি ও তুষ্টি বিরাজমান। সন্তুষ্টি লাভের পর কোনো ভয়-ভীতি ও আজাব সম্ভব নয়। যদি অস্থিরতা ও আজাবের ভয় থাকে তবে তাসলিম বা সন্তুষ্টি বাতিল হয়ে যায়। এর পর মোকামে নফ্সীতে পৌঁছলে বান্দার সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং পরম সত্তার সাথে সে একাত্ম হয়ে যায়। অর্থাৎ এ মোকামে বান্দার

শান হচ্ছে আল্লাহ্র 'সত্তা' আর আল্লাহ্র শান হচ্ছে বান্দার 'সত্তা'। এরই নামা ইত্তেহাদ অর্থাৎ একীভূত হওয়া তথা পরিপূর্ণ মিলন। এ স্তরে 'আনা' বা আমি অর্থ সমস্ত পরিপূর্ণতা ও যাবতীয় সৃষ্টি। এ 'আনা' তথা আমিত্বে উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে শানের পার্থক্য থাকে না। এটা 'কল্ব' তথা অন্তরের উন্নত অবস্থা। একেই 'কলবে-সানুবরী' বলা হয়। এর আকৃতি অনেকটা সানুবর বা দেবদারু বৃক্ষের মতো। লোকের কাছে এটা বিছ্মিল্লাহ্ নামে পরিচিত। এতে নিম্নরূপ স্তরসমূহ রয়েছে–

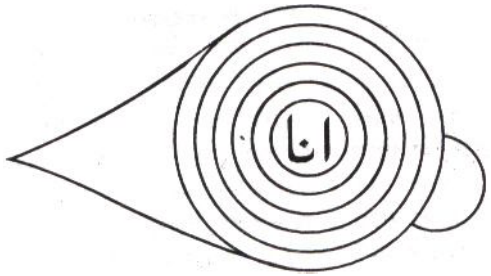

এ কল্ব বা অন্তরের ঊর্ধ্ব মোকাম থেকেই 'আনা' বা আমি কথাটি উচ্চারিত হয়। কলবের এক পার্শ্বে রসুনের কোষের মতো এক টুকরা মাংস আছে, এটাই খান্নাছ বা শয়তানের স্থান। যত শয়তানি তথা কুপ্রবৃত্তির এখান থেকেই উৎপত্তি হয়। কিন্তু এর গভীরে ছদর বা বক্ষের মূল অবস্থিত, সেখান থেকে নয়।

মোকামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

'মুজাদ্দেদিয়া' ও 'মাছুমিয়া' ত্বরিকার অনুসারীদের লতিফাসমূহ নিম্নরূপ– কল্ব, রূহ, সির্, খফী, আখফা, নফ্স, আব, আতশ, খাক ও বাদ। কলবের স্থান বাম স্তনের দু আঙ্গুল থেকে সামান্য নিচে ঝুলানো। রূহ্-এর অবস্থান কলবের ঠিক বিপরীত দিকে ডান পার্শ্বে। সির্ বাম ছাতির দু আঙ্গুল উপরে। খফী ঠিক তার অনুরূপ ডান দিকে অবস্থিত। আর আখফা বক্ষের মধ্যখানে অর্থাৎ বুকের কড়ার নিচু স্থানে অবস্থিত এবং নফ্ছ নাকের উপরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আব, আতশ, খাক ও বাদ এই চার পদার্থ সমগ্র দেহে মিশে রয়েছে। এগুলোর জন্য দেহে নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। যখনই এতে মুর্শিদের তাওয়াজ্জু পতিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তা কারখানার ইঞ্জিনের মতো প্রকম্পিত, গরম ও আলোকিত হয়ে যায় এবং সাধক স্তম্ভিত ও অভিভূত হয়ে ভাবতে থাকে, তার একি অবস্থা হলো! সে যেন কোনো বারুদের প্রতিক্রিয়ার মতো আশ্চর্য বস্তু দেখছে। তাওয়াজ্জুর এ প্রতিক্রিয়ায় সত্যানুসন্ধানী অস্থির ও পাগলের মতো হয়ে যায় এবং এ অবস্থাটি তাকে বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি দান করে এবং রকমারি অবস্থার ফলে তার অন্তর শান্ত ও নরম

থাকে। অবস্থার প্রকৃতিগতভাবে অস্থিরতা হলেও এ অস্থিরতা নিগূঢ় অর্থপূর্ণ। অনুরূপ প্রভাবের সামান্যতেই সত্যানুসন্ধানী প্রভাবিত হয়। এটা কোনো দমবন্ধ জিকিরের প্রভাব নয়। রুদ্ধশ্বাস জিকিরকারী পরিশ্রম করে বটে কিন্তু এর দ্বারা কিছুই হাসিল হয় না। কারণ মুর্শিদের তাওয়াজ্জু বা দৃষ্টি আগুনের মতো। যে শুধু দম বন্ধ করে জিকির করে, সে ব্যর্থ পরিশ্রমী যদিও তা মুর্শিদের সুরতের ধ্যানে হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দম বন্ধ করে জিকির ও অজিফায় মশগুল থাকে সে ব্যক্তি ব্যর্থ পরিশ্রমী ও উপাসক ছাড়া কিছুই নয়। তাওয়াজ্জু বা মুর্শিদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

মোটকথা তাওয়াজ্জুর ফলে সাধকের অন্তর যখন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকতে থাকে তখন জিকিরের শব্দ ও অর্থ আপনাআপনি তার বোধগম্য হতে থাকে এবং তা থেকে প্রেমও উৎসারিত হতে থাকে। আর তখন হতে আল্লাহ্ প্রেমিকের রঙ বদলাতে শুরু করে। লাতায়েফে 'আনাচারিয়া' অর্থাৎ আব, আতশ, খাক ও বাদ লতিফাসমূহের মূলে মুর্শিদের শক্তি যখন প্রভাব বিস্তার করে তখন প্রত্যেকটির প্রভাব ও শান সত্যানুসন্ধানীর শরীরে প্রকাশ পায় এবং সত্যের সাধক তা ভালোভাবেই অনুভব করতে পারে। যেমন– আব ও আতশ যথাক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম। তাওয়াজ্জুর প্রতিক্রিয়া মগ্ন ও সাধারণ অবস্থায় শিক্ষার্থী নিজের মধ্যে অবশ্যই অনুভব করবে এবং লালিমা, আলো ও আগুন ইত্যাদি যা প্রকাশ হবে শিক্ষার্থী তা কলবে অনুভব করে।

একই সঙ্গে দশ লতিফায় জিকির হলে তাকে সুল্‌তানুল আয্‌কার বলা হয়। তখন মনে হয় পৃথিবীর সব কিছু যেন তার সাথে জিকির করছে। এ জিকিরের পরিক্রমণতায় নূরময় বক্ষের স্ফুলিঙ্গ বিজলী অথবা চন্দ্র সূর্যের আলোর মতো দেখায়। কখনো সে নিজের মধ্যে সাড়া শব্দ অনুভব করে, ধীরে ধীরে তার সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার জ্ঞান লাভ হয়। আর বস্তু ও অধ্যাত্ম উভয় জগতের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে সে যথারীতি অবহিত হয়। এ সবই শাইখের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে, কিতাব পাঠে কিছুই হাসিল হয় না।

নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার লতিফাসমূহ

নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার লতিফা তথা সূক্ষ্ম স্থানসমূহ নিম্নরূপ– কল্‌ব ও রূহের স্থান মুজাদ্দেদিয়া ত্বরিকার অনুরূপ। সির্‌রের স্থান পেশানী তথা কপালের যে স্থান হতে চুল গজাতে আরম্ভ করে সেখানে। খফির অবস্থান বক্ষে। আখফা হলো একেবারে মাথার তালুতে– শিশু বয়সে যে স্থানটি নরম থাকে। আর নফ্‌ছ হলো নাভিতে। এর ছয় লতিফা ব্যতীত 'কালিমা' নামে আরও একটি লতিফা রয়েছে–যা আব, আতশ, খাক ও বাদ এ চার পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত। কেননা এ চারটি পদার্থ মিলেই দেহ ও শরীর গঠিত এবং এ জন্যই একে 'লতিফায়ে কালিয়া' বলা হয়। অতএব এক হিসেবে লতিফা সাতটি, অন্য হিসেবে দশটি। ছয় লতিফায় জিকির জারী হওয়ার পরে 'লতিফায়ে কালিয়া'য় এক সঙ্গে জিকির জারী হয়। অতঃপর সত্যদর্শন ও

আধ্যাত্মিক ভ্রমণের মহড়া শুরু হয়। কিন্তু নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার মতে– 'লতিফায়ে আখ্‌ফা' মাথার তালুতে অবস্থিত এবং মুজাদ্দেদিয়া মতে তা বক্ষে অবস্থিত, তবে শিরার মাধ্যমে উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে অর্থাৎ মাথার তালুতে যে হেক্‌মত আছে তা হযরত মুজাদ্দিদ (রহঃ) সাহেব নাকের উপরি ভাগ হতে বের করেছেন। অনুরূপভাবে সির্ ও খফিকেও অন্য স্থান থেকে প্রকাশ করেছেন– এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব।

ঊর্ধ্ব জগতের পাঁচ লতিফা তথা কল্‌ব, রুহ্, সির্, খফি ও আখফার মূল ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ, ভ্রমণ ও স্থিতি স্থান লাভের নক্‌শবন্দিয়া পদ্ধতি হল এই যে, প্রত্যেকটি লতিফা যথারীতি এক এক করে অতিক্রম করতে হবে। যেমন কল্‌বের আসল থেকে আসলের কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করে রূহ্-এর নীতিমালা ও ধাপগুলো সম্পন্ন করতে হবে। এমনিভাবে সির্, খফি ও আখফায় আরোহণ ও অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু মুজাদ্দেদিয়ায় এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ঊর্ধ্ব জগতের পঞ্চ লতিফার ভ্রমণ পথের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ স্থান রয়েছে। সেসব স্থানে বিশ্রাম ও আরাম গ্রহণের মাধ্যমে ঊর্ধ্বারোহণ করতে হবে। অর্থাৎ কল্‌ব স্ব-স্থানে শান্তি গ্রহণরত থাকা অবস্থায় রূহের ছায়ের তথা ভ্রমণ শুরু হয়। কিন্তু তার স্থান কলবের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ এর স্তর উচ্চে এবং কলবের মূল স্থান হতে রূহ্ এক দাওরা ঊর্ধ্বে অবস্থিত। অনুরূপভাবে সির্-এর মূল রূহের উপরে এবং খফি সিরের উপরে ও আখফা খফির উপরে অবস্থিত। মোটকথা যখন এ সকল লতিফাসমূহের ছায়ের হবে অর্থাৎ ঐশীজ্যোতি দ্বারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তখনই পরমসত্তা ও গুণাবলির ছায়াকায়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ লতিফাগুলোকে বেষ্টন করে উদ্ভাসিত হবে, যেমন প্রতিভাত হয় আয়নায় ছায়াসমূহ। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিভাত ছায়া মূল থেকে আলাদা নয়– ছায়া মূলের একটি রূপ মাত্র। হাকিকতে মূল ও তার প্রতিবিম্ব এক ও অভিন্ন।

মোটকথা কল্‌ব, রূহ্, সির্, খফি ও আখ্‌ফা প্রত্যেকটির আসলের আসলে ঊর্ধ্বারোহণে বিশ্রাম নিয়ে যাবে। মুজাদ্দেদিয়া মতে এগুলোকে দাওয়ায়ের, সুলুকে আউয়াল ও সুলুকে ছানী বলা হয়। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা– দায়রায়ে ইম্‌কান, দায়রায়ে জালাল, দায়রায়ে কুরবিয়্যাত, দায়রায়ে বেলায়েত ইত্যাদি। বেলায়েতে ছানী তথা বেলায়েতের দ্বিতীয় স্তরে কোরান, ছাওম, কাবা, নবী এবং শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরগণের হাকিকত সহজবোধ্য হয়। এটা কিতাবী তথা পড়া শোনা জ্ঞানে লাভ হয় না, বরং এটা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ফয়েজের বিশদ বিবরণ

কল্‌বে 'সিফাতে আফ্‌আলিয়া'র তাজাল্লি বা ফয়েজ দীপ্ত হয়। অর্থাৎ কর্মগুণের ফলশ্রুতির নূর কলবে প্রদীপ্ত হয়। রূহ্ মোকামে 'সিফাতে সবুতিয়া'র তাজাল্লি বা

ফয়েজ প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ রূহে ফয়েজ ও নূর পতিত হয়ে সব নূরকে প্রমাণ করে। সিরে পরম সত্তার তাজাল্লি বিকশিত হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তাগত নূর ও আহদিয়াত তথা একত্বের নিশান প্রতিফলিত হয়। খফিতে 'সিফাতে সলবিয়া'র তাজাল্লি প্রতিফলিত হয়। এর অর্থ নিজেকে বের করে দেওয়া বা আমিত্বের খোলস ত্যাগ করা। আর আখ্‌ফা লতিফায় সিফাতে 'শান-এ-জাম' এর তাজাল্লী প্রতিফলিত হয়। এর অর্থ সর্বসমন্বিত মহিমার বহিঃপ্রকাশ।

দৃষ্ট নূরের বিবরণ

কালবের নূরের রঙ জর্‌দ তথা হলদে। রূহের নূর ছোর্‌খ তথা লাল। সির্‌রের নূর ছিয়া তথা কালো। খফির নূরের রঙ ছফেদ তথা শুভ্র। আখ্‌ফার রঙ সব্‌জ তথা সবুজ। নফ্‌সের নূর বেগুনি তথা নীলাভ নক্ষত্রের ন্যায়। আর অবশিষ্ট চার লতিফার নূরসমূহ যথাক্রমে খাক ধানী বা বাদামি, আব নীল, আতশ কালোর মতো, বাদ প্রায় সবুজ বর্ণ।

বেলায়েতের বিবরণ

প্রধান লতিফাসমূহ তথা কল্‌ব, রূহ, সির্‌, খফি ও আখফার বেলায়েত বিশিষ্ট পয়গম্বরদের পদতলে। কল্‌ব আবুল বাশার হযরত আদম (আঃ)-এর পদতলে। রূহ হযরত নূহ্‌ ও হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর পদতলে। সির্‌ হযরত মূসা (আঃ)-এর পদতলে। খফি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পদতলে। আখ্‌ফা শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুয্‌তাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সাল্লাম-এর পদতলে।

জানা দরকার যে, বেলায়েতের দৃষ্টিভঙ্গিতে কেয়ামত পর্যন্ত সকল নবীই আমাদের নবী, তাঁর কোনো অবস্থাতেই পৃথক নন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ও আমাদের ধর্মের মূল একই। পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় বাতেল হলেও মূল বস্তু আজও এক এবং অপরিবর্তিত রয়েছে। কারণ বেলায়েত তাঁদেরই কদম পাকের নিচে। হযরত আদম (আঃ)-এর নূরে কল্‌ব আবাদ হয় এবং আদম (আঃ)-এর দ্বারাই তওবার দ্বার খুলে যায়, তখন মানবপ্রেম সকল প্রকার প্রেমের ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং মুর্শিদের থেকে পথপ্রদর্শক নূরসমূহ ও স্রষ্টার জাতের তাজাল্লীর বিকাশ ঘটে। যার দ্বারা সাধক সঠিক স্থায়ী ও অমূল্য সম্পদের অধিকারী হন। এমনিভাবে 'নূরে ছোরখ্‌-ছোবুতি' হযরত নূহ্‌ (আঃ)-এর তরফ থেকে শিক্ষার্থীর 'লতিফায়ে-রূহে' আসে এবং যা কিছু পাওয়া যায় তাঁদের নিকট থেকেই পাওয়া যায়। বিশেষ করে প্রধান লতিফাসমূহের মুরব্বি হলেন বিশিষ্ট পয়গম্বরগণ এবং দ্বীনের মূলনীতির ক্ষেত্রে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই আমাদের ধর্মকে দৃঢ় করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় অবতীর্ণ হবেন। তিনি বিশেষ করে বাতেনী জ্ঞান প্রচার করবেন। হযরত

ইমাম মেহদী (আঃ) এরও কাজ হবে বাতেনী জ্ঞান সংরক্ষণ। সুতরাং যে ব্যক্তি বাতেনী সম্পর্ক থেকে বিমুখ ও অস্বীকারকারী, সে ধর্মেরই অস্বীকারকারী বরং সে কাফের। তাই যে ধর্মের সারবস্তুকে নষ্ট করে সেও কাফেরই বটে। সুতরাং ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের উচিত ধর্মের মূল বস্তুকে নষ্ট না করা। কারণ আমাদের নবী তাদেরও নবী, যেমন– তাদের নবীও আমাদের নবী। মোটকথা, কিতাবধারীদের উচিত পয়গম্বরদেরকে অস্বীকার ও ঘৃণা করা থেকে বিরত থাকা এবং সকল গোত্রের অলিদের সাথেই বিশ্বাস ও ভক্তির সম্পর্ক বহাল রাখা।

কাদেরিয়া ত্বরিকার পার্থক্য

কাদেরিয়া ত্বরিকার সাধনা কোনো লতিফার সাথে যুক্ত নয় এবং সাধকের যে স্থানে আল্লাহ্‌ শব্দের ভাব জাগরিত হয়, সে স্থান থেকে জিকির শুরু হয়ে গোটা দেহে প্রসারিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন অবস্থা ও নূর সৃষ্টিপূর্বক সাধক আলোকদীপ্ত ও তৃপ্ত হন। ফলে এতে এমন সব গূঢ় তাৎপর্যময় অবস্থাদি সৃষ্টি হতে থাকে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু যথাযোগ্য কামেল মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহ্‌ ব্যতীত কারো পক্ষে এ পথে ফল লাভ করা কঠিন। উপরোক্ত অবস্থাসমূহের স্তর থেকে স্তরে উন্নতির পর্যায়ে মুর্শীদ তাঁর শিষ্যগণকে নিজ ক্ষমতায় পথ ও লক্ষ্যস্থলগুলো নির্দেশ করে থাকেন এবং মৌল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এতে ধীরে ধীরে নূরময় অবস্থা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে ভয়ানক ও বিশাল বিশাল সমুদ্র পার হতে থাকবে। অতঃপর পরম সত্তার প্রভাবে মাকামে ফানা তথা আত্মবিলুপ্তির স্তর বিকশিত হয়, তখন সে পরম সত্তার মূল মহাসাগরে নিমজ্জিত হবে। এখানে সে মূলেরও মূল এবং তার শাখা-প্রশাখার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে ও তার সূক্ষ্ম অস্তিত্বের অলিগলিতে ভ্রমণ করবে। এর পর সে প্রধান পর্দার উন্মোচন ঘটিয়ে তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে, সে স্থানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। এখানে সে কিয়ামত পর্যন্ত পাবে বিভিন্ন মহিমা বা শান। অর্থাৎ এ স্তরে সে যেদিকেই যায় সর্বত্রই পরমসত্তা আর পরমসত্তা, আর যেদিকেই দেখে কেবল নূর আর নূর। মোটকথা অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীন অথবা দৃশ্য বা অদৃশ্য, সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য যা-ই হোক, সবই মূলের আওতায় এক ও অভিন্ন।

চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার কতিপয় লতিফার বিবরণ

চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার ছয় লতিফা নক্‌শবন্দিয়া ত্বরিকার মতোই। তবে, চিশ্‌তিয়া ত্বরিকায় দৈহিক মোকামসমূহে প্রথম থেকেই উভয় জগতের অন্বেষণ করা হয়। যেমন নাসুত, মালকুত, জাবরূত ও লাহুত ইত্যাদি সমস্তই স্বীয় দেহের আওতাভুক্ত ও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দৈহিক বস্তু দেহের সাথে এবং রূহানী বস্তু রূহের সাথে বিদ্যমান। যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, অমাবশ্যা-পূর্ণিমা, জোয়ার-ভাটা, পাহাড়-নদী, বন-জঙ্গল, পশু-পাখি, জ্বীন-ইন্‌সান, আলো-আঁধার, পয়গম্বর, কুতুব, আবদাল, রুজি-রেজেক, হায়াত-মউত, শত্রু-মিত্র, দান, দয়া, বিপদ-আপদ, গজব-কাহার,

সন্তান-সন্ততি, নেকী-বদী, বেহেশ্‌ত-দোযখ, মক্কা-মদিনা, ধর্ম-অধর্ম সবই দেহে বর্তমান এবং প্রকৃতপক্ষে এটা বাস্তব ও সত্য। কারণ আল্লাহ্‌র মহামহিম শান ও সত্তা থেকে কোনো বস্তুই দূরে তথা বাইরে নয়। এজন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে– من عرف نفسه فقد عرف ربه (মান্ আরাফা নাফ্‌ছাহু ফাক্কাদ্ আরাফা রাব্বাহু) অর্থাৎ, "যে নিজেকে চিনছে সে নিজের প্রভুকে চিনেছে।" অর্থাৎ আরিফের নফ্‌সে আল্লাহ্‌র অসীম মহিমার সমস্ত কার্যক্রম ও অভিব্যক্তি বিদ্যমান। এর উপমা আগুনের মতো– যার কোনো সীমা ও শেষ প্রান্ত নেই।

মোটকথা দেহের অংশসমূহকে দশটি মোকাম ও আঠারোটি মঞ্জিলে বিভক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে বুরুজের হিসাব অনুযায়ী শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত ঘুরছে এবং উভয় নাক চাঁদ ও সূর্যস্বরূপ। নাকে বারোটি প্রস্রবণ তথা পানি বেরুবার পথ ও অংশ রয়েছে এবং দিনরাত তা দ্বারা হাজারও শ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে। আর এর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে মন্ত্রপূত। বস্তুত এরই মধ্যে সমস্ত রহস্য বিদ্যমান। এ বারোটি বুরুজের সাথে বিভিন্ন দরজাও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এর উপরিভাগে সাতটি পথ রয়েছে; যথা দুটি কান, দুটি চক্ষু, দুটি নাক ও একটি মুখ আর তার নিচে রয়েছে পাঁচটি স্থান যথা দুটি স্তন, নাভি, পেশাব ও পায়খানার অঙ্গ, সর্বমোট বারোটি পথ। মূলের বিচারে এসব বুরুজ এক একটি জগতের অন্তর্ভুক্ত যথা নাসুত, মালাকুত প্রভৃতি দশটি আলম রয়েছে এবং আর দুটি আলম রয়েছে তার অন্তরে। তবে প্রত্যেক দ্বারে এক এক জন করে ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত রয়েছে। আলমে নাসুত তথা মানব প্রকৃতির দ্বার হলো মুখ, কলিজা হল এর বক্ষ আর এর প্রহরী হলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। 'আলমে-মালাকুত' তথা ফেরেশ্‌তার জগতের দ্বার হল চোখ, ফেপড়া (শ্বাসযন্ত্র) হল এর বক্ষ, এর প্রহরী হলেন হযরত মিকাঈল (আঃ)। দরজায়ে জবরুত তথা রূহানী জগতের দরজা হল নাক, এর বক্ষ হল নাভি এবং প্রহরী হলেন হযরত ইস্রাফিল (আঃ)। দরজায়ে লাহুত তথা আল্লাহ্‌র সত্তা জগতের দ্বার হল কান, এর বক্ষ হল পেট এবং প্রহরী হলেন আজরাঈল (আঃ)। সাধকের এসব মোকাম ও স্তরই ভ্রমণ ও অতিক্রম করতে হয় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ রূপ চাবিই হচ্ছে তার অবলম্বন। এ ত্বরিকার সাধক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাইখের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং যা কিছু লাভ করে তাঁর দ্বারাই লাভ করে। আর যা কিছু দর্শন করে তা শাইখের সুরতের মধ্যেই দর্শন করে। এজন্যই শাহ্ অলি আহাম্মদ (রহঃ) সাহেব 'কাউলুল জামিল' গ্রন্থে একটি বিষয়ের প্রতি ইশারা করেছেন, তা হল, وينظر بين عينى الشيخ فاذا افض منه شيئ فليتبع بما جمعوا قلوبه (অইয়ান্‌জুরু বাইনা আইনাশ্ শাইখি ফাইজা আফাজা মিন্‌হু শাইউন ফালইয়াত্তবে বেমা জামিয়ে ক্বাল্‌বিহি) অর্থাৎ, "মুর্শিদের উভয় চক্ষুর মধ্যস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। যখন কোনো ফয়েজ প্রতিভাত হবে তখন একাগ্রতার সাথে তা হেফাজত কর।" অর্থাৎ, পীরের উভয় চক্ষু তথা উভয় ভ্রুর মধ্যস্থলে নাকের শেষ প্রান্তস্থিত স্থানটি সামগ্রিক নূর রহস্যের খনিস্বরূপ; আকাঙ্ক্ষার চাবি দ্বারা যে এর তালা খুলতে পেরেছে, সে উভয় জগতের সমস্ত সম্পদ লাভে সমৃদ্ধ হয়েছে। এটাই আশিকের

শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একে 'মোকামে মাহ্‌মুদা' বলা হয়। এর স্তর অতিক্রমকারী অসীমত্ব লাভ করেন; তাঁর উভয় চক্ষুর নূরসমূহ সুদৃঢ় হয় এবং এ বেলায়েতপ্রাপ্তগণ আউলিয়াদের দলভুক্ত হন। পরবর্তী লতিফা চক্রে সর্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য আরও বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল।

দশ আলমের চিত্র বা নকশা

আসল– আসল আখফা	পরম সত্তা পর্যন্ত উৎস
আসল– আসল খফি	প্রসারিত, পরম সত্তায়ও পরিভ্রমণ হয়
আসল– আসল সির্	তবে তা বিভিন্ন রকমের হতে পারে।
আসল– আসল রূহ্	
আসল– আসল কল্‌ব	
আসল আখফা	
আসল খফি	
আসল সির	
আসল রূহ	
আসল কল্‌ব	

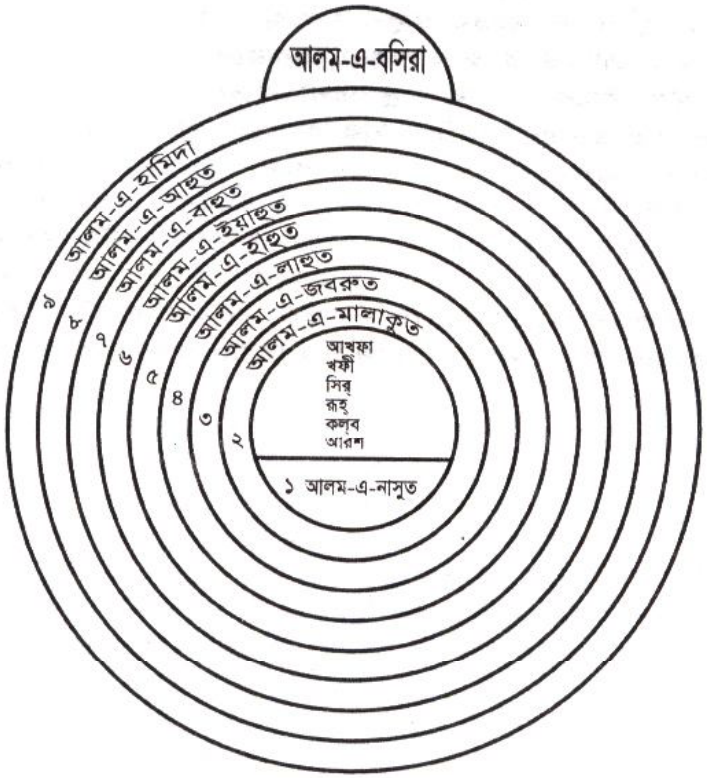

উৎসসমূহ কেবল উপরের দিকেই রয়েছে, নিচের দিকে নেই, তা নয়। বস্তুত উপর নিচ চতুর্দিকেই উৎসসমূহ ও শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আরশ থেকে পাতাল পর্যন্ত সবটাই নশ্বর জগৎ। এটা 'আলমে-মালাকুত' (ফেরেশ্‌তার জগৎ) এর বাতেন এবং পীঠ। আলমে-মালাকুত 'আলমে-জাবারুত' এর বাতেন এবং পীঠ। অনুরূপভাবে জাবারুত লাহুতের এবং লাহুত ইয়াহুতের বাতেন এবং পীঠ। এমনিভাবে একটিকে অন্যটির বাতেন এবং পীঠ বলা হয়। অনুরূপভাবে 'আলমে-নাসুত' অন্য সব আলম তথা জগতের শেষ পীঠে অবস্থান করছে এবং একটি অপরটিকে ডিমের খোসার মতো আবৃত করে আছে। সাধক এগুলো অতিক্রম করার সময় নূরী উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে বিদ্যুৎযাত্রীর মতো স্তরে স্তরে সফরকালে দৃশ্য-অদৃশ্য, জ্ঞেয়-অজ্ঞেয় বহু বস্তু ও দৃশ্য অবলোকন করেন। এমন কি সত্তার জগৎ সফরকালে সাধক স্বয়ং 'আল্লাহ্‌র সত্তা' যা সকল সৃষ্টির উৎস, সে সম্পর্কেও অবহিত হন। এ স্তরে আরোহণকারী হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, গাব্‌রাহ, ফিরিঙ্গী ও মগ সবাই সমান। অর্থাৎ উক্ত স্তরে উপনীতে ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহ্‌র অলি নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। তাই প্রত্যেক নবী সমর্থকদের মধ্যে অলি জন্মগ্রহণ করেন– যদিও প্রকাশ্য কার্যকলাপ অন্য রকম হয়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ হিন্দুদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাধু-ফকির রয়েছেন, যারা মৌল ধর্মের খাতিরে আল্লাহ্‌ ছাড়া সমস্ত বস্তুর পূজা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। তাঁরা কোরান ও নবীদের মান্য করেন। বস্তুত মূর্তিপূজকদের সকল দলই গোপনে দ্বীনে মোহাম্মদীর অনুসরণ করে এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হলে বৈতরণী পার করিয়ে দেওয়া তথা কালেমা এ মোহাম্মদী পড়ে শোনানো হয়। কেউ কেউ এ কলেমা এভাবে বর্ণনা করেছেন, যথা– "লায় লং আবদুলং সু পুত্র মলং" এর অর্থ 'কলেমায়ে তৈয়ব'। এটাকে কলেমায়ে অথর্ব বলা হয়। অর্থাৎ চারি বেদের সর্বশেষ বেদ অথর্ববেদ, এটাই কোরান। তা পাঠ করলে মানুষ মুসলমান হয়ে যায়, এ কারণে তাকে আর নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দাখেল হয় না।

মহাদেব বলেন, "কোনো ধার্মিক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে প্রভুসত্তায় বিলুপ্ত না করে ততক্ষণ তার জন্য কোনো ধর্মই নেই।" দাল শাস্ত্রেও এ কথা বলা হয়েছে। তাদের গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, দ্বীন বা ধর্ম চার প্রকার। যথা– রাজসিক, তামসিক, অলিক ও মানসিক। হিন্দু, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধার্মিক, কাফের ও পাপী রয়েছে। তবে মুসলমানদের মধ্যে আউলিয়ার সংখ্যা বেশি। কিন্তু ইমাম মেহ্‌দী (আঃ)-এর সময়ে সবাই ঈমানদার ও একাচারী তথা সকলের এক ধর্ম হয়ে যাবে। অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে এ কথা উল্লেখ রয়েছে এবং এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে আবার সত্যকাল প্রতিষ্ঠা পাবে। হিন্দু ধর্মেও এ কথা বলা হয়েছে এবং তা অতি সত্য।

ধর্মের শৃঙ্খলা

যুগ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতায়ও পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে। এটা ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য। কারণ শাখা-প্রশাখার মাধ্যমেই বৃক্ষ বৃদ্ধির ক্ষমতা লাভ করে, মূলের শক্তির জোরেই ডালপালাগুলো চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, এর দৃশ্যকে মনোরম করে তোলে আর সমৃদ্ধ করে তাকে ফলে-ফুলে। এতে কখনো বসন্ত বা সুসময় আসবে তাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু ধর্মের হেফাজতকারীগণ মূল রশিকে হাতছাড়া করেন না। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। জাহেরপন্থীগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকে না। ফিকাহ্‌র কিতাব ও নীতিগ্রন্থ ধর্মের কল্যাণে উদ্ভাবিত ছোট বড় নতুন নতুন কথা ও কাজ তথা নামাজের মৌখিক প্রয়োজনীয়তা অজুর সময় কান ও ঘাড় মুসেহ্‌ করা, ঈদগাহে মিম্বর তৈরি করা, মসজিদ সাজানো ইত্যাদি ধর্মের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং ধর্মের সৌন্দর্য বাড়ায়, এমন সব বিষয়ে আত্মনিমগ্ন রাখে। তাতে ধর্মের কোনো ক্ষতি নেই বরং ধর্মের সৌন্দর্য বাড়ে। আমাদের নবী (সঃ) ন্যায়ের খাতিরে তথা ভালোর জন্য অনেক ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছেন যাকে মানসুখ বা রহিত বলা হয়। এ নীতিতেই রাজা-বাদশাহদেরও রাষ্ট্রের আইন রদ বদল হয় এবং সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে মৌলভী খান বাহাদুর সাহেবের প্রণীত আইন কোনো অংশেই খারাপ নয়। কিন্তু ইসলামি শাসকদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে শক্তিশালী রাজপুত্রই রাজা হয়, শক্তির জোরে। এ জবরদস্তিমূলক কাজের দরুন ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বদাই অধঃপতন হচ্ছে আর সব সময়ই যুদ্ধ লেগে রয়েছে। অন্যান্য যে সব দেশে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ধারাবাহিক পদ্ধতিতে যে নেতা নির্ধারিত হয় সে-ই নেতৃত্ব করে, কেউই এ নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে না। এ জন্য সেসব দেশে কোনো গোলমাল ও কলহ নেই। সুতরাং আমাদেরও এ নিয়ম করা উচিত যে পিতৃগোষ্ঠি বা সন্তানদের মধ্যে মুরব্বি ব্যক্তি ধারাক্রমিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব লাভ করবেন। যদিও তিনি বিশেষ জ্ঞানী না হন তা হলেও জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত, তার অনুগত হয়ে কাজ সমাধা করা। আর এটাই আমাদের দেশের নিয়ম। এতে ধর্মের কোনো ক্ষতি নেই। কিছু না বুঝে ধর্মের নামে জেহাদ ও গোলমাল সৃষ্টি করা উচিত নয়। জেহাদ নাম দিলেই তা ফরজ হয়ে যায় না, জেহাদ ফরজ হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে। হয়তো আজ পর্যন্ত অনেকে তা জানেই না। এ জেহাদের ফলেই মুসলিমদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। কেবল জাহেরপন্থী আলেমগণের ফতুয়ার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নয়। রাজ্য শাসনের জ্ঞান ভিন্ন জিনিস। যে ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী তাকে সে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা রাষ্ট্রের পক্ষে বৈধ নয়। মূর্তিপূজক অথবা ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির প্রতি তার আইন অনুযায়ী ন্যায় বিচার করা উচিৎ। যে ব্যক্তি যে ধর্মের অনুসারী, সে ধর্ম অনুযায়ীই তার চালচলন হবে, আর এ ব্যাপারে কেউ সহযোগিতা চাইলে তাকে সহযোগিতাও দিতে হবে। অন্যথায় অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী এবং রাজত্বে মহাসংকট দেখা দিবে। দ্বীনদার

ব্যক্তির উচিত কৌশলে স্বীয় ধর্মের প্রচার করা যাতে তার ধর্মের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট না হয়। ওয়াজকারী ও ফতুয়া দানকারীর সংযতভাবে কথাবার্তা বলা উচিত। যা মুখে আসে তা-ই বলা উচিত নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কোরান ও হাদিসের জ্ঞান কেবল গ্রন্থ পাঠে হয় না বরং তা প্রকৃত সত্য জ্ঞান ও হেকমতের ওপর নির্ভরশীল।

উদাহরণস্বরূপ, জাহেরপন্থীগণ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর দূরত্ব ও প্রশস্ততা সম্পর্কে বলে থাকে যে, পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পাঁচশত বছরের পথ এবং পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ এবং প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও পাঁচশত বছরের পথ। অনুরূপভাবে সাতটি আকাশের প্রত্যেকটির দূরত্ব ও ঘনত্ব পাঁচশত বছরের পথ। বস্তুত পৃথিবীর প্রথম স্তর, যেখানে আমাদের বসবাস, তা প্রথম আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত। সুতরাং দেখা যায়, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব উপরের দিক থেকে পাঁচশত বছরের এবং নিচের দিক থেকেও পাঁচশত বছরের পথ আর পৃথিবীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব প্রত্যেকটি পাঁচশত বছরের পথ। অতএব পৃথিবীর মোট দূরত্ব দাঁড়াল পনেরো শত বছরের পথ। এমতাবস্থায় কী করে এক আকাশ থেকে অপর আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ হয়? প্রথম আকাশটি পরিধিই তো হল পনেরো শত বছরের পথ। বস্তুত প্রথম আকাশটি দ্বিতীয় আকাশের অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় আকাশের তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্র। দ্বিতীয় আকাশটি তৃতীয় আকাশের তুলনায় আরও ক্ষুদ্র। অনুরূপভাবে, প্রত্যেকটি ঊর্ধ্বাকাশ দূরত্ব ও ঘনত্বে প্রত্যেকটি নিম্নাকাশ অপেক্ষা অতি বৃহৎ। এমতাবস্থায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নির্বিশেষে সকল আকাশের দূরত্বই পাঁচশত বছরের পথ এটা কেমন কথা? আক্ষেপ! মুসলিম সম্প্রদায় এমনি চালাক ও জ্ঞানী হয়েছে যে, একটি সাধারণ কথাও তারা বুঝতে পারে না। এজন্য প্রত্যেকেরই ইল্‌মে হেকমত বা বিজ্ঞান শিক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, এটা কোরান দ্বারা প্রমাণিত। ইল্‌মে হেকমত বাংলাভাষা প্রভৃতি যা বিশেষ প্রয়োজনে আসে এবং যে সবের কারণে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ অর্জিত হয় তা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। অন্যথায় অমূলক কথাবার্তা বলে জ্ঞানীদের নিকট বোকা সাজতে হয়।

দুনিয়াদার আলেমের পরিচয়

হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞদেরকে দুনিয়াদার আলেম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেছেন। কারণ তারা কেবল হারাম, হালাল, বৈধ, অবৈধ প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয়াদির আলোচনাতেই লিপ্ত থাকেন। এরা বাদশাহ্ ও তলোয়ারধারীদের মতো। বাদশাহ্ তার রাজত্ব আর যুদ্ধবিজয়ী গাজী তার তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত; পরকাল সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের শাসন করার জন্য দৃঢ় সংকল্প এবং এটাকেই তারা ধর্ম ও পরকালের কর্ম মনে করে।

প্রকৃতপক্ষে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) উক্ত জাহেরপন্থীদেরকে অন্তরের রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। জনৈক ব্যক্তিকে ইসলামের কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও হত্যা করা হয় এবং হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে যুক্তি দেখানো হয় যে, সে তলোয়ারের ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। তখন হযরত (সঃ) সে হত্যাকারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি তার অন্তর ভেদ করেছিলে? অর্থাৎ তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে অন্তর থেকে কালেমা পাঠ করে নি? ফকীহ্ তথা আইনবিদ তলোয়ারের আশ্রয়েই ইসলামের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করে। অথচ সে জানে যে, তলোয়ারের সাহায্যে সকল সন্দেহ দূর করা যায় না বা সন্দেহ দূর হয় না এবং তলোয়ারের সাহায্যে অন্তর থেকে অজ্ঞতার পর্দা অপসারণও সম্ভব নয়। তবুও যে ব্যক্তি মুখে কলেমা পাঠ করে না সে ব্যক্তিকে তারা হত্যার নির্দেশ দেয়। অপরদিকে তাদের হস্ত যুদ্ধসম্পদের দিকে প্রসারিত। কিন্তু কোনো ব্যক্তি মৌখিক কলেমা পাঠ করে আইনবিদের আদেশে দুনিয়াতে তার জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে পারে। যতদিন সে জীবিত থাকবে কলেমার বদৌলতে দুনিয়াতে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে এবং কেউই তার প্রতিবাদ করবে না। তাইতো মহানবী (সঃ) বলেন, ان افاق الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قالوا فقد عصموا من دماء هم واموا لهم (ইন্না আফাকান্নাছা হাত্তা ইয়াকুলা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাইজা ক্বালু ফাক্বাদ্ আসামু মিন্ দামায়াহুম ওয়া আম্‌ওয়ালহুম) অর্থাৎ, "আমরা লোকের সাথে হানাহানি করব যতক্ষণ তারা কলেমা পাঠ না করে, যদি কলেমা পাঠ করে তা হলে তাদের ধন প্রাণ রক্ষা করতে হবে। উক্ত হাদিস দ্বারা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মৌখিক কলেমার উপকারিতা জীবন ও সম্পদের হেফাজত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু পরকালের ব্যাপারে মৌখিক কলেমার কোনোই কার্যকারিতা নেই। অন্তরের বিশুদ্ধতা, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রই পরকালের কার্যকর এবং এ আন্তরিক কার্যাদি ফিকাহ্ বা আইন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি কোনো আইনবিদ কর্তৃক মানসিক কার্যাদির আলোচনা করা হয়, তবে তা হবে কথা শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনার মতোই। কারণ এটা তার ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বাহ্যিক শর্তাদি মোতাবেক নামাজ সম্পন্ন করে আর তার মনে একাগ্রতা না থাকে এবং নামাজরত অবস্থায় সে তার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে ভাবতে থাকে, তাহলে ফেকাহবিদ বলবে যে, তাঁর নামাজ ঠিক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ নামাজের কোনোই কার্যকারিতা নেই। যেমন মৌখিক কলেমা পাঠের পরকালীন কোনো মূল্য প্রকৃত ইসলামের মধ্যে নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাহেরপন্থী আইনবিদ যথার্থতার ফতুয়া দিবে, এই অর্থে যে, মৌখিক স্বীকার উক্তি দ্বারা তার হুকুম তামিল করা হয়েছে। তাই তাকে হত্যা করা ও শাস্তির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু মনের একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা যা পরকালের কাজ, তা যদিও হয় নি। যে সব কাজে জাহেরি কর্মের প্রকৃত সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে ফিকাহ্‌শাস্ত্র সে সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। যদিও সেসব বিষয়ে আলোচনা করে, তবে তাহলেও সে সব আলোচনা ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে, যাকাত

সংক্রান্ত আইন দ্বারা ফিকাহ্‌বিদদের উদ্দেশ্য হল সরকারি আইন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। কেউ যদি বাহানা করে যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং সরকার তাকে গ্রেফতার করে, তাহলে ফিকাহবিদ হুকুম দিবে যে, তার ওপর যাকাত প্রযোজ্য নয়। বর্ণিত আছে যে, কাজী আবু ইউসুফ বৎসরের শেষে নিজ সম্পদ স্ত্রীকে হেবা করে দিতেন এবং তার সম্পদ নিজের নামে হেবা (দানপত্র) করে নিতেন। আর এভাবে তিনি যাকাত এড়িয়ে চলতেন। এটা হলো জাগতিক আইনের বাহানা। কিন্তু পরকালের বিচারে এটা জঘন্যতম পাপ। এ কারণে জাহেরি শাস্ত্রের ইমাম হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন যে, বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনে পরকালের সম্বল লাভ হয় না। হুজ্জাতুল ইসলাম 'এহিয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন– যখন থেকে গ্রন্থাদি রচনা শুরু হয় এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবহারিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে নিষ্ফল গবেষণা আরম্ভ হয়, মানুষ কাহিনী ও ওয়াজের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন থেকেই ইলমে 'ইয়াকীন তথা প্রকৃত জ্ঞান লুপ্ত হতে থাকে।

হৃদয়ের জ্ঞান, নফ্‌সের গুণাবলির জ্ঞান ও শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হয় এবং মাত্র কয়েকজন ব্যতীত সকল লোকই তা বর্জন করে। বর্তমানে যারা তর্ক-বিতর্ক করতে পারে অথবা ওয়াজের সময় রসালো করে কাহিনী বলতে পারে বা ছন্দ মিলিয়ে কথা বলতে পারে, তাদেরকে আলেম বলা হয়। এর কারণ হচ্ছে শ্রোতারা অধিকাংশই সাধারণ মানুষ এবং মারেফত সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা জানে না যে, প্রকৃত জ্ঞান কোনটি। তারা সাহাবাদের কার্যক্রম ও জ্ঞান সম্পর্কেও অজ্ঞ। তা না হলে, এরা তাদের কার্যক্রম থেকে বুঝতে পারত অথবা স্বীয় মুর্শিদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারত এবং ওয়াজের ভিতর কোথায় তাদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে, তারা তাও বুঝতে পারত। তারা উপলব্ধি করত যে, যে জ্ঞানে বাতেনী জগতের শিক্ষা নেই, সে জ্ঞান বৃথা আর পরিচিত হত তারা সে সব বক্তব্যের সাথে যেগুলোকে বর্তমান যুগে সাধারণভাবে মানুষ পরকালের সম্বল মনে করছে এবং তারা তা পরিহার করত। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) ঠিকই বলেছেন যে, "তোমরা এমন যুগে আছ যেখানে বিবেক জ্ঞানের অধীন এবং তোমাদের ওপর এমন এক দিন আসবে যখন জ্ঞান বিবেকের অধীন হবে।" মালেক বিন আনাস (রাঃ) বলেন, "অতীতে সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং স্রষ্টার রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইত এবং আলেম সমাজ হারাম-হালাল বর্ণনা করতেন না, কিন্তু বর্তমানে হারাম-হালালের চর্চাই করা হয়।" অতএব যে সব ফিকাহ্‌বিদ আধ্যাত্মিক রহস্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞ তারাই দুনিয়াদার আলেম। দুনিয়াদার ব্যক্তি যেমন দুনিয়ার কাজকর্ম ও হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, জাহেরপন্থী আলেমও তেমনি জাগতিক বিষয়াদি আলোচনায় সদা লিপ্ত থাকে। তাই জাহেরি আলেমও দুনিয়াদারদের অন্তর্ভুক্ত। আধ্যাত্মিক ও আখেরাতের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণেই সাহাবাগণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, কালামশাস্ত্র অথবা ফিকাহ্‌শাস্ত্রের জ্ঞানের জন্য তাঁরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হন নি। তাই আল্লাহ্ তায়ালা কোরানে বলেন, الذين

جاهدو افينا لنهد ينهم سبلنا وان الله مع المحسنين (আল্লাজিনা জাহাদু ফীনা লানাহ্‌- দিয়ান্নাহুম্ সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা মাআল মুহ্‌সিনীন্) অর্থাৎ,"যারা আমাকে জানার জন্য চেষ্টা করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার সকল পথ প্রদর্শন করেছি এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় কল্যাণকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।" অর্থাৎ, আল্লাহ মৌল সত্তা যা সকল গুণের উৎস, একে জানাই আসল জ্ঞান এবং এ জ্ঞান লাভের জন্য যে চেষ্টা করে তাকেই আল্লাহ্ তার পথের দিশা দেন। ফিকাহ্‌শাস্ত্র অথবা কালামশাস্ত্র কিংবা তর্কবিদ্যা দ্বারা সে পথ পাওয়া যায় না, এ জন্য অধ্যাত্মজ্ঞান অপরিহার্য। এ অধ্যাত্মজ্ঞানের কারণেই সাহাবাগণ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম বলেন, "সাহাবাদের উচ্চ মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা উদাসীন হয়ো না, তোমরা যাদের কথা বলছ, সাহাবাদের মর্যাদা তাদের সকলের উপরে। ধর্ম বিষয়ে তাঁদের মতো জীবন যাপন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কেউ তাঁদের কাছেও পৌঁছুতে পারবে না।" প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এ মর্যাদা কালাম শাস্ত্র ও ফিকাহ্‌শাস্ত্রের কারণে হয় নি বরং পরকালের জ্ঞান এবং তদনুযায়ী পথ চলার দরুনই তারা এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সকলের ওপর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এর কারণ এ নয় যে, তিনি অধিক রোজা রাখতেন বা অধিক নামাজ পড়তেন অথবা অধিক রাওয়ায়েত করতেন অথবা অধিক ফতুয়া দিতেন বা তর্ক-বিতর্ক ও কালামশাস্ত্রে অধিক চর্চা করতেন বরং তাঁর বক্ষে নিহিত বস্তুই এ মর্যাদার কারণ। "উক্ত রহস্যের অনুসন্ধানে তোমাদেরও আগ্রহী হওয়া উচিত।" মহানবী (সঃ) এর বাণীও তাই প্রমাণ করে। তিনি বহু সাহাবি রেখে গেছেন, যারা আল্লাহ্‌প্রেমে, অধ্যাত্মজ্ঞানে অদ্বিতীয় ছিলেন। রাসূল (সঃ) নিজে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মধ্যে দশ জন ছাড়া আর কেউই জাহেরি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না। তবে তাঁরা নিজেরা কখনো ফতুয়া দিতেন না। হযরত ইব্‌নে উমর (রাঃ)-এর নিকট কেউ ফতুয়ার জন্য গেলে তিনি অন্য বিচারকের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, জ্ঞানের নয়-দশ ভাগই মরে গেছে। লোকে প্রশ্ন করল, আপনি কী করে এ কথা বলছেন? আমাদের মধ্যে তো বড় বড় সাহাবি এখনও রয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি ফতুয়া এবং আইন-কানুন সংক্রান্ত জ্ঞানের কথা বলি নি। আমি আল্লাহ্‌র জ্ঞান তথা ফানা ও বাকাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তে বিলীন ও অধিষ্ঠান যা নবী অলিদের প্রকৃত উত্তরাধিকার সে জ্ঞানের কথা বলেছি। বস্তুত হযরত উমর (রাঃ) তর্ক-বির্তকের পথ একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'এহিয়াউল উলুম' গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুচার কথা লেখা হল।

মোট কথা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) জাহেরি বিদ্যা অর্থাৎ ফতুয়া ও আইন কানুন সংক্রান্ত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। এ বাহ্যিক জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে কোনো নবী বা রাসূল পথ প্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হন নি। আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং ঘোষণা করেন, هو الذى بعث فى الا مين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته

ويزكيهم ويعلم هم الكتاب والحكمة (হুয়াল্লাজি বা,আছা ফিল উম্মিয়ীনা রাসূলাম্ মিন্হুম্ ইয়াত্লু আলাইহিম্ আইয়াতিহি ওয়া ইউজাক্কিহিম্ ওয়াইউআল্লিমু হুমুল্ কিতাবা ওয়ালহিক্মাহ্) "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা, যিনি তাদের নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁরা তাদের কাছে তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন এবং তাঁদের শুদ্ধিকরণ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেন।"

অসৎ আলেমদের জন্য কঠোর সতর্ক বাণী রয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে সকলের চেয়ে অধিক শাস্তি প্রদান করা হবে। সুতরাং অসৎ আলেমদের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এখানে অসৎ আলেম বলতে সে-সব বাহ্যিক দুনিয়াদার আলেম বোঝানো হয়েছে, যাদের জ্ঞনের উদ্দেশ্য হল জাগতিক মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা। রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আলেম তার জ্ঞান থেকে উপকৃত হয় নি, কেয়ামতের দিন তার শাস্তি সবচেয়ে বেশি হবে। রাসূল (সঃ) আরও বলেছেন, যে আলেম স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে না, বস্তুত সে আলেম বা জ্ঞানীই নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন, العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعلى على ابن ادم وعلى القلب فذلك علم النافع (আল্ ইলমু ইল্মানে, ইল্মুন্ আলাল্ লিছানি ফাজালিকা হুজ্জাতুল্লাহি তা'আলা আলা ইব্নি আদামা ওয়াআলাল্ কাল্বি ফাজালিকা ইল্মুন্ নাফি') অর্থাৎ, "জ্ঞান দু প্রকার। প্রথমত, মৌখিক জ্ঞান, যা মানুষের কাছে আল্লাহ্র প্রমাণপত্র, দ্বিতীয়ত, কাল্ব বা অন্তরের জ্ঞান, এটাই কল্যাণের জ্ঞান"। ইমাম তিরমিজি খতিব হযরত জাবের (রাঃ) থেকে এ মোরসাল হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত আলেম আল্লাহ্ ওয়ালাদের সাথে অহংকার করার, মূর্খদের সাথে তর্ক করার এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে জ্ঞান অর্জন করে না। যে এ নিয়তে জ্ঞান অর্জন করবে সে জাহান্নামী হবে। রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানকে গোপন রেখেছে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অগ্নিশৃঙ্খলে আবদ্ধ করবেন। তিনি আরও বলেছেন যে, আমি দাজ্জালের চেয়েও যারা দাজ্জাল নয়, তাদের জন্য তোমাদের ব্যাপারে বেশি শঙ্কিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, তা কী? হযরত (সঃ) উত্তর দিলেন, আমি পথভ্রষ্টকারী ইমামদেরকে ভয় করি। এটাই সে যুগ।

বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বে-আমল আলেম ধর্মকর্মহীন জনসাধারণের ইমাম হয়ে গেছে এবং তারা অমূলক কথার দ্বারা হৃদয় সংক্রান্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রিয় সাধারণ মানুষকে নিজেদের ভক্তে পরিণত করেছে। কোনো এক সুযোগে ইমামগণ বাংলার গরিব মানুষের ওপর তাদের বাহু বিস্তার করে। অতঃপর অন্ধ, মূক ও বধির সকলেই সে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে অন্ধ আরও অন্ধ হয়ে গেছে, বধির হয়েছে আরও বধির এবং মূক হারিয়েছে তাদের অবশিষ্ট বাক্শক্তি। বর্তমানে তারা এমন পাকা প্রাণহীন ইবাদতকারী, সুফি, মুত্তাকি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম হয়ে গেছে যে, তারা প্রশংসা ও তাক্লীদ বা আনুগত্যের

চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। এ জন্যই হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "এ উম্মতের মধ্যে মুনাফিক আলেমকে আমি বেশি ভয় করি।" লোকে প্রশ্ন করল, মুনাফিক আলেম হয় কি করে? উত্তর দিলেন– "মৌখিক আলেম অন্তর ও কাজের বিচারে সে জাহেল ও মূর্খ। হযরত সুফিয়ান ছাত্তারী (রহঃ) বলেছেন, জ্ঞান তার প্রয়োগ চায়, জ্ঞান প্রয়োগ না করলে সে জ্ঞান লোপ পায়।" ইব্নে মুবারক (রহঃ) বলেন, "ব্যক্তি যতক্ষণ জ্ঞানের সন্ধানে থাকে ততক্ষণই সে জ্ঞানবান থাকে, যখন সে নিজেকে জ্ঞানী বলে ভাবে তখন সে অজ্ঞান ও মূর্খ হয়ে যায়।" অজ্ঞতা ও বিস্মৃতি থেকে মুক্ত থাকার নাম জ্ঞান। কোনো লোক বিস্মৃতি দ্বারা আক্রান্ত হলে সে আলোহীন প্রদীপের মতো হয়ে যায়। তাই যে আলেম অপরকে উপদেশ দেয় অথচ সে নিজে উপদেশ গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ্র নূর থেকে শূন্য, তাওহীদ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এবং কর্মবিমুখ মৃতপ্রাণ। তার সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেন, انا لعالم ليعذب عذابا لطيف به اهل النار استطاما شعوة عذابه (ইন্নাল আ'লিমা লাইউয়াজ্জাবা আজাবান্ লাতিফুম্ বিহি আহ্লিন নার ইজ্তাতামা শা'ওয়াতা আযাবিহি) "অনুরূপ আলেমকে এতই কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে যে, তা দেখার জন্য দোযখের অন্যান্য অধিবাসীরা তার নিকট জড় হবে।" হযরত রাসূল (সঃ) আরও বলেন, يوتى بالمعالم يوما القيا مة فيلقئ فى النار فتنديق افتابه فيدر وبها يدر الحماربالر فيطوف به اهل النار فيقولن كنت امر با لخير اولدينه والنهى عن الشر واعيه (ইউতা বিল্ আ'লিমি ইয়াওমাল্ ক্বিয়ামাতে, ফা ইউল্কা ফিন্নারি, ফা তান্দিকু অফ্তাবাহু ফাইয়াদূররু বিহা ইয়াদুররুল হিমারু। বিররাফিতুফা বিহি আহ্লূন্নারি ফা-ইয়াকূলূনা, কুন্তা আ-মেরান্ বিল্ খাইরি ওয়াদ্-দ্বীয়ানাতি ওয়া নাহা আনিশ্ শার্ওয়াইহি) অর্থাৎ, "কেয়ামতের দিন একদল আলেমকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং তাদেরকে গাধার মতো ঘোরানো হবে আর দোযখের অধিবাসীরা বলবে, তোমরা কি নিজেরা কাজ না করে অন্যকে উপদেশ প্রদান করেছ?" বোখারী এবং মুসলিম আলেম শব্দের পরিবর্তে রাজুল তথা ব্যক্তি শব্দ ব্যবহার করে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এ অর্থেই আল্লাহ্ তায়ালা কোরান পাকে ঘোষণা করেছেন, اتامر ون الناس بالبر وتنسون انفسكم (আতা' মুরুনান্নাসা বিল্-বির্রি অতান্সাওনা আন্ফুসাকুম) অর্থাৎ "তোমরা কি অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছ– অথচ নিজেদের কথা ভুলে গেছ?" এ কারণে আল্লাহ্ পাক বলেন, ان المنا فقين فى الدرک الاسفل من النار (ইন্নাল্ মুনাফিকীনা ফিদ্দারকিল্ আস্ফালি মিনান্নার) অর্থাৎ, "মুনাফিক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে।" এ জন্যই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ইহুদি ও নাসারাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে আখ্যায়িত করেছেন। অসৎ আলেমদের ধোঁকা এবং চাতুরির সংস্পর্শে যাবে না। কারণ তারা ধর্মের জন্য শয়তানের চেয়েও ক্ষতিকর। শয়তান তাদের সাহায্যেই মানুষের মনে ন্যায় ও সত্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি যদি

দুনিয়ার সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্ এবং রাসূল (সঃ) এর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির আশায় জিকির ও মোরাকাবা করে– তার পথে যে বাধার সৃষ্টি করে বা বাধা দেয়, সে ব্যক্তিই শয়তানের কাজ করছে। কারণ সে ভালো কাজেকে মন্দ কাজের সাথে মিশিয়ে হালালকে হারাম করে দিচ্ছে এবং নবুয়তের পথকে ইবলিসের পথে রূপান্তরিত করে সে নিজেই ইবলিসের পথ গ্রহণ করছে (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন)। বস্তুত সে দোযখকেই বেহেশ্‌ত মনে করছে। রাসূল (সঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! সবচেয়ে নিকৃষ্ট চরিত্র কোনটি? "আল্লাহ্ তুমি ক্ষমা কর" বলে রাসূল (সঃ)-এর জবাব দিতে অস্বীকার করেন। বার বার প্রশ্ন করার পর রাসূল (সঃ) উত্তর দিলেন যে, "অসৎ আলেম।"

অসৎ আলেমের পরিচয় প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে। অসৎ আলেম সে-ই, যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রকৃত বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত, যদিও অন্যান্য বিষয়ে তার কিছু কিছু জ্ঞান থাকে। হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহঃ) তাঁর 'এহিয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন, জনৈক শাইখ কোনো এক আলেমকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেছেন, "যে জ্ঞানের সাহায্যে তোমরা ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করতে, সে জ্ঞানের অবস্থা কী? আলেম হাত উন্মুক্ত করে তাতে ফুঁক দিয়ে বলে যে, "সে সব জ্ঞান এমনি ধূলার মতো উড়ে গেছে।" হাদিস শরীফে আছে– ما اضل قوم بعد هدئ كانوا عليه ما مربه لك الاجدا لابل هم عضمون الا اوتو الجد ال ثم قرأ (মা আদাল্লা কাউমুম্ বা'দা হুদা কানু আলাইহি ইল্লা উতুল্ জিদালা ছুম্মা কারাআ মা মার্‌রা বিহি লাকা ইল্লা জিদালা বাল্‌হুম আদামুন) অর্থাৎ, "হেদায়েত লাভের পর কেউই পথভ্রষ্ট হয় না, কিন্তু তাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তারা পথভ্রষ্ট হবে।" তাই কোরান পাকের উপদেশ হলো- هم اهل الجدال الذين عناهم الله تعا ئ يقوله واحذرهم ان يفتنوك (হুম আহ্‌লুজ্ জিদালিল্লাজিনা আন্নাহুমুল্লাহু তায়ালা ইয়াকুলাহু ওয়াহ্‌জার হুম্ আইয়্যাফতানুকা) অর্থাৎ, "যারা তোমাদেরকে ঝগড়ার দিকে ডাকে, তোমরা তাদের পরিহার কর, তাদের কাজই হল ঝগড়া বাঁধানো।" তিরমিজি শরীফে আছে এবং কোনো বুজুর্গও বলেছেন যে, "শেষ যুগে এমন একদল লোক হবে যাদের জন্য আমলের পথ বন্ধ হয়ে যাবে আর ঝগড়ার পথ খুলে যাবে।" কোনো কোনো হাদিস শরীফে আছে– "আমরা এমন যুগে রয়েছি যখন কাজের ইলহাম হচ্ছে এবং অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় হবে যাদের মন ঝগড়ায় পরিপূর্ণ থাকবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, بعض الخلق الى الله تعالي الد الخصيم (বা'জুল্ খাল্‌কে ইলাল্লাহি তায়ালা আলাদ্দুল্ খাছিম) অর্থাৎ, "ঝগড়াকারী আল্লাহ্‌র বড় দুশ্‌মন।" তাই আল্লাহ কোরান পাকে ঘোষণা করেছেন– من يجادل فى الله بغير علم فهو يتبع كل شيطان مريد (মাইউজাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ইল্‌মিন্ ফাহুয়া ইয়াত্তাবিউ কুল্লা শাইতোয়ানিম্ মারীদ) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ্‌র এবং বাকাবিল্লাহ্‌র বিষয়ে ঝগড়া করে অথচ সে এ বিষয়ে কিছুই জানে না, সে বড় অবাধ্য শয়তানের মুরিদ বা

অনুসারী।" এখানে লক্ষণীয় যে, না জেনে কোনো একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও কোনো প্রকার মতামত প্রদান করা হারাম, তা যদি সঠিকও হয়। আর যদি ভুল হয় তা হলে তো কথাই নেই। এর জবাব কী? কোনো ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যাপারে না জেনে কথা বলা যখন হারাম তখন কিছুই না জেনে তাওহীদ সম্পর্কে কথা বলা কী করে বৈধ হতে পারে? তাওহীদপন্থী, তাওহীদের ভিতরে হাবুডুবু খেয়ে প্রকৃত মাবুদের সাথে যুক্ত ও একাত্ম, তাঁর সংস্পর্শে সে দুনিয়ার সব কিছু থেকে বিমুখ, আর নিজের মাবুদ ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর খেয়ালে নেই। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদপন্থী জিকির ও ধ্যানে সদা মশগুল থেকে বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সত্তার সাক্ষাতে লিপ্ত এবং নিমজ্জিত। সেখানে নফ্‌স ও শয়তান বিধ্বস্ত, কুফরি ও মুনাফেকী পর্যুদস্ত। এখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র জিকির এবং জিকিরকারীদের বিভিন্ন অবস্থা। এ জিকির মুনাফিকদের ওপর কঠিন আঘাতস্বরূপ এবং জিকিরকারীদের মগ্ন অবস্থার আকর্ষণ ও তেজস্ক্রিয়তা এবং মুর্শিদের ধ্যানপ্রভাব জাহেরপন্থীদের জন্য মরণবিষতুল্য। হারাম, শির্‌ক প্রভৃতি অন্যায় কাজ থেকে মানুষ যেভাবে বিরত থাকে, এ জাহেরপন্থীরাও তেমনি জিকির এবং ধ্যান তথা আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে বিরত থাকে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ومن يمش عن ذكر الر حمن تقيد له الشيطانا فهوله قرين وانهم ليصدون هم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون (অ মাই ইয়াই'শু আন জিক্‌রির্ রাহমানি নুক্বাইয়্যেদ লাহুশ্ শাইতোয়ানা ফাহুয়া লাহু কারিনুন্ অ আন্নাহুম লাইউছুদ্দুনা হুম আনিস্‌সাবিলি অইয়াহসাবুনা আন্নাহুমা মুহ্‌তাদুন) অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকিরকে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ্ শয়তানকে তার উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। শয়তান তার সাথীকে সৎপথ থেকে দূরে রাখে অথচ তারা মনে করে যে, তারা ঠিক পথেই রয়েছে।" অতএব যার ওপর শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, জিকিরের প্রতিক্রিয়া তার জন্য কঠিন আঘাতস্বরূপ তো হবেই। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, "জিকির শুনলে শয়তান জিকিরকারীর কাছ থেকে পলায়ন করে আবার যখন জিকির ভুলে যায় তখন শয়তান তার নিকট আসে এবং প্ররোচনা দেয়।" সুতরাং জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয় এবং শয়তান ও নফ্‌সের ধ্বংস হয়। তাই শয়তান জিকির শুনলে জিকিরকারীদের প্রাণের শত্রু মনে করে। সুতরাং যে শয়তান ও নফ্‌সের অধীন সেও শয়তানের দলভুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা মুজাদালার দ্বিতীয় রুকুতে বলেন, استحوز عليهم الشيطان فانسهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون (ইস্‌তাহাওয়াজা আলাইহিমুশ্ শাইতোয়ান্ ফাআন্‌সাহুম জিক্‌রাল্লাহি উলাইকা হিজ্‌বুশ্ শাইতোয়ানি আলা আন্না হিজ্‌বাশ্ শাইতোয়ানি হুমুল্ খাসিরুন) অর্থাৎ, "শয়তান তাদের ওপর জয়ী হয়েছে এবং ভুলিয়ে দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্‌র নাম। অবগত হও যে, তারা শয়তানের সেনাদল এবং তারা অবশ্যই বিপর্যস্ত।" এ শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহ্‌র জিকির শুনলে কষ্টতো পাবেই। কারণ শয়তান তাদের অন্তরে এমন ব্যাধি ঢুকিয়ে দিয়েছে যে,

ভালো কথা তাদের কাছে অত্যন্ত মন্দ ও বিরক্তিকর মনে হয়। শয়তান বড় জ্ঞানী বটে। কিন্তু বাতেনী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এ জন্য জাহেরি বিদ্যার আলেমরাই শয়তানের অধিকাংশ শিষ্য। এ কারণে অসহায় জনসাধারণই আজ তাদের অনুগত ও অনুসারী হয়েছে। আল্লাহ্‌ভক্ত কোনো লোকেই জাহেরি আলেমদের কথায় আখেরাতের সম্বল কখনো ত্যাগ করেননি।

হযরত মনসুর হাল্লায্ (রহঃ)-কে শূলে চড়ান হয়েছে, হযরত শামস তিব্‌রিজি (রহঃ) এর শরীরের চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে, হযরত শীর মাস্‌ত (রহঃ)-কে আলমগীরের সময় হত্যা করা হয়েছে, হযরত বু-আলী কলন্দর (রহঃ), হযরত জুন্নুন, হযরত শাহ্ মাদার, হযরত মানিক পীর, হযরত বাউন পীর, হযরত উস্‌মান হারুনী, হযরত হাফেজ সিরাজ, হযরত মঈনউদ্দিন চিশ্‌তি (রহঃ), হযরত পীরানে পীর দস্তগীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ), হযরত শাইখ আকবর মহিউদ্দীন ইব্‌নুল আরাবী, হযরত খাজা নকশবন্দ, হযরত শাহ্ নেয়ামত বিন শকন, হযরত শাহ্ মানেরী ওরফে মানেরী ফকীর বাঙালী, হযরত শাহ্ ফতেহ্ আলী (রহঃ), হযরত কাশেম শাহ্ এবং শাহ্ আহম্মদ উল্লাহ্ ইসাপুরী (রহঃ) প্রমুখ এবং তাঁদের অনুসারী সকলকে জাহেরপন্থীরা কুফরির ফতুয়া দিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউ এর প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। শয়তানের অনুসারীরা যে সব ফকীর ও আল্লাহ্ ওয়ালাদেরকে কুফরির ফতুয়া দিয়েছে তাঁদের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি হযরত গাউছুল আজম (রহঃ) অন্যান্য বুজুর্গদেরকেও কাফের ফতুয়া দিয়েছে। চিন্তা করা প্রয়োজন, যারা হযরত গাউছে পাককে কাফের ফতুয়া দিয়েছে, তারা ভালো করেছে না মন্দ করেছে? যদি বল যে, তারা ভালো করেনি, তাহলে এখন যারা কাফের ফতুয়া দিচ্ছে তাদেরকে কী বলবে? তাই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করতে বলছেন। আল্লাহ্ বলেন, وان يكا دالذ ين كفروا ليز لقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين (ওয়াইঁয়্যাকাদুল্লাজিনা কাফারু লাইউজ্ লিকুনাকা বি আব্‌সারিহিম্ লাম্মা ছামিউয় লি-যিকরি অইয়াকুলুনা আন্নাহু লামাজ্‌নুনা অমা হুয়া ইল্লা জিক্‌রুল্‌লিল আলামীন) অর্থাৎ, "সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা জিকিরের শব্দ শুনলে তোমাদের প্রতি ভ্রুকুটি দিয়ে তাকাবে এবং বলবে, অবশ্যই সে পাগল হয়েছে। অথচ তা আল্লাহ্‌র জিকির ব্যতীত কিছুই নয়।"

এখন চিন্তা করুন, নবী (সঃ) জিকির করতেন এবং কোরান শোনাতেন, তখন কাফেররা তাঁকেও ঠাট্টা করেছে, পাগল আখ্যা দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র গজবের আশঙ্কা সত্ত্বেও কাফেররা নবী (সঃ)-কে রেহাই দেয়নি। তাহলে আজ তাঁর উম্মত– যারা নবী নয়, কী করে তা থেকে রেহাই পাবে? যদি বলা হয়, বর্তমানে তো সে যুগের মতো কাফের নেই। উত্তরে বলা যায়, এ যুগে কাফের না থাকলেও সকলেই তো আর বেহেশ্‌তে যাবে না। অপর দিকে নবী (সঃ)-এর যুগটা উত্তম ছিল আর এটা ফেতনার যুগ।

হাদিস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত যেমন অলি আব্‌দাল, গাউস, কুতুব ও ভালো মানুষ থাকবেন, তেমনি কাফের এবং মুনাফেকও থাকবে। তাই কোরান মাজীদে বলা হয়েছে, وان يكاد الذين كفروا (অইঁয়াকাদুল্লা-জিনা কাফারু) অর্থাৎ, "কুফরকারীরা নিকটেই রয়েছে।" উক্ত আয়াতের সত্যতা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

নবুয়তের পর বেলায়েতের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং হাশর নশর তা সর্বদাই বেলায়েত বহাল থাকবে। যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বেলায়েতের ধারা চলতে থাকবে সেহেতু আউলিয়াগণও বেলায়েতের ধারায় কেয়ামত পর্যন্ত থাকবেন, তা বন্ধ হয়ে যাবে না। যেমনই আল্লাহ্‌ওয়ালা থাকবেন, তেমনই কাফের, ফাসেক এবং মুনাফেকও থাকবে। কারণ বেহেশ্‌ত যেমন আছে, দোযখও তেমনি আছে; সুতরাং আউলিয়া থাকলে কাফের ফাসেকও থাকবে। এমনিভাবে একাদিক্রমে যত অলি-আল্লাহ্ পৃথিবী থেকে পর্দা নিয়েছেন, সে সঙ্গে তাঁদের সময়ে কাফের-ফাসেকও দুনিয়াতে ছিল। তাই এসব অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা উক্ত বুজুর্গ ব্যক্তিগণ ফেতনাগ্রস্ত তথা অত্যাচারিত হয়েছেন। স্মরণীয় যে, মনসুর হাল্লায যখন 'আনাল্ হক্' বললেন এবং জলসা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন এ জাহেরপন্থীরাই অলি দরবেশদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এটা কোন শরিয়তে আছে যে, এক ব্যক্তি অন্যায় করলে তাকে না পাওয়া গেলে ক্রোধের বশে অন্যদের ওপর অত্যাচার করতে হবে? অথচ হযরত মনসুর হাল্লায কোনো অন্যায়ই করেননি। এ আলোচনায় আশেকদের মনে অবশ্যই ব্যথা লাগবে।

মোটকথা, যখন জাহেরপন্থীরা আল্লাহ্ ওয়ালাদেরকে কাফের ও মুরতাদ আখ্যা দিতে শুরু করল, তখন ইব্‌লিস দেখল যে, সাধারণ মানুষ ফতুয়া ও দলিল প্রমাণের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল, তখন সে আলেমের বেশ ধারণ করে। কারণ শয়তান নিজে জাহেরিবিদ্যার সাগর; সারা পৃথিবীর আলেমদের জ্ঞান শয়তানের জ্ঞানের তুলনায় সাগরের এক বিন্দু জলতুল্য। এমনিভাবে শয়তান তাদের জাহেরি জ্ঞান বাড়িয়ে দিতে লাগল এবং আল্লাহ্‌র ইশারায় সে জ্ঞান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তবে সে জ্ঞান দ্বারা শয়তানের দুরবস্থার কথাও বর্ণনা করা শুরু হয়। এতে শয়তানের দুটি উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রথমত, শয়তানের একটি দোষের বর্ণনা করার সাথে সাথে বর্ণনাকারীর শত শত ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, যথা দোষ বলা এবং যা দোষণীয় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং তা এমন যে, মেথর ময়লা পরিষ্কার করতে করতে এমন হয় যে, তার আর কোনো গন্ধ বোধই থাকে না এবং এ কাজে তার কোনোই অস্বস্তিবোধ হয় না বরং সদা সে এ কাজে সানন্দে লিপ্ত থাকতে পারে। অনুরূপভাবে দোষের কথা বলতে বলতে তা তাদের অন্তরে স্থায়ী হয়ে যায়। ময়লা যেমন গ্লাসকে মলিন করে তেমনি এটাও তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যেমন পরিমাণের বেশি লবণ কোনো কিছুতে মিশ্রিত করলে তা মরণবিষতুল্য হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যারা পরনিন্দাকে বৈধ মনে করে, তাদের জন্য এ উদাহরণ প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত, যার দোষ বর্ণনা করা হয়, তার সে দোষের সমস্ত

পাপ দোষ বর্ণনাকারীর ওপর বর্তায় এবং দোষী সে-পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই শয়তানের সমস্ত পাপ যখন বর্ণনাকারীরা ভাগাভাগী করে নিয়ে যায়, তখন শয়তান বলে, انابرى من عذاب الله (আনাবারিউম্-মিন-আজাবিল্লাহ) অর্থাৎ, "আমি আমার বন্ধুদের মেহেরবানীতে সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে গেলাম।"

এভাবে শয়তান বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে, যাতে তারা তার সহগামী হয়। যদি বলা হয় যে, আল্লাহ্ স্বয়ংই তো শয়তানের দোষ বর্ণনা করেছেন। তার উত্তর হল– আল্লাহ্ এবং তাঁর বন্ধু আপন রহস্য বর্ণনা করেছেন, তোমরা আজও তা বোঝনি। দ্বিতীয়ত, শয়তানী করার দরুনই আল্লাহ্ তায়ালা তার অধঃপতনের কথা বর্ণনা করেছেন– বিনা কারণে আল্লাহ্ শয়তানের কুৎসা করেননি। মনে করুন, যে জায়গায় অপরাধ হয়, শয়তান যদি তথায় উপস্থিত নাও থাকে এবং সে অপরাধের সংবাদও না রাখে, তাহলেও উক্ত অপরাধের জন্য শয়তানকে মিছেমিছি দোষী করা কী করে বৈধ হয়! হযরত আদম শফিউল্লাহর জামানায় তাঁকে সিজ্দা না করার ফলে সে সময়ই শয়তান কাফের হল। তা হলে হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে পৃথিবীতে যারা ছিল তারা কেন পাপ করল? সে পাপ তো শয়তান করাত না বরং তখন সে পাপ থেকে বিরত করাত। এ পাপের জন্যই তাদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। মনে করুন, হিন্দু ও অন্যদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে এবং মূর্তিপূজা শিখিয়েছে। তাহলে পূজাকে তারা অবহেলা করে কেন– কেন তারা পূজার সময় নিদ্রা যায় আর কেন তাতে তাদের মন বসে না? এমন কি এ ব্যাপারে এক পয়সাও খরচ করতে চায় না। লোকে তাদের ধমকায় এবং দান-দক্ষিণা প্রভৃতি বন্ধ করতে মোটেও তাদের বিবেকে বাধে না। এ সব প্রশ্নের উত্তর কী? এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন, "হাসি পায় আমার মানুষের কথা ভাবতে– অপরাধ করে নিজে, দোষ দেয় শয়তানকে।"

পীর ও বুজুর্গদের নাম নিজের সঙ্গে বা ঘরে বা কিতাবে রাখায় বরকত ও উপকার রয়েছে। দরগাহ্ ও খানকা তৈরি করা এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অলি ও ফেরেশ্তাদের সন্তুষ্টি এবং উভয় জগতে শান্তির বিধায়ক। অলিদের নামে যে শিন্নি ও পশু মানতের প্রচলন রয়েছে তা বহাল রাখায় দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি লাভ হয়। এ জন্যই এটা না করা নিজের জন্যই অমর্যাদাকর। অলিদের জন্য মানত করার অর্থ আল্লাহ্র জন্য মানত করা– এর পুণ্য অলিদের প্রতি পৌঁছে দেওয়াই অলিদের মানত। নিজের মুর্শিদের ব্যবহৃত কোনো বস্তুকে অমর্যাদাকরভাবে ব্যবহার করা অথবা তাঁর পালিত কোনো পশুকে কষ্ট দেওয়া দুঃখের ও বিপদের লক্ষণ এবং কারণ। মুর্শিদের সঙ্গে নাফরমানী করা উভয় জগতে ধ্বংসের কারণ। বুজুর্গদের ছায়া মাড়ানো বিপদের লক্ষণ। নিজ মুর্শিদের এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিদের সম্মান করা এবং প্রত্যেক মৌসুমের শুরুতে নতুন নেয়ামত নজর দেওয়ার প্রচলন রাখা উভয় জগতে মুক্তির লক্ষণ। এর বিপরীত ক্রিয়াকলাপ নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ। পীরদের অমর্যাদা ও অশ্রদ্ধা করা নিজেরই ক্ষতির কারণ। আল্লাহ্র অলিগণ পৃথিবীতে তারকার মতো ঝলসায় এবং আকাশের অধিবাসীগণ সে ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করে– যেমনিভাবে পৃথিবীর অধিবাসীগণ আকাশের তারকার ঔজ্জ্বল্য

অবলোকন করে। আউলিয়াদের দুঃখ-যাতনা দেওয়া জগদ্বাসীদের বিপদের কারণ। রাসূল (আঃ)দের পদচিহ্ন অথবা অলিদের আসন যদি কোনো বৃক্ষের নিচে, মাটি, পাথর বা অন্য কিছুর উপর পতিত হয় এবং তা যদি পরম্পরায়ও পাওয়া যায়, তবে যে ব্যক্তি তাকে সম্মান করবে ও ভালো জানবে তাতে তার বুজুর্গি প্রমাণিত হবে। এ সম্মানকারী হিন্দু কি অন্য সম্প্রদায়ের তাতে কিছুই আসে যায় না।

প্রত্যেক মুর্শিদের প্রভাবই দৃঢ় তথা শক্তিশালী। বিশিষ্ট মুর্শিদের প্রভাব তড়িৎ পতিত হয়। মুর্শিদ তিনি– যিনি নফ্স তথা আত্মার প্রভাব সম্পর্কে অবহিত। কামেল তিনি– যাঁর ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত। মোকাম্মেল তিনি– যিনি অন্যকে কামালিয়াত দান করতে সক্ষম। যে মুর্শিদ অজিফায় লিপ্ত থাকার নির্দেশ দেন, তিনি আরিফ নন বরং জাহেদ। তাঁর প্রভাবে বক্ষ প্রসারিত ও আলোকিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে, الا ماشاء الله (ইল্লা মাশাআল্লাহু) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ যাকে যা চাহেন তাঁর তা হতে পারে।" পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর কিছুকেই অস্বীকার করতে পারেন না। এর অস্বীকৃতি অপক্বতা ও নেয়ামতহীনতার লক্ষণ। মুরিদের ওপর ফয়েজ তথা অদৃশ্য প্রভাব বিস্তারের জন্য 'ওয়াইসী' শক্তির প্রয়োজন। মুর্শিদ যাকে কখনো দেখেননি তাকেও দূর থেকে তা দান করতে পারেন। আমার মুর্শিদ কিবলা ইন্তেকালের সময় এক ছেলে এবং এক মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁরা সম্পর্কে ভাই ও বোন। তাঁরা দুজনই অনাথ ছিলেন। ভাইয়ের নাম সাহেব ফায়েজেমাআব জুব্দাতুল আরেফিন কুদ্ওয়াতুসালেকীন মিয়া সুফি মোহাম্মদ মোস্তফা সানাউল্লাহ্ তায়ালা। বর্তমানে তিনি কলিকাতা শহরে সরকারি চাকুরীতে 'মীর মুন্সি' পদে অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, আমার বোন নিজ পিতা– যিনি 'ছরিউল আছর' ছিলেন তাঁর প্রভাবে পূর্ণতার সকল স্তর অতিক্রম করে একজন সুবিখ্যাত ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, এ জন্য আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন।

এখানে আমার কতিপয় সহপাঠী পীর ভাইয়ের নাম উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন ঢাকার জনাব মাওলানা শাহ্ ফকীর আমজাদ আলী, হুগলীর জনাব মাওলানা সুফি শাহ্ গোলাম সুলেমানি ও জনাব মাওলানা শাহ্ আবুবকর সাহেব এবং জনাব মাওলানা শাহ্ বাকা উল্লাহ (মরহুম মগ্ফুর)। ফরিদপুরের জনাব মৌলভী শাহ্ ওয়াজেদ আলী সাহেব, চট্টগ্রামের 'জনাব মুন্সি শাহ্ সোলায়মান ও জনাব হাফেজ শাহ্ ইব্রাহিম। সিলেটের জনাব মুন্সি দিদার বক্স সাহেব ও জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আকবর আলী (মরহুম)। আসামের জনাব মৌলভী আব্দুল খালেক ও জনাব মৌলভী আব্দুল বারী। চট্টগ্রামের জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল আলী সাহেব। এ ছাড়া আরও অনেক ভাই রয়েছেন, যাঁদের নামের পুরো তালিকায় একটি গ্রন্থ হতে পারে।

আমার জন্মদাতা বুজুর্গ পিতার নাম সুফি সাফি হাজীউল হারমাইন্ শরীফাইন মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব। তিনি জনাব আখন নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেবের অন্যতম সুসন্তান। আল্লাহ্ তাঁদের জান্নাতবাসী করুন।

তামাম শোধ

মাত্‌লাউ'ল উ'লূম

সূচি

আল্লাহ্‌র অলিদের আনুগত্য করা ফরয ২৩৫
আলমের বিবরণ ২৩৮
জগতের রূপ ২৩৮
মূল নাম ও তার সংক্ষিপ্ততার বর্ণনা ২৪০
কোরানের সংক্ষিপ্ত রূপ ২৪২
বিস্‌মিল্লাহ্‌র ছীন লম্বা হওয়ার কারণ ২৪২
স্বপ্ন দেখার কারণ ২৪৩
মুর্শিদের দৃষ্টি ২৪৬
শরিয়ত ও ত্বরিকত এর পার্থক্য ২৫০
দ্বীনের আলোর বিবরণ ২৫২
রাজত্ব পতনের বিবরণ ২৫৪
সম্মানের বিবরণ ২৫৭
ঈমানের বিশ্লেষণ ২৫৯
কবর জিয়ারত প্রসঙ্গ ২৬২
ইবাদতের তাগিদ ও গুরুত্ব ২৬৭
ইয়াকিন বা বিশ্বাসের বিভাগ ২৬৭
শরিয়তের নিক্তি ২৬৯
ধর্মের প্রহরী ২৭১
উৎসাদির মূল উৎসের বর্ণনা ২৭৩
ফযীলতের বর্ণনা ২৭৬
একাত্মতার বর্ণনা ২৭৮
বাতেনী কথা ২৮০
তাসাব্বুর অর্থ এবং এর প্রকারভেদ ২৮০
হাক্বিকত প্রমাণিত হওয়ার বর্ণনা ২৮১
অজ্‌দ্‌ এর পরীক্ষা ২৮৪
নামাজের বিবরণ ২৮৫
সাহায্যের বর্ণনা ২৮৭
বিবাহের স্থায়িত্ব ২৮৮
স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ২৮৯
নিশ্চিত জ্ঞানের বিবরণ ২৯০
জ্ঞানের প্রকাশ ২৯৩
সিজ্‌দার আলোচনা ২৯৫
পর্দার আলোচনা ৩০১
ধর্মের শাখা-প্রশাখা ৩১৬
শরিয়তের ব্যাখ্যা ৩১৯
মধ্যবর্তী নামাজের বিবরণ ৩২৩
আত্মীয়তার বিবরণ ৩২৬
জুময়ার বর্ণনা ৩২৯
প্রেমের প্রকৃতি ৩৩১
ফয়েজ গ্রহণ ৩৩৮
ফয়েজের বৈশিষ্ট্য ৩৪০
শিক্ষা দানের অনুমতি ৩৪১

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্‌র অলিদের আনুগত্য করা ফরয

আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী– واصبو نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفد وات والعشئ الخ ا (ওয়াছ্‌বির্ নাফ্‌সাকা মাআল্লাযীনা ইয়াদ্‌উ'না রাব্বাহুম বিল্‌গুদুওয়্যাতি ওয়াল আ'শিয়্যে) অর্থাৎ, যারা সকাল সন্ধ্যায় আপন প্রভুকে ডাকে– আপন মনপ্রাণ তাঁদের সাথে ঠেকিয়ে রাখ। অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন তাঁদের আজ্ঞা পালন কর এবং তাঁদের অনুগত হয়ে যাও। কারণ ফকির ও অলিদের আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করারই নামান্তর। এ কারণে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– تخلقوا باخلاق الله (তাখাল্লাকু বিআখ্‌লাকিল্লাহ্) অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও।" অলি-নবীদের চরিত্রও তাই। সুতরাং যার মধ্যে আল্লাহ্‌র চরিত্রগুণ বিদ্যমান, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজেব। আর এটা অলঙ্ঘনীয় ওয়াজেব। এটা ফরজের স্থলে শর্তসাপেক্ষ ওয়াজেব নয় যে, শর্ত অপসারিত হলে ওয়াজেবও অপসারিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ যাকাত প্রদান ওয়াজেব, কিন্তু যাকাত আদায় করার পর তা আর ওয়াজেব থাকে না। অপরদিকে অলিদের আনুগত্য করা মৌলিক এবং অলঙ্ঘনীয় ওয়াজেব, ফরজের চেয়েও অধিক গুরুত্ববহ। কারণ এরূপ স্থায়ী ওয়াজেব থেকেই ফরয ও অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম বের হয়। কারণ সার্বক্ষণিক ওয়াজেব কখনো অপসারিত হয় না। যেমন আল্লাহ্-রাসূল এবং অলিদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজেব, আর কিয়ামত পর্যন্তই এটা ওয়াজেব। এমনিভাবে প্রমাণিত মৌলিক ওয়াজেবসমূহ পালন করাও সার্বক্ষণিক ওয়াজেব।

মোটকথা, ফকির-অলিদের আনুগত্য করা ওয়াজেব। তাঁদের কোনো কাজ শরিয়ত বিরোধী মনে হলেও তা কেবল বাহ্যিক, কিন্তু অন্তর্নিহিত শরিয়ত বা আল্লাহ্ তা'য়ালার বিরোধী নয়। আহলে জাহেরগণ বাহ্যিক শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল। অথচ দৃশ্যত যা বৈধ ও ভালো মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা বিপরীতও হয়। উদাহরণস্বরূপ, রক্ত এবং মণি প্রভৃতি বাহ্যতঃ অপবিত্র। কিন্তু অন্তঃসারের বিচারে পবিত্র। কারণ উহা দ্বারা পবিত্র মানুষ সৃষ্টি হয়। অনুরূপ যে কোনো অবস্থাতেই স্ত্রী সঙ্গম বৈধ এবং কারও কাছে বললে গালির মতো শোনায়। আল্লাহ্‌র অলিদের কাজকেও এভাবেই বিচার করতে হবে।

হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনা গভীরভাবে চিন্তা করুন। সংক্ষেপে তা হল এই যে, হযরত খিজির (আঃ) সতর্কতামূলকভাবে হযরত মূসা (আঃ)-কে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে, আমার কোনো কাজে আপনি আপত্তি করবেন না। যদি করেন তাহলে আমার থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আমি অবশ্যই এ কথায় বহাল থাকব। অতঃপর হযরত খিজির (আঃ)

নদীর তীরে গেলেন। সেখান থেকে মালিকের অনুমতি ছাড়াই একটি নৌকা নিয়ে নদী পার হলেন এবং পরে স্বীয় লাঠির আঘাতে নৌকাটি ভেঙে নদীতে ডুবিয়ে দিলেন। হযরত মূসা (আঃ) দেখলেন এটা সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী কাজ। কারণ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিস নেওয়া অবৈধ। তদুপরি উহা ভেঙে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অদৃশ্য করে ফেলা হয়েছে। একই ঘটনায় তিন চারটি নিষিদ্ধ কর্ম বা হারাম কাজ হল, তাই হযরত মূসা (আঃ) আপত্তি উত্থাপন করলেন যে, আপনি এসব শরিয়তবিরোধী কাজ করেছেন। তখন হযরত খিজির (আঃ) বললেন, আমার কাছ থেকে আপনি এখনি বিদায় হোন। হযরত মূসা (আঃ) বিনীতভাবে অপরাধ ক্ষমা চাইলেন এবং কথা দিলেন, আর এমন হবে না। অতঃপর সেখান থেকে এগিয়ে পথে একটি ছেলেকে স্বীয় লাঠির আঘাতে খিজির (আঃ) মেরে ফেললেন। হযরত মূসা (আঃ) আবারও এতে আপত্তি করেন। নূরানী বক্ষ হযরত খিজির (আঃ) রেগে গিয়ে বললেন, আপনি আমার থেকে বিদায় হোন। হযরত মূসা (আঃ) আবারও ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। হযরত খিজির (আঃ) তাঁকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। পথে একটি ভাঙা দেয়াল পেয়ে দিনব্যাপী মেরামত করে দিলেন। এ কাজ কেউ তাঁকে করতেও বলেনি বা এজন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিকও পাননি। একান্ত স্বেচ্ছায় কাজটি করেছেন। মূসা (আঃ) আবার প্রতিবাদ করলেন, নূরানী বক্ষ হযরত খিজির (আঃ) তাঁকে আলাদা হতে বললেন, এবার আপনার বিদায়ের পালা। কারণ আমার কাজ আপনার অপছন্দ এবং আপনি গোপন জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে জাগতিক নবীর ধৈর্যও নেই। তখন হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, আপনি নৌকা ভাঙলেন, এর রহস্য কী? উত্তর দিলেন, জনৈক জালিম বাদশা আসছিল, সে নৌকার মাঝি-মাল্লা সকলকে ধরে নিয়ে যেত। তাই এটাকে ডুবিয়ে দিয়েছি যেন বেচারার নৌকা নিজেই পেয়ে যায় এবং এ নৌকা দ্বারা ঐ গরিবরা তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে। নাবালকটাকে হত্যা করার রহস্য হল ছেলেটা ডাকাত হত, তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দিত এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য হত। এজন্য আমি তাকে হত্যা করেছি। অতঃপর তার আর একটি ভগ্নি জন্মগ্রহণ করবে এবং তার আওলাদদের মধ্যে সত্তর জন নবী জন্ম নিবেন। আর দেয়াল মেরামতের মাধ্যমে আমি জনৈক অনাথকে সাহায্য করেছি। এ দেয়ালের নিচে তার পিতার অনেক সম্পদ লুকায়িত আছে। এ দেয়ালটি পড়ে গেলে সে সম্পদ অন্যে নিয়ে যেত। আক্ষেপ এ সব বিষয়ে আপনি মোটেই অবহিত নন এবং আপনার কোনো অদৃশ্য জ্ঞানও নেই। আপনি যদি আমার কাজে আপত্তি উত্থাপন না করতেন, তাহলে অনুরূপ হাজারও বিষয়ে আপনাকে শিক্ষা দিতাম।

এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, হযরত মূসা (আঃ) নবী হয়েও নিজের ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন এবং আপত্তি উত্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'য়ালা গোপন জ্ঞান শিক্ষার জন্য নূরানী বক্ষ হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি বাহ্যিক শরিয়তের অনুসরণ করেন এবং নূরানী বক্ষ

হযরত খিজির (আঃ)-এর কার্যাদি খারাপ ও দোষণীয় মনে করেন। তিনি এটা চিন্তাই করেননি যে, যেহেতু আল্লাহ্ আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন, সেহেতু তাঁর তাক্লীদ বা অনুসরণ করা আমার কর্তব্য এবং তাঁর সাথে বিরোধ করা অনুচিত। এজন্যই ফকির এবং অলিদের কোনো কাজ শরিয়তের ঘোর বিরোধী মনে হলেও, তাঁদের আনুগত্য করতে হবে। কারণ অলিদের হাত আল্লাহ্র হাতে স্থাপিত। আল্লাহ্ যা করান তা-ই তাঁরা করেন, যদিও দৃশ্যত তা আপত্তিকর মনে হয়। যেমন কোনো অলি দেখলেন যে কোনো ব্যক্তির ওপর অদৃশ্য বিপদ আসছে, তখন তিনি তার কিছু মালামাল তার অনুমতি ছাড়াই সরিয়ে নিলেন এবং যতদিন না তার বিপদ কেটে যায়, ততদিন তা নিজের কাছে রেখে দিলেন। এটা চুরি হবে না, বরং এটা হবে মালের মালিকের প্রতি দয়া প্রদর্শন। কারণ সে সময় সে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছিল। তার মালের কিছু অংশ অলি নেওয়ার বদৌলতে আল্লাহ্ তা নিরাপদে রেখেছেন। এভাবে আল্লাহ্র অনেক অলি সময় সময় দৃশ্যত শরিয়তবিরোধী বহু অপ্রয়োজনীয় কাজও করে থাকেন। কখনো লোকদের গালি দেন। এ গালিরও অর্থ আছে। সময় বিশেষে কাউকে লক্ষ করে গালি দিলেও আসলে বিপদ-আপদকেই গালি দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যাতে তার বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়। লক্ষণীয়, যে ভালো করতে চাচ্ছে, আমরা তাঁর দুর্নাম করছি। হযরত খিজির (আঃ) নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছেন, নৌকার মালিক দেখলে অবশ্যই তাঁকে চোর মনে করত। অনুরূপভাবে কোনো কোনো ফকির পতিতার ঘরে যাতায়াত করেন; কখনো কখনো মন্দিরেও যান। এতেও রহস্য আছে। এতে চতুর্দিকে প্রসারিত মূর্তির প্রভাব দমন হচ্ছে, অথবা অন্য রহস্যও আছে। আল্লাহ্র কোনো কোনো অলি নেংটি পরিধান করেন, এরও তাৎপর্য আছে। বিশেষত এর দ্বারা তাঁরা নিজের নফ্সকে লাঞ্ছিত করেন এবং এ লাঞ্ছনার বিনিময়ে অজস্র রহমত ও নেয়ামত লাভ হয়। স্মরণীয় যে, নেংটি পরিধান করা তথা গুপ্তাঙ্গ ঢাকা মালিকী মাজহাবে ফরজ। অথচ অলিদের মাজহাবে তো ফরজই নেই। কারণ তাওহীদপন্থী যখন তাওহীদের সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকেন, তখন বাহ্যিক শরিয়তের কোনো তোয়াক্কা থাকে না। 'আওয়ারিফ' এবং 'ফছুছ্' প্রভৃতি তাসাউফের কিতাব দ্রষ্টব্য। তবে আল্লাহ্র অলিগণ সব সময়ই মঙ্গল করে থাকেন। তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে আল্লাহ্র রহমত অবতীর্ণ হয়। হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ্র অলিগণ পানাহার ও কথা বলার সময় রহমত নাযিল হয়। অতএব তাঁদের সব কথাই রহমত মিশ্রিত। তাঁরা যদি কাউকে মারেনও তাও রহমত।

অলি দু প্রকার– মুতাসাওফিয়া এবং মালামাতিয়া। মুতাসাওফিয়াগণ কদাচিৎ ছাড়া কখনো বাহ্যিক শরিয়তের খেলাফ কিছু করেন না। কিন্তু মালামাতিয়াগণ দৃশ্যত শরিয়তের খেলাফ করেন। যেমন– নেংটি পরা অথবা উলঙ্গ থাকা ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ গাউস-কুতুব-আবদাল এবং উত্তম ব্যক্তিত্ব এদের থেকেই আবির্ভূত হন এবং এরাই পৃথিবীর হিতাকাঙ্ক্ষী।

আলমের বিবরণ

আলম একটি সুমহান স্থান। যাকে আলম-এ-মুতলাক বলা হয়। কোনো কোনো হিসেবে আলম দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন– আলম-এ-আমর এবং আলম-এ-খাল্ক। আবার কোনো হিসেবে আলম চার ভাগে বিভক্ত। যেমন– ১। নাসুত ২। মালাকুত ৩। যাবারুত ৪। লাহুত। অন্য হিসেবে আলম সাতটি– ৫। হাহুত ৬। ইয়াহুত ৭। বাহুত। আর কোনো হিসেবে নয়টি– ৮। আহুত এবং ৯। হামিদা। আবার কোনো হিসেবে আঠারোটি।

মোটকথা আলম-এ-মুতলাক-এর উৎসের প্রেক্ষিতে নামের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ আলম-এ-জাত অর্থাৎ আলম-এ-লাহুতের পরবর্তী স্তরসমূহ নিম্নক্রমে পরস্পর শাখা বিশেষ এবং উপরের আলম তথা হাকীকত-এ-জাত ঊর্ধ্বানুক্রমে একে অন্যের উৎস। কিন্তু এ জাতের শেষ নেই। এর পরিপূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এ জাতে যা কিছু রয়েছে, তা জানা এবং দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে নিজেকে জানতে পারে এবং দেখতে পায় তার পক্ষে সব কিছু জানা ও দেখা সম্ভব। কারণ সমগ্র বিশ্ব স্বীয় অজুদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অজুদ সমগ্র জগৎই অজুদ। আর জগতের মধ্যে অজুদই জগৎ। উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গে আগুন অন্বেষণ করে, সে তো আগুনের সাথে স্ফুলিঙ্গ এবং স্ফুলিঙ্গের সাথে আগুনও পেয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অজুদ এবং জগৎ একটাই। অজুদের বিচারে জগৎও অজুদ। আর অজুদকে জগতের প্রেক্ষিতে বিচার করলে অজুদও জগৎ। এটা যে জানে না, এমন লোকদের নিকট এসব কথা বলা না বলা সমান।

জগতের রূপ

জগৎ একটি হেকমতময় বীজ। এর মধ্যে ফল, ফুল, বৃক্ষ, মগজ ও তৈল সবই বর্তমান এমনকি তা আঠারো হাজার সৃষ্টির জন্ম-পরিসর। যেমন– একটা খোসার মধ্যে শত শত দানা আছে এবং প্রত্যেকটি দানার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারিত রয়েছে, আবার সে সবগুলো দানা রয়েছে একটি মাত্র সাধারণ স্থানে। অতএব এরা সব মিলে এক আবার একই সব। মৌলিক এবং অমৌলিক, এ প্রেক্ষিতে একের বহু হওয়া এবং বহু-এর এক হওয়া, একে অন্যের পরিপূরক এবং দৃশ্য জগতের মূল হল, আলম-এ-জাত তথা লাহুত। আবার আলম-এ-লাহুত এর মূলকে বলা হয় আলম-এ-হাহুত। অনুরূপভাবে আলম-এ-সিফাত অর্থাৎ, আলম-এ-যাবারুত এবং মালাকুত প্রভৃতিও মূলের শাখা-প্রশাখা মাত্র। অতএব, যা কিছু জগৎ মাঝে বিদ্যমান, তা সবই মানুষের মধ্যে বর্তমান। এ জন্যই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকেও চিনেছে।" কবর আযাব কথাটিরও এ একই অর্থ। অর্থাৎ কবরের বড় বড় সাপ বিচ্ছু প্রভৃতি সবই স্বীয় দেহের প্রজাতি। অর্থাৎ, স্বীয় দেহে বর্তমান বিষ থেকে বিভিন্ন ধরনের দংশনকারী জীব জন্মিবে এবং

তাকে দংশন করবে। মানুষের পেটে যেভাবে কৃমি জন্মগ্রহণ করে, সেভাবে মৃত দেহে নিজে নিজেই অনেক ধরনের পোকার জন্ম হয়। শাস্তি ও শান্তি উভয়ই স্বীয় অজুদ অর্থাৎ সত্তা তথা রুহানী সত্তা জাত। এ সময় তাদের মধ্যে রুহ্ প্রবিষ্ট করানো হলে ঐসব পোকার কারণে তাদের কষ্ট হবে। এ পোকা, সাপ, বিচ্ছু যা কিছুই হবে তা সৃষ্টির বাইরে নয়। ভালো হোক আর মন্দ হোক বীজ এটাই। যেমন, মানুষ যখন শয়তানি করে, তখন তাকে শয়তান বলা হয়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শয়তানি এবং কুকুরের স্বভাব দেখা গেলেই তাকে শয়তান বা কুকুর ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ কারণে হাশরের দিন অনেক লোক বানর ও শূকর প্রভৃতির আকৃতিতে কবর থেকে উত্থিত হবে। এর অর্থ হল, বহু আকৃতি-প্রকৃতির বীজ মানুষের স্ব-স্ব অজুদে তথা সত্তায় বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ মাটি থেকে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজি এবং জঙ্গল প্রভৃতি জন্মলাভ করে। মাটির সাথে সকল জিনিস ও প্রজাতির বীজ হিক্‌মত তথা বিজ্ঞানসম্মতভাবে একসঙ্গে মিশিয়ে উহাকে আটার রুটির মতো তৈরি করা হয়েছে। এ কারণে ভূমি সৃষ্টি করে কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত উহাতে বৃষ্টিপাত করা হয়। অতঃপর কয়েক হাজার বছর ধরে উহাকে শুকানো হয়। এভাবে বার বার এরকম করা হয়, ফলে সব জিনিসের বীজ পরিপক্ব হয়ে মাটির সাথে মিশে যায় এবং উহাতে শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। পানি থেকে পর্যায়ক্রমে ভূমির উৎপত্তি হয়েছে– কথাটির অর্থ ভিন্ন। এ কারণেই ভূ-পৃষ্ঠে নানা রকম বৃক্ষাদি, পাথর, রকমারি উদ্ভিদ এবং নানা শ্রেণীর জীবজন্তু জন্মগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকদিন আল্লাহ্ তা'য়ালা এগুলোকে সৃষ্টি করছেন না। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনো প্রজাতি থেকেই দূরে নন বা বিচ্ছিন্ন নন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ সকল বস্তুর সন্নিকটে। এর অর্থ হল, তিনি সত্তাগত জ্ঞানসূত্রে এসবের কাছাকাছি। কারণ সমস্ত বস্তুতেই অবশ্যম্ভাবীরূপে পরমসত্তা ব্যাপ্ত এবং এ সত্তার সাথে জ্ঞানও রয়েছে। এ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির কিছু লেখা না লেখা সমান।

সুতরাং ভূমিকে হেয় জ্ঞান করা কারও উচিত নয়। কারণ ভূমির উপাদান অনেক উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন এবং মৌলিক নূর ও সিজ্‌দার নূর দ্বারা ভূমি সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই গোটা ভূ-বিশ্বকেই আল্লাহ্ মসজিদ আখ্যা দিয়েছেন। এখানে স্বর্ণ-রৌপ্য-নবী-অলি এবং বিভিন্ন রকমের মূল্যবান প্রস্তরাদি জন্মে। এসব বিষয়ে পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে মাটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু দু একটি কারণেই নয়– সব দিক থেকেই মাটিকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন। পবিত্র জগতের সাথে মাটির কী সম্পর্ক– এটা যারা বলেন, তারা যদি এখানে মাটি দ্বারা ধুলোবালি এবং আবর্জনা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে ঠিক আছে। অন্য কিছু বুঝিয়ে থাকলে তা ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা মাটি থেকেই তাঁর বন্ধুদের সৃষ্টি করেছেন এবং এতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র নূর যুক্ত রয়েছে। এ মাটি সকল মাটির মানুষের কাছে মাতৃতুল্য পবিত্র। সুতরাং মাটিকে ভালোবাস এবং নিজেকে মাটির মতো করে গড়ে তোলো। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের পছন্দ করবেন।

মূল নাম ও তার সংক্ষিপ্ততার বর্ণনা

যে নামের মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার সমস্ত গুণাবলি এবং পূর্ণতা বিদ্যমান, তা আল্লাহ্‌র সত্তাগত বা মূল নাম। যথা 'আল্-ইলাহু' এর সংক্ষিপ্ত রূপ আল্লাহু। আল্লাহু-এর সংক্ষেপ হল 'হু'। 'হু'-এর সংক্ষেপ হল এর মর্মার্থ। মর্মার্থে কোনো শব্দ বা ধ্বনি নেই। কিন্তু হু-এর পেশ-এর স্থলে যের এবং যবরও ব্যবহৃত হয়। যেমন– হাঃ হিঃ হু। কোনো কোনো কিতাবে 'আল্লাহু' এর সংক্ষেপ 'আহ্'ও করা হয়েছে। আল্লাহু শব্দের প্রথম অক্ষর 'আলিফ' এবং শেষ অক্ষর 'হু'। এ উভয় অক্ষর মিলে যের, যবর ও পেশ সংযোজনে আহ্, ইহ্ এবং উহ্ গঠিত হয়। অনুরূপভাবে যে কোনো যিকিরের শব্দের সংক্ষেপায়নে কোনো দোষ নেই। যথা– 'নামাযে বেলায়েত'-এ উল্লেখ আছে যে, 'আল-ইলাহু' সংক্ষিপ্ত হয়ে 'ইল্' হয়েছে। অর্থাৎ হামজাতে যের আর লাম যযমের সাথে এসেছে। যিকির দ্বারা কখনো 'ইল্' এর হামজাকে হা-এ-হাউওয়াজ দ্বারা বদল করে হেল্ হেল্ শব্দে যিকির করে থাকেন। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক ধ্বনির মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম পাওয়া যায়। কারণ, এমন কোনো ধ্বনি নেই, যার মধ্যে 'হু' এর লেশ নেই; বরং সব ধ্বনির শেষে 'হু'-এর সংক্ষিপ্তরূপ অনিবার্য। অতএব, তাঁর নাম ব্যতীত কোনো শব্দ বা ধ্বনি নেই। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন, يسبح لله ما فى السموات وما فى الارض (ইউছাব্বিহু লিল্লাহি মাফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা-ফিল্ আরদি) অর্থাৎ, "আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করছে।" এর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক বস্তু এবং জীবের সাথেই মূল সত্তা সম্পৃক্ত। তাই রূপক নামের সাথে যিকির বৈধ এবং প্রচলিত আছে। যে কোনো আওয়াজের সাথেই আল্লাহ্‌র নাম রয়েছে। শেখ সাদী (রাঃ) বলেন,

"বাজিকিরাশ হরচে বিনি দর খোরাশাস্ত
ওয়ালী দানাদ্ দর ইঁ মা'না কেহ্ গোশ আস্ত।"

অর্থাৎ, অন্তরে যা থাকে, আওয়াজে তা-ই আসে। এ অর্থের প্রতি কান রেখে ধ্যান করলে, সব আওয়াজেই আল্লাহ্‌র নাম পাবে। আত্মিক শব্দে 'হু' ও আত্মিক-ই হবে। সব কথায় আল্লাহ্‌র নাম থাকাটা একটা জ্ঞান রহস্য। অনুরূপভাবে সকল কাজেও রহস্য আছে। যেমন– চোরের চুরির মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাজই সম্পন্ন হয়। কিন্তু রূপক অর্থে অপরাধী হয় চোর। যেমন– দাবা খেলার সময় কোনো গুটির চাল যদি ভুল হয়, তখন সে গুটিটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, যেন গুটিটিই অপরাধী। আল্লাহ্‌র কোনো কাজই নিরর্থক নয়। এর রহস্যের প্রেক্ষিতে সব কাজই ভালো। কটূক্তি কখনো দোয়াতুল্য হয়। যেমন, আল্লাহ্‌র অলিগণ কটূক্তির মাধ্যমে কোনো কোনো বিপদাপদ অপসারণ করে থাকেন। কোনো সময় চুরিও আশীর্বাদস্বরূপ হয়। সময় বিশেষে মাল চুরি হলে ভালো হয়। যেমন– হযরত খিজির (আঃ) নৌকা চুরি করাতে মালিকের উপকার হয়েছে। তবে মানুষের অপরাধী হওয়াটা ভাঙা অলংকার এবং অস্ত্রের মতো। খরিদ্দারের কাছে এগুলো

ভালো নয়। কিন্তু স্বর্ণকার এবং কামারের কাছে এগুলো ঠিকই আছে। কারণ এর দ্বারা অন্য জিনিস তৈরি হবে। তেমনি মন্দ কথা এবং অশ্লীল শব্দেরও একই অবস্থা। কেউ যখন কাউকে কোনো অশ্লীল কথা বলে, তাতেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকরী হয় এবং তারই নাম ও কাজ সম্পন্ন হয়। আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির মুখ দিয়ে কোনো বিশেষ সময়ে, যে সমস্ত কথা বলাবার ইচ্ছা করেন, তখন সে সব কথার একটি জগৎ সৃষ্টি করা হয়। আর সে অনুযায়ী ব্যক্তির মুখ থেকে তা নিঃসৃত হয়। যেমন– তাবিজে লিখিত অক্ষরসমূহের মান অনুযায়ী এর চালে পার্থক্য হয়। অর্থাৎ ঘোড়া অথবা হাতির চালের ওপর সংখ্যা নির্ধারিত হলে তাবিজের নক্‌শা এবং রহস্য ধরা পড়বে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক আওয়াজ, কাজ ও নামের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে গুণাগুণে তারতম্য হয়। অর্থাৎ বিশ্বে অলি, আবদাল এবং ফেরেশতাগণ সক্রিয় না থাকলে কোনো বস্তুই বহাল থাকত না। এমনি করে চার পদার্থের সমন্বয়ের বদৌলতে পৃথিবীতে সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে। তাছাড়াও ভালোমন্দ না থাকলে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। যেমন– তারকারাজির প্রভাবে দুনিয়ার সকল বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, জহল এবং বাহরাম এ-দুটি তারকা সবচেয়ে মন্দ। এদের প্রভাব অত্যন্ত খারাপ। অপরদিকে শাম্‌স ও কামার সবচেয়ে উত্তম। এদের প্রভাব ভালো। অনুরূপভাবে অনুমেয়।

সময় সম্পর্কেও এ-একই কথা বলা চলে। সময়ে ভালোমন্দের প্রভাবে পৃথিবীতে রোগ-সুখ, ভালো-মন্দ এবং চোর-ডাকাত ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। তবে এর দ্বারা ভারসাম্যও রক্ষিত হয়। যেমন– অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কোনো জিনিস জমাট বেঁধে যায়, আবার অতিরিক্ত গরমে তা শুকিয়ে যায়। তাই ঠাণ্ডা ও গরমের মাঝামাঝি অবস্থাটি-ই ভারসাম্য। অর্থাৎ পরিমাণের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা হলে, তাতে কিছুটা উষ্ণতা আনয়ন করাও ভারসাম্য এবং এটা এক প্রকার যাতনা। অনুরূপভাবে গরমকে ঠাণ্ডায় পরিবর্তন করাটাও তার জন্য শাস্তিস্বরূপ। এটার নামই দোযখ্ এবং আযাব। এ কারণেই মানুষ এবং জ্বিনকে আগুনের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। কারণ তারা সাধারণত পানি, মাটি এবং বাতাসের প্রতি অনুরক্ত এবং বসবাসও করছে মাটির ওপর। এ কারণে আগুন দ্বারাই তাদের ভারসাম্য রক্ষা হবে। কিন্তু সাগরের দ্বারা তা হবে না। অর্থাৎ আগুনের মধ্যে যে সব পোকার সৃষ্টি হয়, তারা আগুনকে ভয় পায় না; বরং পানিতে তাদের ভারসাম্য এবং শান্তি হবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টির পানি সর্বদাই ভালো; কিন্তু পরিমাণের চেয়ে অধিক বৃষ্টিপাত বিপজ্জনক। অনুরূপভাবে রৌদ্র ইত্যাদিরও একই অবস্থা। এজন্যই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– الانسان مركب بالخطاء وانسيان (আল ইনসানু মুরাক্কাবুন বিল খাতায়ি ওয়ান নিস্‌ইয়ানি) অর্থাৎ, মানুষ ভুল-ভ্রান্তির সমন্বয়ে গঠিত তথা ভালোমন্দসহই মানুষের বুনিয়াদ। তবে ভালোর বিজয়ী থাকাটা উত্তম। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ভালো করছে এবং মন্দ থেকে বিরত থাকছে এর অর্থ সে ভারসাম্য রক্ষা করে চলছে।

কোরানের সংক্ষিপ্ত রূপ

কোরান-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌র সংক্ষেপ হল 'বে'। আর 'বে' অক্ষরটির সংক্ষেপ হল উহার নোক্‌তা বা বিন্দু এবং বিন্দুর সংক্ষেপ হল মর্মার্থ। ফছুছ্ কিতাবে তাই রয়েছে। অতএব যে নোক্‌তা বা বিন্দুর মর্মার্থের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁর কাছে একটি নোক্‌তাই সম্পূর্ণ কোরান।

বিস্‌মিল্লাহ্‌র ছীন লম্বা হওয়ার কারণ

বিস্‌মিল্লাহ্ মূলত বি-ইস্‌মিল্লাহ্ ছিল। এ-'ইস্‌ম্' এর আলিফই 'তাওহীদ'। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ তাওহীদ তথা একত্ব প্রমাণিত হয়। শয়তান এটাকে চুরি করে সরিয়ে তদস্থলে বিস্‌মিল্লাহ্‌র 'সীন'-টাকে লম্বা করে দিয়েছে। নবী করীম (সঃ) যখন দেখলেন যে, শয়তান এটা করেছে, তখন এভাবেই রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য মানুষ যেন সর্বদা শয়তানের চুরির কথা স্মরণ রাখে। ফছুছ্ প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা হচ্ছে, সে যুগে শয়তান তাওহীদের আলিফ চুরি করেছিল, আর বর্তমানে মানুষ মিথ্যার জোরে তাওহীদকেই চুরি করছে। অর্থাৎ, তাওহীদের আলোচনা দুনিয়া থেকে উঠে যাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকাসহ বাংলার কোনো কোনো এলাকায় তাওহীদের আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত প্রায়। শয়তান তাওহীদের আলিফ চুরি করেছে আর কয়েকজন আদম সন্তান তাওহীদকে প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা তাওহীদকে তর্কবিতর্ক এবং লড়াইয়ের ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করছে।

আফসোস! কোনো কিতাব পড়ে বা কিতাবের অর্থ শুনে তাওহীদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা কি সম্ভব? অবশ্যই না। কোনো কোনো লোক লিখেছে যে, সাধকের ধ্যান 'আরশ' পর্যন্ত পৌঁছাই যথেষ্ট। এটাই মোরাকাবা এবং মোশাহেদা। আর দেশ ভ্রমণ অর্থও তাই। অর্থাৎ ধ্যানে 'আরশে' পৌঁছে গেলেই হল। দুঃখ হয়, এসব লোক যারা তাওহীদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান রাখে না, তারা পুস্তক পুস্তিকা লিখে বাঙালিদের কাছে সত্য পীর হয়ে গেল। এর কয়েকটি পুস্তিকার বিভিন্ন স্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র অলিদের কুৎসা করা হয়েছে এবং আলোচনা করা হয়েছে, কোন কোন দল ও সম্প্রদায় খারাপ এবং মন্দ। অলি-আল্লাহ্‌দের অন্যের কুৎসা করা কী প্রয়োজন ছিল? তাওহীদ প্রসঙ্গে ইল্‌মে তাওহীদই আলোচ্য। অন্যের কুৎসা রটনা কি বাঞ্ছনীয়?

এটাকে বলা হয় ইল্‌মে হুজুরী বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ইল্‌মে মোকাশিফা বা দিব্যজ্ঞান এবং ইল্‌মে রাজ বা গুপ্তজ্ঞান। এ জ্ঞান যার নেই এমন ব্যক্তি একত্ববাদীই নয়, আর হলেও তা রূপক। আর প্রকৃত বা আসলের মোকাবেলায় রূপক তুচ্ছ। রূপক হয়েও কেউ কেউ মাথা উঁচু করে চিৎকার করে বলছে, আমরাও একত্ববাদী,

কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র প্রতি যে, তিনি আমাদেরকেও তাওহীদবাদী করেছেন এবং ঈমান দিয়েছেন। সম্ভবত এ ধারণা থেকেই তারা বলে যে, সাধকের ধ্যান আরশ পর্যন্ত পৌঁছাই যথেষ্ট।

স্বপ্ন দেখার কারণ

স্বপ্নজগৎ একটি রূহানী পরিমণ্ডল। মানুষ নিদ্রামগ্ন হলে তার রূহানী দৃষ্টি ও অনুভব ক্ষমতা প্রসারিত হয়। তখন মূল রহস্যের লক্ষণাদি তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান রূহানী সত্তা বিভিন্ন স্থানে স্বীয় অস্তিত্ব প্রদর্শন করে। এর অর্থ এই যে, আগুনের মতো রূহ্ সর্বত্র বর্তমান। এ কারণেই হাজার হাজার লোক হাজার হাজার স্থানে একই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ করতে ও কথা বলতে পারেন, এতে কারও দ্বিমত নেই। রূহ্ সর্বত্র না থাকলে সব স্থানে কী করে একই মুহূর্তে দেখা সম্ভব হচ্ছে? রূহ্‌সমূহ এবং উহার উৎস যে সর্বত্র বিরাজমান 'নূরে হাকীকত' আলোচনা প্রসঙ্গে তা বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন-আপন হাকিকতসহ সর্বত্র বর্তমান এবং এক জায়গায় থেকে শত শত জায়গা স্বীয় আওতাধীনে পায়। অন্যথায় রূহ্‌সমূহের পক্ষে দৌড়িয়ে বিশ্ব ভ্রমণ কি সম্ভব? মোটেই না।

মোটকথা স্বপ্ন আপন নফ্‌সের একটি অবস্থা। সমগ্র জগতের সাথে তার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই যে জগতের সাথে নফ্‌সের সম্পর্ক অধিক, স্বপ্নে তাই প্রতিভাত হয়। আলম-এ নাসুত তথা সৃষ্টিজগতের সাথে সম্পর্কিত স্বপ্নকে দৈহিক স্বপ্ন বলা হয়। রূহ্ যখন স্বীয়দেহের নাছুতি অংশসহ সৃষ্টিজগতে ভ্রমণ করে, তখন সে অনেক অদ্ভুত এবং বিরল দৃশ্য দেখতে পায় ও দৃষ্টিগোচর হয় বহু রহস্য। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে এটা গোপন নয়। তবে সৃষ্টিজগৎ পর্দায় ঢাকা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখানে শয়তানের প্রবঞ্চনার এবং প্ররোচনার আশংকা সদা বিদ্যমান। এ-স্থানটা ভালোমন্দে মিশে রয়েছে। এ কারণে আহলে নাছুতগণ সত্য মিথ্যায় মিলিত থাকেন। তাই এখানের স্বপ্নও ভালোমন্দ মিশ্রিত। সুতরাং স্বপ্নের উপলব্ধি সব সময় সঠিক হতে পারে না এবং এর ফলাফল বিপরীত হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীদের অবস্থা এর বিপরীত। তারা যে স্বপ্ন দেখেন তা সঠিক হয়। কখনো যদি বিপরীত হয়, তার কারণ এই যে, সে সময়ে তিনি জাগতিকতার পর্দায় আচ্ছাদিত ছিলেন। তবে অলি আল্লাহ্‌গণ জাগতিকতার পর্দা থেকে মুক্ত। ঊর্ধ্বালোকে শয়তানের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানে শয়তানের প্রবেশাধিকার নেই। এ কারণেই উম্মতের আশ্রয় হযরত রাসূল (সঃ) বলেন যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশতম অংশ। কারণ সত্য স্বপ্ন পবিত্র জগতের অংশ বিশেষ। এটাকে নিদর্শন বিদ্যা ও অবস্থা শাস্ত্র বলা হয় এবং এটাই নবী অলিদের উত্তরাধিকার। তবে যিনি স্বপ্ন দেখেন এবং যাকে স্বপ্নে দেখেন তাদের নিজ নিজ অবস্থা বুঝে স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং অর্থ করতে হবে।

ভালো জিনিস স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যাও ভালো। তবে বিচার্য যে, স্বপ্নদ্রষ্টা কোন স্তরের ভালো মানুষ এবং কোন ধরনের বস্তু নিয়ে কাজ-কারবার করেন। তাই স্বপ্নদ্রষ্টার সে-সময়কার গুণাগুণ এবং অবস্থার আলোকে সে-স্বপ্নের ব্যাখ্যা হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পীর-অলি অথবা মুর্শেদকে স্বপ্নে দেখা ভালো এবং সন্তুষ্ট অবস্থায় দেখা আরও ভালো। কিন্তু অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত অবস্থায় দেখলে স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য কিছুটা ক্ষতিকর এবং হাত-পা পঙ্গু দেখাও অনুরূপ ক্ষতিকর। তবে এ ক্ষতি যাকে স্বপ্নে দেখা গেল তারও হতে পারে। কিন্তু এতে অস্পষ্টতা এবং রহস্যময়তা রয়েছে। তবে ক্ষতিটা স্বপ্নদ্রষ্টার হওয়ার আশংকাই অধিক। সুতরাং আপন মুর্শেদ এবং নবীদের বিকৃত চেহারা ও দুরবস্থায় দেখা স্বীয় অপরাধ। তাঁদেরকে সুন্দর চেহারায় এবং নূরুজ্জ্বলরূপে বা কোনো কারামতসহ দেখা উভয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সে স্তরের হয়, তাহলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিজের প্রতি প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় যাকে স্বপ্নে দেখা গেল, ব্যাখ্যা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যে কোনো অবস্থাতেই তা ভালো। অনুরূপভাবে কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে আকাশে উঠে গেছে, তাহলে তার অবস্থার আলোকেই এর অর্থ হবে। ঐ সময়ে সে যদি ভালো অবস্থায় থেকে থাকে, তাহলে এটা তাঁর বুজুর্গির লক্ষণ। অন্যথায় কিছু ক্ষতির পূর্বাভাস। যদি তার মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে থাকে, তাহলে সে মারা যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোনো যানবাহন তথা ঘোড়া, জাহাজ ইত্যাদি স্বপ্নে দেখে এবং স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু উভয়ের অবস্থা যদি ভালো মনে হয় অর্থাৎ যাত্রীর কোনো প্রকার কষ্ট অনুভূত না হয় এবং যানবাহনেও কোনো প্রকার ত্রুটি ভাঙা না থাকে বা উহাকে ডুবে যেতে না দেখে তাহলে ভালো, অন্যথায় বিপদের আশংকা রয়েছে।

অনুরূপভাবে স্বপ্নে দেখা বস্তুর ইঙ্গিতের আলোকে স্বপ্নের ফলাফল অনুমান করতে হবে। যেমন কোনো লোক যদি স্বপ্নে দেখে যে, কোনো বস্তু হারিয়ে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে কোনো দুর্ঘটনা আসন্ন। আর যদি স্বপ্নটা এর বিপরীত হয়, তাহলে বুঝতে হবে শুভ সংবাদ। এটা হল সংকেত বিদ্যা। যেমন– কেউ যদি স্বপ্নে পিঁপড়া, চিতা বাঘ অথবা কাক দেখে, তাহলে যেহেতু প্রতারণা এবং লোভ এদের স্বভাব, সেহেতু এ স্বপ্নের অর্থ হবে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার এ প্রকৃতির শত্রু রয়েছে। কেউ স্বপ্নে হিংস্র বাঘ দেখলে তার অর্থ তার বড় শত্রু আছে অথবা সে বড় ধরনের বিপদগ্রস্ত হবে অথবা তার মৃত্যু হবে। সে যদি স্বপ্নে দেখে যে, বাঘটি রোগাক্রান্ত বা দুর্বল বা তার অনুগত, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তার শত্রু দুর্বল হয়ে গেছে। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, বায়ু স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, এটা সর্বদাই ভালোর লক্ষণ। বায়ু মৃদু অবস্থায় দেখাও ভালো; কিন্তু ঝড় দেখা বিপদের লক্ষণ। এটাই হল 'মধ্যম পন্থা উত্তম' এর অর্থ। অনুরূপভাবে স্বপ্নে দেখা বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী স্বপ্নের ব্যাখ্যা হবে। যথা– কেউ যদি স্বপ্নে সাগর দেখে এবং দেখে তার পানি ভালো, তাতে কোনো ভয়ংকর তরঙ্গ নেই এবং তা পার

হওয়ার জন্য কোনো ব্যস্ততা নেই, তাহলে এটা তার প্রশান্ত চিত্তের লক্ষণ। তাতে যদি ভীতিপ্রদ কিছু দেখা যায়, তাহলে ঐ বস্তুর প্রকৃতির আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নির্ধারিত হবে।

কোনো কোনো স্বপ্ন উক্ত স্বপ্নের চেয়েও জটিল। এ স্বপ্নেও সংকেত থাকে, তবে তা বোঝা অধিক কষ্টকর। যেমন কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে তার মা অথবা বোনের সাথে সঙ্গম করছে অথবা মা বোন দেখল যে, আপন ছেলে বা বাপের সাথে সঙ্গম করছে, তাহলে বোঝা যাবে উভয় পক্ষেই আকর্ষণ বা দয়া রয়েছে। তবে উক্ত কর্মে অগ্রগামী পক্ষের অনুরাগ অধিকতর বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বিবি যুবায়দা (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত। তার অর্থ হল এই যে, বিবি যুবায়দা পবিত্র মক্কায় একটি জলাশয় বা নালা খনন করাবেন এবং তা দ্বারা সকল মানুষ এবং জীবজন্তু উপকৃত হবে। আর বিবি যুবায়দাও তা দ্বারা অনেক উপকৃত হবেন। কাজেই বোঝা গেল যে, স্বপ্নবিদ্যা একটি সাংকেতিকবিদ্যা। কিন্তু এতে সংকেতের মধ্যেও সংকেত থাকে। এর আলোকেই সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো নারী যদি স্বপ্নে দেখে যে, তার নাক অথবা হাত থেকে কোনো অলংকার খসে পড়েছে। এর অর্থ হল তার স্বামী থাকলে মারা যাবে অথবা তার কোনো সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে। তবে ঠিক সে পরিমাণ সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে, অলংকারে যে পরিমাণ ঔজ্জ্বল্য ছিল। এ সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক সুনামও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা মরে গেছেন, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ এটাই তার বিশ্বাস। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, নবী করীম (সঃ) মরে গেছেন, তাহলে তার ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। তার ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সংকেতবিদ্যা অন্যান্য বিদ্যার মতোই অন্যতম বিদ্যা। অনেক প্রকার সংকেতবিদ্যা আছে। যেমন– কেউ দৃশ্যমান গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে করতে সে নিজের মনোবাঞ্ছা উপলব্ধি করল। সে দেখতে পেল যে, পাতাগুলো মাথা নেড়ে সংকেত দিচ্ছে– এ কাজটা তোমার জন্য ভালো অথবা নিষেধ করছে। এমতাবস্থায় পাতার মাথা নাড়ার যে অর্থ গ্রহণ করা হবে, সে অনুযায়ীই তার ব্যাখ্যা হবে। প্রত্যেকটি ফুল-বৃক্ষ, জীব-জন্তু, চন্দ্র-সূর্য এবং মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতা একইভাবে বিচার্য। যদিও প্রকাশ্য চোখে দেখা শোনা বা শোঁকা যায় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি দিন, মাস এবং বছরেরও সংকেতবিদ্যা বা শরীর স্থান বিদ্যা রয়েছে। এমনিভাবে কোথাও যাত্রা পথে কোনো বস্তু দেখা বা কোনো বিশেষ শব্দ শোনারও ব্যাখ্যা রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোথাও যাত্রা করার সময়ে সুমধুর আওয়াজ শুনলে বলতেন এটা শুভ লক্ষণ।

তাছাড়াও রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা। এ বিদ্যা নবুয়তের সাথে সম্পর্কিত। হযরত দানিয়াল (আঃ)-এর ওপর জ্যোতির্বিদ্যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে এর কোনো কোনো অংশ বাতিল হয়ে গেছে আর কোনো কোনো অংশ আজও সকল ধর্মে

প্রচলিত রয়েছে। যেমন– দিন, সূর্যমাস, চন্দ্রমাস এবং বছর ইত্যাদি গণনা করা। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি নির্ধারণ করা এবং রবি, সোম ইত্যাকার দিন গণনা করা যা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ফরয। যে অজ্ঞ সম্প্রদায় সাধারণভাবে জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিকে হারাম এবং বাতিল বলছে, তারা ভুল বুঝেছে।

মুর্শিদের দৃষ্টি

মুর্শিদের দৃষ্টি কী রকম? হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– النظر شفاء (আননাজ্‌রু শিফাউন্) অর্থাৎ, দৃষ্টিতে আরোগ্য হয়। এর অর্থ শুভ দৃষ্টি। মুর্শিদকে দেখলে মৃত অন্তর সজীব হয় বা রোগাক্রান্ত অন্তর আরাম বোধ করে এবং চিন্তিত হৃদয়ের চিন্তা দূর হয়। মুর্শিদের আসল এবং প্রকৃত রূপ যে দেখে, সে মরে না। যেমন আজরাঈল (আঃ)-এর আসল রূপ যে দেখে, সে বাঁচে না। তবে এ দেখা কয়েক প্রকার হতে পারে, যেমন বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখা এবং অন্তর্দৃষ্টিতে বা ধ্যানে দেখা।

বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখার জন্য সামনা-সামনি হওয়া প্রয়োজন। ধ্যানে দেখার ব্যাপারে কাছে বা দূরে, অতি দূরেও কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এটা মুর্শিদের বৈশিষ্ট্য। তবে যার ধ্যানশক্তি উন্মোচিত হয়েছে, তাঁর জন্য মুর্শিদের রূপের ধ্যান একটা বিরাট নিয়ামত। এর ন্যূনতম উপকারিতা হল এই যে, এ ধ্যানে আপন মুর্শিদের সাহচর্যের উপকারিতা পাওয়া যায়। হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস (রঃ) বলেন, واذا غاب الشيخ عنه يخيل صورته فتفيد صورته ما تفيد صحبته (অ-ইজা গা-বাশশাইখু আন-হু ইয়াখিল্লু ছোরাতাহু ফাতাফিদু ছুরাতা-হু মা তাফিদু ছুহবাতা-হু) অর্থাৎ, মুর্শিদের অবর্তমানে মুর্শিদের রূপের ধ্যান মুরিদকে তাঁর সাহচর্যের উপকারিতা প্রদান করতে পারে। উল্লেখ্য, মুর্শিদের আসল রূপ আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সম্পর্কিত। নবী কারীম (সঃ) বলেন, من رأني فقد رأي الحق (মান রা-আনি ফাকাদ্ রা-আল হাক্কা) অর্থাৎ, যে আমাকে দেখেছে, বস্তুত সে আল্লাহ্‌কে দেখেছে। সুতরাং যে আল্লাহ্‌কে দেখেছে, সে আলমে লাহুত বা ঐশী জগতের অধিকারী হয়েছে। আর আলম-এ লাহুতে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। কারণ মৃত্যু রূহ-কে আলম-এ নাসুত বা বস্তুজগৎ থেকে আলমে মেছাল তথা অনুরূপ জগৎ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। এর উপরে তার প্রবেশাধিকার নেই। অতএব যে নশ্বর জগৎ অতিক্রম করে অমর জগতে প্রবেশ করেছে, তার আর মরণ নেই; বরং সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে যায়। এ জন্য আল্লাহ্‌র অলিগণ ছাড়া অন্যরা এ বিষয়টা বোঝে না। না বুঝে ভালো কথা, কিন্তু বিপদ এই যে, তারা এর ঘোর বিরোধী। অথচ এরাই তাদের পুস্তক-পুস্তিকায় লিখে যে, সাধক যখন স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তি করার মানসে ধ্যানে বসেন, তখন তিনি অনুভব করেন যে, একটি কামানের গোলা তার বক্ষভেদ করে চলে গেছে। ফলে তার বক্ষে যেন একটা সুড়ঙ্গ হয়ে গেছে। অতঃপর সাধক অনুভব করেন যে, ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গটি বড় হতে হতে গোটা

দেহটি সুরঙ্গের সাথে বিলীন হয়ে গেছে। অর্থাৎ, সুড়ঙ্গটা সমস্ত দেহে ছড়িয়ে গেছে। ফলে গোটা দেহটা সুড়ঙ্গের সাথে বিলীন হয়ে গেছে। এটার নামই ফানা বা আত্মবিলুপ্তি। এটা সাধকের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এখানে স্মরণীয় যে, মুর্শিদের রূপ আল্লাহ্‌র গুণাবলিতে পরিপূর্ণ। যার ধ্যানের মাধ্যমে শত সহস্র সংকেত ও গোপন রহস্য সম্পর্কে আলোক লাভ হয়। তাদের মতে, মুর্শিদের ধ্যান করা শির্‌ক ও হারাম। তাহলে ধ্যানে কামান, গোলা তথা লোহা কল্পনা করা কী করে পুণ্যের কাজ হয়? তদুপরি অনেক অমূলক চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে বিব্রত করা হয়। যেমন– ধ্যানে লোহা দ্বারা কামান ও গুলি তৈরি করা, তাতে বারুদ সংযুক্ত করা এবং আগুনের শক্তিতে গুলি সতেজ হওয়া। অতঃপর সে গুলি বক্ষে বিদ্ধ হওয়া আবার তা থেকে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হওয়া, ধীরে ধীরে সে সুড়ঙ্গ বড় হতে থাকা এবং পরিশেষে তাতে কাল্পনিকভাবে বিলীন হওয়া। অর্থাৎ মিথ্যামিথ্যিভাবে কল্পনায় ফানা বা বিলীন হওয়া।

মাওলানা রুমীর বাণী,

"খেয়ালাতে না-দানে খেলোয়াত নাশিন,
বাহাম বরকুনাদ্ আকেবাত্ কুফরওয়াদিন।"

তিনি আরও বলেন,

"কারে পাকান-রা-কিয়াস্ আজ খোদ্ মগির,
গারচে মান্‌দ বাশাদ দরনাবেশ্‌তান সেরও সীর।"

মোটকথা, এটাও তো ফানা নয়; বরং ফানার ওপর একটা অনুমানের বোঝা চাপানো। বলুন তো, ফানার সময় খেয়াল ও কল্পনাকে ফানা করতে হয় কি না? যদি ফানা করতেই হয়, তাহলে কলেমার আঘাতে কেন ফানা করা হচ্ছে না? লোহার শিবলিঙ্গের দ্বারা কী করে ফানা হবে? এটাতো ফানা নয়; বরং ফানা হওয়ার পথে বাধা। কারণ ফানায় স্বীয় দেহ ও ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে হয়। যাতে তাতে আর কখনো কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি সৃষ্টি না হয় এবং ইহজাগতিকতায় জড়িয়ে না যায়। ধ্যানে যে সুড়ঙ্গের কল্পনা করতে হয়, সেটা তো ইহজগৎ এবং এ স্থানেই। সুড়ঙ্গের মধ্যে যে স্থান অনুমিত হয়, তা আপন দেহের চেয়ে অনেক কঠিন। তার বিলোপ সাধনের জন্য কী ধরনের কামান প্রয়োজন? স্মরণীয় যে, আল্লাহ্‌র তাওহীদের ভিতর কোনো প্রকার অসত্যের প্রবেশাধিকার নেই। সেক্ষেত্রে এতসব অবাঞ্ছিত কল্পনা কী করে বৈধ হতে পারে? এবং এর দ্বারা কী করে তাওহীদ অর্জিত হতে পারে? অতএব তাওহীদের ক্ষেত্রে যাদের এরূপ চিন্তাভাবনা হতে পারে, উপবিষয়সমূহে অনুরূপ আচরণ করতে তারা কি কখনো ছাড়বে? মুর্শিদের ধ্যানের যদি কোনো উপকারিতা ও প্রভাব না থাকে, তাহলে লোহার কি প্রভাব থাকতে পারে? লোহার কল্পনা কেন করতে হবে? মানসিক উপকারিতার জন্য, না আত্মিক উপকারিতার জন্য? অভ্যন্তরীণ উপকারিতার জন্য, না বাহ্যিক উপকারিতার জন্য, না মানবিক উপকারিতার জন্য? তাতে মৌল রশ্মি,

না রূপক রশ্মি কোন্‌টা আছে যে, তার ধ্যান বা কল্পনা করতে হবে? অথচ যে মুর্শিদের ভিতর উক্ত সমস্ত গুণাবলি বিদ্যমান, তিনি দূরে থাকুন অথবা কাছে থাকুন, তাঁর বাহ্য রূপ কল্পনা করা হোক বা আসল রূপ, সর্বাবস্থায় যার দ্বারা প্রভাবিত বা উপকৃত হওয়া যায়, তার ধ্যান করা যাবে না কেন? মুর্শিদের যদি ধ্যান করা না যায়, তাহলে মুর্শিদ দ্বারা লাভ কী? কামানের কল্পনার সময় শয়তান যদি কামানের রূপ ধারণ করে, তাহলে কী হবে? এক গোলার আঘাতে সমস্ত ধ্বংস করে দেবে। কারণ শয়তান সব রূপ ধারণ করতে পারে, কিন্তু রাসূল (সঃ) এবং রাসূলের রূপে বিলীন ব্যক্তির রূপ ধারণ করতে পারে না। কারণ রাসূল (সঃ) এর রূপে বিলীন ব্যক্তির রূপ রাসূলেরই অনুরূপ এবং তিনিই পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর রূপও শয়তান ধারণ করতে পারে না। তাই হাদিস শরীফে আছে– يفر الشيطان من ظل عمر (ইয়া ফিররুশ শায়তানু মিন জিল্লি ওমর) অর্থাৎ, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ছায়া দেখলে শয়তান পালায়। সুতরাং মুর্শিদ না থাকলে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা নেই। الرفيق شم الطريق (আর রাফিকো ছুম্মাত্ তারিকো) অর্থাৎ, প্রথমে মুর্শিদ পরে সাধনা ও সিদ্ধি।

"চো খালিল আ-মদ খেয়াল ইয়ারে মান
ছোরতাস বুৎ মা'না আও বুৎ শেকান।"

যে ব্যক্তি মুর্শিদের ভিতরের রহস্য সম্পর্কে অবহিত নয়, সে মুর্শিদ সম্পর্কে কী জানবে? শুধু মুর্শিদের নাম লেখা এবং তাঁর পরিচয়নামা সঙ্গে রাখায় কী উপকার? তাঁর তরিকার নাম জপলেই তা হাসিল হবে না। আর অযথা বার বার নাম জপ করায় নাম বিলুপ্ত হয় মাত্র। এতে আরও কিছু আছে। কিন্তু মুর্শিদের মধ্যে যে মানবিক ফয়েজ বা উপকারিতা পাওয়া যায় তাতে দয়াময়ের মহান দান অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই মুর্শিদে বিলীন হওয়া বেলায়েতের প্রথম সোপান বা সিঁড়ি। মুর্শিদের মধ্যে মানবিক ফয়েজ না থাকলে মুর্শিদের কোনো প্রয়োজনই হত না। সুতরাং এ ফয়েজ বা প্রচুর কল্যাণ অর্জন করতে হলে ভক্তি, ভালোবাসা ও ধ্যান প্রয়োজন। ভালোবাসাহীন ভক্তি বা বিশ্বাসে তেজ নেই এবং স্মরণ ও ধ্যানহীন ভক্তি ভালোবাসা বিস্মৃতিরই নামান্তর। এ তিনটির সমন্বয় হলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং লক্ষ্য অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে ভক্তি যত বেশি হবে, ধ্যান ও অনুভব শক্তি তত বাড়বে। তবে যিনি অন্তর্দৃষ্টিবান, তাঁর ধ্যান হবে কাশ্‌ফ্ পদ্ধতিতে। আর যিনি অনুভূতিশীল বা অনুরূপ তাকে নিজের তরফ থেকে ধ্যান করতে হবে। তবে উভয় অবস্থাই ভালো। মুর্শিদের ধ্যান অর্থ এই যে, মুরিদ যখন আপন মুর্শিদের ফয়েজপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং বুঝতে পারবে, মুর্শিদের ফয়েজ অর্থ কি? তখন সাবধানী সাধক যখনই মুর্শিদকে স্মরণ করবে, তখনই সে আরও অধিক পরিমাণে ফয়েজ লাভ করবে। তার যিকিরের ক্ষমতা বাড়বে, তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে এবং সে তা উপলব্ধি করতে পারবে। যার এ অবস্থা লাভ হয়নি, সে ধ্যান এবং মুর্শিদের ফয়েজের অর্থ কখনো বুঝবে না। এ কারণেই ধ্যানের ব্যাপারে এদের আপত্তি বা বিরোধিতা।

ধ্যান বিরোধিরা ফয়েজ বা মুর্শিদের মহা দান এবং তাসাউফের অর্থ জিজ্ঞেস করে। বস্তুত তারা জানে যে, ফয়েজের আভিধানিক অর্থ পুরস্কার এবং সংবাদ প্রকাশিত হওয়া। আর তাসাউফ অর্থ কল্পনা বা ধ্যান। কিন্তু এরা এর মর্মার্থ বোঝে না। এ পর্যায়ে অনেক সাধকেরও ধ্যান সাধনায় দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। তারা মুর্শিদের ধ্যানে মুর্শিদের প্রকৃত রূপের ধ্যানও কল্পনা করতে পারছে না। তা হলেও মুর্শিদের ফয়েজ থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না। এ বিষয়ে সাধকদের কোনো প্রকার সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ যখন মুর্শিদের ফয়েজ লাভ হয় অর্থাৎ নিজের অবস্থাদি দ্বারা বুঝতে পারে যে, এ ফয়েজ মুর্শিদের তরফ থেকে প্রেরিত, তখন যদি মুর্শিদের ধ্যান না করা হয়, তাহলে সে ফয়েজ স্থায়ী হয় না। এটাও এক প্রকার ধ্যান। কেননা ধ্যান-ধারণা অনেক প্রকার। যেমন– আবেগের ধ্যান, কাশ্‌ফের ধ্যান এবং বিশ্বাস ও ভক্তির ধ্যান। কাশ্‌ফের ধ্যানে দেখতে হবে কাশ্‌ফের দৃষ্টি দিয়ে। আর আবেগের ধ্যানে দেখতে হবে আবেগের দৃষ্টি দিয়ে এবং ভক্তির ধ্যানে দেখতে হবে ভক্তির দৃষ্টি দিয়ে। এটাও ভালো; বরং এক হিসেবে মৌলিক। কারণ ভক্তির জোরে কাশ্‌ফ ও ধ্যান ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। ভক্তিমূলক ধ্যানশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট। কারণ যার কাশ্‌ফ এবং ধ্যানশক্তি আছে কিন্তু ভক্তি বা বিশ্বাস নেই, সে ব্যক্তি মৃত। কিন্তু যার কাশ্‌ফ এবং ধ্যান নেই, ভক্তি বা বিশ্বাস আছে, সে ব্যক্তি অকপট দ্বিধাহীন। কোনো কোনো সাধক বা শিষ্যের মধ্যে দ্বিধা এবং হতাশা সৃষ্টি হয়। তারা মুর্শিদ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে খারাপ ধারণা করে যে, মুর্শিদ বড় নিষ্ঠুর; হয়ত আমাদেরকে কিছুই দেবেন না। এটা খুবই খারাপ এবং বঞ্চিত হবার লক্ষণ। মোজাদ্দেদ (রঃ)-এর ভাষায়,

"আগার হোব্বে খোরদে লাহো সাকুক দারাদ্ দরিঁয়ে রাহ্
কদম মানদান হীচ সূদ্‌মান্‌দ নিস্ত।"

অর্থাৎ, "এ পথে দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কোনো কল্যাণ নেই।" এ ধরনের শিষ্যদের অবিলম্বে তওবা করা কর্তব্য। কারণ মুর্শিদের কৃপা লাভ করা উচিত, অসন্তুষ্টি নয়। এ ধরনের হতভাগ্য শিষ্য ব্যক্তিগতভাবেই অপদার্থ। তবুও মুর্শিদ তাকে সুনজরেই দেখেন এবং আশীর্বাদ করেন। বস্তুত সে শিষ্য কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই পাচ্ছে। সে যদি তওবা করে, তবে কুলক্ষণ কেটে যাবে।

কোনো কোনো সময়ে শিষ্যদের মধ্যে আবেগ প্রবণতা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, প্রেমের কারণেই এটা হয়। কারণ প্রেমিক বিচ্ছেদে স্থির থাকতে পারে না। কবির ভাষায়,

"হাফতে দরিয়া গর বানুশম তর নাকুনাম কামরা
শরবত দিদার বায়াদ্ তেশনায়ে দিদার রা"।

অর্থাৎ, "সাত সাগরের পানি পান করেও তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটে না।" নবী অলিদের এ রকম অবস্থা হয়। এটা ভালো। তবে আল্লাহ্‌র সত্তা অসীম বিধায় এ পর্যায়ে নিজেকে সংযত করা উচিত। তা না হলে দেওয়ানা বা মজ্জুব হয়ে যাওয়া

অসম্ভব নয়। কিন্তু দেওয়ানা এবং মজ্জুবদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ কুতুব ও আবদাল এবং উত্তম ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হন।

শরিয়ত ও ত্বরিকত এর পার্থক্য

জাহেরি শরিয়ত এবং বাতেনী শরিয়ত তথা ত্বরিকতের বিধিবিধানের মধ্যে রাত দিন এবং জীবিত ও মৃতের মতো বিরাট পার্থক্য। মৃতের বিধান হল দাফন কাফন। তবে এটা জীবিতদেরই কর্তব্য। জীবিতদের কোনো কাজে মৃতের শরীক হওয়ার ক্ষমতা নেই। অনুরূপভাবে ত্বরিকতপন্থীগণ জীবিত এবং শরিয়তপন্থীগণ ত্বরিকতপন্থীদের কাছে মৃত। কারণ প্রেমের বদৌলতেই চিরঞ্জীব হওয়া যায়। অতএব যেখানে প্রেম নেই, তাতো মৃতই। যেসব নবী অলি অনন্ত জীবন লাভ করেছেন, প্রেমের বদৌলতেই তা করেছেন। জাহেরি শরিয়তের অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র প্রেম সম্পর্কে অনবহিত। তাই তারা এ পথের বিরোধী। যাদের মস্তিষ্ক পুড়ে গেছে তারা না নিজেকে চিনতে পারছে, না আল্লাহ্‌র সাথে তাদের আত্মিক বা রূহানী কোনো সম্পর্ক আছে, কিভাবে তারা অনন্ত জীবন লাভ করবে?

সকল অলির নেতা হলেন আমাদের সর্বশেষ নবী। তাঁর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রেমময় বাণী শুনুন। (মেশকাত ও অন্যান্য) إرحمنى يا عأشة (ইরহামনি ইয়া আয়েশাতা) অর্থাৎ, হে আয়েশা আমার প্রতি সদয় হও। অর্থাৎ আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে, আমি মারা যাচ্ছি, তুমি আমার সাথে কথা বলো। তাহলে আমার অন্তরে আল্লাহ্‌র যে মহব্বত জমাট বেঁধে গেছে, তা বের হয়ে যাবে। কোনো কোনো সময় তাঁর উরুতে হাত রেখে পুনঃপুন এ কথা বলতেন। কখনো কখনো অস্থির অবস্থায় যখন তিনি আচ্ছন্ন থাকতেন, তখন পাহাড়ে উঠে যেতেন এবং লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হতেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে দ্রুত ধরে ফেলতেন এবং বলতেন, "অস্থির হবেন না, আপনি যা কামনা করছেন আল্লাহ্ আপনাকে তা দিবেন। আপনি আল্লাহকে পাবেন।" নবী রাসূলদের ব্যাপারে এরূপ শত শত ঘটনা রয়েছে। হাদিস শরীফেও এর সমর্থন রয়েছে।

স্মরণীয় যে, আত্মহত্যা করা বা আত্মহত্যার জন্য চেষ্টা করা শরিয়ত অনুযায়ী হারাম। তাহলে নবী হয়ে তিনি এ কাজ কী করে করলেন? 'শরহে মেশকাত' এবং 'এহ্‌ইয়াউল উলুম' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করলে এর মর্মার্থ জানা যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কান্নার অবস্থা চিন্তা করলে উক্ত আলোচনার অর্থ আরও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন চিৎকার করে কাঁদতেন এবং যিকির করতেন যে, দেড় ক্রোশ মতান্তরে তিন ক্রোশ দূর থেকে শোনা যেত। হযরত দাউদ (আঃ) এত বেশি অস্থির হয়ে যেতেন যে, তাঁকে শান্ত করার জন্য সদা দুজন লোক মজুদ থাকত। যেন কোথাও আঘাত পেয়ে কোনো প্রকার অঙ্গহানি না হয় বা মরে না

যান। 'এহ্ইয়াউল উলুম'-এর তাই রয়েছে। নবী-অলিদের অবস্থা এবং অজ্দ বা পরম প্রেমানন্দ অবস্থা সম্পর্কে লিখতে হলে গ্রন্থের পর গ্রন্থের প্রয়োজন। কোনো কোনো সাহাবি অজ্দ অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। একদা হযরত ওমর (রাঃ) অশ্বে আরোহিত ছিলেন। এমতাবস্থায় শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি পড়ছে– ان عذاب ربك لواقع ماله من داقع (ইন্না আযাবা রাব্বিকা লা ওয়াকেউন্ মা লাহু মিন্ দা-ফেই'ন্)। অর্থাৎ, তোমার প্রভুর শাস্তি অনিবার্য, এর কোনো প্রতিরোধক নেই। হযরত ওমর (রাঃ) একটি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান এবং লোকেরা তাঁকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেন। তিনি এক মাস অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। আবু হুরাইয়া তাবেয়ীর (রাঃ) সামনে ছলেহ্মারী কোরান থেকে পাঠ করেন। তিনি চিৎকার দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত ইমাম শাফী (রাঃ) জনৈক ক্বারীর কণ্ঠে– هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون (হাযা ইয়াওমু লাইয়ান্তি কুনা ওয়ালা ইউজানু লাহুম ফাইয়াঁ তাজিরুনা) এ আয়াত শুনে বেহুঁশ হয়ে যান। একদা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এশার নামায পড়ছিলেন। জনৈক ক্বারী পাঠ করেন, يومئذ يصد الناس أشتاتا ليروا اعمالهم (ইয়াওমা ইজিন্ ইয়াস্দুরুন্নাছু আশ্তা-তালিইউরাও আ'মালাহুম) এতে হযরত আবু হানীফা (রাঃ) বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সারা রাত কান্নাকাটি করেন। আহ্! আহ্! করতে থাকেন এবং বার বার আয়াতটি আওড়াতে থাকেন। এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে 'তোহ্ফায়ে বরযখী' এবং 'এহ্ইয়াউল উলুম' পাঠ করুন।

হযরত আবু তাইয়েবা (রাঃ) যখন নবী করীম (সঃ)-কে সিঙ্গা লাগান এবং টেনে বহিষ্কৃত রক্ত নিজে পান করেন, তখন রাসূল (সঃ) তাঁকে বলেন, তুমি বেহেশত পাবে এবং দোযখ থেকে বেঁচে গেছ। অথচ রক্ত পান করা হারাম। তা সত্ত্বেও রাসূল (সঃ) তাঁকে এ কাজের জন্য তওবা করালেন না; বরং এ রক্ত পান করাকে ভালো মনে করলেন। এটা সত্যিই বড় অদ্ভুত ব্যাপার। কারণ হযরত আবু তাইয়েবা অজ্দ তথা পরম প্রেমে নিমজ্জিত অবস্থায় রক্ত পান করেছেন। কিন্তু রাসূল (সঃ) তখন অজ্দ অবস্থায় ছিলেন না। অজ্দ অবস্থায় না থেকেও তিনি রক্ত পান করাকে ভালো মনে করেছেন এবং এ কারণে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। অতএব যে কেউ তাঁর উম্মত হলে আহলে অজ্দকে দোয়া ও সম্মান করবে।

অনুরূপভাবে জনৈক সাহাবি রাসূল (সঃ)-এর পেশাব পান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকেও দোয়া করেছেন যে, অর্থাৎ তুমি দোযখ থেকে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললে। অর্থাৎ তুমি আর দোযখে যাবে না। এমনিভাবে শরিয়তপন্থীগণ যা হারাম ও কুফর মনে করে এমন অনেক কাজও রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এর জবাব কী? দারাশিকো (রঃ)-এর 'রেসালা-এ-হাছানাতুল আরেফীন' প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, انا احمد بلاميم (আনা আহমাদু বেলামীম্)। আরও বলেছেন, আজ আমি আল্লাহ্কে যুবকরূপে মদিনার বাজারে দেখেছি। অন্যত্র বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দু হাত আমার কাঁধে

রাখেন এবং আমি এটার শীতলতা অনুভব করি। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, أنا أخذت العهد على الأرواح في الازل انامناد يهم الست بربكم آنا مخرج من القبور انا حي لايموت انا جاوزت بموسئ البحر وغر قت فرعون وجنوده انا ارسلت الجبال الشامخات فجرت العبون (আনা আখাযতুল আহ্দা আলাল আরওয়াহি ফিল আযালি আনামুনাদিহিম আলাসতু বিরাব্বিকুম? আনা মুখরিজুম মিনাল কুবুরি আনাহাইয়্যুন্ লা ইয়ামুতু। আনা জাওয়াজতু বিমুছাল বাহরা ওয়া গোরেকাত ফেরআউনু ওয়া জুনুদুহু আনা আরছালতুল জিবালাশ শামিখাতা ফাজারাতিল উ'বূন্।) বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) বলেন, سبحاني ماعظمشانى (সুবহানি মা আ'জাঁমু শানি) (কত উচ্চতর আমার সম্মান)। 'মাজহারুল আযায়েব'-এ এরূপ উল্লেখ আছে। হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর (রঃ) কথা অন্যত্র উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে– اني انا الله فاعبد وني (ইন্নি আনাল্লাহু ফা'বুদুনি)। হাসানাতুল আরেফিনে আরও উল্লেখ আছে যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে মুরিদ করুন, তিনি বললেন, বল– لا اله الا الله چشتى رسول الله (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু চিশ্তী রাসূলুল্লাহ্।) হযরত শাহ্ আলম (রঃ) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী? বলেন, মোহাম্মদ। তোমার বক্তব্য কী? বলেন, আল্লাহু আহাদ। জিজ্ঞাসা করেন, তোমার অবস্থা কী? উত্তর দেন, আল্লাহুস সামাদ। জিজ্ঞেস করেন, তোমার বৈশিষ্ট্য কী? উত্তর দেন, লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ। জিজ্ঞেস করেন, তোমার মর্যাদা কী? উত্তর দেন, অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

দ্বীনের আলোর বিবরণ

দ্বীনকে আলোকিত এবং হেফাজত করার জন্য দ্বীনকে সজীব করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আপন ঘরে বাতি প্রয়োজন। অর্থাৎ নিজের মধ্যে যে বাণী ও ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলা হয় এলহাম, কাশ্ফ এবং খাব বা স্বপ্ন। এগুলোকেই নবীদের হাদিস বা বাণী বলা হয়, যা কোরানের সমার্থক। এগুলোই উম্মতের জন্য দলিল। কিন্তু কেউ কেউ বাতেন অহিকেও হাদিস বলেছেন। মেশ্কাত প্রভৃতিতে তাই আছে। মোটকথা এর দ্বারাই উভয় জগতের সংস্কার ও বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। এ কারণেই উম্মতগণকে ভালোমন্দ সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশে সকল নবী নিজ নিজ উম্মতদের মধ্যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেন উম্মতগণ ভালোমন্দ বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। অর্থাৎ কোরান দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ এবং যা কোরানে উল্লেখ হয়নি, তাই হাদীস। এ থেকে দলিল গ্রহণ করা যায় এবং অর্জন করা যায় তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে পরম নিয়ামত এবং এটা বেলায়েতের বিষয়। নবী

করীম (সঃ) বলেন, آن في امني محدثين وان عمر منهم (ইন্না ফী উম্মতি মোহাদ্দিছিন ওয়াইন্না উমারু মিন্‌হুম্) অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন যারা এল্‌হাম প্রভৃতির মাধ্যমে সঠিক সংবাদ দিয়ে থাকেন এবং ওমর অবশ্যই তাঁদের অন্যতম। অর্থাৎ, আমার উম্মতদের মধ্যে হাদীস বলার লোক থাকবে, তাঁরা ভালোমন্দ কাজ সম্পর্কে অবহিত করবে এবং অতীত ও ভবিষ্যতের অদ্ভুত ঘটনাবলি সম্পর্কে সংবাদ দেবে। আর হযরত ওমর এদেরই একজন। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে যত হাদীস উচ্চারিত হয়েছে, তার এক-শতাংশ লিপিবদ্ধ করলেও কয়েক খণ্ড হবে। এসব এল্‌হামই সাধারণের জন্য দলিল। আর সন্ধানী ও সাধকদের জন্য মোজাদ্দেদিয়া, কলন্দরিয়া, ওয়াইছিয়া প্রভৃতি সব ত্বরিকাই এল্‌হাম ও কাশ্‌ফ দ্বারা প্রমাণিত। এসব ত্বরিকা ছাড়াও বিভিন্ন যুগে বহু ভালো কাজের প্রচলন হয়েছে। যেমন– হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানী এবং সে অতীত উম্মতের আযান স্বপ্নের দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপ, উম্মতের হাদীস দ্বারা বহু ভালো কাজ চালু হয়েছে। যেমন– কোরানে হরকত দেওয়া, ঈদগাহে মিম্বর নির্মাণ করা, মৌলুদশরীফ পাঠ করা, কেয়াম করা, ফাতেহা এবং নেয়াজ। অলিদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, প্রত্যেক কাজে এবং শিন্নী প্রভৃতি উপলক্ষে সুরা ফাতিহা পাঠ করে তা বিতরণ করা হয়, যেন বিপদ-আপদ দূর হয়, অর্জিত হয় সচ্ছলতা। সাধকদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য। এতে তাঁদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। অলিদের ইজ্‌মা বা ঐকমত্য দ্বারা ফাতিহা প্রমাণিত। আনোয়ারে সাতেয়া পাঠ করলে এ বিষয়ে আরও জানা যাবে। এ এল্‌হাম এবং স্বপ্নলব্ধ জ্ঞানই জগদ্বাসীর জন্য সুদৃঢ় প্রমাণ। একেই ইজ্‌মা বা প্রামাণ্য দলিল বলা হয়। উল্লেখ্য যে, কোরান এবং নবী করীম (সঃ)-এর হাদীস ছাড়া জাহেরপন্থীরা অন্যদের থেকে প্রমাণিত হাদীসকে প্রামাণ্য দলিল বলে না, অথচ তারা বিভিন্ন কিতাবাদির ওপর বিবেচনা করে যে সব দলিল রচনা করে, তাঁকে প্রামাণ্য দলিল বলে। বস্তুত অলি-আল্লাহ্ এবং সাধারণ মানুষেরও স্বপ্নে উপকার আছে। যেমন, ইস্তেখারা ও অনুরূপ বিষয়াবলি। তবে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সব স্বপ্নই সঠিক হয়। আর সাধারণ মানুষের কোনো কোনো স্বপ্ন সঠিক হয়। তবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এখনও হাদীস বর্ণনা করেন। অর্থাৎ, তাঁরা কাশ্‌ফ বা স্বপ্নে নবী কারীম (সঃ)-এর কাছ থেকে কোনো বিষয়ে সমাধান জেনে নেন এবং তাঁর জীবিত অবস্থার মতোই হাদীস বর্ণনা করেন এবং তা সঠিকই হয়। তাছাড়া বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল বলে বিবেচিত অনেক হাদীসই এভাবেই সুদৃঢ় এবং সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তো ঠিকই বলেছেন। কিন্তু দুর্বল মনে করা হয় শুধু বর্ণনাকারীর কারণে। যেমন– অন্ধের চাঁদ দেখা, অর্থাৎ আকাশে চৌদ্দ তারিখের চাঁদ কিন্তু চক্ষু নাই; কেউ বলে চার দিনের চাঁদ আবার কেউ বলে আদৌ কোনো চাঁদ উঠেনি। অনুরূপভাবে কেউ বলে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) দুর্বল হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। বস্তুত এসব লোক জানেই না যে, হাদীস দুর্বল নয়, বরং হাদীসের সূত্র

দুর্বল অথবা নিঃসন্দেহে নবী করীম (সঃ) এরূপই বলেছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কেউ যদি কারও কাছে শুনে ইয়াকুতকে বাজে বস্তু মনে করে, তাহলে কি কারও বলার জন্য তা সত্যিই বাজে বস্তু হয়ে যাবে? কখনো না।

রাজত্ব পতনের বিবরণ

ফকির-দরবেশদের ক্লেশ প্রদান এবং নবী-অলিদের হত্যা করার কারণে রাজত্বের পতন হয়, মর্যাদা বিনষ্ট হয় এবং হারিয়ে যায় শান্তি। অনুরূপ কারণ ছাড়া কখনো কোনো শক্তিশালী রাজত্ব ধ্বংস হয়নি অথবা অন্য কোনো বাদশাহ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার মতো বিপদে পড়েনি অথবা দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা দুর্যোগের শিকার হয়নি। হাদীস ও তাফসীর দ্বারা এটা প্রমাণিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্‌ফ এবং সংকেতবিদ্যার মাধ্যমে যা জানা যাচ্ছে, তাও এ বিষয়ে পারদর্শীদের কাছে অজানা নয়। কারণ, এ উভয় জগতের পরিচালনা ও কার্যাদি, যারা কাজ করে, তাদের ওপর নির্ভরশীল। যারা কাজ করে না, তাদের দ্বারা কোনো কাজ হয় না। ছোট বড় কোনো কাজই না। কম বেশির কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, বেশিও আরো বেশির তুলনায় কম এবং আরও কমের তুলনায় কমও বেশি। মোটকথা যে সব কর্মবাদী লোক উভয় জগতের ব্যবস্থাপনায় রত আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে তাঁরাই পছন্দনীয় এবং উত্তম। তাঁদের সুস্থ বুদ্ধির কল্যাণে আল্লাহ্ তাঁদের কাজকে পছন্দ ও গ্রহণ করেন এবং উক্ত ব্যবস্থাপকদের আকৃতি প্রকৃতির অনুরূপে জাগতিক বিষয়াদি সম্পাদিত হয়। যেমন– প্রদীপের কারণে ঘর আলোকিত হয় এবং পিতা-মাতার বর্তমানে সন্তানের সুখ-শান্তি হয়। অনুরূপভাবে ভালো বৃক্ষ এবং বাতাস ও পানির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা করুন।

নিয়ম আছে যে, ব্যাঙ বা সাপের মুখে মোতি প্রভৃতি জন্মে। আর মুখ থেকে তা হারিয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তা মারা যায় বা পাগল হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায় তার সরল গৌরব। তখন তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে অলি এবং আওতাদগণ হলেন, প্রত্যেক শহর বন্দরের ব্যবস্থাপক এবং রক্ষক। তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। এ অসন্তুষ্টির কারণে অবস্থা ও মর্যাদা পাল্টে যায়। ভালোর বদলে মন্দ ও অনিষ্ট সংগঠিত হয়। তবে যে কোনো লোক এ অলিদের চিনতে পারে না। এ কারণে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, الو لي تحت قبائ (আল্ ওয়ালীউ তাহ্‌তা কোব্বায়ী) অর্থাৎ, "অলিগণ আমার জোব্বার নিচে।" অর্থাৎ, তাঁদের চেনা দুষ্কর। কারণ তাঁদের চেহারা দুনিয়াদার এবং দোযখীদের মতোই কিন্তু চরিত্র আল্লাহ্‌র গুণাবলিতে পরিপূর্ণ।

"চু বায়তুল মুকাদ্দাস দারোঁ পরযেতাব
রাহা কর্‌দাহ্ দিওয়ারে বিরুঁ খারাব।"

অতএব, হে জগৎবাসী! সতর্ক হও এবং ভয় কর তাদেরকে। তোমাদের কাছে তিনি অবশ্যই একজন ব্যক্তি তোমাদেরই মতো অথবা দেখতে তোমাদের চেয়েও খারাপ অথবা তোমাদের চেয়ে ভালো। অথচ তোমরা জান না যে, চরিত্র এবং গুণাবলিতে তিনি তোমাদের চেয়ে ভালো।

শোনা যায় যে, যখন বাদশা আলমগীরের সময়ে হযরত শাহ সারমাস্ত (রঃ)-কে হত্যা করা হয়, তখন তিনি নিজের মাথা হাতে নিয়ে বলেছিলেন, তুমি অন্যায়ভাবে আমার মাথা কেটেছ, তোমার রাজত্ব ইংরেজদের সমর্পণ করা হল। আজ থেকে হিন্দুস্থানে মুসলমানদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ, রাজত্বের ব্যবস্থাপক ফিরিঙ্গিদের পক্ষে চলে গেলেন। তখন থেকে দিল্লির মর্যাদা ও সৌভাগ্য নষ্ট হতে শুরু হয়। অনুরূপভাবে যখন জাহেরপন্থীরা মুনসুর হাল্লাজ (রঃ)-কে শূলে চড়ান, তখন থেকে প্রকৃত জ্ঞান এবং এর মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যায়, জ্ঞানের একটা কল্পিতরূপ কেবল বাকি থাকল। এটাকেই আজ দুনিয়াবাসীগণ দ্বীন-ধর্ম মনে করছে। কারণ, যখন ধর্মের সার্থকতার কথা ভুলে যায় অথবা এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই থাকে না, তখন ন্যায়-অন্যায়ের বা ঠিক-বেঠিকের পার্থক্য বোধ কোত্থেকে আসবে?

হযরত মুনসুর (রঃ)-এর বাণীর কথা চিন্তা করুন। তিনি বললেন, 'আনাল হক্ক' আমি সত্য, অথবা আমি আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়ে গেছি। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন তাঁর মৌলরূপে সমুজ্জ্বল, তখন আমি তাঁর গুণের মধ্যে হারিয়ে গেলাম, আমার গুণাবলি তাঁর মধ্যে বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি উক্ত রূপোজ্জ্বল অবস্থায় রূপক অর্থে একথা বলেন, যা আল্লাহ্‌র শানের খেলাপ। অপরদিকে জাহেরপন্থীরা তাঁর কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তির রূপক ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে আলেম বা জ্ঞানী মনে করে। বস্তুত আলেম বা জ্ঞানী আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম। তাহলে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের সাথে সমতা দাবি করা কেমন করে বৈধ হবে? এ অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যখন পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানীদের ওপর চড়াও হয়, তখন এদের বিচার কে করবে? এতদ্‌সত্ত্বেও তারা অহংকার করে বলে যে, হযরত মুনসুর (রঃ)-কে হত্যা করায় দুটি পুণ্য হয়েছে। এ পুণ্য কি তারা নিজ হাতে তৈরি করেছে? তা না হলে তারা কী করে জানল যে, আল্লাহ্‌র অলিদের অবমাননা ও হত্যা করলে পুণ্য লাভ হয়? এ জন্য এ দলের লোকেরা হযরত মুনসুর (রঃ)-এর নাম বলার সময় শুধু মুনসুর বলে থাকে। এভাবে এরা বহু সাধক ও প্রেমিককে কষ্ট দিয়ে থাকে। বন্ধুগণ আশেক বা প্রেমিকদের রক্তকে যারা মেন্দি মনে করে, তাদের থেকে দূরে থাকো। অতএব শয়তান যাদের কাবু করে রেখেছে অথবা নফ্‌সের ফাঁদে যারা আবদ্ধ, কী করে তারা মুমিন হয়? কোনো মুমিনকে কাফির মনে করা ঈমানের পরিচয় নয়। কারণ ঈমান ও কুফরের মধ্যে বিরোধের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং যে মুমিনকে মুমিন মনে করে, সে মুমিন এবং যে মুমিনকে কাফির মনে করে সে নিজে কাফির। আর যদি কোনো

কাফির মুমিনকে মুমিন মনে করে, তাহলে এটা তার ভালোর লক্ষণ। অপরদিকে কোনো মুমিন যদি কাফিরকে নিকৃষ্ট কাফির মনে করে এবং সে দীর্ঘকাল কাফির থাকবে বলে ধরে নেয়, তাহলে এটা তার জন্য খুবই খারাপ। যেন বদ ধারণাটা নিজের ওপরই বর্তাতে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি নিজে ঈমানদার নয়, সে ব্যক্তি ঈমানদারকে চিনতেও পারে না। অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি দোযখে যায়, তাহলে সে কখনো বেহেস্ত পাবে না। আর যে ব্যক্তি বেহেশতের আশা রাখে অথচ দোযখের পথে চলে, সে দোযখে পৌঁছবে। কারণ অনারবের পথ দিয়ে আরব কী করে পৌঁছবে?

"তরসম নারসি বা কা'বা আয় আরাবী
কেঁ রাহ্ কেহ্ তু মিরুবি বেহ্ তুরকিস্তানিস্‌ত্।"

অতএব যার কোনো পথ জানা নেই, তার সকল দাবি মিথ্যা। কারণ যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, তা তো অজ্ঞাত। অজ্ঞাত বস্তুর খরিদ-বিক্রি অবৈধ। এমতাবস্থায় হাক্বিকত এবং মারেফতের বিষয় অজ্ঞতার অনুসরণ করা কী করে বৈধ হবে? যার অনুসরণ করা যায় না তার দাবি কী করে ভালো এবং বৈধ হয়?

"খেয়ালাত নাদানে খেলোয়াত নাশি
বাহাম বরজিন্দা আকেবাত কুফরোদিনা।"

সুতরাং বড়-ছোট নির্বিশেষে সকলের উচিত ভালো লোকদেরকে চেনার পদ্ধতি এবং তাদের কথায় নিহিত ইঙ্গিত ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের ধরনের বিষয়ের কোনো বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শিখে নেওয়া। যাতে করে অযথা উন্নাসিকতা ও বাড়াবাড়ির মতো কুফরির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসা যায় অতীত পাপ থেকে। আর মশগুল থাকতে পারে সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থনায় এবং যে যে অলি ও ফকির দরবেশের সাথে বেয়াদবি করা হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যে সব অলি-ফকির বাহ্যিক জিন্দেগীতে নেই তাদের জন্য সর্বদা দোয়া এবং ফাতিহা করতে থাকবে এবং শিন্নি বিতরণ করবে আর তাঁদের রূহানী ফায়েজের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের মঙ্গল করতে পারেন।

দ্বিতীয় কথা হল আউলিয়া কেরামগণ যেভাবে চলেন, ঠিক সেভাবেই তাদের প্রতি ইনসাফ করা ফরয। তাঁদের সাথে এর বিপরীত আচরণ করা হারাম এবং কুফর। তবে ত্বরিকতপন্থীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণকারীরও ত্বরিকতপন্থী হয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি লুদুনী (ঐশী) বক্তব্য এবং কৃতজ্ঞতাসূচক উক্তির মর্মার্থ অবগত হয়েছেন তথা হযরত মুনসুর (রঃ) এবং হযরত শামস্ তিব্‌রিয (রঃ)-এর সম্পর্কে যথার্থ ধারণা লাভ করেছেন এবং তা মেনে নিয়েছেন, সে আদেল বা ইনসাফকারী যুগ বাদশাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা উক্ত জ্ঞান দান করেন, যাতে করে আল্লাহ্‌র অলিগণ সুখে দুঃখে কিছুদিন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে পারেন।

সম্মানের বিবরণ

সম্মান প্রদর্শন করা একটি নফ্স তথা আত্মিক প্রতিক্রিয়া, যার উৎস সত্তা ও গুণ। অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের ভিতর মূলবস্তু হল আত্মিক প্রতিক্রিয়ার উৎস তথা মৌলিক সত্তা। অতএব কাকেও সম্মান প্রদর্শন করার ইচ্ছা হলে তার স্বরূপকে লক্ষ করে নিজের ভিতর একটি অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ আদি সত্তা থেকে আপন সত্তায় এবং গুণাবলি থেকে আপন গুণাবলিতে সে অনুভূতিকে বিকশিত করা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা আদম (আঃ)-কে আত্মিক প্রতিক্রিয়ার মর্যাদার ওপর সৃষ্টি করেছেন। তাই উক্ত মৌলিক বস্তুসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মিক প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত ও সতেজ করার উদ্দেশে সম্মানসূচক সিজ্দার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইব্লিস উক্ত ক্রিয়াকে অস্বীকার করে সত্তার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হল। এ কারণেই আজ সে কাফির। এছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কেউ যদি কোনো একটি মূল বস্তুকে অস্বীকার করে, তাহলে সে তা থেকে দূরে সরে যায়। যেমন কোরানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজেব। তা সত্ত্বেও কেউ যদি কোরানের কোনো একটি সূরাকে সম্মানের যোগ্য মনে না করে, তাহলে তা প্রকৃতই বেয়াদবী হবে। কারণ কোরান খণ্ড বা সম্পূর্ণ সর্বাবস্থায়ই কোরান। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও নবী-অলি প্রমুখ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলির বাহ্যরূপ। তাহলে সাধারণতভাবে সম্মান প্রদর্শনের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হল। অর্থাৎ যাকে কথায় যেভাবেই সম্মান প্রদর্শন করা হোক না কেন, বস্তুত তা সবই আত্মিক প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ। যে আত্মিক প্রতিক্রিয়া বা আচরণে সত্তার পূর্ণতাসমূহ বর্তমান তা ফরযের চেয়ে অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত। যে সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে গুণাবলীর পূর্ণতা বর্তমান তা অবশ্যই ওয়াজেব বা সুন্নত বলে গণ্য হবে। যে সব লোক এ সুমহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত তারা মূলত আত্মিক সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। ইবলিস আদমের বিশ্লেষণে ব্যর্থ হওয়ার দরুন তার অস্বীকৃতির তলোয়ার নিজের ঘাড়েই পড়ল, সে কাফির এবং অভিশপ্ত হল। অনেক জ্ঞান এবং নৈকট্যের মর্যাদার অধিকারী হয়েও শয়তান আদমের বিশ্লেষণ বা রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তা জানার চেষ্টা করল না, বরং অস্বীকার করে মরদুদ হয়ে গেল। অতএব, আদম সন্তানদের উচিত আদমের সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে, মূল আদমকে সম্মান প্রদর্শন করা। তা না হলে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারাও ইবলিসের মতো অস্বীকার করার কারণে তারই দলভুক্ত হয়ে যাবে। সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য হল কৃপার বদলে কৃপা। অর্থাৎ, শুভেচ্ছার দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা পুনঃ পুরস্কার এবং সম্মান। আল্লাহ্ বলেন– هل جزاء اللاحسان إلا الإحسان (হাল জাযা উল ইহ্সানি ইল্লাল ইহ্সান) অর্থাৎ, "এটা প্রতিষ্ঠিত নিয়ামত। উভয় জগৎ এ নিয়ামতে সমৃদ্ধ।" এ নিয়ামতের বদৌলতে উভয় জগৎ সূর্যের মতো উজ্জ্বল। ছোট বড় সকলেই এর দ্বারা উপকৃত ও শাহেনশাহী দরবারে এ কাজ ফরযের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমির ও সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তিদের দরবারেও সম্মান প্রদর্শনের রীতি একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। যারা এ ইহ্সান বা সদাচরণ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের সম্পর্কে তো কোনো কথাই চলে না– هل جزاء اللاحسان إلا الإحسان (হাল জাযা উল ইহ্সানি ইল্লাল ইহ্সান) এর মর্মার্থে এটাও আছে যে, কেউ যদি সম্মান করে, তবে তাকেও সম্মান করতে হবে। এটা সালামের জবাব প্রদানের মতো। তৃতীয়ত ইহ্সান তথা সম্মান প্রদর্শন করার সময় দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিও অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ যদি সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়, তখন দ্বিতীয় পক্ষ সৌজন্যমূলকভাবে বলবে কষ্ট করবেন না, বসুন অথবা যা বলার বলবে। যদি পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হয় তাহলে সৌজন্যের খাতিরে বারবারই কষ্ট না করার জন্য বলবে। এটা হল পুনঃ পুনঃ সৌজন্য বা দয়া প্রদর্শন। এতে অবশ্যই অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ জন্য শেষ নবী (সঃ) সৌজন্যের খাতিরে কষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, তাজিম বা সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেননি।

তাজিম বা সম্মান প্রদর্শন দু প্রকার। বাহ্যিক এবং আন্তরিক বা যথার্থ। বাহ্যিক হল কারো সামনাসামনি সম্মান প্রদর্শন করা। দ্বিতীয় হল আন্তরিক। অর্থাৎ, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, তার অবর্তমানে অন্তরে যে আত্মিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে সম্মান দেখানো। এ সম্মান প্রদর্শন মানসিক বা আন্তরিক হলেও দেহে যখন মনের প্রকাশ ঘটে, তখন তা বাহ্যিক আকার ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে যথার্থতা প্রমাণিত হওয়ায় এটাকে অর্থের বাস্তব রূপ বলা হয়। কারণ, এতে উভয় সম্মান প্রদর্শন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উভয় প্রকার সম্মান প্রদর্শন পরস্পর সম্পর্কিত এবং বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করা সাধারণভাবে বৈধ। অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ, হাত, পা সহ শরীরের যে কোনো অঙ্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা বৈধ। আর এর দ্বারাই আদব ও সম্মান প্রদর্শনের রীতি সদা প্রচলিত আছে।

চক্ষু দিয়ে দেখা যায়, কর্ণ দিয়ে শোনা যায়, মুখ দিয়ে কারো নাম উচ্চারণ করা যায় এবং প্রশংসাও করা যায়, হাত দ্বারা লেনদেন করা যায়, প্রশংসা প্রভৃতি লেখা যায় এবং পা দ্বারা চলাফেরা ও উঠাবসা করা যায়। তবে কোনো সম্মানীয় ব্যক্তিত্বের সাথে শারীরিক সাক্ষাতে বা ধ্যান ও কাশ্ফের মাধ্যমে আত্মিক মোলাকাতের সময় এ দেখাশোনা, ওঠাবসা ও বলাবলি সবই সম্মানের সাথে করা যেতে পারে। এসব কার্য সম্পাদনের সময় সম্মান প্রদর্শনের প্রতি যত্নবান হওয়াতে কোনো প্রকার দোষ কল্পনাই করা যায় না; বরং আদবকারীর উপর সৌন্দর্য মাধুর্য সূর্যালোকের চেয়ে সুস্পষ্ট হয়।

এখন বাকি রইল জিদ ও বিরোধিতা। আর তা নিয়ে কোনো কথাই চলে না। এ জিদী সম্প্রদায় যদি কোরানের প্রত্যেকটি অক্ষরকেও অস্বীকার করার জেদ ধরে কে তাকে বাধা দেয়? কেউ কেউ তো কোরানের দু একটি অক্ষরের সাথে নিজেদের গোঁড়ামিকেও বৈধ করছে আবার কেউ তা করে বহু ক্ষেত্রে। যেমন এরা কোরান

পাঠে সর্বত্র 'দোয়াদ'-এর আরবি উচ্চারণরীতি অনুসারে দোয়াদ উচ্চারণ করে। কিন্তু সূরা ফাতিহার শেষাংশে 'অলাদ দোয়াল্লিন' এর 'দোয়াদ' কে হিন্দি পদ্ধতিতে 'জোয়াদ' উচ্চারণ করে। তাদের এ গোঁড়ামির কথা নামাজের মধ্যেও কি স্মরণ হয়?

ঈমানের বিশ্লেষণ

যে জিনিসের প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন, সে জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে ঈমান অর্জিত হয় না। ঈমানের দৃষ্টি দ্বারা তাকে দেখতে হবে, তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং অবহিত হতে হবে উহার রকমারি প্রকাশ সম্পর্কে। জানতে হবে আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর সাথে কিরূপে প্রকাশিত হন। এ প্রকাশ বাহ্যিকরূপে হতে পারে আবার অপ্রকাশ্যরূপেও হতে পারে। বস্তুত মৌলসত্তার জ্যোতি থেকে হতে পারে অথবা হতে পারে সে প্রকাশ কর্ম বা অবস্থার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে। যেভাবেই হোক না কেন, তাকে জানতে না পারলে ঈমান অর্জিত হয় না এবং তার মর্মার্থও বোঝা যায় না।

বস্তু মাত্রই আল্লাহ্র প্রকাশিত হবার আধার। আল্লাহ্ তাতে প্রকাশিত হন। তা উপলব্ধি করতে জ্ঞান বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে যায়। তাহলে এ বিমূঢ়তা থেকে বাঁচার উপায় কী? অথচ সকল বস্তুতে আল্লাহ্র প্রকাশ জরুরি এবং অবশ্যম্ভাবী। তবে প্রত্যেক বস্তুই আপন আপন গুণাবলিসহ বর্তমান। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি বস্তু আল্লাহ্র গুণাবলি সহকারে বিদ্যমান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, যে কোনো বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হন। যখন যে বস্তুর মধ্যে তিনি প্রকাশিত হন, তখন সে বস্তুর রূপ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার প্রকাশ সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরানে বলেন, সূরায়ে তোয়াহায়– هل آتك حديث موسى اذا رأى نارا (হাল আতাকা হাদীসু মূসা ইযা রায়া নারান) অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ তোমার কাছে কি মূসার সংবাদ পৌঁছেছে যখন সে আগুন দেখেছিল? فقال موسى لاهله امكثوا إني أنست نارا (ফাকালা মূসা লিআহ্লিহী ইম্কিছু ইন্নি আনাস্তু নারান) অর্থাৎ, তখন মূসা অনুগতদের বললেন যে, তোমরা এখানে দাঁড়াও অবশ্যই আমি আগুন দেখেছি।

لعلى آتك منها بقبس او اجد علىالنار هدى (লায়াল্লা আতাকা মিনহা বিক্বাবাছিন আও আজিদু আলান নারি হুদা) অর্থাৎ, সম্ভবত আমি আগুন থেকে পথের সন্ধান পাব। فلما اتها نودي ياموسى اني آنا ربك فاخلع نعليك انك بالوا دا لمقدس طوى (ফালাম্মা আতাহা নূদিয়া ইয়া মূসা ইন্নি আনা রাব্বুকা ফাখলা'আ না' আলাইকা ইন্নাকা বিলওয়াদিল মুকাদ্দাসি ত্বাওয়া) অর্থাৎ, অতঃপর যখন আগুনের কাছে এল, আওয়াজ এল, হে মূসা! আমি তোমার প্রভু, তোমার পা থেকে জুতা খোলো, অবশ্যই তুমি পবিত্র ও কল্যাণকর ময়দানে রয়েছ। وآنا اخترتك فاسمع لمايوحي أنى انا الله لا اله الا آنا فاعبدنى (ওয়ানাআখতারতুকা ফাছমায়া লাম্মা ইউহা ইন্নানি আনাল্লাহু লাইলাহা ইল্লা আনা

ফা' বুদুনি) অর্থাৎ, আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, তোমার প্রতি যে অহি অবতীর্ণ করা হয়, তা তুমি শোনো অবশ্যই আমি তোমার প্রভু, আমি ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই, তুমি আমার ইবাদত করো। আগুন মূসা (আঃ)-কে ডেকে বলল, হে মূসা! আমিই তোমার প্রভু! এখানে 'আগুন' অর্থ তো অন্যকিছু করা যায় না বস্তুত এটা আল্লাহ্র বহু ধরনের প্রকাশ রীতির একটি। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতে এবং রূপে তার সত্তা থেকে প্রকাশিত হয়। সুতরাং যে বা যে বস্তুতে তা প্রকাশিত হয়, তখন তারই আলোকে এবং বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়। আর যার সামনে প্রকাশিত হয়, তার জ্ঞান অনুযায়ী কথা বলে। মানুষের সামনে প্রকাশিত হলে মানুষ স্বীয় যোগ্যতার মাপকাঠিতে তা উপলব্ধি করে আর জীবজন্তু, জলীয়, বায়বীয়, আগ্নেয় বা মৃত্তিকা বস্তুতে প্রকাশিত হলে তারাও নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সে প্রকাশ সম্পর্কে জানতে পারে। তবে সত্যের প্রকাশ সদা সত্য হয় এবং প্রত্যেক প্রকাশের ফলাফলের প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উভয় জগৎ হৃষ্টপুষ্ট হয়। তারই ফলশ্রুতিতে কল্যাণ ও অকল্যাণ জগৎময় বিস্তার লাভ করে। কারণ হযরত মূসা (আঃ)-এর সামনে প্রকাশিত আল্লাহ্র আগ্নেয় রূপ অনেকটা সাদাটে ছিল। লালের মধ্যে এ সাদাটে অবস্থা শুভ লক্ষণ। এ কারণে ঘটনাটি যে স্থানে সংঘটিত হয়, তাকে আল্লাহ্ পবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। সময় বিশেষে এ প্রকাশ রঙহীনভাবেও সংঘটিত হয়। তবে এ রঙহীনতা এমন একটি মৌলিক বস্তু যা বহু রঙের সার। বস্তুত সে রঙ সমস্ত রঙের চেয়ে উত্তম। তাতে রঙহীনভাবে আল্লাহ্র প্রকাশ ঘটে। মোট কথা, আল্লাহ্র সত্তা কোনো বিশেষ রঙ বা রূপে সীমিত নয়। আল্লাহ্ সমস্ত রঙ-রূপের উৎস যেখানেই যে রূপ দেখা যাক বা অনুভূত হোক না কেন, সবই তার থেকে। যেমন দোয়াতের কালি থেকে সমস্ত অক্ষরের সৃষ্টি, এমন কোনো অক্ষর বা বাক্য নেই যা দোয়াতের কালি থেকে সৃষ্টি হয় না। রাম অথবা রহিম বাক্য অথবা হ্যাঁ-বাচক অথবা না-বাচক সবই দোয়াতের কালি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। তাই কালি এবং কালির জ্ঞান প্রমাণের জন্য অপর দোয়াত এবং প্রকৃত বা মৌলিক কালির প্রয়োজন।

অতএব যেহেতু একটির জন্য অপর একটির প্রয়োজন হয়, সেহেতু যা প্রয়োজন তার অস্তিত্ব অনিবার্যরূপে জরুরি। সে অবশ্যম্ভাবী সত্তা তথা আল্লাহ্র অস্তিত্ব ছাড়া কোনো অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব নেই যার বদৌলতে অপর কোনো অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। ওয়াজেব অনিবার্য সত্তা বলতে সে আদি সত্তাকে বোঝায়, যা সকল বৈশিষ্ট্যের ও গুণের আধার। এটা সৃষ্টিগুণ। এ গুণের বদৌলতে সমস্ত সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এটাকে সৃষ্টি জ্যোতি বলা হয়। এ জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে প্রকাশ বৈশিষ্ট্য এবং শাব্দিক ভাষায় কথা বলা হয়েছে। বস্তুত তা ছিল একটি শ্বেত রঙের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু এটা প্রকাশের আধার। এ কারণেই অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া ব্যবহার করে ডাকা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যত তা আগুন হলেও বস্তুতপক্ষে তা জাত বা মৌল সত্তা। সকল বস্তুতে আবিষ্ট মৌলসত্তাই বস্তুর

অভ্যন্তরীণ সত্তা। আর সকল বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্তা আল্লাহ্‌র প্রকাশ সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ সকল বস্তুর অভ্যন্তরীণ রূপ এবং আল্লাহ্‌র অভ্যন্তরীণ রূপ সকল বস্তুর প্রকাশরূপ। তবে স্রষ্টার প্রকাশের আধার সৃষ্টি আর সৃষ্টির প্রকাশের উৎস স্রষ্টা। উদাহরণস্বরূপ বীজের মধ্যে লুপ্ত ও সুপ্ত বৃক্ষ বীজের অভ্যন্তরীণ রূপ। আর এখনও ফলন হয়নি এরূপ বৃক্ষের ফল ও বীজ উহার অভ্যন্তরীণ রূপ। তবে যে বস্তুর মাধ্যমে কোন বস্তু জন্মায় তা সে বস্তুর আধার। যেমন ডাল থেকে ফুল বের হয়। এখানে ডাল ফুলের প্রকাশস্থল। এ যা পার্থক্য। অন্যথায় বস্তুতপক্ষে কোনো কিছুই স্বয়ম্ভু সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই তো হযরত ওয়ালী উল্লাহ্ (রঃ) 'কাউলুল জামিল' এ লিখেছেন, চিশ্‌তিয়া মাশায়েখগণ বলেন, পীরের ফয়েজ লাভ করার প্রধান শর্ত হল মুহব্বত ও শ্রদ্ধার সাথে নিজের অন্তরকে মুর্শিদের সাথে যুক্ত ও জড়িয়ে রাখা এবং তার চেহারার ধ্যান করা। আমার কথা হল, আল্লাহ্‌র প্রকাশস্থল অসংখ্য। তাই কোনো আবেদ বিজ্ঞ বা বোকা হোক, তিনি তার সামনে প্রকাশিত হয়ে স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী তার মাবুদের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। এ কারণে কেবলামুখী হওয়া এবং আরশে অধিষ্ঠানের কথা শরিয়তে বৈধ। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তোমরা কেউ যখন নামায পড়, তখন সরাসরি নিজের সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। কারণ আল্লাহ্ তাঁর ও তাঁর কেবলার মাঝখানে থাকেন। অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা কোনো দিকে বা মধ্যে অবস্থান করা থেকে পবিত্র। তা সত্ত্বেও হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ কেবলা ও নামাজির মধ্যবর্তী স্থানে বর্তমান। অপর দিকে বাহ্যিক দৃষ্টিবানরা অনুমান করে লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌র দিকপাশ বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং রঙ রূপ কিছুই নেই। এখন লক্ষ্যণীয়, যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ এক এবং বস্তুত তা একটি জাত বা সত্তা, তখন এক বলার সঙ্গে সঙ্গে এর ছটি দিক তথা চার দিক এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ অবশ্যম্ভাবীরূপে আসে। এ ছয় দিক বাদে 'একের' অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। তাহলে এখানে আধার বা আধেয় তথা কোনো স্থানে আল্লাহ্‌র অবস্থান বোঝা যায়। এতে আল্লাহ্‌র সত্তার থেকে স্থান অধিক বড় বলে প্রমাণিত হয়। হাদীস শরীফের বক্তব্য যে, আল্লাহ্ কা'বা ও মুসল্লির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এতেও আধার ও আধেয় এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থাকা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। তাছাড়াও হাদীসে প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ্ আরশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং কিয়ামতে প্রেমিকরা তাঁর দিদার লাভ করবে। বস্তুত হাদীসে আল্লাহ্ তা'য়ালার অবস্থানের কথা উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অসীম শোভা সৌন্দর্য চাঁদ থেকেও উজ্জ্বলতর অনুভূত হবে। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন তাঁর প্রেমিকদের সামনে আপন হাঁটু প্রকাশ করবেন, তখন তাঁর প্রেমিকরা এর শোভা-সৌন্দর্য দেখে বেহুঁশ হয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌র এ উপমারূপ তাঁর প্রকাশ বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর কী? এ কারণেই সাদৃশ্যতাহেতু কিয়ামতের দিন মানব পদাংশ হাঁটু তাদের দেখাবেন।

কবর জিয়ারত প্রসঙ্গ

জিয়ারত অর্থ কবরস্থ ব্যক্তির সাথে রূহানী সাক্ষাৎ। মানুষের চিরন্তন রূহানী সম্পর্কটা কবরেও বর্তমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটি রূহ্‌সমূহের একটি জাত। রূহ্‌সমূহ জাতি সত্তায় সূক্ষ্ম প্রকৃতির। তাই যে কোনো জগতে তার বিচরণ সম্ভব। বস্তুত 'রূহ্' সৃষ্টি রহস্যের অন্যতম। তবে সকল রূহের চেতনা শক্তি এক নয়। উপলব্ধির ক্ষমতা অনুযায়ী উপলব্ধি ও বুদ্ধির তারতম্য হয়, সে অনুযায়ী জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু উপলব্ধির ক্ষমতা কম হোক বা বেশি হোক, যে কোনো সময় প্রকাশ পায় না। স্বীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে তা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কারণ স্বীয়সত্তায় লুপ্ত এবং অপ্রকাশিত বস্তুর জ্ঞান তার প্রকাশ লাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসে না। যে বুদ্ধির জোরে যে যে জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞানের শক্তিতে যে বস্তুর সৃষ্টি হয় তাকে মাখলুক বলা হয়। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রকাশ জ্ঞান সর্বোত্তম। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আল্লাহ্‌র উত্তম গুণাবলির অন্যতম প্রকাশ মর্যাদা আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য। তাই আল্লাহ্ বলেন, والله أحسن الخالقين (ওয়াল্লাহু আহ্‌সানুল খালিকিন)। মোট কথা কোনো বস্তুই মৃত নয়। পয়গাম্বর (আঃ)-দের বাণী এর প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমী মসনবীতে বলেন,

"খাক ও আব ও বাদ ও আতশ মোরদা আন্দ
বা আমান ওয়াতু অলিয়ে বা হক্ক জিন্দা আন্দ।"

অর্থাৎ, তোমার নিকট মৃত বস্তুও আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত। সুতরাং যে বস্তুর মধ্যে মৃত অবস্থায়ও জীবনী শক্তি বর্তমান থাকে, সে বস্তু ভিন্ন স্থানে চিরঞ্জীব। এ কারণে রূহ্‌সমূহকে আল্লাহ্‌র রহস্য বলা হয়। এ জন্যে সমস্ত জগতে রূহ্‌সমূহে প্রকাশ ব্যাপ্ত থাকে। কবরেতে ভালোভাবেই বর্তমান থাকে। কারণ কবর হল প্রকাশের দ্বিতীয় মাধ্যমের আরম্ভ। দুনিয়া হল রূহের প্রথম প্রকাশস্থল। আর পরলোক দ্বিতীয় স্তর। অর্থাৎ হাশর এবং কিয়ামতের প্রথম স্তর হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি কবশেওকত ও পূর্ণতার কাছাকাছি হল। কবরবাসীর প্রকাশের মর্যাদা এবং ইচ্ছা ও সত্তাগত পরিপূর্ণতা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ধরনের হয়ে থাকে এবং কবরবাসীর মানবীয় পর্দা থাকে না। অধিকন্তু বস্তুজগৎ তার কাছে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয় এবং وفى انفسكم أفلا تبصرون (ওয়াফি আনফুছিকুম আফালা তুবছিরুন) অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যেই রয়েছে তোমরা কি অবলোকন করতে পারছ? এ কথার মর্মার্থ তখন তার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যায়। অতএব উক্তরূপ অবস্থাসমূহে আল্লাহ্‌র অবস্থান মুখ্য বা প্রধান এবং বান্দা সেখানে গৌণ। তাই এ সময় তাঁদের নৈকট্যে ও আল্লাহ্‌র নৈকট্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ এখানে নৈকট্যের হেতু হল মৌল বস্তু। এজন্যই সরহে বরজখে বলা হয়েছে, إذا تحير تم فى الأمور فاستعينها باهل القبور (ইযা তা হাইয়ার তুমফিল উমরি ফাসতাইনুহাবি আহ্‌লিল

কুবুরী) অর্থাৎ, তোমরা যদি কোনো বিষয়ে হতাশ হয়ে যাও তাহলে কবরবাসীর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ, কবরবাসী এবং কবর জিয়ারতকারীর মধ্যে স্বাজাত্য বর্তমান। এ কারণে আল্লাহ্ ওয়ালাগণ কবর থেকে এমন ফয়েজ লাভ করে থাকেন, যা কেউ দেখেনি বা শোনেনি। এজন্য নবী করীম (সঃ) প্রত্যেক বছরের শুরুতে কবরস্থানে গমন করতেন। কবরবাসীদের সালাম প্রদান করতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন। কবরবাসীর সুখে তিনি সুখী হতেন আর তাদের দুঃখে তিনি দুঃখী হতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। তিনিও নূরানী কবরবাসীর দ্বারা আলোকিত হতেন। যেমন সুগন্ধী বস্তু অপরকে আনন্দিত করে এবং আলোকিত করে প্রদীপ অন্যদের। অনুরূপভাবে নবীগণ অন্যান্য নবী-অলিদের ফয়েজ ও নিয়ামত দান করেন এবং নবী-অলিদের কাছ থেকে ফয়েজ রহমত এবং বরকত লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, হযরত বারখ্ (রঃ)-এর কাছ থেকে হযরত মূসা (আঃ) আরাম লাভ করেন। এ ঘটনা 'এহ্ইয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে হাদীস শরীফের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবাদ আছে, "লাভ ছাড়া ব্যবসা নেই।" নবী-অলিদের কবরের ন্যায় তারা যে স্থানে বসেন তাতেও ফয়েজ ও উপকারিতা সদা বর্তমান। কবর ও বসার স্থানের পার্থক্য হল যে, কবরে তারা কবরস্থ আর বসার স্থানে তারা রূপক অর্থে বর্তমান। তবে ভিতরের বৈশিষ্ট্য এবং প্রভাব ক্ষমতায় উভয়ই পরিপূর্ণ। কবরের ন্যায় তাতে ফয়েজ ও রহমত বর্তমান। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ্র অলিদের তিন সময়ে রহমত অবতীর্ণ হয়। কথা বলার সময়, পানাহারের সময় এবং যে স্থানে বসে তারা আরাম করেন। কারণ তাঁদের বিশ্রামস্থল আল্লাহ্র স্মরণের জায়গা। আর সে জন্যই নূরময় কবর জগদ্বাসীর জন্য রহমতের স্থান। আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ ফেরেশতা ও রূহ সকল তাঁকে সদা সম্মান করে থাকেন। এ কারণে শহর গ্রামের সকল লোক নবী-অলিদের কবর ও বিশ্রামস্থলকে সম্মান করে আসছেন। এ সব মাজার থেকে অনেকেই ব্যক্তিগত উপকার এবং আত্মিক প্রেরণা লাভ করছে। যদিও অযোগ্য অধমরা এ রহস্যের বিরোধী। নিয়ম হল যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অজ্ঞ, সাধারণত সে ব্যক্তি ঐ বিষয়ে বিরোধী হয়ে থাকে এবং আশ্চর্য মনে করে। বিশেষ করে বাংলার কোনো কোনো অঞ্চল বিরোধিতার ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। এ কারণে তারা আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ্ যেন তাদের দৃষ্টিশক্তি দান করেন। সত্যানুসারীগণ কবর জিয়ারতের দ্বারা প্রথমত সফলতা, প্রভাব ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন লাভ করেন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা ঐশীজ্ঞান দ্বারা উপকৃত হন। অর্থাৎ, কবরস্থ ব্যক্তির কাছে পরিস্ফুট বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা জানতে পারেন। তৃতীয় পর্যায়ে তারা মহামিলনে কামিয়াবি অর্জন করেন, যার সাথে কবরবাসী পুরোপুরি সম্পৃক্ত। চতুর্থ পর্যায়ে তারা আল্লাহ্র মৌলগুণ তথা জ্ঞান যা বস্তুকে বেষ্টন করে আছে, সে সম্পর্কে অবহিত হন। এ কারণে সর্বদা নবী-অলিদের মাজারে ফেরেশতাগণ এবং রূহগণের নূর-উজ্জ্বলতা সক্রিয় থাকে, যেন এখান থেকে

আল্লাহ্র সৃষ্টিজগৎ বরকত লাভ করতে পারে। যোগ্য ব্যক্তিগণ এ সব মাজার থেকে নিজেদের জন্য বরকত সংগ্রহ করে থাকেন। দুনিয়াতে যার এতো উপকারিতা, তার পরকালীন উপকারিতা সম্পর্কে আর কী বলব? লক্ষ কর, তোমরা যদি বিচক্ষণ লোক হও দেখতে পাবে, অলিদের মাজারে আরও লাখো সম্পদ রয়েছে। প্রথমত, জাগতিক বিষয় এবং উপকারিতার কথাই ধর, এ দরবারে আল্লাহ্র তরফ থেকে কত রকমের খাদ্য ও সরঞ্জাম জমা হয় এবং তা দ্বারা আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবন ধারণ করে। এখানে বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন সদা বিতরণ হচ্ছে। আদব এবং সম্মান প্রদর্শনের কারণেই এ কল্যাণ লাভ হচ্ছে। আউলিয়ার মাজারে গম্বুজ ছাদ ও দেয়াল তৈরির দ্বারা আদব রক্ষিত হয়। গেলাফ এবং চাঁদোয়াতে শোভা বৃদ্ধি পায়। ঝাড় এবং পর্দা তার সৌন্দর্য বাড়ায়, ফুল এবং চন্দন তাতে সুগন্ধী ছড়ায়। এ সব কাজই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বর্তমানেও অনেক সাহাবি এবং নবী, অলি ও শহীদের মাজারে প্রাসাদ, গম্বুজ ও ছাদ নির্মিত আছে। আমাদের প্রমাণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। হুজুরে পুরনূর মহানবী (সঃ)-এর মাজারে প্রদীপ ও আলোবাতি সদা জ্বলছে। আমরা এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ আর কী চাই? যদি বলা হয় যে, এটা শুধু নবীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তাহলেও বিরোধ কোথায়? এটা যে শুধু নবীর জন্যই প্রযোজ্য বা বৈধ তা কি কোনো কিতাবে উল্লেখ আছে? এ বৈধতা যদি কেবল তাদের জন্যই হয়, তাহলে এর পক্ষে প্রমাণ থাকা প্রয়োজন ছিল। তাহলে কেন যারা নবী নন তাদের কবরে হাজারো গম্বুজ এবং ছাদ রয়েছে?

এসব মাজারে গম্বুজ ও প্রদীপ, বাতি না থাকলে আজ লোকে তাঁদের কিভাবে চিনত? এবং কিভাবে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত? এসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে কে সেখানে যেত? কেউ যদি আপত্তি করে বলে যে, ফেকার কিতাবে এসব বেদআত বলা হয়েছে। কারণ এগুলো নবী করীম (সঃ)-এর পর নতুনভাবে প্রচলিত হয়েছে। তার উত্তর হল, স্বয়ং ফেকার কিতাবগুলোও তো বেদআত। কারণ নবী করীম (সঃ)-এর পরে ফেকার কিতাবগুলোর নাম চালু হয়েছে। যথা– আলমগীরী, শরহে বেকায়া, হেদায়া, কাজী খান প্রভৃতি। এ সব কিতাবের নাম তো নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে রাখা হয়নি। তাই স্বয়ং নিজেরাইতো বেদআত। এরা অন্যকে কিভাবে বেদআত আখ্যা দিবে? এ বিষয়ে আরও বেশি বুঝতে হলে 'রওশনে দ্বীন' পাঠ করুন। তবে ফেকার কিতাবেও কবরে গম্বুজ এবং ছাদ তৈরি করা বা কবর পাকা করা বৈধ বলা হয়েছে। 'মাজমাউল বাহার'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে– وقد أباح السليف ان يبنى على قبو رامشائخ وا لعلما إلمشاهير ليزور هم الناس ويستر جونه بالجلوس فيه (অকাদ্ আবাহাছ সালিফু আই ইয়াবনা আলা কবুরীল মাসায়েখী ওয়া আল ওলামাইল মাশাহিরে লে ইয়াজুরু হুমুন নাছু ওইয়াস্তার জুনাহ বিল জুলুসি ফিহি) অর্থাৎ, পূর্বসুরিগণ বুজুর্গ এবং প্রখ্যাত আলেমদের কবর পাকা করাকে বৈধ মনে করেন, যাতে জনসাধারণ জিয়ারত করতে পারে এবং তাতে বসে শান্তি কামনা করতে পারে। 'রুহুল বয়ান'-এর লেখক

শায়েখ আব্দুল গণি নাবেলুসীর 'কাসফুনুর' থেকে উদ্ধৃত করেছেন, ان البدعة الحسنات المؤفقة المقصود الشرع يسمي مسنة فبناء القباب على قبورا لعلماء ولأولياء والصاحاء أمرجائز - اذا اكان القصد بذالك التعظيم فى عين العامة لا يتحقرا صحاب هذا القبر - (ইন্নাল বিদায়াতাল হাসানাতাল মোয়াফিকাতুল মাকসুদুস্ শরায়ে ইউসাম্মা মুসান্নাতুন ফা বানাউল কোবাবি আলা কুবুরিল ওলামায়ী ওয়াল আউলিয়ী ওয়াস সোলাহায়ী আমরুন্ জায়েজুন, ইযা কানাল কাছদু বিযালিকা তাজিমু ফি আইনিল্ আম্মাতি লা তাহ্কিরু আসহাবু হাযাল কুবুরে।) মোটকথা বেদ্আতে হাসানা তথা ভালো বেদ্আত নীতিগতভাবে শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জন্য একে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং আলিম, অলি এবং পুণ্যবানদের কবরে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে মিনার ও গম্বুজ নির্মাণ করা বৈধ। তবে সাধারণ কবরবাসীদের কোনো প্রকার অসম্মান করা যাবে না। যেহেতু নবী-অলিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজেব, সেহেতু এর অন্যথা করা হারাম। অপরদিকে তাঁদের মাজারে দেয়াল পাকা না করা হলে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অসম্ভব। এমতাবস্থায় এসব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং রাস্তা বা চারণভূমিতে পরিণত করা হারাম এবং নিষেধ হবে না কেন? বরং এটা হবে সে বুজুর্গের সাথে প্রকৃত দুশমনি। কারণ অনুরূপ অপমানজনক আচরণ করলে তাঁদের কষ্ট হবে। বস্তুত সম্মান প্রদর্শনের অর্থ ও উদ্দেশ্যই হল আরাম এবং শান্তি। আর বেয়াদবী হল এর বিপরীত। বেয়াদব ব্যক্তি কাফির, ফাসিক ও জাহেল হয়ে থাকে। ফরয ইবাদত অমান্যকারী কাফির। ওয়াজেব অমান্য করলে হয় ফাসিক। আর নফল অমান্যকারী হয় জাহেল। কিন্তু যে এ তিনটি কাজের মূল ও উৎস তার সাথে বেয়াদবী করা কুফরির চেয়েও খারাপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তিত্ব থেকে দ্বীন ও ঈমানের সৃষ্টি ও অর্জন হয়, তার সাথে বেয়াদবী করা কুফরির চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ। এজন্য আপন অলির সাথে বেয়াদবী করা তার জন্য অধঃপতনের আলামত। আর শত্রুতার বসে তা যদি করা হয়, তাহলে তা কুফরির চেয়েও জঘন্যতম। কারণ তাঁদের কাছ থেকে তার যে, নিয়ামত দ্বীন ও ঈমান লাভ হচ্ছিল তা তার আদব ও সম্মান প্রদর্শনেরই ফল। বেয়াদবী করার সাথে সাথে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। বেয়াদবী এবং বদআমল ছাড়া অন্য কিছুই হৃদয়ের ঈমানকে বাতিল করতে পারে না। কারণ বেয়াদবীর ফলে আন্তরিকতার মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছে– من عاد لولىفاذن له يحرب من الله ورسوله (মান আ'দালি ওয়ালিয়্যিন্ ফাউযযেনা লাহু ইয়্যাহ্রিবা মিনাল্লাহে ওয়ারাসূলিহি) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো অলির সাথে দুশমনি করে তাকে বলো, সে যেন আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। এজন্য আদব এবং কবরের আচার বিধি সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلعم ان يجلسا حدكم على جهرة فتحرق ثيابه فتخلص الي جلده خيرله من ان يجلس على قبر رواه مسلم (আন আবি হুরাইরাতা

(রাঃ) ক্বালা রাসূলাল্লাহি (সাঃ) আই ইয়াজলিসা আহাদুকুম আলা জাহ্রাতিন্ ফাতাহাররাকা ছিয়াবাহু ফাতাখ্লাসা ইলা জিলদিহী খাইরুল্লাহু মিন আইআজলিসা আলা কাবারিন্ রাওয়াহু মুসলিম) অর্থাৎ, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যদি আগুনের ফুল্কির উপর বসে আর সে আগুন যদি কাপড় পুড়ে চামড়া পর্যন্ত স্পর্শ করে তা ও কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম। অন্য হাদীসে আছে, "মৃতের হাড় ভাঙা জীবিত লোকের হাড় ভাঙার সমতুল্য।" এর দ্বারা মৃতের প্রতি আদব এবং সম্মান বোঝা যায়। এ কারণে কবরে পদচারণা নিষিদ্ধ। সুতরাং কবরের উপর বসা এবং উপর দিয়ে হাঁটা ও কবরকে চারণভূমিতে পরিণত করা নিষিদ্ধ, সেহেতু উহার হেফাজত করা আবশ্যক। এখন এ আবশ্যকতা ওয়াজেব বলে গণ্য হবে। কারণ আদবের প্রতিপাদ্য ওয়াজেব। বেষ্টনী ছাড়া কবরের আদব রক্ষা করা সম্ভব নয়। বেষ্টনীর জন্য দেয়াল প্রয়োজন। সুতরাং আল্লাহ্ওয়ালাগণ গম্বুজ ও দেয়ালযুক্ত মাকবারা বা সৌধ পছন্দ করেন। যেন বুজুর্গদের প্রতি সম্মান সদা বহাল থাকে।

কোনো কোনো জাহেরীপন্থী এ কাজ মাকরুহ লিখেছে। এর উদ্দেশ্য নিজের নাম জাহির করা অথবা অন্য কিছু। বর্তমানে জাহেল সম্প্রদায় যে মৃতকে কুকুরের মতো মাটিতে পুঁতে দেয় এবং তাতে বেড়া না থাকার দরুন পেশাব-পায়খানা করা হয়, এটা হারাম নয় তো কী? দাফনের সময় কবরের উপর খড়কুটো দিয়ে মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়। তার উপর মাদুর চাটাই লাগানো হারাম মনে করা হয়। আর দু-চার জন মিলে পা দিয়ে দাবিয়ে চলে যায়। এর চেয়ে জঘন্য আর কী আছে? অথচ সকল জীবিত ব্যক্তির উপর ওয়াজেব হল মৃত ব্যক্তির প্রতি আদব ও সম্মান দেখানো। এমনকি সর্বদা নবী-অলিদের মাজারে গমনাগমন করা। কারণ এটা রহমতের স্থান। সদা সেখানে উপহার উপঢৌকন পাঠাবে এবং সেখানে এসব বিতরণ করবে। এতে পরিপূর্ণ আত্মিক প্রতিক্রিয়া বর্তমান। নৈকট্যপ্রাপ্ত রূহসমূহ আহার ও বণ্টনে সীমাহীন সন্তুষ্ট হন। যদিও অজ্ঞ সম্প্রদায় এ কাজের বিরোধী তাতেও কোনো পরোয়া নেই। একজন অলি যদি সন্তুষ্ট হন, তাহলে শত মূর্খের কী পরোয়া? এসব বিষয় যদি প্রমাণ দেখতে হয়, তাহলে 'আনওয়ারে সাতেয়া' যাতে– মক্কা মোয়াজ্জেমা ও মদিনা মনোয়ারা এবং হিন্দুস্থানের বড় বড় আলেমগণ দরবেশ এবং আহ্লে বাতেনের দস্তখত ও মতামত রয়েছে দেখুন। বেশি লেখার প্রয়োজন নেই। যার অন্তর চক্ষু আছে সে নিজেই কবরের অবস্থা জেনে যাবে। তার জন্য কোনো দলিল প্রয়োজন নেই। অজ্ঞাত বস্তুর জন্য প্রমাণ প্রয়োজন হয়। জ্ঞাত বিষয়ে দলিল চাইতে হবে কেন? যেমন– স্বপ্ন দেখার দলিল কী? বস্তুত স্বপ্ন বাস্তবিক পক্ষে যে দেখে তার কাছে সত্য, যদিও এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে স্বাদেরও কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু স্বাদগ্রহীতা তা জানেন। সদাসর্বদা দলিলের দাবিতে অটল থাকা আর এর আলোচনায় নিজের অবস্থার কথা ভুলে যাওয়া গোমরাহি। দলিল প্রমাণের দাবি-দাওয়ায় নফ্স খুশি হয়। এজন্য যারা

দলিল প্রমাণের পিছনে লেগে থাকে সব সময় তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে এবং নফ্স মাওলার সন্ধানে নারাজ হয়। এ কারণে তার মধ্যে অশান্তি ও দুঃখ বিরাজ করে।

ইবাদতের তাগিদ ও গুরুত্ব

ইবাদতের তাগিদ, গুরুত্ব এবং ইবাদতের সমাপ্তি ও মারেফতের ফলাফল কোরানের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে– واعبد ربكحتى يا قيك اليقين (ওয়াবুদু রাব্বুকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াকিন) অর্থাৎ, "বিশ্বাস তথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর।" অর্থাৎ, যথার্থ বিশ্বাস বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করা পর্যন্তই কেবল ইবাদত দরকার। তারপর থেকে পরম সত্তার প্রকাশ প্রত্যক্ষণ শুরু হয়। যদিও এটা যথার্থ বর্ণনা নয় তবুও এ থেকে পরম সত্তার নিদর্শনাদি পরিলক্ষিত হতে থাকবে। কিন্তু বিশ্বাস হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর– এ কথা দ্বারা যদি সামগ্রিক বিশ্বাস বোঝানো হয়েছে বলে ধরা হয়, তাহলে বিশ্বাসের পূর্বে ইবাদতের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এটা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। এতে বোঝা যায়, অন্তরের বিশ্বাসের বিভাগ আছে। বিশ্বাসের বিভাগ সম্পর্কে কোরান ও অন্যান্যতেও উল্লেখ আছে। যথা– 'ইল্‌মুল ইয়াকিন' (জ্ঞানগত বিশ্বাস), 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুষ বিশ্বাস) ইত্যাদি। এ আইনুল ইয়াকিন চাক্ষুষ বিশ্বাসের বস্তুই উভয় বিশ্বাসের অধীনে ইবাদতকে বাধ্যতামূলক করেছে। এজন্যই এ ক্ষেত্রে আদেশমূলক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ না হলে ঈমান ছাড়াই ইবাদত হওয়া সাব্যস্ত হত। এ ইবাদতের সমাপ্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমান অর্জন পর্যন্ত সীমিত। আর এটাই 'হাক্কুল ইয়াকিন' বা যথার্থ বিশ্বাস।

ইয়াকিন বা বিশ্বাসের বিভাগ

ইয়াকিনের বা বিশ্বাসের বিভাগ কোরান দ্বারা প্রমাণিত। যেমন– ইল্‌মুল ইয়াকিন ও আইনুল ইয়াকিন প্রভৃতি। এ জন্য ইহ্‌সানের গ্রন্থসমূহে ইল্‌মুল ইয়াকিন, আইনুল ইয়াকিন, হাক্কুল ইয়াকিন প্রভৃতি বিভাগ দেখানো হয়েছে।

ইল্‌মুল ইয়াকিনের দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইল্‌মে আহ্‌ওয়াল তথা গুণগত অবস্থা সংক্রান্ত ইল্‌ম বা জ্ঞান। এ জ্ঞান দ্বারা কর্মের পরিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও প্রমাণ পাওয়া যায়। এ হল অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রথম সোপান। আইনুল ইয়াকিন হল এর দ্বিতীয় সোপান। সেটাও গুণাবলির মাধ্যমে অর্জিত হয়। এটা হল প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ আস্থার জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে গুণরশ্মির উৎসটা স্বয়ং ধ্যানের আওতায় আসে। হাক্কুল ইয়াকিনও গুণাবলি সংক্রান্ত। তবে এতে পরম সত্তার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা হয়। এটাই ইয়াকিন বা বিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়। এখান থেকেই তাওহীদ এবং মিলনের শুরু। এ স্তরে এসে আইনুল ইয়াকিনের এবং তার শাখা-প্রশাখা ও অবস্থাদি সব হারিয়ে যায় এবং পরমসত্তার অবস্থাদি প্রাধান্য লাভ করে। অর্থাৎ, যার

অনুরূপ বিশ্বাস লাভ হয় তথা অনুরূপ চাক্ষুষ জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম গুণাবলি এবং সত্তা পরম সত্তার মধ্যে ফানা তথা একাঙ্গীভূত হয়ে যায়। বস্তুত ইরফান তথা প্রত্যক্ষ (চাক্ষুষ) জ্ঞান অর্থ ফানার মধ্যে তথা বিলীনের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় কোনো ধ্যান-ধারণা অবশিষ্ট থাকলে মিলন ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। দৃঢ় বিশ্বাস যদিও ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বের বিষয় তাহলেও তাও গুণগত। বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ তাছদীক বা মনের স্বীকৃতি। প্রকাশিত বস্তু ও গুণাবলির পথ ধরে বিশ্বাস অন্তরে স্থান লাভ করে। তাওহীদের স্তরে অন্তরও ফানা হয়ে যায়। তাহলে বিশ্বাস ফানা না হয়ে থাকে কী করে? বিশ্বাস অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কেউ আল্লাহ্‌র অলি হতে পারে না।

যখন বিশ্বাসের আভিধানিক অর্থ তাছদিক তথা অন্তরের স্বীকৃতি আর এরপরও কোরান দ্বারা এর বিভাগ প্রমাণিত, তাহলে– واعبد ربكحتى يا قيك اليقين (ওয়াবুদু রাব্বুকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াকিন), (বিশ্বাস অর্জিত হওয়া পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত কর) দ্বারা যদি মৃত্যু বোঝানো হয়, তাহলে এতে বোঝা যায় যে, মৃত্যু বিশ্বাসের শেষ স্তর। মৃত্যু তো কাফির ও ফাসেকেরও হয়। তাহলে মৃত্যুর পর কিভাবে ইরফান তথা আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান হবে? তবে যদি এখানে রিপু ও প্রবৃত্তির ওপর বিজয় অর্জন এবং এগুলোর বিনাশ তথা এগুলোর মৃত্যু বোঝানো হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। কারণ প্রকারভেদসহ এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। واعبد ربك حتى ياتيك اليقين (ওয়াবুদু রাব্বুকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াকিন) উক্ত আয়াত দ্বারা মৃত্যু অর্থ করা হলে ইরফান তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। ইয়াকিন একটি সাধারণ শব্দ। মানুষ, জ্বিন এবং ফেরেশতা সকলের ক্ষেত্রেই এর অর্থ অভিন্ন। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'য়ালা ইয়াকিনের আওতার বাইরে বলে কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং উক্ত বাক্য দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ মিলনের স্তর বিশ্বাস অবিশ্বাসের অনেক ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ বান্দা যখন পরম সত্তায় একাঙ্গীভূত হয়ে যায়, তখন সে ঈমানের স্তর অতিক্রম করে চলে যায়, যাকে দ্বিতীয় বেলায়েত এবং রহস্যলোক পরিভ্রমণ বলা হয়।

উক্ত অর্থের কোনো কোনো বাস্তব রূপকে আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি বলা হয়। মোটকথা এর অর্থ রহস্যাবৃত রহস্য ও উৎপাদিত উৎসের অভিন্নতা। উল্লেখ্য, ইবাদত গুণগত পূর্ণতার ফল এবং ইরফান বা প্রত্যভিজ্ঞা হল জাত বা আদি সত্তা সংক্রান্ত। অতএব সত্তাগত ফল লাভের পর তা থেকে সরে গিয়ে গুণাবলির স্তরে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া কুফরি। এ জন্য হযরত গাউসে পাক (রঃ) বলেছেন, من اردا لعبادت بعدا لوصال فهو كافر (মান আরাদাল ইবাদাতা বা'দাল্ বিসালি ফাহুয়া কাফিরুন) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মিলনের পর ইবাদত করতে চায়, সে ব্যক্তি কাফির। যেমন– চাবি তালার ভিতর ঢুকে বেরিয়ে না এলে তা নষ্ট হয়ে যায়। তবে ইরফান এবং ইবাদত এর বাহ্যিক রূপ এবং ছবি একই রকম। যেমন– আবেদ, যাহেদ

এবং আরেফ প্রত্যেকেই যদি নামাজ আদায় করেন, এর বাহ্যিক রূপ এক ও অভিন্ন হলেও এর উদ্দেশ্য ও ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য আছে। এ কথার অর্থ এই যে, আরেফ তথা আল্লাহ্‌র অলিগণ নামাজ আদায় করেন না; বরং তাঁরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে নামাজ, রোযা প্রভৃতি সম্পাদন করেন; তবে আবেদগণ যেরূপ ত্রুটিপূর্ণভাবে নামাজ প্রভৃতি পড়ে থাকেন সেভাবে নয়। অর্থাৎ, আবেদের ইবাদত গুণ বর্ণনাত্মক আর আরেফের হল মূলের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন– আবেদ ও আরেফ উভয়ই আল্লাহ্ শব্দ বলেন, এখানে আবেদের বলাটার রূপ বর্ণনাত্মক, আর আরেফের হল মৌলসত্তা। এজন্যই সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, সকলের মুখ এক সমান নয়। এজন্য এহ্‌সান এর কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র অলিগণ যখন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করেন অথবা 'আল্লাহ্' বা 'হু' শব্দ উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ এবং প্রসারণ অনুভূত হয়। অর্থাৎ এক প্রকার ভয়ানক ইঙ্গিত ও গভীর সুখ অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অজ্ঞ এবং শিশু, তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে, উক্ত শব্দের মধ্যে এ প্রসারণটা কী ও কেন? বস্তুত এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে আবেদ ও আরেফ এর স্বাতন্ত্র্য পরিচয় বোঝা সম্ভব নয়।

সাধারণভাবে আবেদের নামাজ ইত্যাদি না গুণাবলির বিশ্লেষণাত্মক, না মৌলিক; বরং তাকলীদি তথা নিছক অনুকরণ। এর দ্বারা না শরিয়ত রক্ষিত হচ্ছে, না এহ্‌সানের দায়িত্ব পালন হচ্ছে। কারণ ঈমান এবং মূল ইবাদতের ক্ষেত্রে কারও তাকলীদ বৈধ নয়। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত আরেফের সামনে হালাল এবং হারামের দলিলাদি পেশ করাকে ভালো ও পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ব্যক্তি সালেক তথা সাধক হলেও আনাড়ি এবং অসিদ্ধ। কারণ আরেফের কাছে খুঁটিনাটি মাসলাগুলো শিশুদের আলিফ-বে-র মতো। তাদের কাছে যদি উপ-মূল বিষয়ের যৌক্তিকতা এবং উপকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় আল্লাহ্‌র অলিদের সাথে ঠুকাঠুকি করা কেবল হারামই নয়, বরং অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। লক্ষ করো, আশ্চর্যের কিছুই নেই, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, من يجادل فى الله بغير علم فهو يتبع كل شيطان مريد (মাই ইউ জাদিলু ফিল্লাহি বিগাইরি ইলমিন্ ফাহুয়া ইয়াত্তাবিয়ু কুল্লা শাইতায়ানিম মারিদ) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে না জেনে আল্লাহ্‌র বিষয়ে ঝগড়া করে, সে সকল অবাধ্য শয়তানের তাবেদারী করছে। অর্থাৎ, ফানা, বাকা, পরমসত্তা ও মৌলিকত্ব সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই, তার কোনো আরেফের সাথে ঝগড়া করার অর্থ শয়তানের তাবেদারী করা।

শরিয়তের নিক্তি

যে পরিমাপযন্ত্র বা নিক্তি নবী-অলিদের দিশারী তা প্রভু বৈশিষ্ট্যের প্রকাশিত ফল। যাকে নূরে হেদায়েত, বিশেষ অবস্থা প্রত্যক্ষণ, এল্‌হাম এবং সত্যস্বপ্ন প্রভৃতি বলা হয়। তা দ্বারা সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত হওয়া যায়। তা দ্বারা জানা যায়

যা জানবার এবং বোঝা যায় যা বুঝবার। অর্থাৎ, তা এক প্রকার নূর। তা দ্বারা চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ণের শ্রবণ ক্ষমতা প্রখরতা লাভ করে এবং এতে সকল ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞান হয়। এ কারণেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) যখন নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে অবতরণ করেন, তখন হযরত (সঃ) তাঁর লক্ষণ দেখে তাঁকে চিনে নেন এবং বিশ্বাস করেন। তাছাড়া কি প্রমাণ ছিল যে, তিনি জিবরাঈল (আঃ)? অর্থাৎ, আসমানী দূত যখন বললেন যে, আমি জিবরাঈল, তখন নূরে এল্‌হামী দ্বারা খবর পেয়ে তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে চিনে ফেলেন। এ নূর জন্মগত হলেও মুর্শিদের শিক্ষার ফলে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। তবে এর বিভিন্ন বিভাগ ও স্তরভেদ রয়েছে। তা ব্যক্তি বিশেষের প্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়। তাকে অবস্থা বিদ্যার ফল বা নিদর্শন বলা হয়। এটা কোনো দলিল বা প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়। এ প্রসঙ্গে জাহেরপন্থীগণ হযরত গাউসে আজম (রঃ)-এর সম্পর্কে একটি কাহিনী বলে থাকে। একদিন ইবলিস তার কাছে এসে বলে যে, আমি জিবরাঈল। আল্লাহ্ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি এতে আশ্চর্য হলেন এবং বললেন তুমি দাঁড়াও, আমি কিতাব দেখে নেই যে, শেষ নবীর পর কোনো লোকের নিকট জিবরাঈল আসবে কি না! তখন তিনি প্রকাশ্য দলিলাদি পড়ে জানলেন যে, যদি কেউ অনুরূপ বলে, তবে সে শয়তান। এটা দেখার পর তিনি নাউজুবিল্লাহি মিনহা বলতেই শয়তান পলায়ন করে। তখন তিনি বললেন, আজ আমাকে কিতাবী বিদ্যা রক্ষা করেছে। আমি যদি তা না জানতাম, তাহলে শয়তান আমাকে নষ্ট করে ফেলত। আক্ষেপ! ছি! এসব অসাড় কথাকে শরিয়ত মনে করা কী করে বৈধ হয়? চিন্তা করুন হযরত খিজির (আঃ) এসে যদি বলতেন যে, আমি খিজির, তাহলে তার ক্ষেত্রেও কি নাউযুবিল্লাহ্ পড়া হত? অথবা শয়তান এসে যদি বলত যে, আমি জোনায়েদ বাগদাদী বা শাইখ্ আকবর; তাহলে তিনি কোন কিতাব দেখে বলতেন, এটা শয়তান? এর উত্তর কী? এমনকি যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) শুভাগমন করতেন, তাহলে তাকে কিভাবে চিনতেন? এ ধরনের অসাড় কথাকে যে কিতাব মনে করে, সে কেন গোমরা বা পথভ্রষ্ট হবে না?

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে স্বপ্নে বা কাশ্‌ফের মাধ্যমে অথবা জাগ্রত অবস্থায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে নবী-অলিদের মধ্যে যে অবস্থা ও নূরে হেদায়েত সৃষ্টি হয়, তা দর্শকদের মনে এক চমক সৃষ্টি করে, যার ফলে তাদের মন গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে যে, এই ব্যক্তি রাসূল বা অলি হবেন। উপরন্তু এ নূরে হেদায়েতের বদৌলতে বান্দার পরলৌকিক সুসংবাদ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তবে অবিশ্বাসী এবং অপদার্থ ব্যক্তির ওপর নূরে হেদায়েত কোনো ক্রিয়া করে না। কারণ সূর্যের সামনাসামনি না হলে তার উপর সূর্যের প্রভাব পড়ে না। হে মূর্খ! নবী-অলিদের সত্তায় সাধারণভাবে যে নূরে হেদায়েত বর্তমান, তুমি কি তাও অস্বীকার করতে চাচ্ছ? এরপরও নিজেকে সাধু বলে বড়াই করছ? যদি তুমি অজ্ঞতাবশত এসব কথা বলে থাক, তাহলে সাবধান হয়ে যাও। আর যদি অবজ্ঞাভরে বলে থাক, তাহলে তুমি নূরে হেদায়েতের প্রতি

অবিশ্বাসী হলে। এখন চিন্তা কর, আসল দ্বীনকে অস্বীকার করা প্রকৃতই কুফরি কি না?

ধর্মের প্রহরী

ধর্ম প্রধানদের কয়েকটি শরিয়তের বিষয় সম্পর্কে যত্নবান হওয়া উচিত। অর্থাৎ, শরিয়তের সংজ্ঞা, তাহ্জীব, আদব, আখলাক, বিধি বিধান বা সীমা চৌহদ্দি, বিভাগ, উত্তম, অধম, প্রাধান্য এবং বাতিল প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী না হলে, সে ধর্মের প্রহরী হতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির হাতে ধর্মের নিক্তিকে সমর্পণ করা ধর্মকে বিনষ্ট করার শামিল। কারণ যে ব্যক্তি নিজেই অজ্ঞ সে কী করে ধর্মের ভালোমন্দ পরিমাপ করবে এবং আল্লাহ্র বাণী– الاتخسر الميزان (আলাতুখ্ছিরুল মিজান) অর্থাৎ, "ওজনে কম কোরো না" তারা কিভাবে পালন করবে?

কূপের মাস্আলা একটি অত্যন্ত ছোট বিষয়। কূপ যখন অপবিত্র হয়ে যায়, তাতে কী পরিমাণ পানি আছে, তা পরিমাপ করার জন্য এ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। সে কূপের পানি পবিত্র করতে হলে সে যে পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে বলে, সে-পরিমাণ পানি কূপ থেকে তুলে ফেলতে হয়। অথচ যে ব্যক্তি ইসলামের ওপর অপবাদ দেওয়ার পথ উন্মোচন করছে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, এটা কী করে বৈধ হতে পারে? হযরত সাদী (রঃ)-এর একটি উক্তিকে কোরানের অংশ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে,

"খেলাফে পয়গম্বর কিছিরাহ্ গুজীদ,
কে হরগেজ বা মনজিল না খাহেদ রাসীদ।"

অর্থাৎ, পয়গাম্বরের বিরোধী হলে, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, যারা কোরান ও হাদীসের বিরোধী, এখানে পয়গাম্বর বিরোধী বলতে তাদেরই বোঝানো হয়েছে। ধর্মপরায়ণ লোকেরা কি এর বিরোধী? যে ব্যক্তি ধর্মের সংজ্ঞা এবং এর বিধি বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে কিভাবে বুঝবে কে পয়গাম্বর বিরোধী? আরও উল্লেখ্য, নবীর বিরোধী সে রাস্তা কোনটি, যা অবলম্বন করলে লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে না এটা বলবে কি? যদি তা বলতে অক্ষম হয় এমন ব্যক্তিকে কে হিসেবে ধরে? আল্লাহ্র অলিদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হারাম; বরং বড় ধরনের হারাম। সুতরাং ধর্মপ্রধানদের উচিত এ ধরনের লোকদের ঝগড়া-বিবাদ করতে বারণ করা এবং তাদের সামনে এ ধরনের কথা না বলা যে, কোনো আল্লাহ্র অলির মধ্যে একটি চুল বরাবরও যদি শরিয়ত-বিরোধী কিছু দেখ, তাহলে তাকে ত্যাগ করবে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে যদিও সে বাতাসে উড়তে পারে, পানিতে চলতে পারে এবং বিচরণ করতে পারে আগুনের মধ্যে ইত্যাদি।

এটা কোন কিতাবে আছে যে, একটি চুল বরাবর ব্যতিক্রম দেখলেই আল্লাহ্র অলিকে ত্যাগ করতে হবে? বরং শরিয়তের কথা হল, কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মের শতকরা নিরানব্বইটা কাজই না করে, এবং কেবল একটা মাত্র কাজ করে, তাহলেও

তাকে ধর্মচ্যুত মনে করবে না। অপরদিকে নবুয়ত যুগে রাসূল (সঃ) স্বয়ং এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামগণ পরচর্চা এবং অন্যের কুৎসা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যে ব্যক্তি অলিদের হাল বা অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তাকে মূর্খ এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য করেন। যদিও সে ব্যক্তি জাহেরি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাসূল (সঃ) জাহেরিবিদ্যা থেকে পরিত্রাণ চাইতেন। দুনিয়াদার আলেম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এসব কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় নবী-বিরোধী কে? মাওলানা রুমীর অপর একটি কবিতা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়। কবিতাটি হল,

"আয় বাছা ইব্লিস আদম রুউই হাস্ত
পাছ বাহার দাস্ত নাবায়ীদ ওয়ারেদাস্ত।"

বলা বাহুল্য, যাদের বাতেনী জ্ঞান নেই এবং দৃশ্যত সুন্দর চেহারা তাদের ক্ষেত্রেই এ কবিতায় ইবলিস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা না হলে নূরে বাতেন এর অভিজ্ঞতায় যাদের অন্তর পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্র জ্ঞানের সাহায্যে যারা সঠিক পথ প্রদর্শক ও মুর্শিদের ভূমিকায় লিপ্ত তাঁদের সম্পর্কে তিনি কখনো কি ইবলিস শব্দ ব্যবহার করতে পারেন? মহাবিপদের কথা, সত্যকে গ্রহণ করে তার প্রবক্তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এটাতো কলিকাতার তস্করদের কৌশল– তারা চুরি করে ঘরের বাইরে এসে মালিককেই চোর বলে ধরিয়ে দিতে চায়। এটা সেই জামানা।

বর্তমান সময় দুনিয়াটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, প্রদীপ নিভে গেছে, সাপ বিচ্ছু এবং ইঁদুর প্রভৃতির উপদ্রপে বর্তমান যুগের বাসিন্দারা সীমাহীন কষ্টে জর্জরিত। যে প্রদীপ বাকি ছিল তাও ঝড়ের আঘাতে বিধ্বস্ত এবং কঠোর কষ্টের মধ্যে মানুষ দিবারাত্রি অতিবাহিত করছে। প্রায় একশত বছর পর আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ কৃপায় ঝড়ের শক্তি শিথিল করেছেন। পৃথিবী থেকে অন্ধকারের যন্ত্রণা দূরীভূত হতে শুরু করেছে– اذا جاء نصر من الله والفتح (ইযা জায়া নাছরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু) অর্থাৎ, "আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় উপস্থিত।" সড়ক প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে, আপদ বিপদ দূর হয়ে গেছে, ছেলেরা সব দলে দলে চলে এসো, যার যার খেলায় মত্ত হও এবং সানন্দে বিচরণ করো। মনে হয় সুখের তারকা উদিত হয়েছে। হযরত গাউছে আলম অলিদের ইমাম খত্মে বেলায়েত হযরত মেহদী (আঃ)-এর ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্থায়ী হোক। তার আগমনের নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী তারকা একবার পূর্বাকাশে উদিত হবার পর আবার পশ্চিম আকাশে উদিত হবে এবং একই রমযান মাসে সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এ উভয় নিদর্শনই ইতোমধ্যে কার্যকরী হয়ে গেছে (১৩০০ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেক ১৩১১ হিজরি ১৩ রমজান বৃহস্পতিবার চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিল ১৩০০ সালের ২৪ চৈত্র মোতাবেক ১৩১১ হিজরি ২৮ রমজান রোজ শুক্রবার)। দারকুত্নী প্রভৃতি হাদীসের গ্রন্থে উক্ত নিদর্শনাদির বর্ণনা রয়েছে।

আর উল্লেখ আছে যে, ইমাম মেহদী (আঃ)-এর পূর্বে দুজন মিথ্যা মেহদীর আবির্ভাব হবে। মনে হয় তাদের একজন অনতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেই ফেলেছে।

তবে হযরত ইমাম মেহদী (আঃ)-এর আগমনের পূর্ব মুহূর্তে জগদ্বাসী বেলায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। শহর, গ্রাম এবং অলিতে গলিতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির এবং যিকিরের স্থান গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয় সকল জাতির মধ্যে তুমুল সাড়া পড়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে নূরী মুজাদ্দেদ আবির্ভূত হয়ে জগৎটাকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দেবে। অর্থাৎ, সর্বশেষ ইমাম তথা মেহদী (আঃ)-এর আগমনের অনতিপূর্ব সময়ে অবশ্যই নূরী মুজাদ্দেদের আগমন হবে। তাঁরা এ পৃথিবীটাকে নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করে দেবেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, কোরানের উল্লিখিত চন্দ্র সূর্যের মিলন আর দারেকুত্নীতে বর্ণিত দু গ্রহণ সমার্থবোধক।

উৎসাদির মূল উৎসের বর্ণনা

আরেফ বা অলিগণ আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যান এবং প্রকৃত বা সত্যজ্ঞান তাঁদের মধ্যে উদিত হয়। তাকে 'এল্মে লাদুনী' তথা গায়েবী জ্ঞান বলা হয়। কাশ্ফ্ এবং এল্হাম প্রভৃতি এরই শাখা-প্রশাখা। নবীদের বেলায় এটাকে হাদীস বলা হয়। আর অলিদের বেলায় এটাকে বলা হয় উম্মতি হাদীস। এটা হল বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার মতো। বলাবাহুল্য, লৌহ যখন একবার স্বর্ণে পরিণত হয়, তখন সর্বাবস্থায়ই তা স্বর্ণ। অর্থাৎ, সত্তা গুণাবলি এবং আকৃতি প্রকৃতি সর্বদিক থেকেই তা স্বর্ণ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র যে জ্ঞান বান্দার মধ্যে স্থিতি লাভ করে তার সূত্র এবং পরিপক্বতা আল্লাহ্রই। তাই তিনি আপন কালামে পাকে বলেছেন, ولايحطون بشئ من علمه الابماشهناء (ওয়া লা ইউহিতূনা বিশাইয়্যিম্ মিন্ ইলমিহী ইল্লা বিমাশাআ) অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সে ছাড়া কেউই তাঁর জ্ঞান থেকে আয়ত্ত করতে পারে না। তিনি নিজে কৃপা করে যাকে তা দান করেন, কেবল সেই তা পায়। এ অবস্থায় তাঁর জ্ঞানকে আল্লাহ্র জ্ঞান বলা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা যাকে আপন মৌলিক জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর সম্পর্কে তিনি বলেন, الا ان اوليا الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন্ আলাইহিম্ অলাহুম্ ইয়াহ জানুন্) (সাবধান! আল্লাহ্র অলিগণ ভয় ও চিন্তা থেকে মুক্ত) অর্থাৎ, আল্লাহ্র অলিদের সাথে আচরণের ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাও। সত্তা ও গুণে আকৃতি ও প্রকৃতিতে এবং জ্ঞান গরিমায় সর্বদিক থেকে তারা ভয় ও চিন্তামুক্ত এবং সর্বাবস্থায় তারা নির্ভীক। এ শ্রেণীর লোকগণ আল্লাহ্র জ্ঞান ও পূর্ণতা লাভের যোগ্য হন। অর্থাৎ, তাঁদের থেকে যা কিছুই প্রকাশ পাক না কেন, সবই আল্লাহ্র জ্ঞানের ফলশ্রুতি। এ ধরনের লোকই তাফসীর ও হেকমত সম্পর্কে আলোচনা বা বর্ণনা করার যোগ্য। তাঁদের থেকে প্রকাশিত জ্ঞান ও বাণী সবই সত্য। অর্থাৎ, মৌলিক (মূল) জ্ঞানের মধ্যে

কোনো পর্দা না থাকার দরুন এটাকে এল্মে হক বা সঠিক জ্ঞান বলা হয়। এ জ্ঞান কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। তবে তাঁর মন থেকে যাই বের হোক তা সঠিক। এহেন মর্যাদার অধিকারী লোকদের গাউস, কুতুব, আবদাল, আখ্ইয়ার এবং মুজাদ্দেদ প্রভৃতি বলা হয়। তাঁদের বাণী আল্লাহ্ এবং নবীর বাণী অভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণীর মতো তাদের বাণীও সর্বৈব সত্য। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য করে, তাহলে সেটা হবে তার গোমরাহী, ব্যর্থতা অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত। তাদের যদি রাবুবিয়াতের (ঐশ্বরীক) জ্ঞান প্রাপ্তির সৌভাগ্য হত, তাহলে তারা এতে শরীক হতে পারত এবং এটাকে যুদ্ধে পাওয়া ধনের মতো লুফে নিত। এ পর্যায়ে 'মোকামে ফানা' তথা সাধকের আল্লাহ্তে বিলীনের পর্যায় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। বান্দা যখন আল্লাহ্তে ফানা হয়ে যায়, তখন বান্দার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ সময়ে বান্দার ভিতর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহ্রই সত্তার বদৌলতে। তবে বান্দার সত্তা পরম সত্তা এক জাতীয় হয়ে বর্তমান থাকে। তা না হলে ইরফান তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশে অবশিষ্ট থাকে না। প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্র সত্তায় বিলুপ্তি লাভের পর আর কোথায় যাবে, যা থেকে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি ও অস্তিত্ব সেই সত্তায় প্রত্যাবর্তনের পর তাতে স্থায়ী হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল– كل شئي يرجع الي اصله (কুল্লু সাইয়িন ইয়ারজিউ ইলা আস্লিহী) অর্থাৎ, সব বস্তুই তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন পানি ও চিনি। চিনি পানিতে মিশে যাওয়ার পরও চিনির প্রতিক্রিয়া তাতে অবশিষ্ট থাকে। এ উদাহরণ 'ফানার' সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও অস্তিত্বের উৎসের প্রেক্ষিতে এটা আলাদা কিছু নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। হাদীসে কুদ্সীতে এ সমাধান পাওয়া যায়– الانسان سرى واناسره (আল ইনসানু সির্রী ওয়া আনা সির্রুহু) অর্থাৎ, আমার রহস্য মানুষ আর মানুষের রহস্য আমি। অর্থাৎ, আমার মূল মানুষ আর মানুষের মূল আমি। অতএব জানা গেল যে, সমস্ত বস্তুই আল্লাহ্ থেকে তথা সকল বস্তুর উৎস আল্লাহ্র সত্তা তা থেকে সকল বস্তুর উদ্ভব ও স্থিতি। সাধারণভাবে এটাকে সৃষ্টি মনে করা হয় কিন্তু সাধারণ মানুষ সৃষ্টি কথাটির অর্থ বুঝতে অক্ষম এবং ফানা শব্দের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করাও তাদের জন্য দুষ্কর। অথচ তারা অহরহ ফানা শব্দ উচ্চারণ করছে। অনুরূপভাবে 'মুহীত' শব্দের মূল অর্থ থেকে তারা অনেক দূরে।

মোটকথা, বান্দা আল্লাহ্র সত্তায় বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ হল সত্তায় সত্তা, গুণাবলির সাথে গুণাবলি, রূপের মধ্যে রূপ, প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতি, কর্মের মধ্যে কর্ম আর অবস্থায় অবস্থা, জ্ঞানে জ্ঞান, গরিমায় গরিমা, জাহেরের সাথে জাহের, বাতেনের সাথে বাতেন, কুদরতের সাথে কুদরত, শক্তির সাথে শক্তি, জীবনের সাথে জীবন, এবং মৃত্যুতে মৃত্যু, নূরের মধ্যে নূর, অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার, বুদ্ধির সাথে বুদ্ধি, রূহের মধ্যে রূহ্ আর নাস্তিতে নাস্তির বিলুপ্ত হওয়া। এ ধরনের হাজারো গুণাবলি বান্দার সত্তায় বর্তমান। এগুলো সবই আল্লাহ্র সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ফানা এবং

বিলীন হয়ে যায়। ফানার এ অর্থ যার প্রত্যক্ষ করা হয়নি, সে স্বভাবতই এ স্তরকে অস্বীকার করে। এটা তার বোকামি অথবা বিষয়টাকে এভাবে বোঝার চেষ্টা করুন, প্রত্যেক বস্তুই তার উৎস থেকে উৎসারিত আবার তাতেই প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং বান্দা আপন উৎস ও প্রকৃতি থেকে, যে রূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ঠিক সেভাবেই আপন উৎস মূলের মধ্যে ফানা হয়ে গেল। প্রসঙ্গক্রমে– خلق الله ادم على صورته (খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহী) অর্থাৎ, আল্লাহ্ আদমকে আপন রূপে সৃষ্টি করেছেন। এ উক্তিটি অনুধাবন করুন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপন সত্তা থেকে আদমকে যে রূপ ও গুণে প্রকাশ করেছেন, ঠিক সে পদ্ধতিতেই স্বীয় সত্তায় প্রত্যাবর্তন করিয়ে নেন। সকল বস্তুর উৎসই আল্লাহ্। প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্র নাম আছে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র নামীয় বস্তুর স্বতন্ত্র শরীর প্রয়োজন। এ স্বতন্ত্র শরীরটাকেই বলা হয় তার সুরত বা রূপ। আবার প্রত্যেকটি সুরতের জন্য সিরাত বা প্রকৃতি তথা আচরণ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে সত্তার বৈশিষ্ট্যাদি তাতে বর্তমান। তবে আদমের সাথে গোপন সাদৃশ্য রয়েছে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই; বরং মিলন শক্তির কারণেই এ মর্যাদা। অর্থাৎ বিশিষ্ট বান্দাকে আল্লাহ্র বিশেষ সত্তার পরিচায়ক ও রহস্যাদির উদ্ভাবক বলা হয়। আল্লাহ্র সুরত এবং আদমের সুরত অভিন্ন একথা বলায় কোনো ক্ষতি নেই। কারণ গোপন উৎস উভয়েরই এক। তবে আদমের সুরত এবং আল্লাহ্র সুরত এক বলার অর্থ সুরতে মোশাব্বার প্রকাশ।

তোমরা অপক্ব বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ্র সুরত সম্পর্কে যা ধারণা করছ, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তোমরা বাক্যের ধরনই বোঝ না। বস্তুত আল্লাহ্র সুরত প্রভৃতি কথাবার্তা তাঁর সৃষ্টি রহস্যের তথা সত্তা ও গুণের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে বস্তু যেভাবে হওয়ার হয়ে যাচ্ছে। যেমন ডিমের মধ্যে বাচ্চা, বীজের মধ্যে বৃক্ষের আত্মপ্রকাশ। অনুরূপভাবে উভয় জগতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির মধ্যেই বিস্মিত হওয়া ও বিস্ময়ের ব্যাপার রয়েছে। অর্থাৎ সুরত ও সিরাত, নাস্তি ও হাস্তি, হাজের ও গায়েব, স্বাদ ও গন্ধ প্রভৃতি সবই আল্লাহ্র জাত তথা সত্তা ও গুণাবলি থেকে প্রকাশিত হয়। কারণ জাত সকল বস্তুর মূল। অতএব সে জাতের ভিতর বিস্ময়ের ব্যাপার থাকবে না কেন? সুতরাং সকল বস্তু মূলের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র জাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলা বৈধ। কারণ এগুলো জাতেরই রহস্য। প্রথমত জাতই স্বয়ং একটি রহস্য। সুতরাং যা রহস্যময়, তাতে বিস্মিত হয়ো না। এ ছেলেমি থেকে বিরত হও, আরেফ হয়ে যাও এবং প্রকাশিত পূর্ণতা সম্পর্কে অবহিত হও। তাহলে– خلق الله ادم علي صورته (খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহী) অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আদমকে আপনরূপে সৃষ্টি করেছেন" কথার অর্থ নিজেই বুঝতে পারবে। বস্তুতপক্ষে বিশিষ্ট বান্দা আল্লাহ্র বিশিষ্ট নূর থেকে অর্থাৎ তাঁর সত্তাগত নূরের ধারক। তাদের নবী-অলি বলা হয়। সে কারণেই শেষ নবীর এক নাম নূর যা আল্লাহ্ তা'য়ালারও নাম। সুতরাং যখন নামে পার্থক্য নেই, তখন নামাধারে পার্থক্য হবে কেন? অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উভয়ের নাম অভিন্ন, তখন নূরী মর্যাদায়ও এরা অভিন্ন।

ফযীলতের বর্ণনা

ফযীলত দু প্রকার। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। যা প্রকাশ্য তা সাধারণ এবং যা অপ্রকাশ্য তা অসাধারণ। অর্থাৎ, জাতি ফযীলত এবং সিফাতী ফযীলত। এ উভয়ের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। জাতি ফযীলতের উৎস হল এখলাস তথা দৃঢ় নিষ্ঠা আর সিফাতী ফযীলতের উৎসও অনিবার্যরূপেই সিফাতী বা গুণাত্মক। যা সত্তা প্রসূত অবশ্যই তার মর্যাদা অধিকতর এবং যার যে সত্তার সাথে সম্পৃক্ত সে সত্তার অবস্থা অনুযায়ী তার প্রকাশ স্থায়ী হবে। যেমন সর্বমোট উচ্চ মর্যাদাবান রাসূলের সংখ্যা ছয়। তাঁদের উৎস এবং উপাদান দৃঢ় এবং অসাধারণ। এজন্য তাঁরা অধিকতর মর্যাদাবান। কারণ তাঁরা জাতি ফযীলতের নূর এবং এখলাছ তথা নিষ্ঠা ও সরলতার মূর্ত প্রতীক। তা মূল ও মর্মসূত্রে প্রাপ্ত অনুকম্পা। এ অনুকম্পাই বেলায়েত যা নবুয়তের মূল ও প্রধান বস্তু। তবে বেলায়েত সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত নবুয়তও অপূর্ণ থাকে। তখন এটাকে বলা হয় গুণাত্মক নবুয়ত। যে, নবীর নবুয়ত গুণাত্মক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সুদৃঢ় বেলায়েত অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ফযীলতেও পার্থক্য হয়। এখানে উল্লেখ্য এবং স্মরণীয় যে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐশী জ্ঞান এবং আদব শিক্ষা করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) কে নূরানী বক্ষ হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট পাঠালেন। যখন হযরত খিজির (আঃ) তাঁর এখলাছ তথা আন্তরিকতাপূর্ণ কার্যাদি শুরু করলেন। অর্থাৎ, নৌকা ডুবালেন এবং একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন ইত্যাদি। তখন হযরত মূসা (আঃ) এসব দেখে বিস্মিত হলেন এবং গোপন রহস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর প্রতিবাদ করে বসলেন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) প্রকৃত ঐশীজ্ঞান সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁর কাজের প্রতিবাদ করেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং যার কামালত তথা পূর্ণতার বর্ণনা করছেন, হযরত মূসা (আঃ) পয়গাম্বর হয়েও তাঁর প্রকৃত অবস্থা বুঝতে অক্ষম হন। অথচ নূরানী বক্ষ হযরত খিজির (আঃ)-এর পয়গাম্বর হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

এতো হল কোরানে বর্ণিত একটি কাহিনী। এখন হাদীসে বর্ণিত অপর একটি ঘটনা শোনো। ঘটনাটি হল– হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে একবার অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মূসা (আঃ) স্বজাতিদের নিয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রার্থনা কবুল হচ্ছিল না; বরং তাঁর কাছে আসমানী দূত অবতীর্ণ হয় এবং জানিয়ে দেয় যে, হে মূসা! আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন, বে-এখলাছ তথা আন্তরিকতাহীন মনের প্রার্থনা তিনি কবুল করেন না। তোমার লোকদের মন সরল বা খাঁটি নয়, তাদের প্রার্থনা কী করে কবুল করা যায়? বরং খাঁটি মনের অধিকারী আমার জনৈক অলি বন্ধু আছে তাঁর নিকট যাও। সে যদি তোমাদের জন্য দোয়া করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। তাঁর নাম বারখ্। এ কথায় হযরত মূসা (আঃ) বিস্মিত হলেন এবং তাঁর খোঁজে বের হলেন। ঘটনাক্রমে চলতে চলতে হযরত মূসা (আঃ) একটি জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন।

সেখানে তিনি দেখতে পান গলায় কাপড় জড়ানো কৃশকায় পাগল প্রায় জনৈক ব্যক্তি পায়চারি করছেন। দেখা গেল তার চেহারায় আল্লাহ্‌র সৌরভ চমকাচ্ছে। হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? উত্তর এল, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার নাম বারখ্। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, সাহেব একটু লক্ষ করুন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, সাত বছরের অনাবৃষ্টির ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা ধ্বংস প্রায়। আমরা পর্যায়ক্রমে সত্তর হাজার লোক প্রার্থনায় শামিল হয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা কবুল হয়নি; বরং 'অহি' এসেছে বারখ্ যদি তোমাদের জন্য দোয়া করেন, তাহলে অবশ্যই বৃষ্টি হবে। তখন হযরত বারখ্ বললেন, আমার সাথে ময়দানে চলো। ময়দানে এসে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে বলতে লাগলেন, আজ কোথায় তোমার সে-ক্ষমতা যে, বৃষ্টিপাত ঘটাবে এবং বাতাস পানি জমাবে? আজ তোমার ক্ষমতা বিলুপ্ত; বরং তোমার দৃষ্টিশক্তি নেই এবং তোমার কান কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। মোটকথা তিনি অনুরূপ বেহুদা কথা বলতে লাগলেন। ইতোমধ্যে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অতঃপর কিছু বলতে না বলতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। হাঁটু পর্যন্ত পানি হয়ে গেলে বারখ্ হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন, চলো শুকনো স্থানে যাই। উঁচু জায়গায় এসে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন, দেখ আমি তোমার প্রভুকে কত গালি দিলাম। এতে হযরত মূসা (আঃ) ক্ষেপে যান এবং তাকে ভালোমন্দ কিছু বলতে চান। তৎক্ষণাৎ ঐশী দূত অবতরণ করেন এবং বলেন, সাবধান মুখ খুলবেন না। আল্লাহ্ বলেছেন, তাঁকে যদি কিছু বলেন, তাহলে আপনার নবুয়ত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তিনি দৈনিক তিনবার আল্লাহ্‌র সাথে এরূপ ঠাট্টা করেন। লক্ষ করো, পার্থক্যটা কোথায়? হযরত মূসা (আঃ) তো একজন পয়গাম্বর আর হযরত বারখ্ একজন ভবঘুরে প্রকৃতির লোক। তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র সাথে অসংযম ও তামাশার কথাবার্তা বলেছেন। অপরদিকে হযরত মূসা (আঃ) সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, প্রার্থনা করেছেন, তা আবার একা নয়; বরং সত্তর হাজার লোককে সাথে নিয়ে সাত বছর পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন। তবুও তাঁর প্রার্থনা কবুল হয়নি। অপরদিকে হযরত মাহ্‌বুব অর্থাৎ হযরত বারখ্ মনোযোগ দিতেই বৃষ্টিপাত হল। তাহলে এর মূল উপাদান কোনটি, নবুয়ত না বেলায়েত? যদি বেলায়েত হয়, তাহলে উহা নবুয়ত থেকে শক্তিশালী কি না? এবং বেলায়েত মূল কি না? বরং বেলায়েত উভয় জগতের সমুদয় বস্তু থেকেই উত্তম। কারণ 'ওয়াল' থেকে অলি শব্দের উৎপত্তি। ওয়ালা অর্থ দুস্তি বা বন্ধুত্ব। আর নবী শব্দের উৎপত্তি 'নব' থেকে যার অর্থ খবর। সুতরাং নবী শুধুমাত্র সংবাদদাতা। তাতে বেলায়েত যুক্ত হলে নবুয়ত মজবুত এবং পূর্ণ হয়। অর্থাৎ যে নবীর বেলায়েত মজবুত তিনি অলি থেকে উত্তম। কারণ তার মধ্যে উভয় গুণ একই সঙ্গে বর্তমান। এজন্য বেলায়েত অনির্দিষ্ট (আম) তথা নবী এবং অলি উভয়েরই মূল উপাদান। আর নবুয়ত (খাস) নির্দিষ্ট তথা বিশিষ্ট ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ সংবাদ দেওয়ার জন্য যে কোনো একজন ব্যক্তিই যথেষ্ট এবং তাতেই সকল দুনিয়াবাসীদের

প্রতি যে দায়িত্ব ছিল, তা শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে বেলায়েত প্রয়োজন অনুপাতে বড় ছোট নির্বিশেষে সকলের ওপর সদা ফরয। কারণ মনের বিশ্বাস হল বেলায়েতের সর্ব নিম্নস্তর বা ক্ষুদ্রতম অংশ। এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। মিলনের তথা একীভূত হওয়ার ফলে ঈমানের স্তর অতিক্রম করে গেলেও ঈমান থেকে মুক্ত হওয়া বোঝায় না। এটা একটি বিশেষ অবস্থা। এ সময়ে ঈমান চাপা পড়ে যায় মাত্র।

যে নবীর মূল উপাদান সুদৃঢ় বেলায়েত, তাঁর বুজুর্গিও অধিক। এ কারণে আমাদের শেষ নবী সকলের চেয়ে বেশি বুজুর্গ। কারণ তাঁর নবুয়তের ওপর বেলায়েতের প্রাধান্য ছিল। এ কারণেই তাঁর উম্মতদের মর্যাদা বনী ইসরাঈলিদের নবীদের চেয়ে বেশি। এটা হাদীস শরীফে আছে। পৌঁছা এবং পৌঁছানোর আয়াত দ্বারাও তাই প্রমাণিত হয়। আয়াতটি হল– فاذا فرغت فنصب والي ربك فارغب (ফাইজা ফারাগ্‌তা ফান্‌ছাব্ ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব) অর্থাৎ, দীর্ঘ হুকুম আহ্‌কাম থেকে অবসর হলে তুমি থেমে যাবে এবং রবের প্রতি মনোনিবেশ করবে। এখানে 'ইলা' বা 'প্রতি' শব্দ দ্বারা রবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'রুগবত' বা 'মনোনিবেশ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে বেলায়েত। অতএব প্রমাণিত হয় যে, শরিয়ত যদি শুধু হুকুম আহ্‌কামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে এগুলো সদা পালনীয় হত। অথচ সদা পালনীয় হল এগুলোর মূলনীতি। যা পরিপূর্ণ স্থায়ী নিয়ামত। শরিয়তের হুকুম আহ্‌কাম স্বস্থানে পালনীয় ও কর্তব্য এবং কখনো সে ফরয বা কর্তব্য রহিত হয়ে যায়। কিন্তু বেলায়েত যা সকল কাজের মূল তা কখনো রহিত হয় না। উল্লেখ্য, হাদিস, কোরান এবং আরও যত শব্দ প্রত্যেকটির অর্থ থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটি অর্থের মর্ম ও 'মেসদাক' তথা প্রতিপাদ্য থাকা আবশ্যক। মেসদাক তথা প্রতিপাদ্য বিষয়ের জন্যই শব্দ গঠিত হয়। অর্থাৎ, ভাব প্রকাশের ইচ্ছা হলেই শব্দ উচ্চারিত হয়। তাহলে মেসদাক তথা প্রতিপাদ্য বস্তুটি ইচ্ছার লক্ষ্য হিসেবে স্থির হল। যেমন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করল, সে বলা মাত্রই শব্দটি মেসদাক তথা প্রতিপাদ্য বর্তমান ছিল। এ কারণে তিনি আল্লাহ্ ওয়ালা হয়েছেন। আর যদি কেবল আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারিত হয় এর মেসদাক তথা প্রতিপাদ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে, তাহলে সে কাফির এবং মুনাফিকই থেকে যায়। অপরদিকে আল্লাহ্ শব্দের মেসদাক সম্পর্কে বিশ্বাস থাকলে মুখে তা উচ্চারিত না করলেও সে মুমিন হবে। তবে কোনো কোনো সময় উহা মুখে উচ্চারণ করা ফরয ও ওয়াজেব হতে পারে। তখন তা করতে হবে।

একাত্মতার বর্ণনা

হযরত মূসা (আঃ) প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমাকে দেখা দাও। অর্থাৎ, পরোয়ারদিগারকে দেখতে চাইলেন। উত্তর এল, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না।

অর্থাৎ, এ পর্যায়ে বাহ্যিক দৃষ্টি অচল। প্রকাশ্য মূসা (আঃ) অর্থাৎ, সৃষ্টি রূপের মূসাকে একথা বলা হয়েছে। বাহ্যত সে মাঠে আগুন হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বললেও বাতেনে তাই স্বয়ং আল্লাহ্। এটা ছিল তাঁর জ্যোতি সৌন্দর্যের অগ্নিরূপে প্রকাশ। তূর পাহাড়ে যে জ্যোতির্ময়তার প্রকাশ ঘটেছিল, তা ছিল জালালী। যার কারণে মূলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ ঘটেছে। যার মাধ্যমে সত্তার প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। মোটকথা, পাহাড় ভেঙে গেল, তূর মজে গেল এবং হযরত মূসা বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রখর হয়ে যায়। এ কারণেই পাহাড়ও চোখের সুরমায় পরিণত হয়। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে এবং প্রখর হয়। কারণ যখন প্রত্যক্ষ করার শক্তি নূরে প্রখর হয়, তখন কপালে আলোর ঝলক প্রতিভাত হয়। এতে চক্ষু উজ্জ্বল হয়। তাই যখন তূর পাহাড় ঝল্‌সে গেল, তখন তূর সাথীদের আকৃতি-প্রকৃতিতে ঝলক সৃষ্টি হবে না কেন? যখন পাহাড় এবং সাথীদের প্রত্যক্ষণ শক্তির ঔজ্জ্বল্যে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করল এবং বহু অদেখা বস্তু দেখতে পেল, তখন হযরত মূসা কেন দেখবেন না এবং অবহিত হবে না মূল সত্তার প্রকাশ সম্পর্কে? প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আঃ) ইতোপূর্বে যা দেখেননি তাই দেখেছেন, যা শোনেননি তাই শুনেছেন এবং যা অনুভব করেননি তাই অনুভব করেছেন।

অর্থাৎ, হযরত মূসা (আঃ)-এর বেহুঁশ অবস্থাটিই ছিল তাঁর প্রকৃত সচেতন অবস্থা। এ সময়ে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন এবং প্রকৃত দিদার লাভ হয়। এটা ছিল তাঁর সরাসরি দর্শন। এ পর্যায়ের সাক্ষাতে পর্দার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বহির্দৃষ্টি বা চক্ষু সূক্ষ্মতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুকে অনুবীক্ষণ দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে হয়। অনুরূপভাবে অন্ধকারে কিছু দেখতে হলে আলোর সাহায্যে তা দেখতে হয়। অনুরূপভাবে অদেখা বস্তুকে আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। সে যাই হোক হযরত মূসা (আঃ) প্রকৃত দিদার লাভের পর সারা জীবনেও আর রূপক দর্শন লাভের চেষ্টা করেননি। কারণ প্রত্যক্ষ দিদার-ই আসল দিদার। আর চক্ষুর দেখা হল রূপক দেখা, যদি চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করার শক্তি বা নূর তীব্রতর না হয়। হযরত মূসা (আঃ) এরই কেবল দিদারের সৌভাগ্য হয়নি; বরং তাঁর সাথীবৃন্দেরও দিদার লাভ হয়েছিল, যদিও তারা মরে গিয়েছিল। পরম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রেক্ষিতে এবং তাঁর মহানত্বের কারণেই তা হয়েছিল।

মোট কথা, হযরত মূসা (আঃ) দিদার চেয়েছিলেন বটে; কিন্তু ইত্তেহাদ তথা একাত্মতা বা প্রকৃত দিদার চাননি। চক্ষুর দেখা হয় মিলনের পূর্বে আর মিলনের পরে হয় একাত্মতা। এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হল শুরু এবং শেষ। এতে মনে হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন প্রাথমিক স্তরের, শেষ স্তরের নয়। যদি তিনি শেষ স্তরের হতেন, তাহলে চক্ষুর দর্শন কামনা করতেন না।

বাতেনী কথা

من قال لا اله الا الله فدخل الجنة (মান ক্বালা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ফাদাখালাল্ জান্নাহ্) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, সে বেহেশ্‌তবাসী হবে। অর্থাৎ, সাধক বান্দা যখন আপন মগ্ন অবস্থায় নিমজ্জিত হতে থাকে এবং তাঁর সামনে উন্মোচিত হতে থাকে পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বার, তখন সাদৃশ্যময় তথা নূরালোকমণ্ডিত স্থানকে সাধকের জন্য বেহেশ্‌ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আপন অবস্থাদির পূর্ণতার সঙ্গে রূহ্ তাতে প্রবেশ করে এবং তখন তা বেহেশ্‌তের স্বাদ আস্বাদন করে। এ অবস্থায় সাধককে বেহেশ্‌তবাসী বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বেহেশ্‌তী। তখন সে সাধক আপন অনুরূপ অস্তিত্ব সহকারে বেহেশ্‌তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ফেরেশতাগণ সাধককে বেহেশ্‌তে দেখেন। সম্পৃক্ততার কারণে তাঁর এ মর্যাদা লাভ হয়। কিন্তু দর্শকবৃন্দ জানেন না যে, সে কী করে ঊর্ধ্বলোকে গেল। তবে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তা ঠিকই জানেন। কারণ এটা আল্লাহ্‌র অন্যতম রহস্য।

তাসাব্বুর অর্থ এবং এর প্রকারভেদ

তাসাব্বুর অর্থ কোনো বস্তুর রূপ কল্পনা করা। আবার কিছুর ধ্যান করাকেও তাসাব্বুর বলা হয়। তা দু প্রকার– প্রথমত, জাহেরি তথা চক্ষু সর্বস্ব। এটা ধ্যান চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়। এটা ধ্যান রাজ্যের প্রাথমিক স্তর। দ্বিতীয়ত, বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ অবস্থা সর্বস্ব। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ ধ্যান সম্পন্ন হয়। দৃষ্টিশক্তির যেখানে শেষ সেখান থেকে এর প্রকাশ আরম্ভ হয়। এটাকে বাতেনী অবস্থানগত ধ্যান বলা হয়। যা সাধকের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, এটাও ফয়েজ লাভের অন্যতম উপায়। জাহেরি তাসাব্বুর তিন প্রকার; যথা– (১) তাসাখখুছ, (২) তাহামূল এবং (৩) তাজাহুল। জ্ঞাত বস্তুকে তাসাখখুছ বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো জ্ঞাত বা দেখা বস্তুর সাদৃশ্য রূপ তার অবর্তমানে বা আড়াল থেকে ধ্যান বা কল্পনা করাকে তাসাখখুছ বলা হয়। দ্বিধাযুক্ত দর্শন বা সন্দেহযুক্ত শ্রবণের ভিত্তিতে কোনো বস্তুর রূপ কল্পনা বা ধ্যান করাকে তাহামূল বলা হয়। অর্থাৎ, কোনো একটি বস্তু দেখে বা শব্দ শুনে সন্দেহজনকভাবে মনে হল যে, তা অমুক বস্তু হতে পারে। এ ধারণার ভিত্তিতে কোনো বস্তুর রূপ কল্পনা বা ধ্যান করার নাম তাহামূল।

তৃতীয়ত, কোনো অজ্ঞাত বস্তুর রূপ কল্পনা তথা যে বস্তুর চেহারা সুরত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে বস্তুর সাদৃশ্য রূপ কল্পনা করাকে তাজাহুল বলে। প্রকৃতপক্ষে এটা অসম্ভব। কারণ অজানা বস্তু অজ্ঞাত। আর তার সাদৃশ্য রূপ অজ্ঞাত থেকে অজ্ঞাত। অতএব অজ্ঞাত বস্তুর অজ্ঞাত অংশ আরও অজ্ঞাত। এ কারণেই এরূপ বস্তু ধ্যান করাকে তাজাহুল বলা হয়।

অপরদিকে বাতেনী তাসাব্বুরও তিন প্রকার। যথা– (১) ইনকেশাফ, (২) ইল্‌হাম এবং (৩) এতেকাদ। ইনকেশাফ একটি প্রতিবিম্বাত্মক দৃশ্য। উপলব্ধির অদৃশ্য দর্পণে তা প্রতিভাত হয়। এখানে কোনো অনুমান বা কল্পনার অস্তিত্ব থাকে না। তা-ই মূল তাসাব্বুর বা ধ্যান। তা রহস্যালোক থেকে প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয়ত, ইল্‌হাম। তা আয়নায়ে মোদাব্বির থেকে নফ্‌সে মূলহেমায় তথা মাথার তালু থেকে অন্তরের নির্দিষ্ট স্থানে স্ফুলিঙ্গের মতো প্রতিভাত হয়। এর ফলে অদৃশ্য থেকে অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়। এটাকেই ইল্‌হাম বলা হয়। তৃতীয়ত এতেকাদ। এটা না ধ্যান, না ধারণা, না অজ্ঞতা, না বিস্মৃত; বরং এ একটি নির্দিষ্ট স্থিতাবস্থা। অর্থাৎ এমন একটি পবিত্র বস্তু যা থেকে ইনকেশাফ ও ইল্‌হাম প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পারে যে, এটাই আসল এবং মূল। তবে এতেকাদও দু প্রকার। যথা– জাকি এবং গোবী। জাকি এতেকাদ-এর ফলশ্রুতিতে ইল্‌হাম এবং কাশ্‌ফ সংঘঠিত হয়। আহলে গোবীদের মধ্যে এর ফলশ্রুতি কম এবং বিরল। কিন্তু এতেকাদ বা বিশ্বাসওয়ালা ব্যক্তি মূলতই যোগ্যতম, পারদর্শী এবং শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি।

হাক্বিকত প্রমাণিত হওয়ার বর্ণনা

আল্লাহ্ বলেন, الحق حق (আল হাক্ক হাক্কুন) অর্থাৎ, সত্য সত্যই। এটাই সত্যের বৈশিষ্ট্য। সত্যের স্থিতিস্থলে তা আপন অর্থ মর্মসহ বর্তমান। তা না হলে সত্যকে অন্য বস্তুতে স্থিতি লাভ করতে হবে। সত্যের স্থিতি স্থানও উহার বৈশিষ্ট্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে সত্যের বৈশিষ্ট্যাদি স্থিতিবান নয়। ভালোমন্দ সবই পরমসত্তা থেকে সমস্ত স্থিতি লাভ করেছে। যার মাধ্যমে মন্দ বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, সে হিসেবেই তাকে মন্দ বা অজ্ঞ বলা হয়। অতএব যেদিকে তাকাও দেখবে, কোনো কিছুই হাকিকত থেকে আলাদা নয় বরং দেখবে সত্যের স্থিতিতে সবই সত্য। তবে উচ্চতর নিম্নতর স্তরভেদে তার প্রকাশ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। সত্য যার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত, তার প্রকাশ অনুরূপেই স্থিতিবান। তাই সত্যের পূর্ণতার প্রকাশের ধারক ব্যক্তি এই প্রকাশ বীজের খোসাস্বরূপ। এর ভিতর স্থিতিবান সবই সত্য। কারণ সে সত্যের প্রকাশ মাধ্যম। যে কোন সত্য তাঁর কাছে বর্ণিত হোক, অর্থের প্রেক্ষিতে সে তা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ রহস্য জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করে সে ওটাকে পরখ করে নিবে। অর্থাৎ, যার মধ্যে পরম সত্য স্থিতি লাভ করে, সে যদি একজন সাধারণ বা অজ্ঞ লোক হয়, তাঁর নিকট যদি কোরান কিতাব বা নবী-অলিদের বাণী পাঠ করা হয়, যাতে সত্যের বর্ণনা রয়েছে, তাহলে সে স্বীয় অবস্থা সাপেক্ষে তার মর্মার্থ এমন সুন্দরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, যা অন্য কোনো জাহেরিবিদ্যার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি অনুরূপ সত্যের আধার ব্যক্তি নিজের দেহ মনে সত্যকে অনুভব করবে এবং সত্য তাঁর সারবস্তুতে পরিণত হবে। আর সকল কথার মধ্যে

বিনা তর্কে গণিমতের মালের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে থাকবে এবং সত্যের আধার নিজে তার সার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে, যার মধ্যে সত্য অধিষ্ঠান না করে সে তা বুঝবে না। নিছক হাবাগোবা হয়ে যাবে। আর যদি সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হয়, তাহলে তো তা অস্বীকারই করবে। সত্যের আধার ব্যক্তি কোরান কিতাব এবং সত্যবাণী তথা নবী-অলির বাণীসমূহ গ্রহণ করবেন। আবার যখন তিনি তা থেকে বর্ণনা করবেন অবিকৃতভাবেই করবেন। এ হল তার মূলধন।

উপরের আলোচনার সারমর্ম হল, সত্য সত্যই আর কুফ্‌র হল বাতিল। কুফ্‌র অর্থ অস্বীকার করা। অতএব যে সত্যকে অস্বীকার করে, সে কাফির এবং বাতিল। অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে, তাহলে সে নিকৃষ্টতম হতভাগা। কারণ অজ্ঞতাবশত কেউ যদি আপন লোকদের হত্যা করে তাহলেও তো তারা মারা যাবে। অনুরূপভাবে অজ্ঞতাবশত সত্যকে যদি বাতিল বলা হয়, তাহলে সে সত্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তার মধ্যে বর্তমান সামান্যতম সত্য যাকে বেহেশ্‌ত মনে করছ তাও বাতিল হয়ে যাবে। অতঃপর যথার্থভাবে কুফ্‌রের অর্থ প্রমাণিত হল। যে ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে কিয়ামতে সে বাঘে আক্রান্ত বকরীর ন্যায় ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। যথাসম্ভব এটা মিথ্যা নয়।

সত্যাধারের সত্যতা হল তার জ্ঞান। এ জ্ঞান পর্দা নয়। এ হল রহস্য জ্ঞান, যে ব্যক্তির মধ্যে সত্য অধিষ্ঠান লাভ করে তাঁর পর্দা রূপ জ্ঞান ঢেকে যায়। কিন্তু হাযেব (পর্দায় আবৃত) এ বিষয়ে অবহিত থাকে না। এ প্রসঙ্গে ঘটনার মধ্য দিয়ে আরও দু-একটি কথা শ্রবণ কর। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ–

একদিন হযরত হাবীব (রঃ) নামাজে সূরা– الحمد (আল্ হ্যামদু) এর স্থলে الحمد (আল্ হামদু) পাঠ করেন। হযরত ইমাম হাসান বস্‌রীও তাঁর পিছনে নামাজ পড়ছিলেন। তিনি নামাজ ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি কি অজ্ঞ এবং তিনি একাকী নামাজ পড়লেন। অতঃপর রাতে স্বপ্নে দেখেন আল্লাহ্ তাকে বলছেন, তোমার সারা জীবনের ইবাদত পণ্ড হয়ে গেল। কারণ তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুকে হীন জ্ঞান করেছ এবং তুমি ধারণা করেছ যে, তোমার নামাজ তার নামাজের চেয়ে উত্তম হয়েছে। কারণ, তিনি 'আল্ হ্যাম্‌দুর' স্থানে 'আল-হামদু' পাঠ করেছেন। তবে আমি তাঁর 'আল্-হামদু' পাঠেই সন্তুষ্ট। এরপর তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত এতেকাফ করেন এবং রোযা রাখেন আর আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। যতদিন না তিনি আল্লাহ্‌র রহমতে ক্ষমার ব্যাপারে আশান্বিত হন।

দ্বিতীয় ঘটনা, একদিন হযরত হাবীব (রঃ) এবং ইমাম হাছান বস্‌রী দুজনেই ইচ্ছা করলেন, নদীর ওপার যাবেন। তাঁরা নদীর কূলে এসে দেখলেন, পাড়ে কোনো নৌকা নেই। উভয়েই চিন্তা করছিলেন কী করা যায়। এমন সময় হযরত হাবীব (রঃ) বললেন, চলুন নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাই। এতে হযরত ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বললেন, তুমি পাগল হয়েছ? এতে তিনি চুপ করে থাকলেন এবং পরে নদীর উপর দিয়ে রওনা করলেন। নদীর ওপারে গিয়ে নিজের কাজ সম্পন্ন

করে একইভাবে ফিরে এসে দেখেন উক্ত ইমাম সাহেব সে স্থানেই বসে রয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হাবীব, তুমি কিভাবে নদীর উপর দিয়ে হেঁটে গেলে? উত্তর দিলেন, ওস্তাদ্‌জী তুমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছ, তা সত্ত্বেও কলম দিয়ে ঘষে অনেক কাগজ কালো করেছ। আর আমি নিজের অন্তরকে ঘষে পরিষ্কার করে নদী পার হয়ে গেছি। এ কথা শুনে হযরত ইমাম সাহেব বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, আল্লাহ্ জানেন, হয়ত তুমি কিয়ামতের দিনও এভাবে পার হয়ে যাবে। আমি পড়ে থাকব।

এখানে লক্ষণীয় যে, হাবীব (রঃ) একজন বিদ্যাহীন লোক। তাছাড়া তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সুদখোর এবং কৃপণ ব্যক্তি। কিন্তু তা থেকে বিরত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মধ্যে সত্য স্থিতি লাভ করে এবং তিনি সত্যের পরম পরাকাষ্ঠায় পরিণত হন। তাছাড়া অনুরূপ আরও অনেক ঘটনা বাবা শেখ ফরিদ (রঃ) তাজকেরাতুল আউলিয়াতে উল্লেখ করেছেন। অতএব স্বীকার্য যে, সকল বস্তুসত্তা মৌলিকভাবে স্থিতিশীল সকল বস্তুর উৎস থেকে উৎসারিত। এ এক ধরনের প্রকাশ। যেমন– আগুন, যেখানেই আগুন দেখা যাক না কেন, তা আগুনের উৎসকুণ্ড থেকে উৎসারিত। এখন সে যেখান থেকেই আগুন সংগ্রহ করুন না কেন, তা মূলত এক এবং অভিন্ন। এখানে ভাগাভাগির কোনো সুযোগ নেই। সত্য যাদের অন্তর্ভুক্ত এবং যারা অলি তাঁদের স্তরেও কোনো ভাগাভাগি নেই। তাঁরা সেখানে পরম সত্তায় একাত্ম। এ ধারণাটা প্রকাশিত হওয়া এবং প্রকাশ করার আবর্তনের ওপর স্থিতিবান। এমতাবস্থায় বিচ্ছুরণ থেকে আগুন সংগ্রহ করা আর তার উৎস কুণ্ড থেকে সংগ্রহ করা একই অর্থ। তবে যে ব্যক্তি যে আবর্তনের মুখোমুখি হবে তাকে তা থেকেই নিজের কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি লাভ করতে হবে। কারণ প্রকাশের উৎস থেকে প্রকাশ ঘটে আর প্রকাশ ঘটলে তা থেকে মক্‌ছুদ হাসিল করতে হয়।

অতএব প্রমাণিত হল যে, প্রতিষ্ঠিত পরম সত্য হল আল্লাহ্ এবং দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত সত্য তার প্রকাশস্থল। আর যে বান্দা সত্যকে আত্মভূত করেছেন, তিনিও সত্যেরই প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য। তিনি প্রকৃত সত্য। তাঁর কাছ থেকে আলো গ্রহণ না করলে আলো লাভ হবে না। কারণ মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ বলেন, كونو مع الصادقين (কুনু মাআছ্ ছাদিকীন) অর্থাৎ, সত্যাশ্রয়ী যিনি সত্যকে আত্মভূত করেছেন, তাঁর সাথী হও। অর্থাৎ তাঁকে ডাক, তাহলে আমি শুনব। কারণ তিনি সত্য প্রকাশের মাধ্যম।

এজন্য আপন অলিকে ডাকা আর আল্লাহ্‌কে ডাকা একই। অতএব জানা গেল যে, আলোর আধার থেকেই আলো সংগ্রহ করতে হবে। এটা আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা প্রমাণিত। তাই মাকছুদ হাসিলের লক্ষ্যে দ্বিতীয় উৎস তথা সত্যের প্রকাশ মাধ্যমের শরণাপন্ন হওয়া ফরয। এর বিপরীত কিছু করা হারাম এবং নিজেকে বঞ্চিত করা। তাই বঞ্চিতরা সাধারণত কাফির, ফাসিক এবং পাপী হয়ে থাকে। কারণ সে অলিকে বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকে। এটা নিষ্ফল এবং এর দ্বারা কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

তার ধারণা, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ডাকা শিরক্। এতে করে এর মূর্খ আল্লাহ্‌র বাণীকেই সরাসরি অস্বীকার করছে এবং অজ্ঞতাবশত মূলকে ভিন্ন কিছু মনে করছে। সে প্রকাশ ও প্রকাশের স্থলকে অর্থহীন মনে করে। সুতরাং জেহালত তথা অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সে আবু জেহেলে পরিণত হয়, যা যথার্থ অর্থেই কুফরি। এ নিরেট মূর্খ জানে না যে, হাত দ্বারা ধরা আর রূহের ধরা একই কথা।

অজ্‌দ্ এর পরীক্ষা

কেউ কেউ অজ্‌দ্ তথা ভাবের সীমা নির্ধারণ করেছে। তাঁরা বলতে চায় যে, অজ্‌দ্ মগ্ন ব্যক্তিকে তলোয়ার অথবা সুঁই দ্বারা আঘাত করে পরীক্ষা করতে হবে। যদি তাঁর ব্যথা বোধ না হয়, তাহলে মনে করতে হবে সে অজ্‌দ্ মগ্ন। এ কথায় বোঝা যায় যে, অনুরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং শরিয়তের নির্দেশ। তাছাড়া অজ্‌দ্ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং ছেলেকে বাবার দেহে মুরিদকে শাইখ-এর দেহে এবং উম্মতকে নবীর দেহে অথবা এর বিপরীতে ছুরি প্রভৃতি চালাতে হবে। অথবা, প্রত্যেক অজ্‌দ্ মগ্ন ব্যক্তি অজ্‌দ্ অবস্থায় নিজের হাতে সুঁই নিয়ে আপন দেহে ঢুকিয়ে তাঁর অজ্‌দ্ জানার চেষ্টা করবে কি না তাও বল? কোনো নবী-অলি কি এমনটা করেছিলেন, না করেননি? বিশেষ করে বদরী সাহাবাদের অবস্থার ক্ষেত্রেও কি এ হুকুম ছিল? অধিকাংশ নবীদের অজ্‌দ্ এবং ভাবের উদয় হত, তাঁরাও কি এ কাজ করতেন? বল, উত্তর দাও! আসলে এ হল কোনো গবেট এবং ফালতু লোকের ফালতু প্রলাপ। তা না হলে বল, কোন হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত? এবং এ হাদীসের বর্ণনাকারী কে, বল?

অজ্‌দ্ একটি অবস্থার নাম, যা যিকিরকারীর সাথে যুক্ত হয়। তা চল্লিশ অথবা চুয়াল্লিশ প্রকার। অজ্‌দ্ অবস্থায় সর্বনিম্ন পর্যায়ের জজ্‌বার দ্বারা দেহে এক প্রকার আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যেমন– গরম অনুভব করা বা কম্পন, অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এ জজ্‌বা খুব শক্তিশালী না হলেও এর মৌল বস্তু অনেক উত্তম। এটাকে সাধকের দরজার চাবি বলা হয়। এহ্‌সানের কিতাবসমূহে এ ধরনের কম্পনকে সাধারণ কেরামত বলা হয়েছে। এ একটি বিশেষ অবস্থা যা নবী-অলিদের জন্যই কেবল প্রযোজ্য। এর প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। অজ্‌দ্ এর আলোচনায় এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে দেখ। মোটকথা অজ্‌দ্ সাধককে উচ্চতর স্থান ও মর্যাদার দিকদর্শন প্রদান করে। ফলে সাধকও যা পাওয়ার তাই পান এবং অবহিত হন, যা তাঁর অবহিত হওয়া দরকার। তবে উক্ত অজ্‌দ্‌সমূহের মধ্যে যেটার প্রতিক্রিয়া তীব্র এবং গরম তাকে গোলবা ও সোক্‌কর বলা হয়। তা সাধককে অচেতন ও অস্থির করে ফেলে। এ অবস্থায় প্রকাশিত কল্যাণাদি বর্ণনাতীত। যখন অজ্‌দ্‌দের উপকারিতা বর্ণনা করতে কলম অক্ষম এবং সকল অজ্‌দ্‌দের উৎস বস্তু ও পূর্ণতা অভিন্ন নয়, বরং প্রকারভেদে ফলাফল হয়ে থাকে, তখন কোন অজ্‌দ্ সম্পর্কে তুমি অবহিত এবং কার ওপর তলোয়ার বা ছুরি চালাবে, বলো?

নামাজের বিবরণ

নামাজ একটি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর ইবাদতের নাম। নামাজ 'নিয়ামতে সদরে কোব্‌রা' তথা শাহী মালখানার চাবি। যার বহির্ভাগ নবুয়ত এবং মগজ তথা অভ্যন্তর বেলায়েতে পরিপূর্ণ। তাতে ঐ জিনিস রয়েছে যা সদরে কোব্‌রা তথা শাহী মালখানার বিপরীত অন্য কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। অর্থাৎ, কোনো জিনিসেরই মুখাপেক্ষী হয় না। এ-নামাজ আল্লাহ্ তা'য়ালার সমস্ত পরিপূর্ণতার। অর্থাৎ, এ নামাজের মধ্যে একাধারে ইবাদত, আনুকূল্য, নৈকট্য, সৌন্দর্য এবং ভ্রমণাদি রয়েছে। এতে সাধকের সফর কার্যাদি বিভিন্ন অবস্থা, দোয়া, আত্মসম্বোধন, আত্মমুখী হওয়া এবং অন্যের দিকে মনোনিবেশ না করা, কাশ্‌ফের প্রদীপ থেকে সফল তথা মিরাজের বিভিন্ন স্তর ও স্থানসমূহকে আলোকোজ্জ্বল করা ইত্যাদি। অর্থাৎ, আপন অন্তর ও নফ্‌সের প্রতি মনোযোগী হওয়ার এবং কাবা, জমিন এমনকি নবী-অলিদের প্রতিও মনোনিবিষ্ট হওয়ার প্রশিক্ষণ রয়েছে। নামাজের মধ্যে যে সব জিনিসের নাম মুখে উচ্চারণ করতে হয়, তাদের অর্থ-মর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় ও মনোযোগ দিতে হয়। এমনকি এসবের সাথে উভয় জগতের মধ্যে যে সব বস্তু রয়েছে সব কিছুর নাম জপ করতে হয় এবং ঐগুলোর প্রতি খেয়াল এবং ধ্যান রাখতে হয়। এসব বিষয়ে দৃষ্টি না থাকলে তাকে নামাজ বলা যায় না, বরং তা খেল-তামাসার শামিল।

আর যার অবস্থা এরূপ নয় তার নামাজ অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ দণ্ডায়মান অবস্থান নামাজির শির ঊর্ধ্বালোকে এবং নূরানী দৃষ্টি জমিনে ঝলসাতে থাকে। আর এটাকে সালাতের দর্পণ বলা হয়। এ দর্পণে পূর্ণ সফর প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়। এটা মহাসফর। এ সফরে একবার নিমজ্জিত হলে কিয়ামত পর্যন্ত তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। এ কিয়ামই হল মহান অলিদের কিয়াম তথা অবস্থা। তাঁরা এক কিয়াম অবস্থায় পুরো জীবন কাটিয়ে দেন। এ এক কিয়ামেই তাঁদের নামাজ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং তাঁদের আহ্‌ওয়াল তথা ভাবান্তরসমূহের মাধ্যমে রুকু সিজ্‌দা প্রকাশ পায়। যেমন– বৃক্ষাদির সিজ্‌দা, তাদের ভাবের মাধ্যমে সিজ্‌দা সম্পন্ন হয়। রুকু, তথা উপর দিক থেকে মাথা নিচু করা সফর থেকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করা বোঝায়। অর্থাৎ, এটা এ সফরে পৌঁছার মঞ্জিল। এখানেই এ সফরের ফলাফল এবং উপকারিতা অর্জন হয় এবং 'আহ্‌ওয়াল' তথা ভাবগত সফরে মস্তক অবনত অবস্থায় যে নিয়ামত এবং বরকত রয়েছে, তাও এখানে সংগ্রহ করতে হয়। যেমন– গাড়ি অথবা জাহাজ থামিয়ে যার যার দেনা পাওনা দিয়ে অবসর হয়ে যাওয়া। কিন্তু ঐ সময় কুতুবী দর্পণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। আর ঐ উভয় আঙ্গুলকে দেহের মধ্যে কুতুব বলা হয়। এখানে কুতুবী দর্পণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে আহ্‌ওয়ালে কুতুবিয়া তথা কুতুবদের ভাব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ কারণে গাউস-কুতুবদের দৃষ্টি সদা জমিনে নিবদ্ধ থাকে,

যেন পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। উক্ত কারণেই চার জন কুতুব পৃথিবীর চারপাশে সদা দণ্ডায়মান থাকেন। এ চার কুতুবের ফয়েজ দেহের চার কুতুবের ওপর প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ হাত ও পায়ের চার বুড়ো আঙ্গুলের উপর থাকে, যাকে আরবিতে 'এবহাম' বলে। এ কারণে নামাজে আঙ্গুল জমিনে যুক্ত থাকে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন তা জমিন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না পারে।

মোটকথা রুকুর ভেতরে নামাজী মুসাফির গন্তব্যে যাত্রার পর পূর্ণ নিয়ামত গৃহে পৌঁছে আত্মিক সফরে রত হয়। অর্থাৎ যে সফরে নফ্‌সের মিরাজ এবং কাশ্‌ফ বা প্রভুসত্তার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে– نحن اقرب اليه من حبل الوريد (নাহ্‌নু আক্‌রাবু ইলাইহি মিন্ হাব্‌লিল ওয়ারীদ্) অর্থাৎ, "আমরা তার শাহ্‌রগের থেকেও নিকটে" এ ঘোষণার মর্মার্থ পুরোপুরিভাবে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ, এ স্তরে নৈকট্য সূত্রে একাত্মতা ঘটে এবং وهو معكم اينما كنتم (ওয়া হুওয়া মাআকুম আইনামা কুন্‌তুম) অর্থাৎ, (থাকেন তিনিও তোমাদের সাথে যথায় আছ তোমরা) অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন, তোমরা নামাজের মাধ্যমে যেভাবে এবং যেরূপে ইবাদত করছিলে, তখন আমিও তোমাদের সাথে এবং নিকটেই ছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, নিকট থেকে সাথী সত্তা অধিক উত্তম ও দৃঢ়। অর্থাৎ যা শাহ্‌রগ থেকে নিকটতম তাই সাথীত্ব অর্জনের স্থান যা কল্‌বে মুদাব্বির তথা চক্রাকার অন্তরের একেবারে মাথায় অবস্থিত। অতএব নামাজে নিজেকে নিকট করা ভূমি সত্তার সাথে স্বয়ং সম্পৃক্ত হওয়া। যার প্রকাশ 'নূরে মাহ্‌মুদা', যা দুভ্রুর মধ্যস্থল তথা মূল কপাল এবং তা আল্লাহ্ দর্শনের দর্পণ। নাকের মাথা হল রহস্যময় গোপন নালা এবং সত্যতার দর্পণ। এজন্য সিজ্‌দায় দৃষ্টি নাকে নিবদ্ধ রাখতে হয়। আর দুটি সিজ্‌দা দুটি বেলায়েতের ফলশ্রুতি। যেহেতু দ্বিতীয় বেলায়েত প্রথম বেলায়েত থেকে উত্তম। সেহেতু প্রথম সিজ্‌দা থেকে দ্বিতীয় সিজ্‌দা উত্তম। অর্থাৎ, প্রথম সিজ্‌দায় নিকটে আর দ্বিতীয় সিজ্‌দায় নিকটতম হওয়া যায়। দূরত্ব থেকে নৈকট্য আর নৈকট্য থেকে দূরত্বের প্রয়োজন রয়েছে। এজন্যই নৈকট্য লাভের পর সফরে দূরত্ব ঘটায় আর এ উভয়ের মধ্যে যে মঞ্জিল রয়েছে তা একটিই। তাই রুকু একটি হয়েছে। একটি নৈকট্য ও সাথীত্ব লাভের শুক্‌রিয়াস্বরূপ আর অপরটি হল আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশে নিবেদিত। এ জন্য সিজ্‌দা দুটি হয়েছে। অতঃপর সিজ্‌দার শেষে বৈঠক উভয় দিকের মোসাহেদার ইঙ্গিত, যা বক্ষমধ্যে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, বক্ষমধ্যে সমগ্র জগতের জ্ঞান রহস্যে বিদ্যমান। এ জন্য তাকে জগৎপাত্র বলা হয়। সবশেষে সালামের মাধ্যমে অবসর হওয়ার অর্থ হল অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। এ অবস্থায় কথা বোধগম্য হয়। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে মিরাজের পথে ছিল, এমন তা থেকে অবতরণ হল। এ সালাম কোনো ফেরেশতাকে এবং কোনো লোককেও দেওয়া যেতে পারে। দু রাকাত নামাজের অর্থ হল দু'বার নিয়ামতের ভিতরে প্রবেশ করে তৎসহ বের হয়ে আসা আর চার রাকাত নামাজের দু রাকাত হল আল্লাহ্‌র ইবাদত আর বাকি দু রাকাত হল শুক্‌রিয়া।

সাহায্যের বর্ণনা

সাহায্য দু প্রকার– (১) মিলনের সাহায্য, (২) নৈকট্যের সাহায্য। পরম সত্তায় একাত্ম হওয়ার সাহায্যই মিলনের সাহায্য। যা সাহায্যকারীর সত্তার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত তা সাহায্যপ্রার্থীকে ভাবান্তরের মাধ্যমে সহায়তা করে, এটাই আসল সাহায্য। এ সাহায্যকারীই আসল সাহায্যকারী আর তা হল প্রভুসত্তা।

দ্বিতীয়ত, নৈকট্যের সাহায্য নৈকট্যের সে উৎসকে বলা হয়, যা নৈকট্য অর্জনের পথে রাহ্‌মানী সত্তা বান্দার গুণগত অবস্থাদির সহায়ক হয়। নৈকট্যের উৎসের সাথে মিলিত ব্যক্তিও নৈকট্যপ্রাপ্ত তেমনি সে উৎসের কাছাকাছি ব্যক্তিও নৈকট্যের উৎস হাসিলের প্রেক্ষিতে নৈকট্যপ্রাপ্ত। কারণ যা মূলের নৈকট্যপ্রাপ্ত তার নিকটতম বস্তুও নৈকট্যপ্রাপ্ত। যে কোনো সাহায্য প্রাপ্তির জন্য উসিলা বা মাধ্যম প্রয়োজন। কারণ, এর মূল হল নৈকট্য ও মিলন। এ কারণে সাহায্য কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নয়। সকল প্রজাতির মধ্যেই সাহায্য সাধারণভাবে বর্তমান। অর্থাৎ সত্তাগত সাহায্য সত্তা থেকে, গুণগত সাহায্য গুণ থেকে আর অবস্থাগত সাহায্য অবস্থা থেকে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'য়ালার জাত ও মর্যাদা থেকে সাহায্য বান্দার জাত ও মর্যাদাতে নিপতিত হয়। কোনো সাহায্যপ্রার্থীর পক্ষেই কোনো উসিলা ব্যতীত তা পাওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে সাথীত্ব বলতে মূল সম্পর্ক সূত্রের সাথে অবিরত যোগাযোগ বোঝায়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাহায্য বান্দার ওপর এবং বান্দার সাহায্য বান্দার উপর। এটাও আল্লাহ্‌র সাহায্য। অতএব, বান্দার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাও পরম সত্তায় মিলিত হওয়ার জন্য নৈকট্য বা সাহায্য প্রার্থনারই অন্তর্ভুক্ত। এজন্য নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করা সকল ব্যক্তির উপর ওয়াজেব। যেমন মাতা-পিতা ও অন্যদের সাহায্য। যে ব্যক্তি এ সাহায্যকে অস্বীকার করে, সে কাফির। স্মরণীয় যে, মানুষের প্রতি মানুষের অনুগ্রহ করা ওয়াজেব। কারণ এক মানুষ অপর মানুষের সাহায্য হিসাবে অনুগ্রহ করবে, অন্যথায় পাপ হবে। এটা নৈকট্য লাভের সাহায্য। এ অনুগ্রহ এবং নৈকট্যের সাহায্য যার নেই তার নৈকট্য লাভ হয়নি। অপর দিকে যে ব্যক্তি নৈকট্যের সম্পর্ক রক্ষা করে সে আল্লাহ্‌র নিকট তথা তাঁর মহামহিম ব্যবস্থার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সাহায্য প্রদান করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি এ সাহায্য চাওয়া বা সাহায্য দেওয়ার কার্যাদি থেকে দূরে থাকে, সে শুধুই কেবল আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করছে। সে ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অবস্থান আকাশে। তা না হলে কোন সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ আকাশে অবস্থান করেন? তাদের হতবাক হয়ে চুপ থাকা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। এ শ্রেণীর লোকেরা সর্বদাই সৃষ্টিজাত সাহায্যকে অস্বীকার করে। তারা জানেই না যে, উসিলা ছাড়া সাহায্য সম্ভব নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টি উসিলা বা মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। তথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস প্রভৃতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই বাস্তব রূপ গ্রহণ করেনি। তথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস প্রভৃতির মধ্যে ব্যবস্থাপক শক্তি নিহিত রয়েছে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঐ সকল বস্তু নির্মাণে যা কিছু প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদের

সাহায্য কর এবং সংযোজন কর তাতে যা সংযোজন করা প্রয়োজন। অতঃপর প্রত্যেক বস্তু অস্তিত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব শ্রেণী অনুযায়ী আপন দেহকে সাহায্য করে তথা তাতে অবস্থান গ্রহণ করে। মোটকথা এগুলোকেই সাহায্য বলা হয়। আর সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সাহায্য শুধু অনুমান করেই আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়া হয়। বস্তুতঃপক্ষে তাকে আল্লাহ্‌র দায়িত্বভুক্ত করা আল্লাহ্‌র অলিদের কাজ। কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র সত্তা গুণাবলি প্রভৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। তাঁরা আত্মার রহস্য সম্পর্কে অবহিত। উদাহরণস্বরূপ কোনো বেলায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌তে ফানা তথা বিলীন হয়ে গিয়েছেন, তিনি যদি তাঁর মুর্শিদের কাছে 'বাকাবিল্লাহ' তথা আল্লাহ্‌তে স্থিতিবান হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে মুর্শিদ আল্লাহ্‌র সত্তায় স্থিতিবান অবস্থান থেকে আপন মুরিদকে সাহায্য করবেন এবং যার স্থিতি অর্জিত হয়েছে, তিনি মুর্শিদের মৌলিক বস্তু তথা আল্লাহ্‌র ও মূল সত্তা মুরিদকে দান করবেন। অনুরূপভাবে এ পর্যায়ে এসে একক উৎসে মিলিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, বান্দা একক সত্তায় পৌঁছে স্থিতিবান হয়ে যাবে। এ হাদীস শরীফে তার মর্মার্থ ব্যক্ত হয়েছে– الفقو اذاتم فهو الله (আল ফাক্করু ইজা তাম্মা ফাহুয়াল্লাহু) অর্থাৎ, বেলায়েতের সমাপ্তির পরিপূর্ণতার ফলশ্রুতিতে যে ফকিরী তাই আল্লাহ্ তথা মানবীয় রূপ গুণাবলি থেকে মুক্ত সত্তাই আল্লাহ্। কারণ তাঁর সত্তা আল্লাহ্‌র সত্তায় স্থিতি লাভ করে গেছে। যেমন মাওলানা রুমী বলেন,

"গর্ জোদা বিনি আজ্ হক্ব-ই খাওয়াজ্‌রা
গম্ কুনি হাম্‌তন্ ওয়াহাম্ দিবাজ্‌রা।"

(অর্থাৎ, মুর্শিদকে আল্লাহ্ থেকে আলাদা দেখলে তাঁর আদ্যোপান্ত সব হারিয়ে গেল)। তাই হযরত মুজাদ্দিদ (রঃ) তাঁর মকতুবাতে বলেন, "পীরে তাস্‌ত আউয়াল মা'বুদ তাস্‌ত্।" অর্থাৎ, তোমার পীর-ই তোমার প্রথম মা'বুদ। সুতরাং যার এ যোগ্যতা নেই সে কী করে অন্যকে ফানাফিল্লাহ্‌র ব্যাপারে সাহায্য করবে? অযোগ্য ব্যক্তি অন্যকে সাহায্য করতেও অক্ষম। তার কাছে সাহায্য চাওয়া অযথা।

বিবাহের স্থায়িত্ব

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। কিয়ামত পর্যন্ত এ সম্পর্ক ছিন্ন হয় না, যদি তা রক্ষা করা হয়। যেমন– ঈমান ইত্যাদি। তবে প্রকৃত ঈমান কখনো আলাদা হয় না, কিন্তু অপ্রকৃত ইমানের ভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে অধিকাংশ নবী-অলিদের মধ্যে প্রকৃত বিবাহ বর্তমান। এজন্য নবী-অলিদের পবিত্র স্ত্রীগণকে কোনো উম্মত বা মুরিদ বিবাহ করতে পারে না; বরং তাঁদের বেলায় মাতৃত্বের বিধানাবলি প্রযোজ্য। তাঁরা পরলোকগমন করার পরও জীবিতদের সঙ্গে তাঁদের রূহানী সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। তাই কোরান পাকে বলা হয়েছে– لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموات بل احياء (লা তাহ্‌সাবান্নাল্লাজীনা কুতিলু ফি

সাবীলিল্লাহি আমুয়াতান্ বাল্ আহ্ইয়াউ) অর্থাৎ, শহীদদেরকে মৃত বলো না, বরং তাঁরা জীবিত, তাঁরা আহার করছে এবং বিশ্রাম করছে। এখানে বিশ্রাম কথাটি সাধারণ। সমজাতীয়তা সূত্রে আবদ্ধ বিবাহে, জীবিত ও মৃত অবস্থায়ও কোনো পার্থক্য নেই। এজন্য তারা কবর এবং কিয়ামতেও আপন আপন বিবিদের পাবেন। সাধারণ লোকদের বেলায়ও কারও বিবাহই বাতিল হয় না, স্থগিত হয়ে যায় মাত্র। এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব থেকে যায়।

অপরদিকে তালাকপ্রাপ্ত হলে উত্তরাধিকারিত্ব থাকে না; বরং তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বৈবাহিক সম্পর্কও চলে যায়। কিন্তু বিবাহ যখন স্থগিত থাকে এবং বাতিল করা না হয়, তখন স্বামী-স্ত্রীর রূহ্ যদি সমজাতীয়তার সম্পর্ক রাখে, তাহলে ইহজগতে রূহানী সম্পর্কসূত্রে তথা স্বপ্ন ইত্যাদিতে এবং সত্তা সম্পর্কসূত্রে কবরে ও কিয়ামতে প্রকৃত সম্পর্কসূত্রে পরস্পর ব্যবহৃত হতে থাকবে। উপর্যুক্ত প্রামাণ্য বিশ্লেষণের পর স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পরস্পর মুখোমুখি হওয়া, একে অন্যকে গোসল করানো বা কবরে নামানো প্রভৃতি কাজের অবৈধতা সম্পর্কে মজবুত কোনো দলিল প্রমাণ নেই। ফিকার কিতাবে যদি কিছু লিখেও থাকে তা সাধারণ ফেৎনার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। অন্যথায় প্রাণহীন দেহে ফেৎনার কোনোই আশংকা নেই; বরং তাকে মানুষ অবজ্ঞা করে বা ভয় পায়। হাদীস শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবী স্ব স্ব উম্মতের সাথে এবং প্রত্যেক দলনেতা আপন আপন দলের সাথে থাকবে। তাঁরা ভালো হোক অথবা মন্দ হোক। শুধু কিয়ামতেই নয়; বরং কবর, রূহের জগৎ এবং মঞ্জিলে সর্বদাই থাকবে। তাছাড়া পিতা-মাতা এবং ভ্রাতা-ভগ্নি ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনের সাথে রূহানী সাজাত্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, ভাইবোনদের অধিকার বাতিল হয় না। তাঁরা সকল পাওনার অংশীদার এবং তাঁদের কোনো অধিকার বাতিল হয় না। তাহলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর অধিকার কী করে বাতিল হবে? নবী-অলিদের ক্ষেত্রে তো এ প্রশ্নই উঠে না; বরং সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রেও কোনো স্ত্রীলোক যদি সাজাত্যের প্রেক্ষিতে স্থগিত বিবাহকে বাতিল না করে, তাহলে তাঁদের অন্তরঙ্গতার প্রভাব কী করে বাতিল হবে এবং এ প্রভাব বাতিল হওয়ার কী কারণ আছে?

স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের বেলায় সকল বস্তুর মূল একই। যেমন– গম বা ভূট্টার দানাগুলো থেকে প্রথমত একটি দানা রোপণ করা হয়। তা থেকে বৃক্ষ ও ডালপালা গজানোর পর তাতে আবার দানা উৎপন্ন হয়, শত-সহস্র সংখ্যায়। এসব দানার জাত ও গুণে কোনো খুঁত নেই; বরং সবগুলোরই স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এক। এগুলোকে যদি পুনরায় রোপণ করা হয়, তাহলে তা থেকে শত-শত সংখ্যায় উৎপন্ন হবে।

যে ব্যক্তি উক্ত স্থায়ী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন, তিনি আরেফ এবং মুহাক্কেক। তিনি আত্ম জ্ঞানালোকে আপন রূপ গুণ ও পূর্ণতার মাপকাঠিতে আপন আল্লাহ্কে চিনতে পারেন। কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আল্লাহ্র প্রকাশ তার প্রকাশ মাধ্যমের অনুরূপ হওয়া জরুরি। প্রবাদ আছে– "যেমন কূপ, তেমন জল। আর যেমন গাছ তেমন ফল।" অর্থাৎ, স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে মিষ্টি ও তেতো বিভিন্ন স্বাদে রকমারি সব ফল আপন মিঠা-তিতা প্রভৃতি স্বাদে অভিন্ন। এগুলো যখন এদের স্থায়ী উৎস থেকে প্রকাশিত হয়, তখন এদের স্ব স্ব গুণাবলি প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে তা স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের-ই প্রকাশ। যেহেতু সকল বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস আল্লাহ্র সত্তা, সেহেতু যে স্থানে অথবা যে মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত উপলব্ধিতে তাই সত্তা। এ নীতি সম্পর্কে যিনি চিন্তা করেছেন, তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো মিষ্টি ভাষায় আপন পরিচিতকে এভাবে স্মরণ করেন–

"গাহে দার সুরতে লাইলী ফেরোশোদ
গাহে আজ সুরতে মজনুন্ বর্ আমদ্।"

অর্থাৎ, কখনো লাইলির পোশাকে আবৃত লাইলির মধ্য দিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়েছে আবার কখনো প্রকাশিত হয়েছে মজনুরূপে। প্রকৃতপক্ষে এটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ধরন ও দলিল। যার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি, সে আরেফ নয়। আর যার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য স্থিতিবান নেই, সেও আল্লাহ্ নয়। যার ওপর এসব বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে তিনি মহাপ্রভাবশালী। তিনি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্ থেকে গাফিল নন। চাই তিনি কা'বাতে থাকুন বা মন্দিরেই থাকুন না কেন? যেখানে ধোঁয়া দেখা যায়, সেখানে অবশ্যই আগুনের অস্তিত্ব থাকতে হবে। অনুরূপ আরও একটি নির্দিষ্ট বচন আছে, "যত কল্লা তত আল্লাহ্।" অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতেরই মূল উৎসের বৈশিষ্ট্যের বিচারে আল্লাহ্র সত্তার প্রকাশ। সকলেই আপন আপন যোগ্যতানুযায়ী তাকে উপলব্ধি করে। আর যারা এ বিষয়ে অজ্ঞ, তাদের একূল সেকূল কিছুই নেই। এরা গাফিলের দল বিভ্রান্ত এবং জড়বুদ্ধি। এরা কোরান কী বুঝবে, হাদীসেরই বা কী জানবে? এরা কোরানের প্রশংসাকারী হতে পারে, কিন্তু এদের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত কোরানের কোনো মর্ম উদ্ধার হবে না; বরং আল্লাহ্র আরেফের একটি বাক্যের মর্মেরও সমকক্ষ হবে না তাদের সারা জীবনের লেখা কিতাব ও বক্তব্য। আল্লাহ্র আরেফ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্র পূর্ণতার দৃষ্টিতে কোরান হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের অবশ্যই যোগ্য।

নিশ্চিত জ্ঞানের বিবরণ

সুনির্দিষ্ট উৎস থেকে এ নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। আপন জীবন ও নফ্সের গুণাবলির মূল বস্তু হল জ্ঞান। তা থেকে রকমারি গুণাবলি ও ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। বৃক্ষ বক্ষে দানা ও বীজ যেভাবে লুকায়িত থাকে অনুরূপভাবে আদি সত্তায় লুপ্ত থাকে

প্রকৃত জ্ঞান এবং তা থেকে প্রকাশিত হয় নানা প্রকার গুণাবলি। এটা আলাদা কোনো বস্তু নয়; বরং তা আপন ঘর এবং অভ্যন্তরীণ মর্যাদা ও গুণ। যেমন প্রদীপ নিজেই আলো এবং দীপ্ত। কোনো অন্ধ বা আড়াল ব্যক্তি যদি না-ও দেখতে পায়, তাহলেও কারও দেখার ওপর প্রদীপের আলো নির্ভরশীল নয়; বরং দৃষ্টিবানের দেখা ও দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। যার জীবন ও নফ্‌স যে পরিমাণে শক্তিশালী, তার দেহও সেরূপ আলোকস্তম্ভের মতো। তাতে সে আলো প্রদীপ্ত হয়। তবে প্রথমত কোনো জীবদেহ সত্তাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে দেহের কয়েকটি স্থান তার প্রতিচ্ছায়া এবং তেজে আলোকিত হয়ে যায়। এটা হল কোনো উজ্জ্বল প্রদীপ থেকে কোনো অনুজ্জ্বল প্রদীপের সামান্য আলোকিত হওয়ার মতো। অবশিষ্ট লুপ্ত নফ্‌সের জ্ঞান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হবে। এটা হলো দানার মতো, যা বাহ্যত একটি গোটা, কোনো গাছের ফল এবং উৎস যার অভ্যন্তরে রয়েছে হাজারও বৃক্ষ এবং গুণাগুণ। তা প্রকাশের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন। এর জন্য সময় নির্ধারিত রয়েছে, যখন তা থেকে আরও বৃক্ষ, দানা ও বীজ প্রকাশিত হবে। কিন্তু বাহ্যত তা একটিমাত্র সত্তা হলেও তার মধ্যে লুপ্ত রহস্যাদি ও জ্ঞানের বিষয়ে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত কে জানবে যে, তা এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বিরল সত্তা এবং মহান অস্তিত্ব। অতএব প্রত্যেক বীজে নিহিত সত্তা, তা দ্বারাই পরিচিত হয় বা পরিচিত হবে অথবা অজ্ঞাত থাকবে বা অস্বীকার করা হবে। এটাও উক্ত বীজের এক অস্পষ্ট প্রান্তিক সত্তা। তা জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞতা, আলোর বিপরীতে অন্ধকার, পথপ্রাপ্তির বিপরীতে পথভ্রষ্টতা, সচেতনতার বিপরীতে অচেতনতা এবং সুস্থতার বিপরীতে অসুস্থতা। মোটকথা এটা এ রকম, যেমন– আগুন যদিও উজ্জ্বল এবং গরম; কিন্তু যে জিনিসের মাধ্যমে আগুন প্রকাশ পায় তার সংস্পর্শে আগুনের ধূম্রান্ধকারাচ্ছন্নতা আগুনের উজ্জ্বলতার মধ্যে ভিন্ন গুণ সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার পার্শ্ব বস্তু বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধ হয়ে যায়। অথচ আগুনের প্রভাবে আবার অধিকাংশ জিনিসের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গুণের প্রকাশের সাথে মূল বস্তুও আরও বিকশিত হয়। কারণ সত্তার ফল গুণ, আর গুণের ফল সত্তা। যে বস্তুতে যে গুণ প্রকাশ পায় এবং সমাপ্ত হয়, সে ধারার চূড়ান্ত ফলাফলও সেভাবেই নির্ধারিত হবে। যেমন কোনো বস্তু যদি আগুনের তাপ পেলে সুগন্ধ হয়, তাহলে মূল্যও সেরূপ হবে। আর এতে যদি তা বিস্বাদ হয়, তাও সে বস্তুরই ভাগ্য।

উপরের আলোচনায় আমাদের বক্তব্য বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে গেল। অর্থাৎ, মানুষের দ্বীন ও ঈমানের নূর এবং প্রদীপকে রওশন করতে হলে ঈমানের জ্ঞান প্রয়োজন। সে জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঈমানই হয় না। তা হল অন্ধকার, আবরণ এবং বিভ্রান্তি এর পরিণতি অন্ধকার আর ভ্রষ্টতা। যথাস্থানে নয় এমন বস্তু মাত্রই অপদার্থ। যেমন– যে ব্যক্তি হিসাবের খাতায় ভুল করে বা তা বিনষ্ট করে, সে কি কোনো মূল্যবান ব্যক্তি? অনুরূপ কেউ যদি অজ্ঞতা এবং অলসতা দিয়ে ঈমানের পাত্রটিকে বিনাশ করে ফেলে, সে তো নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। তবে ঈমানদার না

হওয়া পর্যন্ত ঈমানের জ্ঞান প্রকাশ পাওয়া দুষ্কর। যেমন– দুটি বস্তুর ঘর্ষণ ছাড়া প্রজনন অসম্ভব তেমনি ঈমান জন্মের জন্য ঈমানদার প্রয়োজন। জ্ঞান বীজে বৃক্ষ নফ্‌সের মধ্যে বর্তমান থাকলেও তার প্রকাশ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মাটির সহায়তা না পেলে তা থেকে কখনো বৃক্ষ গজাবে না। যেমন অপর কোনো বস্তুর সহযোগ ছাড়া আগুনের প্রকাশ অসম্ভব। অনুরূপ 'ঈমান' মুর্শিদ ব্যতীত অর্জন সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঈমানি জ্ঞানের কিতাব হল মুর্শিদের নূরী অন্তর। তাঁর দীক্ষার আলোকে মুরিদের প্রদীপটি আলোকিত হয়। তা ব্যতীত যে কাগজের পাতায় এবং মৌখিক গুণকীর্তনে লিপ্ত হয়ে গেছে, সে পর্দার আড়ালে পড়ে যায় এবং পথভ্রষ্ট হয় কারণ, যেখানে পানাহারের ব্যাপার, সেখানে পড়াশুনার কোনো ফায়দা নেই। তাছাড়া ঈমানের বৈশিষ্ট্যই হল সে ঈমানদার দেখলে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, সন্তুষ্ট হবে, শান্ত হবে, ভদ্র হবে, সহাবস্থানকারী হবে, সফরসঙ্গী হবে এবং ভালোবাসবে। তাহলে সে প্রেমাস্পদের সেবার মাধ্যমে একত্বের সাগরে ডুব দিয়ে জ্ঞান ও জ্ঞেয় একই পাত্রে পরিণত হয়ে যাবে। তখন সে ঈমানে মুহাম্মদী এবং হাক্বিকতে আহাম্মদীর জ্ঞান পাবে এবং অবহিত হবে ঈসার ঔজ্জ্বল্য, মূসার পূর্ণতা, ইবরাহীমের রহস্য এবং আদম (আঃ)-এর হাকিক্বত সম্পর্কে। ফলে হয়ে যাবে সে হাদীসে কুদ্‌সীর আমলদার এবং পরিণত হবে সে– كنت كنز مخفيا (কুনতু কুন্‌জাম মুখফিইয়ান) (আমি ছিলাম গুপ্ত ধন)-এর প্রকাশ মাধ্যম এবং মর্মার্থে এবং সৃষ্টি করবে আপন প্রকাশের বীজ এবং কর্তা-কর্মে একই ফলাফল দেখাবে। যেমন– জ্ঞানের বিষয় অবগত ব্যক্তি জ্ঞানী। জ্ঞান যখন স্থিত হয়ে যায়, তখন সে জ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হয়।

তাছাড়া তোমরা যখন জানলে যে, নিজেকে ফানা বা বিলুপ্ত করা এবং আল্লাহ্‌র সত্তায় স্থিতিবান হওয়া আর প্রবেশসূত্রে সত্তায় বর্তমান থাকা অবস্থায় আপন উৎস স্বীয় গুণাবলি সম্প্রসারিত করে এবং বিবেচিত হয় সমস্ত গুণাবলি সারা বিশ্বে শাখা-প্রশাখা হিসেবে, তখন আল্লাহ্‌র সত্তার বাইরে কোনো বস্তু থাকে না। সুতরাং তাঁর সত্তার বর্তমান সকল বস্তু সর্বাবস্থায় এবং সকল সৃষ্টিতে তাঁর সত্তায় সম্পৃক্ত। কারণ আল্লাহ্‌র সত্তা সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং কোনো বস্তুই সত্তা থেকে মুক্ত নয় এবং সত্তাও কোনো বস্তু থেকে মুক্ত নয়। যদি পরস্পর মুক্ত হয়, তাহলে 'মোহিত' বা ব্যাপ্ত শব্দের কোনো অর্থ হয় না। তবে সকল বস্তুতে আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পৃক্ত থাকলেও নবী-অলিদের সত্তায় তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। যেমন– আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই বর্তমান কিন্তু দিয়াশলাইতে তা আছে পরিপূর্ণরূপে। তা অতাপিত অবস্থায় শীতল থাকে। অনুরূপভাবে আউলিয়া, যিনি আপন মুর্শিদ, তাঁর মধ্যে ফানা হওয়া আর আল্লাহ্‌র সাথে ফানা হওয়া একই কথা। তবে তাদের মধ্যে প্রকাশের বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন– আগুন দিয়াশলাইয়ে। অন্যথায় সব বস্তুতেই আগুন বর্তমান।

জ্ঞানের প্রকাশ

আপামর জনসাধারণের কথা হল, আগামীতে কী হবে, গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, কোথায় কার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কবে হচ্ছে তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। কেননা কোরানে তাই আছে। এখন প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানী এবং কাশ্ফের অধিকারী ব্যক্তিবর্গও তো বলেন, গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, প্রকৃতপক্ষে তাই হয়। এর হাজার প্রমাণ তোমাদের সামনে পেশ করব। তবে এ আল্লাহ্র জ্ঞানের একবিন্দু মাত্র। এর প্রকৃত অর্থ হল, মূলত আল্লাহ্ই জ্ঞানী আর মানুষ আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে অংশ বিশেষ পেয়েছে। অর্থাৎ, যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তখন নিজের জ্ঞানের বিষয়ে অন্যকে অবহিত করেন। তাই আল্লাহ্ বলেন, ولايحيطون بشئ من علمه الابما شاء (ওয়ালা-ইউহীতুনা বিশাই ইম্ মিন ই'ল্মিহি ইল্লা বিমা-শা-আ) অর্থাৎ, আল্লাহ্র ইচ্ছা না হলে কোনো বস্তুই তার জ্ঞানের কোনো অংশ দ্বারা আবিষ্ট হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে আপন জ্ঞান দান করেন, তিনি আল্লাহ্র জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং অবহিত হন গোপন বস্তু সম্পর্কে। যেমন নূরে ছুদুর (আলোকিত বক্ষ) হযরত খিজির (আঃ)-এর সে জ্ঞান ছিল, যার মাধ্যমে তিনি জ্ঞাত ছিলেন, আগামী দিন বা আগামীতে কী করতে হবে। যথা– ছেলেটি হত্যা করা বা নৌকাটিকে ডুবিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এসব বিষয়ে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে কী করে এগুলোর উদ্দেশে এগুলেন? মহাজ্ঞানের তুলনায় এতো অতি সামান্যতম কাজ। এ স্তরের লোকদের হৃদয়পটে অনুরূপ হাজারও গুপ্ত-জ্ঞান প্রতি মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়। এটাকে বলা হয় 'ইল্মে জাত বা লাদুনী' অর্থাৎ, পরম সত্তার তরফের জ্ঞান। এ শ্রেণীর লোকদের এছাড়া উপায়ই বা কী? তাই কোরান পাকে বলেছেন, اوز عني ان اشكر نعمتك التى انعمت علي وعلي والدى (আওজাআনি আনআসকুরা নিয়ামাতিকাল্লাতি আন্ আম্তু আলা ওয়াআলা ওয়ালিদি) অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এল্হাম বা প্রত্যাজ্ঞান দান কর, তুমি আমাকে এবং আমার পিতাকে যে নেয়ামত দান করেছ, সে জন্য যেন তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। এটা ছিল হযরত সিদ্দিক (আঃ)-এর ফরিয়াদ। এতে সুস্পষ্ট যে তাঁর পিতাও বেলায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন। এ কারণে নিজের জ্ঞানকে পিতার জ্ঞানের তুলনায় দুর্বল মনে করেছেন এবং নিজের জ্ঞানকে পিতার জ্ঞানের ফলশ্রুতি ঠাউরিয়েছেন অথবা উভয়ের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন অথবা এখানে পিতা অর্থে পূর্ব মুরুব্বি এবং নবী-অলিদের বোঝানো হয়েছে। এ এল্হামের দ্বারা আল্লাহ্র সত্তা ও পূর্ণতা তথা গোপনের বিষয়সমূহ অবহিত হওয়া যায়।

অদৃশ্য জ্ঞানের অভ্যন্তরে এবং মর্মের সবটাই একক সত্তা এবং হাক্বিকত। অতএব এ বিষয় যিনি অবহিত, অদৃশ্যে আড়ালে যা কিছু রয়েছে তা তিনি জানেন।

তাই আল্লাহ্পাক বলেন– ومن جهد فينا لنهد ينه سبلن ا (অমান জাহাদা ফিনা লানাহ্দিইয়ান্নাহু সুবুলানা) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সত্তায় সচেষ্ট হয় আমি তাকে আমাদের পথ প্রদর্শন করি। আল্লাহ্পাক বলেন, ولايظهر علئ غيبه احد الامن ارتضى من رسله (অলা ইয়াজহারু আলা গাইবিহি আহাদুন্ ইল্লা মানির তাদা মির রাসূলিহি) অর্থাৎ, যে রাসূলের ওপর আল্লাহ্ রাজি, তাকে ছাড়া কারও নিকট আল্লাহ্ নিজের গোপন প্রকাশ করেন না। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে রাসূলের ওপর আল্লাহ্ রাজি, তার কাছে তিনি নিজের গোপন প্রকাশ করেন। এখানে রাসূল দ্বারা ইল্মে লাদুনীর অধিকারী ব্যক্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। এ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বই প্রকৃত রাসূল। এদের জ্ঞানের বদৌলতে গোপনীয়তার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ হযরত খিজির (আঃ) এবং হযরত বারখ্ প্রমুখদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা নবী না হলেও ইল্মে লাদুনীর ক্ষেত্রে খুবই শক্তিধর।

এখানে রাসূল দ্বারা কেবল নবী-রাসূল উদ্দেশ্য হলে স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উক্ত বাণীর যথার্থতা বহাল থাকে না। প্রকৃতপক্ষে কিতাবসহ আগত প্রকাশ্য নবী রাসূলগণ এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং জ্ঞানদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এর উদ্দেশ্য। যার বদৌলতে বাতেন রূপ প্রকাশিত হয়, তিনি হলেন আত্মনিষ্ঠ রাসূলদের মধ্যে প্রধান। অর্থাৎ, রিসালাতের মর্ত বার মধ্যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী হয়, সে প্রকৃত রাসূলের মধ্যে গণ্য। কেননা কোনো ব্যক্তি তার জাহেরা কিতাব বা সংবাদসহ আগমন করেন। আর কেউ বাতেনী কিতাব এবং মূল উৎস সহ প্রেরিত হন। যেমন হযরত নূরেছুদুর, যদিও তিনি প্রকাশ্য নবী নন কিন্তু বাতেনে তিনি রাসূল ও নবী।

মোট কথা গোপন জ্ঞান হল সূক্ষ জ্ঞান। যে তা জানে না তার জন্য তা বিরল এবং সূক্ষ্ম বিষয়। এরূপ জ্ঞান বহু প্রকার। যেমন গুটি পোকা প্রভৃতি রেশম তৈরী করে এবং বিজ্ঞান জানে। সকল ব্যক্তি তা জানে না। দেখ, বিস্মিত হবে না, পিঁপড়ার যা জ্ঞান আছে, তোমাদের তা নেই। এরা এমন সব সূক্ষ্ম ও বিরল জ্ঞানের অধিকারী যদি তুমি তা জানতে তাহলে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে।

তাহলে তোমার কথায় সকল জীব যারা বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানে আলোকিত, সব কাফির হয়ে গেল। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র জ্ঞানের অধিকারী। যেমন কোনো কোনো নারীদের মধ্যে কারও বাহ্যিক আকার দেখে চরিত্র চেনার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে। এর সাহায্যে তারা অনেক কথা বলতে পারে। বস্তুত তা সত্যও হয়। তাছাড়া কোনো কোনো পাখির মধ্যে এমন ক্ষমতা বিদ্যমান, যার দ্বারা সে ভবিষ্যৎ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে থাকে। যেমন কুটুম পাখির উঁচু আওয়াজ শুনলেই লোকে বুঝতে পারে যে, অবশ্যই মেহ্মান আসবে। এটাকে বাংলায় কুটুম পাখি বলা হয়। বস্তুত তা সঠিকও হয়। কোনো কোনো পাখির আওয়াজ দ্বারা লোকে জানতে পারে যে, এখানে কিছু আসতে পারে বা মারা যাবে বা কোনো কাজ হবে।

সিজ্‌দার আলোচনা

সূরা বাকারার প্রথম পারায় তৃতীয় রুকুতে আল্লাহ্ বলেন, واذ قلنا للملائكة اسجدوا الادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين - (অইয কুল্‌না লিল্ মালা ইকাতিসজুদু লিআদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিসা; আবা অস্তাক বারা অকানা মিনাল কাফিরীন্) অর্থাৎ, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল, সে সিজ্‌দা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। ফলে সে কাফিরদের মধ্যে গণ্য হল। অন্যত্র সূরা আল-আরাফে অষ্টম পারায় প্রথম রুকুতে আল্লাহ্ বলেন, ما منعك ان لاتسجداذا مرتك (মা-মানাআ'কা আল্লা তাছ্‌জুদা-ইজা আমারতুকা) অর্থাৎ, আমি যখন তোমাকে হুকুম দিয়েছিলাম তখন কে তোমাকে সিজ্‌দা করতে নিষেধ করেছিল। তৃতীয়ত তেইশ পারায় সূরা ছোয়াদ্-এর চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ্ বলেন, ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى (মা মানাআ'কা আন তাছ্‌জুদা লিমা-খালাক্কতু বিইয়াদি) অর্থাৎ, কোন জিনিস তোমাকে নিষেধ করেছে তাকে সিজ্‌দা করতে যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্‌র কালামে সিজ্‌দার ব্যাপারে বার বার তাগিদ করা হয়েছে। সিজ্‌দায় সম্মান প্রদর্শন, আত্মবৈশিষ্ট্য এবং আত্মবিশ্লেষণ বিষয়টি ছাড়া আর কী আছে? বস্তুত কোরানেই উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোরানের বক্তব্য এবং সিজ্‌দার সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। সিজ্‌দা কাকে বলে? জমিনে কপাল ঠেকালে কি সিজ্‌দা হয়, না অন্য কিছুও আছে? জমিনের উপর দাঁড়ানোই কিয়াম, না-এর অন্য কোনো অর্থও আছে? প্রথম খণ্ডে (জামেনূর) এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মূর্খরা সরাসরি সিজ্‌দার বিরোধিতা করে কোরানকে পাল্টে দিয়ে কাফির হয়ে গেছে। আক্ষেপ! এ বিষয়ে তাঁর খেয়ালই নেই যে, ইবলিস সিজ্‌দা না করায় পুনরায় তাকে বলা হল যে, আদমকে সিজ্‌দা কর। যে মৌল সত্তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত নূরের প্রকাশক, ইবাদত এবং প্রার্থনা মঞ্জুরকারী, লক্ষ্য অর্জনের পথ প্রদর্শক এবং পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরতকারী। আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত সিজ্‌দা যাতে অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা মানবের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাওহীদে এলাহির ধারণা তথা সালতানাতের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। এটা খিলাফতের সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। যারা এটাকে অস্বীকার করে তারা ভ্রষ্ট এবং কাফির। এর প্রমাণ এর সাথেই যুক্ত রয়েছে। যেমন– শয়তান তাকে অস্বীকার করে কাফির এবং ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যে কেউ এটাকে অস্বীকার করলে কাফির হবে। কারণ এটা একটা সাজাত্য সম্পর্ক, যার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। যেমন– আলোর প্রদীপ, যা থেকে অন্য প্রদীপ আলোকিত হয়। আলোহীন প্রদীপতো অন্ধকারই। এর আশেপাশের লোকেরা আলোর খবরই রাখে না। সে তো অন্ধকারেই আচ্ছন্ন, পথভ্রষ্ট এবং অবিশ্বাসী। যে যেমন সে তাতেই সন্তুষ্ট এবং তাতে মানায়ও তাকে। এজন্য তার সন্তুষ্টি কেবল তার নিজেকেই শোভা পায়। কোরানের ব্যাখ্যা ঐশী জ্ঞানের ওপর

নির্ভরশীল। আর তা হল বেলায়েত এবং আহ্‌ওয়াল তথা ভাবমগ্ন সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান। অতএব এ জ্ঞান সম্পর্কে তোমরা যখন মোটেই অবগত নও, তখন কোরানের কোনো একটি শব্দের অর্থও তোমাদের জানার কথা নয়। কোরানের মূল বস্তু যখন আহ্‌ওয়ালে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তখন এ আহ্‌ওয়াল বা কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কি তোমরা আদৌ অবহিত? যার কোরানের জ্ঞান নেই, সে কী করে ওস্তাদ দাবি করে? এটা তো সে ওস্তাদের কাজ, যে কোরান পাঠের সময় কোরানকে অস্বীকার করছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন ফেরেশতাদের তৌহিদ সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, অর্থাৎ আদম (আঃ)-কে সিজ্‌দা করার বিষয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তখন শয়তান তা অস্বীকার করে এবং তা থেকে বঞ্চিত হয়। বস্তুত তৌহিদ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই কুফর। নিয়ম হলো যে-যে বিষয়ে হতাশ সে-সে বিষয়কে অস্বীকার করে। হাদীস শরীফে একটি দীর্ঘ গল্প আছে। সংক্ষেপে গল্পটি হল– হযরত মূসা (আঃ)-কে জনৈক মহা হতাশ ব্যক্তি তথা ইবলিস বলল, আপনি যখন তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলবেন, তখন আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তিনি বললেন তোমার জন্য অবশ্যই বলব। মূসা (আঃ) ইবলিস-এর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ্ বললেন, সে যদি আদমের কবরকে সিজ্‌দা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করব। মূসা (আঃ) শয়তানকে এ কথা জানালেন, কিন্তু শয়তান তা করতে অস্বীকার করল এবং বলল, যাকে আমি জীবিত অবস্থায় সিজ্‌দা করি নি তাকে মরার পর কী করে সিজ্‌দা করি? এর তাৎপর্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এতে বোঝা যায়, আদমের মর্যাদা কবরেও পূর্বের মতো সুউচ্চ। এ কারণেই কবরকে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং শয়তান তা অস্বীকার করে। অথচ ফেরেস্তাগণ এর বদৌলতে উন্নত মর্যাদা লাভ করেন। ঐশী বৈশিষ্ট্য এবং আদমের মর্যাদার এই যে সম্পর্ক, এটা জাতি তথা মৌলিক। এ বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে যে বিদ্যা বা জ্ঞান দরকার, তা হল শ্রদ্ধা, মহব্বত ও বিশ্বাস। তা হল প্রেম। এর ভিত্তিতেই ফেরেশতাগণ নূরে কাদিম তথা আদম (আঃ)-কে সিজ্‌দা করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রশংসনীয় মর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কে সিজ্‌দা করার কারণে আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং এ সিজ্‌দার কারণে আল্লাহ্ তাঁর সত্তায় বর্তমান সমস্ত পূর্ণতা, যা পথ প্রদর্শক ও পথপ্রার্থীর মধ্যে যোগসূত্র, তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। তা না হলে আদমকে কেন সিজ্‌দা করল, আল্লাহ্‌কে কেন সিজ্‌দা করল না, আর আল্লাহ্‌ই বা কেন আদমকে সিজ্‌দা করার হুকুম দিলেন? এটা কোন শিক্ষা, যে নিজের প্রাপ্য সিজ্‌দা অন্যের ওপর বর্তায়? হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে– الانسان سرى وانا سره (আল্ ইনসানু সির্‌রী ওয়া আনা সির্‌রুহু) অর্থাৎ, "মানুষ তথা আদম আমার রহস্য আমি তাঁর রহস্য।" এখানে মানুষ অর্থ পরিপূর্ণ মানুষ আর তিনি হলেন আদি মানুষ। সকল মানুষের আদি পিতা। সকল সৃষ্টির সমস্ত গুণাগুণ ও মর্যাদা এবং বৈশিষ্ট্য আদমের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য তিনি সৃষ্টির রীতি অনুযায়ী সকলের পিতা এবং প্রতিনিধি বলে গণ্য।

এমনকি তিনি ফেরেশতাদেরও খলিফা, তা না হলে সিজ্‌দা করার প্রশ্ন আসত না। মুরব্বি না হলে তাঁকে সিজ্‌দা বা সম্মান প্রদর্শন করতে হবে কেন? তাই তিনি যে জাতির আদি মুরব্বি সে জাতির অধীনস্থ প্রজাতিসমূহের ওপরও তাঁর প্রভাব এবং আওতা সম্প্রসারিত হয়। গোটা আকাশ এবং পৃথিবী ফেরেশতাদের কর্মক্ষেত্র। তাঁদের কর্মতৎপরতাতে সকল বস্তুর অবস্থান ও অস্তিত্ব, প্রভুর মহান কৃপায় ও ক্ষমতায়। হযরত আদম এ মহান মর্যাদার অধিকারী। এ জন্য ফেরেশতাগণ তাঁকে সিজ্‌দা করেছে। ফলে এ সিজ্‌দা সম্পর্কসূত্রে সকল সৃষ্টির জন্য বৈধ। হযরত আদমের মাধ্যমে প্রকাশিত, শাশ্বত মর্যাদা আল্লাহ্‌রই মর্যাদা। যেমন গাছের মধ্যেই ফলের অস্তিত্ব। আবার চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বীজ থেকেই গাছের উদ্ভব এবং তা পঞ্চবস্তুর মিলিত রূপ। অর্থাৎ, পঞ্চইন্দ্রিয় থেকে বীজের জন্ম এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলি থেকে তা প্রকাশিত। এটা মূলসত্তার অন্তর্গত। সে সত্তা ও মর্যাদার অধিকারী এক শক্তিমান সত্তাই সকলের আল্লাহ্‌।

কোনো ব্যক্তি যে ফল তোলে, তা গাছ থেকেই তোলে আর তা ঐ গাছের নামেই সর্বজনে জানে। এভাবে খিলাফতের মাধ্যমেই যে কোনো ব্যক্তি কবুলিয়াত তথা গ্রহণ যোগ্যতার দরজায় পৌঁছে। সুতরাং খিলাফতের দরুনই সকলে তাঁকে সিজ্‌দা করে। কারণ গাছ না থাকলে ফল কোথা থেকে আসবে?

এ সিজ্‌দা অবস্থাগত হতে পারে। যেমন– গাছের সিজ্‌দা। আবার তা রৌহিকও হতে পারে, যেমন রূহের জগতে রূহগণ আপন খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, ভালোবাসে এবং সিজ্‌দাও করে।

শয়তান যখন আদমকে সিজ্‌দা করা থেকে বিরত থাকল, তখন আল্লাহ্‌ তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজ্‌দা করতে কে তোকে বারণ করল? অর্থাৎ, ফেরেশতাসহ সকল আদিসৃষ্টি আদমকে সিজ্‌দা করেছে, কিন্তু শয়তানকে কে নিষেধ করেছে? তাই আজও যারা শয়তানের অনুসারী তারাও আদমের সিজ্‌দার বিরোধী। কিন্তু আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করার বিরোধী নয়। অথচ তারা জানে না যে, আদমের সিজ্‌দাই বড় সিজ্‌দা। কারণ উচ্চ মর্যাদাবানের উদ্দেশে প্রদত্ত সিজ্‌দাই শ্রেষ্ঠ সিজ্‌দা। এ কারণেই আল্লাহ্‌ আপনরূপ আদমরূপে প্রকাশ করে তাকে খলিফা বানিয়েছেন। অতএব আদমকে সিজ্‌দা করা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করা। বাহ্যিকভাবে এটাকে বৈধ করা হয়েছে, যেন শাখার সূত্র ধরে মূলের সন্ধান পাওয়া যায়।

জাহের পূজারীগণ আদমকে সিজ্‌দার বিরুদ্ধে কোরানের এ বাক্য উদ্ধৃত করে থাকে– لاتسجد وا للشمس ولآ للقمر واسجد والله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون - (লা-তাছ্‌জুদু লিশ্‌শামছি অলা-লিল কামারি ওয়াস জুদুলিল্লাহিল্লাজি খালাক্কা হুন্না ইন কুনতুম ইয়্যাহু তা বুদু-ন) অর্থাৎ, তোমরা চন্দ্র-সূর্যকে সিজ্‌দা করবে না, বরং তাহাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর। প্রকৃতই যদি তোমরা তার ইবাদত কর।

এর অর্থ হল, ইবাদত হিসেবে চন্দ্র-সূর্যকে সিজ্‌দা করা নিষেধ। কিন্তু এ বাক্যে সম্মানসূচক সিজ্‌দা করা নিষিদ্ধ হয়নি। অতএব আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাকেও সিজ্‌দা করা যাবে না, এটা তারা কিভাবে বলেন? কোরানের এ বাক্যটি যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে, এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, আর কেউ সিজ্‌দা পাওয়ার যোগ্য না হলেও আদমের সিজ্‌দা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সুতরাং তাকে অস্বীকার করা তথা কোরানকে পাল্টে দেওয়ার শিক্ষা তারা কোথায় শিখেছে? এ পদ্ধতি তাদেরকে কে শিখিয়েছে? হ্যাঁ, তাদের বক্তব্য যদি এই হয় যে, পূর্ণ ইবাদতের উদ্দেশে সিজ্‌দা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারিত, অন্য কারও উদ্দেশে তা দেওয়া বৈধ নয়, তাহলে ঠিক আছে। এমতাবস্থায় কোরানকে উল্টাপাল্টা করা কি ঈমানদারের কাজ? অবশ্যই না। সিজ্‌দার পক্ষে ফেকাহ্‌ এবং হাদীস গ্রন্থে বহু প্রমাণ রয়েছে এবং বহু কিতাবে তাকে বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে এগুলোর আলোচনা করা হবে। মাওলানা জৈনদ্দীন সাহেব (আদামাল্লাহু বোরহানা) আপন গ্রন্থে চল্লিশটি তাফসির গ্রন্থের বরাত দিয়ে সম্মান সূচক সিজ্‌দার বৈধতার কথা বলেছেন।

নারকীয় শয়তান আপন সম্পর্কসূত্রে সিজ্‌দার বিরোধীদের কাবু করে ফেলেছে এবং আপন গোঁড়ামিতে তারা আত্মতৃপ্ত। এখন তারা তার প্রিয়পাত্র। সত্য কথা হল, কোরানের বাহ্যিক রূপ তথা চাকচিক্য দ্বারা তাদেরকে আক্ষরিক অর্থ ও টিকাটিপ্পনীতে মুগ্ধ করে পথভ্রষ্ট করা সহজ। আসল কথা হল, লোভী পাখিকে ফাঁদে ফেলার জন্য কয়েক দানাই যথেষ্ট। শয়তানের সত্তাটা অস্বীকৃতির বড় উৎস। বিরোধিতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান। তার সম্পর্কের ফলে অতি অটল বিশ্বাসও সহজে টলে যায়। সে বিরোধিতার মাধ্যমেই যে কোনো কাজ করে থাকে। সে কারও সম্ভ্রমকেই সুনজরে দেখতে পারে না। সে তা পারবেই বা কিভাবে? সে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আদমের পূর্ণ মর্যাদা এবং প্রভুর হুকুমকেই অমান্য করেছে। অহংকার থেকেই অস্বীকৃতি জন্মায়। এর ফল অন্যের অপছন্দ হলেও নিজের খুবই পছন্দ। এটা কুকুরের একটি একান্ত বৈশিষ্ট্য। এ ফলাফল এরই সাথে যুক্ত। কুকুরের ঘেউ ঘেউ তার আত্মতৃপ্তির প্রমাণ। এটাও জানা দরকার, যে সব জিনিসের চামড়া মোটা হয়, মগজ হয় সূক্ষ্ম আর এ দুয়ের সম্পর্ক বৈপরীত্যের। তা সত্ত্বেও এর ফল হালকা সুন্দর এবং ব্যবহার স্বতন্ত্র। যেমন– ফলের সারবস্তু ও খোসার সম্পর্ক বিপরীত। এ পার্থক্যটা হল চক্ষু এবং মাংস ও আলো এবং আগুনের পার্থক্যের মতো। কোনো কিছুর বাহ্যিক রূপের সাথে অর্থের মিল থাকলেও তা কেবল সে বস্তুর উপরি কাঠামোর বেলায় প্রযোজ্য হয়। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত রূপের প্রকৃতি নির্ধারিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থ অর্থেই সীমিত থাকে। অর্থ থেকে বস্তু আর বস্তু থেকে এ অর্থ নির্ধারণ চিরায়ত এবং প্রয়োজনীয় মূলনীতি। এ পদ্ধতির কখনো ব্যক্তিক্রম সম্ভব নয়। এটা উৎস পরম্পরায় কোরানের কথক স্বয়ং আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছে। এটাই মগজ তথা সব কিছুর সার। মূলত তাই কোরান। তাই মাওলানা রুমী বলেন, (মস্‌নবী)–

"মান আয্ কোরআন মগজরা বরদাস্তাম
এস্তে খাঁওয়া পেশেছাঁগে আন্দাখ্তাম।"

অর্থাৎ, আমি কোরানের মগজ বের করে নিয়ে হাড়গুলো কুকুরদের জন্য ফেলে রেখেছি। মাওলানা রুমী এখানে আত্মঅহংকারীদের কুকুর বলেছেন। বস্তুত জাহেরপন্থীদের মধ্যে আত্মঅহংকার বা আত্মতুষ্টি বর্তমান। আত্মতুষ্টি যাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা সর্বদাই অন্যকে অপছন্দ করে, অন্যদের দোষ অন্বেষণ করে, কাফির-মোশরেক আখ্যা দেয় এবং শয়তান বা বেদাতী বলে গালি গালাজ করে। সকল জাহেরপন্থী একের বিরুদ্ধে অপরে এ কাজ করে থাকে। এবার দেখ যেমন বীজ, তেমন ফল প্রকাশ পেল কি না? তোমরা কোথায় শয়তান তালাশ করছ এবং কোথায় খুঁজছ জাহান্নাম? স্বীয় কর্মের দ্বারাই তো জাহান্নাম প্রমাণিত হচ্ছে। প্রত্যেক বস্তুই নিজের কর্মের দ্বারা পরিচিত হয়। ঘোড়া দৌড়ায়, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, বাঘ হিংস্রতা দেখায়, সাপ দংশন করে ইত্যাদি। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে– "বৃক্ষের পরিচয় ফলে।" এজন্য যারা এ ধরনের কাজ করে কোরান তাদের খান্নাছ বলেছে।

অপরদিকে মস্তক অবনত করা, বিনয় দেখানো, অন্যকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করা, নিজেকে ছোট মনে করা, অন্যকে জ্ঞানী মনে করা ভালো কাজ। এ ভালোত্বকে নিজের চূড়ান্ত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা আল্লাহ্র একটি বিশেষ গুণ। অর্থাৎ, আল্লাহ্র সত্তা পূর্ণ গুণাবলি এবং মহাসম্ভ্রান্ত মর্যাদায় মণ্ডিত। তা থেকে অন্যের ওপর প্রকাশের মাধ্যমে তিনি আপন মহিমা প্রদর্শন করেন। যেমন– গাছের পূর্ণতা ফলনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর পূর্ণতা হল চন্দ্র-সূর্য। তবে এ সবই মহা প্রভুর পূর্ণতার প্রকাশ এবং প্রকৃত স্রষ্টাই এর সকল সৌন্দর্য এবং মর্যাদার সার। এটা আল্লাহ্ ও বান্দার রহস্য। এতে (শির্ক্) অংশীবাদিতা অবশ্যম্ভাবী নয়। কারণ এতো হল মূলের বিশ্লেষণ। কোনো বস্তুর মূলের প্রতি তাকালে তার মূলের বিশ্লেষণ এবং বিন্যাসের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি সম্প্রসারিত হবে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টিই উৎসের প্রেক্ষিতে প্রকৃত স্রষ্টার পরিচায়ক। মৌলিক স্বাতন্ত্র্যসহ ক্ষমতার প্রকাশক, শক্তির ধারক, সকল কর্মসম্পাদক, অবস্থাদি বিস্তারক, দ্বৈত ও ভিন্নতা সংহারক। অর্থাৎ, দ্বৈতের মূলে যে এক তা দ্বারা একের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ মূলের প্রতি মনোযোগ না থাকা বিস্মৃতি, এটা সর্বদাই মূলের সাথে সংযোগ বিনষ্টকারী। সুতরাং অনুরূপ বিস্মৃত ব্যক্তি সর্বদা বিস্মৃতির সম্মুখীন হয়। ফলে সে হয় কাফির, জাহিল, দুর্ভাগা, বঞ্চিত ও অসহায়। এরূপ সব কিছু থেকে বঞ্চিত এবং অভিশপ্ত অবস্থাই শয়তানের মধ্যে অজ্ঞতার অহংকার সৃষ্টি হয় এবং আদমের মহান মর্যাদাকে অস্বীকার করে মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহ্র নির্দেশ এবং নির্দেশিত হিসেবে মূল ও শাখার বিচারে আদমকে সিজ্দা করা মানে আল্লাহ্কে সিজ্দা করা। আদম তো মৌল উৎসেরই পরিস্ফুট রূপ। যেমন– বৃক্ষ বহু বৃক্ষ-বীজের উৎস। এ বীজ প্রথম থেকেই বৃক্ষের মধ্যে সঞ্চারিত পরবর্তী পর্যায়ে তা গাছের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে অদ্বিতীয় হয়েছে। বরং বলা যায়, সংরক্ষণের বন্ধন মুক্ত হয়ে

বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, রঙ-রূপ এবং অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে। বরং এতে করে উক্ত বীজ বা উৎসটি আপন সত্তাকে ক্ষীণ করে বৃক্ষের সাদৃশ্য সত্তায় সমাবিষ্ট ফল-মূল সকল মূল কাণ্ডের উৎস ও রঙ এর মিলন ক্ষেত্রে এবং বুনিয়াদে পরিণত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তিনি অতুলনীয় রূপে সাদৃশ্যতার চরম স্থলে পৌঁছে আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটান। আপন বিন্যাসে চতুর্দিকে উদ্ভাসিত হয়, বিকশিত হয় স্বীয় কুদরত, গুণাবলি এবং কর্মধারায়। ফলে সবই হয়ে যায় প্রভুময় এবং প্রভু ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব থাকে না।

আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকে লুপ্ত মনে করলে আদি সত্তা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব থাকে না এবং নাস্তিকতা টিকে না অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো জায়গা ও স্থান হয় না। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, তা হয় তাহলে সে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর বিরোধী, এতে সন্দেহ নেই। এ ধরনের বিশ্বাস মূর্খতা ও বাতুলতাজনিত কুফরিসুলভ বিরোধিতার জন্মমূলে আপন মূল ও বুনিয়াদকেই বিনষ্ট করে দেয়। তা না হলে শয়তানের অন্য কোনো খারাপ উৎস ছিল? সে তো আল্লাহ্কে সিজ্দা করে; কিন্তু আদমকে সিজ্দা করে না। তার কথা হল আমি আদমের চেয়ে উত্তম আর আল্লাহ্ আমার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ্কে সিজ্দা করব, আদমকে কখনো সিজ্দা করব না। সুতরাং এভাবে যে আদমকে সিজ্দা করার বিরোধী, সেও ইবলিসের জ্ঞানের পরিণতি থেকে মুক্ত নয়। আল্লাহ্ বলেন, ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجد وا إلا إبليس (ওয়ালাকাদ খালাকনাকুম সুম্মা ছওয়ারনাকুম সুম্মা কুলনা লিল মালাইকাতিসজুদু লিআদামা ফাছাযাদু ইল্লা ইবলিস) অর্থাৎ, (আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, পরে অবয়ব দান করেছি, পরে ফেরেশতাদের বলেছি আদমকে সিজ্দা কর। অতঃপর তাঁরা সকলেই সিজ্দা করেছে কিন্তু ইবলিস ব্যতীত)। কেন এদের পরিণতি তা হবে না, সিজ্দার কথা শুনলেই যে এরা জ্বলে পুড়ে ছাই অঙ্গার হয়ে যায়। আল্লাহ্ হাফেজ।

আল্লাহ্ এদেরকে আদমের বিষয়ে কেন অজ্ঞ করে রাখলেন? দেখ হে, আদমের রহস্যাদি স্বীকার করে নিলে আল্লাহ্র সত্তার পূর্ণতার বিকাশের মধ্যমণি হয়ে যেতে এবং আল্লাহ্র জ্ঞানের ব্যাখ্যার মৌলিক বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ এবং জ্ঞানী হতে পারতে। তাহলে সকল প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতার কবল থেকে মুক্তি পেতে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতায় আপন খলিফা বা প্রতিনিধি করেছিলেন। সে সত্তাগত পূর্ণতা বাহ্যিক রূপের সাথে বিকাশ প্রাপ্ত এবং অধিষ্ঠিত। এ থেকে তা সকল সৃষ্টিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং স্থাপিত হচ্ছে প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে এর যোগসূত্র। ফলে নব নবতর রকমারি সৃষ্টিনৈপুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে পৃথিবী। উদাহরণস্বরূপ সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে এর অধস্তন সৃষ্টিজগতের সাথে। এর আকর্ষণ এবং যোগসূত্রের দ্বারা বস্তুজগতের বৃদ্ধি সমৃদ্ধির চক্র নির্ধারিত। এ ছাড়া কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাতে কখনো পারবে না। এ আল্লাহ্র একটি বিশেষ সম্পর্ক যা সৃজন ধারায় আদমকে প্রদত্ত হয়েছে। তাই

খলিফা অর্থ পশ্চাতে আগমনকারী। অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্ নিজেকে খিলাফতের মাধ্যমেই বিশেষভাবে বিকশিত করেন। তাই হযরত আদম (আঃ) খিলাফতের পর্যায়ে খলিফাই বটে আল্লাহ্ নন। কিন্তু তা না হলেও রহস্যালোকে তিনি আল্লাহ্ থেকে আলাদা নন। যেমন ঔজ্জ্বল্য স্বয়ং আগুন না হলেও আগুন ঔজ্জ্বল্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সুতরাং চকমক বা ঔজ্জ্বল্য অথবা অনুরূপ কোনো বস্তুর অবর্তমানে পৃথিবীর সৃষ্টি অস্তিত্ব অসম্ভব। যেমন সন্তানের জন্য মায়ের প্রভাব একান্ত জরুরি আবার সে সন্তান এক সময় মাতৃত্বের স্থানে পৌঁছে। এটা চিরায়ত রীতি। সার্বিক বিচারে আল্লাহ্ সবকিছুর উৎস। এতে আল্লাহ্র সত্তায় কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তবে এতে রহস্যালোকের মূল বস্তুটিকে সম্প্রসারিত করতে হয়। সবকিছুর মূল উৎস যদি পবিত্র সত্তাই না হবে, তাহলে আর এমন কোন জিনিস পাওয়া যায় যেখান থেকে মাল-মশলা নিয়ে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছু বানাচ্ছেন? যে সব লোক আল্লাহ্কে সকল বস্তু থেকে পবিত্র মনে করেছে এবং সকল দোষ থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছে এবং এভাবে আল্লাহ্কে সাহায্য করছে তাদের কাছে কি আল্লাহ্ কখনো সাহায্য চেয়েছে? নিরেট মূর্খের দল হেকমত তথা প্রজ্ঞার বিষয়কে দোষ ভেবে স্বয়ং আল্লাহ্র জ্ঞান থেকে নিজেরাই বঞ্চিত হল এবং পবিত্র সত্তার মর্মার্থ থেকে দূরে সরে গেল। শুধু তাই নয় অবিশ্বাসের কূপে নিমজ্জিত হয়ে উভয় জগৎই নষ্ট করল।

লক্ষ্যণীয়, পয়গম্বর (সঃ)-কে বৃক্ষ, উষ্ট্র এবং বক্‌রী ইত্যাদি সিজ্‌দা করত। এটা আল্লাহ্র তরফ থেকেই হত। তা না হলে নবী-অলিদের সিজ্‌দা করার জ্ঞান-বুদ্ধি পশুদের থাকার কথা নয়। এ সিজ্‌দা শির্‌ক হলে আল্লাহ্ কেন তাদের দ্বারা সিজ্‌দা করাবেন? এটা শির্‌ক নয়; বরং এটা আনুগত্যের রীতি। অনেকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, আমি যদি "মানুষ মানুষকে সিজ্‌দা করার হুকুমদাতা হতাম, তাহলে বলতাম স্ত্রী যেন তার স্বামীকে সিজ্‌দা করে।" কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস। এ দুর্বল হাদীস দ্বারা কোনো অকাট্য প্রমাণ রোধ করা যায় না। এজন্য অকাট্য দলিল প্রয়োজন। সিজ্‌দা কোরান দ্বারা প্রমাণিত। এটাকে বাতিল করতে হলে আরও মজবুত আয়াত দরকার। কোরানের বিরুদ্ধে হাদীস অকেজো। তাছাড়া এ হাদীসটিও মজবুত নয়। লক্ষ্যণীয়, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হুকুম করলে ওয়াজেব হয়ে যেত। যেমন– পূর্ববর্তীদের জন্য সম্মানসূচক সিজ্‌দা ওয়াজেব ছিল। ওয়াজেব সিজ্‌দা যদি রহিত হয়েই থাকে তবু মুস্‌তাহাব তথা বৈধতা নষ্ট হয়নি। অর্থাৎ, সম্মানসূচক সিজ্‌দা জায়েজ ও বৈধ।

পর্দার আলোচনা

আল্লাহ্র ফরমান অনুযায়ী চোখের পর্দা করা ফরয। আল্লাহ্ বলেন, قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم (ক্বুল্‌লিল্ মু'মিনীনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম) অর্থাৎ,

মুমিনদের বলুন, তারা যেন আপন চক্ষু বিরত রাখে। এ নির্দেশ পুরুষদের জন্য। তারা যেন নিজের চোখের পর্দা করে, তথা খারাপ নজরে না তাকায়। এর পরবর্তী নির্দেশ হল– ويحفظ فروجهم (ওয়া ইয়াহ্‌ফিজু ফুরুজা'হুম) অর্থাৎ, তারা যেন লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে মন্দ থেকে আর আবরণ দ্বারা ঢেকে রাখে। এ সবই পর্দা। এর পর নারীদের পর্দার কথা বলা হয়েছে– قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن (ক্বুল লিল্ মুমিনাতি ইয়াগ্‌দুদ্‌না মিন্ আবসারিহিননা) অর্থাৎ, ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চক্ষুকে বিরত রাখে স্বীয় বদনজর থেকে। অর্থাৎ নারীদের চোখে কুদৃষ্টি রয়েছে, তা যেন প্রকাশ না হয়। এজন্য চক্ষু বন্ধ রাখতে হবে তথা চক্ষু থেকে কুদৃষ্টির উপাদানটা সরিয়ে দিতে হবে। অথবা আপন চোখের শয়তানি দৃষ্টিকে সুলতানি পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। অর্থাৎ চোখের কুঠুরিতে এক প্রকার জলীয় পর্দা দেখা দেয়, তা লজ্জার আবরণও বলা হয়। মা, বোন ও বুজুর্গদের আচরণে সে লজ্জা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ লজ্জার মুখোমুখি হলে যুবকও শিশুর মতো হয়ে যায়। তবে যার লজ্জাবোধ নেই, সে অবশ্যই ফেৎনাবাজ। সে শরিয়তের বিধি-নিষেধের বাইরে। পুনরায় বলা হচ্ছে, يحفظن فرو جهن (ইয়াহ্‌ফিজ্‌না ফুরুজা হুন্না) অর্থাৎ, তারা যেন আবরণ দ্বারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে এবং লজ্জা আবরণে যেন তাকে সকল দোষ থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও পর্দার আয়াত এবং হাদীস সবই উক্ত মর্মে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত শর্তের বিপরীত একটি আয়াত বা হাদীসও নেই। সুতরাং হারাম থেকে বাঁচার জন্য পর্দা করা ফরয। হারাম থেকে বাঁচাই হল পর্দার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। কোরানে যেখানে চোখকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতে সাধারণভাবে চোখ বোঝানো হয়নি। কারণ, সে আয়াতে 'মিন্' পৃথকীকরণ শব্দ। এ দ্বারা একটি বিশেষ অর্থ বোঝায়। প্রধানত নবী-অলিদের পাক ও পবিত্র দৃষ্টি সূক্ষ্ম রূহানী জগতের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় সকল দোষ থেকে মুক্ত। যেমন পরশ পাথরের স্পর্শে তামাও খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। এজন্য কোরানে 'মিন্' বা 'থেকে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ দ্বারা কোনো কোনো চক্ষু বোঝানো হয়েছে। অপরদিকে নবী-অলিদের দৃষ্টিতো পবিত্র রহমতস্বরূপ। তাঁকে কাফিরদের জন্যও রহমত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পবিত্র সংস্পর্শে অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হয়ে যায়। সাবান, পানি ও আগুনের চেয়ে তা উন্নততর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ জন্যই তাঁকে কাফিরদের জন্য রহমত বলা হয়েছে। কাফিরকে অপবিত্র আর রহমতকে আগুন পানিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রহমত তথা নবী-অলিদের দৃষ্টির উপকারিতা সম্পর্কে হাদীসে কুদ্‌সীতে বলা হয়েছে– كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصربه الاخ (কুন্‌তু সামউ'হুল্লাযি ইয়াসমাউ বিহি ওয়াবাসারুহুল্লাযি ইউবছিরু বিহি)। অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন, আমি তার কান হয়ে যাই, সে তা দ্বারা শোনে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, সে তা দ্বারা দেখে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পরিপূর্ণ মানুষের হাত-পা ইত্যাদিতে পরিণত হন, বরং তাঁর গুণাবলি আল্লাহ্র গুণাবলিতে

রূপান্তরিত হয়ে যায়। হতে পারে সে পরিপূর্ণ মানুষটি নবী অথবা অলি, জ্বিন অথবা ফেরেশতা, নারী অথবা পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে যেমনি নবী-অলি হতে পারে, যেমন গাউস পাক, বুআলী কলন্দর, হযরত শাহ্ মাদার প্রমুখ – তেমনি নারীদের মধ্যেও হতে পারেন– যেমন হযরত উম্মে সিদ্দিকা, হযরত উম্মে বরকত, হযরত রাবিয়া বস্‌রি, হযরত বিবি শাবান এবং হযরত বিবি তোহ্‌ফা প্রমুখ। এদের মর্যাদা অতি উচ্চে এবং সব রকম দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তবে উক্ত আয়াতে যে চক্ষু বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা যদি অলিদের বোঝানো হয়ে থাকে, তাতো আরও উত্তম। কারণ তাঁরা মুফ্‌তিদের মতে, চক্ষুকে সংযত রাখার কারণে তাঁদের দৃষ্টি রহমত ও উপশমকারী হয়ে গেছে। অপরদিকে ফেৎনাবাজদের কুদৃষ্টির কারণে তাঁরা মুফ্‌তি এবং ফাসিকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষের পবিত্র সত্তা যা রহমতস্বরূপ, তাঁর দৃষ্টি আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তারই সারাংশ। تخلقوا باخلاق الله (তাখাল্লাকু বি আখ্‌লা-কিল্লাহ্) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হও। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী তাদের কথাবার্তা, ফুঁক বা ছোঁয়া, রহমত এবং অনুকম্পা ছাড়া আর কী? শুধু তাই নয়। তাঁদের পায়ের ধূলা এবং তাঁদের অলিগলির ধূলা-মাটি উপকারী সুরমা এবং মুক্তির উন্নত সাল্‌সা। এ জন্য কামেল তথা পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের কোরানে পাকে বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাঁদের আশ্রয়ে ও আলোকে মানুষ পূর্ণতা পাচ্ছে এবং তাঁদের পায়ের ধূলায় শত শত অন্ধ-নিজেদের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। এ ধরনের বহু ঘটনা ইতিহাসে রয়েছে। এ ছাড়া পয়গাম্বরদের পবিত্র সত্তায় অসংখ্য মর্যাদা ও বিশিষ্টতা রয়েছে। অনুরূপ বহু অলিও জগতে আছেন, অসীম সত্তার সাথে যাদের সম্পর্ক বর্তমান।

মোট কথা, ক্ষতির আশংকা থেকে বাঁচার উদ্দেশে সাধারণের পর্দা করা ফরয। তবে সর্বাবস্থায়ই পর্দা পুণ্যের কাজ এবং ভালো। শালীনতা ও শিক্ষার উদ্দেশে যদি নারী পুরুষের দেখাদেখি হয়, তাহলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার মধ্য দিয়ে কোরানের আরও শিক্ষা ও রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। যেমন– নরকবাসীকে স্বর্গবাসী করা, নেহায়েত দুষ্ট, বেকার, নিম্নতম যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিকেও কয়েকটি গুণে ভূষিত করে উচ্চস্থানে পৌঁছে দেওয়া। একজন নিরেট মূর্খ যে বিশ টাকার লোক নয় সেও শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভের মাধ্যমে হাজার টাকা বেতনের যোগ্য হতে পারে। অনুরূপ গুণীদের সাহচর্য পরশ পাথর স্বরূপ। এর দ্বারা শাস্তি থেকে বাঁচার পথ পাওয়া যায়। সে যদি পরকালের জ্ঞান অর্জন না করে, কেবল পর্দার মধ্যেই বসে থাকে, তাহলে হেদায়েত লাভ করবে কী করে? পৃথিবীর সকল মানুষ; বরং বড় বড় ফেরেশতা এবং জ্বিনদেরও তো হেদায়েত প্রয়োজন। কাফির ও মুনাফিকরা অবশ্য তা চায় না, তাদের মুনাফিকী এ পথে কঠিন অন্তরায়। এ হিসেবে আবু জেহেল এবং কাফিরগণ দুর্ভাগাই রয়ে গেল। অপর দিকে সত্যের ওপর থাকলে মুমিন মুমিনই থাকে। আর সত্য থেকে বিচ্যুত হলে বেঈমান, কাফির

এবং মুনাফিকে পরিণত হয়। এরাই হয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারী আর পরচর্চায় মুখর। কিন্তু পয়গাম্বরগণ সৌজন্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য মূলত একইরূপ কল্যাণকর। তাঁদের কাছে সৌজন্য প্রার্থনা করা ঈমান এবং প্রশান্তির কাজ। তাঁদের মাধ্যম ছাড়া সুপারিশ লাভ করা অসম্ভব। এ জ্ঞান ঈমান ও শান্তির নৌকার সম্বল। তা ইন্দ্রিয় এবং হালের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং পাওয়া যায় চক্ষু কর্ণ ও মুখের সাহায্যে। এ কারণে কল্যাণের উদ্দেশে পর্দাকে বৈধতার বিভিন্ন পর্যায়ে রেখে সকল কার্য সম্পাদনে স্বতন্ত্র ফল পাওয়া যায়। যেমন– কোনো কোনো সময় শারীরিক পর্দা ফরজ আবার কোনো সময় তা মোবাহ্ বা বৈধ ইত্যাদি। এ শর্তেই ফকিহ্‌গণ পর্দার বিশ্লেষণ করেছেন। তারা বলেন, নারীদের আওয়াজও নারী– তাহলেও সাধারণভাবে তা হারাম নয়, বরং তা কখনো হারাম, কখনো মাক্‌রূহ, কখনো মোবাহ্, কখনো মুস্তাহাব আবার কখনো তা সুন্নত বা ওয়াজেব। আবার কখনো এর বিপরীতক্রমে তা সুন্নত, ওয়াজেব এবং ফরয হতে পারে। যেমন কোরান পাঠ করা এবং নিজের পাঠ্যাভ্যাস করা। এটা কখনো সুন্নত বা মোবাহ্ না হয়ে পারে না; বরং বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজের প্রয়োজনে নারীদের উচ্চকণ্ঠ হওয়া ফরয এবং ওয়াজেব। কারণ, উচ্চঃস্বরে না পড়লে পাঠ স্মরণ রাখা কঠিন। শুধু তাই নয় আপন শিক্ষক এবং সহপাঠিদের সামনে জোরে বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুতরাং শর্ত সাপেক্ষে জোরে আওয়াজ করা ফরযও হতে পারে। প্রয়োজনে নারীদের জন্য জোরে আওয়াজ করে অথবা কথা বলে অন্য পুরুষদের শোনানো সুন্নত এবং ফরয। যেমন প্রয়োজনে কাউকে ডাকা অথবা জোরে কথা বলা। উদাহরণস্বরূপ কোনো হিংস্র পশু অথবা ক্ষতিকর প্রাণী কারও ক্ষতিসাধন অথবা মৃত্যু ঘটানোর জন্য ওঁৎ পেতে আছে অথবা আগুন, পানি বা চোর-ডাকাতের আশংকা রয়েছে, এমতাবস্থায় লোকজন ডাকা বা সংবাদ দেওয়া ফরয। অনুরূপ বেচা-কেনার সময় সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে কথা বলা বৈধ। তাছাড়া অচেতন বা আত্মভোলা অবস্থায় পরজাগতিক কারবারেও উচ্চকণ্ঠে বা জোরে কথা বলা নিষেধ নয়। যেমন– টেনে আল্লাহ্ উচ্চারণ করা অথবা উচ্চঃস্বরে আল্লাহ্-রাসূল, হু-বা-হা বলা অথবা নামাজের মধ্যে আযাবের ভয়ে জোরে কাঁদা বা উচ্চকণ্ঠে আহঃ উহ্ করা, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে চিৎকার করা, যিকিরের মধ্যে অজ্‌দ হওয়া এর কোনোটিই নিষেধ নয়; বরং এতে নামাজ পূর্ণরূপে সফল হয়।

যে আওয়াজে ভিন্ন পুরুষদের যৌন উত্তেজনা বাড়ায়, তা নিষেধ এবং হারাম। এরূপ আওয়াজকে আরবিতে 'তাম্‌তীত্' বলে। এ আওয়াজ হারাম। তাছাড়া মেয়েরা যদি নামাজে জোরে কিরাআত পড়ে বা উচ্চকণ্ঠে তাক্‌বীর বলে তাও শরিয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ; বরং তা অনুমোদিত এবং প্রমাণিত। জনাব মাওলানা মরহুম আব্দুল হাই তার 'মাজমুয়া-এ-ফতোয়া' প্রথম খণ্ড ১৮৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ফতহুল কাদীর, শরহে হেদায়া, আইনী এবং সুনান আবু দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ রয়েছে, যাতে মেয়েদের

জামাত এবং উচ্চঃস্বরে কিরাআত এবং তাক্‌বীরের বৈধতা মিলে। একটি হাদীস হল– ای ام ور قة قدقر ات القران فاستذ نت النبی صلعم ان تتخذ فی دارها مؤذنافاذن لها وامرها ان تئم اهل دارها (আইউ উম্মি ওয়ারকাতা ক্বাদ কারাআতাল কোরআনা ফাস্‌তাজানাত নাবিউ (সঃ) আন তাত্তাখিজা ফি-দারিহা মুয়াজ্জানা ফায়াজ্জানা লাহা ওয়া আমারাহা আন্‌তাওয়ামো আহ্‌লে দারেহা) (একদা উম্মে ওয়ারকাহ্ কোরান পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট নিজের ঘরে মুয়াজ্জিন রাখার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন সে যেন তার ঘরের সকলের ইমামতি করে।) তাছাড়া হযরত আয়েশা থেকে ইবরাহীম, তাঁর থেকে হাম্মাদ, তাঁর থেকে আবু হানীফা বর্ণনা করেন– انما كانت تؤم النساء شهر رمضان فتقوم وسطهن (আন্নাহা কায়ানাত তাওয়াম্মা নিছায়া শাহ্‌রা রামাদানা ফাতাকুমু ওয়াসাতাহুন্না) (রমজান মাসে আয়েশা (রাঃ) মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং ইমামতি করেন) আবিহাজার আছ্‌কালানী শহরে রাফিইতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে শোবা পরে আল্ হাকেম ইব্‌নে আবি লায়লী সূত্রে আয়েশা থেকে হাদীসটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন। انها كانت توءم انساء فتقوم معهن فی الصف (আন্নাহা কায়ানাত তায়াম্মান নিছাই ফাতাকুমু মায়াহুন্না ফিস্ সাফ্‌ফি) (তিনি মেয়েদের সাথে কাতারে দাঁড়ালেন) এবং শাফে-ই ইব্‌নে শোবা প্রমুখ উম্মে সালমা থেকে উদ্ধৃত করেন। انها امت انساء فقامت وسطهن (আন্নাহা আম্মাতিন্ নিছাই ফাকামাত ওয়াসতাহুন্না) (তিনি মহিলাদের ইমামতি করেন এবং দাঁড়িয়েছেন তাদের মাঝখানে)। আইনীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর উক্ত মাওলানা বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মহিলাদের জামায়াতে মহিলার ইমামতি করা এবং কাতারের মধ্যখানে দাঁড়ানো নিয়ম, পুরুষদের মতো এগিয়ে দাঁড়ানো বৈধ নয়। এ হাদীস দ্বারা আরও জানা যাচ্ছে যে, মহিলা ইমামের জন্য জোরে কিরাআত পাঠ ও তাক্‌বীর উচ্চারণ বৈধ। কোনো কোনো মাযহাবে মেয়েদের আওয়াজকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কিন্তু এটা পুরুষদের বেলায়, মেয়েদের বেলায় নয়। মোট কথা উক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, মেয়েদের জামাত বৈধ এবং পুণ্যের কাজ।

এতক্ষণ নারীকণ্ঠ, তাদের চলাফেরা, শারীরিক কসরত এবং রূপ প্রকাশের বৈধতা সম্পর্কে আলোচিত হল। কিন্তু দেহ ও অলংকারসমূহের সৌন্দর্য প্রদর্শন সম্পর্কে বিধান ভিন্ন। দেহের বৈধ অংশ খোলা রাখা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনের বৈধতা কোরান দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ বলেন, ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن اوابائهن اواباء بعو لتهن او ابناء بعو لتهن اواخواتهن اونسا ئهن اوما ملكت ايمانهن اوالتبعين غير اولى لاربعة من الرجال اوالطفل الذى لم يظهر على عورة النساء (ওয়ালা ইউব্‌দিনা জিনাতাহুন্না ইল্লা লিবুয়ূলাঁতি হিন্না আও আবাইহিন্না আও আবাই বুউলাতিহিন্না আও আবনাইবুউলাতিহিন্না আও ইখ্‌ওয়াতিহিন্না আও নিছাইহিন্না আও মা-মালাকাত আইমানুহুন্না আউলিতাবইনা

গাইরি আওলা লেআরবায়াতা মিনাররিজালি আওলাতিফলিল্লাযী লাম ইয়াজহার আলা আওরাতিন নিছাই।) অর্থাৎ, নারীগণ তাদের আবরণ প্রকাশ করবে কেবলমাত্র তাদের স্বামী অথবা বাবাদের কাছে, দাদা এবং পরদাদা-বাবাদের অন্তর্ভুক্ত অথবা স্বামীদের বাপদের কাছে। কারণ নারীদের জন্য তারা বাপতুল্য অথবা আপন পুত্রদের কাছে অথবা পুত্রের পুত্রদের কাছে। এরা মেয়েদের কাছে পুত্রতুল্য অথবা আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদের কাছে এরা ভাইতুল্য, অথবা ভগ্নিপুত্রদের কাছে দুগ্ধ সূত্রে মোহ্‌রেমদের বেলায়ও এ নির্দেশ প্রযোজ্য। চাচা এবং মামাদের উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা ভাইদের হুকুমের আওতায় রয়েছে। স্বধর্মীয় মহিলাদের কাছে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবে। 'তিব্‌ইয়ান' থেকে তাফ্‌সীরে হোসাইনিতে উদ্ধৃতি করা হয়েছে যে, ইহুদি মূর্তিপূজক ইত্যাদি মহিলারা ভিন্ন পুরুষের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া দাস-দাসীদের কাছেও মহিলাদের পর্দা করতে হবে না। এ দাস-দাসীরা ঈমানদার হোক বা কাফির হোক। এছাড়া মহিলাদেরকে তাদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে হবে না যৌন ক্ষমতা রহিত অনুগত পুরুষদের কাছে, যারা আহার চাওয়ার জন্য বাড়িতে আসে এবং যৌন চাহিদা সৃষ্টি হয় না এমন শিশুর কাছে। যৌনতার শর্তের ফলে বৃদ্ধ নপুংসক ব্যক্তিগণও আওতায় এসে যায়। কারণ এরাও সকল ফেৎনার ঊর্ধ্বে।

উক্ত আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, পরিচিত বা অপরিচিত পুরুষদের দেখা দেওয়া মহিলাদের জন্য শরিয়ত মতে বৈধ। তাদের দাস বা রান্নাবান্নার কাজে নিয়োজিত পুরুষদের সাথে কথা বলা বা তাদের রূপ প্রদর্শন করাও নিষেধ নয়। তবে তাফসীরে লিখে যে, এদের সরল-সোজা লোক হতে হবে। সে যাই হোক, এ ব্যক্তিগত চাকর বা দাসটি অপরিচিত লোকতো বটে। কোনো কোনো শর্তে দাস-দাসীদের মোহ্‌রেম ধরা গেলেও চাকর তো কোনোমতেই এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এরূপ পুরুষদের দেখা দেওয়া যখন কোরান দ্বারা প্রমাণিত বরং বলা চলে অনুমোদিত। তখন কোরানের মোকাবিলায় কোনো দলিলে তাকে অবৈধ বলা যেতে পারে যে, তার কারণে ধর্মের বিধান পাল্টে যাবে? কারও ধর্মীয় অধিকারকে আত্মস্বার্থে হরণ করা কি কোনো ন্যায়বান লোকের কাজ? যারা মনগড়া কথা আওড়িয়ে ধর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তারাতো দ্বীনদার হতে পারে না; বরং তারা দ্বীন তথা ধর্মের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত।

প্রকৃতপক্ষে নফ্‌সের দুষ্টতার কারণে নারীদের জন্য পর্দা ফরয হয়েছে। নফ্‌সের দুষ্টতার বেলায় নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই হুকুম। পুরুষরা পর্দা না করলে কী করে নারীদের বাঁচানো যাবে? হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হযরত সিদ্দিকা খাতুন মরহুমাকে কোনো অন্ধ থেকেও এড়িয়ে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ অন্ধ চোখের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত হলেও নফ্‌সের দুষ্টতা থেকে মুক্ত নয়। এজন্য তাঁকে তার থেকে এড়িয়ে চলার হুকুম দিয়েছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্যও থাকতে পারে। তাছাড়া আল্লাহ্ বলেন, المؤمنون والمومنات بعضهم

اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (আল মুমিনুনা ওয়াল মুমিনাতি বাযুহুম আওলিয়াও বাযিন্ ইয়া'মুরূনা বিল্ মা'রুফি ওয়া ইয়ানহাওনা আনিল মুনকার) অর্থাৎ, ঈমানদার নারী ও পুরুষগণ পরস্পর অলি। তাঁরা সৎকাজে আদেশ করেন এবং অন্যায় থেকে বারণ করেন। অর্থাৎ, ঈমানদার নারী-পুরুষদের মধ্যে বিদ্যমান বেলায়েত তথা বন্ধুত্ব এবং হৃদ্যতার কারণে এরা পরস্পর আত্মীয় ও বন্ধু। তাই এরা একে অন্যের অলি তথা হিতাকাঙ্খী। অলি শব্দ 'ওয়ালা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'ওয়ালা' অর্থ আশেক বা প্রেমিক। সুতরাং বেলায়েত দৃষ্টে অলিই প্রকৃত বন্ধু তথা মুর্শিদ। তাদের কেউ হলেন মুর্শিদ আর কেউ মুরিদ।

উল্লেখ্য, এখানে ঈমানদার বলতে নারী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো পুরুষ যেমন নারীদের অলি হতে পারে, তেমনি কোনো নারীও হতে পারে পুরুষদের অলি এবং হতে পারে কোনো নারী নারীদের জন্য অলি আর পুরুষ পুরুষদের জন্য। অলি শব্দটি বিশেষভাবে মোমিন বা ঈমানদারের বেলায় প্রযোজ্য, যে ঈমানদার ব্যক্তি একজন পরিপূর্ণ মানুষ, বেলায়েতের বিচারে। এজন্য তাকে অলি বলা হয়। এ অলি বেলায়েতের জ্ঞান দ্বারা ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাই মুরিদদের জন্য অবশ্য পালনীয় এবং করণীয়। কেননা, তিনি তো ইশ্‌ক্ এবং এখলাস-এর শরিয়ত দ্বারা অনুপ্রাণিত। এ হিসেবে প্রেমিকদের পথ হল সরল সোজা। প্রেমিক নিজের প্রেমাস্পদকে আঁকাবাঁকা পথ থেকে উদ্ধার করে তাওহীদ এবং ঐক্যের পথ প্রদর্শন করে। কারণ ইশ্‌ক্ তথা প্রেমের কাছে আশেক-মাশুক ছাড়া আর কিছুই দাঁড়াতে পারে না। তাই নবী-অলিগণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বন্ধু বলে গণ্য। তাঁদের পথ, হেদায়েতের পথ এবং সরল সোজা পথ। তাইতো বলা হচ্ছে– اهدنا الصراطا المستقيم (ইহ্‌দিনাস্ ছিরাতাল মুস্তাক্বীম) অর্থাৎ আমাদের সরল সোজা পথ দেখাও। এ সরল সোজা পথই– مخلصين له الدين (মুখলিসীনা লাহুদ্দীন) তথা নিষ্ঠাবানদের ধর্ম। অতএব এখ্‌লাস তথা নিষ্ঠা ব্যতীত সত্য পথের সন্ধান লাভ করা অসম্ভব। এজন্য আল্লাহ্‌র হুকুম হল– كونو امعالصادقين (কুনু মায়াস সাদিক্বীন্) অর্থাৎ, সত্যাশ্রয়ীদের সাথী হও এবং তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশের দিশারী বা অলির রঙ ও রূপের সাথে মিশে যাও। তাঁর ভিতর বাইরের গুণাবলি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে একাত্ম হয়ে যাও। এটাকে বলা হয় 'কাইনুনাত'। হযরত খাজা আহারার (কুঃ ছেঃ) 'এছবাত-ই রাবেতা'য় তাই লিখেছেন।

'কুনু' আদেশমূলক ক্রিয়া। আদেশ ওয়াজেব প্রমাণ করে। এর সারমর্ম হল সততা এবং শালীনতার জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যা সত্য অলি তথা বিশুদ্ধ বক্ষ তথা মুর্শিদ থেকে বের হয়। এটাই 'কাইনুনাত' এর অর্থ এবং সারমর্ম। সুতরাং মুর্শিদের অন্বেষণ বা সঙ্গলাভে বাধা থাকলে তা দূর করতে হবে। যেন সৎ ব্যক্তি তথা অলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করা সম্ভব হয়। এটা কোনো প্রকার পর্দার স্থান নয়; বরং এটা হল এমন একটি স্থান যেখানে কোনো পর্দা থাকলেও তা সরিয়ে ফেলতে

হবে। কারণ এক্ষেত্রে হুকুম হল সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গী হও। আর পর্দার আয়াতে দুষ্টদের থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, সুতরাং ফেৎনার কারণে পর্দা করা ফরয। আর দীক্ষালাভের জন্য পর্দা সরানো ফরয। অর্থাৎ দুষ্ট লোকদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা যেমন ফরয এবং পবিত্র আত্মার সাহচর্যলাভ করা তেমনি ফরয। এ দুয়ের পার্থক্য ব্যাপক। একই হাড়-মাংসের দেহে কোথায় মগজ আর কোথায় গোবর! হেদায়েতের গুরুত্ব সম্পর্কে চিন্তা করুন। তা অনন্ত সত্তায় পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে গণ্য। তবে তাকে পরম সত্তার সমকক্ষ ও সমমানের হতে হবে। তা না হলে তাঁর পক্ষে উসিলা হওয়া সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ্ বলেন– وابتغوا اليه الوسيلة (ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াছিলাতা) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য উসিলা খোঁজ কর। এটাও সাধারণ নির্দেশ। এর সোজা অর্থ হল, আল্লাহ্‌কে পেতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৎ ও সিদ্ধ মুর্শিদ ধর। এ ক্ষেত্রেও পর্দা রক্ষা করা সম্ভব নয়; বরং এখানে কাছাকাছি উপস্থিতি প্রয়োজন যা পর্দার সম্পূর্ণ বিপরীত। এত তাগিদ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর আশেক ও প্রেমিকদের লক্ষ করে বলেছেন, فا سئلوا اهل اذكر ان كنتم لا تعلمون (ফাস্‌আলু আহ্‌লায্-যিক্‌রি ইন্ কুনতুম লা-তা'য়ালামুন) অর্থাৎ তোমরা যা না জান, তা আহলে যিকিরকে জিজ্ঞাসা কর। এজন্য আদেশটি নির্বিশেষে নারী পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এর পরিষ্কার অর্থ হল মুর্শিদকে জিজ্ঞাসা কর এবং মুর্শিদের দীক্ষা অনুসরণ কর। এজন্য শারীরিক ও মানসিক উপস্থিতি প্রয়োজন। এ আয়াতের মর্মার্থ ও দুষ্ট লোকদের ওপর আরোপিত পর্দার আয়াতের বিপরীত তথা এ ক্ষেত্রে মুর্শিদের মুখোমুখি হওয়া শর্ত। আর তাও হতে হবে ঈমান, নিষ্ঠা, খেয়াল ও ধ্যান, দোস্তি মহব্বত এবং নৈকট্য ও সাথীত্বের বৈশিষ্ট্য সহকারে। কিন্তু ফেৎনাবাজ তথা দুষ্ট লোকদের মুখোমুখি হওয়া মহিলাদের জন্য হারাম। তাদের সাথে নিষ্ঠা, খেয়াল, ধ্যান, দোস্তি মহব্বত প্রভৃতির তো প্রশ্নই উঠে না; বরং তাদের মুখোমুখি হওয়া তাদের সাথে কথা বলা এমন কি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের প্রতি তাকানো হারাম। অতএব, দুষ্ট লোকদের কাছে পর্দা না করা হারাম আর বক্ষ পরিষ্কারের বিদ্যালাভের পথে মুর্শিদের কাছে পর্দা করা হারাম। কারণ তাতে পর্দাকারী হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে। অথচ এজন্য আল্লাহ্‌র কঠোর নির্দেশ রয়েছে– واصبر نفسك معالذين يدعون ربهم بالغوت والعشئ يريدون وجهه (ওয়াসবির নাফ্‌সিকা মাআল্লাযীনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম বিল-গুদুয়াতি ওয়াল আশিয়্যি ইউরিদুনা ওয়াজহাহু।) অর্থাৎ, নিজ জীবনটাকে তাঁদের সাথে জড়িয়ে রাখ, যারা সকাল সন্ধ্যা তাঁদের প্রভুকে ডাকে তথা স্মরণ করতে করতে আল্লাহ্‌তে মিশে গেছে। অর্থাৎ, তাঁদের প্রাণের সাথে প্রাণ, বুদ্ধির সাথে বুদ্ধি, বিদ্যার সাথে বিদ্যা, অন্তরের সাথে অন্তর, আত্মার সাথে আত্মা, ছের এর সাথে ছের এবং খফির সাথে খফি তথা বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তাঁদের চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে গড়ে তোল। যাতে মুর্শিদ সত্তার পরিপূর্ণ গুণাবলি আপন সত্তায় উদ্ভাসিত হয়। এটা শতবার

মুখোমুখি হওয়ার চেয়েও অধিক কার্যকর। কারণ, সাধারণত মুখোমুখি অবস্থায় মূল সত্তায় এবং গুণাবলির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। তবে আপন মুর্শিদের মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে তাঁর সত্তা ও পূর্ণতার অনুশীলন দ্বারা মুর্শিদের চরিত্র মাধুর্যে মুরিদ অভিভূত হয়ে যায়। এর ফলে মুর্শিদের গুণাবলিসমূহ আপন সত্তায় আকর্ষিত হতে থাকে অনুরূপ বিশ্বাস না থাকলে কোনো মুর্শিদের ফয়েজ আপন সত্তায় আসবে না। বস্তুতপক্ষে মিলন কামনা দ্বারা রহস্যাতিরহস্যময় মৌল মিলন উদ্দেশ্য। অপরের মাধ্যমে বা দূর থেকে এটা সম্ভব নয় এবং অন্য কারও কথায় বিশ্বাস দ্বারাও এটা সম্ভব নয়। তবে এর কিছু বাহ্যিক আলামত দেখা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি আপন মুর্শিদ ছাড়া নিজের সিদ্ধ অবস্থা প্রকাশ করে, তাহলে পরিণামে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে। এটা সকলেরই জানা যে, অলৌকিক অবস্থা কারও কাছে প্রকাশ করলে, তা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুর্শিদের মহান সত্তার প্রভাব থেকে বঞ্চিত সে-তো আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা থেকেও দূরে। এরূপ ব্যক্তিতো কোরানের প্রসারতা সম্পর্কে অজ্ঞ। সে-তো ফাসিক এবং মুনাফিক। কারণ সে আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ থেকে দূরে এবং এর বিরোধী ও অলিদের নিগাহদারী বা তত্ত্বাবধানের সমালোচনা করছে এবং অলিকে ফাসিক ও মুনাফিকদের দলভুক্ত করে নিজেদের মতো অলির বেলায়ও দেখা-সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধান নিষিদ্ধ করছে। অতএব, অনুরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফির। কারণ যে আমানত নষ্ট করলে মানুষ কাফির হয় তা হল ঈমান এবং অন্যের ঈমান ও আমানত নষ্টকারী কাফির ও শয়তান। কারণ এটা খান্নাছ শয়তানের কাজ। এজন্য এ ব্যক্তি নিকৃষ্টতম কাফির। কারণ সে দুপ্রকার আমানত নষ্টের কাজে লিপ্ত। তবে মুর্শিদ এবং মুরিদের মধ্যে যদি কোনো প্রকার ফেৎনার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা থেকে নিষ্কৃতি হওয়া ফরয। কারণ, তা না হলে হেদায়েতের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। মুর্শিদ পরিপক্ক না হলে এমনটা হয়। এটা বিপজ্জনকও বটে। সর্বোপরি অধিকাংশ নারীর কাঁচা বুদ্ধি। এ জন্য পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তথা ইনসানে কামেল দ্বারা তাদের বিশুদ্ধায়ন প্রয়োজন। অপরদিকে আহ্‌লে যিকির যারা নিজেরাই নিজেদের সঠিক মুর্শিদ তাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ ভাণ্ডার থেকে ভাবসূর্যরশ্মি যখন ধ্রুব তারার মতো আল্লাহ্‌র প্রেমিকের প্রেমাকাশে উদিত হয়, তখন সেই মহাসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মহিয়ান গরিয়ান প্রভু অতি মিষ্ট ভাষায় আপন প্রেমিকদের এভাবে সুসংবাদ দেন– تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلو دهم وقلو بهم الى ذكر الله (তাক্‌সায়িরুরা মিন্‌হু জুলুদুল্লা-যীনা ইয়াখ্‌সাওনা রাব্বাহুম সুম্মা তালিনু জুলুদুহুম ওয়া ক্বুলূবুহুম ইলা যিকরিল্লাহি) (সূরায়ে জুমার দ্বিতীয় রুকু) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে সে অবস্থায় তাদের পশম শিউরে উঠে, তাদের চামড়া নরম হয়ে যায় এবং তাদের অন্তর বিগলিত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। অর্থাৎ, সিদ্ধ অবস্থায় আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তা অনেকটা উত্তপ্ত সীসার মতো। আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যকার প্রেমের ফলশ্রুতিতে বান্দার 'ইনকিসাফ' তথা হৃদয়ের প্রসারতার

সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঈমান সম্পদের আমানতদার হয়ে থাকে। এজন্য সূরা হাদিদে ঈমানদারদের লক্ষ করে বলা হয়েছে– الم يات للذين امنوا ان يخشع قلوبهم لذكر الله (আলাম ইয়াতি লিল্লাযীনা আমানূ আইয়াখ্‌সাউ কুলুবুহুম লি-যিকরিল্লাহি) অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সে সময় কি আসে নি, যখন তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে ভীত ও নরম হবে।

যে ব্যক্তি ঈমান সম্পদের পথ এবং নূরে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে, সে কি সুপারেশী বক্ষ এবং নির্মল অন্তর ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করবে? বরং এ বিনয় নম্রতার কারণে আল্লাহ্ সাধকদেরকে উপযুক্ত মুর্শিদের হাওলা করে দেন। এভাবে উস্তাদ এবং মুর্শিদগণের মাধ্যমে বান্দারা আল্লাহ্‌র অনুকম্পা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ পীর এবং মুরিদের মধ্যে বিরাজমান আত্মীয়তার সম সম্পর্কের বদৌলতে স্বীয় সৌভাগ্য অনুযায়ী অলি বা মুতাওয়াল্লি ও মুর্শিদ এবং মুরিদের মর্যাদা পেয়ে থাকে। এ সম্পর্কের গুরুত্ব এতই বেশি যে, পৃথিবীর অন্য কোনো সম্পর্কই এর চেয়ে বেশি নয়। কারণ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তার সঙ্গে যে ব্যক্তি সম্পর্ক রাখেন, তার মর্যাদাও সবচেয়ে অধিক এবং উন্নত হবে। অতএব নবী, অলি এবং মুর্শিদ সর্বদাই উন্নত মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা ফেরেশতা, জ্বিন এবং মানব, যে কোনো সম্প্রদায় থেকেই হন। তবে আল্লাহ্ ওয়ালাদের এ উন্নত মর্যাদার পর্যায়ে মনের পর্দা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে নফ্‌সের প্ররোচনায় চোখের দ্বারা যে ফেৎনা থাকার আশংকা থাকে তা দূর হয়। তখন কোনো নারীর প্রতি নজর দেওয়া নিষিদ্ধ নয়। ফতোয়ায়ে শামীতে আছে– واجمعوا على بغير قصد اللذة والنا ظرمع ذلك امن من الفتنة (ওয়াইজ্‌মাও আলা বিগাইরি কাছদিল্লাজ্জাতি ওয়ান নাজেরো মা'আ যালিকা আমেনুন্ মিনাল ফেৎনাতি) অর্থাৎ, সকল ফিকাহ্‌বিদগণ একমত যে, ভোগমুক্ত দৃষ্টিতে তাকানোতে কোনো দোষ নেই, আর এটা নজরে সুলতানী থেকে অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– النائر شفاء (আননাজরু শিফাউন) অর্থাৎ, দৃষ্টি ঔষধস্বরূপ। অনুরূপ দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি সুপারিশকারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁদেরকে জাতির বা সম্প্রদায়ের ত্রাতা বা সুপারিশকারী বলা হয়। অনুরূপ সদয়দৃষ্টির আড়াল ব্যক্তি সুপারিশ থেকে বঞ্চিত। সে নবী এবং অলিদের আমানতের অযোগ্য। উল্লেখ্য, মহিলা মুরিদগণ যখন আপন রাসূলে হাকীকী তথা মুর্শিদের মুখোমুখি হবে, তখন তাঁদেরকে অভ্যন্তরীণ তথা মনের পর্দা বহাল রাখতে হবে। নিজের পিতা ও চাচাদের সামনে যেভাবে পোশাক পরার নির্দেশ রয়েছে, সে ভাবেই পোশাক ইত্যাদি রক্ষা করতে হবে। কারণ এ সাক্ষাৎ ওয়াজেব। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এটা জরুরি। এ সাক্ষাৎ সঠিক পথ প্রদর্শন কর্ম হিসেবে গণ্য। এ কারণে অলিদের জন্য শরিয়ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ পর্দা আবশ্যক। এটা শত শত বাহ্যিক পর্দার চেয়ে অনেক উত্তম। বিবি রাবেয়া বস্‌রী, বিবি তোহ্‌ফা এবং বিবি শাবান প্রমুখ শরিয়ত অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ পর্দা করেছেন, যা শত শত বাহ্যিক পর্দার চেয়ে উত্তম এবং কার্যকরী।

বাবা শেখ ফরিদ তাঁর আপন 'তাজ্‌কেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অলিকুল মাতা হযরত রাবেয়া বস্‌রী যতক্ষণ হযরত হাসান বস্‌রীর দরবারে হাজির না হতেন, ততক্ষণ তিনি ওয়াজ শুরু করতেন না। কেউ যদি তাঁকে প্রশ্ন করত যে, আপনি মহিলা হয়ে অপর পুরুষদের সভায় আসেন কেন? তিনি জবাব দিতেন, হাদীসে বলা হয়েছে– طالب المولى مذكر طالب العقبى مؤنث طالب الدنيا مخنث (তালিবুল মাওলা মুযাক্‌কারুন তালিবুল ওক্‌বা মোয়ান্নাসুন তালিবুদ্দুনিয়া মোখান্নাছুন) অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সাধনকারী পুরুষ, পরকালের সাধক নারী এবং দুনিয়াপ্রার্থী নপুংসক বা খোজা। সুতরাং আমি আল্লাহ্‌র সাধক তাই পুরুষ, তোমরা পরকাল সাধক তাই নারী। তোমরা কেন অপর পুরুষদের দরবারে আসছ? শরিয়তি পর্দায় সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ কর, তা হল অধ্যাত্মবাদী এবং নবী-অলিদের কাছে আসা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য বৈধ। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে নবী-অলিদের কবর ও মাজার জিয়ারত সাধারণভাবে বৈধ ও উপকারী। এ জন্যই আমাদের শেষ নবীর মাজার জিয়ারতে বহু নারীর সমাগম হয়। হযরত উম্মে বরকত জহুরা খাতুনের কবর আজও শত শত নারী-পুরুষ সর্বদা জিয়ারত করে। জিয়ারত অর্থ মোলাকাত বা সাক্ষাৎ। সুতরাং জিয়ারতকারীদের জিয়ারত শত মোলাকাতের চেয়েও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। জিয়ারত অবস্থায় তাদের সাথে মোলাকাত করা কেন বৈধ হবে না? যাদের জিয়ারতের সৌভাগ্য হয়নি, তারা তো দৃষ্টিহীন। তাদের পক্ষে জিয়ারতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তারাতো কলুর বলদ তথা চক্ষুবন্ধ তৈলের ঘানির বলদ। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কত চক্কর হল? সে বলবে আমার কাজ শুধু চক্কর দেওয়া এর বেশি আমি জানি না। কিন্তু প্রেমিকগণ যারা জিয়ারত করে তারা সকলেই মনেপ্রাণে তা করে। কাশ্‌ফ প্রভৃতির মাধ্যমে দীদার সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও অপরিচিতা মহিলার জিয়ারতে উক্তরূপ ধ্যান-খেয়াল করা শরিয়তমতে বৈধ বলে প্রমাণিত আছে। অতএব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আপন পীর ও মুর্শিদের শালীনভাবে ধ্যান ও খেয়ালের সাথে জিয়ারত করার মধ্যে অবশ্যই অধিক কল্যাণ রয়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এ কল্যাণ ফরযও হতে পারে।

লক্ষণীয়, আরবের মেয়েরা আজও লুলু দেয়। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং হযরত মা বরকত (মা ফাতিমা) অন্য মহিলাদের সাথে লুলু দিতেন। বোখারী শরীফে এর উল্লেখ আছে। আজও তো এটা হারাম নয়। শত শত লোক এ আওয়াজ শুনে থাকে।

মোট কথা, প্রেমাসক্ত ব্যক্তিদের যে প্রহর্ষ বা স্পন্দন হয়, তার কারণ তাদের প্রেম ও মহব্বত। অর্থাৎ, প্রেমানলের উত্তাপ থেকে এক প্রকার বিচ্ছুরণ ঘটে। এ এক অপূর্ব এবং রহস্যময় দৃশ্য। যে ব্যক্তি এ অবস্থার শিকার হয়, তাকে একেবারে জ্বালিয়ে দেয়। তার সংসার বিরান করে দেয়। কখনো এ অবস্থা চোর হয়ে অনুরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাণ চুরি করে এবং ডাকাত হয়ে তার ধন-সম্পদ লুট করে,

মন্ত্ররূপে তার বুদ্ধি ছিনিয়ে নেয়। জাদুটোনা হয়ে তাকে চির রোগীতে পরিণত করে, দেও বা ভূত হয়ে তাকে পাগল করে দেয়, প্রেতরূপে তাকে কষ্ট দেয়, তুফানরূপে তাকে মিছমার করে দেয়, ভাবাপ্লুত করে পাগল বানিয়ে ছাড়ে, খামখেয়ালি করে প্রেমে মা-বাপ থেকে আলাদা করে দেয়, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, ভবঘুরে বানায়, বনের পশুর মতো করে দেয়, নির্লজ্জ বেশরম করে তোলে, সুখ-শান্তি কেড়ে নেয়, পানাহারে অনীহা সৃষ্টি করে, খাট-পালং থেকে নামিয়ে ধূলায় লুটিয়ে দেয়, কখনো হাসায় কখনো কাঁদায়, আহ্! উহ্! চিৎকার করে আর আহ্! উহ্!-এর আগুন যাকে পুড়িয়েছে তার অন্তর কাবার, কলিজা কোপ্তা এবং গুর্দা কয়লা হয়ে গেছে, রক্ত পানি হয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে। তবে প্রেম আগুনে পুড়ে যাকে ভস্ম করে দিয়েছে, তার তো হদিস-ই নেই। ইউসুফের আগুনে জুলেখা পাগলিনী হয়ে গেছে। এতো হল নকল প্রেম। এতেই তো ফরহাদ-মজনু বনবাসী হয়েছে। তাহলে প্রকৃত প্রেম যার মাশুকরূপে সৌন্দর্যে শত ইউসুফের চেয়েও উত্তম যার দীদারের জ্যোতি স্ফুলিঙ্গে আত্মহারা শত শত পাগল পাগলামি করছে, সে প্রেম যাকে আঘাত করে তার অন্য কী উপায় আছে?

আহ্‌লে অজ্‌দ্ তথা প্রেম প্রহর্ষ ব্যক্তিগণ স্বস্তিহীন তথা মাজুর। প্রিয়া এবং মাশুকের দীদার তথা মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কোনো স্বস্তি থাকে না। যার দর্শনের দ্বারা আল্লাহ্, রাসূল এবং নবী-অলিদের দীদার লাভ হয়; বরং এতে গোটা সৃষ্টি পরিভ্রমণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান সম্ভব হয়। এসব অবস্থাদির সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, আপন মুর্শিদের সাথে দীদার না হলে জীবন রক্ষাই কষ্টকর হয়। এমতাবস্থায় আপন পীর-মুর্শিদের সাথে সাধক ও জাকেরদের মোলাকাত করা অপরিহার্য এবং ওয়াজেব হয়ে পড়ে। কারণ এ সময়ে মোলাকাতে চক্ষু শান্তি করতে না পারলে, হয় তার কলিজা ফেটে যাবে অথবা সে পাগল হয়ে যাবে অথবা আত্মভোলা হয়ে যাবে অথবা হুঁশহারা হয়ে যাবে। এতে সে শরিয়তের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যা নিষিদ্ধ ও হারাম। সুতরাং আপন মুর্শিদকে আধ্যাত্মিক পিতা মনে করে নেহায়েত আদবের সাথে যেভাবে আপন বাপ-দাদাদের নিকট যাওয়ার হুকুম রয়েছে ঠিক সেভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে মুর্শিদের সাথে মোলাকাত করা উচিত। এটা ওয়াজেব। কারণ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটা প্রয়োজন। এর দ্বিতীয় কারণ হল এতে সঠিক হেদায়েত তথা এতে মুরিদ ও মুর্শিদের মূল রহস্য নিহিত এবং এটা চূড়ান্ত বস্তু তথা হাল বা প্রেম প্রহর্ষ অবস্থার লক্ষ্য অর্জনের পথ। এ কারণে আল্লাহ্‌ওয়ালাদের আধ্যাত্মিক শরিয়তের পর্দা প্রয়োজন হয়। তাই বিবি রাবিয়া বস্‌রী, বিবি তোহ্‌ফা এবং বিবি শাবান (রঃ) প্রমুখদের আধ্যাত্মিক শরিয়তি পর্দা ছিল যা হাজারও বাহ্যিক পর্দা থেকে উত্তম।

মোট কথা, যখন মনের পর্দা হয় তথা যখন মন নফ্‌সের প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়, তখন মন হারাম ও সকল শংকার ঊর্ধ্বে চলে যায়। আর যার মনে কালিমা

থাকে, শত পর্দার মধ্যে থেকেও সে সুযোগ খুঁজবে। পাকা পূঁজ ভর্তি ফোঁড়া ঢেকে রেখে লাভ কী? বরং একে ফাটিয়ে দাও।

উদ্ধৃত আছে যে, বাবা শেখ ফরিদ তাঁর 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত রাবেয়া বস্‌রী যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত হাসান বস্‌রীর দরবারে হাজির না হতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ওয়াজ শুরু করতেন না। এতে বোঝা যায় যে, নারীগণ যোগ্যতায় পুরুষদের সমকক্ষ; বরং ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষদের চেয়ে উত্তমও হয়। এজন্যই হযরত হাসান বস্‌রীর দরবারে হযরত রাবেয়া বস্‌রী সকলের চেয়ে মর্যাদাবান ছিলেন। অথচ উক্ত দরবারে শত শত পুরুষ উপস্থিত ছিলেন এবং যাদের অধিকাংশই ছিলেন খায়রুল কুরুন তথা পুণ্যবানদের যুগের মানুষ। মোট কথা, যোগ্যতা অথবা অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য হোক, প্রত্যেক নারী প্রত্যেক পুরুষের মোকাবিলায় বুজুর্গ। যেমন মা তার নিজের সন্তানের কাছে। অনুরূপ কামেল তথা পরিপূর্ণ ব্যক্তি নাকেস তথা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির মোকাবিলায় অধিক বুজুর্গ বা মর্যাদার অধিকারী। রুবুবিয়াত তথা লালন-পালনের দায়িত্বের জন্য অনেকে মর্যাদার অধিকারী হয়। যেমন পিতা-মাতা প্রমুখ। আবার কেউ সাধনায় সিদ্ধির পূর্ণতার প্রেক্ষিতে অনেক মর্যাদা পেয়ে থাকেন। কামেল এবং আরেফ ব্যক্তিত্ব এর অন্তর্ভুক্ত। এদের মোকাবিলায় পৃথিবীর সকল মানুষ নগণ্য এবং ক্ষুদ্র পর্যায়ভুক্ত। এ বুজুর্গ সম্প্রদায় হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পিতা-মাতার পরিপূর্ণ গুণাবলি অর্জন করে পৃথিবীবাসীর জন্য পিতা-মাতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আছেন। এ জন্য স্বর্গীয় উপলব্ধির জগতে তথা জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় স্তরে দেখা যাবে অলিগণ সকলের চেয়ে উন্নতশির। যেমন হযরত মা বরকত ফাতিমা এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও অন্যান্য। অনুরূপ হযরত রাবিয়া বস্‌রী ও সভাসদদের নিকট মাতৃতুল্য ছিলেন। হযরত বিবি রাবেয়া বস্‌রীকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত আপনি নারী হয়ে পুরুষদের দরবারে আসেন কেন? তিনি উত্তরে বলতেন, হাদীস শরীফে আছে– طالب المولى مذكر طالبعقبى مونث طالب الدنيا مخنث (তালিবুল মাওলা মুজ্জাক্কেরুন তালিবুল ওক্‌বা মুয়ান্নাছুন তালিবুদ্ দুনিয়া মোখান্নাছুন) অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রার্থী পুরুষ, পরকালপ্রার্থী নারী এবং দুনিয়াপ্রার্থী খোজা। তোমরা পরকাল প্রার্থী তাই নারী। পুরুষদের দরবারে কেন আস? এ ছিল তাঁর শান্ত-সমহিত অবস্থায় চারিত্রিক পবিত্রতার মান। তবে যারা অজ্‌দ্ তথা প্রেম-প্রহর্ষের অধিকারী এবং হাল তথা মগ্ন অবস্থাপ্রাপ্ত হন তারা মোবাহ্ তথা অনুমোদিত পর্যায়ে থেকে সাধনার পথের মুসাফির হয়ে যান– এ পর্যায়ে তাদের নামাজ সংক্ষেপ করতে হয়। রোজা, নফল ইবাদত এবং জামায়াত প্রভৃতি থেকে রেহাই পান। নেহায়েত জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ পানাহারে তুষ্ট থেকে হারামের স্তর পেরিয়ে উৎস স্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ স্তরটাকে বলা হয় মোবাহ্‌র স্তর। প্রকৃতপক্ষে এ মহা সফরে বহু কঠিন কাজের সম্মুখীন হতে হয়। এতে রয়েছে ভয় ও সংকট, কঠোরতা ও জটিলতা, যার কারণে হয়ে যেতে হয় জ্ঞানহারা ও বেহুঁশ। এ ভয়ানক নদীর

ভ্রমণতরী আরামদায়ক নয়। এ অবস্থায় তার মাঝি-মাল্লারা এবং খালাসী সবই অস্থির হয়ে থাকে এবং অন্তর পানিশূন্য হয়ে যায়। এ সময় কারো আহার নিদ্রা বা অত্যাচার বা শক্তি-সামর্থ্য সবই বেকার। একমাত্র আহ্! উহ্! আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই এ সময়ে কাজে আসে না। সুতরাং এটা মৃত্যুর সময়ের সাথে তুলনীয়। তাই আশেক এবং প্রেমিকগণ মোবাহ্‌র পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ, তাদের দ্বারা কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে যেমন অজ্‌দ্ অবস্থায় শরিয়তের তোয়াক্কা না করা প্রভৃতি ক্ষমা করিয়ে নেন। তবে অজ্‌দ্ অবস্থায় শরিয়তের তোয়াক্কা না করার মধ্যেও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সাহেবে 'তায়াররুফ' প্রেমমগ্ন অবস্থায় শরিয়ত লংঘনের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আবূ তাইয়্যবা রাসূল (সঃ) এর শিঙ্গা টানেন এবং ভক্তির বশে রক্ত পান করেন। তখন রাসূল (সঃ) বলেন, তুমি দোজখের আগুন থেকে বেঁচে গেলে। আর এটা হল বড় ধরনের গুনাহর কাজ। তা সত্ত্বেও রাসূল (সঃ) তাকে এ কাজ থেকে বারণ করলেন না; বরং তাকে দোয়া করলেন। এর কারণ এই যে, ভিতরে তার ইচ্ছা ছিল সঠিক। তা না হলে হারাম রক্ত পান করার ফলে তার বেহেশতের দ্বার প্রশস্ত হতে পারে না। হাদীসে এ ধরনের অনেক কাহিনী আছে। এর কিছু কিছু "তায়াররুফ" ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া বদরের সাহাবাদের আল্লাহ্ যে সুসংবাদ দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে মাওলানা রুমীর মছনবির ব্যাখ্যায় জনাব হাজী এমদাদ উল্লাহ্ (রঃ) লিখেছেন– "তাওয়াজ্জু কালাম আনাস্ত কি-ই-শায়েখে বরকদমে আছ্‌হাবে বদর বাশাদ্, বরুয়ে হামা আশিয়্যা বা মুন্‌জিলা মোবাহ্ গর্‌দিদাহ্ বাশাদ। চে আজ মাচিয়াদ্ বেমাহোয়া মছিয়াত্ ফানিগাস্‌তাবাসাদ্। ওয়া আজ এরতেকাবে গুনাহ্ হার সাইয়েখ্‌রা দারার না দারাদ্।" (এ বাণীর মর্মার্থ হল এই যে, শায়েখে বদরী সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসারী হলে সব কিছু তার কাছে মোবাহ্ হয়ে যায়, অপরাধ আবার কী, তখন অপরাধ বলতে আর কিছু থাকে না। পাপের কাজেও শায়েখের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।) বলা হয়েছে– ان الله قد اطلع على قلوب اهل البدر فقال اعملوا ماشئتم لقد غفرت لكم (ইন্নাল্লাহা ক্বাদ আত্‌লায়া আলা কুলুবি আহ্‌লিলবাদারী ফাকালা ই'মালূ মা-শি-ই তুম লাক্বাদ গাফারতু লাকুম।) অর্থাৎ, আল্লাহ্ আহ্‌লে বদরদের অন্তরে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা যা ইচ্ছা কর, আমি অবশ্যই তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

হাদীসে আরও একটি কাহিনী পাওয়া যায়, এটা আবি লাবাবা-বিন আবদুল মানজার (রাঃ)-এর ঘটনা। তা হল এই যে, রাসূল (সঃ), বনী কোরাইজাকে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের ব্যাপারে সাদ-ইবনি-মায়াজ যা বলবে তোমরা তা মেনে নেবে। একথা মেনে নেওয়ার পর তারা আবু লাবাবার কাছে পরামর্শ চায়। আবু লাবাবা নিজের হাত দিয়ে গলার দিকে ইশারা করেন। অর্থাৎ, সে তোমাদের হত্যা করতে হুকুম দিবে। তোমরা তার ফায়সালা মানবে না। প্রকৃতপক্ষে সে সময় আবু লাবাবা গোলবার হালতে অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন। পরে যখন তাঁর হুঁশ আসে

তিনি লজ্জিত হন এই ভেবে যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। অতঃপর সোজা গিয়ে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন এবং বলেন যে, যতক্ষণ আল্লাহ্ আমার তওবা কবুল না করেন, ততক্ষণ আমি এভাবে থাকব। তখন রাসূল (সঃ) বললেন, সে যদি আমার কাছে আসত তাহলে আমি তাঁর জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। সে যখন এ কাজ করেছে, তখন আল্লাহ্ তাঁর তওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমি তাকে খুলব না। অতঃপর আবু লাবাবার তওবা কবুলের ব্যাপারে আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। সূরা আনফাল্– يا ايها الذين امنوا ان تتقون الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئا تكم ويغفكر لكم والله ذوفضل العئيم - (ইয়া আইউ-হাল্লাযীনা আমানু ইন্তাত্তাকুনাল্লাহা ইয়াজ্আল্ লাকুম্ ফুর্কানান্ ওয়াইয়ূকাফ্ফির আন্কুম ছাইয়্যে আতিকুম ওয়াইয়াগফিরলাকুম ওয়াল্লাহু জুল্ ফাদলিল আজীম) অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করবে তিনি তোমাদের মীমাংসা করে দিবেন, তোমাদের অপরাধসমূহ মুছে ফেলবেন, তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ্ অনেক অনুকম্পার অধিকারী। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে খুলে দিলেন। 'তায়াররুফের' লেখক এ কাহিনীটিকে চৈতন্যহীন ব্যক্তির জন্য শরিয়ত লংঘনের দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবু লাবাবা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে বেয়াদবি করেছেন এটা অপরাধ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে ক্ষমা না চেয়ে নিজেকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে দ্বিতীয়বার অপরাধ করেছেন। তা সত্ত্বেও ভিতর নির্দোষ ছিল বিধায় তা তওবা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, পাপের ভয়ে, কৃত পাপ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গিয়ে পবিত্র বক্ষ উন্মোচনের চাবিস্বরূপ হয়েছে। গুনাহ্র সুবাদেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। 'নোসখা-এ-জাদুত্তাকোয়াতে' তাই লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকলে তাতে দেখতে পারেন।

এখন যে উপলক্ষে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে চিন্তা করলে এ আয়াতে যে পথের প্রতি ঈশারা করা হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাতে কোনো প্রকার দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকবে না। হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) এ ভ্রমণতরীতে আরোহণ করার দরুনই জাহেরপন্থীদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করেছেন। যদিও তিনি বাহ্যিক রূপকে অনেক গুরুত্ব দিতেন, তথাপি মাকতুবাতে তিনি লিখেছেন– "পিরেতাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত।" (তোমার পীর তোমার প্রথম মাবুদ)। তিনি আরও লিখেছেন, 'আয় দারিগোকি শরিয়ত মিল্লাত আমাই হাস্ত, মিল্লাত মা মিল্লাতে কাফিরু হাম তারসায়ী হাস্ত।' (অন্ধ মাজহাব এই শরিয়ত হয়, তরসাই মাজহাব মম কাফেরী নিশ্চয়)। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ বান্দাদের যে সব পাপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, মানুষ যদি ইচ্ছা করে সে কাজ করার পর ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন; বরং মনের নিষ্ঠা সাপেক্ষে বান্দাকে আরও অধিক পুণ্য দিয়ে থাকেন। এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, কোনো ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপরাধ বা গুনাহ্ করলে তার গুনাহ্ অনুকম্পার অন্তর্ভুক্ত

হবে না কেন? যেমন হাড়িতে পাকের জিনিস আগুনের তাপে তরপাতে থাকে এবং ছুটাছুটি করে এতে তো কোনো ক্ষতি নেই; বরং বাবুর্চির এতে চরম উপকার হয় এবং কার্য সিদ্ধ হয়। আগুন তাতে চাউল ডাল গোস্ত এবং মশলাসমূহ মিশিয়ে একাকার করে দেয়। সে উত্তাপে পানি কাঁপতে থাকে, চাউল ডাল তরপাতে থাকে আর মশল্লা ও গোস্ত গলতে থাকে। অনুরূপ অজ্দ্-এ আনন্দ এবং প্রেমাত্মক হাঙ্গামা ছাড়া আর কী আছে? জাহান্নামের আগুনের চেয়ে উত্তপ্ত এ প্রেম আগুনে জ্বলন্ত অবস্থায় তার কোনো স্বাদ অবশিষ্ট থাকতে পারে যে জন্য তার দ্বারা আবার জাহান্নামের কাজ হতে পারে? আল্লাহ্ই তো তাদের বলেছেন, اعملوا ما شئتم (আ'মালু মা-শি'তুম) অর্থাৎ, যা ইচ্ছা কর।

ধর্মের শাখা-প্রশাখা

সৎকর্মের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বারণ করা সংক্রান্ত ইসলামের বিধি-বিধানসমূহকে ধর্মের শাখা-প্রশাখা বলা হয়। মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্জিত কোনো নির্দেশ পালনীয় নয়। অর্থাৎ, যে নির্দেশের সাথে প্রেমের প্রহর্ষ নেই, যে নির্দেশ অধ্যাত্ম চিন্তা থেকে মুক্ত, তা নির্দেশ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়; বরং ধর্ম ও ধর্মের মূলনীতি পরম উন্নতির সহায়ক যা প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বিধি-বিধান এবং এর চৌহদ্দী পূর্ণাঙ্গ শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা নিরেট আহ্ওয়াল তথা প্রেম-প্রহর্ষিত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়– এরই এক অবস্থার নাম ঈমান। অর্থাৎ, ঈমানের ফলশ্রুতি মুলবস্তুর উৎস হলো আহ্ওয়াল তথা পবিত্র প্রেম-প্রহর্ষিত অবস্থা। ঈমান হল প্রহর্ষিত অবস্থার একেবারে প্রাথমিক স্তর। ঈমান থাকলেও কেবল হাল তথা পবিত্র প্রেম-প্রহর্ষিত অবস্থায় উৎস বস্তু অবতরণ করে। তা মূল বক্ষ থেকে ঈমানের স্থান হয়ে সেখান থেকে পবিত্র প্রেম-প্রহর্ষের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করতে থাকে। উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তির কাছে ঈমান পরাজিত হলেও প্রেম-প্রহর্ষিত অবস্থার বিচারে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বাইরে নয়। তবে বিজিত। কারণ ঈমানের ফলাফল প্রেম ও মহব্বত পবিত্র প্রেম-প্রহর্ষ থেকে আসে। তা পরাজিত হলেও আপন সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কারণ তারও তো উৎপত্তি প্রেম-প্রহর্ষ থেকে। অর্থাৎ, প্রেম ও মহব্বত ঈমানের মূল এবং পরিণতি। কারণ শাখা মূল থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। মূল থেকেই শাখা-প্রশাখা বের হয়।

যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মায় এবং জমি থেকে উদ্গত হয় সমস্ত ভূতলীয় বস্তু। বস্তুত এ জমি বীজেরও বীজ। তা থেকে হাজারও প্রকার বস্তু উদ্গত হয়ে পৃথিবীকে সুশোভিত করে দিচ্ছে। অথচ এগুলো এককভাবে পরস্পর বিরোধী কিন্তু মূলত এগুলো পরস্পর বিরোধী নয়; বরং এটা পূর্ণতার প্রকাশ। বস্তুত এটা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ যা বাহ্যত পরস্পরবিরোধী হলেও এর অভ্যন্তরে রয়েছে নানাবিধ রহস্য ও গোপন তত্ত্ব। যেমন ভালো-মন্দ, মিঠা-তিতা, কোনো গাছই বীজ নিরপেক্ষ নয়, তেমনই ধর্মের কোনো শাখা-প্রশাখা বা ধর্ম প্রকৃত ঈমান থেকে মুক্ত নয়, এ

ব্যাপারে মাওলানা রুমির ব্যাখ্যাটি পেয়ালায় সাগর ঢুকানোর মতো। তা হল "মারহাবা শুদ্ জুম্লাগি আমিখ্তা, কুজ্হাদর এক্ লগন্ দররিখ্তা জায়াকে খোদ্ মান্দুধাহ্ জুজ এক্ বেশ্ নিস্থ্, কেশে হাইয়ে জিনে রুইয়ে এক কেশ্ নিস্ত্।"

মোট কথা, সকল ধর্মই মূলত এক। কারণ এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রভু নেই, তখন তাঁর বাহ্যিক প্রকাশেও অন্য কারও অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাও এক এবং অভিন্ন। রকমারি বৈশিষ্ট্যে সকল সৃষ্টি এক, তবে প্রত্যেকেই যার যার অনুকূল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে এবং আহরণ করে আহার ও শক্তি। তবে বস্তুর স্বীয় বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে যা একজনের জন্য খাদ্য তা অন্যের জন্য বিষ। কিন্তু মূল উৎসে এ সবই এক এবং অভিন্ন। লক্ষণীয় যে, সমস্ত বস্তুই মাটি থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মলাভ করে কিছুদিন পর আবার তা মাটিতে মিশে যায়। এভাবে এরা আপন স্রষ্টার কাছে ফিরে যায়। আল্লাহ্ বলেন, كل شئي اليه ترجعون (কুল্লু শাইইন ইলাইহি তুরজাউন) অর্থাৎ, সকল বস্তু আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাচ্ছে। সৃষ্টি পর্যায়ে যে বস্তু যে বৈশিষ্ট্যে বর্তমান ছিল প্রত্যেক বস্তু সে রূপ চরিত্রে পরিণতিপ্রাপ্ত হবে। তবে সে যাই হোক, সর্বাবস্থায়ই এরা আপন আদি উৎসের পরিচায়ক। দোয়াতের কালি থেকে যেভাবে অক্ষর সৃষ্টি হয় ঠিক সেরূপ প্রেম থেকে সৃষ্টি সমস্ত বস্তু উৎস ও লক্ষ্যের বিচারে প্রেমাস্পদেরই নির্যাস।

লক্ষ্যণীয়, আহ্মদ (সঃ)-এর প্রেম তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য আহাদ তথা পরম সত্তা পর্যন্ত পৌঁছে এবং তাঁর ইশ্ক ওয়াহেদী তথা একক প্রেম বা মুহাম্মদীর গোপন রহস্য তা দ্বারা হযরত গাউসে পাক ঐশ্বরিক মর্যাদা লাভ করেন। বড় বড় গাউস কুতুব এবং অলি আবদালদের, আহম্মদী প্রেম চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। দেখ, মুহাম্মদী প্রেম হযরত ওয়েস করণী (রঃ)-কে রহস্যালোকে পৌঁছে দেয়। অথচ তিনি চোখের দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যদিও তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-কে বাহ্যিক চক্ষে দেখেননি কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, বাহ্যিক দৃষ্টি যার ধারে কাছেও পৌঁছার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইহধাম ত্যাগের সময় উপস্থিত, তিনি হযরত আলী (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, আমার এ জুব্বা আমার বন্ধু ওয়েস করণীকে প্রদান করবে। একথা শুনে তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে তিনি কে? হযরত বললেন, তিনি 'করণ' এর অধিবাসী। প্রকাশ্যে তাঁর সাথে আমার মোলাকাত হয়নি।

কাহিনীটি এরূপ– হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁরা দুজন উক্ত ব্যক্তির অন্বেষণে 'করণে' আসেন এবং লোকের কাছে তাঁর সম্পর্কে জানতে চান। তখন এলাকাবাসী তাঁদের বলেছিল যে, এ নামের একজন জংলী লোক আছে, সে সব সময় মানুষ থেকে দূরে থাকে। অবশেষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা তাঁকে উক্ত জুব্বা মোবারক হস্তান্তর করেন এবং তাঁরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সালাম জানিয়ে বলেন যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি আপনার জন্য এ উপহার পাঠিয়েছেন। তিনি এ কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা দুজন তাঁর সাথে

আন্তরিকভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করেন এবং তিনি শান্ত হন। কথাবার্তা শেষ করে হযরত ওয়েস (রঃ) তাদের বললেন, আপনারা একটু দূরে অপেক্ষা করুন, আমি হুজুরের উম্মতের জন্য দোয়া করব। তারা দুজন হযরত ওয়েস (রঃ) থেকে আলাদা হলেন। তখন হযরত করণী (রঃ) দোয়ায় লিপ্ত হলেন। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! মৃত উম্মতদের একেবারে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ কয়েক হাজার লোককে ক্ষমা করে দিলেন। তিনি আবার দোয়ায় লিপ্ত হলেন, এবারও কয়েক হাজার লোককে ক্ষমা করা হল। তিনি আবার দোয়ায় লিপ্ত হলেন এবং যথেষ্ট পুনরুক্তি করতে লাগলেন। তখন আওয়াজ এল নজদে যত ছাগল আছে তাদের পশম পরিমাণ সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেওয়া হল। আবারও তিনি দোয়ায় লিপ্ত হলেন। ইতোমধ্যে হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সাথে কথা আরম্ভ করেন। ফলে তাঁর গোপন কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তখন অতি আক্ষেপের সাথে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনি যদি আমাদের গোপন কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করতেন, তাহলে সকল মৃত উম্মতদের আজ ক্ষমা হয়ে যেত। এতে তারা উভয়ই লজ্জিত হন এবং বিনয়ের সাথে বলেন, ক্ষমা করুন। বিস্তারিত কাহিনী হযরত বাবা শেখ ফরিদ (রঃ)-এর 'তাজকেরাতুল আউলিয়া'তে দেখুন।

এখানে গভীরভাবে চিন্তা করলে একটি সূক্ষ্ম বিষয় ধরা পড়ে। তা হল এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) দুজনই বিশিষ্ট সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও হযরত ওয়েস করণী (রঃ)-এর সাথে অত্যন্ত বিনীত এবং ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলেছেন এবং গোপন দোয়ার সময়ে হযরত আলী কর্তৃক একটু বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়াতে হযরত করণী (রঃ) দুঃখিত হন, যে জন্য হযরত আলী (রাঃ)-কে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল হযরত করণী (রঃ) কিভাবে এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করলেন? এটা কি চর্মচোখে দেখার সাথে সম্পর্কিত না অন্তর্দৃষ্টি তথা নূরী দর্শন এবং প্রেম-প্রহর্ষ অবস্থায় সাক্ষাতের ফল? বরং এ মর্যাদা তার প্রেমের ফল। এটা ঈমানি দৃষ্টি এবং প্রেমের ফল না হলে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে দেখেননি, কী কারণে তার এ মর্যাদা লাভ হবে? আবু জেহেল এবং অন্যান্য কাফিরগণ তো তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছেন। এ জন্য কি তারা কোনো মর্যাদা পেয়েছেন? প্রেম এমন একটি পরশ পাথর যার স্পর্শে লোহা, তামা খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। আসল প্রেমের মধ্যে তো শরিয়ত ও বিধি-বিধান বিলুপ্তই হয়ে যায় এবং পরিত্যক্ত হয় মাশুক ছাড়া অন্য সবকিছুর তোয়াক্কা। এ অবস্থায় সুফিদের জন্য ফরয, ওয়াজেব বা সুন্নত অথবা মুবাহ্ এর মোকাবিলায় আদেশ নিষেধ অবতীর্ণ হয়। জাহেরপন্থীগণ এটা জানে না তাই তারা এর বিরোধী। ফেকাহ্বিদও, যেমন– 'দুররুল মোখতার' এবং 'শামী' প্রভৃতি এ রেয়াত তথা অব্যাহতি সম্পর্কে যত্নবান। কিন্তু সুফিগণও তো সর্বশেষ সীমা রক্ষা করার বিরোধী নন; বরং তারা এর প্রকৃত সমর্থক। এ ব্যাপারে প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ন্যায়ত বলতে হয়, জাগতিক প্রেমের লক্ষ্য স্বার্থ। এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। অপরদিকে লক্ষ করুন, কখনো যদি মজনুর সামনে

লাইলি এসে বলেছে যে, আমি লাইলি। মজনু বলেছে, তুমি কোন লাইলি? উত্তর দিয়েছে, আমি তোমার প্রেমিকা। মজনু বলেছে, সে লাইলী দিয়ে আমার কাজ নেই, আমি যে লাইলির সাথে মিলিত হয়েছি, সে আমার থেকে আলাদা নয়।

শরিয়তের ব্যাখ্যা

শরিয়তপন্থীদের উচিত প্রথমে শরিয়তের সংজ্ঞা এবং উহার বিভাগ সম্পর্কে অবগত হওয়া। শরিয়তের বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারলে ধর্ম এবং ঈমানের প্রেক্ষিতে ইসলাম, ঈমান এবং ইরফানের সৌন্দর্যসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে আর জানা যাবে কোন বিদ্যার বৈশিষ্ট্য কী? এ জন্য তাদের শরিয়তের সংজ্ঞা ও বিভাগ সম্পর্কে জানা ফরয।

শরিয়ত তিন প্রকার : ১। শরা তাআব্বুদি, ২। শরা তাআ'সুকী এবং ৩। শরা তাআর্‌রুফি। শরা তাআব্বুদি, সর্বসাধারণের শরিয়ত। শরা তাআ'সুকী, আশিক তথা প্রেমিকদের শরিয়ত এবং শরা তাআর্‌রুফি, আরেফদের শরিয়ত। সর্বসাধারণের শরিয়ত সদা তর্ক-বিতর্ক মতানৈক্য এবং ঝগড়া-বিবাদে জর্জরিত। এ কারণে জাহেরপন্থীরা পরস্পরবিরোধী এবং সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। এটা কোনো মানুষের কাছেই অজানা নয়। অথচ এরা বাতেনী শরিয়ত তথা আশেক এবং আরেফদের শরিয়তের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না; বরং সে গোপন তথা রহস্যময় পথ সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও জানার সৌভাগ্য জাহেরপন্থীদের নেই। কেননা জাহেরপন্থীদের কোনো প্রকার কামালত বা পূর্ণতা ভাগ্যে জোটে না; বরং বক্তৃতা এবং শোনার মধ্যেই তাদের ধর্ম সীমাবদ্ধ। অপর দিকে, ইশ্‌ক বা প্রেমবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত শরিয়তের সমাপ্তি হল হাল তথা পবিত্র প্রেম-প্রহর্ষ অবস্থা। প্রহর্ষ জজ্‌বা, চৈতন্যহীনতা প্রভৃতি পথে তা অর্জিত হয়। কাশ্‌ফ, এল্‌হাম এবং মোশাহেদ প্রভৃতি এর ফলশ্রুতি। এ পথেই অর্জিত হয় প্রকৃত ঈমান ও একিন; বরং এর চূড়ান্ত পর্যায়ে একিনের পরিসমাপ্তির অনুমোদন আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা প্রমাণিত। বলা হচ্ছে– واعبد ربك حتى يا تيك اليقين (ওয়া'বুদু রাব্বুকা হাত্তা ইয়াতিকাল ইয়াক্বীন) অর্থাৎ, ইবাদত কর তোমার প্রভুর একিন অর্জিত হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ, এ স্তর ধ্যান ধারণার ঊর্ধ্বে। এটা পূর্ণাঙ্গ একিন। সুতরাং হযরত গাউস পাক বলেন, من ار ادا لعبادة بعد الوصول فقد اشرك با الله (মান আরাদাল ইবাদাতা বাআদাল ওয়াসূলে ফাক্বাদ আশরাকা বিল্লাহি) অর্থাৎ, মিলনের পর ইবাদত নিঃসন্দেহে শির্‌ক। হাসানাতুল আরেফিনেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত দারাশিকোও উক্ত আয়াতের অনুরূপ অর্থ করেছেন। এরপর ইর্‌ফান তথা মারেফাতের বিষয়সমূহ যা ইল্‌মে মারেফাতের জন্য আবশ্যক তা প্রকাশিত হয়। এটা ইবাদতের ঊর্ধ্বের স্তর। এ স্তরে ইবাদত করা অবৈধ। এ কারণে মারেফাত এবং ইশ্‌ক্‌-এর স্তর সাধারণ ঈমান স্তরের ঊর্ধ্বে এবং উন্নত। জিবরাঈলের একটি

হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়। মেশকাতে ঈমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। তা হল ঈমান, ইসলাম এবং ইহ্‌সান। ঈমানের এ সংজ্ঞার ব্যাপারে সুফিগণ মন্তব্য করেছেন যে, এখানে ইসলাম দ্বারা সাধারণভাবে প্রেম অর্জন তথা আহ্‌ওয়াল বা প্রেম প্রহর্ষিত অবস্থা ও ইরফান তথা ঐশী জ্ঞান প্রাপ্তি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এখানে পরিপূর্ণ হাল্‌ তথা প্রেম-প্রহর্ষিত অবস্থা দ্বারা ঐশী জ্ঞান লাভের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রেম ও ঐশী জ্ঞানের কাছে সাধারণের ইসলাম ও তার আনুমানিক গুরুত্ব সম্পূর্ণ মূল্যহীন। যেমন– কালেমা তাওহীদ, কল্পিত ইসলাম এবং এর কাল্পনিক কাঠামোকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর না সূচক "লা" আল্লাহ্‌ ছাড়া সব কিছুকেই অস্বীকার করে। অর্থাৎ, বাহ্যিক বিধিবিধান সাধারণভাবে ইবাদতসহ সব কিছুই লা অস্বীকার করে।

সুতরাং এ কালেমা প্রেমের বাণী বলে গণ্য। এ কালেমার অস্বীকৃতিমূলক বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাধারণের শরিয়তকে অস্বীকার করাও বৈধ। এ কারণে প্রেম অস্বীকৃতির স্তরে উপনীত হয়ে প্রেমিকও এর পথিকদের পরম সত্তার প্রতিষ্ঠার সফলে রূপক বিধিনিষেধের অনুসারী না করে মৌলিক বিশুদ্ধায়নের দিকে নিয়ে যায়, যেন জাহেরপন্থিদেরকে বাতিল করা হচ্ছে। এ কারণে বাহ্যিক শরিয়তের অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র অলিদের কাফির মনে করে। বস্তুত স্বয়ং কালেমার মধ্যেই এ কুফরির শিক্ষা নিহিত রয়েছে। স্বয়ং কালেমাই তো ফরয, ওয়াজেব, হালাল-হারাম সংক্রান্ত সমস্ত বিধিবিধানসহ আল্লাহ্‌ ছাড়া সব কিছুকেই অস্বীকার করে। তা না হলে জাত এবং হাক্বিকত তথা মৌল সত্তা কিভাবে প্রমাণিত হয় এবং লাভ হবে তার সম্পর্কে পরিপক্ব যথার্থ জ্ঞান। অতএব অনুরূপ অস্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষেই যথার্থ ইসলাম।

এজন্য কাফিরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– প্রথমত, কুফরে তায়াব্বুদী, দ্বিতীয়ত, কুফরে তায়াসূকি এবং তৃতীয়ত কুফরে ইরফানী। কুফরে তায়াব্বুদির ক্ষেত্রে যে কুফরি করে, সে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধী। কারণ এ স্তরে ধর্ম এবং তাদের জ্ঞান ইবাদতের মধ্যেই সীমিত। এর বাইরে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই। দ্বিতীয়ত, কুফরে তায়াসূকীর অর্জিত জ্ঞানরাজ্যে প্রেম এবং পরম সত্তার নৈকট্য ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখানে সব কিছুকেই অস্বীকার করে আপন সত্তার পরিপূর্ণতা প্রমাণিত হওয়ার কারণে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের কাছে এটা কুফরি বলেই মনে হয়। কিন্তু আহ্‌লে হক তথা সত্যের সাধকদের জন্য অনুরূপ কুফরি বাধ্যতামূলক, অন্যথায় দ্বিত্বতা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। এ ধরনের কুফরি করা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের জন্য বড় ধরনের ফরয কাজ। এর অন্যথা করা তাদের জন্য শির্‌ক। কারণ পরম সত্যের পাশাপাশি অন্য কিছুকে অস্বীকার করা মারাত্মক শির্‌ক। জাহেরপন্থিরা এটা জানে না আর শিখালেও বোঝে না। আগুনের বিকাশ তথা সারা পৃথিবীর আগুন একই আগুন এটা যারা জানে না, তারা উক্ত বিষয় কী করে জানবে? তারা জানে না রহস্য জগৎটা কোন বৃক্ষের ফল। তাই তারা একটা মজার কথা বলে। অর্থাৎ, যে বিষয়ে তাদের কিছু বলার থাকে না, তখন তারা বলে যে, এর মধ্যে রহস্য আছে।

যে যাই হোক চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রমাণিত হল যে, এক প্রকার কুফর আছে যা দোযখের কাজ আর বাকি দু প্রকার কুফর হল ভালো ও পুণ্যের কাজ। পরবর্তী দু প্রকার কুফরের মাধ্যমে পরম সত্তা ও পূর্ণতা নিজের মধ্যে স্থিতিলাভ করে। এটাই ইত্তেহাদ বা একীভূত হওয়া। এখানে আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যকার ভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে স্বতন্ত্র আল্লাহ্র সত্তাকে অস্বীকার তথা কুফরির মাধ্যমে আপন সত্তায় আল্লাহ্কে অধিষ্ঠিত করা হয়। জগতের সকল অলি এবং নবীগণ এ উভয় প্রেক্ষিতে আপন আপন পূর্ণতা প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাপারে কোনো অলি-আল্লাহ্রই ভিন্নতা নেই। উল্লেখ্য, দারাশিকো (রঃ) তাঁর 'হাসানাতুল আরেফিন' কিতাবে উচ্চস্তরের আউলিয়া, প্রধান সাহাবা এবং নবীদের সম্পর্কে এমন কতশত কথা লিখেছেন, জাহেরপন্থিরা যাকে কাফির এবং কুফর বলে থাকেন; বরং এমন কোনো অলি নেই যার এ ধরনের কুফরি বলার প্রমাণ নেই। লক্ষণীয়, হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) তাঁর মাকতুবাত কিতাবে বলেছেন,

আইয়ে দরইগা কে শরিয়ত মিল্লাতে আমাই হাস্ত
মিল্লাতে মা মিল্লাতে কাফিরওয়া হাম্ তরসায়ী হাস্ত॥
কুফ্রে ঈমান জুল্ফ্ ওয়ারুয়ে আঁ পরী জিবাইয়ী হাস্ত॥
কুফ্র ও ঈমান হার দু আন্দর রাহে মা ইয়াক্তায়ী হাস্ত॥

হযরত বু আলী কলন্দর (রঃ) বলেন, "চে মূসা চে ঈসা চে পীর মুরসালান আহমদ। চে তরচা ও চে মগা ইঁজা হামা গাশতাহ বরাবর বিন্" (অর্থাৎ এখানে মূসা ঈসা পীর পয়গাম্বর এবং আহমদ ও মগ ইত্যাদি কোনো ভেদাভেদ নেই, সব মিলে একাকার)। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, رأيت شيئا الا رأيت الله (রাআইতু শাইআন ইল্লা রাআইতুল্লা) অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো বস্তুই দেখি নি। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, مارأيت شيئا الا رأيت الله (মা-রাআইতু শাইআন ইল্লাহ রাআই তুল্লাহ) অর্থাৎ, আমি সকল বস্তুতে আল্লাহ্কেই দেখেছি। অন্যত্র তিনি বলেছেন যে, কোরানে কোনো শত্রুর উল্লেখ নেই এবং বলা হয়নি কিছু কাফিরদের লক্ষ করে। এখানে কাফির দ্বারা আসল কাফির তথা আরেফদের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইব্নে আরাবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেছেন, ان الذين كفرواسواء عليهم (ইন্নালাযীনা কাফারু ছাওয়াউন আলাইহিম...)

মোট কথা আল্লাহ্ ও বান্দার একাত্ম হওয়া একটি বড় রহস্য। আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে ভিন্নতা চলে গেলে জ্যোতির প্রকাশ অনুভূত হওয়া বান্দার মর্যাদা এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। যেভাবে বিশ্বব্যাপী আগুনের প্রকাশ বর্তমান সেভাবেই আল্লাহ্র মধ্যে বান্দা এবং বান্দার মধ্যে আল্লাহ্র প্রকাশ বর্তমান। বরং তার চেয়েও হাজারগুণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহ্র প্রকাশ বর্তমান ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। এ প্রকাশের প্রেক্ষিতে বান্দাও সর্বরকমে অদৃশ্য ও

দৃশ্যমান। যারা জানেন তাদের কাছে এটা গোপন নয়। এক আল্লাহ্র সাধক-মুর্শিদের ফয়েজ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে তারও এ কথা অজানা নয় যে, মুর্শিদের কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করার ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের কোনো পার্থক্য নেই। যখনই আপন মুর্শিদকে স্মরণ করবে তখনই অদৃশ্য থেকে এক আশ্চর্য বস্তু প্রত্যক্ষ করবে অথবা কোনো আকর্ষণ অথবা নৈকট্যজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। যাকে দেখাশোনার মাধ্যমে চেনা যাবে অথবা সৃষ্টির প্রকাশের মাধ্যমে জানা যাবে। দিয়াশলাই অথবা আগ্নেয়শিখার মধ্যে আগুনের অস্তিত্বের মতোই বান্দা অনুরূপভাবে সর্বত্র বর্তমান ও দৃশ্যমান। তবে এটা আল্লাহ্র সুস্পষ্ট প্রকাশ। এ ক্রিয়া কৌশলটা জানা-ই আল্লাহ্র অলিদের কাজ। কালেমাপন্থিরাও এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই নেই। এক শ্রেণীর জ্ঞানবঞ্চিত অযোগ্য লোক যারা নিজেরা কাফির তারা প্রকৃত মুমিনদেরকে কাফির মনে করছে। এরা সদা কাফির এবং সদা মুশরিক। আল্লাহ্র সত্তার মতো "রূহ"-ও পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত ও প্রকাশিত। যে প্রজাতি থেকে কোনো কিছু জন্মায় এমন কোনো প্রজাতি রূহের মূল সত্তা থেকে মুক্ত নয়। এটাকেই পিতৃত্ব তথা পিতা-মাতার সূত্রে স্রষ্টা, সৃষ্টি, সন্তান এবং জন্ম বলা হয়। বিভিন্ন কারণে জন্ম বা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু মূলত প্রথম স্তরে যিনি স্রষ্টা তিনি হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। তিনি পরবর্তী সৃষ্টিরও স্রষ্টা এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত সর্বজ্ঞ এবং সকলের স্রষ্টা। তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী। তাইতো আল্লাহ্ বলেন, تبارك الله أحسن الخالقين (তাবা-রাকাল্লাহু আহ্সানুল খালিক্বীনা) অর্থাৎ, স্রষ্টাদের মধ্যে আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট এবং উত্তম। তিনি আপন পূর্ণ শক্তির দ্বারা বিভিন্ন বস্তু থেকে সৃষ্টি করান। রূহানী জগতের একটা মহৎগুণ ও বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সকল জীব ও সৃষ্টি জগৎ থেকে গোটা বিশ্ব চরাচরে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে ফেরেশতাদের একটি সৃষ্টি পর্যায় আলোকিত হওয়ার পর এক সূক্ষ্ম সত্তা থেকে সমস্ত দৈহিক বস্তু আত্মপ্রকাশ করে। যেমন বৃষ্টির দ্বারা ভূমি সঞ্জীবিত হয়। প্রত্যেক বস্তুর পরিপূর্ণতা এবং চূড়ান্তপ্রাপ্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন– মুরগির ডিমে বাচ্চা পাওয়া যায় এবং বৃক্ষে পাওয়া যায় ফল এবং গোটা। আর গোটা থেকে পাওয়া যায় অন্যান্য বৃক্ষরাজি। অনুরূপভাবে ইবাদতের পরম প্রাপ্তি হল প্রেম, আর প্রেমের প্রাপ্তি হল ইরফান তথা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞান। যেমন পরিষ্কার দেখা যায়– ডিমের ভেতর বাচ্চা এবং নিশ্চিত জানা যায় গোটা বা বীজের ভিতর বৃক্ষ। তেমনি নিশ্চিত যে, নবী-অলিগণ সত্য, বেহেশতি এবং পুণ্যবান। তাঁদের দ্বারা যে পুণ্য সৃষ্টি হয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। যেমনি সন্দেহ নেই যে, পানির দ্বারা পিপাসা দমন হয় এবং অর্জন করে সকল বস্তু পরিচ্ছন্নতা। সাবান কাপড় পরিষ্কার করে তাও পানি ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং এমন কোনো বস্তু আছে যে, যা দ্বারা উহা অপবিত্র হবে। যখন সাগরের পানি এবং সাবান দ্বারা সব বস্ত্র পরিষ্কার করা হয়, এমতাবস্থায় সাগরের পানিকে কী দ্বারা ধৌত করবে? সাবানের যদি পরিষ্কার করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তা কিভাবে অন্যকে পরিষ্কার করবে?

মধ্যবর্তী নামাজের বিবরণ

আল্লাহ্‌র বাণী– حافظوأ علي الصلوة والصلوة الوسطئ (হাফিজু আলাছ্ সালাতি ওয়াছ সালাতিল উস্‌তা) অর্থাৎ, যত্নবান হও সব নামাজ এবং মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। এখানে দু প্রকার নামাজ উদ্দেশ্য। প্রথম নামাজ দ্বারা পাঁচ বেলার নির্ধারিত ও অনির্ধারিত নামাজ বোঝানো হয়েছে। সালাত শব্দে সাধারণভাবে নির্ধারিত ও অনির্ধারিত সময়ে নামাজ বোঝায়। কারণ হাফিজু আদেশমূলক ক্রিয়া, এটা দৃঢ়তা প্রমাণ করে আর দৃঢ়তা অগ্রাধিকার পায়। অন্যান্য নিয়ম নীতিও এর বিরোধী নয়।

মোট কথা, উক্ত বাণী ওয়াক্তিয়া নামাজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং উক্ত আয়াত দ্বারা নামাজের অর্থের চেয়ে অধিক অর্থপূর্ণ নামাজ প্রমাণিত হয়। কারণ নামাজের অর্থ এবং উদ্দেশ্য শুধু ইবাদত নয়; বরং তার উদ্দেশ্য ইবাদত, দোয়া, প্রেমের প্রকাশ, কল্যাণ, নৈকট্য, সুন্দরায়ন, সুদূর সফর, দরূদ ইত্যাদি। সুতরাং এগুলোর মূল নীতি এবং ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে নামাজ বহুমুখী উদ্দেশ্য এবং ব্যাপক অর্থবহ হয়। এজন্য নামাজকে "সালাত" সময় নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সালাত তথা নামাজ দ্বারা যদি ওয়াক্তিয়া নামাজ ধরাও হয়, তাহলে "সালাতে ওস্‌তা" আল্লাহ্ কোনটিকে বলেছেন। ওস্‌তা অর্থ অভ্যন্তরীণ এবং মধ্যস্থিত নামাজ। এর অর্থ বাতেনী নামাজ যা অন্তরের তথা কল্‌বের জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয়। তাই সালাতে ওস্‌তা তথা মধ্যবর্তী নামাজ। কারণ এটাই মধ্যবর্তী স্থান। তথায় সালাতের ফয়েজ তথা উপকারিতা প্রকাশিত হয় এবং তাতে নামাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া প্রতিভাত হয়। এতে করেই সফল হয় নামাজের সমুদয় উদ্দেশ্যাবলি তথা ইবাদত, অনুকম্পা, নৈকট্য, সুন্দরায়ন, মহাসফর ইত্যাদি।

এগুলোই নামাজের মূল এবং মাধুর্য। এসব ছাড়া নামাজের পরিপূর্ণতা আসে না, আর এ নামাজই সকল নামাজের মধ্যমণি এবং সময়সমূহের অন্তর্নিহিত নামাজ এ জন্যই এটাকে সালাতে ওস্‌তা তথা মধ্যস্থিত নামাজ বলা হয়েছে। এ নামাজ অবিরত এবং সর্বক্ষণিক। এর বিরতি নেই। তাইতো নবী করীম (সঃ) বলেন, صلواة الدوام افضل من صلوة الوقت (ছালাতুদ দাওয়ামি আফজালূ মিনাছ্‌ছালাতিল্ ওয়াক্তি) অর্থাৎ, সর্বক্ষণিক নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের চেয়ে উত্তম। এতে বুঝা যায় নামাজ দু প্রকার। আল্লাহ্ বলেন, নামাজ এবং মধ্যবর্তী তথা মধ্যস্থিত নামাজের প্রতি যত্নবান হও। এখানে দু ধরনের নামাজের কথা বলা হয়েছে এবং এ দ্বিতীয় প্রকার নামাজকে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দা তথা আহলে যিকিরদের জন্য ফরয করেছেন। কারণ তাঁরা এর ফলাফল এবং ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞাত। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তা বুঝে নিবেন। আর অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিধাগ্রস্ত হবে এবং অনুমান করে এটা-ওটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবে, তা হবে বিতর্কমূলক। বিতর্ক হয়ে থাকে অনুমানকে ভিত্তি করে। অথচ অনুমান কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

নামাজ উপাস্যতার জগতে বান্দার জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ। যে নামাজের এ বৈশিষ্ট্য নেই তা নামাজই নয়। তাতো কেবল আবরণ নিঃস্বতা এবং ফাসাদ। আল্লাহ্ এ জুলুম থেকে রক্ষা করুন।

কেউ কেউ প্রমাণ দ্বারা সালাতে ওস্‌তা অর্থে আছরের নামাজকে বুঝিয়েছেন। তা হলেও তো আসর একটি সময়ের নাম। একটি শক্তিশালী সময়ের নাম আসর। এরই নাম ওস্‌তা। এটি একটি বিশেষ সময় যা দুটি সময়-সীমান্তে বিদ্যমান, সাগরের মধ্যভাগের গভীরতা এবং কোষাগারের সম্পদের মতো এটাই মধ্যস্থান। সর্বাবস্থায় এরইতো হেফাজত এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুত এ একটি অন্যতম গোপন বস্তু। যার স্থান একমাত্র অন্তরে। তাই মধ্যবর্তী স্থান এবং অবস্থা যা সমাগত হয় বক্ষে, যার উৎস মাথার মধ্যস্থিত তালুতে। এরই সাহায্যে সকল গোপন বিষয়াদি চূড়ান্ত হয়। গোপন বিষয়সমূহ যারা জানেন তাদের নয়; বরং এ বিষয়ে যারা অজ্ঞ কেবল তাদের কাছেই গোপনীয় বিষয় গোপন থাকে। সচেতন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন অথবা আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা, কারও কাছেই কোনো কিছু গোপন থাকে না। কারণ যার দ্বারা গোপন প্রকাশিত হয় এবং যার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয় স্বয়ং গোপন এ দুয়ের মূল এবং বিষয়বস্তু। এভাবে যে বিলুপ্ত হয়ে যায়, যে আবার স্বয়ং গুপ্ত ভাণ্ডারে পরিণত হয়ে যায়। যিনি হৃদয় সিংহাসনে উপবিষ্ট তিনিই আমাদের সকল রহস্যের উৎস। তিনি বলেছেন, كنت كنزا مخفيا (কুন্‌তু কান্‌জান্ মাখফিইয়ান) অর্থাৎ, আমিই গুপ্তধন। এটা সূর্যের উদয়-অস্তের সাথে তুলনীয়। কখনো উজ্জ্বল হয়ে উদিত হয় আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। যা প্রকাশ হয়ে গেছে তা আর গোপন রইল না। তা যেন চর্বিত বস্তু। গোপন জ্ঞানীদের কাছে যদি তা কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়, তা বুঝতে হবে এটা অস্ত যাওয়ার সময়। আর গোপন প্রকাশের সময়টাকে মনে করতে হবে উদয়ের সময়। তবে এটা আকাশে দৃশ্যমান নকল সূর্য নয়। কারণ এ সূর্য তো একই সময় পৃথিবীর সব জায়গায় উদয় হয় না। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়াও অন্ধকার অঞ্চল আছে। সেখানে সূর্যের প্রভাব পড়ে না। সেখানে আসর অর্থ কী হবে? উহা কি কোরানের হুকুমের আওতার বাইরে? না, না; বরং সেখানে সূর্য দ্বারা সদা উদয়মান সূর্য বুঝাবে। সে সূর্য আকাশে সদা ভাসমান। দিবা-নিশি এর বিচিত্র গুণাবলি বর্ণহীনতায় পূর্ণতা পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, سلام هى حتى مطلع الفجر (সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্‌লাইল্ ফাজ্‌রি) অর্থাৎ, কদরের রাতে ফজর পর্যন্ত অগণিত নিয়ামত বর্ষিত হয়। তাহলে যে সব স্থানে সূর্য উদয় হয় না, তারা কি এ বরকত থেকে বঞ্চিত? না, না; বরং এটা সে ফজর যা রহস্যাকাশে উদিত হয়, যা থেকে কোনো স্থান খালি থাকে না। তবে যে ব্যক্তি এ সূর্যের মুখ দেখে না সে এ সূর্য উদয়ের খবরই রাখে না। সেই, صم بكم عمى فهم لايرجعون (সুম্‌মুম্ বুকমুন উম্‌ইউন্ ফাহুম লা ইয়ারযিউন) অর্থাৎ, সে মূক, বধির, অন্ধ এবং অজ্ঞ। কিন্তু এই প্রকাশ্য সূর্য যা আমাদের মাথার উপর ঘুরছে এবং আরব ও তার বাইরের ভূ-মণ্ডলের কোনো

কোনো অংশে যার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান– গবেষণার ফলে সে বিষয় এখন সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত। এর উৎস ও অভ্যন্তরীণ সব কিছুই সকল রহস্যের আধার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ সবের উৎস অনুরূপ হাজারও সূর্যের বিলুপ্তির পরও বহাল থাকবে। এর মর্যাদা পরকাল পর্যায়ে প্রকাশিত হবে, যা কখনো অস্তমিত বা বিলুপ্ত হবে না। আস্‌র দ্বারা যদি অনুরূপ তাৎপর্যময় নামাজ উদ্দেশ্য হয় তাহলে যথার্থ। তবে এ ধরনের নামাজের যথার্থ অন্তর প্রয়োজন, কেবল হুকুম তামিল করা দ্বারা এ শ্রেণির নামাজ আদায় হয় না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, انا انزلناه فى ليالة القدر (ইন্না আন্‌যাল্‌নাহু ফী লাইলাতিল কাদ্‌রি) অর্থাৎ, আমি কোরানের সারমর্ম কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। অর্থাৎ কোরানের সারমর্ম তথা উভয় জগতের সমস্ত সৃষ্টির ভিতর বাইরের সমস্ত ধারণা মূলবীজ থেকে প্রমাণিত। এজন্যই বলা হচ্ছে, كل شئى اليه ترجعون (কুল্‌লু শাইইন ইলাইহি তুর্‌জাউন) অর্থাৎ, সকল বস্তুই তাতে প্রত্যাবর্তন করবে। এ একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়। সকল মৌল বস্তুতে কোরানের পূর্ণতা ও বৈশিষ্ট্য বিকাশমান এবং ভারসাম্য নির্ধারণ পরিমাপ যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল।

মোটকথা আমি কদরের রাতে কোরানের সারবস্তু অবতীর্ণ করেছি, তা ভূমিতে সংঘটিত হচ্ছে। কারণ যে আকাশ চক্রে রাতের অবস্থান হওয়ার কারণে রাত দিনের পার্থক্য হয় এবং ভূকেন্দ্রে চব্বিশ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। আর আকাশের গ্রহচক্রে পূর্ণ একমাস অর্থাৎ, কমবেশি ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। এভাবে আকাশের আবর্তনের প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে দিন ও বছর গণনা করা হয়। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে এ রাত দিন নেই। সেখানে হিসেব ভিন্নরূপ। কারণ আকাশে সময়ের কম বেশি পরিমাপ দ্বারা কার্য সম্পাদন হয় না। তাহলে এটা কোন রাত, যার মধ্যে কদর বা মর্যাদা রয়েছে? এ মর্যাদা কি জগদ্বাসীর জন্য, না আকাশবাসীর জন্য, না ফেরেশতাদের জন্য, না ঐশী জগদ্বাসীর জন্যও প্রযোজ্য? বস্তুত সে মর্যাদা যা উৎস ও উৎপত্তিসূত্রে জাগতিক নিয়মে সুরক্ষিত বীজে বর্তমান। কারণ সকল সৃষ্টির বিভাজন সমন্বয় এবং মর্ম যখন মূলাধার থেকে লাওহে মাহ্‌ফুজে নির্ধারিত হয়, তখন এ রাতও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বস্তুতপক্ষে কোরান সে রাতের প্রান্ত যা কালের মগজ ও ভাণ্ডার তাতে আপন সৌরভ ও ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয়। কারণ সে মহান কদরের রাত স্বীয় উৎস থেকে আপন কার্যকারিতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু হিসেবের আবর্তের দরুন কেউ এক বছরে, কেউ প্রত্যেক বছরে, আর কেউ লক্ষ বছরে একবার কদর লাভ করে। তার বছর তার আবর্তনেই সমাপ্ত হবে। আর সেখানের হিসেব সেখানেই শেষ হবে। তাই আল্লাহ্ বলেন, وما ادرك ما ليلة القدر (ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কাদরি) অর্থাৎ, ক্বদর কি তা জান? উল্লেখ্য, কদরের রাত তাঁর কদরে রহস্য সাগরের এক বিন্দু মাত্র। তাইতো আল্লাহ্ বলেন, ليلة قدر خيرم من ألف شهر (লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফিশাহ্‌রি।) অর্থাৎ, কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। কে জানে এসব কী রকম হাজার মাস, যে হাজার মাসের চেয়ে এক রাত উত্তম। তাহলে একমাস

কত মাসের চেয়ে উত্তম হবে? তাই আল্লাহ্ বলেন, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر (তানায্‌যালুল মালা–ইকাতু ওয়াররুহ্ ফীহা বি–ইয্‌নি রাব্বিহিম মিন কুল্‌লি আমরিন) অর্থাৎ, এরা অসীম রহ্‌মতের সাগর থেকে মাছের মতো চলমান পানিতে চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে। যেমনি বর্ষার অন্ধকারে জলস্রোতের উজানে স্রোতকে পিছনে ফেলে মাছ বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত স্থানে। তখন তারা নিজেকে ভুলে যায়। এ এক অপূর্ব স্বাদ। এ স্বাদের কারণেই গোটা সৃষ্টি জগৎ, নাস্তি-জগৎ থেকে হাস্তি-জগতে এসেছে। এ স্বাদ ঐশী প্রেমকে এমনভাবে তরঙ্গায়িত করে যা বর্ণনাতীত। এ স্বাদ মধুর সাগরের গভীর ডুবাতে থাকে যার প্রাতঃরশ্মির প্রভাবে উভয় জগৎ স্বাদে সৌরভে উদ্ভাসিত হয়। এ কল্যাণ রাশির বদৌলতে অসংখ্য ও নিকটতম ফেরেশতা উদ্ভিদের চারা এবং গাছের পাতার মতো প্রকাশিত হয়ে সারা জগৎ ভরে দেয়। এটা কত না অপূর্ব মোবারক সময়! তাই বলা হচ্ছে, سلام هى حتى مطلع الفجر (সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজরে) অর্থাৎ, চতুর্দিকে শান্তির প্রস্রবণ বহে সূর্যোদয় পর্যন্ত। এটাকে ফজরের সময়ও ধরা হয়। এ সময়ের কৃপাময় নূরের বদৌলতে শান্তির পর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। এর ফলে জাগতিক অন্ধকার মানবিক আবরণের আচ্ছন্নতা বিদূরিত হয় এবং খুলে যায় রহস্য জ্ঞানের দ্বার। এ সময়ের প্রাতঃ সমীরণে বুলবুলি ও মালিগণ হৈ চৈ ও প্রেমের ধ্বনি করতে করতে নির্জন থেকে বেরিয়ে আসে ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে বলতে বলতে। আক্ষেপ এই কৃপাময় রাত এবং মাশুকের গন্ধময় নির্জনতা শেষ হয়ে যাচ্ছে যা এক দু করে বহুদিনে এসেছিল। যার মধ্যে উভয় জগতের সৌন্দর্য ঝলসাচ্ছিল তার কালো কেশগুচ্ছের মোহে প্রেমিকা মাতাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি আজ নিরাশ হচ্ছেন। শবে কদর যদি কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ হত তাহলেও তাঁর সে ফজরের আনন্দ এবং চাকচিক্য এক মুহূর্তের জন্যও ব্যাহত হত না। অশান্তি, অশান্তি আক্ষেপ! আক্ষেপ!! কদর কে সরিয়ে নিল, কে তা বিচ্ছেদ করল?

আত্মীয়তার বিবরণ

আল্লাহ্ সকল জাতি এবং সকল জীবের আপন এবং আত্মীয়। তবে কী ধরনের আপন এবং আত্মীয়? কেবল কি মৌখিক আত্মীয় এবং আপন? এটাতো অসত্য এবং মিথ্যা কথা। তিনি যদি রূপক অর্থে আপন এবং বন্ধু হন তার অর্থ হল তিনি প্রকৃত এবং যথার্থ বন্ধু নন, নকল বন্ধু। এটা সত্যের আলাপ। যা প্রকৃত এবং সত্য তার কাছে রূপক অর্থহীন। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন আত্ম সম্পর্কের বিষয় অবগত হওয়া। আপন নির্দিষ্ট মূল গণ্ডি সম্পর্কে অবহিত হওয়া তথা আমরা কী, কে-ই বা আমাদের, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কোথায় ফিরে যাব, কী ছিলাম, কী হয়েছি এবং কোন বস্তু থেকে কী প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার নাম আমরা এবং তোমরা? আর কিভাবে সৃষ্টি সম্পর্ক প্রকাশিত হয় এবং কোন ধরনের সম্পর্ক সদা

মূল বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এগুলো যদি অনর্থক বা সম্পর্কহীন হয়, তাহলে আল্লাহ্‌কে আমরা প্রমাণ করব কিভাবে? যেমন লোকে বলে আমার চোখ, আমার নাক, আমার হাত, এগুলো আমার। এটা তারা কিভাবে বলে? এখানে সম্পর্কটা কি ধরনের এবং এ কথার অর্থই বা কী? এ একটি সম্পৃক্ততার সম্পর্ক। এটা সর্বজনবিদিত মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে কোন ক্রমেই তা স্বীয় মূল থেকে আলাদা হতে পারে না। কারণ এ একটি সত্তাজাত বৈশিষ্ট্যের নাম। সকল জীবের কাছেই আপন বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য। স্রষ্টার এ সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্যে আসল অলংকৃত করে ডেকে ওঠে এটা আমার সৃষ্টি। অপরদিকে সৃষ্টি আপন আদি প্রকাশসূত্রে বলে ওঠে তিনি আমাদের স্রষ্টা। এ একটি মহা রহস্য। কেবল প্রেমাসক্ত অবস্থায়ই সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। যেমন মুখের লালা মুখেরই এক প্রকার রস। তা দ্বারা মুখে স্বাদ সৃষ্টি হয়; কিন্তু বলার সময় বলা হয় যে, এটা লালা। আমার হাত, আমার চক্ষু, কথার অর্থও তাই। অনুরূপ সামগ্রিকভাবে আমরা ও তোমরার মধ্যেও একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক অনুভূত হয় এবং ধারণা হয় যে, এতে বৈপরীত্য রয়েছে। বস্তুত এ সম্পর্ক আপন সৃষ্টিমূল ও প্রকাশগত বৈপরীত্য বা বিরোধের নয়। বরং প্রকাশিত রূপের প্রেক্ষিতে বলা হয় আমরা তোমরা এবং বন্ধু, এরূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সকল প্রজাতি নিজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। নিজের মধ্যে নিজের খুশি অনুভব করে, নিজের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ে, নিজেকে রসসিক্ত করে এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় এক প্রকারের স্বাতন্ত্র্যবোধ। এ কারণে প্রথম আপন মূল বস্তু রসসিক্ত হয় এবং পরে যার মধ্যে আপন রস সঞ্চারিত হয়েছে তার সহযোগে খেলাধুলায় লিপ্ত হয়। এ খেলায় সকল ব্যক্তি জোয়ান, বৃদ্ধ সবই শিশুর মতো। এ এক অদ্ভুত মিল যে শিশুর খেলার মাধ্যমে শিশু জন্মলাভ করে। এখন বলো যে, শিশু কোনটি – পিতা না পুত্র? শিশুটি যদি শিশু হয় তাহলে শিশুর এ শিশুত্বের সম্পর্ক কার থেকে প্রকাশ পেল? মূল বস্তুতে তুমি আর আমি কী? তুমি আর আমি তো আপনাতেই বর্তমান। আমার হাত, আমার পা বা হে আমার হাত, হে আমার পা কথার অর্থ যা, ঠিক সে অর্থেই আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা, আর বান্দা বলেন, আমার আল্লাহ্। এ একাত্মতার অর্থ হলো আমাদের দেহ-মন আল্লাহ্‌র আর আল্লাহ্‌র দেহ-মন বান্দার। এ চিন্তায় বিভোর হয়ে প্রেমিক প্রেম-সাগরে অবগাহন করে একাত্ম হয়ে যায় এবং প্রকৃত বন্ধুত্বের পূর্ণ সম্পর্ক আত্মস্থ করেই দাবি করে আমিই সে। আমি যখন দূরে ছিলাম, তখন দূরদৃষ্টি আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এ পথের প্রেমিক প্রেমাস্পদ ছাড়া আর কাউকেই চায় না। এ না দ্বীন চায়, না ধর্ম চায়; বরং সে বলে, "আইন কাফির আশিকাম মুসলমানি মেরাদরকারনিস্ত।" অর্থাৎ, আমার প্রেম আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুকেই অস্বীকার করে এবং মুসলমানি আমার প্রয়োজন নেই। প্রেম আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সব কিছুকেই অস্বীকার করে বলেই প্রেমকে কাফির তথা অস্বীকারকারী বলা হয়েছে। এমনকি এটাই আসল কালেমা তাওহীদ তথা প্রকৃত একত্ববাদের বাণী। এ কালেমার "লা" আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে।

অন্যথায় কোনো কিছুই অস্বীকার করা হত না। অতঃপর সালেক যখন একাত্ম হয়ে যায় তখন সবকিছুকেই ইল্লাল্লায় মওজুদ ও প্রমাণিত করে। এর অর্থ হল আল্লাহ্‌র জীবনী শক্তিতে সবকিছু জীবিত, আল্লাহ্‌র স্থিতিতে সবকিছু বর্তমান, তাঁর প্রকাশে সবকিছু প্রকাশমান আর তিনি সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, তাঁর জ্ঞানে সকলে জ্ঞানী, তাঁর শ্রবণশক্তিতে সকলে শোনে, তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে সব দৃষ্টিবান এবং তাঁর মেহেরবানীতে সকলেই মেহেরবান ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সত্য। বস্তুত আল্লাহ্ তা'য়ালাই সব কিছুর প্রকৃত সত্তা এবং আদি উৎস। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেন, هوالأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ محيط (হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ জাহিরু ওয়াল বাতিনু ওয়া হুয়া বি–কুল্‌লি শাইইন মুহিত্।) অর্থাৎ, তিনিই প্রথম ও শেষ, তিনি জাহের এবং বাতেন এবং তিনি সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ সব কিছুর মূল ও উৎস, সে মূলই সর্বত্র বিরাজিত এবং বেষ্টিত। যেমন বীজের পূর্ণতা বৃক্ষের মধ্যে সর্বতোভাবে বেষ্টন করে রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ সকল ধাতুর মূল ধাতু এবং সকল সৃষ্টির আদি। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ সকল প্রজাতি এবং সৃষ্টির উৎস। এ কারণেই সব কিছুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র নাম নিতে হয়। সকল বস্তু বা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ সদা বর্তমান বিধায় এ পরম সত্তার উপস্থিতির কারণেই তো ক্রিয়াশীল হয় এবং সে কর্মের উৎসে বা মূলে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তা দীপ্যমান থাকে। এজন্য তাঁর নামের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তাঁর নাম এবং নামের মৌল বস্তু তথা সামগ্রিক সত্তা অস্তিত্ব তাঁর প্রকাশের উৎসস্থল। এজন্য তাঁর এক নাম জাহের। অর্থাৎ, উক্ত স্থানে তাঁর সত্তাগত, গুণগত এবং কর্মগত প্রকাশ মূলধাতু এবং রহস্যাদির প্রেক্ষিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্য তাঁর অপর নাম বাতেন। বান্দা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে যখন কর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে বিস্‌মিল্লাহ্‌র শক্তিতে কর্ম সম্পন্ন করে। অর্থাৎ, সদা বর্তমান প্রকাশমান ও স্থিতিবান আল্লাহ্‌র শক্তি সামর্থ্যে কর্ম সম্পাদন করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে থাকে। অর্থাৎ, যেহেতু আল্লাহ্ আখের বা শেষ, সেহেতু সমস্ত কাজের সমাপ্তিও তিনি। যখন নাম সহকারে আল্লাহ্ বর্তমান, তাই তাঁর কৃতজ্ঞতা ও গুণাবলি তাঁর প্রসারতায় উৎসরূপে বর্তমান। সুতরাং এ সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে আপন সত্তায় এবং অন্য কোনো প্রজাতির প্রতি তাকানো যায়, তাহলে তাঁর আদি অন্তেও এ প্রেক্ষিতটি সম্প্রসারিত করলে, সে রূপটিই দেখা যাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্ধান আপন ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে এ বিষয়ে সব কিছু সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশের যুগ। ইতিমধ্যে অতিবাহিত বোকা ও অজ্ঞদের যুগ স্বাভাবিক নিয়মেই তেল চাটার মতো তলিয়ে যাচ্ছে। যুগের মানুষরা এটাকে অনেক সময় ধর্ম মনে করে। বর্তমান দুনিয়াবাসী ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে এবং যা নিয়ে তারা গর্ব করে তাঁর যুগ শেষ হয়ে গেছে। অচিরেই জগদ্বাসীর দৃষ্টি ধর্ম পূর্ণতা ও উৎসের দিকে সম্প্রসারিত হবে। দ্বীন ও ইজ্জতের প্রভুর নিষ্ঠাবান বন্ধু,

যারা সৃষ্টির সেরা এবং তাঁদের সহযোগীদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

জুময়ার বর্ণনা

আল কোরানের আটাশ পারায় সূরায়ে জুময়ার দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ্ বলেন, يا أيها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع (ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিছছালাতি মিই ইয়াওমিল জুময়াতি ফাসআও ইলা যিকরিল্লাহি অযারুল বাই-আ) অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসীগণ! জুমার দিনে নামাজের জন্য ডাকা হলে বেচাকেনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে ধাবিত হও। এ আয়াতে সাধারণভাবে বিশ্ববাসীদের আহবান জানানো হয়েছে, তবে মহিলাদের জন্য জামায়াত ফরয হওয়ার কথা অন্য কোনো সূত্রে জানা যায় না বিধায় তারা এ হুকুমের আওতার বাইরে। তাছাড়াও রুগ্ন ব্যক্তি এবং মুসাফির যারা এ হুকুমের শর্তাবলির আওতার মধ্যে নয়, তাদের বেলায়ও এ হুকুম প্রযোজ্য নয়; বরং রাসূল (সঃ) এর বাণী মোতাবেক উক্ত ব্যক্তিগণ জুময়া ও জামায়াত থেকে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত। এক কথায় আহবানটি সাধারণ হলেও কেবল অধিক প্রযোজ্য ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। উক্ত আয়াতে 'ইযা' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। আহবান দ্বারা দিনের কোনো একটি নির্ধারিত সময় বোঝানো হয়েছে। এ কারণে 'ইযা' শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। মিন শব্দ আরও স্পষ্ট করে দিনের একটি বিশেষ সময়কে বুঝিয়েছে। আর তা হলো সূর্য ঢলে পড়ার পরবর্তী তথা যোহরের সময়। ফলে যোহরের নামাজের স্থলে জুময়া ফরয হয়েছে। এর অর্থ হলো ওয়াক্তিয়া নামজের চেয়ে জুময়ার নামাজের মর্যাদা বেশি। যেমন বেশি অন্য সব স্থানের তুলনায় কা'বার মর্যাদা, আদম সন্তান ও অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় নবী-অলিদের মর্যাদা, সকল কিতাবের তুলনায় কোরানের মর্যাদা। যে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত সে উক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। সুতরাং অনুরূপ ব্যক্তি বুজুর্গ হতে পারে না, আর যে ব্যক্তি একে অস্বীকার করে সে কাফির। অবজ্ঞার সাথে তা অমান্যকারীও কাফির। এখন আলোচনা করা যাক– فاسعوا الى ذكر الله (ফাসআও ইলা যিকরিল্লাহ্) "আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে ধাবিত হও" সম্পর্কে। এ হুকুমটিও সাধারণ। অর্থাৎ, আহ্বান শোনামাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণে সচেষ্ট হও তথা যিকিরে মশগুল হয়ে যাও। এখানে যিকির শব্দটিও সাধারণ তথা অনির্দিষ্ট অর্থবোধক। এর দ্বারা সাময়িক যিকির মনে করা হয়, যাকে নামাজ বলে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য স্মরণে এলাহী। সুতরাং স্মরণে এলাহীকেই নামাজ বলে। কারণ নামাজের মূলই হল স্মরণে এলাহী। তাকেই এ আয়াতে যিকির বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। সুতরাং নামাজ আর যিকির উভয়ই নামাজ।

এখানে উল্লেখ্য, জুময়ার দিনটি খুব মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়। এ দিনে আল্লাহ্ ওয়ালাদের এক ধরনের অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। জুময়ার রাতের আরম্ভ থেকেই সমস্ত রাত এবং দিন আল্লাহ্‌র স্মরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাদের দেহমন তাজা এবং সজীব হয়ে যায়। যেন পরিপূর্ণ পূর্ণিমার রাত। কি মনোরম সে রাতের দৃশ্য। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে তা গোপন নয়। এ কারণেই উক্ত আয়াতে সালাত না বলে যিকির শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সালাতও পড়া হচ্ছে বটে, তবে তা মুখ্য (মুরাদি) মৌলিক বা লক্ষ্য নয়। অমৌলিক বস্তুত মূল্যহীন। তাই নামাজ যিকিরের ওপর নির্ভরশীল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যিকিরই নামাজ। এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– الصلوة الد ائم افضل من الصلوة الموقتة (আছ্ছালাতুদ্ দায়িমু আফ্‌জালু মিনাছ্ ছালাতিল্ মাওকুতাতি) অর্থাৎ, সর্বক্ষণিক নামাজ ওয়াক্তিয়া নামাজের চেয়ে উত্তম। এটাই মনের যিকির সর্বক্ষণিক চর্চার ফলে মনস্থ হয়ে গেছে। এটা হাদীস শরীফে এসেছে। কিন্তু অনুরূপ যোগ্যতা সহকারে সময় থেকে সময়ে নামাজের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান হওয়া ফরয। এ একটা বিরাট নিয়ামত। এ কারণে পয়গাম্বর (সঃ) এভাবে নামাজ পড়েছেন। কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য যিকির। অতএব, ধাবিত হও দ্বারা বাহ্যিক এবং অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার নামাজের কথাই বলা হয়েছে। এজন্য 'ফাস্‌আও' তথা 'ধাবিত হও' দ্বারা সর্বদা অনির্দিষ্ট বোঝানো হচ্ছে এবং এর দ্বারা খণ্ডনের সমস্ত শর্ত শেষ হয়ে যায়। এর পরই বলা হচ্ছে 'অ জারুল বাইয়্যা' অর্থাৎ, বেচাকেনা বন্ধ করে স্মরণে এলাহীতে লিপ্ত হও। তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত হবে। এখানে বেচাকেনা দ্বারা নিছক ব্যবসায়িক লেনদেন বোঝানো হয়নি। এর দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত জাগতিক কারবার বোঝানো হয়েছে। তা না হলে শহরে যারা দোকানদারি করে না, তাদের উপর জুময়ার হুকুম বর্তাবে না। তাহলে কিতাব পাঠে রত বা অন্য কোনো ধর্মীয় কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে জুময়ার হুকুম প্রযোজ্য হবে না। সে ব্যক্তি শহরের বাসিন্দা হলেও না। এখানে শহরের কোনো শর্তই নেই। কারণ শহর ছাড়া যে কোনো গ্রামেও বেচাকেনা হয়। তা না হলে যে সব লোক শহরে বাস করে, কিন্তু বেচাকেনায় লিপ্ত নেই, তাদের ওপর কি জুময়ার নামাজ ফরয নয়।

কেনাবেচা হয় বলে জুময়ার জন্য যদি শহর শর্ত করা হয়, তাহলে এমন কোনো গ্রাম আছে যেখানে কোনো কেনাবেচা হয় না। এতো গেল জুময়ার জন্য শহরের শর্ত আরোপ করার ব্যাপার। এর পরও থাকে সুলতান হওয়া এবং দণ্ডবিধি চালু থাকার শর্ত। বর্তমানে আমাদের ভারত বাংলায় তো সুলতান রয়েছে তার অধীনে আদল্ ইন্‌সাফ্ হচ্ছে। আমাদের যুগে কোনো দেশইতো দণ্ডবিধি থেকে মুক্ত নয়। হত্যা, চুরি এবং ডাকাতি সব ধরনের মামলার বিচার হচ্ছে। হত্যা ও প্রাণনাশের বদলে ফাঁসি এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে জেলে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তা না হলে মামলায় প্রত্যেকেই তার দাবি কিভাবে পেশ করছে?

আচ্ছা দেখো, সকল মামলায়ই ইনসাফ হয়, কেবল জুময়ার জন্যই কি মুসলিম বাদশা হওয়া শর্ত? এ শর্ত আরোপের ফল হল এই যে, এতে জুময়া রহিত হয়ে যায়। এ দেশে যদি কোনো আমির বা কাজী না-ই থাকে, তাহলে তাদের স্থলে যারা কার্য সম্পাদন করছে তারা কাজীর আওতায় পড়ে কিনা? যদি না পড়ে, তাহলে এটা দারুল হরব্ বা শত্রু রাজ্য এবং মুসলিমদের জন্য দারুল হরবে বাস করা বৈধ নয়। তাহলে আমাদের কি এদেশ ছাড়তে হবে? যদি ছাড়তে হয়, তাহলে অবিলম্বে ছেড়ে পালানো ফরজ। আর যদি বলা হয় যে, এটা দারুল আমান বা শান্তির রাজ্য, তাহলে আমির ও কাজী থাকার শর্ত কোথায় অবর্তমান? আসলে এসব হল আল্লাহ্‌র আদেশকে বাতিল করার জন্য ফালতু আলোচনা। যদি বলা যায় যে, জুময়ার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। বাহ্যিকভাবে আয়াত বা হাদীস দ্বারা মত পার্থক্য আছে বলে মনে হয় এবং মুফ্‌তিদের মতামতও যদি তাই হয়, তাহলে এর উত্তর হল এই যে, মতভেদ দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত কোনো বিষয় বাতিল করতে সুনির্দিষ্ট দলিল দরকার। মতভেদ দ্বারা তা কখনো বাতিল হয় না এটা সাধারণ নীতি। ফিকাহ্, কালামশাস্ত্র এবং সকল বিষয়ের মূলনীতিও এটা। এ নীতিকে যদি অগ্রাহ্য বা বাতিল করা হয়, তাহলে মূল এবং নিঃসন্দেহ আদিষ্ট বস্তু কোরান, খুঁটিনাটি মতভেদ কী করে বাতিল করবে? এটা কখনোই সম্ভব নয়। কোরানের মূল বিষয়বস্তু অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং কোরানের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য– يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله (ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানু উযা নুদিয়া লিছছালাতি মিই ইয়াউমিল জুম'য়াতি ফাসয়াও ইলা যিক্‌রিল্লাহি) কোরানে ব্যবহৃত 'ইযা নুদিয়া' শব্দের অর্থ কী তা বোঝানো হবে। 'আমানু' দ্বারা মুমিন বোঝানো হয়েছে। তাহলে আহ্বান জানাবে কে? সে মুমিন হওয়া শর্ত না হয়, তাহলে তার ওপর জুময়া ফরয হবে কিভাবে? তাহলে মুয়াজ্জিনকে মুমিন হতে হবে কি হবে না? তাহলে এবার বলো এ পরিষ্কার নির্দেশের মধ্যে জটিলতার কী আছে?

প্রেমের প্রকৃতি

প্রেমিক যখন আল্লাহ্‌র প্রেমে লীন হয়ে যায়, তখন প্রেম অন্তর নূরী সত্তায় সমরঙ ও সমজাতীয় হয়ে যায়, উত্তপ্ত লোহার মতো। উত্তপ্ত হতে হতে লোহা যখন অগ্নিরূপ ধারণ করে, তখন তার ভিতর দিয়ে আগুনের প্রকাশের দরুন লোহাটি স্বয়ং আগুনে পরিণত হয়। তার ভিতর বাহির কোথাও লোহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না। যদি লোহার কোনো বৈশিষ্ট্য অবশিষ্টই থাকল, তাহলে আগুনের চরিত্র রইল কোথায়? আগুনকে উত্তাপ দিলে কোনো বস্তুর মাধ্যমে তা প্রজ্বলিত হয়। কোনো জিনিসের আশ্রয় ছাড়া আগুন জ্বলতে বা কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। তাই সম বৈশিষ্ট্যের না হলে সে জিনিসের মাধ্যমে আগুনের আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং

যে জিনিসের মধ্যে আগুন থাকে সে জিনিস থেকে আগুনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণই প্রকাশিত হবে। তখন আগুনের জ্বালা, তাপ, শোঁ-শোঁ শব্দ, প্রভাব ও উত্তাপই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে; বরং অগ্নিময়তা ছাড়া আর কিছুই তো থাকবে না। এমনকি আগুনের প্রভাবে কাঠগুলো ছাইভস্মে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় কাঠ থেকে 'আমি আগুন' ছাড়া আর কী শব্দ বের হবে? কাঠ যদি বলে যে, আমি আগুন তাহলে কি তা অসঙ্গত হবে? প্রজ্বলিত কাঠের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট রইল, যার কারণে সে বলবে না যে আমি আগুন? আগ্নেয় প্রকাশের পর কাঠের কোনো বৈশিষ্ট্যই বাকি থাকে না; বরং তা আগুনে রূপান্তরিত হয়। দশ মণ কাঠ ভস্ম হওয়ার পর একসেরও যখন বাকি থাকছে না, বরং ভস্ম হয়ে এখন কেবল বিলুপ্তি বাকি, তখন কে তাকে কাঠ বলবে? বরং তা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অনুরূপ আল্লাহ্‌র প্রেম, এর চেয়েও আরও অধিক অধিক শক্তিশালী আগুনের মতো। যখন এর মূল স্বয়ং আল্লাহ্, প্রেমিকের মধ্যে প্রকাশিত হয় সে প্রেমিকের কী অবশিষ্ট থাকবে? বস্তুতপক্ষে আগুন একটি রূপক বস্তু, তার প্রভাবে অন্য বস্তু বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা মৌল ও আদি বস্তু। তাঁর উপাদান সকল বস্তুকে সদা বর্তমান, বেষ্টিত, প্রকাশিত ও স্বপ্রমাণিত, ভিতরে বাইরে স্থায়ী। এমন কোন বস্তু আছে যাকে তা প্রভাবিত করবে না? এর বাহ্যিক প্রভাবেরর ফলে কেউ যদি বলে 'আনাল হক' বা 'আনাল্লাহ্' বা আমি আল্লাহ্ তাহলে তাতে কি আল্লাহ্‌র প্রকাশিত হওয়া প্রমাণ হয় না? আল্লাহ্ তা'য়ালার কি এমন ক্ষমতা নেই যে, তিনি তাঁর কোনো বান্দার ওপর আপন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন? আল্লাহ্‌র প্রভাব কি এতই ক্ষুদ্র ও দুর্বল যে, বান্দার প্রভাবে তা লুপ্ত হয়ে যাবে বা হেরে যাবে? এ বাতিল বিশ্বাস এবং ভ্রান্ত ধারণার কবল থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। এ কারণে এ বাতিল গোত্রের লোকেরা তাদের পবিত্র বিশ্বাস তথা কালিমা তাওহীদের মৌখিক স্বীকৃতিটাকেও উক্ত ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা নস্যাৎ করে দেয়।

কালিমা তাওহীদের অর্থ মর্মানুযায়ী দুনিয়া আখিরাতের সব কিছুকে অস্বীকার করার পর তারা ঐ সমস্ত বস্তুর মাধ্যমেই আবার আল্লাহ্‌কে প্রমাণ করে এর বেহেশত এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি কামনার মাধ্যমে তাওহীদের ধারণাটাই বিনষ্ট করে ফেলে। এটা একটা বিরাট ধোকা। অপরদিকে তাওহীদের আলোচনা করার সময় ওয়াজেবুল ওয়াজুদ তথা স্বতন্ত্র সত্তার সংজ্ঞায় তারা বলে যে, তাঁর সৃষ্টি কৌশল দ্বারা আমরা তাঁর পরিচয় লাভ করি। অর্থাৎ, বস্তুসমূহ দেখে তারা বলে যে, অবশ্যই এর কারিগর আছে। এখানে কারিগর কথাতো অনির্দিষ্ট, তা একাধিকও তো হতে পারে। এখানে লক্ষণীয়, কালেমা যে সব বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে সমস্ত বস্তু দ্বারা কারা কালেমার মর্মার্থকে অস্বীকার ও বাতিল করেছে। কালেমা সব কিছুকে অস্বীকার করেই আপন মর্মার্থ ও প্রমাণীয়কে প্রতিষ্ঠিত করছে। এটাই তাওহীদের পথ এবং এটাই স্থায়ী। এটাকে বাতিল মনে করার ফলে ধূম্রজালের মধ্যে জড়িয়ে তারা অন্ধ হয়ে গেছে। আর বিভ্রান্তির ফল তার গাছের পরিচয় দেয়।

একদিকে তারা বলছে– আল্লাহ্ ছাড়া সবই লয়যোগ্য, অপরদিকে বলছে, বনজঙ্গল দ্বারা আল্লাহ্ প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্র প্রমাণের পূর্বে জঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে, কালেমার বক্তব্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে কি না? তাই আল্লাহ্ বলেন– أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون (আতা, মুরুনান্নাছা বিলবিররে ওয়াতানছাওনা আন্ফুছাকুম ওয়া আনতুম তাতলূনাল কিতাবা আফালা-তা'কিল্ন।) অর্থাৎ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হয়ে লোকদের সৎ উপদেশ দিচ্ছ, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করছ, তাহলে তোমরা কি বোঝ না? আক্ষেপ! যার ঈমানের প্রাথমিক কোনো জ্ঞান নেই, তার আবার কী যোগ্যতা থাকতে পারে? সুতরাং আখিরাতের ভক্তদের উচিত তাদের পথ শোধরানো এবং মুর্শিদের কাছ থেকে কোরানের মূল বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আর কালেমা ও তাওহীদের অনুসরণের মাধ্যমে প্রকৃত মাবুদের বা উপাস্যের পরিচয় লাভ করা। তাহলে তার আবশ্যকীয় জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শান্তির সন্ধান পাবে। যারা ফিকাহ্র কিতাবের দ্বারা কুফর ও ঈমান প্রমাণ করছে, তারা যা দ্বারা ঈমান অর্জিত হয়, সে সব বিষয় বা ঈমানের সংজ্ঞা যা ঈমানদারদের জানা দরকার ফিকাহ্র কিতাবসমূহে কি জানতে পারে? ফিকাহ্র কিতাবে যদি তা না থাকে, তাহলে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপার তারা কোথা থেকে আমদানি করছে? অর্থাৎ জমা নেই খরচ আছে। হতে পারে ফিকাহ্র কিতাবে ঈমান সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা আছেই বা। কিন্তু ঈমান তো 'ইল্মে আহ্ওয়াল' তথা অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তা না জানলে তো ঈমান লাভ হয় না।

ফিকাহ্র সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। ফিকাহ্র বিষয়বস্তু হল ইসলামের প্রকাশ্য কার্যকলাপ তথা বৈধতা ও অবৈধতা সংক্রান্ত ইসলামের অমৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি। ফিকাহ্ শব্দের অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। জ্ঞানের নামে তাতে কেবল কয়েকটি অমৌলিক বিষয়ে আলোচনা হয়। ফকীহ্ বা ফিকাহ্বিদ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তিনটি 'মাসআলা' সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আকাঈদ এবং বাহ্যিক অবস্থাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি তার অন্তর্ভুক্ত। আর জ্ঞানী বা আলেম বলা হয় তাকে, যে ধর্মীয় মূলনীতিসমূহ পূর্ণভাবে অবহিত। সুফি তিনি, যার মধ্য থেকে হালাল-হারামের শত সহস্র হেতু প্রকাশিত হতে থাকে। এ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি অন্তিম মুহূর্তে কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ ধরনেরই কথা 'গায়াতুল আওতার'-এ লেখা হয়েছে। তাছাড়া সর্বস্বীকৃত নীতি যার উপর ফিকাহ্শাস্ত্রের ভিত্তি তাও তো এই যে– لايزال احل با لشك ولابا لظن او با لاختلاف اوبالا حتمال (লাইয়াজালুল আহ্লে বিস্সাক্বি অলাবিজ্জান্নি আওবিল এখতিলাফি আওবিল এহতেমালি) অর্থাৎ, দ্বিধা, সন্দেহ মতানৈক্য বা অনুমান ও ধারণা দ্বারা কোন বস্তুর বা বিষয়ের বৈধতা নষ্ট হয় না। সুতরাং এসব নীতি দ্বারা কোনো হালাল বস্তুর মৌলিকত্ব যখন বিনষ্ট হচ্ছে না, তখন শুধু সন্দেহ ও অনুমানের বশে তাকে হারাম আখ্যা দেওয়া বৈধ নয়। কোনো বিষয়ে যদি মতানৈক্য থাকে,

তাহলে তা হবে বির্তকমূলক বিষয়। তবে তা হালাল এবং বৈধ হিসেবে গণ্য হবে। তাকে সরাসরি অবৈধ আখ্যাদানকারী পাপী বা কাফির হবে। ফিকাহ্শাস্ত্রে কাফির হওয়ার বিষয়গুলোকে যুক্তিযুক্ততার ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে, কাউকে কাফির হিসেবে স্থির করা হয়নি। সুতরাং এর জোরে কাউকে কাফির বলা মোটেই বৈধ নয়। কারণ ঈমান এবং ঈমানের পূর্ণতা ফিকাহ্র আলোচ্য বিষয়ভুক্ত নয়। এ অজ্ঞাত বিষয়ে ফিকাহ্ কিভাবে রায় দেবে? এ কারণে ফিকাহ্বিদগণ তাদের কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, আমরা কিছু শাখা বিষয়ে আলোচনা করি এবং ঈমান ও এহসান সংক্রান্ত বিষয়গুলো আকাইদের গ্রন্থে দেখে নিবে। এমতাবস্থায় যে সব লোক ফিকাহর দ্বারা ঈমান বাতিল হওয়ার কথা বলে অথচ ঈমানের উৎপত্তি সম্পর্কে ফিকাহ্ থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারে না, তারা কি কোনোমতেই হিসেবের যোগ্য? এ বেহুদা বক বক থেকে আল্লাহ্ওয়ালাগণ অবিলম্বে বিরত হোন। অন্যথায় মৃত্যুর সময় এ অজ্ঞাতপ্রসূত দ্বন্দ্ব তোমাদের ঈমানের পথ থেকে বিরত রাখবে।

এখানে বাহ্যিক বিষয়ে ফিকাহ্শাস্ত্রের মতভেদ লক্ষণীয়। যারা সাপ ও গুঁইসাপ খায়, তারা কোন দলিলের ভিত্তিতে তাকে হালাল মনে করছে? আর যারা একে হারাম মনে করে, তাদেরই বা দলিল কী? কোরানের আলোকে কোনো বস্তু বৈধ বা হালাল বলে মনে হলে, কোনো হাদীসে তা যদি হারাম বলেও উল্লেখ করা হয়, সে ক্ষেত্রেও বৈধতারই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, হাদীস কোরানকে বাতিল করতে পারে না। এটা জানার প্রেক্ষিতে احل لكم صيد البر والبحر (অহিল্লা লাকুম সাইদুল বাররি ওয়াল বাহরি) অর্থাৎ, তোমাদের জন্য জলস্থলের শিকার হালাল করা হল। কোরানের এ ঘোষণার আলোকে মালেক এবং হাম্বল (রঃ) সাপ এবং গুঁই সাপ প্রভৃতি খাওয়ার হালাল বলেন। তোমরা কেউ যদি তাকে হারাম মনে কর, তাহলে তোমরা বলতে পার যে, এটা আরোপিত হারাম, তাকলিদ তথা অনুকরণের কারণে মেনে নিচ্ছি, বস্তুত এটা হারাম নয়। অজ্ঞ জনসাধারণের তো কোনো কথাই নেই। সামান্য লেখাপড়া জানলেই তারা এটা হারাম, ওটা হারাম বলতে শুরু করে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের আরও দু একটি বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনা করা যাক। কোনো কোনো ফিকাহ্র কিতাবে আছে, কোনো পুরুষ যদি কোনো অপরিচিতা নারীকে যৌনভাবে স্পর্শ করে, তাহলে উক্ত নারীর মা স্পর্শকারী পুরুষটির শাশুড়ি হয়ে যায়। অর্থাৎ, উক্ত নারীর মা, দাদি থেকে উপরস্থ সকল ও নীচস্থ বেটির বেটি যত আছে সবই উক্ত পুরুষের জন্য বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়। কিন্তু 'দুররুল মোখতার' প্রভৃতির গ্রন্থকারগণ এ মতকে বাতিল করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এ অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা শুধু তাদের ঐক্যমত। বস্তুত মূলনীতি অনুযায়ী তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। 'গায়াতুল আওতার'-এর লেখক বলেন, যেহেতু পর নারীকে স্পর্শ করা বৈধ নয়, সেহেতু তা দ্বারা জামাইয়ের মর্যাদা স্থির করার বৈধতার যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয় কথাটি সুদ বিষয়ক। কোনো কোনো ফিকাহ্বিদ বলেছেন সোনা, রূপা, আটা, গম, খুরমা ও লবণ ইত্যাদি জিনিসের

লেনদেন অতিরিক্ত নেওয়া বৈধ নয় এবং এটা সুদ। কিন্তু তা ছাড়া অন্যসব জিনিসের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্রহণ করা সুদ বলে হাদীসে প্রমাণ নেই। তা সত্ত্বেও ফিকাহ্‌বিদদের অধিকাংশের মতে, তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। তবে 'দুররুল মোখতার' এর লেখক তাদের মতকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, তাদের এ সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। মনে করুন এক থান কাপড়ের দাম দু টাকা আর এক থান কাপড়ের দাম দশ টাকা। এখন যদি এর বিনিময় করতে হয়, তাহলে কি কেউ তা করবে? অনুরূপভাবে ফিকাহবিদদের মধ্যে অনেক বিতর্কমূলক বিষয় রয়েছে। তাই বলে কি আসল প্রতিপাদ্য বস্তুটি ত্যাগ করতে হয়? যদি তাই হয়, তাহলে জুম্‌য়া এবং ঈদের নামাজ ছেড়ে দাও। কোনো কোনো জাহেরিপন্থী ফিকাহ্‌বিদ সম্মানসূচক সিজদাকে হারাম বলছে। কেউ বলছে শির্‌ক। তবে অনেক গবেষক এবং তফসীরকারক তাকে বৈধ মনে করেন। এটাকে মূলনীতি অনুযায়ী হারাম বলা যাবে না। সর্বদা এটা মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বা সুন্নত হিসেবে গণ্য হবে।

বস্তুতঃপক্ষে কাফির হওয়ার জন্য ঈমান বিচ্ছিন্ন হওয়া দরকার। যে ব্যক্তি ঈমানের বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ, সে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে এ অজানা বিষয় জ্ঞান দান করার যোগ্য নয়। সে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা বলছে তাকে বিতর্কমূলক বিষয়রূপে গণ্য করে পরিহার কর। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا (ওয়ালা তাতিউ মান আগফালনা কালবাহু আন যিকরিনা) অর্থাৎ, শুনবে না তাদের কথা আমরা যাদের অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে নির্লিপ্ত করে দিয়েছি। অর্থাৎ, এসব লোক যদি দলিল উপস্থাপন করে বা ফতুয়া দেয় তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ان فى ذا لك لذكرلمن كان له قلب (ইন্না ফী যালিকা লিযিকরুন্ লিমানকানা লাহু কাল্‌বুন) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কোরানে যিকির রয়েছে তাঁর জন্য, যার অন্তর আছে। অর্থাৎ, কোরানের বিষয়বস্তু আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান আর তা কাল্‌ব তথা অন্তরের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যারা আহ্‌লে কাল্‌ব বা অন্তরবাদী তারাই কোরানের বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। তা না হলে কোরান দ্বারা ফতুয়া দেওয়ার যোগ্য হয় না। সহী হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– استفت عن قلبك وان افتاك المفتون (ইস্‌তাফ্‌তি আন্‌কালবিকা ওয়াইন আফতাকাল মুফ্‌তিউন) অর্থাৎ, বাইরের মুফ্‌তি ফতুয়া দিলেও তথা বারণ করলেও তুমি তোমার মনের কাছে ফতুয়া চাও। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তর হয় প্রসারিত। তাতে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অসংখ্য রহস্য উদ্ভাসিত হয়। তার অংশবিশেষও শত প্রমাণের চেয়েও বলিষ্ঠতর। তাইতো আল্লাহ্ বলেন, والذين جاهد وافينا لنهد ينهم سبلنا (ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহ্‌দি ইয়ান্নাহুম ছুবুলানা) অর্থাৎ, যে সব লোক আমাদের সত্তায় সাধনায় লিপ্ত আমরা তাঁদের অবশ্যই স্বীয় পথ প্রদর্শন করি। যার জন্য কোনো কিতাব দলিল প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে আহাম্মদী

লিখেছেন, اما الكلام فى الاوليا فخارج عن البحث (আম্মাল কালামু ফিল আওলিয়ায়ি ফা খারিজুন আনিল বাহাছি) অর্থাৎ, আউলিয়াদের বিষয়টি তর্ক-বিতর্কের বাইরে।

যে সব লোক মনগড়াভাবে বলছে যে, সিজদা কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট, তারা কি দেখাতে পারবে সুস্পষ্টভাবে সিজ্‌দা শব্দটি কোথায় উল্লেখ আছে? হাদীস তো কোরানের বিরোধী হতে পারে না; বরং কোরানের ফেরেশতাদের জন্য আদম (আঃ) এর সিজ্‌দা এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জন্য মানুষের সিজ্‌দার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নিষেধের প্রমাণ কোথায়? শুধু তাই নয়। কোরানে আরও উল্লেখ রয়েছে– ولقد حلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجد والا ابليس لم يكن من الساجدين (ওয়ালাক্বাদ খালাক্বনা কুম ছুম্মা ছাওয়ারনা কুম ছুম্মা কুলনা লিল মালাইকাতিছ্‌জুদু লি আ-দামা ফাছাজাদু ইল্লা ইবলিছা লামইয়াকুম মিনাছ ছাজিদীন) অর্থাৎ, আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি, পরে আকার দান করেছি। অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজ্‌দা কর, এতে ইবলিছ ছাড়া সকলেই সিজ্‌দা করেছে, সে সিজদাকারীদের সাথে শামিল হয়নি। আরও বলা হয়েছে– ما منعك ان تسجدا اذا امرتك (মা মানাআকা আন তাছজুদা ইজা আমারতুকা) অর্থাৎ, আমি যখন তোমাকে সিজ্‌দা করতে হুকুম দিলাম, তখন কে তোমাকে তা থেকে বারণ করল? অনুরূপ অনেক স্থানে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সিজ্‌দা শব্দের সুস্পষ্ট ব্যবহার রয়েছে। বিরোধীরা কোথা থেকে বলছেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারো জন্য সিজ্‌দা নেই। যদি বলা হয় যে, সিজ্‌দার বৈধতা রদ হয়ে গেছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোরানের খবর বাতিল হয় না, আর এটা খবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সিজ্‌দা বলতেই আল্লাহ্‌র জন্য সুনির্দিষ্ট উক্ত আলোচনার দ্বারা এ অবরোধ ভেঙে গেছে। যদি বলা হয় যে, সম্মানসূচক সিজ্‌দা তথা মস্তক অবনত করা কেবল বৈধ ছিল। তাহলে বর্তমানে অনুরূপ সিজ্‌দা দ্বারা নামাজও বৈধ হবে। কারণ, সেটাও তো সিজ্‌দা। যদি বলা হয় যে, তা এখন রহিত হয়ে গেছে, তার জবাব হল এই যে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস একক বর্ণিত হাদীস। তা অকাট্য দলিল তথা কোরানের মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া হাদীস কোরানকে বাতিল করতে পারে না। অপরদিকে কোরানের হুকুম কোরান দ্বারা রহিত হতে পারে। কিন্তু কোরানের সংবাদমূলক বর্ণনা কোনো কারণেই রহিত হয় না। সিজ্‌দার আয়াতটি সংবাদমূলক। 'তাফ্‌সিরে কালালি' শাইখুল হিন্‌দ এর 'বাহারুল উলু'ম' এবং 'এহ্‌ইয়াউল উলু'ম' প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যদি বলা হয় যে, সম্মানসূচক সিজ্‌দা শিরক্ না হলেও হারাম। এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের ঐকমত্য রয়েছে। এর জবাব হল যে ঐ ফিকাহ্‌বিদদের ঐক্যমত দ্বারা কোনো কিছুকে হারাম আখ্যা দেয়া বৈধ নয়। কারণ কোনো কিছুকে হারাম প্রমাণ করার জন্য কোরানিক দলিল প্রয়োজন। এতে কারও দ্বিমত নেই। এমতাবস্থায় অকাট্য দলিলের মোকাবিলায় এ অনুমানভিত্তিক ঐক্যমত কী করে

গ্রহণযোগ্য হতে পারে? সে বিষয়ে অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ, তাফসিরকার এবং সুফির মত বৈধতার পক্ষে রয়েছে, তার বিপরীতে কয়েকজন ফিকাহ্‌বিদদের মতামত কী করে ইজ্‌মা তথা অধিকাংশের ঐক্যমত হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে? যদি বলা হয় যে, যদি কোনো বিতর্কমূলক বিষয়ে কেউ হারামের পক্ষে ফতুয়া দেয় আর কেউ তাকে হালাল বলে, তাহলে হারামের পক্ষের মতকেই গ্রহণ করতে হবে। এর জবাব হল এই যে, প্রথমত, এ কথা ফিকাহ্‌র মূলনীতিবিরোধী। কারণ মূলবস্তু সর্বদাই অনুমোদনীয় হয়। যদি বলা হয় যে, জমহুরের মতে, সকল বস্তু মূলত বিবেচনাধীন থাকে, এটাও মারাত্মক ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ তাতে ইজ্‌মা ও কিয়াস্ এর উৎপত্তি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ বিবেচনাধীন বিষয়ে কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে ইজ্‌মা বৈধ নয়। সুতরাং অনুরূপ মতের অনুসারী ব্যক্তির দ্বারা তো ইজ্‌মার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় মারাত্মক ক্ষতিকর কারণ এই যে, জগতে এমন কোনো বস্তু নেই শাখা-প্রশাখায় যার প্রভাব পড়ে না। তাকে হারাম বললে জুম্‌য়া ও দু ঈদের নামাজও হারাম হয়ে যাবে এবং অবৈধ হবে ইমাম শাফেয়ীর পিছনে নামাজ পড়া। কারণ শাফেয়ী মাযহাবে মাথার একটি মাত্র চুল মুছলেই ওযুর ফরয আদায় হয়ে যায়। আর হানাফী মাযহাবে মাথার এক-চতুর্থাংশ মোছেহ্ করা ফরয। এ শর্তানুযায়ী শাফেয়ীদের ওযু হয় না। সুতরাং শাফেয়ীদের পিছনে হানাফীদের নামাজ বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র বাণী– لاتسجد واللشمس ولاللقمر (লা-তাছজুদু লিশ্‌শামসি ওয়ালা লিল কামারি) অর্থাৎ, তোমরা চন্দ্র সূর্যকে সিজ্‌দা করবে না। এর আলোকে যদি বলা হয় যে, সম্মানসূচক সিজ্‌দাও নিষিদ্ধ। এর জবাব হল এই যে, এ আয়াতের শেষে– ان كنتم اياه تعبدون (ইন কুনতুম ইয়্যাহু তায়াবুদুন) অর্থাৎ, "যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত কর" এ বাক্যাংশ যুক্ত রয়েছে। এর পরিষ্কার অর্থ হল যে, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তখন চন্দ্র-সূর্যকে ইবাদতসূচক সিজ্‌দা করবে না। এ আয়াতে কেবল ইবাদতসূচক সিজ্‌দা অন্যের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে ইবাদত শব্দ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। এতে এমন কী রয়েছে যাতে সম্মানসূচক সিজ্‌দা নিষিদ্ধ হবে? যারা কোরান দ্বারা সম্মানসূচক সিজ্‌দাকে নিষিদ্ধ করছে, তারা উক্ত আয়াতের শেষাংশ বাদ দিয়ে দেখাচ্ছে। পুরো আয়াতটি হচ্ছে– لاتسجد وا للشمس ولا للفمر واسجدو الله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون (লা-তাছজুদু লিশ শামসি ওয়ালা লিল কামারি ওয়াছজুদু লিল্লাহিল্লাযী খালাকা হুন্না ইন কুনতুম ইয়াহু তা'বুদুন।) অর্থাৎ, তোমরা চন্দ্র সূর্যকে সিজ্‌দা কোরো না এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে সিজদা করো, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত কর। কিন্তু এ উক্তি দ্বারা আদম (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) এর সিজ্‌দা তো নিষিদ্ধ হয়নি; বরং তা একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ।

অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে ব্যবসা করে তারা কোরানের মূল বক্তব্যকে এভাবে পাল্টে দেয়। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থও বিকৃত করে। উদাহরণস্বরূপ কোরানের আহ্বান– يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى

السلم كافة (ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু উদখুলু ফিস্ সিল্‌মি কাফ্‌ফা) এর দ্বারা অর্থ করে– "হে মুমিনগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হয়ে যাও।" অর্থাৎ, 'সিল্‌মি' এর আভিধানিক অর্থ শান্তি, প্রেম ও বন্ধুত্ব পাল্টে দিয়ে তদস্থলে ইসলামের নাম প্রচার করছে। অনুরূপভাবে কোরানের অপর আয়াত– اذكر ربك فى نفسك تضرعاوخيفة دون الجهر من القول (উজকুর্ রাব্বিকা ফিনাফ্‌সিকা তাদার্‌রু আন ওয়াখিফাতান দুনাজ জাহির মিনাল কাওলি) এখানে 'খিফাতান' এর অর্থ তারা করে "গোপন"। অথচ এর আভিধানিক অর্থ ভীতি বা ভয়। শুধু তাই নয়, ওহাবিদের বিকৃত করার ধরন আরও মারাত্মক। তারা অনেক ফিকাহ্ ও তাসাউফের কিতাব মুদ্রণের সময় ভালো ভালো বাক্য বাদ দিয়ে ছাপে এবং কোনো কোনো বাক্য জালিয়াতির মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলে। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রচনা থেকে অনেক অংশই বাদ দিয়ে দিয়েছে। যেমন ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদ আল ফেসানী (রঃ)-এর 'মাবদাও মায়াদ' গ্রন্থের এক স্থানে পুরো এক পৃষ্ঠাব্যাপী সম্মান সূচক সিজ্‌দা বৈধ বলে লেখা ছিল। তারা তা সম্পূর্ণ উধাও করে দিয়েছে। [দিল্লীর মুজদাবায়ী প্রেসের ছাপা কপি দ্রষ্টব্য]। 'মাবদ ওয়া মায়াদ' গ্রন্থ থেকে ওহাবিদের দ্বারা উধাওকৃত সম্মানসূচক সিজ্‌দার বৈধতা সংবলিত বক্তব্যটি 'তোহ্‌ফাতুল আকইয়ার' গ্রন্থে হুবহু উল্লেখ রয়েছে। তবে কিতাবের মাঝে মধ্যে থেকে, যে সব অংশ বাদ দিয়েছে জ্ঞানীদের কাছে তা গোপন নেই। তাফসীর 'ফাত্‌হুল আজিজ' এর মূল আরবি তাফসীরে– ماوهل لغير الله (মা উহিল্লা লি গাইরিল্লাহি) অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত হালাল হবে না-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, পশু জবেহ করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম উচ্চারণ করলে, তা হারাম হবে। কিন্তু ওহাবিরা ফারসি তাফসীরে তা বিকৃত করে লিখেছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নাম যে কোনো সময় উচ্চারণ করলেই তা হারাম হয়ে যাবে। তারা সম্মানসূচক সিজ্‌দার বৈধতার পক্ষে লিখিত 'ফতুয়ায়ে সিরাজিয়া'র কয়েকটি বাক্যও বিকৃত এবং উধাও করে দিয়েছে।

ফয়েজ গ্রহণ

(প্রথম পর্ব)

অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে এমন শায়েখের মনপ্রাণের সাথে মুরিদ তার আপন মনপ্রাণ সম্পৃক্ত করে দিবে বা অনুপ্রবেশ করিয়ে দিবে আর ভাবতে থাকবে, যেন প্রেমাস্পদ তাকে প্রভাবিত করছে। তাহলে দু-চার মিনিটের মধ্যেই সে কমবেশি এ প্রভাব নিজের মধ্যে অনুভব করবে। এ প্রভাবের প্রকৃতি কম্পন, গরম, বা শোঁ শোঁ শব্দের মতো হতে পারে। এর দ্বারাও সে উপলব্ধি করতে থাকবে যে, এক ধরনের বস্তু অবশ্যই আমার জ্ঞাত হচ্ছে। এ থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে তার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। উত্তম ব্যক্তিতো পাঁচ দশ মিনিটেই গলে পরাভূত হয়ে যায়। কারও কারও তো প্রভাবের পর প্রভাব ফায়েজের মতো অথবা বিভিন্ন অবস্থা

অনুভূত হতে থাকে। তখন সে বুঝতে পারে যে, অমুক আমাকে আলোড়িত করছে। অতঃপর তার ভিতর অনুভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে সে বুঝতে পারবে যে, এটা ইস্‌মে জাত তথা মহান সত্তার অনুরণন এবং প্রভাব। অনুরূপ প্রভাবাধীন কাল্‌ব তথা অন্তরের কম্পনটাই ইস্‌মে জাত তথা মহান সত্তা। অতঃপর সে তার সাহায্যে অদ্ভুত বিরল বস্তুসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে থাকবে। এগুলো হবে আলো বা অন্ধকার ধরনের অথবা চন্দ্র বা তারকা ইত্যাদির মতো। তবে এগুলো স্থায়ী হয় না; কিন্তু তার প্রভাবে অন্তর সচেতন হতে থাকবে এবং ক্রমান্বয়ে সে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে অল্প সংস্পর্শেই তার মনে এক ধরনের অতি মনোহরি আকর্ষণ বোধ হবে। যার বরকতে মানুষ ফলনশীল বৃক্ষের মতো কল্যাণকর হয়। অর্থাৎ তার মানসিক শক্তি দৃঢ়তর হয়ে প্রতিক্রিয়াসমূহ পরিপক্ব হবে এবং এ শক্তি বিভাগের পার্থক্য নিরূপণ, তার উন্নতি ও বলিষ্ঠতার জন্য মুর্শিদের শক্তি সর্বক্ষণিক প্রয়োজন। এটা মূল বা আসল শক্তি। তার থেকে এ শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, সে হয়ে যাবে মৃতবৎ। তবে তার মধ্যে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত প্রভাবটি নষ্ট হবে না। তবে হ্যাঁ, মুর্শিদ যদি তা বাতিল করে দেন, তাহলে কিছুটা তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকলেও তা বরকতহীন ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। এর আলোচনা অন্যভাবে হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য ভিন্ন।

মোট কথা, উপরে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহের বিভিন্ন স্তরের শক্তি এবং জ্ঞান আলাদা। এতে আহ্‌ওয়াল তথা অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান হলেও উৎস সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের তারতম্য হয়। ঐ অবস্থায় যার যে পরিমাণ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া লাভের সৌভাগ্য হয়েছে তার শক্তি ও জ্ঞান তার চেয়ে অধিক হবে না। এহেন রুবুবিয়াত সংক্রান্ত জ্ঞানেও অনেক পার্থক্য হয়। সুতরাং গুণগতভাবে প্রত্যেকের নিকট জ্ঞাত না হলেও চূড়ান্ত সত্তার অধিকারীর কাছে জ্ঞাত। কারণ তাঁর মধ্যে এ জ্ঞানের সমস্ত বিভাগ ও শক্তি বিদ্যমান। অর্থাৎ, তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞান ও শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত। অর্থাৎ, তিনি এর সব ধরনের বিভাগ উপ-বিভাগ সম্পর্কে জানেন। কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অস্থিরতা হয় তাও তিনি জানেন। যখন তাদের এই পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের সৌভাগ্য হবে উক্ত শক্তিকে সে অন্য কিছু মনে করবে না।

মোট কথা মুর্শিদের শক্তি মন থেকে শুরু করে কর্ম ও গুণাবলির জ্যোতি ও নিশানা মুরিদের মধ্যে বিকশিত করতে থাকে, ফানা হোক, বাকা তথা স্থিতি পরম সত্তায় হোক বা মূলে হোক সবই মুর্শিদের প্রভাব। অর্থাৎ পরম সত্তায় ফানা তথা বিলীন বা বাক্কা তথা স্থিতি যাই হোক সবই মুর্শিদের প্রভাব। মুরিদের কিছুই অর্জিত হোক সবই মুর্শিদের বস্তু নিরপেক্ষ সত্তার অবদান। এটাই হল বক্ষ সম্প্রসারণের সার কথা। তা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সত্তা থেকে মুর্শিদ সত্তায় বিকশিত হয়ে থাকে। তাই বলে এমনটা প্রয়োজন নেই যে, মুর্শিদের মুর্শিদও থাকতে হবে। মুর্শিদ তার সিলসিলা বা ধারা ক্রমিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নন। এর অর্থ হল খাঁটি মুর্শিদ অগ্নি

উত্তপ্ত সীসার মতো। মূলত তা সীসা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অগ্নিবৎ। সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের ধারায় তা সীসার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

ফয়েজের বৈশিষ্ট্য
(দ্বিতীয় পর্ব)

ফয়েজ এক ধরনের সঞ্চারিত প্রভাব এবং শক্তি। ফয়েজ অর্থ পুরস্কার ইত্যাদি। মুর্শিদের এই পবিত্র ও শাশ্বত ফয়েজ যা মুরিদকে প্রভাবিত করে তা যদি কোনো অলি বা আল্লাহ্‌র সাধকের সংস্পর্শ পায় তাহলে সে ফয়েজ স্বীয় পবিত্র বৈশিষ্ট্যাদি সহকারে আতর ইত্যাদি সৌরভের মতো বিচ্ছুরিত হয় এবং তার বদৌলতে ধীরে ধীরে উক্ত অলির আরও অধিক প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে এটা তুলনীয়। কখনো যদি কোথাও ফুঁ দেওয়ার প্রয়োজন হয় আর তা দিলে তাতে নিজ শরীরের আরাম এবং প্রশান্তি আসে। অনুরূপভাবে আপন ফয়েজও অন্যের ভিতর প্রবেশ করে তাকে আলোড়িত বা উত্তেজিত করে, যেমনি উত্তেজিত করে হাওয়া আগুনকে। আবার তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাগত হয় নিজের মধ্যে। যেমনি গুলি ফিরে আসে পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে। তখনই বুঝবে যে, এটা আপন মুর্শিদের ফয়েজ। মুরিদের সত্তায় বর্তমান মুর্শিদের প্রভাব যেন স্বয়ং মুর্শিদ। কারণ আগুনের ফুলকিও আগুনই। 'কুদ্দুসের' অর্থ এটাই। যে কোনো স্থানই এর গতিবিধির বাইরে নয়। উল্লেখ্য যে, মুরিদ যখন একাদিক্রমে সংস্পর্শে আসে তখন ফয়েজও একের পর এক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে আপন আপন রূপ প্রকাশ করে এবং প্রদীপের মতো আলোর ঝলক প্রদর্শন করে। দুটি প্রদীপ একত্র হলে আলোও অধিক হয় এবং একটি অপরটি দ্বারা উপকৃত হয়। এ রহস্য জ্ঞানীদের অজানা নয়। ঠিক তেমনই সোহ্‌বত বা সংস্পর্শতা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয় আপন আপন মুর্শিদের প্রতিষ্ঠিত আওতার মধ্যে। তার মধ্যে এ গুণ না থাকলে কারও তা অনুভব হত না এবং কেউ-ই তাতে পথের সন্ধান পেত না। সুতরাং কোনো কবর বা অলির জিয়ারতের বদৌলতে মুরিদ যদি কোনো ফয়েজ অনুভব করে, তাহলে তাঁর উচিত তা তার মুর্শিদ থেকে আগত বলে মনে করা। অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতার সার অর্থ এটাই। সর্বত্র সর্বাবস্থায় তথা বস্তু বা অবস্তু, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান চেতন অবস্থায় বা অচেতন অবস্থায়, মৃত বা জীবিত সৃষ্টি জগৎ বা সত্তার জগৎ সর্বত্রই মুর্শিদের ফয়েজ বা প্রভাবিত করার ক্ষমতা বিরাজমান।

মোট কথা, কেউ যদি কোনো কবর বা অলির নিকট ফয়েজ প্রার্থনা করে, তাহলেও উক্ত মৌল বস্তুর কারণেই তাকে সাহায্য ও অনুকম্পা করা হবে। উক্ত মূল বস্তু সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই এ ফয়েজের সৌভাগ্যও তার হবে না। এ কারণে আমাদের নবী করীম (সঃ) বলেন, الا انبئكم بخيا ركم قالوا بلى ايا رسول الله قال خياركم اذا رؤ ذكر الله (আলা আম্বাউকুম বি খিয়ারিকুম কালু বালা

ইয়া রাসূলাল্লাহ ক্বালা খিয়ারুকুম ইজা রায়াও যিকরিল্লাহ্) অর্থাৎ, আমি কি বলব তোমাদের মধ্যে পুণ্যবান ব্যক্তি কে? সাহাবাগণ বললেন, বলুন হে রাসূলুল্লাহ্। তিনি বললেন, তিনিই তোমাদের মধ্যে পুণ্যবান যাকে দেখলে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। তবে অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এর মর্মার্থ তারা বুঝবে না। এ জন্য তারা কোনো অলির দর্শন বা জ্যোতির্ময় কবরের জিয়ারত করতে গেলেও তা থেকে তারা কোনো পথের সন্ধান পায় না। কিছু অজিফা পাঠ করে শ্বাস নিতে নিতে চলে আসে। এ হাদীস দ্বারা মুর্শিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য জানা গেল। তা হল এই যে, তাঁকে দেখলে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ হয়।

ফয়েজ তথা মুরিদের ওপর মুর্শিদের প্রভাব শক্তিশালী এবং দুর্বল দুরকমই হয়। শক্তিশালী প্রভাবের প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষণ আত্মস্থ ও উত্তপ্ত থাকে। কিন্তু দুর্বল প্রভাবে এ বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে তারও কিছুটা প্রতিক্রিয়া হয়।

শিক্ষা দানের অনুমতি

উল্লেখ্য, এটা নবাগতদের যুগ। চারদিকে হেদায়েতের নূর চমকাচ্ছে। ক্ষুদ্র মহান সকলের মুখ থেকেই ধ্বনিত হচ্ছে খাইরুল কুরুন তথা মহান ব্যক্তিদের কথা। বড় ছোট নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ মারেফতে এলাহীর দিকে আকৃষ্ট এবং মহান আল্লাহ্‌র তাওহীদের প্রবক্তা। বিশেষ করে এ পবিত্র যুগে শেষ যুগের ইমাম হযরত মেহদী (আঃ)-এর প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে এ যুগের সকলেই একমত। দ্বীনে মুহাম্মদী স্বীয় সৌন্দর্যে সকল দেশ ও রাষ্ট্রে উদ্ভাসিত হওয়ার পথে। সুদীর্ঘ অতীত থেকে যে সব শুভ প্রথা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধার্মিকদের পুণ্যলাভের সুযোগ করে দিচ্ছিল কালের প্রলয়ে তাদের কিছু কিছু ভালো কাজ তথা মৃতদের উদ্দেশে ফাতেহা পাঠ, শবে বরাতের আলোকশয্যা, মিলাদ ও কেয়াম বুজুর্গদের কবরে বাতি জ্বালানো প্রভৃতি ওহাবি দাপটে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও অধুনা আল্লাহ্‌র ফজলে হেদায়েতের প্রদীপস্বরূপ সম্মানিত অলিদের নির্দেশে 'আনোয়ারে ছাতেয়া' প্রভৃতির মতো কতেক গ্রন্থে এ কাজসমূহের বৈধতা ও উপকারিতা সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও যোগ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আসলে এসব ছাড়া কোনো উপায় নেই, এগুলোই পরকালের পাথেয়। সুতরাং সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রচারে ও উৎসাহ দানের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি, সঠিক শরিয়তের অনুসারী এবং আরো যে সব মহান ব্যক্তি এ পথে আছেন তাদের সকলের উচিৎ জানমালসহ এ সব শুভ কাজগুলোর প্রচার এবং প্রসারে প্রয়াসী হওয়া। নিজেরা এসব কাজগুলো করা এবং এগুলোর প্রচারে বিরত না হওয়া। এটা বসে থাকার যুগ নয়। এটাই আল্লাহ্‌র অলিদের ইচ্ছা– لاخوف عليهم ولاهم يحزنون (লা খাওফুন আলাই– হিম অলাহুম ইয়াহ্‌জানুন) অর্থাৎ, তাদের কোনো ভয় নেই এবং চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণও নেই।

উল্লেখ্য, যারা আল্লাহ্‌র সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তারা হেদায়েত ও পবিত্র ত্বরিকতের পথে নবাগতদের শিক্ষা দিবেন তাঁরা যেন তাঁদের শিষ্যদেরকে আপন মুর্শিদের দিকে নিবিষ্ট করিয়ে যোগসূত্রে আবদ্ধ করেন এবং কেবল কল্‌ব তথা মনের কথা বলে আপন মুর্শিদের কল্‌বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাগিদ করেন ও কখনো নিজের কল্‌বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে দিবেন না। কারণ তাতে ফয়েজ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই বিরাট ক্ষতি এবং বঞ্চনা রয়েছে। তবে যারা সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কেবল নবাগতদেরকেই আপন মুর্শিদ ও বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং তা সুদৃঢ় করার শিক্ষা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ, ধ্যান, খেদমত এবং উরস প্রভৃতিতে শরীক হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আপন মুর্শিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং মহিলাদের সবক দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু বৃদ্ধ ও আত্মীয়দের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। তবে তাদেরকেও কল্‌ব তথা মনের সংযোগ স্থাপনের কথা বলা যাবে না। শুধু মনোনিবেশ এবং যোগসূত্রের কথাই বলতে হবে। অদৃশ্য ওয়াইসিয়া এর অন্তর্ভুক্ত। যে মুর্শিদ ফায়েজে ওয়াইসিয়া প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি নিকটে বা দূরে থাকুন মুরিদের ওপর তাঁর প্রভাব সদা এক বরাবর। সাধক অনায়াসে নিজের মধ্যে এটা উপলব্ধি করতে পারবে। এটাকে 'সফীর' বলা হয়। তখন আল্লাহ্ আপন দয়া ও রহমতে তাদের পথের সন্ধান দেন। এ সব শর্ত শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা কেবল তালিম তথা শিক্ষাদানের অনুমতি পেয়েছেন, খেলাফত পাননি। আর যাদের কাছে আপন পীরদের দস্তখত ও মোহরযুক্ত অনুমতিপত্র নেই, তারা তস্‌কর এবং দাগাবাজ। মুরিদের উচিত তাদেরকে এড়িয়ে চলা। অনুমতি পত্রের ভাষা বা বক্তব্য নিম্নরূপ– "নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।" অতঃপর আগ্রহী সাধক প্রেমিকদের খেদমতে সালাম শুভেচ্ছান্তে আমি ফকির আহমদ আলী ওরফে জান শরীফের আরজ এই যে, মিয়া অমুক সাহেব বিনীত স্বভাব এবং ঐশী প্রেমবৃক্ষের ফল আস্বাদনকারী, সাধনার ক্ষেত্রে তার স্থান জ্যোতির্ময় কর্ম জগতের চূড়ায়। আল্লাহ্ চাহে তো অনন্য প্রেম অন্বেষণের পথে আদি একক অন্তর্যামির সদয় মারেফত লাভ তার দেরি নেই। তিনি মুর্শিদের আদেশক্রমে নবাগত মুসলিম উৎসাহীদেরকে মুজাদ্দেদীয়া, মাসুমিয়া তরিকার বিষয়ে শিক্ষাদানে রত। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অদৃশ্য ওয়াইসিয়া ফয়েজ যা শিষ্যদের জন্য প্রয়োজন, সে উদ্দেশে তিনি মুরিদদেরকে কেবল আপন মুর্শিদের প্রতি মনোযোগী করে দিবেন।

তামাম শোধ

سفينه سفر

ছফিনায়ে ছফর

সূচি

ছফিনায়ে ছফর ৩৪৫
দোয়া দান আদান প্রদান ৩৪৮
নবী সাহেব কবর হইতে ফয়েজ প্রাপ্তি হইতেন ৩৫৪
কবরের এলাকা ৩৫৬
মরণ লক্ষণ ৩৬২
কবরে জেন্দা করা ৩৬৩
দাফন করার পর মুর্দারের বিবরণ ৩৬৪
তাজেম গোর ওয়াজেব ৩৬৬
মদতে কবর ৩৬৯
মদত রূহানী ৩৬৯
দর্গা ও মঞ্জেল ৩৭৬
নোয়াখালীর অন্তর্গত ৩৮৪
ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ৩৮৪
মোর্শেদ কবর উদ্ধার সঙ্গের সঙ্গি ও রাহাদার ৩৮৫
বিরহ ৩৯৪
আদিতন ৩৯৭
হযরত ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রহঃ) এর ইহধাম ত্যাগে বিরহ ৩৯৮
মোর্শেদী ৪০৬
পীরের অনুগ্রহ আশ্রয় করা কি? ৪০৬
মোর্শেদ কি? ৪০৬
তাছির কি? ৪০৬
মুরীদ কি প্রকারে সেই গুণ সত্য বলিয়া স্থির করিবে ৪০৭
কেতাব দেখিয়া মুরীদ বানান যায় কি না? ৪০৭
স্বপ্নের কথা কি সত্য? ৪০৮
মোর্শেদ স্বপ্নে কোন আদেশ করিলে তাহা যথার্থ কি না? ৪০৮
নেশান হযরত ইমাম মেহেদী ৪০৮
চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ ৪০৯
তন ও মন মাঝে যে সকল ফল বর্তমান তাহার দলিল কোরান ৪১০
কবরের পরিমাণ ৪১২
কবরের হেজাব ৪১৩
জানাজা নামাজের নিয়ত ও দোয়া (নিয়ত) ৪১৭
নামাজের বয়ান ৪১৮
আয়নায়ে ছালাত ৪১৮
আয়নায়ে কুতবী ৪১৯
আয়নায়ে খোদা নামা ৪২০
ছজুদা দুই কেন? ৪২০
রূকু কেন? ৪২০
দো রেকাত কেন? ৪২০
বসা কেন ৪২০
অয়নায়ে আলম ৪২০
চার রাকাত কেন ৪২১
রোজার বয়ান ৪২১

سفینه سفر

ছফিনায়ে ছফর

শুভকালে শুভদিনে শুভ নিরাঞ্জন ।
লোভ রস রসনায়ে সুধা আস্বাদন ॥
বন্ধুসনে বন্ধু আত্মে দিয়ে মন মান ।
গাইও কুকিল রবে তাঁর গুণগান ॥
হেরিও তাঁহার কায়ে জ্যোত সমুজ্জ্বল ।
দর্পণ যাহার হৃদ হয়েছে বিমল ॥
ইসলামের নূর জ্যোতিঃ যাঁহার বদন ।
হেরিবে চক্ষের পোতে ঘষিলে অঞ্জন ॥
অঞ্জন চক্ষের খুবি মঞ্জেলে আম্বুর ।
ইয়াদে হোছেনে লায়লী আরশ কাংকুর ॥
প্রভাত ছেতারা কলি খেলিল যখন ।
রায়হান বিলাসে গুঞ্চা হাসিল গগণ ॥
আঁখির কাজল হেরে চটক বিলাস ।
সম্বন্ধ যাহার সনে মন অভিলাস ॥
হাস হাস হাস কলি রঞ্জিত খঞ্জনে ।
গাইও মধুর গান রসনা রসনে ॥
সোহাগে রঞ্জন কর মধু লভিবার ।
মধুকর মধু স্বাদে দাড়িম্ব আনার ॥
হইও আতর গন্ধ সালামের নূর ।
ফেরত আসুক তান আওয়াজ বন্ধুর ।
قوله تعالى - قل ما انفقتم من خير فللوا لدين
والا قوبين و اليتمى و المساكين و ابن السبيل
নেক চিজ নেক কাম কর নেক দান ।
মাতা পিতা আত্মজনে সেই শানমান ॥
এতিম মেছকিন আর মোছাফের তরে ।
খায়র হালে নেক দেলে দেখিও নজরে ॥
ভালাই এহ্ছান নেকে করিও আদর ।
এহ্ছান ওয়াজেব কোরান ভিতর ॥
قوله تعلى - وبا الوالدين احسانا وذى القربى

واليتمى والمساكين وقولوا للناس حسنا
মা বাপ এগানা আর এতিম মেছকিন ।
নেক বোল নেক দোয়া লোকে নেক চিন ॥
মা বাপ এগানা আর এতিম মেছকিন ।
মোছাফিরে এহ্ছানী কোরানে একিন ॥
মা বাপের এহ্ছানী খোদার ফরমান ।
হর হালে কোনমতে নাহিক এড়ান ॥
এতিম এছির আর রাহাগির তরে ।
এহ্ছানি ওয়াজেব কোরান ভিতরে ॥
রাহাগির হন কিন্তু মা বাপ যখন ।
এবনেচ্ছাবিল বটে তাঁহারাই হন ।
মা বাপ রাস্তায় যদি হন মোছাফির ।
ফরজন্দান কোন দেশে নিজে রহে স্থির ॥
তারপরে দোহুকুম ওয়ারেদ হয় ।
খেদমত এহ্ছান যারে কোরানেতে কয় ॥
চার পাঁচ এহ্ছানে দরজা আদায় ।
একস্তর হয়ে যদি রূধাত কোথায় ॥
পাঁচ হুকুমের মানি করন আদায় ।
পাঁচ দরজা একস্তর হয়েছে যথায় ॥
মাতা পিতা তাঁরা যদি হন কয়দী হালে ।
এছীর তাঁহার নাম হবে কিন্তু ফলে ॥
মুছাফের হালে কিন্তু হইবে যখন ।
এবনেচ্ছাবিল নাম হইবে তখন ॥
মেছকিন এতিম হালে হইলে আবার ।
এতিম মেছকিন নাম হইবে তাহার ॥
খেস কুটম্বের হাল উপস্থিত যাঁর ।
জীল কোবরা বলে নাম হইবে তাঁহার ॥
পাঁচ নামে পাঁচ শান পাঁচ জন হয় ।
হতে পারে একজন পাঁচ শানে রয় ॥
পাঁচ নৈলে চার হবে চার নৈলে তিন ।
দুই একে কদাচন না হইবে ভিন ॥
জেন্দেগীতে ছিল যবে সুখের বাসর ।
এহ্ছানীতে করিতেন মা বাপে আদর ॥
জেন্দেগী আখের হলে পৌছিলে কবর ।
মুছাফের হাসরের দারাজ ছফর ॥

জেন্দেগী আখের হলে পৌছিবে কবর ।
কয়েদ কবর মধ্যে লাগাত হাসর ॥
জেন্দেগী আখের হলে পৌছিলে কবর ।
এতিম মিছকিন নহে তার বরাবর ॥
কে করিবে এহ্ছানী তখন তাহার ।
কেবা আছে কোন ঠাঁই হেন ওফাদার ॥
কে দেখিবে তার দুঃখ কে হেরিবে তারে ।
কোথা আছে হেন বন্ধু এভব মাঝারে ॥
রাখিয়া এ ভবপুরী চলিনু ছাড়িয়া ।
কেবা জানে কোন দেশে কোথা রব গিয়া ॥
কোন দেশে ঠাঁই হবে কোথা বাড়ী ঘর ।
কে জানে কি ঐ দেশে আত্ম নহে পর ॥
এগানা বেগানা আর ছাড়িয়া সকল ।
কে জানে কি কোন ঠাঁই আমার আজল ॥
কি আছে কপালে লেখা কেবা জানে তায় ।
দেহ ছেড়ে প্রাণ পাখী কেন চলে যায় ॥
এ দেহ মাটির ঘর জাগীর মাটির ।
আছিল পালঙ্ক নিশি বিছান পাটির ॥
কে জানে কি এই দেহ রহিবে কোথায় ।
দেহ ছেড়ে প্রাণপাখী কেন চলে যায় ॥
একেলা আসিনু আমি একা চলে যাই ।
অসার আমার সার আর আশা নাই ॥
যেন বৃক্ষ স্বাভাবিক না পারে দুলিতে ।
না পারে চলিতে পদ না পারে বলিতে ॥
এইরূপ এতিম এছীর হয় যারা ।
লাচারিতে হেলিতে দুলিতে নারে তারা ॥
তাই বলি আলম স্বভাব ত্যাগে যেই ।
এতিম এছীর হতে শত গুণে সেই ॥
কবরের কারাগার হারে কি বিষম ।
স্মরিলে যাহার নাম ঝংকারে পশম ॥
মরিতে না চাহে কেহ মরিতে না চায় ।
ছাড়িয়া কি ভব খেলা প্রাণপাখী যায় ॥
এ সুখ আলম দ্বীপে বেলওয়ার পাঞ্জরে ।
মুহূর্তে কি তার সাধ পারে ভুলিবারে ॥
মাতা পিতা ভাই বন্ধু ত্যাগিয়া সকলে ।

কেমনে যাইব কোথা প্রাণপাখী বলে ॥
একেলা যাইয়া আমি রহিব কোথায় ।
কি হবে আমার গতি কি হবে উপায় ॥
দুলাল হইয়া যদি পারি রহিবার ।
ছাড়িয়া আমাকে দাও কছম তোমার ॥
ছিড়িলে হায়াত ডুরী ডুবে যাবে তরী ।
বাঁচিবার আশা নাই আহা মরি মরি ॥
এ গরল চিত্তে হবে কবর যাহার ।
শত কারাগার হৈতে কারাগার তার ॥
এর বেশী এতিম আর নহে কদাচন ।
এর বেশী দুঃখী আর নাহি কোন জন ॥
শত সুখী হৈলে সেই দুখের সাগরে ।
এভব জুদাই দুঃখ সহিবারে নারে ॥
তন কাঁদে মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে আর ।
জুদাই দাপটে অঙ্গ করে হাহাকার ॥
ঝাঞ্জীর ছিদ্রের ন্যায় ছেদিয়া পাঞ্জর ।
জোয়ারে উথলে যেন বানেতে সাগর ॥
নবী আলী সাধু জন এ ভবেতে যারা ।
আখেরে জুদাই রোলে কাঁদিলেন তাঁরা ॥
তাই এবে তাঁহাদের করিয়া স্মরণ ।
আশীর্বাদ অভিলাষে সদা দিও মন ॥

দোয়া দান আদান প্রদান

এবে যারা আশীর্বাদে অনিত্য ভাঞ্জন ।
উদ্ধারিতে তাঁহাদেরে করিও স্মরণ ॥
এহ্ছান মালী কিম্বা এহ্ছানী বদন ।
আরাম পাইবে তায় মুর্দা দুঃখীগণ ॥
মালের ছওয়াব আর নেক বদনের ।
মুর্দার পৌছান তাহা হাদীসে জেকের ॥
জেন্দা লোক মুর্দাগণে সওয়াব রেছানী ।
আজাব হইবে কম পৌছাইবে এহ্ছানী ॥
যাহার আজাব নাই কবর মাঝার ।
কিম্বা সেই কোন কালে নহে গুণাগার ॥

তারে যদি ছওয়াব রেছান কোন জন ।
হাছেল এনাম তার বুজুর্গি কারণ ॥
কিন্তু যে এহ্ছানি করা হুকুম আল্লার ।
এতিম এছির জেন্দা কিম্বা মুর্দার ॥
বিষম কঠিনে যেই হন গ্রেফতার ।
এহ্ছানী লাজেম চাই তেমন তাহার ॥
তাই নবী করিতেন কবরে গমন ।
বদন ভরিয়া নূর লইয়া আপন ॥
রৌশন করিয়া লিত অজুদ চেরাগ ।
পসর করেন তাতে কবরের বাগ ॥
আন্ধার কঠিন ঠাঁই করেন উজ্জ্বল ।
হেদায়েত নূর যার অজুদ জামাল ॥
অজুদের নূর তান অজুদের ঘর ।
হেদায়েত বাতি নূরে করেন পসর ॥
এহ্ছানি নেক তার তামাম বদন ।
নিয়ত একিন যার আলম রৌশন ॥
সেই কেন কষ্ট হেতু কবরে গমন ।
কিন্তু দোয়া করিবারে মুর্দার কারণ ॥
যাবত জীবন দুঃখ হেরিয়া মুর্দার ।
কবরে গমন তান দোয়া করিবার ॥
এইতো এহ্ছান তান এহ্ছান রব্বানী ।
দুঃখে দয়া খোদাতালা প্রকাশে আপনি ॥
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
এতিম মিছকিনে তাম দিও বন্ধীগণে ।
খেলাইবে বান্ধাগণ বন্ধু হেন মনে ॥
মহব্বত সঙ্গে তারে খেলাইবে খানা ।
বন্দীগণে আদরেণ এলাহি রব্বানা ॥
বন্দীগণে কবরের করিও স্মরণ ।
তুমিও কবরে যাবে হইলে মরণ ॥
তুমি যদি এ সময় স্মরিবে তাহায় ।
তোমার কবরে বান্দা স্মরিবে তোমায় ॥
অতএব নবিবর স্মরণে মুর্দার ।
কবরেতে যাইতেন দেখা করিবার ॥
প্রথমে যাইয়া তিনি করিত সালাম ।
পরে আর মুর্দা সঙ্গে করিত কালাম ॥

তোমরা চলিয়া এলে ছাড়িয়া সংসার ।
আমরা আসিতে আছি পিছনে তোমার ॥
তোমাদের যেই দশা হয়েছে এখন ।
আমাদের সেই রূপ হবে পরক্ষণ ॥
তোমরা আছহ এবে কয়েদ কবরের ।
আমিও তোমার মত হইব আখের ॥
মাটিতে মিশিছে তব মাটির পঞ্জর ।
ভাবিতে তোমার ন্যায় হবে নারী নর ॥
তোমাদের যেই দশা হৈয়াছে এখন ।
ক্ষণেকে আমার দশা হইবে তেমন ॥
قوله تعالى -منها خلقنا كم وفيها نعيدكم
ومنها نخرجكم تارة اخرى
মাটি হতে তোমাদেরে করিনু সৃজন ।
আবার মাটিতে সবে করিবে শয়ন ॥
সে মাটি হইতে পরে উঠাব তোমায় ।
পুনর্বার কেয়ামতে দেখিবে তাহায় ॥
গভীর দুঃখের বাণী মরণ নেশান ।
কোরানেতে দয়াগুণে বলেন এহ্ছান ॥
তাই তুমি আদরিও হেন রাহিগনে ।
আদর করিও আর গরীব অতনে ॥
ভাই বন্ধু কবরেতে নাহি কোন জন ।
এতিম মিছকিন হালে আপনি আপন ॥
দমে দমে তাহাদেরে স্মরণ করিও ।
হর হালে কবরেতে নজর রাখিও ॥
দিনে দিনে তাহাদেরে দিও দোয়া দান ।
মাসে মাসে সালে সালে রাখিও ধেয়ান ॥
ছদকা রাখিও জারি ধার্য্য করে দিন ।
সকলে মিলিয়া তায় করিবে আমিন ॥
তায়েন রহিল দিন দেশ দেশান্তরে ।
মিলিত হইয়া কার্য্য করিবারে পারে ॥
ছোট বড় জমাতের সকলে মিলিয়া ।
কবরে করিবে দোয়া মুর্দার লাগিয়া ॥
তাই অলী আউলিয়ার ফাতেহা নেয়াজ ।
সর্বদা আছেন জারি পৃথিবীর মাঝ ॥
তাই নবী পয়গাম্বর হাবিব আল্লার ।

দিন ধার্য্য করিলেন আমির হামজার ॥
দশ আর বিশ দিন রোজ চল্লিশার ।
ছঃ মাহা ফাতেহা জারি আর সালিয়ানার ॥
হাদীসে সোয়াব নেক নাহিক বারণ ।
সামনে ফতওয়া মাঝে দেখ সর্বজন ॥
ছাওয়াব করিলে বন্ধ করিয়া এঙ্কার ।
মুর্দার আজাব হয় নাহি দেখ তার ॥
আজাব দেখিবে কেনে চক্ষু রৈতে কানা ।
আন্দাজে লাঠির ভরে না দেখিয়া মানা ॥
কিন্তু যদি দেখিতেন আহত্তাল মুর্দার ।
কোন হালে মালুম হইয়া যেত তার ॥
কিম্বা যদি দলিলের দেখিত অছুল ।
হরগেজ এমন কামে না করিত ভুল ॥
কিম্বা যদি আউলিয়ার জানিত কারণ ।
কখন নেকের কাজে না রৈত বারণ ॥
কিম্বা যদি জানিতেন রহু ভেদাভেদ ।
কখন নেকের কাজে না করিত জেদ ॥
কবর আজাব আর কবর রাহাত ।
রাহাতন্নাছের জন্য এই নেক বাত ॥
নেক লোক করিলেন পছন্দ নেকের ।
বানালেন হরকাম আল্লা ইয়াদের ॥
যে কাম করুন নেক ছাত্তাব তাহায় ।
যে ছুরতে যে হালেতে করেন আদায় ॥
তাই আল্লা ফরমিলেন ডউল (ছুরত) নেকের ।
খাড়া বসা সোয়া হালে আমার জেকের ॥
দমে দমে হরকামে হরেক ছুরতে ।
হর হালে নেক কাম কর হর বাতে ॥
قوله تعالى - قل كل يعمل على شاكلته
কহ নবী লোক দিকে আমল করিতে ।
আমল করেন যেই আপন ডৌলেতে ॥
যেমন আমল যার ছুরত তেমন ।
নেক লোকের নেক কামে হরেক গঠন ॥
গঠনেতে নানারূপ আমলেতে নেক ।
বাতেনেতে নেক তার জাহেরে প্রত্যেক ॥

বাতেন কলব চাই নেকের দরকার ।
যথায় দেলের নেক দলিল তাহার ॥
নেক দেলে নেক আমল উহার দলিল ।
হাদীস তাহার দেল নহে কাল কিল ॥
كذا فى عين العلم استفت عن قلبك وان افتك الفتون
নেক দেল কলবেতে ফত্য়া তলব ।
যদ্যপি করেন মানা মুফতিগণ সব ॥
নেক লোকের দেলে নূর দলিল তাহার ।
বেনূর লোকের তার নাহি দরকার ॥
কোরানে আসল তার হেদায়েত নূর ।
নেকের আছর সেই কলবে জহুর ॥
তাই প্রভূ ফরমিলেন কোরান মাঝার ।
কোরান জেকের হয় কলব যাহার ॥
নেক লোকের দেল মধ্যে ঠাহরে কোরান ।
দলিল তাহার এই কলবের শান ॥
নেক লোকের দেল নূরে হেদায়েত নূর ।
কোরানের হেদায়েত যাঁহার জহুর ॥
তাই আল্লা ফরমিলেন কোরানের শান ।
হেদায়েত নূর নহে কাগজ কোরান ॥
قوله تعالى : قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى
نوراوهدا للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
কহ নবী কে ভেজিল মুসা সনে নূর ।
হেদায়াত সেই নূর তৌরাতে জহুর ॥
হকিকত তৌরাতের কলব মাঝার ।
হেদায়াত যেই নূরে হয় নেককার ॥
লোকে তারে বানাইল কাগজের ছাপা ।
ওরক তুমার পড়ে বলেন মারহাবা ॥
এনমত বেশী করে কোরান ভিতর ।
ছাপাইয়া গোপনেতে রাখে বহুতর ॥
শুনিতে কি তার কথা কহিছে কোরানে ।
বরং সামেল সেই গাফেলের সনে ॥
قوله تعالى ولا تطعم من اغفلنا قلبه عن ذكرنا
নাহি শুন তার কথা হও খবরদার ।

গাফেল করিছি আমি কলব যাহার ॥
যাহার কপাট দেলে লাগা রৈছে তালা ।
বেগর মোর্শেদে কুঞ্জি নাহি যাবে খোলা ॥
যাহার কলব নাই থাকিতে কলব ।
বুঝিয়া না বুঝে সেই কথার মতলব ॥
দেখিয়া না দেখে সেই কোরানের বাণী ।
মনে মনে বুঝে আমি আরেফ রব্বাণী ॥
এলেম আহওয়াল নূর কলব আন্দর ।
তাই ব্যাখ্যা করিছেন কোরান ভিতর ॥
قوله تعالى : ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب تحقيق
اسمين ذكر اسكى لئى هى كه جسكى لئى هى قلب
কোরান জেকের হবে কলব যাহার ।
কলব ব্যতীত নহে কোরান তাহার ॥
কলব আহওয়াল নাই যাহার তলব ।
কোরান পড়েছে শুধু বুঝে না মতলব ॥
কেচিমেচি করে সেই কোরান বাতায় ।
যাহা মুখে আসে বলে না ডরে খোদায় ॥
তাই রব ফরমিলেন বজ্জাতি বান্দার ।
বেশী কমি করে কহে কোরান আমার ॥
হেন লোক ওফাদার নহে কদাচন ।
তাই তারে চিনালেন প্রভূ নিরাঞ্জন ॥
তাই যারা ওফাদার কোরান মাঝার ।
নাহি ভয় নাহি ডর শানে আসে যার ॥
নাহি ভয় চলনেতে নাহি ভয় শানে ।
নাহি ভয় জাহেরেতে না ভয় বাতেনে ॥
قوله تعالى - الا ان اوليا الله ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون
هشيا رتحقيق اولياء الله لو كون ير كوى ذونهبن اور نه اون
ير كوئ غم طارى هوكا -
আউলিয়ার শরা যাহা আমল এছরার ।
আওয়ামের শরা কোথা তাহার কেনার ॥
যাহার তরিক হয় তরিক রছুল ।
চলিবে তাহার পন্থে না করিয়া ভুল ॥
তাহারাই দিয়া থাকে ফাতেহা নেয়াজ ।
তাহারা সদায় করে মুর্দারের কাজ ॥

নবী সাহেব কবরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হওতঃ ঐ কবর হইতে ফয়েজ প্রাপ্তি হইতেন

আর যদি নবীবর কবর আজাব ।
দেখিতেন মনস্তাবে হ'তেন বেতাব ॥
আর যদি দেখিতেন কোন জনে খোশ ।
কবরের খোশে আপে হতেন সন্তোষ ॥
কবরের নূরে নিজ হ'ত মুনওর ।
যেমন প্রদীপে ঘর করেন পসর ॥
যেমন সুগন্ধি করে গোলাব আতর ।
যদ্যপি রহিবে গন্ধ সঙ্গেতে অপর ॥
তেমনি কবর যার ফয়েজ রৌশন ।
সেই ফয়েজ হইতেন নিজে ফায়দা মন ॥
যেমন পিতার সুখে সুখ ফরজন্দের ।
তেমনি ফরজন্দ সুখে সন্তোষ বাপের ॥
অতএব জেয়ারত নবী আম্বিয়ার ।
বেহেস্ত গোলজার নূর কবর আউলিয়ার ॥
কবর গোলজার যার নূও মুনওর ।
সে নূরে চমক মারে আরশ উপর ॥
আরশ কান্দিল যার চমকের নূর ।
মোকাম মাহামুদ সনে করিছে জহুর ॥
আউলিয়া আম্বিয়া আর সাধু আশেকান ।
মকাম মাহ্মুদে যার অনিত্য মকান ॥
যথায় মকাম যার চমক তথায় ।
দোজখের শান কান্তি বদনে দেখায় ॥
কোথায় দোজখ আর কোথায় বদন ।
দোজখ চমক মারে বদনে কেমন ॥
তেমন বদন যার সুধা জ্যোতির্ময় ।
আলম লাহুতে তার সেই যুতিচয় ॥
হেরিতে এছলাম নূর যার অধিকার ।
ফুটিলে তাহার চক্ষু দেখে অনিবার ॥
তাই তাহা সংক্ষেপেতে আদেশে কোরানে ।
পেশানিতে আছর ছজুদ মোমিনানে ॥
আছে যার সে নেশান কবরেতে তার ।

দেখিয়া চিনিবে তারে হাসর মাঝার ॥
যে নেশান বলন্দির উচা নূর শান ।
উলিছে যাহার নূর কপালেতে চাঁন ॥
ঘষা মাজা ছজুদের দাগ নহে সেই ।
ছেতারা বলন্দ যার কপালেতে এই ॥
হৃদি দেশে জ্যোত যার আছর আনওয়ার ।
চেহেরাতে জ্যোতি নূর চিক মারে তার ॥
আছর ছজুদ এই অজুদ বেলওয়ারে ।
ছেতারা বুরুজে তার হৃদে জ্যোত মারে ।
কবর আকাশ তার হইবে রৌশন ।
আরশ মদির নূরে যেন সিংহাসন ॥
মাটির মন্দির তন আরশ আকাশ ।
সুরুজ বুরুজে নূর হইলে প্রকাশ ॥
মুহূর্তে বলন্দ সেই হইবারে চায় ।
কাননে অনল হেন চারি দিগে যায় ॥
যে দেশ যাহার দেশ জহুর তাহার ।
আছর এলাকা তার হয় অনির্বার ॥
তাই গোর আখেরের প্রথম কদম ।
ছফর মঞ্জিল এই হাসর আলম ॥
আমল এখলাছ আর বন্দেগী আনওয়ার ।
দ্বিগুণ হইতে রবে মুহূর্তে তাহার ॥
বেলায়েত নূর যার হুজুরি আনওয়ার ।
হাশর মাহশর তক নিত্য দুনা তার ॥
যে বান্দার হবে শান এমত নছিব ।
সে বান্দার এবাদত খোদার করিব ॥
দোন আলমের শান এবাদত তার ।
যে কাম করুক কিন্তু বন্দেগী খোদার ॥
চলা ফিরা খানা দানা নিন্দ কিম্বা ঘুম ।
এবাদত শানে তার খোদাই হুকুম ॥
রেজামন্দি বিনে তার কোন কাজ নাই ।
খেজেরের শানে নেক বুরাতে ভালাই ॥
যে জন এমন জনে দিবে মন মান ।
বদল তাহার শানে হবে নিজ শান ॥
যে জন এমন জনে করিবেন খোশ ।
আছরে তাহার অঙ্গে মিটে যাবে দোষ ॥

যে জন এমন জনে রাখেন খবর ।
ধরিবে তাহার শানে উছিলা আছর ॥
না ভুলিও হেন জনে না ভুল কখন ।
পাইবে উছিলা তার আল্লার স্মরণ ॥
খাওন খেলান আর দেওন দেলান ।
নিয়ত বরকত পান্থে পাবে মুক্তি দান ॥
খেদমতে রহম তার রহম আল্লার ।
পাইবে বান্দার শানে এনাম বান্দার ॥
তিলে ফুলে তেল তায় তাছির আতর ।
দূর হ'তে দান করে গন্ধ মনোহর ॥
করিম তুম্বার বদ নাহিক বিচারে ।
পাইলে নাকের রন্ধ্র গন্ধ দেয় তারে ॥

কবরের এলাকা

কবরের সাথে আছে এলাকা বাতেনী ।
হাকিকতে মূল যার মোহিত রূহানী ॥
আরওয়া লতিফ নূর বাতাস অজুদ ।
হকিকত জিনিষের হামেসা মৌজুদ ॥
যেন হকিকত রূহ জমিন মাঝার ।
মজুদ রহিতে হয় সকলের সার ॥
ফুলে ফল ফলে জল রস আস্বাদন ।
প্রত্যেক প্রত্যেক রঙ্গে প্রত্যেকের তন ॥
একই মাটির সঙ্গে গুণ অবিচার ।
অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত সংসার ॥
কে আছে মাটির গুণ গণিবারে পারে ।
হেন জন কেবা আছে বলহ সংসারে ।
যবে এ মাটির গুণ পারে না গণিতে
কেমনে রূহের গুণ পারিবে বুঝিতে ॥
শত গুণ আছে তার শত গুণ তার ।
কিন্তু গুণ হকিকত নবী আউলিয়ার ॥
রূহু গুণে গুনি কিন্তু জীব জন্তু যত ।
বাছা রূহু নবী অলী সোনা রূপা মত ॥
কবরেতে নবী অলী রূহের তাছির ।
প্রত্যহ মোহিত হালে এলাকা হাজির ॥

এলাকা আল্লার শানে এলাকা বান্দার ।
মজুদ রহিতে হয় খাজানা ভাণ্ডার ॥
তাইত কবর হয় আল্লার মঞ্জুর ।
যেমন গন্ধক সনে আগুন জহুর ॥
গন্ধকের সাথে যদি হয় মনিছাল ।
আঘাতে আওয়াজ দেয় আপন উজ্জ্বল ॥
যে জিনিষ যার সনে করিবে মিলিত ।
দুগুণের এক গুণ সামিলে জড়িত ॥
গুণে গুণে শত গুণ গুণেতে হাজার ।
এক হতে আর হয় আর হৈতে আর ॥
এসব রূহানী গুণ বাতিন তাছির ।
প্রত্যেক অজুদে আছে রূহু পৃথিবীর ॥
নূর হবে নূরে যার নূর মন তন ।
আচম্বিতে নূর তনু দিবে দরশন ॥
হবেন মস্কেল কোসা মস্কিল আছান ।
মোদাব্বের নূর রূহু এই শান মান ॥
হতে পারে যেতে পারে প্রকাশ্য অজুদ ।
মোদাবেবর রূহু নূর সদাই মজুদ ॥
মোদাব্বের নূর আত্মা অলী আম্বিয়ার ।
সদায় জহুর করে পৃথিবী মাঝার ॥
আসে আসে করে নূর প্রকাশ জহুর ।
হয় তনু নয় তনু তাজল্লির নূর ।
মোজহারে মোছবেতা হয় তনু তন ।
নেস্তি হতে হাস্তি শানে যেমন স্বপন ॥
ইহকাল পরকাল করিতে উদ্ধার ।
উদ্ধারিবে মন দুঃখ হাশর মাঝার ॥
কবরেতে কান্তি নূর মোছবেতার সনে ।
বন্ধুতার রবে সঙ্গী কবর আসনে ॥
কেরামত হিত পথে হইয়া হাজির ।
মোচন করিবে দুঃখ বান্দা এলাহির ॥
ইহকাল পরকাল অলী আম্বিয়ার ।
দায়েম মোছবেতা শান জহুর যাহার ॥
আকাশ মেঘের ন্যায় জহুর তাহার ।
ক্ষনে আছে ক্ষণে নাই হয় অনির্বার ॥
কেমন মেঘের গতি কেবা জানে তায় ।

কিরূপে কেমনে ছিল আছিল কোথায় ॥
তেন রূপে অলী নবী মেঘ সনে শান ।
গায়েব জাহের হয় আল্লার নেশান ॥
তাই স্বপ্নে, কাশফে দেখে নবী অলী তরে ।
এক সাথে এক রাতে শতেক হাজারে ॥
জামে নূরে লেখা গেছে রূহের সম্বন্ধ ।
দেখিলে বুঝিবে তায় যেমন পছন্দ ॥
যে যেমন তে তেমন দেখে আম্বিয়ায় ।
প্রত্যেক ছুরতে ছবি প্রত্যেক দেখায় ॥
মুহূর্তে হাজার ছবি কি রূপেতে হয় ।
কোথা হতে কি ছুরতে কহ কি বিষয় ॥
حديث شريف - من رانى فقد راء الحق
যে দেখেছ মোর তরে সত্য দেখা সেই ।
নবী অলী হকে হক হকিকতে এই ॥
আমাকে দেখিছে যেই সত্য দেখা তার ।
আমার দেখনে হয় দেখন আল্লার ॥
খাবে কিম্বা কাশফে দেখে কিম্বা সে জাগনে ।
সত্যই নবীর দেখা রাখা চাই মনে ॥
বল দেখি কি কারণে একই সময় ।
শতজনে শতস্থানে দেখিবারে পায় ॥
নূর রূহ সর্বদা প্রকাশে সর্ব ঠাঁই
অপ্রকাশ জাগা তার হেন জাগা নাই ॥
আনওয়ারে মোছবেতা এই রূহের বদন ।
হতে পারে হর রঙ্গে সদা সর্বক্ষণ ॥
মোছবেতা জহুর যেন আগুন অজুদ ।
হেন কোন জাগা নাই নাহিক মজুদ ॥
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘষাঘষি জোরেতে আঘাত ।
শিলে আর পাথরেতে মেঘে বজ্রাঘাত ॥
জাহের হইতে পারে তামাম আলম ।
এইত মোছাবেতা গুণ নহে বেশকম ॥
ছাবেত জাহের যেই হইবারে পারে ।
গায়েব হাজের নাই তাঁহার হুজুরে ॥
চেরাগ আগুন যেন নিবাইলে নাই ।
আছে কিন্তু সেই ঠাঁই কিন্তু জ্যোত নাই ॥
মোজাহারে লাতায়েন বলে এর নাম ।

থাকিতে সে নাই কিন্তু আজব কালাম ॥
যেই চিজ পৃথিবীতে হৈছে আর হবে ।
কোন চিজে রূহু নাই বল দেখি এবে ॥
রূহুর সমষ্টি সার চিকন আসল ।
দুধে লনি বীজে মনি ফুল মাঝে ফল ॥
রূহের রূহু যেই জাতে সেইত খোদা ।
এলাকা আছর যার কভু নহে জুদা ॥
চিকণের চিকণ সেই সকলের মানী ।
আমরে রব বলে তাই কোরানেতে ধ্বনি ॥
ফলে রুহ খোদা নহে হুকুম খোদার ।
জাতের হুকুম রাখে জাত হৈতে তার ॥
প্রথম দরজাতে হয় খোদার অজুদ ।
দোছরা দরজাতে হয় আরওয়ার মৌজুদ ॥
দুধে লনি সার তার ঘৃতে সার তার ।
গুণাগুণ জুদা নহে দোহের মাঝার ॥
উভয় উভয় গুণে পুষ্প আর বাস ।
এক গুণে দুই গুণ শ্বাসেতে প্রশ্বাস ॥
তাই নবী হাদীসেতে শানে ও গুণের ।
জ্ঞান গুণ ছুরতের জাত ছেফাতের ॥
حديث شريف خلق الله ادم على صورته
নিজরূপে সৃজিলেন আদমের তরে ।
ছেফাত মোছবেতা গুণ যাঁহার অন্তরে ॥
ছেফাত ছুরত পরে আদম ছুরত ।
শান গুণ সেফাতের যাঁহার মুরত ॥
ছেফাত যাঁহার নাম গুণ বলে তারে ।
শান গুণ না হইলে জাত হইতে নারে ॥
যেথায় মৌজুদ জাত মৌজুদ ছেফাত ।
ছেফাত বিহনে কভু নাহি ঠরে জাত ॥
জাতেতে ছেফাত আর ছেফাতেতে জাত ।
দোন মিলে একসাথে ছুরত ছিরত ॥
ছুরত নহিক যার ছিরত তাহার ।
কেমনে জাহের হবে বলহে আবার ॥
ছিরত জাহের হওয়া ছুরত দরকার ।
ছুরত বিহনে জাত নাহি হইবার ॥
কিন্তু ছুরতের মানী নহে কদাচন ।

জহেরা অজুদ খালী আদমের তন ॥
তন তার পুরসার মোছবেতা জহুর ।
দোন আলমের ছানা আদমের নূর ॥
খাছ গুণ সেই গুণ ছেফাত আল্লার ।
যে ছেফাতে যে ছুরত সে ছুরত তার ॥
যেমন ছুরত যার মোছবেতা জহুর ।
তেমন অজুদ চাই হওন জরুর ॥
দোন আলমের বিচে যতেক ছুরত ।
আদমের মত নহে কেহুর মুরত ॥
বলন্দ ছেফাত জাত বলন্দির শান ।
তাই বীজ অঙ্কুরেতে হয় বিদ্যমান ॥
যেই বীজের যেই গুণ সেই গাছ তার ।
জাহের হইল তরু ছিল নিরাকার ॥
নিরাকার রূপে যবে খোদার অজুদ ।
আদম তাঁহার শান বাতেনে মৌজুদ ॥
হকিকত আদমের হাকিকত তাঁর ।
জাহের বাতেন তাঁর আদমের সার ॥
রূপেতে অরূপ কভু অরূপ ছুরত ।
নিরাকার রূপ গুণ অরূপ মুরত ॥
আস্বাদের রূপ ছবি নহে কদাচন ।
না থাকিলে স্বাদ গুণ সব অকারণ ॥
যার যেই রূপ গুণ তেমন জহুর ।
জাগা গুণে রূপ কয় জাগা গুণে নূর ॥
স্থূল গুণে নাই কয় স্থূল গুণে আছে ।
আছে নাই এক ঠাঁই হকিকত কাছে ॥
কবরের সাথে যথা এলাকা বন্দার ।
ছাড়াইতে না পারিবে করিলে হাজার ॥
যথায় পরাণ পাখি করিবে গমন ।
নেক বদ সাথে সাথে যাইবে আপন ॥
রূপে তনে দেখা যাবে তাহার আছর ।
যেন কোন চিজ রহে বেলওয়ার ভিতর ॥
কিন্তু যবে রূহু আসে বদন বেলওয়ারে ।
পেশানী ফানোশে তার শান জ্যোত মারে ॥
আদম ছুরত পরে আদম ছুরত ।
লা মহল এই বাক্য জবানী আদত ॥

যাহার ছুরত যার ছুরত তেমন ।
এমত উত্তর নহে হবে কদাচন ॥
আদম তারিফ আর আদমের গুণ ।
বুঝিবারে আদি কথা ছিল ধুনা ধুন ॥
যেকালে আদম জাত ওয়াহেদের জাতে ।
গুণ জ্ঞান শান মান ছিল এক সাথে ॥
সেকালের আদি কথা হাদীসের সার ।
জাহের বাতেন শান নাহি ছিল যার ॥
তখন খোদার জাতে আছিল আদম ।
নৈরাকার এই মানী নহে বেশকম ॥
এরাদা আলমে নহে হয় নৈরাকার ।
এরাদা ছেফাত হয় বাহের তাহার ॥
এরাদা জাহের হয় যেই শান পরে ।
মোছবেতা তাহারে কয় গুণ অনুসারে ॥
মোছবেতা জাহের হওয়া গুণ আর শান ।
পয়দা বলিয়া যারে কহে বিদ্যমান ॥
পেয়েছে খোদার গুণ হয়েছে খোদার ।
মৌজুদ খোদার গুণ রহিবে তাহার ॥
قوله تعالى - قل كل من عند الله
কত নবী যথা যত জগত মাঝার ।
খোদা হতে হইয়াছে সকলি খোদার ॥
জাত হৈতে জাত পয়দা নূর হৈতে নূর ।
শান গুণ ছেফাতের মান ভুরা ভুর ॥
বহু ছেফাতের যোগে কলায় ছুরত ।
তখন মৌজুদ জাতে দেখায় মুরত ॥
জহুর জাহের আর পয়দা কহে তারে ।
তাজল্লি বলিয়া কভু নাম হয়ে পড়ে ॥
খোদার গুণের সার জাহের আদম ।
মখলুক তাহার নাম নহে বেশকম ॥
এই জন্যে মখলুকেরে বান্দা বলা যায় ।
বান্দা পদে ধরা কিন্তু না জাবে খোদায় ॥
আদম হইতে পয়দা হইলে খোদার ।
আদমের বান্দা সেই হইত প্রচার ॥
যার বান্দা তার গুনে গুণি বান্দাগণ ।
তার রঙ্গে তার ঢঙ্গে তার তনে তন ॥

তাই তাহা সার বাক্য আদেশ কোরানে ।
সকল হইবে রুজু আসলের পানে ॥
قوله تعالى كل شئ يرجع الى اصله

মরণ লক্ষণ

মুর্দা বেরাম যেই মউত বিমার ।
তারপরে নেগাদারী কর বারে বার ॥
মরণ নিকটে হয় মন পেরেশান ।
খসিয়া পড়িতে রহে জেন্দেগী নিশান ॥
বদনে আদিম সার নিকলিয়া যায় ।
অধৈর্য্য নিরস হয় সেই মন ঘায় ॥
শুনিতে না পারে সেই কেহর বচন ।
এত নূর মন গেলে হইবে মরণ ॥
মরণ বিলাস করে অন্তরে যাহার ।
দিনে দিনে তনু ক্ষয় হয়ে যায় তার ॥
কমিবে হাটুর বল বাড়িবে চঞ্চল ।
দিন দিন শরীরের কমে যাবে বল ॥
যে দেশের মনপাখী সে দেশে যাবার ।
আকাঙ্ক্ষা চঞ্চলে চাহে সদা উড়িবার ॥
কাঙ্কুরা খসিয়া গেলে ভেঙ্গে যাবে ঘর ।
নিবিলে দীপের বাতি রবে না পসর ॥
যাহার আদিম ঘর ভাঙ্গা গেছে আগে ।
বুঝিতে না পারে সেই অনুরাগ রাগে ॥
চক্ষু মুখ টলে যাবে নাভি টলে ধির ।
জমের মুরলী ধার হইবে বাহির ॥
কর্ণ নাসা কান্তি ভঙ্গ বিলাস আসন ।
খসিলে তারের মুখ হইবে মরণ ॥
যাইবে সঙ্গের সাথী দেখিবে স্বপন ।
ভাই বন্ধু এ স্বপনে হবে অন্বেষণ ॥
যাইবে সঙ্গের সঙ্গী হামজাদ ।
ঘুচিবে অরুচি মধু রসনা আস্বাদ ॥
সে সময় তারে সবে করিও আদর ।
ইয়াদ আল্লার নাম তার বরাবর ॥
গুণা মাফ তৌবা করে খোদার দর্গায় ।
সকলে মিলিয়া দোয়া করিবে তাহায় ॥

কবরে জেন্দা করা

কবরের জেন্দা করা রূহের সম্বন্ধ ।
যেমন বিজলী বাতি কথা নহে মন্দ ॥
তারে আসে তারে যায় তারের খবর ।
মুহূর্তে আলোক হয় তামাম শহর ॥
এই রূপ রূহু সনে মোছবেতা জহুর ।
হাজার আঞ্জির দানা এক বটে নূর ॥
শতেক বৃক্ষের বুটি রূহু দানা সার ।
এক হতে আর হয় হাজারে হাজার ॥
জেন্দেগী জহুর পন্থে যার জেন্দেগানী ।
যথায় যেরূপ জেন্দা একি তার মানী ॥
তনে জেন্দা রূহু সনে বেলওয়ার অজুদ ।
মন জেন্দা কুল আলম সম্বন্ধ মৌজুদ ॥
সম্বন্ধ রূহের জেন্দা তনের স্বপন ।
সে সম্বন্ধ দুনিয়ার বাচন মরণ ॥
রূহের মরণ নাই জহুর সম্বন্ধ ।
দুঃখ সুখ তার সাথে একই পছন্দ ॥
তনে সুখ যেইরূপ মনের আছর ।
মনে সুখ মন তনে তন বরাবর ॥
তন্মধ্যে তন পুশিদা তনের ভাণ্ডার ।
একতনে শত তন তামাম সংসার ॥
যত তন খাইয়াছ পেটের মাঝার ।
সেই তন তনে গোর হইবে তোমার ॥
মাছ মাংস দুম্বা ভেড়া পোনা মীন যত ।
তব পেটে গোর তার হবে শত শত ॥
সে গোর তোমার পেটে হইবে যেমন ।
তুমিও বাঘের পেটে হইবে তেমন ॥
তুমি কি একেলা যাবে একেলা কবর ।
তব তন কবরেতে শত তন ঘর ॥
শত পরাণীর তুমি হয়েছ কবর ।
সুখ দুঃখ তাহাদের তোমার ভিতর ॥
তুমি যদি সুখ দিয়া থাক তাহাদেরে ।
পাইবে তুমিও সুখ কবর ভিতরে ॥
মগ কুকী পাহাড়েতে যারা সাপ খায় ।

হিসাব হবে না বুঝি বুঝেছ তাহায় ॥
হিসাবের কালে সাপ নেকলিবে যবে ।
কবরেতে সেই সাপে তারে নাহি খাবে ॥
খাইয়াছে যারে যেই দাইক তাহার ।
কাটিবে তাহারে হয়ে সাপের আকার ॥
যেই যাহা করিয়াছ গ্রহণ ভোজন ।
নেয়ামত আশীর্বাদে করিও শোধন ॥
বদন কবরে তাই তাহাদের সুখ ।
আরাম পাইবে তবে আল্লার মুল্লুক ॥
ছুওয়াল কবরে তবে হইবে না দায় ।
আবাদ মলুকে ডর রহিবে কোথায় ॥
ইনসাফ রব্বানী সনে আবাদের ঘর ।
তাহুত ছোলতানী কবে আসে তারপর ॥

দাফন করার পর মুর্দারের যে অবস্থা হয় তাহার বিবরণ

মাটি দিয়া মুর্দ্দাগণে আসিবে যখন ।
রূহু দিলে জেন্দা দেহ হবে পরক্ষণ ॥
ছুটিয়া যাইবে তার ঘুমের খোমার ।
চক্ষু মোছে আঁখু পাখু করে বার বার ॥
বেলা যেন অস্ত যায় দেখে তৈল রূপ ।
সন্ধ্যা হল দিবাগতে আসিলে গরূব ॥
চল যাই কার্য সারি যার যেই কাজ ।
সার সার দিন যায় আসে সাম সাজ ॥
যার সেই কার্য সারে নর ধরাধাম ।
অস্ত গেলে রবি বেলা এলে নিশা সাম ॥
তেন রূপ কার্য কর মন অভিলাষে ।
পন্থগতি তালাসিবে গোর চারি পাশে ॥
না পাইয়া পথগতি বলিবে কি হায় ।
কি হইবে মম গতি আসিনু কোথায় ॥
সার চিন্তা মনে গতি হইবে তখন ।
কোথায় যাইব আর হয়েছে মরণ ॥
তাই মোরে রাখিয়াছে এক বর ঠাই ।
যাইবে কেমনে কোথায় যাবার আসা নাই ॥

সঙ্গে নাই মাতা পিতা পুত্র পরিজন ।
ভাই বন্ধু কেহ নাই একেলা গমন ॥
ছাড়িয়া আসিনু যবে এ ভব সংসার ।
কি হবে আর গতি কি হবে আমার ॥
ধুনিবে কলেজা কলি তুলা ধুনা সাটে ।
ফুটিবে কমল তালু চিন্তে হিয়া ফাটে ॥
কান্দিবে পতিত হয়ে অকুল সাগর ।
কেমনে সমুদ্র জলে ভাসিবে পাথর ॥
ওহে কাল ইহকালে কি হবে আমার ।
কি হইবে কোন গতি নাহি যদি আর ॥
চিন্তায় কাতর তনু পশে অঙ্গে বাণ ।
বিপাকে ধমকে তার উড়িবে পরাণ ॥
চারি ধার ছন্দ সুর আওয়াজ রটনা ।
আসে কেহ যায় কেহ এই কি ঘটনা ॥
বাঘের আওয়াজ আর শূকরের বোল ।
একেবারে দিগে দিগে পড়ে গেছে রোল ॥
হেনকালে চক্ষু খুলে দেখবে তাবত ।
চারি পাশে বাঘ, ভালুক নানান আফত ॥
কেহ চাহে মারিবারে কেহ খাইবার ।
সাপ, চেলা, ডাশ, নেশ মারিবে আবার ॥
এমন আজাবে মুর্দা হলে গেরেপ্তার ।
জেন্দা যদি রক্ষা গতি করিবে তাঁহার ॥
দোয়া দেলী একিনেতে বাতেন আছর ।
সদকা খয়রাত কিম্বা জেয়ারৎ কবর ॥
আজানে মুর্দ্দার রক্ষা কবরের পাশে ।
বাঘ ভালুক সেই কালে ভাগিবে তরাশে ॥
আজানে পনর ফল যেই যথা দিবে ।
হুস কর কথা ধর দেখহ কেতাবে ॥
আজান আজব চিজ ইয়াদ আল্লার ।
বহুতর লাভ আছে ভিতরে তাঁহার ॥
একা যেতে রাহা পরে রাত্র অন্ধকার ।
ভূত প্রেত তুফানাদি পথ ভুলিবার ॥
বেটা বেটী জন্মকালে রাহাত আজান ।
পাইবে বহুত বালা হতে পরিত্রান ॥

তাজেম গোর ওয়াজেব

নেকতন আদমের ছুরত নেকের ।
আদাব লেহাজ নেক বনি আদমের ॥
যাহার আদাব নাই ফরজন্দ আদম ।
পশুর জীবন তার নহে বেশ কম ॥
চক্ষের আদাব আর আদাব মুখের ।
হস্তপদ আদাব আর আদাব দেলের ॥
নিচ আঁখি বাক্য ধীর বচন মধুর ।
হাত পা রঞ্জন যেন বেহেস্তের হুর ॥
আদাবে বসন যেন মসজিদ মিম্বার ।
শয়নে সজ্জিত যেন তাক্যা মনোহর ॥
চলনে আদাব যেন খঞ্জন রঞ্জন ।
বুলবুলের মত হবে মুখের বচন ॥
হরিণ শরীর ন্যায় শরীর কোমল ।
মুরব্বি গমনে শান্ত যেমন আজল ॥
জানিয়া না জানে যেন চালাক চতুর ।
পুছিলে কহিবে কথা জবান মধুর ॥
হাসি মুখ সাদা মন রাখিবে সদায় ।
কহিবে সার্থক কথা কথায় কথায় ॥
বেশী কথা রাষ্ট্র হাস লম্পট চঞ্চল ।
ধৈর্য্যহীন সহ্যঘাতি মনরীতি খল ॥
না জানে এমন জন গভীর স্বভাব ।
গাইছে গবিন্দ সুরে নামের কেতাব ॥
আদাব শিখিতে হয় আদিবের সনে ।
শিখিলে পাইবে ধন রাখিবে যতনে ॥
শিখিলে আদাব চাল চলিবে তখন ।
শুনিবে না কার কথা করিলে বারণ ॥
আদাব দস্তুরে চাই শিখন কেতাব ।
পড়িলে গাবরগণ সেই বে আদাব ॥
নবী অলী বোজর্গান আদাবারে সনে ।
শিখেন আদাব রস দেখিয়া কোরানে ॥
ফাজেল চতুর তাঁরা ছিল না কখন ।
মাটির স্বভাবে যেন ছিল সাদাতন ॥
তাঁদের ছুরত ছবি পছন্দ খোদার ।

তাইত রহিল জারি পৃথিবী মাঝার ॥
সালামে আদাব বলা নত করা শির ।
যে যেমন তে তেমন আমির ফকির ॥
ছোট বড় মুরব্বির রাখহ লেহাজ ।
হাদীসে ছাবেত যাহা বুজর্গের কাজ ॥
জামেনূর কেতাবের সালাম ভিতর ।
লেখা গেছে দেখ তায় আদাব সত্বর ॥
জীবনে আদাব যার চাই জেন্দা হালে ।
মরিলে আদাব তাঁর করিবে সকলে ॥
ধরিবে তাজিম সনে করাবে গোসল ।
ভব মায়া ত্যাগে যেই হয়েছে অচল ॥
পরাবে কাপড় তাঁরে অতি সযতনে ।
শোয়াবে কবর ধামে পরম আছনে ॥
ভাই বন্ধু আত্ম আর কিম্বা স্বামীবর ।
উতারিলে ভাল হয় কবর ভিতর ॥
উতারেন আলী শাহা ফাতেমা মাতারে ।
গোসল দেলাতে পারে বিবি মিঞা তরে ॥
কেতাবে লিখিত এই হাদীসে কথন ।
বুঝিয়া সুঝিয়া কাজ করহ চলন ॥
হব্ব জব্ব নাহি চাই নামের কেতাব ।
তমিজ কেতাব যেই উলুল আলবাব ॥
ভাল কাষ্ঠে দেওয়া চাই গাথনী গোরের ।
চার পানে ঘিরা চার কিম্বা সে ইটের ॥
তার পরে বিছাইবে পাটি কি চাটাই ।
খের কুটা আদমের শানে আসে নাই ॥
মোছলেম বুজর্গ জাত ফরজন্দ আদম ।
খের কুটা গোরে তার কিসের ভরম ॥
حديث - انزل الناس على قدر منازلهم
যে যেমন কদরের জাগা চাই তার ।
ফরজন্দ আদম নহে পশুর আকার ॥
দেওয়ার চেরাগ দেওয়া গোম্বজ দালান ।
কবরে দুরস্ত তাহা তাজিমের শান ॥
রহিত হইল ঘর কোথা ঘর তার ।
আখেরে শোয়াবে তায় কবর মাঝার ॥
এক দিন করিবার কর যাহা হয় ।

আর না আসিবে ঘরে ঘরে কাম নয় ॥
তার ঘরে থাক যেই দোয়া দিও তাঁরে ।
আর না আসিবে সাধে ফিরে ঐ ঘরে ॥
পদ দিয়া পদ মাথা না কর গোরের ।
বেয়াদবী শান ইহা জান মুর্দারের ॥
তাজিম আদাব চাই হাদিসের বাণী ।
চারি পানে যদি হয় আগুনের ধ্বনী ॥
কাপড় জ্বলিবে তাতে জ্বলিবে শরীর ।
তবু নাহি কবরেতে পদ কর স্থির ॥
শিয়রে কবর দিয়া নাহি সোও আর ।
হাদীসেতে মানা ইহা আজাব মুর্দার ॥
আজাব মুর্দার যদি হইল শয়নে ।
আজাব না হবে কেন পায়ের চটনে ॥
জুতা পদে নাহি যাও সদনে অলীর ।
বে আদব সান ইহা সমান কাফীর ॥
বে তাজিমে দুঃখ পায় রূহু মুর্দাগণ ।
দীন দুঃখী সেই দুঃখে হয় সর্বজন ॥
খের কুটা বেতাজিম কেবল সঞ্চয় ।
পাত কাটা ডাল ভাঙ্গা কাম সভ্য নয় ॥
অসভ্য অফল গাছ ফলে বদ ফল ।
রূহুগণ দিলে দোয়া ঘটে অমঙ্গল ॥
মুনী মানী লোক যদি অছিয়ত করে ।
পাগ টুপী পোষাকাদী দেলাবে কবরে ॥
দিবে তাহা কেতাবেতে রওজা আছে তার ।
না দিলে তেমন জনে হবে গুনাগার ॥
ঝাড়ু কষি গোর নূর কর মনোহর ।
হইবে সন্তোষ মন রূহের পশর ॥
নাদানের চাট পাটি কবরে এছরাফ ।
খড় কুটা ইনছানের বুজর্গ গেলাফ ॥
সাজ শোভা তাজ টুপি জেন্দা লোক সনে ।
এছরাফ না হল তাহা জানিল কেমনে ॥
দশে বিশে টাকা যার জামা জোড়া গায় ।
সুন্দর মকান ঘর বেহুদা টাকায় ॥
তাহাতে এছরাফ বুঝি নহে কদাচন ।
চাট পাটি কবরেতে এছরাফ কেমন ॥

হইল দুর্গতি দশা বাঙ্গালা দেশের ।
সাজ শোভা উঠাইয়া নিল কবরের ॥
সাজ শোভা দূরে রহে বুরিযা চাটাই ।
অধর্মী তাহুতীগণ দিতে দেন নাই ॥
বলে ইহা এছরাফের সাজ নীতি কাজ ।
মছজেদ দিও তায় পড়িবে নামাজ ॥
কে দিল মছজেদ আর কে পড়ে নামাজ ।
উল্টা মার দিয়া লুঠে কবরের সাজ ॥
লক্ষ লক্ষ পরাণীর মাটির কবর ।
না দিল কাহার পাটি মসজিদ ভিতর ॥

মদতে কবর

নেকতন অলীগণ কবরের শান ।
জহুর কোরবত যার খোদাই নেশান ॥
এভব ছলবী পর্দা হইয়া গেলে দূর ।
বাতেনের শানে নফছি এলাকা জহুর ॥

মদত রূহানী

মদত রূহানী হয় মদত আল্লার ।
এলাকা জাহের শান রূহু নাম তার ॥
রূহু নামে নাম যার নূর জাতে পুর ।
আকাশ পাতাল ব্যাপী যাঁহার জহুর ॥
যে রূহু নূরাণী হয় রূহের ছরদার ।
পৃথিবীর ভালা বুরা হাতে রহে তাঁর ॥
নেকতন রূহুগণ তাবেদার যত ।
এক পরে এক রহে তাবে অবিরত ॥
পৃথিবীর ভাল মন্দ হাতে রহে তাঁর ।
সমাধা করেন কাম এরাদা আল্লার ॥
তাই নাম মোদাব্বের উপাধি রূহের ।
ভালা বুরা পৃথিবীর শানে খেজেরের ॥
নেকতন রূহুগণ যাহার সংসারে ।
গাড়িলে নেশান ঝান্টা কে লাড়িতে পারে ॥
এস এস মোদাব্বের গাড়হ নেশান ।
থাকুক তোমার দেশে এলাহির শান ॥

যে ঘরে হইবে নূর আসন তোমার ।
কে পারে হেলাতে তাহা আসন খোদার ॥
যে বাসরে যেই রূহু করিছে আসন তোমার ।
রহুক অটল সাধ তার সিংহাসন ॥
ধরিবে গুরুর পদে সিংহাসন যাঁর ।
লড়িবে না হেলিবে না এ ভবেতে আর ॥
গুরু সুতে গাঁথা গেছে যে দানা চন্দন ।
এক সনে আর রবে হবে না মরণ ॥
চন্দন গলার মালা গাঁথা গেছে যাঁর ।
খসিয়া পড়িতে নারে থাকিতে সংসার ॥
ধন্যবাদ রূহু নূর শত ধন্যবাদ ।
দেখিও ভবের খুবী পুরাইও সাধ ॥
নেকতন রূহুগণ নবী আউলিয়ার ।
মুরব্বির আরওয়া আছে যার অধিকার ॥
সদায় রহিবে তাঁর অটল আসন ।
বিপদে তাঁহার কভু হবে না মরণ ॥
ভাসিবে তাঁহার ডিঙ্গা কহর দরিয়ায় ।
ধরবে রূহানী বৈঠা মাঝি মাল্লা তায় ॥
মরিলে কবর মাঝে সঙ্গী হবে তার ।
কি ভয় আউলিয়া মাঝি যাহার ডিঙ্গার ॥
গুরু ধামে নূর মাঝি আরোহণ নায় ।
ভাসিতে ভাসিতে গিয়া লাগে কেনারায় ॥
কেনারা পেয়েছে ডিঙ্গা বিষম ছফর ।
আল্লা আল্লা বল সবে ধরিয়া ছাপ্পর ॥
উঠ এবে কেনারায় লাগিয়াছে নাও ।
যার যথা যাইবার সেই দিগে যাও ॥
আস কান্ত কর শান্ত ভুলনা আমায় ।
চড়িয়া তোমার ডিঙ্গে এনু কেনারায় ॥
দেখিছি তোমার ডিঙ্গা সত্যই অটল ।
ভয়ানক সমুদ্দুরে নাহি পড়ে তল ॥
দেখিছে অনেক সাধু ছওয়ার ডিঙ্গার ।
ইহ ভব সমুদ্দুর হৈয়া গেছে পার ॥
যাহারা হইবে পার রহিয়াছে আশে ।
দেখহ অটল ডিঙ্গা কেনারায় ভাসে ॥
দেখিয়া অটল ডিঙ্গা হইও ছাওয়ার ।

নিমিষে এ ভব নদী হয়ে যাবে পার ॥
না দেখিয়া ডিঙ্গা যারা রহিয়াছে আশে ।
কহর নদীর পরে ভেরা ভুরা ভাসে ॥
কোন দিক হতে ভুরা কোথা নিয়া যায় ।
গাঙ্গের তরঙ্গ মাঝে খেলিয়া বেড়ায় ॥
তাই তারা নূর ডিঙ্গা চিনিল না হায় ।
কভু পৌছিল ভেরা গিয়া কেনারায় ॥
তাই তারা করিছে না তালাস ডিঙ্গার ।
ভুল ডিঙ্গে আরোহণে ভুল হয়েছে তার ॥
ভুল ডিঙ্গে মাঝি মাল্লা চালাক চতুর ।
নূরী ডিঙ্গা বলে তারা দেখাইছে ভুর ॥
ডুবাল মাল্লার জাত গরল অন্তর ।
সরল লেবাছ সাজে ভরিল কহর ॥
ওপারে তুলিবে বলে ডুবাইয়া মারে ।
মরিল আজল বালা না চিনিয়া তারে ॥
যে জন না জানে ডিঙ্গা নূরানী খবর ।
ভব নদী পার হতে হইবে সত্ত্বর ॥
বুঝিবে তখন তারা করিলে গমন ।
রহিবে না কোন গতি পড়িলে সমন ॥
সমন থাকিতে কর গমনের গতি ।
অকালে না হবে কেউ কাহার সারথি ॥
নেক রূহু আপনা আওলাদ ফরজন্দানে
তালাশ করিতে রহে ইয়াদের সনে ॥
ইয়াদ আদর যেই করেন আত্মার ।
রূহু আত্ম নেগাবানী করেন তাহার ॥
স্মরণ রাখিলে আত্ম স্মরিবে তাহারে ।
নিত্য আত্মা দেখা দিবে তার সমাদরে ॥
নিত্য আত্মা সদা যদি রাখিবে স্মরণ ।
বোলাইলে আসিবেন তাহার সদন ॥
হইবে আত্মার সঙ্গী আর্শি নূরী সনে ।
যেমন আতশ আর্শি সূর্যের কিরণে ॥
সূর্যের কিরণ আর্শি নিজ গুণে টানে ।
টানিয়া গরম আগ জ্বলন্ত আগুনে ॥
তেমনি আত্মার গুণে আপনার গুণ ।
করিবে পসর বাতি করে ধুনাধুন ॥

আলো সনে আলো যেন পসর উজ্জ্বল ।
হইবে আছর তেজ ফুটিবে জামাল ॥
রূহু গুণ গুণ যার গুণে সম্মিলিত ।
ধরিবে বিজলী জ্যোতিঃ মেঘে আচম্বিত ॥
ওয়াইছিয়া গুণ এই ফয়েজ রৌশন ।
জ্বলিবে যাহার ঘর দেখিবে আপন ॥
চুমুক হায়ওয়ানী কহে এই গুণ তরে ।
মোর্শেদ রাশেদ নৈলে পাইবারে নারে ॥
তাই যারা ওফাদার নহে কদাচন ।
কভু না হইতে পারে রূহের ভাজন ॥
জেয়ারত কবরের রূহের তাছির ।
তালাসিলে মুর্খগণ কহেন কাফির ॥
খেয়ালি মোর্শেদ আত্মা ছুরত খেয়াল ।
আকর্ষণ সনে যার পাইবে জামাল ॥
সে জামালে কামালত এলাহির ফানা ।
কোথায় পাইবে যেই চক্ষু রৈতে কানা ॥
কবর সুন্দর করা রাখন যতনে ।
রৌশন পসর তায় আদাবের সনে ॥
রূহু তারে দোয়া দিবে দেখিলে সুন্দর ।
যে জন কবর সাফ করিল ছাপ্পর ॥
فی شرح برزخ
واذا تحير تم فی الامور فاستعينوا باهل القبور
সরে বরজখেতে তাই লেখিছে সুন্দর ।
ডরানি কার্য্যের চাই মদত কবর ॥
ভয় ভিত কোন কামে হইবে যখন ।
মদত কবর হতে লও নেকতন ॥
নেকের কবরে রহে মোছবেতা জহুর ।
আরশ ভেদিছে যার কবরের নূর ॥
হাদীস উম্মতি সনে হৈয়াছে ছবুত ।
আউয়াল আখের তক রৈয়াছে মজবুত ॥
আদম হইতে নিয়া রোজ কেয়ামত ।
নেক লোক এই শানে আছেন তাবত ॥
মালুম হইয়া গেছে তাহা সবাকার ।
রৌশন হয়েছে দেলে হাজারে হাজার ॥
দেখিয়া কবর খুবি দোয়া দেন অলী ।

শতে শতে দেখিছেন তাই যাই বলি ॥
দেখিছে দেখিবে আর নেক লোক যাঁরা ।
আন্ধার ওহাবীগণ রহিবে আন্ধেরা ॥
ওহাবীর দেলে নূর নাহি কোন কালে ।
ছাগলে চাটিবে গোর লেখিলে কপালে ॥
নিজ গোর ছাগলের নহে তাতে দায় ।
নেক লোক বেতাজেমে রূহে দুঃখ পায় ॥
নেক রূহু দেখে যদি কবরের শান ।
কহেন আরওয়ার তরে এই মোর মান ॥
দেখ মোর বেটাগণ আমার কবর ।
বানালেন শান ছবি রূপে মনোহর ॥
এই রূপ বলিলেন নবী অলীগণ ।
এই রূপ কহিলেন নেক রূহু তন ॥
এই রূপ বলিবেন কেয়ামতাবধি ।
আজমাস করিয়া দেখ সত্য হও যদি ॥
আজমাস নেকের ভাগ হিস্যা আম্বিয়ার ।
এলহাম মোলহেমা কাস্ফ হাদীস প্রচার ॥
আজমুদা হাদীস বাত্তি নেক সনাতন ।
সে বাত্তি বদের দেলে হবে না রৌশন ॥
তাই তাহা ফেকার কেতাবে লেখা সার ।
ঘর গুম্বুজ দেয়া চাই নেক আউলিয়ার ॥
জামেনূর কেতাবেতে লেখা গেছে তায় ।
দেখ এই রেছালাতে আখেরী ফৎওয়ায় ॥
ফাতেহা বলিতে হয় নামে আউলিয়ার ।
কোন নামে ছওয়াব আদি পৌছাব কাহার ॥
কি প্রকারে নিয়ম আদি শির্নি ও মিঠাই ।
চিনি কত দুধ কত ঘৃত কত চাই ॥
না দেওয়া নিমক আর মরিচ অম্বল ।
কোন অলী শির্নি খিরে দিত ফলাফল ॥
যে দস্তুর ছিল যার অলীর মাঝার ।
সেই অর্থে নাম রৈল ফাতেহা তাঁহার ॥
বরকত নেয়াজ রৈল নামে ফতেমার ।
সত্য পীর সত্য শির্নি পৃথিবী মাঝার ॥
ফাতেহা কুন্দরী হয় (আজ) ওয়াজ তাহাদের ।
ফাতেমা হানিফা, আর ঘরানা ঘরের ॥

খোদেজা আয়শা আর কুলছুম জয়নব ।
হফজা নাম সাত তন বিবিগণ সব ॥
ইমামের নেয়াজ আর ফাতেহা আলীর ।
সামাদার নেয়াজ আর নেয়াজ খিজির ॥
কলন্দরী নেয়াজ আর শির্নি বড় পীর ।
শেখ ফরিদ মান্য আর নেয়াজ গাজির ॥
একে একে যত মান্য ফকিরানা ঘরে ।
বখসেস এনাম আল্লা দিয়াছেন যারে ॥
কাস্ফ আর এলহামাদি কিম্বা সে স্বপন ।
পেয়েছে গায়েব রত্ন আখেরের ধন ॥
সে রত্নে করেন যত্ন যেই রত্নাকর ।
ফজল রহম এই অলীর নজর ॥
সেই নামে নাম তাঁর খোদাই আসল ।
নামাজে নিয়ত যেন সুন্নত রসূল ॥
ফলে কিন্তু নামাজেতে মানস আল্লার ।
রাসূলের নাম আর ছজুদ কাবার ॥
তেন রূপ নজরেতে মানস খোদার ।
কোরবত নেয়াজ ধার্য আছে যে প্রকার ॥
তাহাকে শেরেক কহে মশরেক যে জন ।
আউলিয়ার রাস্তা নেক খোদার স্মরণ ॥
যে জন খোদাকে খাবে দেখেনা কখন ।
কেমনে সে জানে তারে শেরেক কেমন ॥
না জানে ছেফাত আর নাহি চেনে জাত ।
নাহি জানে শানমান না জানে হালাত ॥
নাহি জানে এত্তেহাদ না জানে এরফান ।
ইসলাম কাহারে বলে কাহারে ঈমান ॥
মোসলমান কোন জন মুমিন কে আর ।
শরার তারিফ কেবা এগানা খোদার ॥
আশেকের শরা আর আহকাম আলীর ।
শরিয়ত আব্দাল আর শরিয়ত খেজের ॥
বদরের সাহাবির শরা আহকাম ।
মরদের শরা যাহা আওরাতে হারাম ॥
জাহেরা ইমাম যারা খেলাফ তামাম ।
একের হালাল আর অন্যের হারাম ॥
এমত খেলাফ আদি এখ্‌তেলাফ যত ।

হানিফি হবে না কভু মালেকির মত ॥
জাহেরানা ঘরে যবে এমত কালাম ।
একের হালাল আর অন্যের হারাম ॥
বাতেন যাহার নেক নিশ্চয়ই সে নেক ।
বাতেন যাহার নাই তারে বলে ভেক ॥
পৃথিবীতে হেন নেক নহে কোন কাম ।
এখ্‌তেলাফি শানে যারে না বলে হারাম ॥
তাই এ উম্মত মধ্যে গোর গোর যত ।
এক গোরো নহে কভু আর গোরো মত ॥
ফাছেক কাফের কেউ কহে কার তরে ।
দীনেতে গাফেল তাই ফাছাদ খাতেরে ॥
যদি কেহ নেক হালে করিতেছে নেক ।
গাফেলান বলে ইহা হারাম শেরেক ॥
নাহি জানে মূলে যার রহিয়াছে নেক ।
কস্মিন তাহার কাম হবে না শেরেক ॥
শেরেকেতে পাক হন নবী অলীগণ ।
কোরানে যাহার ব্যাখ্যা অলীর মোচন ॥
তার কাম হর হালে খোদার পছন্দ ।
বুঝিতে না পারে যারা লেগে যায় ধন্দ ॥
আউলিয়ার নিকটেতে নাহিক এঙ্কার ।
সকল খোদার কাম ভালা বুরা তার ॥
আপে ভাল পরে ভাল ভাল সর্বকাল ।
হর কামে নেক যার নাহিক জঞ্জাল ॥
حديث
تخلفوا باخلاق الله
ছেফাত খোদার সনে করহে তোমার ।
বদল আখলাক কর আখলাক আল্লার ॥
তাই তব ছহব্বতে পাওয়া যাবে রব ।
নহে যত দলাদলি অকারণ সব ॥
পিরাপিরী নাহি জানে অলী আলীগণ ।
নিরবধি যার ঘরে খোদার স্মরণ ॥
স্মরণের নিকটেতে পাইবে স্মরণ ।
স্মরণের সাথে তবে হইবে মরণ ॥
মরণ যাহার হবে স্মরণের সনে ।
চিরজীবি হবে সেই স্মরণ মরণে ॥

মরণ যাহার হবে চিরজীবী আশ ।
মরিলে জীবন পাবে অলীর সমপাশ ॥
মরিছেন যেই জন আগে মরণের ।
হইছে মন্দের মন্দ মন্দ সকলের ॥
সে মন্দ পছন্দ নেক নিকটে খোদার ।
সে নেক নেকের সার পৃথিবী মাঝার ॥
পৃথিবীতে যত নেক সে নেকের নেক ।
যাহারা না জানে তাই নেক নহে ভেক ॥
ভেকেতে নেকের ভেক নহে নেক কাম ।
বন্ধুর আদর ভেক নহে সে হারাম ॥

দর্গা ও মঞ্জেল

নেক লোক তাবেদারী দর্গা ও মঞ্জেল ।
যে মতে আউলিয়ার খোশ থাকে দেল ॥
মাজার মঞ্জেল আর কবর তৈয়ার ।
যেমতে তাজিম রহে অলী আম্বিয়ার ॥
তাই আরব আজমেতে আর হিন্দুস্থান ।
কবরেতে শতে শতে গম্বুজ দালান ॥
মদিনা গম্বুজ নূর নবী মোস্তফার ।
বেহেস্ত বাগান চক পৃথিবী মাঝার ॥
কত সোনা কত রূপা কত বেলওয়ার ।
চান্নি ও গেলফা আর ফানোসের ঝার ॥
ঝুলিতেছে সারি সারি কাতারে কাতার ।
যে দিগে নজর লাগে দেখিতে বাহার ॥
ঝাড়ু কশি খাদেমান করেন দর্গার ।
মছলন্দ ফরাস কত চৌদিকে তাহার ॥
শত শত আলেমান তাহার খাদেম ।
ঝাড়ু কশি করিতেছে হইয়া নাদেম ॥
বেদাত বলিয়া বদ বলিতেছে যারা ।
তুড়িবারে কয় বার গিয়াছিল তারা ॥
পারে নাই পারে নাই ফজলে খোদার ।
রহিছে দীনের শান নবী মুস্তফার ॥
আর কত কবরেতে মসজিদ মন্দির ।
দেশে দেশে বর্তমান অলী ও নবীর ॥

বায়তুল কুদ্দুস আর বোগদাদ শরীফ ।
রৌশন আরশ ন্যায় যাহার তারিফ ॥
সামের মছনদ আর রুমের ভাণ্ডার ।
সারি সারি ইমারত অলী আউলিয়ার ॥
মিছির ফারছ আর কাবুল কান্দাহার ।
কত ঠাঁই কত গোর কবর মাঝার ॥
নেজাম মুল্লুক আর পেশওয়ার বোম্বাই ।
না আছে কবর দর্গা হেন জাগা নাই ॥
শাহে চিস্তী নূরে এলা হাবিব আল্লার ।
আজমীর শরীফ যার কবর আনওয়ার ॥
কবরে মন্দির শান আল্লার নিশান ।
দেখিয়া যাহার খুবি ফেরেস্তা হয়রান ॥
দিগে দিগে ইমারত রহিছে অঙ্কিত ।
কোঠার কেবিনে শামা জ্যোতিঃ প্রজ্বলিত ॥
হাতা ও বাজুতে তার কত সামাদান ।
মকমল জরিতে ঘর বেহেস্ত মকান ॥
সোনার ডালেম্বে জারি লহন বুটার ।
খানে খানে চারিদিকে জ্বলিতেছে ঝার ॥
ছেহেনের চারি পাশে পাকা ইমারত ।
লোভিছে প্রভুর নাম জেকেরে তাবত ॥
শত শত আশেকান সে ঘর মাঝার ।
নানারূপে করিতেছে জেকের খোদার ॥
নানারূপে অলী আর নানান ফকির ।
নানারূপে ভঙ্গিমাতে করেন যিকির ॥
গাঞ্জা হোক্কা খায় কেহ জটা রাখে শিরে ।
গাজি আশা চিমটা কেহ চলে ধীরে ধীরে ॥
মেয়েদের মত কেহ করিছে ছেঙ্গার ।
গাইছে গজল গান গৎ সারিন্দার ॥
বেহালার সুরে কত গাইছে গজল ।
সেতারার টানে কত হয়েছে পাগল ॥
গাইছে তায়ফার সখি সুমধুর গান ।
আশেকের ঐ টানে হানিছে পরাণ ॥
ভূমি ধামে কত লোক গড়াগড়ি যায় ।
পাগড়ি খুলিয়া কেহ ফেকে মারে গায় ॥
কোরান পড়িছে কেহ হাদীস বয়ান ।

শুনিয়া আশেক লোক হইছে হয়রান ॥
আর কত ধুমধাম ওরোছের দিন ।
বেহিসাব কারবার কে করে তাইন ॥
ছফরের বার কিম্বা তের দিন হয় ।
দেখে এস বন্ধুগণ যার মনে লয় ॥
আদাবের সাথে আর তথায় যাইও ।
মিথ্যা হলে এস মোরে তবে গালি দিও ॥
বড় পীর দস্তগীর গাউসে আজম ।
আরশ মঞ্জেল যার ছফরে আলম ॥
দর্গা মাজার যার রৌশন গোলজার ।
স্থানে স্থানে ইমরাত চৌদিকে তাহার ॥
বহুতর মাঠ ভূমি তাহার ছেহেনে ।
হাজার হাজার লোক রহেন সেখানে ॥
রাত্রেতে মোমের বাতি জ্বলিতেছে ঝার ।
সামাদান দেওয়াল গির কাতারে কাতার ॥
জরি ও মখমলে ঘেরা মোরাব্বা নূরানী ।
জালওয়া করিছে নূরে আরশ রব্বানী ॥
ওরোছের দিন তান হাসরের শান ।
দেখিয়া লোকের খুবী আলম হয়রান ॥
জেকেরের রোল তায় শানে কেয়ামত ।
আওয়াজ ধরিছে জোরে শুনিলে হায়বত ॥
মোজাদ্দেদ আলফেছানি হাবিব আল্লার ।
আপ্তাব বলন্দি নূর আকাশ মাঝার ॥
তাহার মোরাব্বা নূরী জরী ঝালরের ।
সোনার মেরাপ ঝুমকা দেওয়াল আঙ্খোর ॥
খোদার আশেক আর নবীর দেলবন্ধ ।
পাক্কা ছেহেন দর্গা শহর ছেরহিন্দ ॥
দিল্লির শহর ঘর শোভিছে সুন্দর ।
শতে শতে ইমারত মাজার কবর ॥
হিন্দুস্থানে নানা দেশে কত কব নাম ।
কোন ঠাই বাকী নাই আলম তামাম ॥
বাঙ্গালাতে বর্দ্ধমান চব্বিশ পরগনায় ।
আশে পাশে চব্বিশ জিলা শহর কলকাতায় ॥
কত রঙ্গে সাজ শোভা কবর মন্দির ।
মাওলা আলী, কবল আলী বাবা জুমন পীর ॥

গোরক পীর, ফতে শাহা আর জামাল পীর ।
কত ঠাই পাকা গোর গম্বুজ মন্দির ॥
ঢাকা ধামে আজিমপুর ভিতরে কোব্বায় ।
লেংটা শাহী পাগল শাহী বাহের হাতায় ॥
মগ বাজারে লাল বাজারে অলীর বারাম ।
সাত রৌজা শহরেতে প্রকাশ তামাম ॥
পল্টনের বাহিরেতে রৌজা ঠাঁই ঠাঁই ।
নেয়ামত বুত সেকান মজ্জুব মনাই ॥
মিরপুরে শাহে আলী বোগদাদী সুলতান ।
বুজর্গির শানে যার আলম হয়রান ॥
পীর শাহা সুলতান দর্গা মদনপুর ।
নাছিরাবাদের মাঝে কামেল মশহুর ॥
শ্রীহট্টের জালাল শাহী দরগা গুরুধাম ।
বাজিল যাঁহার ডঙ্কা মল্লুক তামাম ॥
আরেফিন দর্গা আছে পাহাড়ের শিরে ।
যাত্রিগণ শিখরেতে রহে নদী তীরে ॥
ফরিদপুরে আলমচাঁদ জমির মামুর ।
বাজিল যাঁহার ডঙ্কা আওয়াজে ঝুমুর ॥
উদিত নক্ষত্র গুরু আকাশ মণ্ডলে ।
বলন্দ সেতারা যাঁর উলিছে কপালে ॥
গঞ্জেরাজ বলে নাম প্রকাশ যাঁহার ।
আব্দুল আজিজ গঞ্জেরাজ ব্যাখ্যা তাঁর ॥
বিক্রমপুর অধিনতা ফরিদে সামিল ।
ফরিদপুরের কিয়দংশ বিক্রমের মিল ॥
তাঁর বিচে আছে কত মঞ্জেল আরাম ।
জানি যাহা কহি তাহা একে একে নাম ॥
সিড্যা নামে গ্রামেতে দর্গা ফকির টোন ।
আবির ঠাকুর নামে প্রকাশ রৌশন ॥
মুসলমান হন তান ঠাকুর পদবি ।
লক্ষে লক্ষে আছে যার বুজর্গির খুবি ॥
ধানাই নামে গ্রামেতে সানূর মঞ্জেল ।
ধামসি ভূমে পাগল সাঁই ফকির কামেল ॥
তেলিপাড়া ছয় দর্গা এলাহির নূর ।
একস্থানে একখানে সমান জহুর ॥
মালাখানে দেওয়ান শাহা জাহান মাসুর ।

মৌলভী নামেতে বেটা ভেঙ্গে করে চুর ।
তুড়িল নূরাণী দর্গা রৌশন মঞ্জেল ।
অধীর না হয় নূরে কাফেরের দেল ॥
ধর্ম কর্ম যাঁহাদের ছিল বিদ্যমান ।
লক্ষে লক্ষে তাঁহারাই করেন সম্মান ॥
হিন্দু কি মোসলেম আদি গুণী মানী যাঁরা ।
এক বাক্যে এক কালে নতশির তাঁরা ॥
তুড়িল সোনার খাট নূর এলাহির ।
সে অবধি মান গুণ গেল মৌলভীর ॥
অলী অহঙ্কারে মান রবে না কাহার ।
পুত্র পরিজনে ধন হানী হবে তার ॥
মজলিশ শাহার গোর পাতরাল গ্রাম ।
মানাইর সাকিনে আছে দর্গা মন ধাম ॥
মনাই ফকির নাম যাহার মশহুর ।
বুজর্গির শান তার কত দূরে দূর ॥
বরিশালে খাঞ্জে পীর সাহে আরেফিন ।
জাগা জাগা কত নূর কে করে তাইন ॥
কুমিল্লাতে কল্লা শহীদ সরাইল অন্তর ।
লাল শাহা পাগল শাহা এক তত পর ॥
কাশেমপুরে বদ্দূ শাহা হুজুরিসা আর ।
বৈল ঘরে গুরুধাম মঞ্জেল যাঁহার ॥
বারেল্যাতে পীর মিঞা কুমিল্লা ভিতর ।
ভাওয়ালেতে শাহা মন্দির ঢাকার অন্তর ॥
সাহেব আলী সাহ আর দর্গা মাদার ।
মুল্লুক দাপট চোটে কাঁপিতেছে যার ॥
সাভাজপুরে কাছেম শাহা ধামে গঙ্গাপুর ।
কেরামত যাঁর জারি নূরণ আলা নূর ॥
চাঁনপুরে লাল শাহা নশ্বিনপুর ধারে ।
সুধারামে লেংটা শাহা দালাল বাজারে ॥
সন্দ্বীপের চাঁন শাহা আজমপুরি পীর ।
কাঞ্চনপুরে মিরন শাহা নূর এলাহির ॥
সাত রৌজা এক স্থানে সারি সারি শান ।
আকাশ গম্বুজে যেন উলিয়াছে চাঁন ॥
তার পরে যেয়ে দেখ নেদামে মোদাম ।
সূফী নূর মুহাম্মদ গোলজার বারাম ॥

উলিছে যাঁহার নূরে নূর মহাম্মদ ।
গণিয়া কে করে শান তার হদাহদ ॥
গণিবারে তার মান সাধ্য আছে কার ।
ফিরিত যাহার বাক্যে উজান ভাটার ॥
আহা কলি কোথা গেলি না দেখি স্বপনে ।
নাম রৈল শামে হায় রহিলি গোপনে ॥
নিশা জলে নাশা ভিজে দামে দম বন্ধ ।
ছিলি কোথা গেলি কোথা খেলা খেলি ছন্দ ॥
এ খেলায় গেলরে বেলা বেলা গেল হায় ।
নিশি ভোরে ঘুমে রৈলি দিন বয়ে যায় ॥
চিংরি সাহা নেদামপুরে মহাজনের হাট ।
দক্ষিণাংশে বাজারের ধরিয়াছে ঠাট ॥
সীতাকুণ্ডের পূর্ব কোণে বার আউলিয়ার ।
দর্গা ও মঞ্জেল শান বশন জাগার ॥
সে জাগা দেখিলে জাগে মনের বাসনা ।
ভিজে অঙ্গ স্বীয় সঙ্গ চক্ষু ও রসনা ॥
আহা পীর দস্তগীর কহ সমাদরে ।
কি লাগিয়া এসেছিলে জঙ্গল ভিতরে ॥
কে তোরে আনিল সাধু এ কানন মাঝে ।
কি দেখিলি কি শুনিলি ছোবে সন্ধ্যা সাজে ॥
আহা কি কানন তব শুভ জন্মে বল ।
এমন গৌরব সঙ্গে হইলি জঙ্গল ॥
কত শত মুনি জন এ গৌরব সনে ।
বিধাতা গুণের তারে ফিরিতেছে বনে ॥
তব অন্বেষণে নাম করিয়া স্মরণ ।
মরিছে মরিবে আর কত মহাজন ॥
থাক থাক শুভ ধাম সুধা গুন সারে ।
আসিবেন কত সখা তোমার দুয়ারে ॥
আসিবেন সখা যারা দিও পদে স্থান ।
রহিবে তোমার দ্বারে তাঁহার নেশান ॥
আহঃ হারে অদৃষ্টের এই ফলাফল ।
না দেখিনু না হেরিনু গাইনু গজল ॥
আপ্তাব রঙ্গ জ্যোত হেরিয়াছে যাঁরা ।
দেখিয়াছে চিনিয়াছে পাইয়াছে তাঁরা ॥
পাইয়াছে পায় যাঁরা পাবার কারণ ।

দেখিয়াছে দেখে যাঁরা দেখার দেখন ॥
চল মন বলি এবে বলন বোলার ।
বলবে তোমার বোল বলনে তোমার ॥
তারপরে চাটগাঁতে করহ নজর ।
ক্ষনেকে যাঁহার নাম হইল শহর ॥
এ জাগা পতঙ্গ নিশি নদী সরোবর ।
আছিল যাহার তীরে ফকির বদর ॥
সরাসরি সর যবে আসে পূর্বকালে ।
হুহু শব্দ সোরসার আকাশ পাতালে ॥
ইশারা করেন তায় আপন আঙ্গুল ।
সে অবধি ঐ সরে নাহি আছে বোল ॥
সে কথা বলিয়া আর নাহিক দরকার ।
মাজার গোলজার যার রৌশন খোদার ॥
আমানতে আমানত হল যেই মাল ।
আমানত নামে অলী খোদার জামাল ॥
টাউনের পরে আছে সে নূর আম্বুর ।
বলিছে চক্ষের সুরমা নূরে কোহে তুর ॥
অলী মাঝে শেখ নামে উপাধি যাঁহার ।
ফরিদ বলিতে গুরু হন সবাকার ॥
এভবে ফরিদ হেন আছে কোন জন ।
কে করিল জঙ্গলেতে এমত রোদন ॥
রোদনের চশমা রৈল ভূমে কূপ জারি ।
গাহিছে পরম কথা লোকে সারি সারি ॥
তার পরে আগে চল টিলা শির ধাম ।
ঐ দেখ কোব্বা নূর বাজিদ বোস্তাম ॥
নেশান গদ্দির স্থান জাগা বসনের ।
বানালেন খাদেমান ছবি কবরের ॥
সে ছবির খুবি নূর মোহিত রূহানী ।
অলীর এলাকা এই কেছমত বাতেনী ॥
তাই মদিনাতে গোর বিবি ফাতেমার ।
দুই রওজা দুই ঠাঁই হয়েছে তৈয়ার ॥
জেয়ারত করে লোক দোন কবরের ।
মোলাকাত পান তাঁর যে হন জায়ের ॥
দূর দেশ হতে যবে হয় জেয়ারত ।
স্বপনে কি খাবে দেখে কিম্বা কাশাফত ॥

কিম্বা পীর তাছাওর করেন যখন ।
যে যেমন তে তেমন পায় ফয়জ ধন ॥
তেমনি বসন জাগা মোরাব্বা নূরানী ।
রহিছে তাহাতে শুধু এলাকা রুহানী ॥
তাই তার জেয়ারতে দেয় যবে মন ।
পাইবে রূহানী দেখা যেমন স্বপন ॥
স্বপন নাহিক সেই দিদার রৌশন ।
মোলাকাত করে যেই জানে সেই জন ॥
তার আগে রহিয়াছে গাজীর আসন ।
আছিল গভীর বনে যার সিংহাসন ॥
মাদার পীরের চুলা রৈয়াছে অঙ্কিত ।
এলাকা গহিন বনে শান প্রজ্জ্বলিত ॥
লেমুয়া নামেতে গাও পূর্ব ধারে তার ।
আসন গৌছিয়া ধাম রৈয়াছে তৈয়ার ॥
কবরের ছবি খুবি গাউসে আযম ।
যাহার এলাকা লাগা তামাম আলম ॥
ইছাপুরে কামালাত আহাম্মদ পীর ।
নবী নামে নাম যার নূর এলাহির ॥
যাহের বাতেন যার নূর বেলায়েত ।
আছহাব বদর শান যাঁহার তাবত ॥
মুহাম্মদ হানীফ নাতি নবী মুস্তফার ।
মুহূর্তে ঘুরেন দেশ আলম ছাওয়ার ॥
রোখামের ছয় সাত মঞ্জেল দক্ষিণ ।
হেফাজতে দর্গা ধাম ধরা আছে চিন ॥
দর্গা মছজেদ কত কতবা আসন ।
দেশ ঘুরে পর্যটনে দেখিছে সুজন ॥
দেখিছে গহিন বনে আসন গাজীর ।
রহিছে বসন স্থান অলী ও নবীর ॥
ফেরেস্তা তাজিম যার করেন সদায় ।
হারে অন্ধগণে কভু নাহি দেখে তায় ॥
যাহার তাজিমে হয় তাজিম খোদার ।
হায়বতের জাগা স্থান নবী আউয়িলার ॥
ভেদিছে যাহার নূর আকাশ পাতাল ।
আরশ মন্দিরে নূর যাহার জামাল ॥
কলম আল্লাহর লেখা কলিমের বাণী ।

গাইছে গভীর গান সুরেশ্বর ধনী ॥
তুমি গুরু আছ ভাল আমি কেনে মরি ।
দয়া হেন কর তুমি যোগে যোগ তরি ॥
শুর ধামে তাঁর নাম রৈয়েছে অঙ্গিক ।
সুখে থাক সুখ মতি হয়ে হরষিত ॥
আশীর্বাদে সদা বন্ধু রহিও ভাজন ।
জীবিত রহিও সখা হইয়া মরণ ॥
তোমা সনে দুই বন্ধু আসনে তোমার ।
আদরে আসন লয় আসন মাঝার ॥
ঢাকার ওসমান নূর শাহাদাত বর ।
আব্দুল আজিজ সাধু সুদারামে ঘর ॥
এ তিন সাধুর টানে সাধু ফতে আলী ।
হাবিলাস মন সদা করিতেছে কেলী ॥
আহা গুরু কল্পতরু সুলতানে আযম ।
ফতে নামে ফতে সার মুল্লুক আলম ॥
ফতে সারে সুরেশ্বর ফতে দিও সার ।
থাকুক তোমার সার সংসার মাঝার ॥

নোয়াখালীর অন্তর্গত

সামপুরে দরগা নূর আলম মশহুর ।
জকিয়দ্দিন নামে সাহা নুরূন আলা নূর ॥
বড়ালিয়া গ্রামেতে থানে লক্ষ্মীপুর ।
নেওয়াজ আলী মুন্সী নামে এলাহীর নূর ॥
তার পরে সাম পাড়া মৌজার আন্দরে ।
গোপনে পুসিদা গুরু ছিল গুনসারে ॥
প্রকাশের কালে যদি আসিল সম্পাস ।
কত কালে দরগা ধাম করিলা প্রকাশ ॥

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত

সুরেশ্বরে সাহা মির সৈয়্যেদ মিরণ ।
প্রকাশে গোপন ছিল আখেরের ধন ॥
তন ছফিনা রৈছে বান্ধা লবে কলকাতায় ।
মন ছফিনা বাদাম দিয়া সদা আসে যায় ॥

সেই ছফিনার পাশিঞ্জার বড় গুরু পীর ।
পিছনে ধরিছে বৈঠা খাজায় খিজির ॥
মহাম্মদী ঘাটে ডিঙ্গা আসে আর যায় ।
সাত সমুদ্দুর পরে গিয়া লাগে কিনারায় ॥

মোর্শেদ কবর উদ্ধার সঙ্গের সঙ্গি ও রাহাদার

যে মুরিদ পরে পীর অধিকার হবে ।
রহিবে না ভয় ভীত পরকাল ভবে ॥
ইহকাল পরকাল উদ্ধারেন যেই ।
হাশরের কর কুঞ্জি মোর্শেদের এই ॥
যে দেশে রশিদ তালা খোলা গেছে যার ।
মোর্শেদী এলাকা জারি হইবে তাহার ॥
ছাবেত এজহার নূর করিবে জহুর ।
মোর্শেদের রূপ নূর আসিবে হুজুর ॥
মোর্শেদের পরে যদি পরিবে নজর ।
মনের আন্ধার যাবে হইয়া পসর ॥
ভীত মন ডর যদি হইয়া যাবে দূর ।
কবর এলাকা নূর হবে দূরা দূর ॥
নেক রূহু তার ঠাঁই হবেন প্রকাশ ।
আসিবেন নেক দূত লইতে তালাশ ॥
আসিবেন অলী আলী তাঁর মদদগার ।
বাতেন তালাশ ভেদ নবী আউলিয়ার ॥
খুসির তরঙ্গে খোলে সাগরের মূল ।
সে তরঙ্গে ভব মায়া পড়ে যাবে ভুল ॥
তরঙ্গ মুহিত সনে নেকামল যার ।
মোকাম বলন্দি ঘর খুলে দিবে দ্বার ॥
সে দ্বার খুলিলে তার পথের অন্ত নাই ।
যথা যাবে সঙ্গি সাথী রবে সব ঠাই ॥
সঙ্গীয় সারথী যথা মোর্শেদ মমিন ।
সঙ্গের সারথি সনে হইবে না ভিন ॥
আগে যাঁরা গেছে তাঁরা সঙ্গি হবে তার ।
সুখের বাসর হবে স্বর্গ অধিকার ॥
কবর এলাকা হবে স্বর্গ সুখ ধাম ।

যথায় রহিবে তার সকল আরাম ॥
যে ছেতারা যার দ্বীপ দুনিয়া সকল ।
রহিবে পরম সুখে তাহার ভিতর ॥
ছেতারা আলম দ্বীপ দুনিয়া সকল ।
দেখিতেছে যত ইতি করে টলটল ॥
বেহেস্ত দোজখ আছে এ তারার মাঝ ।
হইবে যাহার জাগা যেমন সমাজ ॥
এতারা হেরিছে যারা হেরে নিজপুর ।
দর্পণ মমিন দেল আরশ কাঙ্গর ॥
আরশ যাহার দেলে উজ্জ্বল দর্পণ ।
আরশের নূরে যার ছুরত মোহন ॥
পরকাল পরদেশ চিনেছেন সেই ।
আখেরাত আলামত মুমিনের এই ॥
পরম সুখের ঘর পরকাল দেশ ।
যে মুমিন মনপুরে হইবে খাহেশ ॥
উড়িবে বিরহ মন মাশুকের রসে ।
প্রত্যাশ সুখের সুখী যাবে সুখ দেশে ॥
পতঙ্গ বিরহ মন গমন সরল ।
নিজপুর যাইবার অভ্যাস গরল ॥
আকাঙ্ক্ষা যাহার মনে সুখের অঞ্চল ।
এভব গৌরব তার বিরস চঞ্চল ॥
এভবের লোভ রস রহিবে না মনে ।
গৌরব সুখের দিন যাব কত দিনে ॥
বিরাজিবে সুখ রস যাহার অন্তর ।
সুখ দেশ বিমোহিত চিত্ত কলেবর ॥
এভবের সুখ শান্তি রহিবে না মনে ।
বাসনা রহিত দেশ যাব কত দিতে ॥

রেয়া, কেনা, হাছদ গং ইহারা দশ জন শরীরের রিপু থাকা বিধায় প্রত্যেক শরীরের মধ্যে দশটি স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাই রাজ্য সঙ্গে তুলনা করা হইল ।

দশ রাজ্যে দশ জন আছে রাজ্যেশ্বর ।
হাকেম হোকামাগণ সৈন্য সেনাবর ॥
বিধর্মীর গোত্রে তারা ধর্ম লেশ নাই ।
সে সংসারে কার নাই ধর্মের দোহাই ॥
কিন্তু তারা ধর্ম বেশে সত্য উল্লাসন ।

করিয়া সত্যের সার করিছে গোপন ॥
ঈমান লুটিয়া নিতে সাধু সন্ন্যাসীর ।
দিয়াছে রাজত্ব ভার শাসন তদবির ॥
গাইছে চিকন সুর নরম জবান ।
মিষ্ট মিষ্ট বাক্যে ধন লোভিছে পরাণ ॥
সাধু হতে সাধু তারা পুরুষ উত্তম ।
এক হতে এক বেশী নম্রপূর্ণ মোম ॥
রাজা প্রজা মন্ত্রীগণ উজির নাজের ।
ধর্ম রূচী গান যেন মুখে তাহাদের ॥
করিছে নেকের সুরে নেকের ওয়াজ ।
নেক বিনা নাই কার মুখের আওয়াজ ॥
বলে যদি হরে নিতে না পারিবে ধন ।
কলে ছলে মায়া মুগ্ধে করিবে হরণ ॥
যে অফিস যেই স্থানে দেওয়ান কাচারী ।
বসা আছে চৌকিদার ঘাটে সারি সারি ॥
সাজিছে ধর্মের সাজ লেবাছ সুন্দর ।
আবা কাবা পাগ শোভা মালা মনোহর ॥
কেতাব ধর্মের সাজ ভারত পুরাণ ।
ধরিছে ওয়াজ সুর হাদীস কোরান ॥
দেখিয়া এসব সাজ ধর্ম লোভী যারা ।
পতঙ্গ প্রদীপ জ্যোতে পড়িতেছে মারা ॥
না জানে তাহারা এই ঠগের দোকান ।
ঠগিছে লোকের ধন হানিছে পরাণ ॥
যদি কেহ সন্ধান পাইয়া থাকে তার ।
পড়ে না ধোঁকায় তার রহে হুসিয়ার ॥
সাধু অলী নেক যেই রাসেদ সুজন ।
চিনিছে ধোঁকার দেশ রাজ সিংহাসন ॥
সঙ্গিগণ সঙ্গে লিয়া যেতে দূরাদূর ।
অধর্মের পুরী পিছে রেখে ভূরাভূর ॥
এক রাজ্য ছেড়ে যদি অন্য রাজ্যে যায় ।
এক পরে এক দেখে সাধু জামা গায় ॥
হরিতে লোকের ধন পাতিয়াছে জাল ।
নরম মেজাজ শান সুরত জামাল ॥
ভঙ্গিমাতে না পারিলে ক্রোধভরে কয় ।
মার মার মার বলে দেখাইছে ভয় ॥

যদি না শুনিল সাধে তাদের দোহাই ।
চলহ ধর্মের বালা আর ভয় নাই ॥
তার পরে এক রাজ্য দেখে চমৎকার ।
মিলিছে সুন্দর এক ধর্মের বাজার ॥
যে দিক নয়ন হেরে আঁখি ঠরে নাই ।
ধর্মপুরী এই হবে এই ধর্ম ঠাঁই ॥
সঙ্গিগণ ছিল যত বলে কোথা যাব ।
এরূপ গৌরব দীন কোন দেশে পাব ॥
চল এবে মুরিদ হইবে পীর হাতে ।
ছাড়িলে এমন দিন পড়িবে আফতে ॥
সত্য সাধু বলে এই ধর্ম রাজ্য নয় ।
চলহ আমার সঙ্গে না করিবে ভয় ॥
বলে নয় সঙ্গিগণ একথা কেমন ।
শুনি নাই কভু হেন মধুর বচন ॥
ডাকিছে সার্থক ডাক ধর্মের আচার ।
লোভিছে আমার মন আল্লাহু আকবর ॥
যে জন পড়িল ফাঁদে রহিল সেজন ।
মুরিদ হইল ভুলে দেখিয়া স্বপন ॥
বাকী যারা ছিল তারা অগ্র পানে যায় ।
দেখিল ধর্মের খুবী ধর্ম রাজ্য তায় ॥
করছে ধর্মের গৃহে ধর্মের বাসন ।
দীনের আলাপ দেশে তার সিংহাসন ॥
ওয়াজ আওয়াজ তার হাদিস কোরান ।
দেস্তার ধরিছে ছেড়ে আলেম প্রধান ॥
কত শত দিগে পাশে খলিফা জোগার ।
যে যেমন তার সনে করে কারবার ॥
বলে ধর্ম এই ধর্ম আর ধর্ম নাই ।
ধার্মিক রাজ্যের আগে চল এবে যাই ॥
খেলাফত দিবে আর জোরা অলীর ।
পৃথিবীতে হেন মান কোথা আছে পীর ॥
সঙ্গিগণ বলে হায় হেন দেখি নাই ।
ছাড়িয়া এমন গুরু কোথা যেয়ে পাই ॥
জেন্দেগীর তরে আমি হইব খাদেম ।
যায় যারা যাউক তারা হইবে নাদেম ॥
মূল সাধু সাধ যার ধর্মের অঙ্কুর ।

ধর্ম রস তার মনে করিছে জহুর ॥
বলে এই ধর্ম নয় বটে ধর্ম চোর ॥
চলহ ধর্মের দেশে সঙ্গি হও মোর ॥
না আছে দীনের লেশ চক্ষু কর্ণ নাসা ।
দেখিয়া অধর্ম দেশ ধর্মই ভরসা ॥
ছাড়িয়া অধর্ম রাজ্য ধর্ম দেশে যাব ।
ধর্ম রৈলে ধর্ম জয় সঙ্গে সঙ্গে পাব ॥
ছেড়ে গেল ধর্ম বলে অধর্মের স্থান ।
পৌছিল সারথী সার খোদা মেহেরবান ॥
এক দুই দশ ধামে এড়ায় জঞ্জাল ।
পৌছালেন রাহাদার সামাল সামাল ॥
পথে যদি ধর্ম সাজ না রৈত পশর ।
ধর্মপূরে বরাবর যেত দরাদর ॥
রাশেদ বিহনে তাহা চিনা মহা দায় ।
ধর্ম আশে ধর্মীগণ পন্থে যারা যায় ॥
ধর্মবাসে ভিক ভেক না আছে কখন ।
মন সরে পরিপূর্ণ আপনি আপন ॥
যদি ভেক করে দেখ মন রস সার ।
মন রসে বেশ ভূষা সকলি অসার ॥
درعمل کرش هرجه خواهی
پوش تاج برسرو علم بر دوش
আমলে কোশেস যার বেশ ভূসা তাঁর ।
কর তাহা চাহ যাহা নহে গুণাগার ॥
সার সার সার তাঁর মানসিক মাল ।
অমানসে মন রসে লোভের কাঙ্গাল ॥
কাঙ্গাল লোভের মনোবাঞ্ছা রসে ।
সে লোভ জঞ্জাল হয় মনের অলসে ॥
মনের বিকাশ লোভ রস রসাঞ্জন ।
ঘষিলে দেখিবে চক্ষে ধর্মের অঞ্জন ॥
আসন রসন রস ধর্মের বাসনা ।
সে রস হেরিলে কার রবেনা যাতনা ॥
যাতনা যাহার টুক রসের জোগার ।
সে রস লোভিলে লোভ রবেনা গো আর ॥
সে রস যাহার দেশ উপদেশ তাঁর ।
উপদেশ রসে রস সকলি তাহার ॥

সঙ্গের সারথী যার নাহি এই ভবে ।
পাইবে না রস দেশ রস পাবে কবে ॥
রস লোভে যায় যেই লম্বা রসনায় ।
রস নামে কষ ঘষে জিহ্বার মাথায় ॥
দশ রিপু যার ঘরে সঙ্গি আছে যার ।
রিপু দেশে অধর্মের কেবলি জোগার ॥
রেয়াকেনা হছদাদী লোভ মদ যত ।
ধর্মনাশে ধর্ম ভেকে ধর্মে করে হত ॥
ধর্ম পথে দিছে মন ধর্মের সাগর ।
পাগ টুপি আবা কাবা রেয়ার নাগর ॥
চিকন চতুর রেয়া কোপায় উদ্দিস ।
লবণ বিটনে রান্ধে বানাইল বিষ ॥
পাগ টুপি সুন্নতের যত সরঞ্জাম ।
রেয়া বিষে এককালে হইল হারাম ॥
হারামে আরাম নাই খোদার দরবারে ।
হারাম যাহার পাগ রাখ নাহি তারে ॥
এপাগ রহিলে মাথা রহিবে না আর ।
দোজখে জ্বলিয়া খাল যাইবে মাথার ॥
রেয়ার রাজত্ব ভারী আরকান দৌলত ।
দেওয়ান কাচারী থানা নানা ফজিলত ॥
রেয়া রাজা আপনার সিঙ্গে দিয়া ভার ।
ধর্ম পথে ধর্ম সাজ সকলি তাহার ॥
ডাকিছে রেয়ার গৌরী কাঞ্চনের সুর ।
এস এস দীনদার এই দীন পুর ॥
গাইও দীনের গান শিখহ কোরান ।
লইও আখের পন্থ হইবে গেয়ান ॥
এ পন্থে ধর্মের কান্তে পাইবে সরল ।
পাইবে না বিনা ইহা সকলি গরল ॥
নফছ যোগে শয়তান যোগ মিলে যোগাযোগ ।
বিনাশে দীনের রস করিতেছে ভোগ ॥
দীন নামে দিয়া ঢোল দীনের বাজার ।
মিলিছে দীনের ঘর কাতারে কাতার ॥
যেই আসে সেই কহে এই দীন পুরী ।
উপরে দীনের কাম ভিতরেতে চুরী ॥
না পাইল টের তার নফছ রস বসে ।

না গেল রসেদ আগে মনের অলসে ॥
তাই লেখা গজ্জালীর এহিয়া ভিতর ।
জাহেরান এ বিদ্যার রাখে না খবর ॥
নফছের এলেম যাহা শয়তানের কাম ।
নাহি জানে জাহেরান আলেম তামাম ॥
হিতে বিপরীত হয় কিমিয়া সোনার ।
মোরগের উমে ছানা না হয় আণ্ডার ॥
যদিও রেয়ারপুরী পিছে ফেলে যায় ।
কেনা কুট হতে বাঁচা হবে মহা দায় ॥
নেক দেখে নেক কেনা শেখ দেখে শেখ ।
পীর দেখে পীর কেনা আলেম প্রত্যেক ॥
ধন্যবাদ কেনা রাজ্যে তোমারি আসন ।
গুরু রাজ্যে কেনা কসা শিষ্যই ব্রাহ্মণ ॥
কেনা কুটে দংশিলেন যাহার অন্তর ।
কাল বিষ নাহি খণ্ডে পড়িলে মন্তর ॥
কেনার চিকন বেনা কে বুঝিতে পারে ।
কেনা নাই যেই ধর্মে ধর্ম বলি তারে ॥
কেনা শিরে পদ দিয়া যদি কেহ যায়
হছদ এড়ান কাণ্ড হবে মহা দায় ॥
যে যাবত হবে শান্ত হছদের থালি ।
হবে না দীনের কান্ত কলঙ্কের ডালি ॥
দীন নামে দীন বন্ধু আত্ম হবে যার ।
হইবে ধর্মের বন্ধু এ ভব সংসার ॥
আদাওত কেনা তার রবে না কখন ।
হইবে সরলপুণে মনের রঞ্জন ॥
আদাওত বদবালা সঙ্গেতে অলীর ।
লড়ন খোদার সনে হইবে কাফীর ॥
আদাওত শিরে যদি পদ দিয়া যাবে ।
লালসের রাজ্যে গিয়ে উপনীত হবে ॥
সে রাজ্য লালস কার্য উত্তম অধম ।
সকলের মনপুরে লালস গরম ॥
সিংহাসনে আরোহণ সে বাজার লাল ।
চকবাজারে দেশ ধামে জ্বলিছে মোসাল ॥
সে মোসালে পতঙ্গের বাড়ে অনুরাগ ।
মরিছে পতঙ্গগণ দেখিয়া চেরাগ ॥

পীর হতে পীর এই ধর্ম রাজ্যে ভার ।
ধরহ পীরের হাত তামাম সংসার ॥
সুন্নতের পীর এই সুন্নতের রস ।
সাজ শোভা যত ইতি সুন্নত সরস ॥
রসুলুল্লা তক মেলে সনদ যাঁহার ।
কে আছে এমন পীর বলহে আবার ॥
এ পীর খেলাফ যেই সেই পীর নয় ।
তাড়াও তাহার তরে যথা মন্দচয় ॥
সত্যই লালস গুরু হন সবাকার ।
কে আছে এমন পীর এ ভবেতে আর ॥
লালসের লালাইত শোভা সাজ লাল ।
ধরিছেন লাল কান্ত সুরত জামাল ॥
মনপুরে মন রস যাহার গরম ।
সাজ শোভা তার পার্শ্বে কিসের ভরম ॥
হয় সাজ হউক সাজ সাজে কাম নাই ।
সাজিছে আসল সাজ সুরত মনাই ॥
নবী বরে সাজ শোভা দেখিয়াছ কবে ।
সুন্নতের সাজ শোভা কোথা পেলে এবে ॥
লালসের সাজ শোভা মুখে লম্বা দাড়ি ।
লালসের অনুরাগ লালস শিকারী ॥
ধন্যবাদ লাল সাই শত ধন্যবাদ ।
সকল ধর্মের রান্ধে তোমারি সংবাদ ॥
কিন্তু যেই দীন লোভী দীনের স্মরণ ।
করিছে ধরিবে নয় তোমার চরণ ॥
স্বার্থক দীনের খুবি যার সনে আছে ।
যাইবে স্বার্থক বর স্বার্থকের কাছে ॥
স্বার্থক তাহার পীর হবে দস্তগীর ।
লালস যাহার আগে নোয়াইছে শির ॥
দশ রিপু যার পন্থে কণ্টক বিশাল ।
হইছে না হইবে না হবে কোন কাল ॥
পথের পথিক তারে ধরহে নাগর ।
সঙ্গের সারথী এই রাশেদ সাগর ॥
قوله تعالى
والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم
চাহে যারে দেয় তারে সিদা রাহা তার ।

মদদ মোর্শেদ নূর অলী আউলিয়ার ॥
قوله تعالى
يضل من يشاء ويهدى من يشاء
গোমরা করে চান যারে হেদায়েত করে ।
ভাল মন্দ আসলেতে খোদা বরাবরে ॥
রেহাই করিবে যারে কেবা মানা করে ।
দেখিয়াছ হেন জন কে আছে সংসারে ॥
মাফ কর পাক সাঁই পাকের সংসার ।
নাপাক করিতে পাক কেবা আছে আর ॥
কিন্তু যেই লালসার লয়েছে মন্তর ।
তাড়াইলে দ্বীপে ঘর হইবে পশর ॥
দশ রিপু ভাগ্য গুণে বশ হবে যার ।
রৌশন হইবে ঘর এ ভব সংসার ॥
দশ দেশ পাক গৃহ পার হবে যেই ।
হেরিবে ধর্মের দেশ ধর্ম দেশ সেই ॥
সে দেশ ধর্মের দেশ ধর্ম অনুরাগ ।
উলিছে আকাশ তারা জ্বলিছে চেরাগ ॥
পাইবে পাপের লেশ পাপের নিশান ।
চিনিবে দীনের ঘর দীনের সম্মান ॥
ধর্ম সাজে রিপুগণ যত রাজ্য ধর ।
মানিবে তাহার দীন ভাগিবে সত্ত্বর ॥
খেলওয়ারের খেল ছিল জুয়াচুরি তাস ।
দিন নামে রিপুগণ করে সর্বনাশ ॥
চিন দিলে পালাবার আর সাধ্য নাই ।
থাকিবে নেকের দেশে নেকের দোহাই ॥
কর যাহা করিবার সময় করার ।
শুভ গৃহে শুভ ফল ফল অবিচার ॥
আবা কাবা পাগ টুপি সুন্নতের সাজ ।
সুন্নতের জাগা এই সুন্নতের কাজ ॥
না পারিতে ইতিপূর্বে সুন্নতের খুবি ।
না পারিল অলীগণ না পারিল নবী ॥
রিপু জর্জরিত যেই সদা সর্বক্ষণ ।
করিতে না পারে যেই রিপুর দমন ॥
পাগ দিলে নিজ শিরে রিপু শির তায় ।
অনুরাগ রিপুগণ শিরে শোভা পায় ॥

ছাওয়াবের কামে রেয়া ঠেকায় হেজাব ।
রিপুগণ ছাওয়াবেরে করিছে আজাব ॥
দশ রিপু দশ দেশ শরীর মঞ্জেল ।
রিপু বসে খোদা দেশ হইবে হাসেল ॥
রিপু বসে পীর চাই সহা সরঞ্জাম ।
ছড়াইবে রেয়া কেনা হাছদ তামাম ॥
রিপুগণ দমনের নফসের লড়াই ।
জেহাদ আকবর এই হাদীসেতে তাই ॥
রিপু বসে পীর চাই সহা সরঞ্জাম ।
ছাড়াইবে রেয়া কেনা হাছদ তামাম ॥
মরিলে কাফের হাতে শহীদ সে কম ।
মারিলে নফছেরে হবে শহীদ আযম ॥
নফছেরে মারিলে হবে নিজের মরণ ।
রেয়া কেনা রহিবে না যাবত জীবন ॥
করিবে না কারে কভু খোঙ্কা নছিহত ।
লইবে না কার কভু খোঙ্কা খেলাফত ॥
চলিবে না চাল কভু খোঙ্কা রস বসে ।
হইবে না বস কভু খোঙ্কা মধু রসে ॥
ধরিবে না পেচ পাগ মাথা ছের তাজ ।
সাদা সিদা কাম তাঁর আল্লার নেয়াজ ॥
হয় পাগ হউক পাগ সুন্নত নবীর ।
না হইলে তালাসিবে বাতেন খুবীর ॥
বাতেন এলাকা নবী সুন্নত নেকের ।
নহে পাগ শিরে দিলে সুন্নত নফছের ॥

বিরহ

এসে ছিলাম ভব সাগরে, সাগর খেলা কল্লাম তায় ।
এসে ছিলাম ভব সাগরে, সাগর খেলা কল্লাম তায় ॥
জল তরঙ্গ আসে যায় আর,
জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
পিতা মাতা পিতঃ পিতাঃ সকলে খেলিছে তায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
জল কেহ ঘোলে কুলে কেহ ঘুম পাতালে যায় ॥
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥

কার নিন্দে প্রাণ কাঁন্দে, কার হিয়া জ্বলে যায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
সন্ধ্যাকাল নাও ডুবিল অঙ্কুরে কাঁদিছে মায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
আহা নৌকার মাঝি কেঁদে বলে ডোবল নৌকা হায়রে হায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জর তরঙ্গ আসে যায় ॥
তাত গরিল ডিংগা ডোবে ডোবে গলই দারির কি উপায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
দুই ধারে দুই রক্ষী মাঝি তারা জলে ঝাম্ফ খায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
আরী মাঝি পেশেঞ্জার তাদের দেহ তরী ভেসে যায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
মাথা উভি জলতরঙ্গ ডোবল তরী হায়রে হায় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জল তরঙ্গ আসে যায় ॥
ভব সাগরে ডোবল তরী তোরা দেখবি কারা আয়রে আয় ।
জল তরঙ্গ আসে যায়, আর জলতরঙ্গ আসে যায় ॥

বিরহ

শুইয়া শোয়াইয়া গেলি শয্যা বসুধাম ।
ভুগিয়া ভোগাইয়া গেলি চিরশ বেরাম ॥
দুঃখ পেয়ে দুঃখ দিলি হারে চির দুঃখ ।
সুখ হর সুখ হরে নিলি সর্ব সুখ ॥
উজ্জ্বল নক্ষত্র চক্ষু হরে চক্ষু ধন ।
হরিল মস্তক পুঞ্জে মাথা কুঞ্জবন ॥
হরে নিল কর্ণ নাশে মম কর্ণ নাশা ।
দেহ পুঞ্জ নিল তব এ দেহ ভরসা ॥
বাহু হরে নিল তব এ বাহুর বল ।
পদ হরে নিতে পদ হইল অচল ॥
আঙ্গুল কমল তব হরে নিল হাত ।
খসিল কলম নখ চিরুনীর দাঁত ॥
সুবচনে হরে নিল মুখের বচন ।
সুগমনে হরে তব সারদা গমন ॥
সুগেয়ানে হরে তব গেয়ান সরল ।
সামর্থ সঞ্চয়ে নিল এ দেহের বল ॥

মধু হাস্যে হ'রে নিল এ হাস্য বদন ।
কৌতুকে শুষিয়া নিল হৃদয় বেদন ॥
মন দিয়া মন হর হিরামন পাখী ।
কেমনে মাটিয়া দেহে প্রাণ পাখী রাখি ॥

বিরহ

গুরু ক্ষেত্রে তব দশা তাঁরা শিরোমণি ।
বুধের মঞ্জেল লেশ শনির রজনী ॥
তাই তব রাজ নূর শশীর মণ্ডল ।
শত শত শিরা কাশে করে টল টল ॥
অতএব হৃদ দেশে বিধি সিংহাসন ।
অল্প কালে শক্তি পুঞ্জ ভেদিছে গগণ ॥
রাজশক্তি একোকালে শরীর মণ্ডলে ।
বিধিগতি তেকারণে ছিল অল্পকালে ॥
ইহকাল পরকাল সঞ্চয় কারণ ।
মুহূর্তে বিরহ তেজ ছিল না বারণ ॥
আছিল সুখের শয্যা মাটি অনির্বার ।
ছিল না বিছান গদি কখন তোমার ॥
শীতের দাপটে পুষ্প হৃদ বিচলিত ।
গরমে বরফ ন্যায় রৌদ্রে প্রগলিত ॥
জীবনে রসের খাদ্য কর না ভোজন ।
শেষকালে চাহ প্রিয় আম্র আস্বাদন ॥
সেকালে তোমায় বৎস নাহি দিনু আম ।
কলেজা বিন্ধিল বান সে আমের নাম ॥
থাক বৎস সুখে থাক পৃথিবী অসার ।
কার জন্যে কাঁদ মনু কেবা ভবে কার ॥
যে বাসনা ভব খেলে রহিল তোমার ।
ইহকালে পূর্ণ কিহে হইবে আবার ॥
চিত্ত দূর না করিও ওহে বৎস ধন ।
চিরজীবি ইহ ভবে নহে কোন জন ॥
আগে গেলি আগ ভাগে আগের সঞ্চয় ।
ধন্যবাদ সুখে রহ দিয়ে পরিচয় ॥
যে জন তোমায় ডেকে নিল আচম্বিত ।
রহ বালা তাঁর সনে হয়ে হরষিত ॥

বিরহ

এই কি সুন্দরময় ভবের বাগান ।
হেরিলে যাহার পানে জুড়ায় পরাণ ॥
সারি সারি বৃক্ষ আদি ভবের মাঝার ।
আহা কি ধরিছে সাজ জুড়িয়া সংসার ॥
ডালে ডালে সাজে শোভা পাতায় পাতায় ।
বৃক্ষে বৃক্ষে সাজ শোভা লতায় লতায় ॥
কতই সুন্দর বন কতই সুন্দর ।
হেরিলে নয়ন সুখ বিভোর অন্তর ॥
পুষ্পরাশি শাখা শিরে যেন শোভাকর ।
শোভিত করিছে কুঞ্জে এ বন সুন্দর ॥
ঝিলে পদ্ম শোভাকর শাপলার শিরে ।
খেলিছে তরঙ্গগণ এ জল গভীরে ॥
পৃথিবী জুড়িয়া আছে বন ভয়ঙ্কর ।
কে করিল হেন বন সংসার ভিতর ॥
যে জন করিল এই ভব পুষ্প বন ।
হৃদ পুষ্পে দাও পুষ্প তাঁহার আসন ॥

আদিতন

খাক তনের আদিতন ধৈর্য্য সহ্য গুণ ।
পরম গুণের গুণ যাহাতে নিপুণ ॥
পর ধরম গুণে জগৎ নির্ম্মাণ ।
করিয়া প্রকাশ তায় নিজ সম্মান ॥
এ জগতে গুণ অন্ত ক্ষান্ত নাহি যার ।
আদি অন্তে অন্ত সার মহিমা তাহার ॥
মহিমা কেবল তার গুণের সঞ্চার ।
এ মণ্ডলে শত শত দেখ বারে বার ॥
মূলে নিরাকার গুণ আকার ধারণে ।
লক্ষ লক্ষ কমল আদি ফুটিতেছে বনে ॥
ললিত কমল দল সুন্দর বসন ।
ধরিছে মেঘের সাজ জুড়িয়া কানন ॥
বসন কাননে মেঘ সুন্দর সকল ।
বিজলি সমান কুঞ্জ করে ঝলমল ॥
মৃত্তিকা মাতার পেটে এরূপ সুন্দর ।

ধৈর্য্য গুনে সন্তানেরে দিছে তাই বর ॥
এস এস আদি গুণ হৃদে কর বাস ।
যেই স্থানে যেই গুণ করহ প্রকাশ ॥

সান হেন শাহে আলমে হকিকত গৌহরে একতা মদনে মারেফৎ রশিদে রাশেদ ও কোতবে এরশাদ হযরত মাওলানা মোর্শেদানা শাহে ফতে আলী সাহেব মাগফুরের সন ১২৯৩ সাল মাহে আশ্বিনে ইহধাম পরিত্যাগ সম্বন্ধে বিরহ

মনে আসে আশ্বিন মাসে জুড়িয়া আকাশ ।
লক্ষ লক্ষ তারাগণ ছোটে পাশাপাশ ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে তারাগণ ছুটিয়া বেড়ায় ।
এক দিক হতে তারা আর দিকে যায় ॥
আগত হইতে নিশি লাগাত প্রভাত ।
দিকে দিকে তারা খেলা ছিল সারা রাত ॥
ঘর বার আমাদের ছিল আগমন ।
ছিল না মনের শান্তি শরীরে বসন ॥
হুতাসে মনের শান্তি নাসিতে কেবল ।
নিশি ভর ছিনু সবে যেমন পাগল ॥
অশান্তি হইল মম ধৈর্য্য অনুকূল ।
শান্ত শীল ছিল মন হইবে আকুল ॥
তার পরে শীঘ্র গতি কলকাতা নগর ।
সেবিবারে পীর পদ মন কলেবর ॥
এ বিরসে ধৈর্য্য সহ্য রহিল না আর ।
মনে আশা জিজ্ঞাসিব নিকটে পিতার ॥
একদিন জিজ্ঞাসিনু আগে গুরুপিত ।
আদেশিবে আশীর্বাদ মন আছে ভীত ॥
এইরূপ কেন দেখি আকাশ মণ্ডলে ।
শুনি নাই দেখি নাই কভু কোন কালে ॥
নির বাক্য রণ পীর না করিয়া বাণী ।
আছু আঁখে চক্ষু হতে নিকলিল পানী ॥
মুহূর্তে রাহুর মেঘ এ চন্দ্র কপালে ।
পূর্ণিমাতে দাগ চিহ্ন প্রকাশিল ভালে ॥
অধির হইয়া পুনঃ দেন আশীর্বাদ ।

শুন শুন বৎস ধন বিদায় সংবাদ ॥
কেহ না রহিবে ভবে কাজা এলাহির ।
যেতে হবে একদিন ত্যাগিয়া শরীর ॥
বন্ধু বিনা রক্ষা যার নাহি এই ভবে ।
বন্ধুই বান্ধব তাঁর বোলাইলে যবে ॥
মিলিবারে বন্ধু সনে মনের বাসনা ।
পুরিবে মনের সাধ ঘুচিবে যাতনা ॥
তাই অতি শীঘ্র গতি এক দেল বর ।
ত্যাগিবে এ মায়া পুঞ্জ দেখিবে সত্ত্বর ॥
অতএব দূতগণ ফিরিস্তা আল্লার ।
খুশির নিশান তোলে মাফিক তারার ॥
লক্ষ লক্ষ দূতগণ তার আগুয়ান ।
সেই জন্য দেখ বৎস এইত সম্মান ॥
ভীত পদ দাস কহে করিয়া প্রণাম ।
হাফেজ জামাল তাই ত্যাগে এই ধাম ॥
বলে নহে বৎস ধন সে হাফেজ নয় ।
দেখিবি ক্ষণেক কালে হইবে প্রত্যয় ॥
একেলা আছিনু দাসে কহেন একেলা ।
একেলা সদায় মনে রহে কহা বলা ॥
আশ্বিনের শেষ পক্ষে মোর্শেদ আলম ।
প্রকাশিলা নরাধমে আল্লার কলম ॥
এ ঋতু হেমন্ত কার্ত্তিক কাল যায় ।
আগন আগতে শীত পাইবে না হায় ॥
সমন সংহারে কান্তে করিল গমন ।
বাজিল ছফর ডংঙ্কা হইবে চলন ॥
বাজিলে ছফর ডংঙ্কা কে রহিতে পারে ।
আলবেদা আলবেদা নর কহ সমাদরে ॥
এক দুই তিন যায় বিগত আঘন ।
না রহিবে বিশ ক্ষেত্রে পৌঁছিলে সমন ॥
আট, নয়, দশ, যায় বিশ আঘণের ।
এ দম ভরসা শান্তি হইল আখের ॥
চলিল খোদার বন্ধু নিকটে খোদার ।
মুহূর্তে পরাণ পাখী ছাড়িল সংসার ॥
বিশেতে বিষম ক্ষেত্র উপনীত বাস ।
কাঁদিয়া অধীর মন হইল তরাশ ॥
কি দেখিলাম কি হইলাম কি হইব আর ।

কেমনে জীবিত রব এ ভব সংসার ॥
কোথা হৈতে পেয়েছিনু কোথা চলে যায় ।
কোথা হতে দিল দেখা আছিলা কোথায় ॥
অহরহ যার সাধ ছিল না বারণ ।
সে সাধ ভুলিবে কিসে হইল কেমন ॥
কেমনে চলিলে বন্ধু কে হরিল তোরে ।
আসহে আমার নাথ দেখা দাও মোরে ॥
কে নিল হরিয়া হারে এলাহির নূর ।
কোথায় ছাফিল হাঁরে নূর কোহে তুর ॥
কেমনে ডুবিল হরে আখেরি ছফিনা ।
কোথায় ভাসিয়া গেল গোলজার মদিনা ॥
কে করে গারূব হনে এ নূর বিম্বর ।
কে করে বিলোপ হারে চন্দ্র শোভাকর ॥
কি লাগিয়া খসে গেল আকাশের তারা ।
কি লাগিয়া লোপ হল নূরাণী ছেতারা ॥
কি কারণে গোম হল আকাশ মন্দির ।
কে করিল অন্ধকার নূর এলাহির ॥
আছিল খোদার শান যে শান বান্দার ।
কে হরিল সেই শান ভূবন আন্ধার ॥
জাগনে দেখিনু কিবা দেখিনু স্বপন ।
জীবিত রহিল কিবা হইল মরণ ॥
মনে বুঝি স্বপন দেখিনু এইবার ।
আসিবে আমার পিতা দেখিব আবার ॥
দুচক্ষু মুদিত দেখি নিশির স্বপন ।
ভাসিল জোয়ার জলে চক্ষের অঞ্জন ॥
ছুটিল নয়ন তাঁরা চক্ষের পুতলি ।
কেমনে হইল লোপ হৃদপিণ্ড কলি ॥
অধির হইয়া কাঁদে তোমার বাসনা ।
মধু স্বরে কর বাণী খুলিয়া রসনা ॥
কেনে হারে চঞ্চলতা তোমার এমন ।
আচম্বিতে কেনে সখা হইলা গোপন ॥
মাতা পিতা ত্যাগে যার সঙ্গের সঙ্গীন ।
কেমনে তাহাকে দূরে করে দিলা ভিন ॥
ভবে আর এ ভবে কে সারথী আমার ।
আহা পিতঃ আহা গুরু সঙ্গে যাব কার ॥
নৈরাশ করিলে কাহে অবোধ ছাওয়াল ।

কার আগে দাঁড়াইব অনাথ কাঙ্গাল ॥
বিশাল মধুর বাণী শুনিব কাহার ।
হেরিব কমল মুখ কার বারে বার ॥
তবে যদি ভাসাইলে দাসে সমুদ্দুরে ।
ধরিতে অনাথ কর, কে কহিল তোরে ॥
মুহূর্তে ভুলিতে যারে না পারি কখন ।
চির লোভ কেমনেতে রহিবে গোপন ॥
আস নাথ অনাথেরে দেখা দিয়া যাও ।
ধরি করে ধরি গলে ধরি তব পাও ॥
আমার সে সাধ শান্তি কে পুরাবে হায় ।
যাইব কাহার আগে বলিব কোথায় ॥
চির তরে দাস আমি হইয়াছি যার ।
সেজন ব্যতীত আর কে আছে আমার ॥
যথা রব চিরকাল না হইব ভীন ।
ভীনেতে অধীর নহি যায় যাক দিন ॥
কমলের মধু লোভে যারা মধুকর ।
কেমনে এই সুধা স্বাদ ত্যাগিবে সত্বর ॥
মধুর কাঙ্গাল অলী ফুলের বাসনা ।
তাড়াইলে নাহি যায় বিষাদ যাতনা ॥
যায় যাক প্রাণ যাক পঙ্গ মধুকর ।
অনাসে পরাণ বধে দেখিয়া পশর ॥
প্রভাত কালে রস যারা মধু খায় ।
বিভোর অলীর দল তাহারে বোলায় ॥
ওহে পাখী ডাক কিন্তু সুধা বিদ্যমান ।
অনিত্য রসের মদে দিছ কি পরাণ ॥
খবর আসে না যার হৈয়াছে খবর ।
দাবির আওয়াজে কিহে পাবে দেলবর ॥
اه هرگاه که در بستان بد میدگ چه خرش شود دلمن
یگذ ار ای دوست تابوقت بها درسیزه بینی دمیده برگل -
আহাকি কমল কুঞ্জ হেরি দলে দল ।
চমক আকাশ তারা যেন টল টল ॥
কি সাধ হেরিতে আজ ফুলের বাগান ।
এস বন্ধু দেখ আজ মম অভিমান ॥
শুয়েছি মাটির তলে কবরে আমার ।
ধরিছে মেঘের সাজ ফুলের গোলজার ॥

যে বাগানে যেয়ে আমি লভিতাম ফুল ।
সে ফুল আমার কক্ষে করিয়াছে মূল ॥
দেখ এসে তামসিক ফুলের তামাসা ।
ক্ষণেকে তোমার কিহে হবে এই দশা ॥
ছিল যাঁরা দেখ তাঁরা কুসুম বিলাস ।
কেহ না করিল পূর্ণ ভব অভিলাষ ॥
শত শত অভিলাষী এসেছিল যাঁরা ।
এ ভব কুসুম কুঞ্জে রহিছে কি তারা ॥
شنوحافظ بتو گیم که گل تازه غمی ماند
اگر ماند شبی ماند شی دیگر غمی ماند
পুষ্পধামে পুষ্প তাজা এক রাত রয় ।
রেহাফেজ পুষ্প তনু রাতের বিষয় ॥
অন্যরাত পুষ্প রাশি রবে না গো আর ।
এ ভব বাগান তনু পুষ্পের সংসার ॥

বিরহ

ফল ফলে ফলে; যেই যাহা বলে;
যে করে রোপন যার ।
আঞ্জির আঙ্গুর; ডালেম্ব লেবুর;
যে বিছন ফল তার ॥
বীজ বন্ধু যার; বন্ধু গাছ তার;
বন্ধু বৃক্ষে ফলোধর ॥
বন্ধুর বিহঙ্গে; বন্ধু রস সঙ্গে;
বন্ধু জালে বন্ধ কর ॥
এবার মথুরা; কে যাবিগো তোরা;
চল যাইগো মম সঙ্গে ॥
বদন ভরিয়া; লইবি দেখিয়া;
মাতাল হইবি সঙ্গে ॥
কামিনী কাজল; সকলি আজল;
সঙ্গের সঙ্গিনী নয় ॥
বেহাগ মন্দিরে; যাব ধীরে ধীরে;
এই কথা সবে কয় ॥
বিরাগে বৈরাগ; যার অনুরাগ;
পবন তাঁহার সখা ।

পবন উল্লাসে; পবন বিলাসে;
পবন না যায় রাখা ॥
মনের বাদাম; চলিলে আরাম;
যে দিকে ধরিবে পাল ॥
যায় শুরু ধামে; বিরহ বাদামে;
নদ নদী বিল খাল ॥
যে বিক্রম বলে; চলে জলে স্থলে;
সে বল কাগজে নয় ॥
কাগজ কামিনী; রবিও যামিনী;
যে তনে উদিত হয় ॥

বিরহ

(রাগ ত্রিপদী)

কি নাম জপিতে কয়; কাগজ দেখিতে হয়;
কাগজ লিখিতে হয় কিসে ॥
কাগজ দোয়াত কালী; কেতাব কোরান বলি;
দোয়াতে সকলি রৈছে মিশে ॥
অক্ষর আকার যত; কালির পুতুল মত;
কোন কুমারে গড়েছে গো কায়া ॥
পুতলী মাটির ছন্দ; দোয়তে রৈয়াছে বন্ধ;
সেই কালী বল কার মায়া ॥
মিছা কায়া মিছা মায়া; পড়া লেখা ছায়া কায়া;
কালীর অক্ষর প্রভু নয় ॥
যার নাম লিখ পড়; তাঁরে যেয়ে তালাশ কর;
কোন অক্ষরে আছে দয়াময় ॥
শরীফি তা নিজাক্ষরে; পেয়েছিল রত্নাকরে;
তাই রত্ন যত্ন করে সার ॥
সে অক্ষর ভ্রম করি; ইকার আকার সারী;
এ সংসারে হৈয়াছে অসার ॥

বিরহ

আসিবার কালে বান্দা আছিলা বেহুশ ।
যাইবার কালে বান্দা রহিবে না হুশ ।

কেমন বেহুশ কাল বুঝিতে না পারি ।
নিদ্রা ভোরে কেনে দিনু কাল নদী পাড়ি ॥
জাগিয়া রহিতে চাই আলাপ নিজ্জুম ।
দো-চক্ষু মুদিত রাখে নিশি ভোর ঘুম ॥
জাগিবার কালে যদি বিলাসিবে ঘুম ।
কেমনে জাগিবে যবে হইবে নিজ্জুম ॥
কেন ঘুম কোথা ছিলি কোন দেশ তোর ।
কি লাগিয়া ঘুম নিশি চক্ষু করে ঘোর ॥
ঘুমে ছিলাম ঘুমে রৈলাম যাব ঘুম দেশে ।
জাগনে আসিলে ঘুম কি করিব শেষে ॥
ওরে ঘুম কেবা তুই বুঝিতে না পারি ।
কি লাগিয়া হলাম এবে তোমার ভিখারি ॥
জাগন বাসনে যত রহিনু চেতন ।
ততই মোহনী ঘুম করে অচেতন ॥
কাল ঘুমে নিশি ভোরে রলি অচেতন ।
ধন জনে মূলে নাশ হলি না চেতন ॥
যে ঘুমে বিনাশ কাল আহা পরকাল ।
সে ঘুম সঙ্গের সাথী চিরস জঞ্জাল ॥
যে দিলি আমায় ঘুম জাগাও আমায় ।
জাগিলে কেমনে আমি হেরিব তোমায় ॥
হেরিলে তোমার মুখ হরে মন দুঃখ ।
জাগিলে নিশার ভোরে যাবে চির দুঃখ ॥
জাগাও আমায় কাল তুমি সচেতন ।
বন্ধু কবে বন্ধু তরে রাখে অচেতন ॥
কালুকা আমায় তুমি রাখ নিশা ভোরে ।
ছুটিল সে কাল ঘুম হেরিলাম তোরে ॥
হেরেছি তোমার মুখ বিলাসিছে সুখ ।
মম মুখ তব মুখ হেরি এক মুখ ॥
আমি হে তোমার মুখ তুমি হে আমার ।
দুই মুখে এক বাক্য রূপে নিরাকার ॥

বিরহ

গ্রীষ্মাগতে বর্ষা এল আষাঢ় সাওন ।
হেমন্ত শরৎ গতে কার্ত্তিক আঘন ॥
পৌষ মাঘে শীত যায় ফালগুনে বসন্ত ।

কালে কালে কাল গতি একাল অনন্ত ॥
ছয় ঋতু বার মাস সংসারের কাল ।
সাত দিনে বিরহিত ভব সরজাল ॥
ঘড়িকালে কাল বেগ মুহূর্ত্ত সমন ।
স্বর চক্রে বিশ হাজার দম নারায়ণ ॥
কমল বদন পিণ্ডে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ।
হরিছে এ ভব মায়া মুহিনী আকাশ ॥
ভোজন দমের বায়ু শরীর রতন ।
কান্তিপুর নির গতে মুহূর্ত্তে পতন ॥
পতন বিরাজ যার অঙ্কুর আসল ।
কালের মাহাত্ম্য এই সংসার গরল ॥
ওহে কাল ইহকাল সকলি তোমার ।
অনিত্য আসার দেশ তব অধিকার ॥
যেই দেশে গেলে হবে সুধা স্বাদ মন ।
সে দেশে তোমার ভয় রবে না কখন ॥
সে দেশের প্রিয় যারা যাবে সেই দেশে ।
রহিবে না ইহ ভবে বৃথা পড়ি আসে ॥

বিরহ

সকলি সকল ভাবে ভবের ভাবনায় ।
কেও না ভাবে সন্ধ্যা গতি রহিব কোথায় ॥
কি লাগিয়া এলাম ভবে সঙ্গে যাব কার ।
কে হবে সঙ্গের বন্ধু সঙ্গ সহাকার ॥
ছিল যারা বন্ধু তারা আছে না এখন ।
আছে যারা যাবে তারা পাইলে সমন ॥
সামনে গমন যার ভবের বিদায় ।
এ ভব বন্ধুর দ্বারে আসিবে না হায় ॥
রহিয়াছে বন্ধুর দয়া বন্ধু নাই আর ।
আসিবে না ফিরে বন্ধু ভবের মাজার ॥
ভব কালদন্তে যারে করিছে সংহার ।
ফিরিয়া আসিবে কি হে এ ভবেতে আর ॥
এসেছিলা কেনে ভাই ভাব এইক্ষণ ।
কি লইয়া যাইব দেশে হইলে চলন ॥
চল এবে দেশে যাই বেলা যায় যায় ।
বেলা গেলে নিশি গতে কি হবে উপায় ॥

দিন গেল নিশ এল ঘোর অন্ধকার ।
পাইবে না কারে কভু ভাঙ্গিলে বাজার ॥
সকলি চলিয়া যায় যার যেই দেশে ।
একেলা রহিলে তুমি কি হইবে শেষে ॥

মোর্শেদী

উঠ উঠ শিশুগণ মন মণ্ডলে চলে ।
মোর্শেদের নাম নিয়া ডুব দিও জলে ॥
যে ঘাটে মোর্শেদ ডুবি করিছে শীতল ।
সেই ঘাটে ডুব দিয়া যেও জল তল ॥
অঙ্কুরে আষাঢ়ে নদী মাঘে ঘোর শীত ।
শুকনা জলে খেলে মৎস্য মনে নহি ভীত ॥
বৎস থুইয়া গাভী ডাকে গাভের আশায় ।
উজান পবনে ডিঙ্গা বাদাম দিয়া যায় ॥
কাঙ্গালের মাণিক ধায় কোলের বাছুর ।
বৃদ্ধকালে স্নেহ-সুত আসিবে না তোর ॥
যার যেই কাল ঘোড়া দৌড়াইয়া যায় ।
শরীফি তুই কার জন্য রলি কার আশায় ॥

পীরের অনুগ্রহ আশ্রয় করা কি?

উঃ- ফরজ আইন । এসম্বন্ধে কোরান, হাদিস, এজমা কেয়াছ প্রভৃতি বহু সংখ্যক কেতাবে তাহার দলিল মৌজুদ আছে। সুতরাং প্রত্যেক ফেকার তমহিদে এই আখেরাত প্রাপ্তি বিদ্যার আলোচনা করা গিয়াছে। বাকী "জামেনূর" নামক কিতাবে ঐ আখেরাত প্রাপ্তি পন্থাগুলির ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, উহাতে দেখুন ।

মোর্শেদ কি?

মোর্শেদ এক অনির্বচনীয় আশ্চর্য ধন । তাহার তাছিরে লোকের পাপ মোচন হইয়া, পরকালীন সদগতি লাভ হয় ।

তাছির কি?

তাছির মোর্শেদের আধ্যাত্মিক এক প্রকার তড়িৎ শক্তি সঞ্চরণবৎ গুণ বিশেষ । চুম্বক হইতে যেমন অন্য লৌহে ঘর্ষণ দ্বারা চুম্বকধর্ম্ম বিস্তারিত হয়, তদ্রুপ মোর্শেদের আত্মা হইতে শিষ্যের আত্মায় ঐ অব্যক্ত গুণ সম্মিলিত হইয়া বিস্তৃত হইতে থাকে ।

গুণ কোথায় থাকে, উহার দ্বারা কি হয়? গুণ প্রাণে থাকে। ঐ আছর শরীরস্থ হইলে, তাহাকে গুণ বলিয়া জানা যায়। যেমন বৃক্ষের গুণ ফল, তাহা খাইলে স্বাদ জানা যায়। এই জন্য গুরু রূপ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না করিলে, কেহ চিরজীবি হইতে পারে না। সেই ফলের রসই আবেহায়াৎ। অতএব পীরের ফয়েজ লওয়া ফরজ।

মুরীদ কি প্রকারে সেই গুণ সত্য বলিয়া স্থির করিবে

ফলের গুণ ফলেই পরিচয় দিয়া থাকে। ফলতঃ বৃক্ষের একটি গোটা দেখিলেই চিনা যায়, কিন্তু মোর্শেদ মানুষ বইত আর কিছুই নহেন। তাহাকে দেখিয়া চিনা যায় না। তাহার গুণ শরীরে বিকশিত হইলেই তাহাকে চিনা যায়। তাঁহার আছর লও, তবেই বুঝিতে পারিবে। ফল খাইলে যেরূপ তাহার স্বাদ বুঝা যায়, সেইরূপ পীরের আছর গ্রহণ করিলেই তাহার স্বাদ বুঝিতে পারা যায়। চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া রস চিনা যায় না। চক্ষু বন্ধ কর, মনে ভক্তি কর। কাহারও চাকচিক্য দেখিও না, মানসিক চাকচিক্য দেখিলেই জানিতে পারিবে।

অর্থাৎ ঐ আছর লইলে পীরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। কিন্তু ইহাতো কেবল বিসমিল্লা মাত্র। তৎপরে যতই তলে ডুবিতে থাকিবে, ততই তাহার গভীরতা অনুভব হইতে থাকিবে। যেই পীরের গুণের গভীরতার ইয়াত্তা নাই দেখিবে, তাহাকে সমুদ্র তুল্য জ্ঞান করিবে।

আবার চরা জলে সকল নৌকা চলে না, বরং সময় বিশেষে ঐ জল শুকাইয়াও পড়ে। তদ্রুপ অগভীর গুণ বিশিষ্ট পীর নাকেছ। ঐরূপ পীরেরা মধ্যে মধ্যে অন্যান্য মহা পীরকে ঘৃণা করে ও অনুপযুক্ত বলিয়া চর্চা করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য ঐ প্রকার পীরের মুরিদেরাও তাহাদের পীর অপেক্ষা অধিক গভীরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাহারা কেবল আপনাদিগকেই পবিত্র মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম।

কেতাব দেখিয়া কেবলমাত্র তদনুসারে মুরীদ বানান যায় কি না?

ওগো বাবু! ঐরূপ করাত একটি চক্রান্ত মাত্র। কেননা গাছ ভিন্ন যেমন ফল হয় না, আবার ফল ব্যতীত রসও নাই। তবে কেতাবে রসের নাম আছে বলিয়াই কি তাহাকে ফল বলিতে হইবে? খোদা প্রাপ্তি পন্থ কেতাবের অতিরিক্ত। কেতাব ঔষধের তালিকা স্বরূপ মাত্র। কেবল উহাতেই (তালিকা পাঠে) রোগ দূর হয় না; ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে হয়। প্রকাশ্য বিদ্বানগণ (আলেমগণ) মাত্র এই প্রকাশ্য বিদ্যা দ্বারা পীরের কার্য করিতে পারেন কি না? না। আধ্যাত্মিক ক্ষমতাহীন ব্যক্তিরা কখনই মুরীদের হৃদয়ে মানসিক শক্তি সঞ্চারপূর্বক মারেফতের বীজ বপন

করিতে সক্ষম হন না। কিন্তু মানসিক শক্তি প্রাপ্ত মুরিদগণও অন্যের হৃদয়ে ঐ শক্তি বিস্তার করিতে পারেন।

স্বপ্নের কথা কি সত্য?

হ্যাঁ, সত্য লোকের স্বপ্ন নবুয়ৎতুল্য। অর্থাৎ আসমানি কেতাব যেমন নিজ প্রমাণে সত্য, তেমনই গৌরবান্বিত, সিদ্ধ মহাপুরুষের স্বপ্নও সত্য।

মোর্শেদ স্বপ্নে কোন আদেশ করিলে তাহা যথার্থ কি না?

হ্যাঁ। যে ব্যক্তি নিজে সত্য, তাঁহার পীরও সত্য, তাঁহার স্বপ্নও সত্য, তাঁহার আহ্‌য়াল এবং এল্‌হাম প্রভৃতি সকলই সত্য।

মোর্শেদ স্বপ্নে বা কাস্ফে কোন আদেশ করিলে তাহা সমাধান করা দুরস্ত কি না?

হ্যাঁ অবশ্যই ঐ আদেশ পালন করা কর্তব্য ও দুরস্ত। বিশেষতঃ উহা পালন না করিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা। এমন কি ধন প্রাণহানি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ইহা ফরজ তুল্য। ইহাকে নবুয়তে বাতেনী বলা যায়। এই জন্য পৃথিবীর যাবতীয় নবী, অলী, গুণী মানী পূর্ব পুরুষ হইতে ঐ কার্যের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই ইহার পক্ষপাতী।

কাস্ফ কিম্বা স্বপ্ন দ্বারা নেক লোকেরা কোন কার্য সমাধা করিয়াছেন কি না বা কোন কার্যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না?

হ্যাঁ। ইসমাঈল নবীর কোরবানী স্বপ্নের আদেশে সমাধা হইয়াছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের ফলে মিসরের বাদশা হইয়াছিলেন। আমাদের নবী সাহেবের নামকরণ ও অন্যান্য অনেক কার্য স্বপ্নের আদেশ মতে হইয়াছিল।

নেশান হযরত ইমাম মেহেদী আলায়হেচ্ছালাম

আখের জামানা যবে দুনিয়া আখের।
হবেন আখের অলী শানে সিদ্দিকের ॥
তছদিক এলেম নূর রস বেলায়ত।

তামাম করিবে রস সে রসে তাবত ॥
করিবে রৌশন দেশ এরফানের জ্যোতি ।
ফকিরী নামক বিনা না রহিবে গতি ॥
হইব মুল্লুক ধামে ফকিরের ধুম ॥
জাগিবে আরেফ জ্যোতি পড়িবে হুজুম ॥
জাগিবে আল্লার শান ভাগীবে শয়তান ।
দিন দিন সাধু সনে বাড়িবে ঈমান ॥
যখন গোলজার হবে বাতেন আনওয়ার ।
হবেন খাতেম অলী নেশান তাঁহার ॥
আলামত হবে তাঁর জহুরের শান ।
হাদীসেতে হাবিবুল্লা আপে ফরমান ॥
সেতারা উলিবে লম্বা দারাজ দোমের ।
দেখিবে তাহারে সবে আওয়াল আখের ॥
দুইবার হেন তারা উজান আকাশ ।
একে একে রজনীতে হইবে প্রকাশ ॥
এক মাসে দুই গ্রহণ চাঁদ সুরূজের ।
জুম্মাবারে হবে রাহু মাহে রমজানের ॥
হইয়াছে এই দোন নেশান জহুর ।
হবে না জহরত মেহ্‌দী আজি বহুদুর ॥

চন্দ্র গ্রহণ

বাংলা সন ১৩০০ সনের ৯ই চৈত্র ১৩ই রমজান জুমে রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে ।

আর সূর্য গ্রহণ

বাংলা সন ১৩০০ সনের ২৪ই চৈত্র ২৮ শে রমজান শুক্রবার হইয়াছে । কেহ কেহ বলিয়াছেন কোরান শরীফে الشمس والقمر جمع ঐ গ্রহণ উপলক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অতএব দারে কুতনীর হাদীসে ইহার এই রূপই তফসীর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

আসিবেন মেহ্‌দী শাহা আহাম্মদ নামে
নামে নাম মুহাম্মদ না জানি কি কামে ॥
সুত হন আব্দুল্লার মাতা আমেনায় ।
লিখন দলিল পাতে এই পাওয়া যায় ॥

হযরত ইমাম মেহদী সাহেবের শীঘ্র আগমনের একটি প্রবল কারণ ও চিহ্ন এই হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নবী সাহেবের দরমিয়ান প্রায় ৯০০০ বৎসর গত হইয়াছে । হযরত আদম (আঃ) ষাট গজ লম্বা ছিলেন । তবে দেখা যায় যে উল্লেখিত

সময়ের মধ্যে ষাট গজ হইতে সম্প্রতি সাড়ে তিন হস্ত বরং তাহা অপেক্ষাও হ্রাস হইয়াছে । এইক্ষণ বিবেচনা করিলে–
এই সাড়ে তিন হাত হাতে পিপীলিকার ন্যায় হওয়ার মানুষের অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া বোধহয় । আবার ঐ ষাট গজ এই ক্ষণের গজ নহে; উহা নবী সাহেবের সময়ের পরিমাণ । বর্তমান সময়ের বিবেচনায় উক্ত পরিমাণ আরও বেশী কেননা জিদ্দায় মা হাওয়া (রা:)'র কবর দেখিতে পাওয়া যায় উহা ৩৬ ইঞ্চির গজের (৩০০) তিনশত গজের বোধ হয় কম হইবে না । আর মা হাওয়া (রা:) হযরত আদম (আঃ) অপেক্ষা অধিক লম্বা ছিলেন না ।

তন ও মন মাঝে যে সকল ফল বর্তমান তাহার দলিল কোরান

তাই কোরানের নূর অলীর বদনে ।
নবী অলী বীজ গুণে ফল তরু তনে ॥
সে তরু চিনিলে পারে ফল খাইবারে ।
না চিনিলে ফল নামে কস খেয়ে মরে ॥
সিজ খেয়ে দিস যার হয়েছে ভরম ।
ফল খেতে মানা বোঝে আখের অধম ॥
তাহা হতে সত্য খাব কোরানের সার ।
নবী অলী পায় নূরে খাবের দিদার ॥
নবুওয়ত হিস্যা সেই হাদীসেতে কয় ।
সেই হিস্যা আম্বিয়ার নেক তনে রয় ॥
খাব কি কাস্ফ আদি এলহামের নূর ।
রাজ নেয়াজের সার যাহার জহুর ॥
ভেদাভেদ কাজ এই আছর রাব্বানী ।
যার দেলে সেই ভেদ সেই জন গণী ॥
তাহা হতে যেই নূর হয়েছে জহুর ।
খোদাই তাঁহার মূল নূর হতে নূর ॥
সে নূরের আকিদায় আছহাব তামাম ।
সে নূরের গাছ ফল তরিকার নাম ॥
তরিকা বলিতে হয় নেছবত অলীর ।
যেই ডালে যেই ফল হৈয়াছে বাহির ॥
মজহাব বল আর মৌলুদ কেয়াম ।
রাজ নেয়াজের খুবি আল্লাহর নেয়াম ॥
এলহামের নেয়ামত এসব তামাম ।
রাজ পন্থে যাহাদের প্রকাশ মুদাম ॥

শত শত আলী অলী এলহামের নূরে ।
লইছেন যে জিনিষ মুল্লুক সদরে ॥
গায়েব খাজানা ছিল খোদার ভাণ্ডারে ।
নেক লোক পান তাহা অলীর আদরে ॥
এলহামে পেয়েছে যাহা নেয়াজ খোদার ।
খাবেতে দলিল কোথা বল দেখি তার ॥
স্বপন দেখিছে যেই জানে সেই জন ।
নবীগণ জিব্রাইলে সাক্ষী কোন্ জন ॥
যে কাজের গাওয়া নাই কি বিশ্বাস তার ।
নবী অলী কিসে হল কহ নামদার ॥
জিব্রাইল বলে হৈল কিসেতে একিন ।
কিন্তু এই নূরে হোদা বাতেনের চিন ॥
আর্শী জ্যোতে নিজ জ্যোত যেন জ্যোত ধরে ।
হাদি নূরে হেদায়াত চিনে সে প্রকারে ॥
হেদায়াত করে যেই তার হুদা নূর ।
হেদায়াত পান যেই তাহাতে জহুর ॥
যার দেখা তার চিন তার জ্যোত হয় ।
দেখে যেই চেনে সেই চিনন বিষয় ॥
তাই তার নূরে হোদা হেদায়াত কাম ।
নবী অলী হতে মিলে মৌলুদ কেয়াম ॥
তরিকত তরিকার শরা মোজহাব ।
ফতেহা নেয়াজ আর এলহামাদি খাব ॥
পাইয়াছেন পায় যাঁরা পাবে সর্বক্ষণ ।
মনপুরে নূরে হোদা যাহার রৌশন ॥
মন দেশে নূরে হোদা নাহি আছে যার ।
দেখা নাই শুনা নাই সব অন্ধকার ॥
গাইছে গোবিন্দ সুরে জবানী ওয়াজ ।
বেদাত হারাম তার মুখের আওয়াজ ॥
নূতন সকল কাম বেদাত হারাম ।
নূতন হইছে হবে পৃথিবী তামাম ॥
বেদাত বলিছে যেই সেওত নতুন ।
নূতন কেতাব নাম নূতন রাখন ॥
এই কি আজাব এল কোথায় থাকিয়া ।
বেহেস্তের লোক নিতে দোজখে ধরিয়া ॥
বেহেস্তের রাহে যেই হৈয়াছে তৈয়ার ।

পিছ হৈতে খুলে দেয় দোজখের দ্বার ॥
ডেকা ধরা পোলাপানে ধরে নিয়া যায় ।
নবুওয়ত রাহা থুয়ে দোজখ দেখায় ॥
খাব আর কাস্ফ আদি হিস্যা নবুওয়ত ।
নেক লোকের এই শান রাহে মারফত ॥
স্বপ্ন ঘরে বাস যার না আছে কখন ।
বেদাত বলিয়া কিহে দেখিল স্বপন ॥
সত্য যদি সত্য ঘরে দেখিত স্বপন ।
নবুওয়ত রাহে তবে জানিত আপন ॥
নফ্সের স্বপন এই নফ্স রস বসে ।
না গেল রাসেদ আগে মনের অলসে ॥
নামের তাজেম আর তাজেম জাতের ।
খাড়া বসা কেয়ামাদি সঙ্গে মৌলুদের ॥
জামেনূর কেতাবের দোছরা হিস্যায় ।
তাজেমের হদাহদ লেখা গেছে তায় ॥
কিন্তু যে না জানে কিম্বা হবে নাবালেক ।
পর সাথে লড়ালড়ি সদাই প্রত্যেক ॥
কামালতে যেই জন হয়ে গেছে পুর ।
ঝগড়া ফাসাদ নাহি তাহার জহুর ॥
খোদাওয়ালা বোবা ধন জানিয়া না জানে ।
এ সংসারে যার তার রব্বি গুণ শানে ॥
তাই তার এ সংসারে রৈয়ে যায় মান ।
গুণে গুনী নিজে ফানি আল্লার নেশান ॥
তাই যাঁরা অলী আল্লা হিংসা নাহি তার ।
সুখের বাসর হয় সয়াল সংসার ॥
মরিলে সকলে মিলে করে আশীর্বাদ ।
কেয়ামত তক থাকে তাহার ইয়াদ ॥

কবরের পরিমাণ

১। প্রত্যেক কদান্দাজ অর্ধেক উভ ও প্রশস্ত হইলেই ভাল হয়। যদি স্থান বিশেষে ইহা অপেক্ষা কিছু কম বেশী হয় তাহাতেও ক্ষতির কারণ নাই ।

২। সিন্ধুক গৌর কিম্বা লহদ কবর অর্থাৎ কবরের ডাহিন পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ফাঁক (বোগল কাটা করা) কে লহদ কহে, আবার ইহাই ভাল বলিয়া উল্লেখ আছে, যেহেতু সরে বেকায়া নামক কেতাবে উহা উত্তম বলিয়া বর্ণিত

আছে। সিন্দুক গৌর বলিয়া কবরের উপর দিয়া ছাদের ন্যায় কাষ্ঠ বিছাইয়া, মাটি আবদ্ধ করা এবং লহদের কেহ কেহ খাড়া চারও দিয়া থাকেন।

৩। মুর্দ্দারকে কবরে ডাহিন কেরেটে কিঞ্চিৎ কাইত ভাবে রাখা সুন্নত, কিন্তু এরূপ কেরেটও ভাল নহে, যাহাতে মুর্দ্দারের কষ্ট বোধ হয়।

৪। কবরের মাটি নরম কিম্বা সময় গতিকে তাহাতে জল কাদা থাকিলে, তাহাতে বিছান কিম্বা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক লোকের কবরে খাট দিলেও কোন দোষ নাই।

৫। যাঁহারা কবরে মৃত্যুকে উতারিবেন, তাহাদের পক্ষে বিছমিল্লা কিম্বা অপর কোন দোয়া দরূদ পাঠ করান ছুন্নত, আবার তৎক্ষণাৎ নূরে কবর দ্বারা কবরকে মহফুজ করিয়া দিতে পারিলে মৃত ব্যক্তির আছান হওয়ার কারণ, যাহা আউলিয়া ও মুর্শেদের মধ্যে প্রচলিত ও বিদ্যমান। এমন কি সময় বিশেষ কোন কবরের ভীত ভয় পর্যন্ত ঐ নূরে রহিত হওত কবর রৌশন হইয়া থাকে। এমন কি যে ব্যক্তির মধ্যে নূরে কবর সদা সর্বদা বিরাজমান, সেই ব্যক্তি অন্য কবরকেও রৌশন করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং মুর্দ্দারদিগকেও আপন নূর দ্বারা নূরাণী করিয়া দিতে পারেন। ঐ নূরের দ্বারা বেঈমানকেও ঈমান দিয়া জাগরণ করাইতে পারেন। ইহাকে তছরোফে বেলায়েত কহে। এইরূপ তছ্ফেরের দ্বারা অলী লোকেরা অনেক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। এমন কি গুণাগারের তৌবা করান শক্তি ও মনকে রানে বেলায়াত এবং খোঙ্কা ইসলামাবলম্বীদিগের ঈমান বিরহিত করাও তছরোফের অধীনতা। কিন্তু সাদা মুসলমানগণ কোন অলীর বেলায়েত ছিনাইয়া লইতে সক্ষম নহেন বরং অলীর হাতেই উহাদের আয়ত্ব ও বিলুপ্ত।

৬। মুর্দ্দারের ছিনা কিম্বা কপাল ও কাপড়ের উপর শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা কল্মা শাহাদাত কিম্বা চারিকুল ইত্যাদি লেখা মুর্দ্দারের পক্ষে ভাল। সামি ও অন্যান্য কেতাবে ইহাই লিখিয়াছে, কলম দ্বারা লিখিলেও ক্ষতি নাই, যদ্যপি ইহাতে এখ্তেলাফ বর্তমান।

কবরের হেজাব

১। মৃত দেহকে দাফন কাফন করতঃ কবরের চারি কোণে চারিজন দণ্ডায়মান হইয়া চারিকুল পাঠ করিলে কবরের হেজাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ কবর বালা হইতে রক্ষিত হয়। এমন কি যদি হেজাব ভাল রূপ হইয়া যায় তবে কবরের উৎপীড়ন অর্থাৎ শিয়াল কুকুরগণ কবর হইতে যে মুর্দ্দা উত্তোলন

করিয়া ফেলায়, তাহা হইতেও রক্ষিত হয়। সে বিষয় অনেকগুলি প্রণালী থাকা হেতুও এই স্থানে তাহার বিবরণ বর্ণনা করা গেল না।

২। মুর্দ্দা দাফন কাফন করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য মানসিক বলে আশীর্বাদ করা কর্তব্য এবং উহার উপর খোদার রহম উৎসারিত থাকা পর্যন্ত বিলম্ব করিবে। যদি ইহাতে সক্ষম না হয় তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিলম্ব করিবে। যদি ইহাতে সক্ষম না হয় তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ স্থানে গৌণ করা আবশ্যক। তাহার পরিমাণ মেস্কাতে জানওয়ার জবেহ করত বাতচিত করিতে যত সময় লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করিতে হইবে, কিন্তু ইহা ঐ খয়ের খাহির কেবল শেষ পক্ষ মাত্র। নতুবা যতক্ষণ পর্যন্ত কবরের নিকট দোয়া কালামে মানণিত থাকিবে, ততই ফল এবং মৃত ব্যক্তি সুখের বিষয়।

৩। গোরে যখন মাটি চাপাইতে হয়, হস্ত দ্বারা চাপাইবে কিম্বা কোনরূপ বেয়াদবি সরঞ্জামের দ্বারা না হয় সেইরূপ বস্তুর দ্বারা মাটি চাপান যথারীতি কার্য। ইহার বিপরীত দূরস্ত নহে। যদিও কেহ কেহ শুদ্ধ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা আদাবের রীতির মধ্যে পরিগণিত নহে।

৪। কবর মাহি পোস্ত অর্থাৎ মৎস্যের পৃষ্ঠের ন্যায় কিঞ্চিৎ উঁচা করা ভাল, কিন্তু ইহার কম বেশী করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কবরের উপর বরই কিম্বা খেজুরের শাখা গাড়িতে কেহ কেহ বলিয়াছেন আবার ইহা হাদীস বলিয়াও বোধ হইতেছে এবং তাহার টিকা (ইল্লত) এই প্রকার কহিতেছেন যে ঐ শাখা জীবিত থাকা পর্যন্ত উহা আল্লাহু আল্লাহু জেকের করিতে থাকিবে। ইহার মানি কিছু বুঝা যাইতেছে না। কারণ ববই কিম্বা খেজুরের শাখাতো কাটা মাত্রই মরিয়া যায়, কিন্তু এই স্থলে যদি ঝিকা কিম্বা মাদারের শাখা হইতো, তবে উহা মরিত না বরং জেকের করিতে থাকিত, ইহার টিকা এই প্রকার সম্ভব পর নহে ইহার টিকা যে অন্য প্রকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫। মুর্দ্দার মরিলে যদি তাহার বাড়ীতে ঐ সময় কিছু খাদ্য তৈয়ার করা হয়, তবে তাহার মধ্যে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ মরণ কোন শিষ্টাচার বেরামে হইয়াছিল কিনা। যদি ওলা উঠা কিংবা গুটি ইত্যাদি বেরামে হয় তবে তাহা খাওয়া একেবারেই সঙ্গত নহে। আর যদি সহজ পীড়াজনক মৃত্যু হয়, তবে দেখিতে হইবে মৃত ব্যক্তি কিরূপ বয়স্ক। আর যদি ঐ ব্যক্তি বুড়া অবস্থার লোক হয় এবং তাহার মরণে কাহার মন অতি বিচলিত না হয়, তবে তাহা খাওয়া যাইতে পারে; নতুবা মাকরূহ।

৬। মরণের পর যে কয়েকদিন রূহু দোয়া দানের জন্যে আসে তাহার নাম তিজা, চাহারম, সপ্তমী, দশই, সাতাইসা, চল্লিশা, ছমাসি ও সাল্ইয়ানা।

৭। মুর্দ্দারের গোসল দেলান কুসম (অল্প) গরম পানি লইয়া সাবান ইত্যাদি দ্বারা ভাল রূপ ধুইতে হইবে, কিন্তু নাকে পানি না দিয়া অজু করান চাই।

৮। জননার পাঁচ কাপড় যেমন ইজার, চাদর, কোর্ত্তা, ছিনা বন্ধ ও দামন। প্রথমে ছিনা বন্ধ বিছাইয়া ক্রমে চাদর, ইজার পিরান ও দামন মাথার পেছসহ ছিনার দিগ লম্বা করিয়া দুই দিগে টানিয়া দিবে। সময় বিশেষে এক কাপড়েও হইতে পারে। মেয়ে ছেলে জননা মধ্যে গণ্য এবং পুরুষ ছেলে মরদের মধ্যে ধরিতে হইবে। পুরুষের তিন কাপড় যথা চাদর, ইজার ও কোর্ত্তা। লোকেরা চাদর ইজার মাথা হইতে পায়ের তলায় অতিরিক্তই দিয়া থাকেন এবং পিরান গলা হইতে সেই পর্যন্ত হইলেও ক্ষতির কারণ নাই।

৯। গোসলের পানি গরমের সময় বরই পাতা এবং ওস্‌নান পত্র দ্বারা গরম করিয়া মুর্দ্দারের গোসল করান যাইতে পারে। ইহাতে কোন দোষ নাই বরং শরীরের ময়লা পরিষ্কার হইবার সম্ভব।

১০। মুর্দ্দারের তাবুত স্কন্ধে করিয়া নিতে হইলে তাহা বেশী ফায়দার কারণ। ফলে তাহাতে সুন্নতের রীতির একটি বড় আদবের কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

১১। মুর্দ্দার স্কন্ধে করতঃ চল্লিশ কদম হাটন যে একটি উত্তম কার্য্য তাহতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দলিল যে প্রকারই হউক না কেন কিন্তু এই একটি নেক ফাল ও নেকের আলামত বিধায় চল্লিশ কদমে হয়তঃ চল্লিশ বৎসরের গুণা মাফ হইতেও পারে নতুবা প্রত্যেক কদমে যে কতটি উত্তম প্রক্রিয়ারাহু কেরামত তাহার অছু ছাদতের মধ্যে বিরাজমান, তাহাই উহার পক্ষপাতি এবং পাপ মোচনের কারণ।

১২। মুর্দ্দারের নামাজ রোজা ইত্যাদি ফেদিয়া স্বরূপ প্রত্যেক নামাজ রোজার জন্য পয়সা ছদকার ন্যায় ধরিয়া যত টাকা হয় তাহার পরিবর্তে এক জেলেদ কোরান লইয়া কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করতঃ সে আবার অন্য এক জনকে দান করেন, এ রকম অনেক বার দান করিলে পরে প্রথম যাহাকে দান করা হইয়াছিল তাহাকেই দেওয়া হয়। আর ঐ কোরান শরীফের মূল্য ফেদিয়া যত টাকা হইয়াছে তত টাকা নির্দ্ধার্য করা হয় কিংবা বেশ কিস্মতী বিধায় বহু কিস্মত বলা হয় যে ইহাও সত্য। আবার অপারগের জন্য জন্যে এইটি এক প্রকার হিলা বরং নেক ফলের তরিকা কিন্তু চালাকির নামকে অম্ল মুখ যে লবণ কাটা হইবে তাহার বিশ্বাস কি?

১৩। মুর্দ্দারের জন্য জানাজার পর দোয়া দরূদ যাহা পড়িতে হয় পড়িয়া শেষপক্ষে এতিম মেছকিন ও তালবে এলেমদিগককে কিছু কিছু ছদকা দেওয়া ভাল। সুতরাং কাপড় কিংবা পয়সা ইত্যাদি দান করিলে মুর্দ্দারের পক্ষে অতি রাহাতের কারণ। আবার যাঁহারা এই ছদকা গ্রহণ করিবেন,

তাঁহারা অল্পে তুষ্ট হইয়া মুর্দ্দারকে দোয়া করিবেন। পয়সার লোভ করণ নাই, ইহা অশুদ্ধ। আবার যাহারা ছদকা দান করিয়া থাকেন, তাহাদেরে পক্ষেও যেন কোন বেয়াদবি প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তাহার নেক থাকিবে না। কারণ মুখ কালা নেকের বালা; আর হাসি মুখে নেক বৃদ্ধি পায়। কালা মুখ বদকামের বিছমিল্লা; আর মনকালা বদকারের রীতি মূল।

১৪। কবর আমাদের দেশে উত্তর রোখেই করিতে হয়। যাহারা কাবার পশ্চিমে অবস্থিত, তাহারা দক্ষিণ দিকে কবরের ছেরানা রাখেন। যাঁহারা ক'বা শরীফের উত্তরাংশে তাঁহারা পশ্চিমে ছেরানা এবং যাঁহারা দক্ষিণাংশে তাঁহারা পূর্ব ছেরানা দিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও কহে কেহ পূর্ব ছেরানা কবর দিয়া থাকেন, ইহাও অশুদ্ধ নহে। কারণ শোয়া ব্যক্তির নামাজে পূর্ব তরফই মাথা রাখিতে হয়, ইহাও কাবার তাজাম বটে। এই জন্য এতদ্দেশে অনেক গোর পূর্ব রোখেই পাওয়া গিয়াছে।

১৫। জানাজার চারটি দোয়াকে অর্থাৎ মুর্দ্দারকে সামনে রাখিয়া তাহার সিনা বরাবর খাড়া হওতঃ চারটি দোয়াকে পাঠ করিতে হয়, ইহাকেই নামাজ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। তাহার নিয়ম এই, প্রথম খাড়া হইয়া জানাজার নিয়ত করিবা মাত্রেই আল্লাহু আকবার বলিয়া নামাজের মত হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করণার্থে ছোবহানাকা পড়িয়া পুনরায় ঐরূপ তকবির বলিতে হইবে।

১৬। যদি নিয়ত জানা না থাকে, তবে বাংলা হিন্দি কিংবা ফারসী জবানে হউক না কেন এই প্রকার কহিবে যে, আমি এই জানাজার চারি তককবির নামাজ পড়ি। ইমামের পিছনে যদি ইহা, মুখে বলিতে অসমর্থ হয়, তবে মনে মনে কহিলেই চলিবে। কারণ নিয়ত মুখে পাঠ করা ওয়াজেব নহে। ঠেকা বশতঃ যদি কোন দূর দেশে জানাজা পড়ার উপযুক্ত লোক পাওয়া না যায়, তবে ঐ প্রকার নিয়ত করিয়া এক তকবির কহিবে পর নামাজের ছানা অর্থাৎ ছোবহানাকা লায়লাহা গায়রুকা তক পড়িয়া দ্বিতীয় তকবির কহিবে।

আল্‌হামদু সূরা পাঠ করিয়া তৃতীয় তকবির কহিয়া কুলহুয়াল্লাহু সূরা পাঠ করতঃ চতুর্থ তকবির কহিয়া ডাইন ও বামে সালাম ফিরাইবে। এবং যে দোয়া দরূদ জানা থাকে, তাহা পড়িয়া মুর্দ্দারের বকশিস মানসে থাকিবে। তথাটি মুর্দ্দারকে বেজানাজায় রাখা কর্তব্য নহে। কারণ ইহাতে পৃথিবীর মধ্যে গজব নাজিল হওয়ার কারণ থাকে। অতএব বেনামাজীরও জানাজা পড়া উচিত। কেননা মুর্দ্দার উপর জানাজা পড়া ওয়াজেব নহে বরং উহা জীবিত লোকের উপর পড়া ওয়াজেব। আবার মুর্দ্দারকে কষ্ট দেওয়া কিংবা বেনামাজি বলিয়া র্ভৎসনা করা একেবারেই নিষেধ এমন কি মুর্দ্দার যে রকমই হউক না কেন তাহাকে দোয়া করিতে পারে। মুসলমান বলিয়া ওয়াজেব জ্ঞানে দোয়া করাই ওয়াজেব।

আবার হাদীস কোরানের অর্থ মত আম মতলব বুঝায় অর্থাৎ সকল মুর্দ্দারকে কার্য্য এহ্ছান করণ ইহাই সঙ্গত কার্য্য নতুবা কোন ব্যক্তিরও নম্বর নাই যে কে নেক ও কে বদ। যদি মৃত্যুর কালে বদের পরিবর্তে নেক ও নেকের পরিবর্তে বদে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহাই বা কে বলিতে পারে, তবে কেন বেনামাজির জানাজা পড়িবে না। যাহারা পঞ্চাতী অথবা তুরতুরী ও মোল্লাকী নামাজ পড়িয়া থাকেন অর্থাৎ সমাজের নামাজও ঘাটে মাঠে দুই করস্থ অঙ্গুলি লম্বা লাঠি সোটার উপর নমস্কার রূপে নামাজ পড়াকে তুরতুরী কহে। আবার মোল্লাকি নামাজ পড়িলেই যে হইল তাহা বরং নামাজের মন ঠিকসহ যে নামাজ কায়েম করা তাহা কোরানে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার খেলাপ যে নামাজ তাহাই মোল্লাকি নামাজ। তবে কি তাহারও জানাজা রহিত হইবে। জামেনূর কেতাবে যে কোরানের আয়াতে নামাজের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে তাহার মর্ম্ম নামাজকে কায়েম করাই বুঝায়। আবার কোরানে ইহাও আসিয়াছে যে কোন লোকদিগকে বদগুমান করিও না, কারণ বদগুমান করার মধ্যে অনেকেই বদ আবার এহ্ছানার্থে হাদীস কোরানেও একই মতলব অর্থাৎ মৃতদিগকে নেক বলিয়া কল্পনা কর আমিও তোমাদিগকে নেকী প্রদান এবং মুর্দ্দাগণকেও আরাম প্রদান করিব।

জানাজা নামাজের নিয়ত ও দোয়া (নিয়ত)

نويت ان اودى اربع تكبيرات صلوات الجنازة الثناء لله تعالى والصلوة على النبى والدعاء لهذم الميت متوجها الى جهة الكعبة الشريفة الله اكبر

মৃত স্ত্রীলোক হইলে لهذا الميت এর স্থলে لهذا المية পড়িবে। ও হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া নাভীর নীচে বাঁধিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত দোয়া।

سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجك ثنائك ولا اله غيرك -

পড়িয়া দ্বিতীয় তকবির কহিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত দোয়া-

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وتر حمن على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

পড়িবে ও তৃতীয় তকবির কহিবে। এবং তৎপরে নিম্নলিখিত দোয়া

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشا هدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وانثانا اللهم من احيته منا فا حيه على الاسلام ومن تو فيته منا فتوفه على الايمان -

পড়িয়া চতুর্থ তাকবির কহিবে। আর মৃত শিশু হইলে চতুর্থ তকবির বালকের জন্য নিম্নলিখিত দোয়া।

الهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شا فعا و مشفعا -

পড়িয়া চতুর্থ তাকবির কহিবে। আর মৃত বালিকা হইলে অত্র দোয়ার اجعله শব্দে স্থলে اجعلها এবং شافعاومشفعا শব্দের স্থলে شافعا ومشفعة বলিবে ও চতুর্থ তকবির কহিবে। অতঃপর ডাহিন বামে ছালাম ফিরাইয়া জানাজা শেষ করিবে।

নামাজের বয়ান

নামাজ আজব চিজ সংসার মাঝার।
বহুতর নেয়ামত ভিতরে ইহার ॥
সদরে কোবরার কুঞ্জি জানিবে নামাজ।
রাজ ভাণ্ডারের ধন নামাজের মাঝ ॥
নামাজের বহির্ভাগ নবুয়তময়।
ভিতরেতে বেলায়ৎ পরিপূর্ণ রয় ॥
সদর কোবরার বিচে যত ধন আছে।
সব চিজ খুঁজে পাবে নামাজের বিচে ॥
অন্যত্র খুজিতে নাহি হইবে দরকার।
সমুদয় কামালৎ ইহার মাঝার ॥
এনায়ৎ এবাদত আর তকর রব।
তজম্মল ছলুকের ছফরাদি সব ॥
আফওয়াল আহওয়াল আর দোয়া ও নেয়াজ।
সংসারের হাকিকত নিজ তন মাঝ ॥
নিজ তত্ত্ব অন্য তত্ত্ব তত্ত্ব সংসার।
চেরাগ মানুষ খোলা মেয়ারাজ দ্বার ॥
সে চেরাগে নিজ দৃষ্ট কাবা দৃষ্টতায়।
সে দৃষ্ট চেরাগ জোঁতে সব দেখা যায় ॥
সেই দৃষ্টে হেরে যারা নবী অলী তরে।
আশীর্বাদ ছালামতে নামাজ ভিতরে ॥
السلام عليك ايها النبى وعلى عباد الله الصالحين

আয়নায়ে ছালাত

দেল দর্পণের নূর যাহার স্মরণ।
কেয়ামে জমিনে নেগা ছালাত দর্পণ ॥
খাড়া হালে উচ্চ দেশ শির অধিকার।
ছায়া নূরী আর্শি জোত জমিন মাজার ॥
সে জোতে আলম জাত চেরাগ ছফর।

মেরাজ ভেদাভেদ খোলে যার পর ॥
সে কেয়ামে নদী ডুবি করিছেন যাঁরা ।
খাড়া হালে নামাজেতে রহিছেন তাঁরা ॥
আওতাদ অলীর এই কেয়াম নামাজ ।
নামাজ দর্পণ ফল নূর মেয়ারাজ ॥
ছফর বলন্দ হতে রাহাত মঞ্জেল ।
আরাম রাহাত কর হয় খোশ দেল ॥
যার যেই দেনা পাওনা করণ আদায় ।
নেয়ামত তহশিলের ঘাট কেনারায় ॥

আয়নায়ে কুতবী

কুতবী দর্পণ পরে রাখন নজর ।
অতএব দৃষ্টি করা পায়ের উপর ॥
পায়ের আঙ্গুল গুরু কুতুব দোজন ।
হস্ত পদে শ্রেষ্ঠ চার কুতুব বদন ॥
অতএব নীচে নেগা কুতুব অলীর ।
কেয়াম বৃক্ষের ন্যায় উপরেতে শির ॥
বৃক্ষ ন্যায় এবাদত তাদের তাবত ।
খাড়াভাবে বন্দীগীতে জেন্দেগী যাবত ॥
নামাজির রোকু ধাম নিকট মঞ্জেল ।
কোরবত মোকামে সিদ্ধ নামাজ কামেল ॥
قوله تعالى نحن اقرب اليه من حبل الوريد هم بهت قريب
ترهين طرف اسكى گردان كى شهه رگ سى
ঘেটি মূল রগ হতে নিকট খোদায় ।
রুকুতে ইসারা তাই গরদান ঝুকায় ॥
সে রগের শান খুবী যাহার গরদান ।
তাহার নামাজ মূল তৌহিদ নেশান ॥
وهو معكم اين ما كنتم
নিকটির সার হতে একত্রিত গুণ ।
নিকটস্থ হতে বেশী গুণেতে আপন ॥
দুই গুণ একসনে হওয়া এক সাত ।
পানি চিনি এক স্থানে নহে সে তফাত ॥
মকাম ছজুদা এই পদ্দ তালুদেশ ।

গোলাকার হৃদপিণ্ডে খোদার খাহেস ॥
জাহের মজহার যার নহর মহমুদ ।
দোন ভোর মধ্যে নাক আনওয়ার ছজুদ ॥
মকাম মহমুদা নূর জাহের যাহার ।
নাম মূলে ভুরু দ্বারে এঞ্জেন তাহার ॥

আয়নায়ে খোদা নামা

নাছিরা কুঞ্জির জোরে খোলে যার ধন ।
খোদাই দর্পণ এই নহর মদন ॥
নামাজেতে নাক নেঘা তাই বরাবর ।
নাক শিরে ছজদাতে করণ নজর ॥

ছজুদা দুই কেন?

দোন মধ্যে গুণাগুণ মূলে বেশ কম ।
পিছান ছজুদা মূল অনেক উত্তম ॥

রূকু কেন?

ছফরের পরে হয় আবার ছফর ।
ঠরণ মঞ্জেল তাই আরামের ঘর ॥

দো রেকাত কেন?

আপন শুকুর আর শুকুর খোদার ।
দো'রেকাত জোড় জোড় একে বাদেগার ॥

বসা কেন?

দো'রেকাত পরে বসা দোন তরফের ।
মোসাহেদা এক সনে আওয়াল আখের ॥

আয়নায়ে আলম

ছিনা বুকে নেগা করা আলম আয়নায় ।
পৃথিবীর ভেদাভেদ প্রকাশিবে তায় ॥

চার রেকাত কেন?

চার রেকাত চার কোন মোরাব্বা নূরানী ।
তিনে হয় তিন দরজা গুণে গুণমণি ॥
মোর্শেদ রছুল গুণে গুণ নিত্য ধন ।
রছুল আহাদ গুনে তিন একতন ॥
তিনে তনু মূলে মনু চার অলঙ্কার ।
চার এক সব ফাক এক নিরাকার ॥
কেমন আকার আর কোথা নিরাকার
কে হে'রেছে কে দেখিছে বাক্য চমৎকার ॥
তিন কেন এক বলা সেও এক নয় ।
এক বলা নৈরাকারে কিসে পরিচয় ॥
এক বলা নিরাকার হইতে না পারে ।
এক দুই গুণগান হইতে হইবে সাকারে ॥
সত্য লেখ সত্য পড় সত্য কর গান ।
ঘোড় ডিম্বু বাক্য শুধু আকাশ সমান ॥
না হেরিলাম না দেখিলাম না শুনিলাম যারে ।
আক্কল গেয়ানে যারে নহে ধরিবারে ॥
তবে তার কোন গুণে আনি অধিকার ।
দেখিলে না চিনি তারে নিকটে আমার ॥
কি গুণের ভক্তি তার গুণের নামাজ ।
কর কার্য যার রাজ্য কর না সমাজ ॥
চিন দিলে চিনা নাই একি মহা দায় ।
তালাসিলে যারে তুমি কাছে হতে যায় ॥
জিজ্ঞাসিছ যার ঠাঁই তাহার তালাশ ।
সরলেতে চিন দিলে কর অভিহাস ॥
বিশ্বাসের ঘরে যেই নারে যাইবারে ।
অবিশ্বাসে হাস্য করে তালাসিছে যারে ॥

রোজার বয়ান

নামাজের ন্যায় রোজা রাখাও ফরজ। রমজান মাসের ৩০টা রোজায় ৩০টা বুরাই দূর হইয়া ৩০টা নূর হাছেল হয়। এই রোজা দ্বারা ঈমান বিমল হয়, নেক কাজে মন যায় ও নানাবিধ পীড়া হইতে মুক্তি ঘটে। এতদ্ভিন্ন নফল রোজা রাখাতেও অনেক ফল কেতাবে লিখিত আছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের "মদিনা" নামক কিতাবে লিখা গিয়াছে।

আইনাইন

সূচি

আল্লাহর জাত ও গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য কী? ৪২৫
আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের রুহ মোবারক প্রকাশিত হতে পারেন কি না? ৪২৮
আল্লাহ আপন সত্তা থেকে কিছু সৃষ্টি করেন না, এর জবাব কী? ৪৩১
জায়েদ বলে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে বান্দার কোনো দখল নেই ৪৩১
আল্লাহর জাত বা সত্তাও মজুদ তথা বর্তমান ৪৩২
তাসদিক কী? ঈমান কাকে বলে? ৪৩৩
আদম (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) এর সিজদা ফরজ ছিল কি না? ৪৩৫
নামাজ আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তবে তাতে অন্যের তাজিম রয়েছে ৪৪১
কে তোমাদের নিষেধ করল সিজদা করতে, এ বাণীর মর্মার্থ ৪৪২
আল্লাহ্‌র জন্য কি কেবল সিজদাই নির্ধারিত? ৪৪২
সিজদা, দাঁড়ানো, উঠা, বসা, ইত্যাদি কার্যাদির ব্যাপারে আইন কী? ৪৪৩
ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ৪৪৪
সিজদা সম্পর্কে কোরান শরীফের একটি আয়াত ৪৪৪
সিজদা সম্পর্কে মেশকাত শরীফের একটি হাদিস ৪৪৫
সম্মানার্থে সিজদা ৪৪৯
হযরত আদম (আঃ)কে ফেরেস্তাগণ কেন সিজদা করেছিল? ৪৪৯
অন্যকে সিজদা করতে মন চায় না, কারণ এটা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ৪৪৯
পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের চালুকৃত শুভ অনুষ্ঠানাদি ৪৫০
আদব আচরণাদির মধ্যে সিজদাও অন্তর্ভুক্ত কি না ৪৫২
সিজদা, সম্মান, অথবা ভক্তি পেতে হলে তাকে বুজুর্গ অবশ্যই হতে হবে। ৪৫৩
নবী না হয়েও মর্যাদায় নবীর চেয়ে বুজুর্গ হতে পারেন কি? ৪৫৪
মিলাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কেয়াম করা কী? ৪৫৫
সম্মান প্রদর্শনের তাৎপর্য কী? ৪৫৭
যা ফরজ বা ওয়াজেব নয় ৪৫৮
কোনো কোনো ফেকার কিতাবে মিলাদ কেয়াম ইত্যাদিকে ৪৫৯
কোরান খতম ও মিলাদ শরীফ পড়ে যে টাকা পয়সা গ্রহণ করা হয় ৪৫৯
নবী-অলি এবং পূণ্যবান বান্দাগণ কখনও কাফের হন কি? ৪৬০
বার বার যারা ঈমান আনে আবার কাফের হয় ৪৬০
ফেকাহ গ্রন্থাদিতে কুফর অর্থে ব্যবহৃত বাক্য ৪৬০
মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে দেখেন কি না ৪৬১
কেউ কেউ বলে আল্লাহ্‌কে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখার প্রমাণ নেই ৪৬২
কারো কারো প্রশ্ন যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে পাননি ৪৬৪
সিজদায় জমিনে মাথা লাগানো হয় এবং কাবার উপর লাগানো হয় না কেন? ৪৬৫
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু চাইবে না ৪৬৬
উসিলা হিসাবে জমিনের মালিক অন্যকে তা দান করতে পারেন কি না ৪৬৭
সাধারণ লোকদের ভয় দেখানোর জন্য এসব হাদিস বলা হয়েছে কি ৪৬৮
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলদের তাবেদারি কাকে বলে? ৪৬৯
"হাল জাজাউল এহ্‌সানে ইল্লাল এহ্‌সান" এর অর্থ কী? ৪৭২
কোনো বিষয়ে হারাম প্রমাণের জন্য কোরানিক দলিল প্রয়োজন কি? ৪৭৫
আম্বিয়া আউলিয়াগণের জন্য নজর নেয়াজ ৪৭৬
আম্বিয়া আউলিয়াগণের রূহ মোবারক পানাহার করেন ৪৭৯
আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর মাজার সৌধে এত সৌন্দর্য বিধান কেন? ৪৮১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন নং ১

আল্লাহর জাত তথা সত্তা এবং সিফাত তথা গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য কী? বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রকাশ বলতে কী বুঝায়? কোন উৎস থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি জগতের প্রকাশ ঘটান? এবং জীবন-মরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সত্তা ও গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং যা সত্তা তাই গুণ। অর্থাৎ, গুণাবলির সমষ্টিই সত্তা। অর্থাৎ, যেমন গুণাবলি ছাড়া সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা অসম্ভব তেমনি সত্তা ছাড়া গুণাবলির প্রকাশও সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো ফলকে তখনই ফল বলা হয়, যদি তাতে তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণাবলি বর্তমান থাকে। মিঠা, তিতা, লবণ, অম্ল, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ এবং রংঢং ইত্যকার বহু গুণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে জাত প্রমাণিত হয়। আর যদি এ সকল গুণাবলি জাত থেকে আলাদা করে ফেলা হয় তাহলে কোনোকিছুই থাকবে না, বস্তুত যাকে সত্তা বলা যায়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সত্তার ফল গুণাবলি আর গুণাবলির চূড়ান্ত পরিণাম সত্তা। এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং এরা কেউ কারো বদল বা স্থলাভিষিক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে যারা বলেন গুণাবলি সত্তাও নয় আর সত্তা বহির্ভূতও নয়– তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাহলে সত্তা ও গুণের সংজ্ঞা কী? এতো একটি অযথা ও অমূলক কথা। বিশ্ব জগতের সৃষ্টিতো সত্তার চরম উৎকর্ষ এবং গুণাবলির সম্পূর্ণ প্রকাশেরই প্রমাণ। অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র অনন্ত সত্তায় বর্তমান সমুদয় সৃষ্টির তাবত গুণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত উৎস থেকে সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়। যেমন একটি আটি থেকে বহু ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষ জন্মায়। বৃক্ষটিতে এমন কোনো বস্তু থাকে না এর আটি সত্তায় যা নেই। বরং বৃক্ষটির মূল থেকে শাখা-প্রশাখা, ফল ও পত্র-পল্লবাদির জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান উৎসই আটিতে বর্তমান রয়েছে। এতে এটাই প্রমাণ করে যে, সৃষ্টিতে তাঁর উৎসের মূল সত্তাই প্রকাশ হয়। অর্থাৎ মূল সত্তার প্রকাশিত উৎকর্ষে এবং মাহাত্ম্যের দীপ্তলোকে বিশ্বজগতের প্রকাশ হয়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে মনোযোগের সাথে 'জামেনূর'-এর প্রথম খণ্ড পাঠ করুন। আল্লাহর সত্তা থেকে সকল বিশ্বজগতের সৃষ্টি কথাটির অর্থ এই যে, সৃষ্টির উৎসরূপ আল্লাহর যে সত্তা প্রত্যেকটি সৃষ্টি মোতাবেক এক একটি জগৎ। তা থেকেই প্রত্যেকটি বস্তু আলাদা আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আটি থেকে বৃক্ষ উৎপাদিত হয়। আর আটি হয় ভূমি প্রভৃতি থেকে, ভূমির সৃষ্টি হয় পানি থেকে, পানির সৃষ্টি হয় বাতাস থেকে আর বাতাস আগুন থেকে, আগুন আর্দ্রতা অর্থাৎ পদার্থ চতুষ্টয়ের মূল থেকে, আর্দ্রতা স্রষ্টার আদি সৃষ্টির ইচ্ছা থেকে, ইচ্ছার সৃষ্টি সৃষ্টি-নৈপুণ্যের থেকে, সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সৃষ্টি এর চূড়ান্ত ভাণ্ডার থেকে আর চূড়ান্ত ভাণ্ডারের সৃষ্টি প্রেম থেকে, প্রেমের সৃষ্টি রূহ থেকে এবং রূহের সৃষ্টি আল্লাহর মূল

সত্তা থেকে। আল্লাহর এই চূড়ান্ত সত্তাই সব সৃষ্টির মূল উৎস। তা না হলে কিছুই হত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

والله بكل شئ محيط

"ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়্যিন মুহিত"

অর্থাৎ, "আল্লাহ সব বস্তুতে আবিষ্ট।" উল্লেখ্য, সৃষ্টিজগৎ, সৃষ্টি-নৈপুণ্য প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে যখন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখন প্রত্যেকটি পর্যায়েই তাকে সুস্পষ্ট পরিপূর্ণ জগৎ মনে হয় এবং মনে হয় এখানেই সৃষ্টির সমাপ্তি। আবার যখন মৌল প্রাণীস্তর হয়ে পর্যায়ক্রমে নানা স্তরে আল্লাহর আদি ইচ্ছা রূপান্তরিত হতে থাকে তখনও প্রত্যেক স্তরে উহাকে সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ বিশ্ব মনে হয়। এ পৃথিবী তো বিশ্বসৃষ্টির অন্যতম পর্যায়। এটাকেও বৈশিষ্ট্যাদি এবং প্রাণিকুলের প্রকাশ দেখে সৃষ্টিজগতের চূড়ান্ত পর্যায় বলে ধারণা হয়। বস্তুত বিশ্বের মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক সবকিছুর সমন্বয়েই এক একটি সৃষ্টিজগৎ ধরা হয়।

মূলের বিচারে এগুলো সবই এক একটি বিশ্ব এবং এর প্রকাশ জাতি উৎস মৌল উপাদান, সবই এর সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ যেমন বৃক্ষের উৎস আটি। এ বৃক্ষের পর্যায় যেমন উৎস শাখা-প্রশাখার প্রকাশ্য স্থিতি, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্তরকেই এক একটি বিশ্ব বলা হয়। এর প্রকাশ হওয়া গোপন হওয়া রূপান্তর ও স্থিতির কারণ তথা বিবর্তন রহস্যের সৌকর্য আদি অন্ত এবং জাহের বাতেন সব পর্যায়ে উন্মুক্ত এবং সদা সর্বত্র বর্তমান রয়েছে। এটাই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির রহস্য। হাকিকত ও আল্লাহত্বের প্রেক্ষিতে এ একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় এক জগৎ থেকে অন্য জগতে রূপান্তরই মৃতাবস্থা। এক্ষেত্রে আপন জগৎ ত্যাগ করতে ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। বস্তুত এ প্রকাশ এবং পরিবর্তনই প্রকৃত জীবন। এখানে সৃষ্টির আপন পূর্ণতা ও ব্যর্থতার প্রকাশ এবং ফলাফলের অবস্থান ও স্থিতি রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষের আটিটি যখন মাটিতে পচনপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে ধীরে ধীরে বৃক্ষ উদ্‌গত হতে থাকে তখন মনে হয় তা যেন জীবন থেকে মরণের দিকে যেতে যেতে আবার জীবন প্রাপ্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। সুতরাং যখনই মৃত্যুবরণ করা তখনই জীবনপ্রাপ্ত হওয়া। বস্তুত মৃত্যুই প্রকৃত নতুন জীবন। এর অর্থ হল আপন আদি উৎস থেকে উদ্‌গত হয়ে উৎস পরম্পরায় নিজেকে প্রকাশ করা। বরং সে একই সত্তা আউয়াল আখের তথা আদিঅন্ত ভ্রমণান্তে জাহের তথা প্রকাশিত হয়।

كل شئ اليه ترجعون

"কুল্লু শাইয়্যিন ইলাইহী তুরজাউন।"

অর্থাৎ, "সকল বস্তুই স্ব স্ব উৎসে প্রত্যাগমনশীল।" এ শাশ্বত নীতির ফলে বাতেন অর্থাৎ, গোপন পথে আপন আদি সত্তায় প্রত্যাগত হয়। এভাবে আল্লাহর সৃজন ইচ্ছার অধীনে তারই আদি সত্তায় লুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী সত্তার প্রকাশ ঘটে। অতঃপর আপন সৃষ্টির সত্তার আওতায় থেকে আদি অনন্য একক উৎসের আলোকে নিজে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে একেবারে আদিতে যেরূপে ছিলেন সে রূপ ধারণ করে আল্লাহর সত্তায় উন্নীত ও উপনীত হয়। এ স্তরেই আল্লাহ গুণাবলিতে মহানরূপে প্রকাশিত হন। এ পূর্ণতা সহকারেই আল্লাহ সর্বত্র সকল সৃষ্টিতে দীপ্তিমান। এভাবে বিশ্বজগৎ একেরই বহুবিধ প্রকাশ এবং একেরই মাহাত্ম্যগত বহুবিধ সৌকর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা। এতে আল্লাহর সত্তা বহুবিধ পরিণতিযুক্ত হলেও তা বীজ ও বৃক্ষের মতো। যেমন বীজের প্রকৃত প্রকাশ বৃক্ষ আবার তেমনি বৃক্ষের প্রকৃত পরিণতি বা প্রকাশও বীজ।

উল্লেখ্য, প্রকাশ ও পরিণতির বিচারে বীজে যেমন বহুত্ব বর্তমান অর্থাৎ একটি মাত্র বীজ থেকে হাজারো বৃক্ষ ও বৃক্ষের উৎস উদগত হয় এবং তা থেকে আবার হাজারো বীজ ও বৃক্ষ উদগমন করে, আল্লাহর সত্তাও তেমনি বহুত্ব বিশিষ্ট। এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সুন্দরের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এভাবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জীবনদানকারী ও পরিবর্ধনকারী হওয়ার ফলেই সকল সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য।

মৃত্যুবরণ করা অথবা রূপান্তরিত হওয়া প্রকৃতই নতুন জীবনলাভ করা। সুতরাং কোনো সৃষ্টি যতক্ষণ আপন উৎসগত হওয়ার সাধনায় বিজয়ী হতে বা সিদ্ধিলাভ করতে না পারে ততক্ষণ সে আত্মবিস্মৃত এবং আপন উৎস থেকে গাফেল অবস্থায় অচৈতন্য ও অপবিত্রতার শিকার হয়ে থাকে। এ অবস্থায় কারও মৃত্যু হলে সে কাফের ও ফাসেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এখানে কাফের ও ফাসেক অর্থ ব্যর্থ বা উৎসচ্যুত। তার আরও সংস্কার ও সংশোধন বা শুদ্ধায়ন প্রয়োজন। এজন্য তাকে সৃষ্টিরূপে জন্ম-জন্মান্তরে আরও থাকতে হবে।

জমিন থেকে যেমন মিঠা, তিতা বস্তু জন্মে তেমনি একই মৌল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েও কেউ জ্যোতির্ময় স্রষ্টার কৃপায় উন্নত হয়ে তথাগত হয়, আবার কেউ জ্যোতি বঞ্চিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে তেলাপোকার মতো অপবিত্র ও দূষিত হয়ে যায়। এভাবে একই সৃষ্টিজগৎ বিভিন্ন সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়। তা সত্ত্বেও ভূমির মতোই বহু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আল্লাহর সত্তা ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোনো উৎস বা উপাদান নেই। তাছাড়া আর কোনো সৃষ্টি-নৈপুণ্য বা সৃষ্টিকল্প নেই যা থেকে সমগ্র বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে, এবং আসবে ও যাবে। এ সৃষ্টিকল্প কেন্দ্রেই সব কিছুর নিয়তি নির্ধারিত ও এ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, মৌলিকত্বের বিচারে বা হাকিকতে ভালোমন্দ বলে কিছু নেই। ভূমি থেকে বৃক্ষাদি এবং প্রাণিকুলের সৃষ্টি হয়। এগুলো সম্পর্কে ভালোমন্দের যে ধারণা তার কারণ এগুলোর গুণাবলির পার্থক্য এবং যুগের বিবর্তনে সমাজে রুচির পরিবর্তন। ভূমি থেকে যেসব বস্তু পয়দা হয় তা সবই জীবন, মৃত্যু এবং অন্য বহু

গুণ যুক্ত হয়েই পয়দা হয় এবং মৃত্যুর পরও ভূমির পরশে তা ঐসব গুণাবলি পুনঃপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আপনার মধ্যে ভূমির জীবন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ভূমি সকল ভূ-বাসীর উৎস। এজন্য ভূমি ভূ-বাসীর কাছে মাতৃমর্যাদায় স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত সৃষ্টির চাদর ভূদেহে লেপটে রয়েছে। তা থেকেই সময়মতো তা প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন নং ২

আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের রূহ মোবারক নশ্বর পৃথিবীতে প্রকাশ্য স্থানে আপন অর্জিত মর্যাদার বলে প্রকাশিত হতে পারেন কি না? এবং একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আপন ব্যক্তি সত্তায় গুণাগুণ সহকারে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পারেন। রূহ অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং তা একই সময়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে আপন অস্তিত্ব প্রকাশ করতে পারেন। রূহের এ ক্ষমতার বদৌলতেই সৃষ্টির ব্যাপক প্রসারে স্রষ্টার যে ইচ্ছা রয়েছে তা বাস্তবায়িত হয়। সদা সর্বত্র বিশ্ব জুড়ে এ প্রক্রিয়াই কার্যকর হচ্ছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং বেতার পদ্ধতি এক মুহূর্তের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে যেভাবে আপন আওতাভুক্ত করে সৃষ্টি প্রক্রিয়াও সেভাবে মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র কার্যকর হয়। এটা অতি আশ্চর্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান। এ বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো গরুর খাদ্য ও ঘাস থেকে দুধ উৎপাদন করে এবং কৃত্রিম উপায়ে মুরগির ডিম থেকে এ বাচ্চা জন্মায়। তা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানুষ প্রযুক্তির সাহায্যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায়। আর আল্লাহর তরফ থেকে তা হতে এক মাস সময় লাগে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

অবিলম্বে আল্লাহর তরফ থেকে এসব বাচ্চার হাত-পা সৃষ্টি হয়। এর ব্যাপক বাণিজ্য চলছে। এতে বোঝা যায় যে, এ প্রযুক্তি বা জ্ঞানও কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নয়। বরং অন্যরাও এর অধিকারী হতে পারে। বড়ই আশ্চর্য যে, বাপের মধ্যে সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা রয়েছে তাও লোকে জানে না। বাপের মধ্যে সে ক্ষমতা না থাকলে সন্তানের জন্ম হয় না। কিন্তু তাও অনেকেরই বুঝে আসে না।

অনুরূপ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি বা জন্ম ক্ষমতা রয়েছে। এজন্যই জন্ম প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। কেউ যদি সে বিদ্যা বা জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে তা অতি উত্তম কাজ। তাতে মানুষ কাফের হবে কেন? বরং এজন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং প্রার্থনা করা উচিত হে আল্লাহ আমাদেরকে অনুরূপ উন্নত জ্ঞান দান করো যাতে আমরাও জানতে পারি যে, মানুষও সৃষ্টি করতে পারে।

অজ্ঞরা জানে না যে, সৃষ্টি বা প্রকাশিত হওয়া এ এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া। বোকা হয়ে জন্মগ্রহণকারী এটাও জানে না যে সে বোকা। উল্লেখ্য, জ্ঞানীগণ যে জ্ঞানভাণ্ডার

রেখে গেছেন, তা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নতুন নতুন জ্ঞান প্রকাশ হতে থাকবে। এরই নাম খুলক বা প্রকৃতি। আসা যাওয়া এবং দৃশ্যমান হওয়া সব সৃষ্টির স্বাভাবিক ও সাধারণ কর্ম। এটা সকলের কাছে পরিষ্কার। আর তাৎক্ষণিকভাবে হাজির হওয়া রূহের প্রকৃতি এবং ক্ষমতাধীন এটাও সকলের জানা।

হয়ত এটাও জানা আছে যে, সূক্ষ্ম দেহ রূহের তাবেদার কিন্তু রূহ এবং আল্লাহর প্রকাশ বা দৃশ্যমান হওয়ার কথা অনেকেই জানে না। এ বিষয়ে তারা বোকা। এজন্য তাঁরা রুহের প্রকাশিত বা দৃশ্যমান হওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করে। এটা কুফরী এবং অজ্ঞ হঠকারিতা। অজ্ঞতা দূর হলেই তারা তা বুঝতে পারবে এবং তাদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হবে। সে যা হোক রূহ আদি সৃষ্টিকল্পের মূল রহস্যভাণ্ডার বিধায় তা উক্ত উদাহরণের চেয়ে হাজারো গুণ সূক্ষ্ম। তা আল্লাহ ভালো জানেন। এ বিষয়ে যার জ্ঞান নেই সেতো তা অস্বীকার করবেই। তবে প্রসারিত অন্তরের অধিকারী স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের সৌকর্য চমৎকার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, "স্বয়ং তিনি মুহাম্মদ (সাঃ) স্ব-শক্তিতে সামিল মাহফিলে মিলাদে।" তাদের কাছে নবী-অলিদের রূহের তাৎক্ষণিক প্রকাশ দৃশ্যমান হওয়া অজানা নয়। আল কোরানের বাণী এ বুজুর্গি ও সত্যতা প্রকাশের সম্ভাব্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ বলেন,

حتى يلج الجمل فى سم الخياط ط

"হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সামমিল খিয়াত।"

অর্থাৎ, "এমনকি সুইয়ের গর্ত দিয়ে উট বহর গমন করতে পারে।" (সূরা আরাফ : রুকু ৪)। সুইয়ের গর্তে প্রবেশকারী উট বহরের তুলনায় রূহ অতি সূক্ষ্ম। তাপযন্ত্রে সূর্য তাপের প্রকাশ কি আশ্চর্য নয়? আগুনও তো সদা সর্বত্র স্বীয় নিরূপিত প্রকাশ প্রক্রিয়ায় প্রজ্বলিত রয়েছে। সারা বিশ্বে আগুনের এ অস্তিত্বের স্বীকৃতি কি আল্লাহর সাথে শির্ক হবে? উল্লেখ্য, চার পদার্থের মূল যা সমস্ত বস্তুর উৎস উপাদান রূহ তা থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্ম।

বস্তুত রূহ আপন সূক্ষ্মতায় বিশ্ব পরিমণ্ডলে আবিষ্ট হয়ে নিজ উৎসমূলে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং তা প্রতি মুহূর্তে বিশ্বজগতে জ্যোতি ছড়াচ্ছে। বস্তুত উহার প্রকাশ থেকেই সবকিছু প্রকাশিত হচ্ছে। উহার সৌজন্যেই রূহ সদা সজীব। মূলে সম্পৃক্ত না থাকলে রূহ মরে যাবে। মূলত এ সূক্ষ্ম সত্তাই সকল বস্তুর উৎস। এটা আল্লাহ প্রদত্ত। সৃষ্টি জগতের বিস্তারিত প্রসার হচ্ছে। এ ক্ষমতা আল্লাহ কেবল নিজের মধ্যে সীমিত করে রাখেননি। বীজের মধ্যে বৃক্ষাদি উদ্‌গমনের যে ক্ষমতা রয়েছে এবং পিতার ভেতর প্রজননের যে শক্তি মজুদ আছে তাও তো আল্লাহ কেবল নিজের মধ্যেই নিজের জন্য নির্ধারিত ও সীমিত করে রাখেননি। এটাতো বান্দার জন্য বরাদ্দকৃত আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা। আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন এমন কোনো প্রমাণতো নেই।

সে যাহোক, আলোচ্য জ্ঞানে বঞ্চিত ব্যক্তির অন্তত এটা জ্ঞান করা উচিত যে, আল্লাহ তার যা ইচ্ছা এক মুহূর্তে যেমন প্রকাশ করতে পারেন তেমনি পারেন তিনি যে কোনো বস্তু যখন ইচ্ছা ধ্বংস করে দিতে এবং পারেন তিনি কঠিন বস্তুকে নরম আর নরম বস্তুকে কঠিন করে দিতে। আল্লাহ যদি সুইয়ের গর্তে পাহাড় প্রবেশ করিয়ে দেন তাতেই বা আশ্চর্যের কি আছে? রূহ কি মুহূর্তে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে না? সুতরাং রূহের ভ্রমণ করা যখন প্রমাণিত ও স্বীকৃত তখন এর প্রকাশ বা দৃশ্যমান হওয়া অপ্রমাণিত বা অস্বীকার্য হবে কেন? বস্তুত কোনো ব্যক্তি যখন কোনো স্থানে আগমন করে, তখন সে তার চেহারা-চরিত, জ্ঞান-গরিমা ও পূর্ণতার সব বৈশিষ্ট্যসহই দৃশ্যমান হয়।

অন্যথায় তার আগমন বা উপস্থিতি অর্থহীন হয়ে যায়। বস্তুত এমনটা হতে পারে না। চির মূর্খ, অজ্ঞতার অন্ধকারে যে কিছু দেখে না সে কুফরির বোঝাকে জ্ঞান ধারণা করে চির কাফেরই রয়ে যায়। সুতরাং নূরাণী রূহ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান হয় না। আর অন্ধেরতো বাতির দরকারই নেই।

মিলাদ মাহ্‌ফিলে আম্বিয়াদের রূহ কি হাজির হয় না? মিলাদ মাহ্‌ফিলে আম্বিয়া এবং ফেরেশতাদের এমনকি বিবি আছিয়া, হাজেরা এবং মরিয়ম (আঃ) এর উপস্থিতি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাজির হওয়া কি নিষেধ আছে? কাবা একটি পাথর, নামাজে তাকে সামনে অতি নিকটে মনে করাও বৈধ এবং পুণ্যের কাজ। এমতাবস্থায় সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট নূরী রূহের অধিকারী যার প্রকাশ স্বয়ং আল্লাহর প্রকাশেরই প্রতিচ্ছায়া এবং যে মানুষ আল্লাহর লুপ্ত ও গুপ্ত রহস্যতাকে যথেচ্ছ হাজির ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা কি নিষেধ? স্বয়ং হাদিস কুদসী সাক্ষ্য দেয় যে–

كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصرو ويده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها والسانه الذى يتكلم به *

"কুনতু সামিয়াহুল্লাজি ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাছারুল্লাজি ইয়াবছিরু বিহি ওয়া ইয়াদাহুল্লাতি ইয়াব তিশু বিহা ওয়া রিজালাহুল্লাতি ইয়ামশি বিহা ওয়া লিসানু হুল্লাজি ইয়া তাকাল্লামু বিহি।"

অর্থাৎ "আমি আমার প্রেমিক বান্দার কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা এবং মুখ হয়ে যাই যা দ্বারা তিনি শোনেন, দেখেন, ধরেন, হাঁটেন ও কথা বলেন। আল্লাহ যখন কারও গোপন অর্থাৎ, কেউ যখন আল্লাহর বিচরণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তখন একই মুহূর্তে তিনি উভয় জগতে ভ্রমণ করেন।

তাহলে তিনি মিলাদ মাহফিলে হাজির হতে পারবেন না কেন? রূহের প্রকাশ ক্ষমতায় অস্বীকৃতি শয়তানের অজ্ঞতা তুল্য। আদম (আঃ) এর মধ্যে এই গোপন রহস্যের উদ্‌ঘাটনের জন্যই আদম (আঃ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করা হয়। স্থূল বুদ্ধি মেজাজি শয়তান তা বুঝতে না পারার কারণে সিজদা দিতে অস্বীকার করে চির কাফেরে পরিণত হয়েছে। হাজারও খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তি

নবী-অলিগণকে স্বপ্নে, কাশফে এবং ধ্যানে প্রত্যক্ষ করে থাকে তাতে শির্ক হয় না।

এমতাবস্থায় কোন দোষে নবী-অলিগণকে সামনে হাজির মনে করা শির্ক হবে? এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোরান ও হাদিসের অতি প্রাকৃতিক তথা রহস্যপূর্ণ বক্তব্যাদি যা নিজের জ্ঞান বুদ্ধি মোতাবেক দার্শনিক প্রচলিত নীতিগ্রাহ্য হয় না তাকে চিরন্তন মিথ্যা মনে করা। আল্লাহ বলেন-

بل كذبوا مالم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله - واذا لم يعتدوا به فيقلون هذا افك قديم *

"বাল কাজজাবু মা লাম ইউহিতু বি ইলমিহি ওয়া লাম্মা ইয়াতিহীম তাবিলুহু ওয়া ইজা লাম ইয়াহ্তাদু বিহি ফায়্যাকুলু না হাজা ইফকুন ক্বাদিম।"

অর্থাৎ, "তারা মিথ্যারোপ করে যখন কোনো কিছু তাদের জ্ঞানের পরিধিতে না আসে। এবং যখন উহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং তাতেও তাদের ভ্রষ্টতা দূর না হয় তখন তারা বলে এটা পুরনো মিথ্যা কথা।"

প্রশ্ন নং ৩

জায়েদ বলে যে, আল্লাহ আপন সত্তা থেকে কিছু সৃষ্টি করেন না, এমনিতেই সৃষ্টি করেন। এর জবাব কী?

উত্তর : 'এমনিতেই' শব্দের কোনোই অর্থ নেই এবং এটা নিরেট অজ্ঞতা প্রসূত। 'এমনিতেই' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রশ্নকারী একজন চরম মূর্খ। এ অর্থহীন শব্দটি ব্যাখ্যা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় তাহলে সে ব্যাখ্যা করুক।

আল্লাহ বলেন,

ولقد صرفنا فى هذا القران من كل مثل وكان الانسان اكثر شئ جدلا *

"ওয়া লাকাদ সোয়ারাফনা ফি হাজাল কুরআনি মিন কুল্লি মাসালিন ওয়াকানাল ইনসানু আকসারা শাইয়্যিন জাদালা।"

মোট কথা, আল কোরানে সব বিষয়ের জ্ঞান বিজ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ লোক তা না জেনে ঝগড়া করে।

প্রশ্ন নং ৪

জায়েদ বলে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে বান্দার কোনো দখল নেই?

উত্তর : বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ভুল এবং মিথ্যা। কারণ বান্দার নিজে থেকে কোনো জ্ঞান নেই। বরং আল্লাহ থেকেই সমস্ত বস্তু প্রমাণিত। সবকিছুর চূড়ান্ত ভাণ্ডার

হিসেবে তা থেকেই সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রকাশ। এ ভাণ্ডার থেকেই জ্ঞান গরিমা, ক্রোধ, দয়া এবং কার্যাদি ও কথাবার্তা অস্তিত্ব পায়। অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে যে গুণাবলি দান করেন সে কেবল সেটুকুরই অধিকারী হয়।

আল্লাহ যাকে যে জ্ঞান দান করেন, তা সে চূড়ান্ত ভাণ্ডার থেকেই আসে এবং এটাকেই "ইলমে গায়েব" বা গুপ্ত জ্ঞান বলা হয়। এখানে গায়েব অর্থ অজ্ঞাত এবং অজানা এবং তা থেকে আল্লাহ যাকে যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান দান করেন তা-ই বান্দার জ্ঞান। অতঃপর বান্দার এ জ্ঞানকে উৎসের প্রেক্ষিতে অপ্রকৃত, প্রকৃত এবং রূপক ও মৌলিক বলা হয়। বস্তুত 'ইলমে গায়েব' বলে কিছু নেই। কারণ 'ইল্ম' অর্থ জানা। আর যা জ্ঞাত বা জানা তা গায়েব হতে পারে না।

প্রশ্ন নং ৫

জায়েদ বলে সমগ্র সৃষ্টিতে আল্লাহর জ্ঞান ব্যাপ্ত, জাত বা সত্তা নয়। আর আমরের দাবি হল আল্লাহর জাত বা সত্তাও মজুদ তথা বর্তমান। তাহলে কার কথা সঠিক?

উত্তর : আমরের দাবি সঠিক। কারণ সত্তা একটি মৌলিক উপাদান। যার মধ্যে জ্ঞান ও গুণাবলি বর্তমান। অর্থাৎ, সত্তার পরিণতি গুণাবলি, আর গুণাবলির পরিণাম সত্তা। অর্থাৎ, সত্তা ও গুণাবলির অস্তিত্ব পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব সত্তা ছাড়া জ্ঞানের প্রকাশ হতে পারে না। বস্তুত বর্তমান সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সত্তাসহ গুণাবলি মজুদ রয়েছে। এ বিষয়ে যারা জানেন তাদের নিকট এটা জ্ঞাত। এমনকি একটু অণু বা বিন্দুও তার সত্তার বাইরে নয়। কারণ, যেহেতু আল্লাহর সত্তাই সব সৃষ্টির মৌল উৎস, সেহেতু তা ব্যতীত মর্যাদা অথবা জ্ঞান প্রভৃতি কোনো গুণই প্রকাশ লাভ করতেই পারে না। বস্তুত যেহেতু সবকিছুর মূল উৎস আল্লাহর সত্তা সেহেতু সবকিছুতেই সর্বাগ্রে সে সত্তার অস্তিত্ব অনিবার্য। এবং তা থেকে প্রকাশিত হয় বিধায় তার অন্যান্য গুণাবলি সে সাথে প্রকাশ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। বীজ ছাড়া বৃক্ষের উদ্গমন যেমন সম্ভব নয় তেমনি জ্ঞান ও তার উৎস ও মৌল উপাদান ছাড়া প্রকাশ লাভ করতে পারে না। জ্ঞানকে যে রূপক ও অযথার্থ বলা হয় তা তার কার্যকারিতার প্রেক্ষিতে। জ্ঞানের উৎস আর এর প্রকাশ মাধ্যমের পার্থক্য বুঝতে হবে। তা না হলে সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার ইচ্ছা কার্যকর এ তত্ত্ব অক্ষুণ্ন থাকে না। এ কারণেই বলা হয়েছে–

والله بكل شئ محيط *

"ওয়াল্লাহু বি কুল্লি শাইয়্যিম মুহিত।"

অর্থাৎ, "আল্লাহ সবকিছুতে আবিষ্ট।" এতে কেবল জ্ঞান গুণই নয়, সত্তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রশ্ন নং ৬

তাসদিক কী? ঈমান কাকে বলে? য়্যাকিনে যন্নি আর তাক্‌লিদি ঈমান কী?

উত্তর : 'তাসদিক' অর্থ অন্তরে বিশ্বাস করা। এটা অন্তরের ক্রিয়াদির অন্যতম। মুখ অন্যের জন্য তা প্রকাশ করে। নিজের বা আল্লাহর জন্য এ প্রকাশ প্রয়োজন নেই। সুতরাং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থিতি লাভকেই ঈমান বলা হয়। অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন না হওয়া বা না থাকাই কুফর এবং বে-ঈমানি। অন্তরের কার্যাদির দ্বারাই অন্তরে ঈমান পয়দা হয়। এটি একটি অবস্থা। সুতরাং যে এ পূর্ণ অবস্থার অধিকারী তার ঈমানও পরিপূর্ণ। এ পূর্ণ ঈমানের অপর নাম ঈমানে কাসেফী। তা যোগ্য অন্তরে প্রবেশ করে প্রকৃত ঈমানে পরিণত হয়।

ঈমানে যন্নি তা নয়। এক্ষেত্রে অনুমানের পর্দায় এক প্রকার ছায়া পতিত হয় এবং মনের বা ধারণার পরিবর্তনের সাথে সাথে তা চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জনৈক ব্যক্তি খবর দিল যে, আমি একটি বিরাট বাঘ দেখেছি এবং বার বার বলে মানুষকে তা ভালোভাবে বিশ্বাসও করিয়েছে। আবার কয়েক ঘণ্টা পর জানাল যে, আসলে আমি বাঘ টাঘ কিছুই দেখিনি।

শ্রোতারা তাও বিশ্বাস করে এবং সংবাদদাতার প্রতি তারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারায়। অনুরূপভাবে যারা অন্যের কথায় বিশ্বাস করে ঈমান আনে তাদের ঈমানও এরূপ অসার এবং ভিত্তিহীন নড়বড়ে।

এভাবে কেউ যদি অন্যের থেকে শুনে বিশ্বাস করে যে এটা হারাম, এ কাজ নিষিদ্ধ, অমুক ব্যক্তি কাফের, অমুক ব্যক্তি মুশরিক, এ কাজে বেহেস্ত পাওয়া যাবে, আর অমুক কাজে খোদা পাওয়া যাবে ইত্যাদি। অতঃপর সে যখন এর বিপরীত কথাবার্তা শুনবে এবং তা তার কাছে ভালো লাগবে তখন যা তার পূর্বে অপছন্দ ছিল সেসব ছেড়ে দিয়ে ধরুন জুম্মা এবং ঈদের নামাজ পড়তে লেগে গেল। তারপর আবার অন্যান্য আলেমদের নিকট অন্য ধরনের কথাবার্তা শুনে ঢোল ও শারেঙ্গী বাজাতে আরম্ভ করল এবং নামাজ রোজা ছেড়ে দিল। কারও কারও ব্রহ্মধর্ম এবং আর্যধর্ম গ্রহণ করার মতো অবস্থাও হয়। এভাবে যন্নি ঈমানদারগণ যে ঈমানের জোরে নিজেদেরকে দ্বীনদার মনে করে, সে ঈমানই তাদেরকে বিপথগামী করে। বস্তুত যে ঈমান ঈমানই নয় তা নষ্ট হবার প্রশ্ন অবান্তর। যার ঈমানই নেই তার ঈমান নষ্ট হবে কোত্থেকে! এ শ্রেণীর ঈমানদারগণ হেদায়েতের নামে হেদায়েতকেই বরবাদ করছে।

মোটকথা, যা ঈমানই নয় তাকে ঈমান আখ্যা দিয়ে এবং এক ফুৎকারে তা উড়িয়ে দেওয়ার পথও প্রশস্ত করে দিয়ে এরা মানুষকে কাফের মুশরিক বানাবার উত্তম হেদায়েতকারী হিসেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। অর্থাৎ, প্রথমে যাদের মুসলমান বানায় পরে তাদেরই আবার কাফের-মুশরিক বানায়। নিজেরা তাদের কাফের মুশরিফ বলে এবং কুফরির ফতোয়া দেয়। আফসোস! কে জানে এদের ধর্ম কী? যা তুড়িতে আসে আরেক তুড়িতে চলে যায়। গাছের পরিচয় তার ফলে, তাদের

সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ উপমাটি যথেষ্ট। নামে ইসলাম আর কাজে বিপরীত। এটাকে কি ঈমান বা ধর্ম বলা যায়? আল্লাহ বলেন,

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله *

"লাইসাল বিররা আন তুয়াল্লু উজুহাকুম ক্বিবালাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি ওলা কিন্নাল বিররা মান আমানা বিল্লাহি।"

অর্থাৎ, পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোনো কল্যাণ নেই। বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি যে ঈমান এনেছে তাতেই রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং এ পথে ঈমানে কাসেফী অর্জন করতে হবে। এ ঈমান অন্তরে প্রকাশিত হয়ে এবং উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে জ্ঞাত বস্তুতে পরিণত হয়। এটা আর যায় না। আর যাবেই বা কোথায়! এযে আপন আত্মা ও বোধ থেকে এসেছে। যেমন কেউ যদি কোনো বস্তুর স্বাদ নিজে গ্রহণ করে থাকে আর সে সম্পর্কে কেউ যদি বিপরীত কথা বলে সে তাকে মিথ্যুক মনে করবে। নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীতে হাজার ব্যক্তির কথাও সে গ্রহণ করবে না। বরং সে আপন অভিজ্ঞতালব্ধ যোগ্যতার বলে তাদের কথা বাতিল করে দিবে। কি উত্তম এই অন্তরবান অলি-আল্লাহ ও আরেফগণ, অনন্য ত্যাগী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা নিজেদের জীবনের ব্যাপারেও বেপরোয়া। যন্নি ঈমানের অধিকারী জাহেরপন্থী এবং তাক্‌লিদি ঈমানদারদের কোনো কথা তারা শোনেন না। বরং অন্তরস্থিত ঈমানের অধিকারী আপনপ্রাপ্ত পূর্ণ যোগ্যতার আলোকে নিরূপিত সত্যকেই যথেষ্ট মনে করেন। এর দ্বারাই তাঁরা ঠিক-বেঠিক আলো অন্ধকার এবং দ্বীনধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু ঐ সকল যোগ্যতার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তাই প্রকৃত এবং পূর্ণ জ্ঞান। এটাকে 'ইলমে আহয়াল' তথা অবস্থার জ্ঞান বলা হয়। ইলমে আহয়াল তথা কোরানের জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী তাঁকে আলেমে রাব্বানী এবং ছাহেবে হাক্কানী বলা যায়। অর্থাৎ, প্রভুজ্ঞ ও সত্যের অধিকারী বলা যায়। এজন্য আমাদের নেতা রসূল (সঃ) বলেন,

"উম্মতদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম, একটি 'আল কোরান' এবং দ্বিতীয়টি 'আল আবা' অর্থাৎ, যারা তা বোঝেন।"

যারা কোরান বোঝেন তাদের আহলে কোরান বলা হয়। আহলে কোরান না হলে কোরান বোঝা সম্ভব নয়। কারণ অন্তরের ক্রিয়াদি দ্বারা অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর কোরানের সারমর্ম উদ্ধার নির্ভর করে। তাইতো কোরানে দ্বীনদারকে অগ্রিম সংবাদ দেওয়া হয় যে–

ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب *

"ইন্না ফি জ্বালিকা লাজিকরা লিমান কানা লাহু কালবুন।"

অর্থাৎ, "অবশ্যই কোরানে জিকির রয়েছে অন্তরবান ব্যক্তিদের জন্য।" ঈমান এবং বিশ্বাসও অন্তরে প্রকাশ পায়। এজন্যই আল্লাহ ঈমানকে অন্তরের ভিতরে সমাসীন করেন। আল্লাহ বলেন,

قالت الاعراب امناط قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوا بكم ط -

"কালাতিল আরাবু আমান্না কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদ খুলিল ঈমানু ফি কুলুবিকুম।" (সূরা হুজুরাত-১৪)

অর্থাৎ, "আরবরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। হে মুহাম্মদ আপনি তাদের বলুন যে, তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বল যে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি।" তাই তাঁরা মুসলমান হলেও মুমিন নয়।

প্রশ্ন নং ৭

আদম (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) এর সিজদা ফরজ ছিল কি না? একই সিজদায় ইবাদত সম্মান প্রদর্শন এবং অভিবাদন বৈধ কিনা? তাতে সালতানাত আত্মীয়তা গোপন রহস্য এবং মিলন ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকে কি না?

উত্তর : আদম (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) উভয়ের সিজদাই ফরজ ছিল। এর উদ্দেশ্য অসীম আদব প্রদর্শন। তবে সাধারণত বুজুর্গের বেলায় এর উদ্দেশ্য সম্মান প্রদর্শন, সালতানাত ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে এর উদ্দেশ্য অভিবাদন, ইবাদত অবস্থায় হোক অথবা এর বাইরে হোক। যেমন নামাজে জমিন এবং কাবাকে সিজদা করা সম্মানসূচক আর আল্লাহকে সিজদা করা ইবাদত। বস্তুত সিজদা দেওয়া হয়েছে নামাজের জন্য, যাতে সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ইবাদত এবং সাথে সাথে সম্পাদিত হয়েছে জমিন ও কাবার প্রতি আদব বা সম্মান প্রদর্শন। তবে এ উভয় উদ্দেশ্যই ফরজের অন্তর্ভুক্ত। কারণ জমিনের উপর কাবার দিকে আল্লাহর উদ্দেশে সিজদা করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ একই সিজদায় দুটি ফরজ– একটি ইবাদত যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট হাজিরি আর অপরটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন। তবে তা ইবাদতের রূপ ও ভঙ্গিতে সম্পাদিত হলেও উদ্দেশ্য ও মর্যাদায় তা ইবাদত নয়।

সুতরাং খাস ইবাদতেই যখন অন্যের জন্য সম্মানসূচক সিজদা কেবল প্রমাণিতই নয় বরং ফরজ এবং ওয়াজেব, তখন ইবাদতের বাইরে অন্যের সম্মানার্থে সিজদা নিষিদ্ধ হয় কিভাবে?

অতএব নামাজের সিজদায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যেহেতু ফরজ এবং নামাজের তাশাহুদে নবী-অলি এবং বুজুর্গদের প্রতি সালাম ও দরূদ ওয়াজেব এবং সুন্নত। তবে প্রকৃত ইবাদতের জন্য তাজিম ও সম্মানই প্রকৃত এবং মূল ভিত্তি। কারণ নামাজের সিজদার উদ্দেশ্যই তাই। তা না হলে একই সিজদায় দুটি ফরজ হয় কী করে?

তবে সিজদা কী? যিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য তার ক্ষেত্রে এটা যথার্থ সিজদা। আর সান্নিধ্যের যোগ্য এক্ষেত্রে এর অর্থ ভিন্ন। অর্থাৎ সান্নিধ্য লাভ ও মিলনের

উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন। এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি সামনাসামনি হওয়ার কারণে কাউকে সিজদা করে সে সান্নিধ্য অবস্থার দিকে অগ্রসরমান আর যে মিলন অবস্থার অনুবর্তী হয়ে সিজদা করে সে পরম সত্তার মিলন পথের যাত্রী। বস্তুত ইবাদত এবং তাজিম বা সম্মান একটি পূর্ণ কর্মেরই বিভিন্ন দিক। আল্লাহ বলেন,

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب *

"ওয়ামাই ইউয়াজজিম শায়ায়্যিরাল্লাহি ফা-ইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব।"

"কেউ যদি আল্লাহর নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে তা তাদের অন্তরের ধর্মানুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ।" (সূরা হজ্জ-৩২)

এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেও আল্লাহর ভাষায় অন্তরের ধর্মানুরাগ প্রমাণ হয়। যা আল্লাহর শান-শওকতের উচ্চ সম্মানের জন্য। যেমন কোরান কাবা নবি, অলি, এবং বুজুর্গদের তাজিম ও সম্মান যার মর্তবা প্রমাণিত তা প্রকৃত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এটা আল্লাহ সম্পৃক্ত কর্মের বৈশিষ্ট্য।"

যেমন কোরানকে সম্মান করলে আল্লাহ খুশি হন, কারণ এটা আল্লাহর বাণী। অনুরূপ পয়গম্বর অথবা কোনো পুণ্যবানকে সম্মান করলেও আল্লাহ খুশি হবেন। আর ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নত কাজ সম্পাদনেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। এটা ইবাদত। বস্তুত ইবাদত ও সম্মান প্রদর্শন দুটোই একইরূপে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো এবং বসা ও অভিবাদন বা মস্তক অবনত করা আর চোখের ইশারা, এসব ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইবাদত আর অন্যদের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন। এগুলো বাহ্যত একইরূপে সম্পাদিত হলেও অর্থ ও উদ্দেশ্য আলাদা। তা না হলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে মাথা নত করে ইবাদত করাতো সর্বদাই অবৈধ।

সুতরাং ইবাদতের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন আর সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অনিবার্যরূপে ইবাদত সম্পন্ন হচ্ছে, সেহেতু এগুলোর বাণী ও সাধারণ উদ্দেশ্যাদি বুঝে এর বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে নির্ভুল জ্ঞানের প্রয়োজন এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, كونوامع الصديقين 'কুনু মায়াসোয়াদেকীন' (সূরা তওবা-১১৮)। "সৎদের সঙ্গী হয়ে যাও। এটা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর আদেশ। এটা ফরজ। এ ফরজ সম্পাদনে সম্মান প্রদর্শন, ভক্তি প্রকাশ এবং অভিবাদন জরুরি। অর্থাৎ সৎজনদের উক্ত কার্যাদির মাধ্যমে রাজি ও খুশি করে তাদের একাত্ম হয়ে সত্তাগত হতে হবে। এটাই এর উদ্দেশ্য, এ কাজে চরম ও পরম প্রেমের প্রাধান্য প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হবে পরমসত্তার ফয়েজ বা প্রেরণায় আপ্লুত হওয়া। এজন্য আল্লাহর প্রকাশ এবং পরমসত্তার বাস্তবরূপ, সৎজনদের অনন্ত অবিনশ্বর সত্তায় নিজেকে ফানা বা বিলীন করতে হবে।

উল্লেখ্য, সাদেক তথা সৎজনদের সত্তা আল্লাহর সত্তারই প্রকাশ। এ জন্য আল্লাহ সাদেক তথা সৎজনদের সঙ্গলাভ করার আদেশ করেন। তাহলে সঙ্গলাভের

ফলে নিজেদের মধ্যে তাদের সত্তা ও গুণাবলির জ্যোতির্ময়তা বিকশিত হবে। যদি তাই না হবে, তাহলে আল্লাহ তার আপন সত্তার দিকে সরাসরি আহ্বান জানালেন না কেন? প্রকৃতপক্ষে মানুষই আল্লাহর রহস্যের প্রকাশ। মানুষের মধ্যেই নিহীত তার সমুদয় রহস্য। এ রহস্যেরই মূর্ত প্রতীক এবং অভিব্যক্তি মুর্শিদ, সুগন্ধ যেমন সাধারণ তেলকে আতরে পরিণত করে।

উদাহরণরূপ আগুনে পুড়ে কাঠ যখন আগুনের মতোই সূক্ষ্ম অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয় তখন তার দহন শক্তি পরিগ্রহণ করে। এটা আগুনের চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং পরিপূর্ণরূপ। আগুনে পোড়ার আগে কাঠের এ ক্ষমতা ছিল না বরং তা ছিল নিরেট কাঠ মাত্র। আগুনের সংস্পর্শে এসে কাঠও আগুন হয়ে যায়। তাহলে আগুন কী জিনিস, আগুনই কি কেবল আগুন? অন্য কিছু কি আগুন নয়? কাঠও আগুন হয়, এর একমাত্র কারণ আগুনের সাথে এর সঙ্গত্ব। আগুন যখন অন্যকে পোড়ায় তখন সে নিজেকে অন্যের মধ্যে প্রকাশ করে। এটা আগুনের নিজের কাজ এবং ইচ্ছা। এর ফলে কাঠও আগুন হয়ে যায়। এতে সঙ্গত্বের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় বৈকি। সুতরাং সঙ্গত্ব দ্বারা সঙ্গীর সত্তাই অর্জিত হচ্ছে বিধায় স্বীকার করতেই হবে যে, সত্তার এ পরিক্রমণে কোনো একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান রয়েছে।

তা সর্ব কর্মের উৎস এবং তাতে কল্যাণ ও মঙ্গল ছাড়া কিছুই নেই। এজন্য আল্লাহ সঙ্গযোগ্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, 'সাদেক' অর্থাৎ সৎ হিসেবে। কোরানে এ সাদেক তথা সৎজনকে উসিলা ও বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তাদের আনুগত্য করা আল্লাহরই আনুগত্য করা, তাদের যিকির করা আল্লাহরই যিকির করা, তাদের ধ্যান করা আর তাদের সাথে একাত্ম হওয়া আল্লাহরই ধ্যান আর তারই সাথে একাত্ম হওয়া এবং তাদের মধ্যে বিলীন হওয়া আল্লাহতেই বিলীন হওয়া। আল্লাহ বলেন–

يايها الذين اموا كنوا انصار الله *

"ইয়া আইয়্যু হাল্লাযিনা আমানু কুনু আনসারাল্লাহি।"

"হে ব্যক্তিগণ যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহর সাহায্যকারী হও।" (সূরা সাফ্ ২৪ আয়াত) এবং আরও বলেন, كونوا مع الصادقين "কুনু মায়াছ সাদেক্বীন" অর্থাৎ, "সৎদের সঙ্গী হও" (সূরা তওবা)।

উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইবাদতের মধ্যে তাজিম ও তাজিমের মধ্যে ইবাদত, সত্তার মধ্যে বিদ্যমান। এজন্য বান্দা ইবাদত আর সম্মান যে নামেই আনুগত্য প্রকাশ করুক তা মূলের উদ্দেশেই নিবেদিত হয়। আল্লাহর সত্তায় আত্মলীনই এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। এ কারণে আল্লাহ বলেন- وابتغو اليه الوسيلة "ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসিলাতা" অর্থাৎ, "আল্লাহর পথে উসিলা অন্বেষণ কর।" তাই হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করা আল্লাহরই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়েছে। এ সিজদার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রকাশের স্থায়ী উল্লেখ ছিল যার মর্যাদা কেয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

ولقد خلقنكم ثم صورنكم ثم قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس -

"ওয়ালাক্বাদ খালাকনাকুম ছুম্মা ছওয়ার নাকুম ছুম্মা কুলনা লিল মালায়িয কাতিছ জুদু লি আদামা ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ।"

অর্থাৎ, "অবশ্যই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করলাম। অতঃপর তোমাদের রূপদান করলাম। তারপর ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা কর। ইবলিশ ব্যতীত সকলেই তাকে সিজদা করল।" (সূরা আরাফ) উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে সৃষ্টি করার অর্থ সত্তার স্পষ্টপ্রকাশ আর রূপদান করার অর্থ রূহের জগৎ থেকে সৃষ্টিজগতে আসা। আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের যখন আদেশ করা হয়, তখন আদম সন্তানদের রূহসমূহ সৃষ্টিরূপে আদমের সত্তায় বর্তমান ছিল ফলে ফেরেশতাদের দেওয়া সিজদা আদমের সাথে আদম সন্তানগণও প্রাপ্ত হন। এরূপ সিজদা দেওয়া বড়ই পুণ্যের কাজ। এ কারণে হযরত ইউসুফ (আঃ) কে উপলক্ষ করে তা পুনরায় সংঘটিত হয়।

আর আমাদের শেষ নবীর ক্ষেত্রেও তা পূর্ণমাত্রায় সংঘটিত হয়, যে কারণে বৃক্ষ লতা ও পশুরাও তাকে সিজদা করে। এখানেই এর শেষ নয় বরং এ পরম কল্যাণের কাজটি পৃথিবীময় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়। এমনকি মূর্তিকে যারা সিজদা করে তারাও চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় এ উত্তম সৌজন্য কর্মটিকে উত্তম ইবাদত মনে করে। তবে যারা সিজদার বিভিন্ন মান সম্পর্কে অনবহিত তারা সিজদাকে এর উৎস থেকে আলাদা করে কেবল এর বাহ্য রূপটাকেই সিজদা মনে করে। তাজিম বা সম্মান প্রদর্শনে সিজদার বিরোধিতা ও তা পরিহার করার ফলে সম্মানার্থে সিজদায় যে ইবাদত সম্পাদন করতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সহচরত্বের সিজদা সহচরত্ব থেকে প্রকাশ পায়। সহচরত্ব প্রকাশের জন্য এটা যথেষ্ট। এটা কেবল শির ঝুঁকানো নয় বরং এটা রহস্যলোক। সেখানে দেহ-প্রাণ, কামনা-বাসনা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি সবই পরাভূত এবং রুকু, সিজদা, কেয়াম ও বৈঠক একমাত্র কাম্য। তবে আহলে হক্ক আপন সত্তা ও গুণাবলি থেকে প্রকাশিত জ্ঞান, ধৈর্য, দয়া, কৃপা, অনুকম্পা, দর্শন, শ্রবণ এবং কথাবার্তা ইত্যাদি পরিপূর্ণ গোপন রহস্যাদি নিজের মধ্যে প্রকাশ করার মাধ্যমে রুকু, সিজদা সম্পাদন করেন। অনুরূপ একটি সিজদা বিশ্বের সব সিজদার সমতুল্য। এটা সিজদায়ে ইত্তেহাদি।

উল্লেখ্য, সিজদাকে তাজিম বা সম্মানার্থে গ্রহণ না করলে কেবল মাথা ঝুঁকালেও কাফের হবে। বরং ইবাদতের ন্যায় অন্য উদ্দেশে দাঁড়ানো ও বসা শেরেক হওয়া উচিত। অথচ সিজদায়ে ইত্তেহাদি জাত এবং সিফাতের প্রকাশের স্থান। কারণ মূলত সারা বিশ্বে একই সত্তা প্রকাশিত ও আবিষ্ট। সুতরাং মূল যদি সিজদাবনত না হয় তাহলে এর গুণ রূপ শাখা সিজদা করে কী করে? সূর্যের আলো দেখা যাবে অথচ সূর্য উদিত হবে না এটাতো হতে পারে না। এ জন্যই কোরানে এসেছে যে,

"সারা বিশ্বই আল্লাহর উদ্দেশে সিজদারত।" এই অর্থেই সিজদায়ে ইত্তেহাদিতে সারা বিশ্ব সিজদাকারী এবং সিজদাকৃতও বটে। এ পর্যায়ে এরফান এবং ইত্তেহাদের পূর্ণতার প্রকাশ হয়।

আহলে হকের সত্তায় মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা যা-ই হোক তার মধ্যে আত্মলীন হলে প্রকৃত মূলে আল্লাহর সত্তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। অতএব আহলে হকের সত্তায় আত্মলীন হলে জানতে পারবে আল্লাহ কী? আল্লাহ কোথায় পাওয়া যায়? আর কোন জিনিসের মধ্যে আল্লাহর প্রমাণ পাওয়া যায়? আল্লাহর প্রকাশ্য রূপ কী? আল্লাহর গোপন প্রকৃতি কী? আল্লাহর অদৃশ্য গঠন কী? এবং কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিতে আবিষ্ট আছেন? অতএব আহলে হকের সত্তা যা সিজদাযোগ্য এখানে এসে দেখে নাও যে, এজন্য একটি সিজদাই যথেষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট যার মধ্যে রকমারি হাজারো রুকু এবং সিজদার প্রকাশ হয়।

এ সিজদার অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-কে প্রদত্ত ফেরেশতাদের সিজদা পূর্ণতা ও তাৎপর্যে সর্বাধিক অনন্য। আল্লাহর উপস্থিতিতেই আদম (আঃ)-কে সিজদা করা হল। আবার হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে প্রদত্ত সিজদা তাঁর আপন বাবা, যিনি নবী ছিলেন তাকে দিয়ে করানো হল। এটা কি বুদ্ধি সমর্থন করে? ইসমাইলের কুরবানি এবং আমাদের শেষ নবীকে বৃক্ষাদি ও উট বকরির সিজদা করাও আল্লাহর ইশারাতেই সম্পাদিত হয়। এতেও তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা যে বৈধ সুস্পষ্টভাবে তা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া এই রহমতময় ধর্মে নামাজে জমিন ও কাবাকে যে সিজদা করা হয় তাও তো বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে অনেক তাৎপর্য ও রহস্য নিহিত রয়েছে। যদিও আল্লাহর প্রকৃত বন্ধু যার সাথে আল্লাহর চেনা পরিচয় রয়েছে তিনি ছাড়া কেউই তা জানেন না। এজন্য হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রাঃ) তাঁর তাফসির গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমাদের নবী করিম (সাঃ)-এর বক্ষে বারোটি কুঠুরি রয়েছে। তার পবিত্র ছিনা মোবারকে গোপন রহস্যাদির মালামালে পরিপূর্ণ। এ কোঠার তালায় যিনি চাবি লাগিয়েছেন তিনি সিজদা পাওয়ার যোগ্য। দূর-দূরান্ত থেকে আল্লাহর সৃষ্টিরা এসে তাকে সিজদা করে। হযরত গাউসে পাক (রঃ) এবং হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রঃ) এর উদাহরণ। এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কী?

বস্তুত সিজদার উদ্দেশে আবেদের উঠা, বসা এবং চোখ ও মাথা দ্বারা ইশারা করা সবই মাবুদের উপাসনার অন্তর্ভুক্ত। আর তাজিম এবং সম্মানের ক্ষেত্রে এসবের অর্থ কেবল সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন। তা না হলে উঠা বসা দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তা করা কি বৈধ? অবশ্যই না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, রুকু সিজদা আর উঠা বসা সবকিছুর অর্থ এবং বৈধাবৈধ উদ্দেশের ওপর নির্ভর করে।

সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদাসূচক অভিবাদনের জন্য সিজদা, উঠা-বসা, রুকু ও মাথা ঝুঁকানো বৈধ। বরং ক্ষেত্রভেদে তা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও মোবাহ এবং হারাম, মাকরুহ এবং নিষিদ্ধও বটে। এটা নির্ভর করে এগুলোর প্রয়োগের উদ্দেশের ওপর। কিন্তু জমিন ও কাবাকে সিজদা করা সম্মান বটে এবং তাতে শুধু একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্য থাকা শর্ত। উহাই একমাত্র ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, একই নামাজে আল্লাহর ইবাদত এবং জমিন ও কাবার উদ্দেশে সিজদা ইত্যাদি ফরজ করা হয়েছে। স্মরণীয় যে, নবি ও অলিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা অভিবাদনও ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নতই বটে।

السلام عليك ايها النبى و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين *

"আসসালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়ালা ইবাদিল্লাহিস ছোয়ালেহীন।"

অর্থাৎ, "হে নবী আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর নেক্কার বান্দাগণের উপর সালাম।"

এখানে লক্ষণীয় যে, নামাজে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সিজদার মধ্যেও আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যও জড়িত রয়েছে। এমতাবস্থায় নামাজের বাইরে সিজদা, রুকু, কেয়াম এবং প্রার্থনা যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নয় তা কী করে নিষিদ্ধ হতে পারে? বরং কেবল আল্লাহর উদ্দেশে জমিনে সিজদা করা এবং তাতে জমিন ও কাবা ইত্যাদির ধ্যান না রাখা হারাম। অপরদিকে জমিন ও কাবার উদ্দেশে সিজদা, কেয়াম ও রুকু সবই করা হল কিন্তু তাতে মনোযোগ না থাকলে তা মাকরুহ হবে। আর ঘৃণাচ্ছলে জমিন ও কাবা প্রভৃতিকে সিজদা ইত্যাদি না করা কুফর এবং উভয় দিকে মনোযোগ রেখে তা করা সর্বাধিক উত্তম।

এমতাবস্থায় তাকলিদি ঈমানের লোক, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশে সিজদা করা হারাম ও কুফর বলে অথচ কিয়াম বা উঠা-বসা এবং মাথা নত করাকে হারাম বলে না তাদের জবাব কী? এর উত্তরে যদি তাঁরা বলে যে, উঠা-বসাও হারাম তাহলে কেবল সিজদা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইতিপূর্বেকার তাদের এ বক্তব্য টিকল কোথায়?

সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর জন্য যা নির্ধারিত তা অন্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। যথা– সম্মান, ভক্তি, প্রেম ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি। মৌলিক তথা প্রকৃত ইবাদতের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য গুণাবলি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উদাহরণস্বরূপ প্রেম যেমন আল্লাহর জন্য তেমন বান্দার জন্যও প্রয়োজন আর আল্লাহর জ্ঞান থেকেই বান্দা জ্ঞান পেয়ে থাকে, আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ এবং স্বর্গীয় শক্তি থেকে দয়ার দান হিসেবে বান্দা তা লাভ করে। তা না হলে আল্লাহ কোথা থেকে বান্দাকে এসব দেন। সত্য কথা হল যে,

অন্তর অন্ধকারে ঢাকা থাকে আর সে সময় যদি কোনো কিছু অন্বেষণ করা হয় তখন সে বস্তু দেখা যায় না এবং অন্বেষণকারী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এর প্রমাণতো নিজের মধ্যেই বিদ্যমান। একদিকে জমিন ও কাবাকে সিজদা করছে অপরদিকে তাকে অস্বীকারও করছে এবং বলছে নামাজে আমরা আল্লাহকে সিজদা করছি জমিনকে নয়। অথচ বারবার জমিনে মাথা ঠেকায় এবং কপাল ঘষে তা সত্ত্বেও বলে যে, আমরা আল্লাহকে সিজদা করি।

প্রশ্ন নং ৮

নামাজ যখন আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তবে তাতে অন্যের তাজিম এবং সম্মানও বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে কিভাবে তা আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট হয়?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা আপন সত্তায় একটি মৌলিক ও বিশিষ্ট উদঘাটক সত্তা। সুতরাং তার মর্যাদাকে প্রকাশ করার জন্য যে ইবাদত তাও বিশেষ ধরনের। এটাকে "ইবাদতে মুতামায়্যেন্নাহ্" অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ইবাদত বলা হয়। এটা প্রকৃত তথা ফরজ ইবাদত। এ ইবাদত সম্পাদনে যে পূর্ণতা প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাদি ও মাধ্যম হিসেবে মূলমুখী বিধায় মূলের মর্যাদা রাখে। এটাকে বলা হয় বাড়তি মাধ্যম। এর মাধ্যমে সম্পাদিত ইবাদতকে বলা হয় মাধ্যমিক তথা সহায়ক ইবাদত। এই ইবাদতের মর্যাদা অনেক বেশি। এ কারণে নামাজে কোরান এবং কাবা এবং পীর পয়গাম্বরদের সত্তা, গুণাবলি এবং কার্যাদির প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। নামাজের বাইরে অনুরূপ ভক্তি, সম্মান প্রদর্শন করা হলে তাও আল্লারই উদ্দেশে হবে এবং তাও মাধ্যমিক বা সহায়ক ইবাদত। অর্থাৎ নবী অলিগণের আসন, মাজার, পোশাক, গেলাফ, টুপি এমনকি জুতা ইত্যাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণ তারা আল্লাহর প্রিয় পাত্র। তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এগুলোও সহায়ক হিসেবে ইবাদত। আল্লাহর সৃষ্টিজগৎকে তারই সৃষ্টি মনে করে সম্মান করা উত্তম ইবাদত। কারণ ফরজ কার্যাদির চেয়ে এতে ফজিলত বেশি। তাইতো আল্লাহ বলেন,

ومن يعظم شعائى الله فانها من تقوى القلوب -

"ওয়ামাইয়্যিও য়াজ্জিমু শায়ারিয়রাল্লাহিফা ইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব।"

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শন মনের ধার্মিকতার পরিচায়ক।" (সূরা হজ্জ) এর অর্থ হল আল্লাহ নিজের তরফ থেকে বান্দার জন্য যা কিছু প্রকাশ করেন তা সবই আল্লাহর। এজন্য সেসব বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বান্দার কৃতজ্ঞতা ও ধার্মিকতার প্রকাশ।

প্রশ্ন নং ৯

مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدى

"মা মানায়াকা আনতাছ জুদা লিমা খালাকতু বি-ইয়াদি।"

অর্থাৎ, "কে তোমাদের নিষেধ করল সিজদা করতে। আমি যাকে সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে।" (সূরা ছোয়াদ ৪ রুকু)

এ বাণীর মর্মার্থ অনন্তকাল বহাল থাকবে কি?

উত্তর : এটা যেহেতু কোরান, এর মর্মার্থ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল ও কার্যকর থাকবে। কারণ ফেরেশতারা কি উক্ত সিজদা পরিত্যাগ করে তওবা করেছে? না, না, করেনি। বরং উক্ত সিজদায় যে কল্যাণ ও বরকত রয়েছে ফেরেশতাগণ তাতে সর্বদা ডুবে থাকবে, যতদিন তাঁরা বর্তমান রয়েছে। কোরানের মর্মার্থ রহিত না হওয়া পর্যন্ত এ সিজদায় কার্যকারিতা এবং বরকতও রহিত হবে না। ফেরেশতাগণ আজও আগের মতোই আদম (আঃ)-কে সম্মান করে। তা না হলে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার কারণে তাঁরাও কাফের হয়ে যেত। যে কারণে শয়তান কাফের হয়। এ কারণে উক্ত সিজদার বরকত প্রকাশিত হওয়ার জন্য আদম সন্তানের মধ্যেও সম্প্রসারিত করা হয়। এজন্যই হযরত ইউসুফ (আঃ) এর পিতা মুরব্বি হয়েও নিজের সন্তানকে সিজদা করেন এবং ফেরেশতারা মুরব্বি হয়েও সিজদা করে কম বয়স্ক আদমকে।

সুতরাং আদম এবং আদম সন্তানদের বড়ই সৌভাগ্য যে, তাদের জন্য সিজদা নির্দিষ্ট হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

فى وجو ههم من اثر السجود ط

"ফি উজুহিহীম মিন আছারিছ ছুজুদ।"

অর্থাৎ, "তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন রয়েছে।" (সূরা আল-ফাতহা-২৯) তবে যাদের মনের ময়দানে বিতাড়িত শয়তানের বসবাস এবং বর্তমানে যারা শয়তানের অধীন তারাও সে নূরে বঞ্চিত হয়ে উক্ত সিজদাকে হারাম ও শিরকের পাল্লায় ওজন করছে।

প্রশ্ন নং ১০

আল্লাহর জন্য কি কেবল সিজদাই নির্ধারিত; না রুকু, দাঁড়ানো, বসা, বিনয়, মাথা নত করা, কথাবার্তা, দেখাশুনা এবং কাজকর্ম ইত্যাদি তারই জন্য নির্ধারিত?

উত্তর : ব্যাপক অর্থে এবাদতে উক্ত সব কাজই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। ইবাদতের উদ্দেশে উক্ত সব কাজই আল্লাহর জন্য এবং ইবাদত হিসেবে গণ্য।

সিজদাতো দূরের কথা কেউ যদি চোখের ইশারায়ও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কুফরিমূলক কোনো কথা মুখে উচ্চারণ করে অথবা কান পেতে কুফরির উদ্দেশে তা শুনে বা হাতের দ্বারা কোনো কিছু ধরে তাহলেও সে কাফের। এমতাবস্থায় কী করে অনুরূপ একমাত্র সিজদাই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হল। আল্লাহর সম্পর্কে এ ধরনের কথা নিতান্তই অনিষ্টকর এবং বিভ্রান্তিকরও বটে। বস্তুত আল্লাহর জন্য সিজদা ইত্যাদি কোনোটাই নির্ধারিত নয়। বরং এসবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা মর্মার্থই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন,

ماهذه التماثيل التى انتم لها عكفون *

"মা হাজিহিত তামাছিলুল্লাতি আনতুম লাহা আকিফুন।" (সূরা আম্বিয়া-৫২)

অর্থাৎ, "এসব মূর্তি কী যে তোমরা এগুলোর কাছে দাঁড়াও।"

সুতরাং এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের উদ্দেশে দাঁড়ানোও কুফরি। সে দাঁড়ানো কোনো মানুষ বা বৃক্ষাদির কাছে হলেও তা কুফরি হবে। তাহলে যে ব্যক্তি সিজদার বিরোধী, অথচ দাঁড়িয়ে ইবাদতে মশগুল সে কাফের হবে না কেন? যদিও সে কাফের নয় তবুও সে নিজের বিচারেই নিজে কাফের হতে বসেছে।

প্রশ্ন নং ১১

পূর্বে উল্লিখিত (সিজদা দাঁড়ানো, উঠা, বসা ইত্যাদি) কার্যাদিতে যদি ইবাদত মকসুদ না হয় তাহলে এগুলোর ব্যাপারে আইন কী?

উত্তর : উক্ত প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, ইবাদতের মকসুদ ছাড়াও এসব কার্যাদি হয়ে থাকে, বস্তুত এটাই ঠিক। বরং রুকু, সেজদার অর্থ ব্যাপক। ইবাদত মকসুদ না থাকলে তা ইবাদত হবে না। তেমনি অভিবাদন বা সম্মান প্রদর্শন মকসুদ না থাকলে তাতে আদব বা সম্মান প্রদর্শন বোঝাবে না। এগুলো না ফরজ না সুন্নত। বরং তা সার্বক্ষণিক মোবাহ। এটা যে কোনো বস্তুর মৌলিক অবস্থা। রঙের মূল উপাদানের মতো। এতে যে রঙ মেশানো হবে তা সে রঙ-ই ধারণ করবে। তেমনি সর্বদাই যেমন, দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বসে থাকা ইত্যাদি উদ্দেশে ও মকসুদ মোতাবেক ফরয বা সুন্নত হয়ে থাকে। তাছাড়া মূলত এগুলো মোবাহ। তবে এগুলোর প্রয়োগে হারাম বা মাকরযুক্ত হলে এগুলো হারাম ও মাকরুহ হবে। উদাহরণ স্বরূপ চুরির মকসুদে বসা আর মিথ্যা বলার জন্য দাঁড়ানো হারাম ও মাকরূপ। এরূপ কারণে নামাজও হারাম এবং মাকরূহ হতে পারে। অনুরূপভাবে ক্রোধের বসে এবং হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্দেশে মসজিদ নির্মাণ করা, নামাজ ও জামাতে সামিল হওয়া এবং জাগতিক স্বার্থ ও মনে কালিমা নিয়ে নামাজ আদায় করা যাতে ইবাদতের আস্বাদন নেই তা সবই হারাম। তাইতো আল্লাহ বলেন,

فاذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالى يرآئون الناس

"ফাইজা কামু ইলাছ্ছালাতি কামু কুছালা ইউরাউনান নাছু।"

(সূরা নেছা-১৪২)

অর্থাৎ তোমরা যখন নামাজে দাঁড়াও ক্লান্ত ও অমগ্নচিত্তে দাঁড়াও, মানুষকে দেখাও। অর্থাৎ, গ্লানিযুক্ত মন নিয়ে দাঁড়াও। এজন্য নামাজে চিত্ত স্থির হয় না, একাগ্রতা আসে না এবং মনে পবিত্রতার বদলে ময়লা জমে। এ কারণে রিয়া তথা লোক দেখানো মনোভাব প্রকাশ পায়। এ জন্য উক্ত আয়াতে বলা হয়, তোমরা লোকদেরকে তোমাদের নামাজ প্রদর্শন কর। এরপরও অনুরূপ নামাজিদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে নামাজ পড়, না লোকদের দেখাবার জন্য? তাহলে কে বলবে না যে, আমরা আল্লাহর জন্যই নামাজ পড়েছি। এমতাবস্থায় মিথ্যুক কে, আল্লাহ না নামাজি?

প্রশ্ন নং ১২

ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : ইবাদতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বন্দেগি বা আনুগত্য করা। আপন অন্তর যা ইবাদতের স্থান সেখানে আল্লাহর প্রকাশ ঘটিয়ে প্রার্থনা ও প্রেমের প্রকাশকে ইবাদত বলে। এক্ষেত্রে বান্দা কর্মের কর্তা আল্লাহর সত্তা ও পূর্ণতাকৃত এবং উহার প্রকাশ হল কর্ম। এরই নাম ইবাদত। সে একক সত্তার পূর্ণতা অন্যের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট সর্বোত্তম বিশুদ্ধ কর্মই আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য।

প্রশ্ন নং ১৩

কোরানে যে আল্লাহ তায়ালা অন্যের জন্য সিজদা সম্পূর্ণ নিষেধ করেছেন তা এই আল্লাহ্ বলেন,

لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن -

"লা তাসজুদু লিসসামছি ওয়ালালিল কামারি ওয়াছ জুদু লিল্লাহীল্লাজি খালাকা হুন্না।"

অর্থাৎ, "তোমরা চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা কোরো না, বরং এদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে সিজদা করো।"

উত্তর : যায়েদ তুমি একজন বড় চোর। তুমি আল্লাহর কালামের অংশ বিশেষ গোপন করেছ। তুমি স্পষ্ট কাফের। কারণ আল্লাহ বলছেন, "তোমরা চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা কোরো না, বরং এদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহকে সিজদা করো।" এবং এই আয়াতটির শেষাংশ হল এই যে–

ان كنتم ايه تعبدون *

"ইনকুনতুম ইয়্যাহু তায়াবুদুন।"

অথচ প্রশ্নকারী আয়াতের এ অংশটি উল্লেখ করেনি। কোরানের উক্ত আয়াতে যা বলা হয়েছে তা এই যে, আল্লাহর ইবাদতের সময় তোমরা চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা করবে না। অর্থাৎ, "ইবাদতের নিয়তে চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা করা নিষেধ।" সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, কেবল ইবাদতের উদ্দেশে সিজদা করা উক্ত আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হলেও সিজদা নিষেধ নয়। এখানে প্রশ্নকারীগণ এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কালামের প্রকৃত অর্থ গোপন করছে। আল্লাহ বলেন,

ولا تلبسوا الحق بالباطل *

"ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিলি।"

অর্থাৎ "সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কোরো না।"

কথিত আছে যে, যারা নামাজকে অস্বীকার করে তাঁরা কোরান থেকেই নামাজ ত্যাগের দলিল দেয়। তাঁরা কেবল কোরানের আয়াতের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে।

আর তা হল এই যে–

لاتقوبوا الصلوة

"লা তাকরাবুসসালাতা।"

অর্থাৎ, "তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না।" এটা অবশ্যই কোরানের আয়াত কিন্তু পূর্ণ আয়াত নয়। পূর্ণ আয়াতটি হল–

لاتقوبوا الصلوة وانتمسكر *

"লা তাকরাবুসসালাতা ওয়াআনতুম সুকারা।"

অর্থাৎ, "তোমরা নামাজের ধারেও যাবে না, যখন নেশাগ্রস্ত হও।" এর অর্থ হল নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া উচিত নয়। এ আয়াতে সর্বাবস্থায় নামাজ পড়াতো নিষেধ করা হয়নি। সেজদার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে যে, ইবাদতের উদ্দেশে তোমরা চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা করবে না। সাধারণভাবে সিজদা নিষিদ্ধ করা হয়নি। আদম ও ইউসুফ (আঃ)-এর সিজদার ঘটনা কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে এই সিজদার নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে কোরানের অন্য কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। প্রশ্নকারীকে শয়তান নষ্ট করেছে। এ জন্য সে কোরানের অংশ বিশেষ গোপন করে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যারা উক্ত আয়াত 'মনসুখ' বলছে তাঁরাও ঠিক বলছে না। কারণ উক্ত আয়াত 'মনসুখ' হয়নি।

প্রশ্ন নং ১৪

মেশকাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

ان رسول الله صلى الله عليه سلم كان فى نفر من المهاجرين والانصار فجاء بعير فسجد له فقال اصحابه يارسول الله (ص) يسجد لك البهائم والشجار فنحن احق ان تسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم *

"আন্না রাসূলুল্লাহি (সাঃ) কানা ফিনাফারি মিনাল মোহাজিরিনা ওয়াল আনসারি। ফাজায়া বায়্যিরুন ফাছা জাদালাহু ফাকালা আছহাবিহি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়াছজুদু লাকাল বাহায়্যিমু ওয়াস্‌সাজারু ফানাহ্‌নু আহাক্কা আনতাছজুদা লাকা ফাকালা আবুদু রাব্‌বাকুম ওয়া আকরামু আখাকুম।"

অর্থাৎ, "একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোহাজের ও আনসারদের এক সমাবেশে বসে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাকে সিজদা করে। তখন সাহাবাগণ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পশু এবং বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করছে। অতএব আমাদেরও তো আপনাকে সিজদা করা উচিত। উত্তরে রাসূলুল্লাহ বলেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং আপন ভাইদের সম্মান করো।" এ হাদিস থেকে তো আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা নিষেধ বলে মনে হয়। তাছাড়াও হাদিসে রয়েছে যাতে মানুষকে সিজদা করা নিষেধ বোঝা যায়। এসব হাদিসেও উট, বকরি ইত্যাদি কর্তৃক রাসূলুল্লাহকে সিজদা করতে দেখে সাহাবাগণ তাকে সিজদা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, "আমি যদি মানুষ মানুষকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে যেন আপন স্বামীকে সিজদা করে।"

উত্তর : উপরের হাদিসগুলোর দ্বারা অকাট্য ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত যে, উট, বকরি ও বৃক্ষাদি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) সিজদা করেছে। এই দলিল স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে প্রকাশিত এবং প্রমাণিত, এটা নবুয়তের মাজেজা। এজন্য আর কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বরং এ স্থলেই নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া এবং খোদা তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান এবং শুকুর গুজারি না করার কারণে চির কাফের হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা এটা আল্লাহর দান এবং তারই গুপ্ত রহস্যময় ব্যাপার যা অতি উত্তম ও সম্মানের স্থান। এর প্রতি সম্মান দেখানো সকল বান্দার ওপর ফরজ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ বলেন যে, "আল্লাহর ইবাদত করো এবং ভাইদের সম্মান করো।" এ স্থলে পয়গাম্বর (সাঃ) নিজে আত্মগোপন করে উম্মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি একটি উত্তম নেয়ামত। হুঁশিয়ার বান্দাদের অন্তরে স্বর্গীয় প্রেরণা আসে যার ফলে তারা নিজে থেকেই সে সিজদা গ্রহণ করেন।

লক্ষণীয় যে, হযরত আদম (আঃ) এর অন্তরে যখন উক্তরূপ প্রেরণার সৃষ্টি হয় তখন তিনিও কৃতজ্ঞতার সাথে তা গ্রহণ করেন। অথচ বয়সে তিনি ফেরেশতাদের কাছে শিশুর মতো ছিলেন। ফেরেশতাদের বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও জ্ঞান ও বুজুর্গির কারণে আদমের সম্মান বেড়ে যায় এবং ফেরেশতাদের দ্বারা তাকে সিজদা করানো হয়। ঘটনাটি বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়।

হযরত ইউসুফের বেলাতেও তাই ঘটানো হয়েছে। নিজের মা বাবা দ্বারা তাকে সিজদা করানো হয়েছে। আর তাঁরাও এ কাজের বিরোধিতা করেননি। বরং হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তার মা বাবাও কৃতজ্ঞতার সাথে তা মেনে নেন। অপর দিকে আমাদের রসূল (সাঃ) কেও উট, বৃক্ষাদি সিজদা করে এবং তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেননি। বরং তিনি নিজে এবং তার সাহাবাগণ কৃতজ্ঞচিত্তে তা মেনে নেন। এমতাবস্থায় কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্মানের সিজদা নিষেধ করেছেন? ধরে নিলাম সাহাবাগণ সিজদা করেননি কিন্তু তার বিরোধিতাও তো করেননি। কারণ কোরান এবং অলৌকিক সাক্ষ্য দ্বারা এটা প্রমাণিত। অতএব যে সম্মানের সিজদা অস্বীকার করবে সে কাফের আর এ অনুগ্রহের দানকে যে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবে সে হবে আল্লাহর শাকের অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দা। আর এটা বড় ধরনের ফরজ কাজ। এ কারণেই হযরত আদম, ফেরেশতাগণ হযরত ইয়াকুব প্রমুখ এবং আমাদের রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, আল্লাহর নেয়ামত যারা ভোগ করেন, নেয়ামতের সে সব অধিকারীগণই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন। অর্থাৎ, যিনি নেয়ামত লাভ করেন, নেয়ামতের ভোগ ও স্বাদ আস্বাদনের পর তাকেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় কী করে সাহাবাগণ সিজদা কবুল না করেন! তা না হলে সাহাবাগণ আর কী জন্য শুকরিয়া জানাবেন?

এখন বলোতো যাদের কথা আলোচনা করা হল তাদের মধ্যে কে সিজদাকে হারাম বা শিরক বলেছেন? রাসূলুল্লাহ তো বলেছেন, "আল্লাহর ইবাদত করো এবং ভাইদের সম্মান করো।" এতেওতো সিজদার উদ্দেশ্যটাই স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইবাদতের উদ্দেশে প্রদেয় সিজদা বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত আর সম্মানার্থে সিজদা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য। তবে একই সিজদায় উভয় বিষয়ে মনোযোগ থাকলে তা আল্লাহর জন্য ইবাদত এবং অন্যের জন্য সম্মানের অর্থ বোঝাবে। যেমন নামাজের সিজদা। এতে আল্লাহর জন্য ইবাদত আর জমিন ও কাবার উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন বোঝায়। সিজদা একটি বহু ভাবগর্ভ শব্দ এবং বহু অর্থে এর ব্যবহার হয়।

বস্তুত একমাত্র অর্থবোধক বাক্য কোনো উচ্চাঙ্গের বক্তব্য নয়। দ্বিতীয় হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমি যদি সিজদা করার হুকুম করতাম তাহলে স্ত্রীকে হুকুম করতাম সে যেন তাঁর স্বামীকে সিজদা করে।" এ হাদিসটি দুর্বল হলেও এর বক্তব্য অত্যন্ত সফল ও অর্থবহ। রাসূলের বক্তব্য, "আমি যদি মানুষকে হুকুম করি মানুষকে সিজদা করার জন্য"–এর অর্থ হল যে, সিজদা করার রীতি ও প্রচলনের কথা কোরানে বার বার বলে এসেছে। তা সত্ত্বেও যদি আমি সে বিষয়ে আবার হুকুম করি তাহলে তাতে বেশ কড়াকড়ি আরোপিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ তা চাননি।

তাছাড়া এতে মুসলিম সমাজে এবং উম্মতদের মধ্যে স্ত্রীদের নিকট স্বামীদের অতিরিক্ত মর্যাদা বোঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সিজদা, সিজদাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বুজুর্গি নির্দেশ করে। বুজুর্গির কারণে মানুষ মুরব্বি হয়ে যায়। যেমন নবী এবং অলি, মুরশিদ এবং বাদশাহগণ বয়সে কম হলেও অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্ব ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কারণে তারা বাপ দাদারাও মুরব্বি হয়ে যান। যেমন আমাদের নবী হযরত আদম ও হযরত ইউসুফ (আঃ)। রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধিকারী এবং মুরব্বিদের সিজদা করা কল্যাণের কাজ। এটা আল্লাহর আমানত। এটাকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর রোষের স্বীকার হয়ে হয়ে শয়তান দোজখবাসী হতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া আর যে দুই একটি হাদিস যা সম্মানার্থে সিজদার বিরুদ্ধে পেশ করা হয়ে থাকে সেগুলো এ ধরনেরই এবং সেগুলো সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে।

যদিও একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিজদা করা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন, জিরা শহরের বাদশাহকে লোকেরা খাস করে ঐ সিজদা করত। ঠিক ঐ অনুকরণে লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও সিজদা করার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাসূল তাদের বলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার কবরে সর্বদা সিজদা করবে? তখন লোকেরা তা অস্বীকার করল। এর উত্তরে রাসূল (সাঃ) বলেন, তাহলে আমাকে সিজদা কোরো না। এর অর্থ এই যে, তোমরা আমার কবরকে রাজার কবরের মতো যখন সিজদা করবে না, তখন আমাকেও তা কোরো না। এ কারণে অধিকাংশ তাফসীরকার এবং গবেষকগণ উক্ত হাদিসের এই ব্যাখ্যা গ্রহণপূর্বক সম্মানার্থে সিজদাকে জায়েজ এবং কল্যাণপূর্ণ কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

দু/চার জন যদি একে হারাম ও শিরক বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেও তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ তারা হিসেবের মধ্যে গণ্য নয়। আর এদের বক্তব্যে তেমন কোনো তাৎপর্য নেই।

উল্লেখ্য, হারাম বা শিরক বলাকে ফরজ মনে করা, মূলত কুফরি গুণেরই বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের ক্ষেত্রে হালাল হারামের মনগড়া ফতোয়া জারি হয়ে থাকে। বস্তুত কোনো কিছুই হারাম নয়। এজন্য কোরান ও হাদিসের অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুকে হারাম বলার অনুমতি নেই বরং তা সবই হালাল ও জায়েজ। কারণ মূলত সবই হালাল। এজন্য ইমাম আজম (রঃ) বলেন, শত কাজের মধ্যে একটি ইসলামী কাজও কেউ যদি করে তাকেও ইসলামের বাইরে মনে করা বৈধ নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম (রঃ) বলেন, 'আহলে কিবলা' অর্থাৎ, কাবার দিকে যে মাথা নত করে সে মুশরিক নয়। সুতরাং যে কাফের নয় তাকে কাফের মনে করার অর্থ হল, ইসলামের ধারা বা রশি কেটে দেওয়া। এটা যে করে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। অতএব যার খুশি সে নিজে নিজে কাফের হোক তোমরা নিজেরা কাউকে কাফের বোলো না।

প্রশ্ন নং ১৫

সম্মানার্থে সিজদা হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্যের জন্য যা ফরজ ছিল কোরান দ্বারা সে ফরজ কি রহিত হয়ে গেছে?

উত্তর : কখনো না। সম্মানার্থে সিজদার ফরজ বা বৈধতা কোরানে রহিত হয়নি। বরং সে সাথে আদমের সম্মানের বাধ্য-বাধকতা এবং নির্দেশ সাধারণভাবে যুক্ত রয়েছে। যেমন কাবা এবং জমিনকে সম্মানার্থে সিজদা, রুকু ও কেয়াম ইত্যাদি নামাজের মধ্যেও ফরজ। অর্থাৎ নামাজের মধ্যে সিজদা ইত্যাদি যা ইবাদত হিসেবে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সে রুকু, সিজদা ইত্যাদি আবার সম্মানার্থে কাবা ও জমিনের জন্য ফরজ। এটা নাসেক মানসুখ অর্থাৎ রহিত হওয়া থেকে পবিত্র। অপরদিকে সম্মানের বিষয়টি ওয়াজেব পর্যায়ে বর্তমান। মানুষ মানুষকে সম্মান করে থাকে। কোনো মানুষই এ থেকে মুক্ত নয়। মুখে হলেও তো একে অন্যকে সম্মান করে। মুখও তো মাথারই একটা অংশ।

প্রশ্ন নং ১৬

হযরত আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাগণ কোন সিজদা করেছিল? জ্বিন ও মানুষের জন্য সে সিজদা কি নিষিদ্ধ?

উত্তর : হযরত আদম (আঃ) কে ফেরেশতাগণ সম্মানের সিজদা করেছিল। মানুষও মানুষকে সে সিজদা করতে পারে। সাধারণত এর কারণ এই যে, আদমের সিজদায় ফেরেশতা ও জ্বিন উভয়ই সামিল ছিল। শয়তান ছিল জ্বিনের গোষ্ঠীভুক্ত। অপর দিকে মানুষও মানুষকে সিজদা করেছে। যথা হযরত ইউসুফের সিজদা। কোরানে এর প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্ন নং ১৭

অন্যকে সিজদা করতে মন চায় না, বেশ কষ্ট হয়। কারণ এটা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।

উত্তর : শয়তান নরকের যে আগুনে জ্বলছে, তোমাদের এ কষ্ট সে শয়তানি পুত্র শোক যন্ত্রণার চেয়েও অধিক। বস্তুত সিজদা কখনও কি কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ছিল? আল্লাহ তো হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) কে ফেরেস্তা, জ্বিন এবং মানুষ দ্বারা সিজদা করিয়েছেন। তাছাড়া আমাদের নবী (সাঃ) কে জীবজন্তু এবং বৃক্ষাদি দ্বারা সিজদা করিয়েছেন। আর আজও ফেরেশতা, জ্বিন এবং মানুষ দ্বারা জমিন ও কাবাকে সিজদা করাচ্ছেন। আরে মিয়া! তোমরা নামাজ পড় সিজদা কর কাকে? আজ পর্যন্ত তাও জান না। বলো, তুমি জমিন ও কাবাকে কি করছ?

প্রশ্ন নং ১৮

মিলাদ, কেয়াম, ফাতেহা, নেয়াজ এবং চৌঠা, সপ্তম, দশম, বিশতম, চল্লিশা, ষান্মাষিক ও বার্ষিক ইত্যাদি নির্দিষ্ট তারিখ উদযাপন এবং অলি বুজুর্গ শহীদান ও অন্যান্য পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের চালুকৃত শুভ অনুষ্ঠানাদি পালনের কারণ, উপকারিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা কী?

উত্তর : উক্ত অনুষ্ঠানাদির অভূতপূর্ব কল্যাণাদি ও ফলাফল পূর্ণ মর্যাদাসহকারে এগুলো উদযাপনের উপর নির্ভরশীল। এগুলো উদযাপনের সূত্রপাত হয় ভাব জ্ঞানের স্রোতধারা থেকে, যা ছাড়া আসমানী কিতাবও অকার্যকর এবং নিষ্ফল হয়ে যায়। লক্ষণীয় যে, হযরত জিব্রাঈল আসমানী কিতাব অবতরণের শুরুতে আমাদের শেষ নবী (সাঃ) কে اقرا باسم 'একরা বি এসমী' পাঠ করতে বলেন। কিন্তু হযরত তা পাঠ করতে অপারগ হন। তখন হযরত জিব্রাঈল নিজের হাত দ্বারা হযরত (সাঃ) এর মোবারক বক্ষে তিনবার চাপ প্রয়োগ করেন। ফলে হযরতের নিকট কোরানের শব্দার্থসহ প্রকৃত কোরান স্পষ্ট হতে থাকে। যদ্বারা তিনি একজন শিক্ষক হলেন। সুতরাং হযরতের কোরানিক জ্ঞান তাকলিদি বা শোনা বিদ্যা নয়। জিব্রাঈলের কাছ থেকে শোনাতেই যদি মূল কোরান সমাপ্ত হত তাহলে তা হত নিছক শোনা ও ধারণাকৃত। বস্তুত শোনা খবর প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুই না। তাইতো আল্লাহ বলেন,

ان الظن لايغنى من الحق شيئا *

"ইন্নাজোয়ান্না লা ইউগনি মিনাল হাক্কী শাইয়্যা।" (সূরা নজম-২৮)

অর্থাৎ, "অনুমান দ্বারা সত্যের কোনো ফলাফল পাওয়া যায় না এ জন্য আসমানী দূত পড়িয়েছেন এবং বক্ষ দাবিয়েছেন। অর্থাৎ, মৌখিক বিদ্যার সাথে সাথে এলমে আহয়াল তথা ভাব জ্ঞানের ফলন ঘটিয়েছেন। যার ফলে রাসূলের বক্ষ নূরময় হয়েছে। উম্মতের মধ্যে যাদের বক্ষ সেই নূরে আলোকিত ও প্রসারিত তারা আহলে নবী এবং নায়েবে রাসূল। তাদেরই জ্যোতিময় বক্ষ থেকে মৌলুদ, কেয়াম, ফাতেহা ও নেয়াজ ইত্যাদি প্রচলন হয়েছে। বস্তুত এসব অনুষ্ঠান শ্রুতি পরম্পরা থেকে আসেনি। বরং এগুলোর গভীর তাৎপর্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে। কোরানের মালিক এগুলোর জ্যোতির্ময় রহস্যের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে–

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا *

"ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনা লা নাহ্‌দি ইয়ান্নাহুম সোবোলানা।"

(সূরা আন কাবুত-৬৯)

অর্থাৎ, "যারা আমাদের সত্তায় সচেষ্ট আমরা তাদেরকে আমাদের পথগুলো প্রদর্শন করি।" এজন্য তাদের কোনো কেতাব বা দলিলের প্রয়োজন হয় না। এ নির্দেশনা আসে নূরময় বক্ষ থেকে 'ইলমে লাদুনি' এর মাধ্যমে তা কাস্‌ফ ও এলহামরূপে পথ প্রদর্শন করে। এ বক্ষ আল্লাহর অনুকম্পাপ্রাপ্ত মহাসম্পদ ভাণ্ডার।

এটাই কোরান কেতাবের মূল এবং আল্লাহর আরশরূপে স্মরণীয়। এ হল সমস্ত জ্ঞানের খনি। এখানে সমস্ত জ্ঞানের সমারোহ এবং 'ইলমে লাদুনি' এর প্রকাশও এখানেই হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তার বন্ধুকে সুসংবাদ দিচ্ছেন–

ولقد اتينك ملدنا علما *

"ওয়ালাকাদ আতাইনাকা মিল্লাদুন্না এলমা।"

অর্থাৎ, "অবশ্যই আমরা তোমাকে আমাদের তরফ থেকে দান করেছি এলমে লাদুন।" ফলে তুমি হয়েছ আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার।

সুতরাং তোমার অন্তর থেকে যা বের হচ্ছে তা শত শত কেতাব ও প্রমাণাদির চেয়ে উত্তম। বস্তুত যা নিজেই উজ্জ্বল ও নূরময় তার পথ চলার জন্য কোনো কেতাব দলিলের প্রয়োজন নেই। যথা– ঈমান, এটা মনের বিশ্বাস কোনো কেতাবের কাজ নয়। এটা কোনো বেদাত বা মাকরূহ হবে না। কারণ এটা কোরানের মর্ম থেকে প্রকাশিত। সামান্যতম 'ইলমে লাদুনি' থেকে যে ঈমান হয় সে জন্য কেতাবের কোনোই প্রয়োজন নেই, সে ঈমানকে কেতাবে স্থাপন করলে তা কোনো কাজে আসবে না। তাইতো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

استفت عن قلبك ان افتك المفتون *

"ইস্‌তাফতা আন কালবিকা ইন আফতুকাল মাফ্‌তুন।"

অর্থাৎ, "যদি মুফতিরা কোনো বিষয়ে তোমাকে ফতোয়া দেয়, তুমি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাইবে।" কারণ ফতোয়া হয় দলিলের ভিত্তিতে, আর মন হল জ্ঞানরহস্য ভাণ্ডার। এজন্য আল্লাহ কোরানকে কল্‌বে তথা অন্তরে সমর্পণ করেছেন। তিনি বলেন,

ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب *

"ইন্না ফি জালিকা লা জিকরা লিমান কা'না লাহু কালবুন।"

"অন্তরবানদের জন্য এ কোরান অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা অন্তরবান নয় তাদের জন্য কোরান অবতীর্ণ হয়নি।

মোট কথা, মুমিন ও আল্লাহ ওয়ালাদের মূলধন হল কাল্‌ব তথা অন্তর। বাকি ঈমান, ইবাদত সম্পদ ও সম্ভ্রম সবই সে বক্ষ ভাণ্ডারের জ্যোতি ও কর্ম। এমনকি বক্ষ মালিন্য রূপ অন্ধকার এবং পাপ কার্যাদিও তৈলাক্ত আবরণরূপে বক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়। এটাকে মনোরোগ বলা হয়। তাই বলা হচ্ছে–

فى قلوبهم مرض *

"ফি কুলুবিহীম মারাদুন।"

অর্থাৎ, "তাদের মনে রোগ আছে।" এমন তো বলা হয়নি যে, কোরানে রোগ আছে অথবা এওতো বলা হয়নি যে, কোরানে ঈমান আছে।

সুতরাং প্রমাণিত যে, মনের সৌন্দর্য স্বচ্ছতা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি সংক্রান্ত জ্ঞানই নূর। আর তাই ঈমান, সান্ত্বনা, ঐশী প্রেরণা, পূর্ণতা, সত্য এবং তাই প্রকৃত জ্ঞানের মূল উৎস। এসবই সত্য ও প্রয়োজনীয় এবং সর্বরকম দোষমুক্ত। তাইতো আল্লাহ বলেন,

ليس لك عليهم سلطان *

"লাইসা লাকা আলাইহিম সুলতোয়ানা।"

অর্থাৎ, "তারা যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নাই। আল্লাহ শয়তানকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেন।

উল্লেখ্য, উক্তরূপ বক্ষের নূর যা স্বয়ং রবের প্রেরণাদীপ্ত তা থেকে মিলাদ, কেয়াম, ফাতেহা, নেয়াজ ইত্যাদি শুভ অনুষ্ঠানাদির প্রচলন হয়েছে। এটা গবেষণালব্ধ প্রকৃত সত্য। অপরদিকে দলিল দ্বারা যা প্রমাণিত তাতো ধারণামাত্র। সুতরাং যা কেবল ধারণার ফল তাকে আসল মনে করা বড় ধরনের গোমরাহি। উক্ত রূপ নূরি জ্ঞানের মোকাবেলায় কেতাব দলিলের তো কোনো কার্যকারিতা বা গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং যেখানে সত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত সেখানে কেতাব দলিল হাজির করা প্রকৃতই গোমরাহি। কারণ ভাব গভীর রহস্যজ্ঞানকে দলিলের চক্করে আবদ্ধ করার অর্থ হবে নামাজ পড়ার সাথে নামাজের মসলা-মাসায়েল যা দলিল তা জপ করা।

প্রশ্ন নং ১৯

যাদের ঈর্ষামুক্ত পবিত্র বক্ষ থেকে ইলমে লাদুনি (দিব্যজ্ঞান) এবং অন্তর জ্যোতি প্রকাশিত হয় তাদের আদব ও সম্মান করা কী? এবং আদব আচরণাদির মধ্যে সিজদাও অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : এমন লোকদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন ফরজ এবং ওয়াজেব। কারণ তাদের অন্তরে প্রদীপ্ত নূর পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞানের সারাংশ এবং প্রভুর গোপন জ্ঞানভাণ্ডার। সুতরাং তাদের সম্মান করা আল্লাহকেই সম্মান করা, এবং তারই সন্তুষ্টি লাভ করা। যেমন কোরানের সম্মান আল্লাহরই সম্মান ও ইবাদত। বস্তুত দিব্যদৃষ্টিতে গোপন রহস্যলোকে এটাই প্রকৃত এবং আসল ইবাদত। উক্তরূপ পবিত্র মনের বদৌলতেই সকল পুণ্যকর্ম আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় যদিও তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের বরাবরে সম্পাদিত হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত আদম (আঃ) এর সিজদা কিরূপে সম্পাদিত হল তা লক্ষণীয়। আল্লাহর সৌন্দর্য রহস্য উজ্জ্বলরূপে আদমকে গৌরবদীপ্ত করে এবং সারা বিশ্বে তা প্রতিবিম্বিত হয়। তখন ফেরেশতাগণ তার সম্মানে মাথা নত করে এবং সিজদায় অবনত হয়। এটা উৎকৃষ্ট ইবাদত। সারা বিশ্বের জন্য এটা মহোৎসব। এ মহোৎসব বা ঈদের শোভা সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে কোরান কেয়ামত পর্যন্ত ঢাকঢোল পেটাতে থাকবে।

কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি সৌন্দর্য যে, তত্ত্ব জ্ঞানের বা রহস্যলোকের পূর্ণতা প্রাপ্তি আদম জাতির জন্যই নির্ধারিত। কোনো ফেরেশতা বা জ্বিনের এ সৌভাগ্য হয়নি। জ্বিন জাতি যখন জানতে পারল যে, উক্তরূপ অভূতপূর্ব গৌরব আদম ও আদমসন্তানদের দান করা হয়েছে। তখন তাদেরই বংশোদ্ভূত ইবলিশ ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়। ক্রোধের আগুন তার গোটা শরীরকে দাহ করে এবং সে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে। অপরদিকে আল্লাহর ইচ্ছায় সে গৌরব রহস্য ধীরে ধীরে আদম সন্তানদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে। এ ধারারই এক পর্যায়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইদের দ্বারা সিজদা করানো হল। অবশেষে সিজদা করানো হল আমাদের শেষ নবীকে পশু, প্রাণী ও বৃক্ষাদি দ্বারা। এসব করানো হল এজন্য যে, ভবিষ্যতে কোনো অধম যেন এর বিরোধিতা না করে এবং না ভাবে যে, এরূপ সিজদা করা উচিত নয়। অপরদিকে আমাদের নবীকে বৃক্ষাদি এবং পশু প্রাণী দ্বারা সিজদা করানো হল যাতে এ সিজদাকারীরাও আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র আদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদ্দেশ্য আদম ও আদম সন্তানগণ সারাবিশ্বে প্রভুর খলিফা বা প্রতিনিধি– এ চূড়ান্ত রহস্য প্রকাশ করা। সুতরাং এ রহস্যপূর্ণ সিজদা খেলাফতের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে ফরজ কল্যাণকর পরহেজগারী; ওয়াজেব এবং সুন্নত। খলিফা, পীর, বুজুর্গ এবং আউলিয়া প্রমুখ আহলে রাসূলদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা ফরজ। পুণ্য ও কল্যাণ কর্ম হিসেবে এটা উত্তম। কারণ আদমের সত্তা উত্তম এবং আদম রহস্যের উৎস উত্তম। অপরদিকে সম্মান প্রদর্শন এবং সিজদাও উত্তম কাজ। এর চর্চা কোরান কেয়ামত পর্যন্ত চালু রেখেছে এবং তা রহিত করেনি এটা উত্তম।

সুতরাং হে অনুগত সচেতন বান্দারা, প্রভুর প্রেমে আসক্ত হয়ে নতশির হয়ে যাও, আদববান হয়ে যাও, নিজেকে বিনীত করে দাও, মুখে কান্নার ভাব করো, মনকে হাসাও এবং চোখ দিয়ে দেখ যে এটা কোন গাছের ফল।

প্রশ্ন নং ২০

সিজদা, সম্মান, অথবা ভক্তি পেতে হলে তাকে অবশ্যই বুজুর্গ হতে হবে। কেবল হযরত আদম (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্যই এ বুজুর্গি বিশেষভাবে নিধারিত না অন্য কাউকেও আল্লাহ্ উক্ত বুজুর্গি দান করেছেন?

উত্তর : বুজুর্গি একটি অদৃশ্য ও সর্বজনীন নেয়ামত বা আল্লাহর অনুকম্পা। আল্লাহর যে বান্দা সে নেয়ামত লাভ করেন তিনি বুজুর্গ অলি এবং কামেল অর্থাৎ, পূর্ণ মানুষ হন। এর মোকাবেলায় নবুয়ত ও মাতৃপিতৃ মর্যাদাও পরাজিত। নবুয়তও মাতৃপিতৃ মর্যাদার চেয়ে বুজুর্গির মর্যাদা বেশি। হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর মাতা-পিতার সিজদা করার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বুজুর্গির এ মর্যাদার রহস্য সর্বজনীন। আল্লাহ্ তাঁর যে বান্দাকে তা দান করেন তিনি এ মর্যাদার

অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন ওয়াজেব। অনুরূপ মুর্শিদ ও মুরব্বিদের প্রতি আদব দেখানোও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে বুজুর্গির মর্যাদা নবুয়তের মর্যাদার চেয়েও অধিক আল্লাহর যে কোনো বান্দা তা অর্জন করতে পারেন।

প্রশ্ন নং ২১

নবী না হয়েও মর্যাদায় নবীর চেয়ে বুজুর্গ হতে পারেন কি?

উত্তর : বুজুর্গি এবং মর্যাদা কেবল নবুয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বুজুর্গি হল পরিপূর্ণতা। বেলায়েতের পথে তা অর্জিত হয়। রহস্যলোক ও অদৃশ্য জগৎ এর পরিমণ্ডল। এখানে যার ক্ষমতা বেশি তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী বুজুর্গ। রাসূল (সাঃ)-এর বাণী দ্বারা একথা বহুভাবে প্রমাণিত।

প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হযরত মূসা (আঃ) এর সময় একাধারে সাত বছর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ সময় এলাকায় বৃষ্টিপাত বন্ধ ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সত্তর হাজার লোক নিয়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময় দৈব আওয়াজ এল বাররাখ নামে আমার এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন, তিনি যদি তোমাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করেন তাহলে বৃষ্টি হবে। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) হযরত বাররাখের সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় আবার আওয়াজ এল, তিনি মাঠে বেড়াতে গেছেন। এমন সময় দেখা গেল জনৈক ব্যক্তি গায়ে কাপড় জড়ানো অবস্থায় একটি অন্ধ গলিপথে দ্রুত পথে চলমান।

বস্তুত তার চেহারায় দীপ্ত দৈবজ্যোতি দেখে হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কে? জবাব এল আমি আল্লাহ্‌র বান্দা কালিমুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করেন আপনার নাম কি? বললেন বাররাখ। তখন কালিমুল্লাহ্ বলেন আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে, তখন আরিফ বিল্লাহ্ হযরত বাররাখ বললেন, বলুন যা বলার আছে। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রাপ্ত ওহীর কথা তাকে জানান। অতঃপর মাহবুবে সোবহানী হযরত বাররাখ বললেন, চলুন ময়দানে যাই। ময়দানে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে হযরত বাররাখ বলতে শুরু করেন, হে আল্লাহ আজ তোমার শক্তি কমে গেছে। তোমার দৃষ্টি কাজ করে না, কান শুনে না, হাতও চলে না এবং বাতাস ও পানি তোমার কথা মানে না। এজন্য বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরূপ অর্থহীন প্রলাপ করতে করতে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে; কিছুক্ষণের মধ্যেই এ প্রলাপের ফলে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। ফলে মাঠে হাঁটু সমান পানি প্রবাহিত হলে তিনি হযরত মূসা (আঃ) কে নিয়ে উঁচুতে উঠেন এবং তাকে বলেন দেখেছেন আমি আপনার আল্লাহ্‌কে কত গালমন্দ করলাম। এতে গোশশা হয়ে হযরত মূসা (আঃ) তাকে কিছু বলার জন্য উদ্যত হলে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে হযরত মূসা (আঃ) কে বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন তার মরমী

বন্ধুর সাথে বেয়াদবি করলে আপনার নবুয়ত কেড়ে নেওয়া হবে। তার এ বন্ধু দৈনিক তিনবার তার সাথে এরূপ হাসি তামাশা করেন। ('এহ্ইয়াউল উলুম' থেকে)

অতএব উপরিউক্ত ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বুজুর্গি কেবল নবুয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বুজুর্গি পরিপূর্ণতা এবং ইচ্ছাশক্তি যা বেলায়েতের পথে অর্জিত হয় যার পরিমণ্ডল রহস্যলোক ও অদৃশ্য জগৎ। এর সূক্ষ্ম মাধুর্য ব্যাখ্যায় জনৈক আরিফ বিল্লাহ্ বলেন,

صد هزاران هموز موسی در هر گوشی

ربی ار نی گ وشوده دیدر جو امده

"ছোয়াদো হাজারান হামছো মূছা দরহর গোসা।

রাব্বি আরিনি গোসোদা দীদার জু ইয়া আমাদা।"

অনুবাদ : অনুরূপ মূসা আছেন হাজার হাজার প্রত্যেক হুজরাখানায়

বলছেন যারা দেখা দাও হে প্রভু তারা তার দেখা পায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত খিজির (আঃ)-এর মর্যাদার কথা স্মরণ কর। তাঁর কাজকর্ম বাহ্যত নবুয়তের জ্ঞানের বিপরীত ছিল। এজন্য হযরত মূসা কালিমুল্লাহ্ তাঁর কাছে লজ্জিত হন। তবে এ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, নবীগণ বুজুর্গ নন। বরং এ দ্বারা যে কথাটা পরিষ্কার প্রমাণিত হল তা এই, যে নবুয়ত বেলায়েত জয়ী হয় তা উত্তম। কারণ বেলায়েত নবুয়তের মূল উৎস। বস্তুত নবুয়ত বেলায়েতেরই প্রকাশ। তাও আবার আপন প্রকাশের গুণগতমানের বিচারে উত্তম ও সাধারণ হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত ঈমাম গাযযালী (রঃ) আপন গ্রন্থ 'কিমিয়ায়ে সায়াদাত'-এ বলেন, বেলায়েত হল ব্যাপক। অর্থাৎ অলি নবুয়তপ্রাপ্ত হলে নবী হন। তা না হলে তিনি অলি থাকেন। জামেনূরের দ্বিতীয় খণ্ড তথা মাতলাউল উলুমে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

প্রশ্ন নং ২২

মিলাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কেয়াম করা কী? এর উপকারিতা কী? এতে আমাদের অনীহা বোধ হয়?

উত্তর : হে চাঁদ শরীফ মিয়ারা, তোমাদেরতো অনীহাই পছন্দ। বেশ তোমরাতো নামাজ পড় তাতে তোমরা কী কর? তাতে তোমরা অনেক রংঢং কর। মিলাদ অনুষ্ঠানেতো কেবল একবারই কেয়াম করা হয়। আর কেয়াম তথা দাঁড়ানো ও বসা ইত্যাদি নামাজের দীপ্তিমান কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত বটে। বস্তুত নামাজে কেয়াম তথা দাঁড়ানো ফরজ। মিলাদের কেয়ামও সেই একই রহস্যের দীপ্তিমানরূপ। এর মধ্যে হাজারও রহস্যের প্রকাশ ও অবগতি হচ্ছে। এ থেকে পবিত্র নূরী প্রেরণা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা সর্বক্ষণিক ফরজ। তা যদি না হবে, তাহলে নামাজে বার

বার রুকু ও সিজদার প্রয়োজন কী? এটা কী এমন যে, কাজ করব অথচ ভাত পাওয়া যাবে না। অথবা এটা কি ভূতের বেগার যে, আলিফ-বা পড়বে আর এর নামও জানবে না বা নামাজে এমন তেমন করবে আর এসবের অর্থের ব্যাপারে উদাসীন রবে। এ প্রসঙ্গে শেখ সাদী (রঃ) বলেন,

بخبر دیاند چند جوخود بخبر

عیب پسنداند بزعم نونور

উচ্চারণ : বে খবরদি চান্দে জো খোদ বেখবর।

আয়েব পছন্দান্দ বোজ আম হুনুর।

অনুবাদ : সমস্যা অজ্ঞ উদাসীন ভ্রান্ত ধারণায়,

দোষারোপ করে তারা জ্ঞানীর কথায়।

আরে নামাজ তো এক প্রকার শাসন প্রক্রিয়া। বান্দার সত্তা ও গুণাবলিতে তার মাবুদের জন্য যা কিছু মজুদ আছে নামাজভুক্ত কার্যাদির মাধ্যমে তা সবই প্রকাশিত ও নিবেদিত হয়। বান্দার সত্তা ও গুণাবলি নিবেদনের এ এক বিস্ময়কর পদ্ধতি। এখানে বাঁশি ও সারেঙ্গী যেমন অন্যের পেষণে বাজে ঠিক তেমনি আরদ্ধের পেষণে বান্দার যা কিছু আছে সবই নিবেদিত হয়।

উল্লেখ্য, সুন্নত, মোস্তাহাব, ফরজ এবং ওয়াজেব সব বান্দার কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি একটি সুন্নত নামাজও সম্পাদন করতে শুরু করে তাহলে তার জন্যও রুকু সিজদা ফরজ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও নামাজের রীতিনীতি, কেরাত এবং সঠিক উচ্চারণ ওয়াজব। এক্ষেত্রে ইবাদত শর্ত। এখানে নিয়ত করা ফরজ। সুন্দরভাবে কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। এগুলো সব বান্দার কাজ।

অনুরূপভাবে মিলাদের অনুষ্ঠানে বরকতের উদ্দেশে যখন রাসূলের (সাঃ) জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়, তখন মোস্তাহাব, সুন্নত, ওয়াজেব এবং ফরজ ইত্যাদি সুন্দরভাবে পালন করতে হয়। যেমনি পালন করতে হয় মুরব্বি ও বুজুর্গদের সামনে নেহায়েত আদবের সাথে বসা ও দাঁড়ানোর মতো কার্যক্রম। নবীর মিলাদ অনুষ্ঠানে নবীর আদব এবং বেলায়েতের অনুশাসন পালন করা ওয়াজেব ও ফরজ। উত্তমরূপে তা পালন করা অর্থাৎ, উত্তম স্থানে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করে উত্তম আওয়াজ ও মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে ভালো আলোচনা এবং আনন্দঘন পরিবেশে ইত্যাদির প্রতি যত্নসহকারে মিলাদের অনুষ্ঠান করা সুন্নত ও মোস্তাহাব হলেও এতে ফরজের ফজিলত রয়েছে। এতসব কিছুর পরও কেয়ামের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে পরম সৌজন্য ও সম্মানবোধ প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য, রূহ যখন আপন বৈশিষ্ট্য মোতাবেক পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন যে সব বান্দা সাক্ষাৎ ও দর্শন পর্যায়ে বিকশিত, তাদের উপর রূহের ফায়েজ ও বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন আন্তরিক বন্ধুর বিরহের কথা স্মরণ হলে তার মধ্যে

শোক ও মাতম সৃষ্টি হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর বিরহ বেদনায় অস্থির করে ফেলে। একথা কে না জানে? বরং একথা জানে না পৃথিবীতে এমন মানুষ বিরল। লক্ষণীয় যে, কেউ যদি নিজের কোনো দেখা শহরের ছবি কল্পনা করে তার মনের পর্দায় সে শহরের দৃশ্যাদি স্পষ্ট দেখতে পায় এবং সেই শহরের বিস্তারিত বিবরণ সে নির্ভুলভাবে বলতে পারে ও তাতে কোনো প্রকার মিথ্যা বা ভুলের অবকাশ থাকে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি আলিফ, বে, তে শিখে এবং সে অক্ষরগুলো লিখতে চায় তাহলে উক্ত অক্ষরগুলোর যে ছবি তার মনে আসবে হুবহু তাই সে লিখবে অথবা পড়বে। ঠিক তেমনি অতি সূক্ষ্ম নূরময় রুহ যাকে কোনো পর্দা আড়াল করতে পারে না এবং যা সারা বিশ্বে সদা বর্তমান কেয়ামের ফলে কেয়ামের সময় তা প্রতিভাত হয়। কারণ এ কেয়াম নবির আদব এবং মহব্বতের গোপন প্রকাশের দলিল। এটা ফরজ এবং ওয়াজেব থেকে উত্তম। এতে কোনো মিথ্যা বা মন্দের লেশ নেই। এটা নবুয়ত সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ প্রমাণ।

বসৎ, তুমি কি কখনো টেলিগ্রাফ দেখনি? তা কত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। রূহের ক্ষমতা কি এর চেয়েও কম? মিয়া! যদি ফুল হওতো সুগন্ধি ফুল হও, কাজে আসবে।

প্রশ্ন নং ২৩

বসার মাধ্যমেই তো সম্মান প্রদর্শন হয়, আরও সম্মান প্রদর্শনের তাৎপর্য কী?

উত্তর : সম্মান প্রদর্শনের সাথেও বান্দার শারীরিক কার্যক্রম ও মানসিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মুখের সম্মান প্রদর্শন হল মুখে বলা ও হাসিখুশি চেহারা। চোখের সম্মান প্রদর্শন হল কান্না ও বিনীত দৃষ্টি। কানের সম্মান প্রদর্শন হল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। হাতের আদব হল ইশারা করা এবং বক্ষ ও কোমরে হাত বান্ধা ইত্যাদি। তেমনি মিলাদের অনুষ্ঠানে দাঁড়ানোর মাধ্যমে পায়ের দ্বারা সম্মান দেখানো হয়। এটা কেন নিষেধ হবে? তাহলে কি পা ভেঙে দিতে হবে? কোরানে তো জিকিরের ক্ষেত্রে কেয়ামের উল্লেখ রয়েছে। বলা হচ্ছে–

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ج

"ফাজ কুরুল্লাহা কিয়ামাওঁ ওয়া কুউদান ওয়াআলা জুনুবিকুম।"

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহর জিকির কর দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায়।" (সূরা নিসা-১০৩) উক্ত তিন অবস্থায় অথবা এর যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর জিকির হতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাঁড়ানো, বসা এবং শয়ন ইত্যাদি আল্লাহকে স্মরণ করার উপাদান। এগুলোর অবলম্বন ছাড়া আল্লাহর জিকির বা স্মরণ সম্ভব নয়। বস্তুত এগুলোর অবলম্বন ছাড়া কোনো কাজই সম্পন্ন হতে পারে না। কোনো জ্ঞানী লোক বলত যে দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া চলবে না। বসা থাকলে

দাঁড়ানো চলবে না, আর দাঁড়ানো থাকলে শয়নে যেতে পারবে না। আর শোয়া বা বসা থাকলে দাঁড়াতে পারবে না। এসব কথা কেউ গ্রহণ করবে না। কারণ ধর্মীয় অথবা জাগতিক কোনো কাজই এই তিন অবস্থা ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় মিলাদ অনুষ্ঠানে কিয়াম ইত্যাদি নিষেধ বা হারাম হয় কী করে? এ ধরনের মনগড়া কথাবার্তা কিসের ভিত্তিতে বলে তা আমাদের জানা নেই।

প্রশ্ন নং ২৪

মিলাদ, কেয়াম, ফাতেহা, নেয়াজ এবং কোরান ও তাসবিহ্ খতম ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি যা ফরজ বা ওয়াজেব নয়, তাকে ফরজ বা ওয়াজেব মনে করে সর্বদা আদায় করা হচ্ছে, এটা কি মাকরুহ কাজ হচ্ছে না?

উত্তর : যা ফরজ বা ওয়াজেব নয়, তাকে ফরজ বা ওয়াজেব মনে করা হচ্ছে, এ অভিযোগ সত্য নয় বরং মিথ্যা। যা ফরজ বা ওয়াজেব নয় এটা যে জানে, সে কি কখনো তাকে ফরজ বা ওয়াজেব করতে পারে? না জেনে যা ফরজ বা ওয়াজেব নয়, তাকে কেউ যদি ফরজ বা ওয়াজেব মনে করে, সেটাতো তার অজ্ঞতা। সুতরাং নিজের অজ্ঞতার কারণে কেউ যদি মিথ্যা অভিযোগ করে যে, যা ফরজ নয় তাকে ফরজ মনে করা হচ্ছে, এটাতো নিছক বিভ্রান্তি ছড়ানো বৈ কিছু নয়। জানি না যা ফরজ নয় তাকে ফরজ মনে করা হচ্ছে এ অভিযোগের উৎস কোথায়? তবে উক্ত কার্যাদিতে ফরজ, ওয়াজেবের চেয়ে অধিক কল্যাণ ও ফজিলত রয়েছে। উক্ত কার্যাদির দ্বারা যেসব কল্যাণ ও বরকত লাভ হয় তা ফরজের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বহুবিধ কল্যাণ ও বরকতের উৎস। যা ব্যতীত ফরজ, সুন্নত সবই নিষ্ফল। কারণ সেটাই সকল কর্মের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য হাসিলের আশাতেই সব ভালো কাজ করা হয়।

বস্তুত প্রশ্নে উল্লিখিত কাজগুলো ফরজ, সুন্নত ইত্যাদির মূল বটে। এগুলোতে অবশ্যই অনেক কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এমতাবস্থায় এগুলোর গুরুত্ব ফরজের চেয়ে কম নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর একটি মাত্র ফজিলত শত ফরজ, ওয়াজেবের চেয়েও উত্তম। কারণ এসব কাজের ফজিলত স্থায়ী এবং তাছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই।

উল্লেখ্য, লোকের সাথে ভালো কথা বলা সর্ব-নিম্নতম ভালো কাজ আর এটা সব সময়ই ভালো। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মন্দ কথাও কি বলা দরকার? অপরদিকে কোরান পাঠে মধুর কণ্ঠ, মিষ্টি সুর এবং বিশুদ্ধ পাঠরীতি ইত্যাদি বেশ প্রশংসনীয় এবং সুন্দর জিনিস। এগুলো মোস্তাহাব ও সুন্নত। এমতাবস্থায়, সর্বদা মধুর কণ্ঠে, মিষ্টি সুরে ও বিশুদ্ধ পাঠরীতিতে কোরান পাঠ করা অথবা সুন্দর সুশ্রী অক্ষরে কোরান লেখা কি দোষের হবে? না নিষেধ হবে? মাঝে মাঝে কি কর্কশ সুরে অশুদ্ধ উচ্চারণে কোরান পাঠ করতে হবে? না অসুন্দর অক্ষরে তা লিখতে হবে? তা না

হলে কি কোরান পাঠ বা তা লেখা মাকরুহ হবে? সর্বদা সুন্দর সুশ্রী অক্ষরে কোরান লেখা কি নিষেধ? এটা কে না জানে যে, সাধারণভাবে পাঠ্য একটি অজিফাও যদি সর্বদা পাঠ না করা হয় তাহলে তাঁর যোগসূত্র থাকে না এবং এর ফলে উক্ত অজিফার ফায়েজ বা শুভপ্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত এর কোনো উপকারিতাই আর থাকে না। নির্ধারিত অজিফা সর্বদা পাঠ করতে হয় এবং সব সময়ে অন্তরে আল্লাহর জিকির স্মরণ জারি রাখতে হয়। এগুলো মাঝে মাঝে করলে কোনো উপকার হয় না। তোমরা তো মাদ্রাসায় যাও এবং লাগাতার যাও। তাও ছেড়ে দাও এবং মাঝে মধ্যে যাবে।

আরে মিয়া! মিলাদ, ফাতেহা এবং নেয়াজ ইত্যাদির মাহফিল তো মাঝে মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দিন তো আর হয় না। অথচ তোমরা এসব নিয়ে সারাক্ষণ বক বক করছ। এগুলো নিয়ে আলোচনা না করে পার না? এ ধরনের বকবকানি তো হারামের চেয়েও ক্ষতিকর। এ ধরনের বকবকানি, সমস্ত পুণ্য কর্মের প্রধান দ্বার যে অন্তর তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়।

প্রশ্ন নং ২৫

কোনো কোনো ফেকার কিতাবে উপরে আলোচিত বিষয়গুলোকে মাকরুহ বলা হয়েছে। এর উত্তর কী?

উত্তর : ঐ সব কিতাব তাকে তুলে রাখো। কারণ যাদের ফেকাহ শাস্ত্রের পরিভাষা, মতভেদ এবং আলোচ্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ জ্ঞান নেই, তারা যদি কোনো বিষয়ে বাহ্যদৃষ্টিতে কিছু বলে তা অর্থহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (রঃ) সাপ ও গুইসাপ হালাল বলেন এবং ইমাম আবু হানিফা বলেন এগুলো খাওয়া হারাম। এখন বলো এটা কোন ধরনের হারাম? এটা যে জানে না তার মুফতি সেজে ফতুয়া দেওয়ার অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, 'ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এ শ্রেণীর ফতোয়া দাতার ওপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের তরফ থেকে অভিশাপ বর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি বাণীর বরাত দিয়ে একথা লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২৬

যে কোনো খতম এবং মিলাদ শরীফ ইত্যাদি নানা ধরনের অনুষ্ঠানাদি পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীগণ যে টাকা-পয়সা গ্রহণ করেন, তা কি বৈধ পারিশ্রমিক না নিষিদ্ধ অথবা হারাম?

উত্তর : এটা না হারাম না নিষিদ্ধ। কারণ এটা আল্লাহর উদ্দেশে আল্লাহর পথে খরচ। যার পক্ষে সম্ভব তিনি গ্রহিতাকে তা দান করেন। এমনকি এ উপলক্ষে রুটি,

খাদ্য, পানীয় এবং পান-তামাক, পোশাক-আশাক, টাকা-পয়সা, ইত্যাকার যা কিছুই খরচ হয় তা সবই আল্লাহর উদ্দেশে আল্লাহর পথে দান। এসব পারিশ্রমিক নয়। পারিশ্রমিকে প্রস্তাব ও গ্রহণ শর্ত। অর্থাৎ, মিলাদ বা খতম পরিচালক এ কাজের জন্য যদি কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবি করে আর মিলাদ বা খতমের আয়োজক যদি সে দাবি মেনে তাকে কোনো টাকা-পয়সা প্রদান করে তাহলে তা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন নং ২৭

নবী-অলি এবং পুণ্যবান বান্দাগণ কখনো কাফের হন কি? কখনো তাদের ঈমান নষ্ট হয় কি?

উত্তর : না, তারা অবশ্যই কখনো কাফের হন না। কারণ তাদের ঈমান মৌলিক এবং তারা হাকিকি ঈমানের অধিকারী যা কখনো তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হয় না। ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে গেছে এবং তা মিশে গেছে তাদের সমগ্র সত্তায়। সুতরাং তা আর যাওয়ার নয়।

প্রশ্ন নং ২৮

বার বার যারা ঈমান আনে আবার কাফের হয় এবং শিরক করে আবার তওবা করে এবং কলেমা পড়ে এটা কোন ঈমান এবং কী ধরনের কাজ?

উত্তর : আরে বুদ্ধিমান সাহেব! ঈমান কি কোনো গোখাদ্য যে, যেমন খরিদ তেমন বিক্রি হবে অথবা যেমন মহাজন তেমন খরিদ্দারের মতো। ঈমান আসা-যাওয়ার কথা যারা বলে তাঁরা যেন নতুন নতুন চালানে ঈমান ও আমল আমদানি ও রপ্তানির কাজ করেছে। তা না হলে, ঈমান যায় আবার আসে কী করে? বাংলা ভাষায় একটি মশহুর প্রবাদ আছে–

চালাকের ধোকা ঔজ্জ্বল্ল ঠক,
থুক দিয়ে আটক করে বক।

অর্থাৎ, "ঠকের জিনিস কাঁচের মতো চক চক করলেও আসলে তা মাটির পুতুল।"

প্রশ্ন নং ২৯

ফেকাহ গ্রন্থাদিতে কুফর অর্থে ব্যবহৃত বাক্য দ্বারা প্রকৃত কুফর এবং কাফের প্রমাণিত হয় কি?

উত্তর : ফেকাহর গ্রন্থাদিতে কুফর অর্থে ব্যবহৃত বাক্য দ্বারা ঈমান বিনষ্টকারী কারণাদি বর্ণনা করা হয়। এটা ঠিক আছে। কিন্তু ঈমান কি জিনিস এবং তা কিভাবে অর্জিত ও স্থায়ী হয় সে কথাতো ফেকাহর কিতাবাদিতে নেই। তাহলে যার

আমদানি নেই তার রপ্তানি কোথা থেকে হয় তাতো আমাদের জানা নেই। এমনকি ফেকাহর কোনো কিতাবে ঈমান, ঈমানের উৎস এবং ঈমান কাকে বলে তার কোনো বর্ণনা নেই। কোথাও যদি এসব বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েও থাকে তাও হয়েছে নেহায়েত প্রসঙ্গক্রমে। মূল বিষয় হিসেবে নয়। এ ধরনের মৌলিক বিষয়ে নেহায়েত প্রাসঙ্গিক আলোচনা বিবেচনার যোগ্য নয়। বরং ফেকাহবিদগণ উক্ত বিষয়াদি সংক্রান্ত আলোচনা তাসাউফবিদদের উপরই ছেড়ে দিয়ে থাকেন। কারণ ঈমান সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের সুস্পষ্ট এবং সঠিক বর্ণনা তাসাউফবিদদের পক্ষেই সম্ভব। 'দূররে মুখতার' এবং 'শামি' ইত্যাদি কিতাবে আছে কুফর অর্থে ব্যবহৃত বাক্যাদি দ্বারা কাফের সাব্যস্ত হয় না। বরং তাতে যেসব কারণে কাফের হতে পারে তার কোনোটিকে বোঝায়। কুফরি কথা বললেই কাফেরি সাব্যস্ত হয় না। বরং কুফরটাই সাব্যস্ত হয়। এবং কুফর সাব্যস্ত হওয়াতে কেউ কাফের হয় না। বরং কুফর হওয়ার উদ্দেশে কুফরি কথা বললে সে কাফের হয়।

প্রশ্ন নং ৩০

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে দেখেন কি না; যদি দেখেন তাহলে সে দেখাটা কী বা কী রকম?

উত্তর : মুমিনের ঈমানি চোখের দৃষ্টি যখন প্রসারিত হয়, তিনি তখন আল্লাহকে দেখতে পান। তিনি যদি তাকে না দেখেন তাহলে কার ওপর তিনি ঈমান আনলেন? তবে কাফের আল্লাহকে দেখতে পায় না। উল্লেখ্য, ঈমানি চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্বপ্ন, কাশ্‌ফ (স্বর্গীয় প্রেরণা), এলহাম (স্বর্গীয় বাণী) এবং বোধিজ্ঞান সহায়ক অনুসঙ্গি ও উপাদান হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, ঈমানের অনুশাসনের আওতায় স্বপ্ন ও কাশ্‌ফযোগে মুমিন আল্লাহকে দর্শন করেন। ঈমানি নূরের কিরণের গুণে অর্জিত কাশ্‌ফ তথা অতি প্রাকৃত বোধিলোকে আল্লাহকে তার সত্তা ও গুণাবলি সহকারে দেখা যায়। অনুরূপভাবে এলহামি দৃষ্টি তথা আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত প্রজ্ঞালোকে ও আল্লাহকে তার সর্বত্র প্রকাশিত ও সবকিছুতে আবিষ্ট সত্তা ও গুণাবলি সহকারে দেখা যায়। এ ঈমানী চোখ এবং এলহামি দৃষ্টি বাহ্য চোখের উৎস। অতএব বাহ্য চোখের উৎসমূলে যা পরিপূর্ণরূপে পরিদৃষ্ট হয় তারই সম্প্রসারিত দৃষ্টিতে বা বাহ্য চোখে তাকে দেখা যাবে না কেন? হ্যাঁ, মূল চোখ তথা কাশ্‌ফ শক্তি এবং এলহামি দৃষ্টি যার নেই তার পক্ষে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, কোনো কিছু দেখতে হলে দৃষ্টির উৎস থেকে দৃষ্টি ধ্যানলোকে প্রসারিত হয়ে মূলের সম্প্রসারিত দৃষ্টি শাখার মাধ্যমে তা বাহ্যদৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়। দৃষ্টিশক্তির উৎস থেকে দেখার সূত্রপাত্র হয়। তা না হলে চক্ষু থাকলেও দেখা যায় না।

ঈমানি চোখের দৃষ্টি সক্রিয় ও প্রসারিত হয়ে ঈমানদারের বাহ্য চক্ষুকে সক্রিয় করে। তাই তার উৎস থেকে উৎসারিত দৃষ্টি সমেত বাহ্য চোখে দেখা মূল চোখের দেখা বলেই গণ্য হয়। মূল থেকে দৃষ্টি যখন অন্তর্দৃষ্টিতে আসে তখন তা দ্বারা দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখাই মুমিনের কাজ। আর তাকে না দেখা বা তাকে দেখা অপছন্দ ও অস্বীকার করা কাফেরের কাজ। তাই কোরান ঘোষণা করছে–

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى واضل سبيلا *

"মান কানা ফি হাজিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা ওয়ায়াদাল্লু সাবিলা"

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ এবং পথভ্রষ্ট।"

(সূরা-বনী ইসরাইল, ৭২)

উক্ত আয়াত দ্বারা দু প্রকার গোমরাহির কথা জানা গেল– এক অন্ধত্ব এবং দুই পথভ্রষ্টতা। পথভ্রষ্টতা অর্থ কুফরির দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া। এ থেকে অন্ধত্ব আসে। এ আয়াতের আসল ব্যাখ্যা এই যে, অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে প্রদীপ্ত ও আলোকময় হওয়া যায় দুভাবে। এক ঈমানি দৃষ্টি আর দুই হাকিকি দৃষ্টি। ঈমানি দৃষ্টির প্রসারিত আলোকে আল্লাহ ও তার গুণাবলি এবং কার্যাদি দেখা যায়। আর হাকিকি দৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর প্রকৃতি অবলোকন করা যায়। সুতরাং ঈমানী দৃষ্টি সক্রিয় ও স্বচ্ছ সে তো ঈমানদারির সাথেই বলবে এবং বলবেই যে, তিনি আল্লাহকে দেখেছেন বা দেখছেন। আর যার তা নেই সে তো এ দাবি করবে না। তবে শুভচেতনার বশে সে যদি অন্যের দেখার কথা স্বীকারও করে তা হবে তাকলিদ বা পরানুস্মরণ। আর নিজে দেখে না বলে অন্যের দেখাকে অস্বীকার করার অর্থ হবে অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ করা। অপরদিকে যার ঈমানি চক্ষু খোলা নেই সে নবজাত চড়ুই পাখির বাচ্চার মতো দেখার জন্য ছটফট করবে। সুতরাং তাকে কাফের বলা যাবে না।

প্রশ্ন নং ৩১

কেউ কেউ বলে আল্লাহকে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখার প্রমাণ নেই?

উত্তর : বস্তুত এ একটি অর্থহীন প্রশ্ন। অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি মূলত বাহ্য চোখের মাধ্যমে প্রকাশ হয়। স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ ইত্যাদি বাহ্য চোখের দেখা না হলেও বস্তুত তা বাহ্য চোখের মূলেরই সম্প্রসারিত দৃষ্টি। অর্থাৎ, বাহ্য চোখে অন্তর্দৃষ্টির সম্প্রসারণ শেষ হলে এর মূল থেকে স্বপ্নের প্রকাশ ঘটে। আর নিদ্রাচ্ছন্ন চোখ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে মূল থেকে কাশ্‌ফ দৃষ্টি সক্রিয় হয়। আর কাশ্‌ফের প্রকাশ পর্যায়ের সমাপ্তি হলে মূল থেকে এলহামের নূর প্রদীপ্ত হয়। আর এর ক্ষমতা যেখানে শেষ সেখানে প্রদীপ্ত হয় নূরে হাকিকত অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি।

বিষয়টা এ রকম যে, গাভীর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা এর সত্তার মধ্যে বর্তমান। বের হওয়ার সময় হলেই কেবল তা বের হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, যার মধ্যে যা

নেই, তার থেকে সে জিনিস কখনো বের হবে না। উদাহরণস্বরূপ যে বীজে বৃক্ষের মূল, কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখা মজুদ নেই, কখনো তা থেকে এসব বের হয় না। এটাই সমস্ত বস্তুর মৌলিক ও পরিপূর্ণ অবস্থা বিভিন্নভাবে যার প্রকাশ চলছে। চক্ষু, কর্ণ, নাক, জিহ্বা প্রভৃতি সবই পানির মতো। কারণ এগুলোর মাধ্যমে সব কার্যাদি প্রতিবিম্বিত হয়। যথা– দেখা ও দৃষ্টির দ্বার চক্ষু, শ্রবণের দ্বার কান, শোঁকার জন্য নাক এবং স্বাদ গ্রহণের জন্য মুখ। এগুলোর মূল এক এবং এরা পরস্পর শাখা-প্রশাখা। এ কারণে মূল ও শাখার মধ্যে পারস্পরিক যোগ সম্পর্ক অপরিহার্য।

মূল বিনে যেমন শাখা অসম্ভব তেমনি মূলের জন্য শাখা অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে শাখার মধ্যে মূলেরই প্রকাশ ঘটে। তাই শাখাও মূলই বটে। শাখার মাধ্যমে প্রকাশিত বস্তু মূলের সূত্রেই পরিচিত হয়। পুণ্যবান এবং প্রদীপ্ত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিত্বের আল্লাহ দর্শনের ক্ষেত্রেও এ একই নীতি প্রযোজ্য। তারা আল্লাহকে বাহ্য চোখে এবং মৌল চোখে দেখেন। স্বপ্ন এবং কাশ্‌ফ-এর অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর বুজুর্গদের বেলায় ইহকাল এবং পরকাল সমার্থবোধক। হযরত রাসূলে করিম (সাঃ)-এর বাণী মোতাবেক তাই হয়। তিনি বলেন, موتوا قبل ان تموتوا "মোতু কাব লা আন তামুতু" অর্থাৎ, "মরণের পূর্বেই মর।" অতএব জীবিত অবস্থাতেই তারা মৃতবৎ হয়ে যান। ফলে সর্বদা তারা মরণের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকেন। এজন্য তাদের জীবন-মরণের কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের দুনিয়ার জীবন মৃত্যুতুল্য। আর তাঁদের দুনিয়ার মৃত্যু যেন প্রকৃত জীবন লাভ। এমর্মেই কোরানে বলা হচ্ছে–

لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم يرزقون *

"লা তাহছাবান্নালাজিনা কোতিলু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াতান বাল আহ্ ইয়ায়ুইনদারাব্বিহিমইয়ারজুকুন।"

অর্থাৎ, "আল্লাহর পথে শহীদদের তুমি মৃত মনে ক'রো না। বরং তাঁদের পালনকর্তার নিকট তাঁরা জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে আরামে আছেন।" (আল ইমরান-১৬৯)।

মোট কথা, যারা আল্লাহর পথে জীবন তলোয়ারে শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত মনে ক'রো না বরং তাঁরা জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত আছেন। সুতরাং মুমিনকে মৃত মনে করা আর মৃত্যু হলে জীবিত মনে করা একই কথা এবং যথার্থ। এমতাবস্থায়, মুমিন বাহ্যচক্ষু অথবা কাশ্‌ফ ইত্যাদি যেকোনোভাবে আল্লাহকে দেখতে পান এবং তাকে দেখতে দিন। হাদিস শরীফে আছে, মুমিনগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহকে পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখবেন। সুতরাং দুনিয়াতেও তাঁদের অনুরূপ দেখতে দিন। তোমরা যারা তা বিশ্বাস করো না, তারা বাদুরের মতো চক্ষু বন্ধ করে থাক। তবে,

من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى

"মান কানা ফি হাজিহি আমা ফাহুয়া ফিল আখিরাতি আমা।"

অর্থাৎ, "এখানে যারা অন্ধ পরকালেও তারা অন্ধ থাকবে।"

কোরানের এ বাণী যাদের সম্পর্কে ঘোষিত হয়েছে তাদের দলভুক্ত হয়ো না। এবং নবী-অলিগণকে মৃত মনে করে তাঁদের নিকট নিজের বাসনা প্রার্থনা তথা তাঁদের তাবেদারি করার সৌভাগ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'রো না।

প্রশ্ন নং ৩২

কারো কারো প্রশ্ন যে, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে পাননি, এমতাবস্থায় অন্য কারো পক্ষে কী করে আল্লাহকে দেখা সম্ভব?

উত্তর : আরে মিয়া! তোমরাতো বড় সংশয় সৃষ্টিকারী। আল্লাহ বলেন–

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاوخرموسى صعقا

"ফালাম্মা তাজাল্লা রাববাহু লিলজাবালি জায়ালাহু দাক্কাওঁয়াখাররা মূসা ছায়াঈকা।" অর্থাৎ, "তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে জ্যোতি বিকিরণ করেন পাহাড় বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং মূসা (আঃ) বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়।" (সূরা আরাফ, ১৪৩) কোরানের অর্থ বোঝেন এমন কারও কাছে বুঝে নাও এখানে তাজাল্লী তথা জ্যোতি বিকিরণ বলতে কী বোঝায়? আর এ জ্যোতি বিকিরণের পর মূসা (আঃ) আল্লাহকে দ্বিতীয় বার দেখতে চেয়েছিলেন কিনা বা ঐ ঘটনার পর মূসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌কে দেখার বাসনা মিটে গিয়েছিল কিনা? যারা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী তাদের এরূপ বাসনা হয় না। মসনবী শরীফে তোমরা পড়নি যে, জনৈক ব্যক্তি তার মাশুক আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলছিল যে, আমি তোমাকে পেলে সিঁথি করে দিতাম, নথ পড়াতাম, কানে কর্ণফুল পড়াতাম এবং হাতে চুড়ি পড়াতাম ইত্যাদি। এ সময়ে হযরত মূসা (আঃ) পিছন থেকে এসব কথা শুনছিলেন এবং বললেন যে, আপনি কুফরি কথা বলছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর কথায় তাঁর মধ্যে অত্যধিক বিচ্ছেদ-বেদনা সৃষ্টি হয় এবং তিনি জঙ্গলে চলে যান। পরে মূসা (আঃ) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলতে যান তখন আল্লাহ তাঁকে আশেক বিচ্ছেদে ধমকাতে থাকেন। এ ধমকের কথাটি হযরত মাওলানা রুমী বর্ণনা করেছেন এভাবে–

از براى وصل كردن امدى
نه براى فصل كردن امدى

আজ বরাইয়ে অছল কারদান আমদি।
না বরায়ে ফছল কারদান আমদি।
এসেছ কি তুমি মানস মিলনে,

না, এসেছ তুমি বিচ্ছেদ সাধনে।

অর্থাৎ, আমার আন্তরিক আশিক যেভাবে আমার সাথে কথা বলে, তাই আমার মিলনের পথ; তুমি তাতে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ।

এ প্রসঙ্গ মাওলানা রুমী বলেন–

استلاح هندی را هند هند

استلاح سندیه راسندر هند

ইসতালাহে হিন্দে ইয়ারা হান্দ হিন্দ।

ইসতালাহে ছান্দে ইয়ারা ছান্দে হিন্দ।

হিন্দি সিন্দি কথা বলে তার আপন ঢঙ্গে।

আশেক আপন কথা বলে তার প্রেমের ঢঙ্গে।

অর্থাৎ, আশিক আপন প্রেমের ঢঙে কথা বলেন আর আবেদ কথা বলেন নিজস্ব অবস্থার প্রেক্ষিতে। এখানে লক্ষণীয় যে, বিষয়টি বেশ গুরুতর এবং পয়গাম্বর (আঃ) পর্যন্ত এখানে নীরব রইলেন।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যখন তিনি আল্লাহকে দেখতে চান তখন তিনি প্রেম ইশক সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং তখনও তার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়নি ও উন্মোচিত হয়নি তার নিকট হাকিকতের পূর্ণরূপ। জ্যোতির বিকিরণে পাহাড় জ্বলে পুড়ে চোখের জ্যোতি সুরমায় পরিণত হয়। তাতে কি হযরত মূসা কালিমুল্লাহ এবং সাথীবৃন্দ জ্যোতিপ্রাপ্ত হননি? বস্তুত সেদিন থেকেই হযরত মূসা কালিমুল্লাহর অন্তর্দৃষ্টি লাভের পথ এবং বেলায়েতের শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান হতে শুরু করে। এটা আল্লাহ্ তায়ালাকে পরিপূর্ণরূপে দেখার স্তর। এটা আল্লাহ্কে দেখার বাসনা প্রকাশের অনেক উর্ধ্বের স্তর। ربی ارنی (রাব্বি আরিনি) অর্থাৎ, "আল্লাহ আমাকে দেখা দাও" – এতো হল দুধের শিশুর চাহিদার মতো। আরে মিয়া সত্যের পূজারী, আল্লাহ যদি তোমাকে প্রেম প্রবাহে অনুপ্রাণিত করেন আর তাতে যদি তোমার চর্ম চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হয় তাহলে তুমিও স্পষ্টতই আল্লাহ এবং তাঁর পূর্ণরূপ দেখতে পাবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখবে যে, হাজারও অন্ধের আনুমানিক বক্তব্যের চেয়ে একজন দৃষ্টিমানের দেখা কথাই যথেষ্ট এবং অকাট্য।

প্রশ্ন নং ৩৩

সিজদায় জমিনে মাথা লাগানো হয় এবং কাবার উপর লাগানো হয় না?

উত্তর : জমিন বুজুর্গ তথা সম্মানিত এবং আল্লাহর এক মহান নিদর্শন। এরই রহস্যলোক থেকে কিবলা, কাবা, মসজিদ, দরগাহ এবং খানকাহ্ প্রভৃতি প্রকাশ হয়। এমনকি আদম রহস্যও জমিনেরই অন্যতম প্রকাশ। জমিন থেকেই হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, নবী-অলিগণও জমিনেরই দৃশ্যপট। জমিনের কল্যাণেই জমিনবাসীর জীবন-মরণ, জ্ঞানবুদ্ধি, দান-দয়া ও প্রজ্ঞা,

রহস্যাদি, খেলাফত এবং আধ্যাত্মিক পরম পরিচয় লাভ হচ্ছে। এর বুজুর্গি এজন্য যে, ইবাদতের সময় হাজারও উন্নত শির এতে অবনত হয়। উপরন্তু জমিনবাসীর বুজুর্গি, উন্নতি এবং জীবন-মৃত্যু সবই জমিনের পোশাকে আবৃত। এ জমিন তাঁর বাসিন্দাদেরকে মাতৃচাদরের মতো তাবত সম্ভ্রম দান করছে, সম্পদ ও আহার যোগাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র বস্তুটিও সে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। অনেকেই হয়ত এ সম্পর্কে খবর রাখে না, সিজদায় জমিনে কেন মাথা লাগানো হয়? জন্মে আর জীবনে এমনকি মৃত্যুর পরও এ জমিনে মিশে থাকবে। জমিন আমাদের আরাম ও সুখে রাখবে এবং ঘর ও আলো দান করবে। ফলে জমিনবাসী জমিনের সমস্ত গুণের সাথে একাত্ম হয়ে জমিনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। সে সময়ে কিবলা সামনে থাকবে। এ জন্য কিবলা সদা সামনের দিকে হয়। এ একটি জ্যোতির বিকিরণের স্থান। যেন প্রদীপ্ত প্রদীপ। এ প্রদীপ ঈমানি নূরে নূরময়।

প্রশ্ন নং ৩৪

মেশকাত শরীফে শির্ক অধ্যায়ে কয়েকটি হাদিস রয়েছে, যেগুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কিছু চাইবে না এবং একটি সুই বা সুতাও অন্যের কাছে চাওয়া শির্ক?

উত্তর : এ হাদিসগুলোর মর্মার্থ চূড়ান্ত এবং মৌল অর্থে প্রযোজ্য। সমস্ত বস্তু আল্লাহ্র, আল্লাহ সব বস্তুর স্রষ্টা, দাতা এবং যাকে ইচ্ছা তা দিতে ও নিতে পারেন একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। বর্তমানে এ কথা কারও কাছেই গোপন নেই এবং সকলেই এটা জানে। ধরুন কেউ যদি বলে যে, কোনো বস্তু আল্লাহর নয় এবং তিনি তা দেওয়ারও মালিক নন তাহলে এর প্রতিবাদে জ্ঞানী ও অজ্ঞ নির্বিশেষে হাজারও লোক দাঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সব কিছুরই প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ। তবে রূপক অর্থে যে বস্তু যার মালিকানাধীনে আছে সে বস্তুর দরকার হলে তার কাছে চাওয়া ওয়াজেব। যেমন দোকানদারের কাছে লবণ, তেল, কাপড় আরও যা যা দরকার চাইতে হবে। তা না হলে বাজারে গিয়ে কি আল্লাহর কাছে চাইবে যে, হে আল্লাহ আমাকে দু টাকার লবণ আর পাঁচ টাকার কাপড় দাও? আর চাইলেও কি আল্লাহ দিবেন? কখনই দিবেন না। বরং এটা বোকামি হবে। এ ধরনের কাজের দ্বারা মানুষকে বোকা হতে হয়। এ ধরনের বোকামি শরিয়ত অনুমোদন করে না বরং তা নিষেধ ও হারাম।

এমতাবস্থায় মেশকাত শরীফে উল্লিখিত আলোচ্য হাদিসগুলোর দু রকম ব্যাখ্যা হয়। প্রথমত প্রকৃত অর্থে, দ্বিতীয়ত রূপক অর্থে। প্রকৃত অর্থের ব্যাখ্যাটি ইতিপূর্বে আলোচিত হল। তবে রূপক অর্থে যে যার মালিক তার নিকট চাওয়া ওয়াজেব এবং ক্ষেত্রবিশেষে রূপক মালিককে বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজেব।

অন্যথায় যদি মনে করা হয় যে, সবই আল্লাহর জিনিস আর আমরাও আল্লাহর বান্দা, তাই জিনিস নিয়ে গেলাম মূল্য আল্লাহকে পরিশোধ করব অথবা আল্লাহর নামে খরচ করব। অনুরূপ চিন্তা করে কেউ যদি কারও কোনো জিনিস নিয়ে যেতে চায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সে ধৃত হবে এবং চোর হিসেবে গণ্য হবে। আর চোরের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما *

"ওয়াছছারিকু ওয়াছছারিকাতু ফাক তোয়াউ আইদিয়াহুমা"

অর্থাৎ, "তোমরা চোর ও চোরনি উভয়ের হাত কেটে দাও।" (সূরা মায়েদা-৩৮) এমতাবস্থায় চোর বা চোরনি যদি বিচারককে বলে যে, হাদিসে আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবং অন্যের মনে করা বা অন্যের কাছে কিছু চাওয়া শির্ক। তাহলে বিচারক তাকে আহাম্মক ও বোকা বলবে এবং চুরি ও বোকামির জন্য তাকে শাস্তি দিবে। সুতরাং ঐসব হাদিসের সরল অর্থ গ্রহণ করে তা দ্বারা অন্যের নিকট কিছু চাওয়াকে শির্ক প্রমাণ করতে গেলে তাতে দুটি হারাম একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। যথা হাদিসের প্রকৃত অর্থ নষ্ট করা একটি হারাম আর দ্বিতীয়টি হল চুরির মতো বোকামি করা।

প্রশ্ন নং ৩৫

উসিলা হিসেবে জমিনের মালিক ও নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অন্যকে তা দান করতে পারেন কি না? এবং নেয়ামত প্রাপ্তির আশায় তাঁকে ডাকা বিধেয় কি না?

উত্তর : উসিলা হিসেবে জমিন ও অন্যান্য নেয়ামত যা আল্লাহর তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে তা থেকে জমিন ও অন্যান্য জিনিস আপন বংশধরকে দেওয়া যায়। এটা জমিনের মালিকানা। এ প্রক্রিয়ায় দুনিয়ার সমস্ত বস্তুতে মালিক মহাজনের অধিকার নীতি চালু রয়েছে। এভাবে ইহলৌকিক সমস্ত কিছুরই দ্বিতীয় পর্যায়ের মালিক জমিন অতঃপর জমিন যাকে যা দিয়েছে সে তার তৃতীয় পর্যায়ের মালিক। এভাবে ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। এমনি যে ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক হয়, প্রয়োজনে তার নিকট সে বস্তু চাওয়া ওয়াজেব। এর অন্যথা করা হারাম ও নিষেধ। সুতরাং যাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তাঁর কাছে তা চাওয়া জরুরি। উদাহরণস্বরূপ মানুষকে সংশোধন করার বিদ্যা আল্লাহ মুর্শিদকে দান করেছেন। সুতরাং এর সাথে সম্পৃক্ত সব কিছু মুর্শিদের কাছে চাওয়া ফরজ।

উল্লেখ্য, চাওয়া দু প্রকার। প্রকৃত ও বাহ্যিক। বাহ্যিক চাওয়া যেমন বিপদ মুক্তির জন্য আছহাবে কাহাফের নাম লেখা, জপ করা, ডাকা। বস্তুত শির্ক স্থানীয় হলেও এগুলো শির্ক নয়। বরং তাতে আল্লাহরই কাছে দয়া ও আরাম প্রার্থনা করা হয়। এমনকি আছহাবে কাহাফের নামে সব রকম বিপদ দূর হয়। এ কথা হাদিস

দ্বারা প্রমাণিত। লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নামের বর্তমানেও আছহাবে কাহাফের নামের তাবিজ এবং অজিফাতে পুণ্য ও কল্যাণ এবং সাফল্য লাভ হয়।

অনুরূপ তাদের ডাকলেও পুণ্য ও বিপদ মুক্ত হয়। তাই বুজুর্গ পীর মুর্শিদকে পবিত্র উদ্দেশে ডাকলেও পুণ্য ও কল্যাণ লাভ হয়। কারণ তাঁরা আল্লাহ তায়ালার ফায়েজ, রহমত ও নেয়ামতের অধিকারী। এজন্যই কোরানে বলা হয়েছে–

وابتغوا اليه الوسيلة *

"ওয়াবতাগু ইলাইহীল অসিলাতি।"

অর্থাৎ, "তোমরা উসিলা অন্বেষণ করো।" এ আয়াতের মর্মার্থ মোতাবেক, নবী, অলিগণ জীবিত অথবা পরলোকগত। তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজেব। কারণ প্রকৃত অর্থে তাঁদের জীবন ও মৃত্যু সমার্থবোধক। নিম্নে উল্লিখিত কোরানের আয়াত দ্বারা তাই বোঝা যায়–

لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم يرزقون * فرحين *

"লা তাহসাবান্নাল্লাযিনা কুতিলু ফি সাবি লিল্লাহি আম ওয়াতান বাল আহইয়াউ ইনদা রাব্বি হিম ইউর জাকুন। ফারেহিন।"

অর্থাৎ, "শহীদদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত; এবং খেয়ে দেয়ে আরামে আছেন।" (সূরা আল ইমরান-১৬৯)

প্রশ্ন নং ৩৬

কেউ কেউ বলে যে, সাধারণ লোকদের ভয় দেখানোর জন্য এসব হাদিস বলা হয়েছে। যাতে তারা শির্ক ও বেদাতের দিকে না যায়।

উত্তর : সত্যকে নিখাদ করার জন্য স্বচ্ছ গবেষণা প্রয়োজন। মিথ্যা দিয়ে সত্য প্রমাণ করা যায় না। সোনারূপার কেনাবেচায় সোনারূপাই থাকতে হবে। তাতে বারলি বিক্রি আর গম প্রদর্শনই হারাম। বস্তুত জনসাধারণের নিকট হালালকে হারাম হিসেবে প্রচার করা বড় পাপকর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরা পাপকর্ম। কারণ পক্ষপাতমূলক মাসলার কথাবার্তার কারণে দু পক্ষের মধ্যে পরস্পর দোষারোপ এবং বিরোধ থেকে মারামারি পর্যন্ত হয়। এটা কখনো বৈধ ও অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। এ ধরনের বাজে কাজের কারণে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে মুশরিক ও কাফের বলছে। আর এসব কথার অনুসরণই হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এ ধরনের মাসলা বা কথাবার্তা পরিহার করা ফরজ। আল্লাহ বলেন,

ولاتلبسوا الحق بالباطل *

"ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিলি।"

অর্থাৎ, "সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।" (সূরা বাকারা-৪২)

প্রশ্ন নং ৩৭

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলদের তাবেদারি কাকে বলে? এর মর্মার্থ কী? এবং কোন ব্যক্তি তাবেদার?

উত্তর : তাবেদারি একটি কলবি তথা আন্তরিক ক্রিয়া। যেমন বিশ্বাস বা ঈমান আনা অন্তরের একটি কাজ যা অনেক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং যা থেকে সকল শারীরিক ও মানসিক কার্য সম্পন্ন হয়। বস্তুত কল্‌ব তথা অন্তরই সকল অবস্থা ও কর্মের উৎস। মোট কথা, মনের সংযোগ ছাড়া কোনো কাজ সঠিক হয় না। অর্থাৎ, কোনো কাজের সাথে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ মনের অবস্থা যুক্ত না হলে আল্লাহ ও রাসূলের তাবেদারি নামে যে কাজেই করা হোক তা নিষ্ফল। তাই আল্লাহ বলেন,

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبين *

"লাইছাল বিররা আনতুয়াল্লু উযুহাকুম কিবালাল মাসরিকি ওয়াল মাগরিবি ওয়ালা কিন্নাল বিররাহ মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরে ওয়াল মালায়িকাতি ওয়াল কিতাবি ওয়ান্নাবিয়্যি না।"

(সূরা বাকারা-১৭৭)

অর্থাৎ, "এতে কোনো কল্যাণ নেই যে, পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং কল্যাণের কাজ হল আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কেতাব এবং নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।" অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হওয়াটাই নেক তথা কল্যাণের কাজ নয়। যেমন পশ্চিম প্রান্তের লোকদের কেবলা পূর্বদিক এবং পূর্ব প্রান্তের লোকদের কেবলা পশ্চিম দিক। বরং আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতাগণ, কেতাবসমূহ এবং কেয়ামতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত কল্যাণের কাজ। সুতরাং তাবেদারির জন্য ঈমান শর্ত। আর ঈমানের জন্য শর্ত হল কল্‌ব তথা আন্তরিক কাজ। কারণ অন্তরই ঈমানের স্থান।

তাই আল্লাহ বলেন,

قالت الاعراب امناط قل لم تؤمنوا ولكن قولا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلو بكم ط

"কালাতিল আরাবু আমান্না কুল্‌লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ওয়ালাম্মা ইয়াদ খুলিল ঈমানু ফি কুলু বিকুম।"

অর্থাৎ, "আরবরা বলে আমরা ঈমান এনেছি, তখন আল্লাহ আপন বন্ধুকে বলেন, আপনি তাঁদেরকে বলুন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ, কিন্তু তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।"

অর্থাৎ, তোমরা শুষ্ক শীর্ণ মুসলিম এবং আল্লাহর তাবেদার বা অনুগত হতে পারনি কারণ এখনও তোমরা জানতেই পার নি ঈমান কী? যারা ঈমান কী জিনিস তাই জানে না তারা আল্লাহ এবং রাসূলের তাবেদার হতেই পারে না। আল্লাহ বলেন,

ومن يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصلحين وحسن اولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما *

"ওয়ামাইউতি ইল্লাহু ওয়ার রাসূলাহ্ ফা উলায়্যিকা মায়াল্লাজিনা আনা মাল্লাহু আলাইহিম মিনান্ নাবিয়্যিনা ওয়া সিদ্দিকীনা ওয়া শুহাদায়্যি ওয়া সালিহিনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা, জালিকাল ফাদলু মিনাল্‌লাহি অকাফা বিল্লাহি আলিমা।"

অর্থাৎ, "যারা আল্লাহ ও রাসূলের তাবেদারি করে তারা আল্লাহর অনুকম্পাপ্রাপ্ত নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলদের সঙ্গীও বটে। তাঁরা উত্তম সাথী। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।

মোট কথা, নবী, সত্যবাদী, শহীদ এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর আল্লাহর অনুগ্রহের দানে পরিপূর্ণ এবং সুশোভিত হেদায়েত লাভ বা সঠিক ধর্মচর্চার পথে তাঁরা সর্বাধিক সহায়ক। তাদের দ্বারা যাদের বক্ষ আলোচিত হয়েছে এবং যারা ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শনের শিক্ষার 'ইলমে লাদুন' বা আল্লাহর তরফের বিদ্যার শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের অনুগত বা তাবেদার ব্যক্তিগণ আল্লাহ এবং রাসূলেরও তাবেদার বটে। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের তাবেদার হওয়ার জন্য বর্ণিত মহান ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে হেদায়েতের শিক্ষা গ্রহণ করা ফরজ।

তাই তো আল্লাহ বলেন,

وابتغوا اليه الوسيلة

"ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসিলাতা"

"আল্লাহর পথে উসিলা অন্বেষণ করো।"

অর্থাৎ, আল্লাহর পথে চলতে চাইলে মাধ্যম অন্বেষণ করো আর খোঁজ করো বন্ধু।

তাঁদের ডাকো দূর থেকে এবং অগোচরে যতক্ষণ তারা হাজির না হন। ডাকো তাদের উচ্চস্বরে যতক্ষণ তোমার ডাকে তাঁরা সাড়া না দেন। ডাকো তাঁদের বিনীত ও নম্রভাবে যতক্ষণ তাঁরা তুষ্ট না হন। ডাকো তাঁদের সামনে এবং অগোচরে যতক্ষণ তারা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং আপন না হন। ডাকো তাঁদের দমে দমে সর্বাবস্থায় যতক্ষণ না তারা তোমাদের অজিফায় পরিণত হন। তাঁদের নাম আল্লাহর নামের জ্যোতি এবং আল্লাহর সত্তারই দ্বিতীয় পর্যায় এবং সারাংশ।

সন্তান যখন আন্তরিকতার সাথে নিজের মাকে মা, মা বলে ডাকে তখন মা-বাপ- ভাই সবাই সন্তুষ্ট হয়। তাতে আল্লাহও খুশি হন। ফলে আল্লাহর রহমতের

সাগরে ঢেউ সৃষ্টি হয় এবং তা মা ও অন্যান্যদের অন্তরে মহব্বতরূপ মিষ্টি জলের চিরন্তন স্রোতধারার সৃষ্টি করে। তা না হলে সন্তানের জন্য মাতা-পিতার অন্তরে এত স্নেহ কোথা থেকে আসে। সন্তান তাদের মা-বাবাকে সামনে পিছনে এতবেশি ডাকে যেন অজিফা জপে। এটা সন্তানের জন্য ইবাদতই বটে। আল্লাহ বলেন,

وبالوالدين احسانا

"ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি এহ্সানা।"

পিতা-মাতার প্রতি বিনীত হও। এহ্সান বা বিনীতভাব একপ্রকার নমনীয়তা যাতে দেহমন এক হয়ে যায়। এজন্যই শিশুদের কথা এত মধুর লাগে। বস্তুত এমন কোনো যুবক এবং বৃদ্ধও নেই, যে বিপদ আপদে মনের গভীর থেকে নিজের মা-বাবাকে স্মরণ না করে। এটা আল্লাহর রহমত যে, মা-বাবার মাধ্যমে সন্তানরা আল্লাহর দয়া লাভ করে।

এজন্য আল্লাহর পথের সাধকবৃন্দও আল্লাহর দয়া লাভের মাধ্যম তথা উসিলা হিসেবে আপন আপন যোগসূত্র মোতাবেক– হে আমার শাইখ, হে আমার মুর্শিদ, হে বাবাজান, হে গাউসুল আজম, হে শেখ ফরীদ, হে মাদারপীর, হে আল্লাহর নবী; হে আল্লাহর রসূল, এমনকি ইয়া আলী, ইয়া আলী বলেও তাঁদের সামনে অথবা দূরেও ডেকে থাকে। এর বরকতে আল্লাহই এরূপ সাধককে একজন কামেল মুর্শিদের ফায়েজ দান করেন। এটা পরশ পাথর এবং সর্বরোগ নিরোধক ওষুধের মতো, যার আকর্ষণে লোহাও সোনা হয়ে যায়। সুতরাং অনুরূপ কামেল এবং মোকাম্মেল মুর্শিদের সত্তা ও গুণাবলিতে বিদ্যমান প্রদীপ্ত জ্যোতির ক্ষমতার প্রতি আল্লাহ তায়ালা মনোযোগ আকর্ষণ করে হুকুম করছেন,

كونوا مع الصدقين

"কুনু মায়াছ ছাদেক্বীন"

অর্থাৎ, "সৎদের সঙ্গী হয়ে যাও।" অর্থাৎ, মুর্শিদগণই সৎ এবং তাঁদের সাথী হয়ে যাও। আল্লাহর এ হুকুম পালন করা বড় ধরনের ফরজ কাজ।

উল্লেখ্য, মুর্শিদের সত্তা ও গুণাবলিতে হেদায়েতের নূর তথা আলোকবর্তিকা রয়েছে। তা তোমাদের সত্তা ও গুণাবলিকে দিবালোকের মতো উজ্জ্বল করে দিবে। তখন তোমাদের অবস্থা হবে অন্ধের দৃষ্টি লাভ করার মতো। যার কাছে সারা বিশ্ব অদৃশ্য ছিল সে তখন সবকিছু সুস্পষ্ট দেখতে পাবে। এটাকে বলা হয় আল্লাহর নেয়ামত বা অনুকম্পার দান। নবী-অলি সৎকর্মশীল এবং শহীদগণ আল্লাহর তরফ থেকে এ সম্পদের অধিকারী। এর মাধ্যমেই আল্লাহ ও বান্দার যোগসূত্র রক্ষিত হচ্ছে এবং মুর্শিদের সত্তা এ সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সমুজ্জ্বল। সুতরাং এ মুর্শিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তাঁরা ভাল মানুষ, আল্লাহর তরফের উত্তম বন্ধু এবং আল্লাহর সাথী হওয়ার জন্য এরাই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং তাঁর কথাই চূড়ান্ত। অতএব মাহবুবে সোবহানি এবং আলমে রাব্বানী যার বক্ষ আল্লাহর

নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ তিনিই তো হেদায়েতের মূলধন। সুতরাং যারা হেদায়েত পেতে চায়, তাকে ছাড়া হেদায়েত পাওয়া এবং তাঁর তাবেদারি ছাড়া আল্লাহর তাবেদার হওয়া অসম্ভব। অতএব যে মুর্শিদের তাবেদারি করেনি সে তো হেদায়েতই পায়নি। সুতরাং তার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন নং ৩৮

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

"হাল জাজাউল এহ্সানে ইল্লাল এহ্সান" এর অর্থ কী?

উত্তর : প্রশ্নে উদ্ধৃত আয়াতাংশের অর্থ এহ্সানের প্রতিফল এহ্সানই বটে। কারণ এহ্সান শব্দের মূল হল 'হাসান' যার সাধারণ অর্থ উত্তম তথা ভালো। এ দ্বারা এখানে সাধারণভাবে ভালো কাজ বোঝানো হয়েছে এবং ব্যাপক কাজের দিকে আহবান করার উদ্দেশেই এখানে এহ্সান শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন রোজা, নামাজ তো নিজের জন্য এহ্সান বা ভালো কাজ। এছাড়াও ঐচ্ছিকভাবেও বান্দা যেসব ভালো কাজ করে সেসব কাজকে নীতিশাস্ত্রে সর্বদাই 'হুসনুল আমাল' তথা ভালো কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে সমস্ত ভালো কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কেয়ামত পর্যন্ত বান্দা যেসব ভাল কাজ করবে তা তার প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে কাজের কোনোরূপ বর্ণনা করা হয় নি। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

قل كل يعمل على شاكلته

"কুল কুল্লাইয়ামালু আলা শাকিলাতি।"

"বলে দিন, প্রত্যেকেই নিজের রুচিমতো কাজ করে।"

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেন, হে দোস্ত আপনি বলে দিন যে, প্রত্যেকেই আপন আপন রুচিমতো কাজ করে থাকে। এখানে কাজের কোনো ধরন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। বরং এতে যে কেউ নিজের তরফ থেকে যে কোনো ভালো কাজ উদ্ভাবন করবে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। আর যে সব সুস্পষ্টভাবে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে এবং কোরান ও হাদিসের আওতায় এসেছে সেগুলো আদিষ্টকর্ম যা ফরয ও ওয়াজেব,

অপরদিকে এহ্সান হল সীমাহীন যে কোনো ভালো কাজ সম্পাদন করা তা কখনো খারাপ বা মন্দ হয় না, কারণ

الاصل فى الاشياء اباحة

"আল আসলু ফিল আসইয়ায়্যি আবাহাতি।"

সকল বস্তুই মূলত হালাল এবং মোবাহ্– এ নীতির ভিত্তিতে এখানে মোবাহ শব্দ দ্বারা ভালো কর্মের সীমাকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ সাধারণভাবে ভালোর বদলে ভালো বলার মাধ্যমে পরম ভাণ্ডারের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তা হল এই যে, বিনিময়ের কোনো সর্বোচ্চ সীমা নেই তবে এহ্সানের বিনিময়ে যা পাওয়া যাবে তার সর্বনিম্ন হার হল একের বিনিময়ে দশ। উভয় দিকের ভালো বা এহ্সানের সর্বোচ্চ সীমা অনির্দিষ্ট। লক্ষ লক্ষ বার পুনরাবৃত্তি করলেও ভালোই থাকবে। নীতিগত মৌলিকভাবে যে কাজ ভালো বা যে কাজে লক্ষ লক্ষ কল্যাণ নিহীত, কোনো আনুষঙ্গিক দোষত্রুটির জন্য তা কখনো মৌলিকভাবে খারাপ বা মন্দ হতে পারে না। কারণ মন্দ কাজের প্রতিফল একের অধিক হয় না। সুতরাং কোনো মন্দ কাজ বহুগুণ বিনিময় কোনো কাজকে পরাভূত বা নষ্ট করতে পারে না। বরং অল্পই বেশির কাছে পরাভূত এবং মূল্যহীন। সুতরাং যেসব বস্তু মূলত কল্যাণকর তথা সুন্নত, হালাল ও নেক তথা ভালো তা আপন অস্তিত্বেই হালাল। তা কখনো হারাম হতে পারে না। তা সব সময়ই সুন্নত এবং ভালো। এ ভালো কর্মের বদৌলতেই কোরানের মর্মার্থ অনন্তকাল সারাবিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ গণ্য। এহ্সান কোনো কারণে হারাম হতে পারে বলে মেনে নিলে কোরানের মর্মার্থ যে কল্যাণকর গুণাবলি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত ভালো ও পুণ্য কর্মের পথই একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি হাদিসে আনুষঙ্গিক মন্দের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসটি এই–

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار

"কুল্লু বেদাতুন দালালাতুন ওয়া কুল্লু দালালাতুন সাবিলুহা ইলান্নার।"

"সমস্ত বেদাত গোমরাহী আর সব গোমরাহীর গন্তব্য হল নরক।" এর অর্থ হল, যে কোনো নতুন কাজ গোমরাহীর হলেই তা গোমরাহী বলে গণ্য হবে। অন্যথায় যে কোনো নতুন কাজকে গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হলে, যেসব হাদিসে নতুন কাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে সে হাদিসের কী জবাব দিবে? যথা হাদিস–

من سن فى الاسلام سنة بها فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولاينقص من اجرهم بشئ -

"মান সুন্নাহ ফিল ইসলামী সুন্নাতু বিহা ফায়ামালা বিহা বায়াদাহু কিতাবুলাহু মিসলু আজ্‌রি মিন আমালা বিহা ওয়ালা ইয়ানকুদু মিন উজরাহুম বি শাইয়্যিন।"

অর্থাৎ "কেউ যদি ইসলামে কোনো ভালো নিয়মনীতি চালু করে, অতঃপর তা অনুসরণ করা হয়, তাহলে সে উক্ত নিয়মনীতির অনুসারীদের সমপরিমাণ পুণ্য পাবে কিয়ামত পর্যন্ত। তবে তা অনুসারীদের পাওয়া থেকে কাটা হবে না।" (মুসলিম শরীফ)। আল্লাহর আপন ভাণ্ডার থেকে উক্ত নিয়মনীতি চালু কর্তাকে এটা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, উক্ত হাদিসটি বদান্যতা এবং এহসানের মৌলিকত্ব এবং মর্যাদার দলিল। অতএব এহসান সূত্রে উদ্ভাবিত বদান্যতা এবং ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও মোস্তাহাবের মতো বিশেষ ধরনের কার্যাদি সবই বদান্যতা এবং এহসান। বরং এহসান ও কল্যাণ তাতে মৌলিকভাবে যুক্ত। অতএব এহসান থেকে এহসান তথা কল্যাণ থেকে কল্যাণ কিয়ামত পর্যন্ত বহাল ও চালু থাকবে। অপরদিকে খারাপ ও মন্দ কাজ এর প্রতিদ্বন্দ্বী যা তেলাপোকার মতো আচড়ায়, এগুলো মূল বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্ধকার। এজন্য এহসানকে বাতুল প্রমাণ করতে হলে এর গ্রহণযোগ্যতার অকাট্য দলিল প্রয়োজন। আর এহসান তথা বদান্যতামূলক কাজের জন্য কোনো দলিল প্রয়োজন নেই। কারণ তা নিজে ভালো এবং উত্তম। এর বাস্তবায়ন সর্বদা উত্তম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে হারাম বলে ফেকাহবিদদের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ক্ষতি এড়ানো। উদাহরণস্বরূপ সমকামিতা। এতে বড় রকমের দুর্ঘটনার আশঙ্কা বিদ্যমান। এখানে অপরিষ্কার ও অপবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

তবে সুদের ব্যাপারে কোনো কোনো ফেকাহবিদ যে চানা, মটর ইত্যাদিকে সোনা, রূপা, আটা, গম, খুরমা ও লবণ ইত্যাদির সাথে তুলনা করেছেন, তা অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এতে বড় রকমের ক্ষতি রয়েছে। এজন্য 'দূররে মোক্তার' গ্রন্থে ফেকাহবিদদের সে মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কারণ এক জাতের বস্তু দ্বারা অন্য জাতের বস্তু কি বদল হতে পারে? উদাহরণস্বরূপ দু টাকা দামের এক থান কাপড়ের বদলে কেউ কি দশ টাকা দামের একথান কাপড় দেবে? দেবে না। বরং হাদিসে যে ছয়টি অসম বিনিময়কে হারাম করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেও নীতিগত ব্যাখ্যায় সাধারণভাবে এহসান বা পারস্পরিক কল্যাণ বিবেচিত হয়। এতে সাধারণভাবে বস্তুর লেনদেনের হারাম প্রমাণ হয় না। যেমন বিশটাকার এক ভরি সোনার বদলে কেউ আশি টাকা দামের এক ভরি সোনা দিতে রাজি হবে? অবশ্যই হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে কেবল ওজনে সমান হলে হবে না মূল্য সমান হতে হবে। এবার প্রকৃত কল্যাণের প্রতি লক্ষ করো– কোনো বস্তুর মূল্য নির্ধারণ ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে তার গুণাগুণ, মর্যাদা ও উপকারিতাই বিচার্য বিষয়। এ জাতীয় সমমানের বস্তুগুলোই কেবল সমজাতীয় বলে গণ্য হবে অন্যথায় গুণে মানে সমান না হলে, একই জাতের হলেও তাদেরকে সমজাতীয় ধরা হবে না। তাকে অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করতে হবে। তা না হলে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় যেসব অঞ্চলে সোনা দিয়ে সোনা এবং রূপা দিয়ে রূপা বিনিময় হয়, সেসব অঞ্চলে বিনিময় বা বেচাকেনায় তার মূল্য-মানের প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ওজনের প্রতি নয়। পণ্যের মূল্য ও মান তত্ত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের দিকেই ইশারা করে হাদিসটিতে বলা হয়েছে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ। এজন্য অবৈধ লেনদেন থেকে বাঁচতে হলে সোনা রূপা বা যে কোনো বস্তু বা পণ্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাদের উপযোগ এবং মূল্যমান বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথায় ভালো বা উত্তম স্বর্ণের বদলে নিম্নমানের স্বর্ণের বিনিময় বা আশঙ্কা রয়েছে যা বৈধ নয়।

সুতরাং কেউ কেউ উক্ত হাদিসের উদাহরণ দিয়ে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে কেবল ওজনে যা পরিমাণে কম বেশির বিনিময়কে সুদের অন্তর্ভুক্ত করছে তা বড়ই ক্ষতিকর। এক শ্রেণীর বাহ্যদর্শী ফেকাহবিদ এভাবে সুদের ভয় দেখিয়ে মুসলিম সমাজকে একেবারেই গরিব করে ফেলেছে। ব্যাপক জনগণ তাদের দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তারা হালালকে হারাম মনে করছে। সুদ দেওয়া এবং নেওয়া উভয়ই নিষিদ্ধ। তা সত্যেও যা নিশ্চিত সুদ তারা তা দিচ্ছে, আর যা সুদ হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই তাকে সুদ আখ্যা দিয়ে হারাম করে রেখেছে।

উল্লেখ্য, কোরানের অনুসরণ করতে হলে এর গূঢ় এবং ভাবার্থ জানতে হবে। এরা তা উপেক্ষা করে কেবল শব্দার্থের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। এরা জানে না যে, সোনা কেবল একটি শব্দ নয়, রঙ ও রূপ বা গুণাগুণও এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো কিছুর নামতো মুখের ধ্বনি বা আওয়াজ। কিন্তু তাকে কলমবন্ধ করতে হলে কলম কালি প্রয়োজন হয়। অপর দিকে রঙ হল এক প্রকার নমুনা।

স্বর্ণের মতো পিতলের রঙও হলুদ। সুতরাং বুঝতে হবে আসলে কিসের নাম স্বর্ণ বাইরের রঙটার নাম স্বর্ণ, না এর প্রকৃত উপযোগ ও মূল্যমানের নাম স্বর্ণ। আসলে পণ্যের মান ও উপযোগটাই বিনিময়ের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। স্বর্ণ বা যে কোনো পণ্য সমমান এবং সম উপযোগিতা বিশিষ্ট হলেই কেবল তাদের বিনিময় কমবেশি করা উক্ত হাদিসের মর্মমতে হারাম হবে। অপরদিকে যেসব পণ্য মানে ও উপযোগিতায় সমান নয়, সেসব পণ্যের সম পরিমাণ বিনিময় ও বৈধ নয় এছাড়া এ ধরনের বিনিময়ে কেউ রাজি হবে না। সুতরাং সুদের প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে? মোট কথা সমমান ও সম উপযোগ বিশিষ্ট সোনা-রূপা, আটা-ময়দা ইত্যাদির কম বেশি বিনিময়ই কেবল সুদ হবে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। এ সিদ্ধান্তই সর্ব চূড়ান্ত।

প্রশ্ন নং ৩৯

কোনো বিষয়ে হারাম প্রমাণের জন্য কোরানিক তথা সুস্পষ্ট দলিল প্রয়োজন কি?

উত্তর : হ্যাঁ, কোনো বিষয়ের হারাম প্রমাণের জন্য সুস্পষ্ট কোরানিক দলিল অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কেউ যদি নিজের তরফ থেকে হারামের কারণ আবিষ্কার করে, কোনো কিছুকে হারাম বলে তাহলে সে নিজেই হারামের শিকার হবে। অর্থাৎ তাঁর কাজটি হারাম কাজ বলে গণ্য হবে। শুধু তাই নয় তাতে তাঁর কুফর, আল্লাহদ্রোহিতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, কোরানে হস্তক্ষেপ, ভ্রষ্টতা এবং সত্য প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি প্রমাণিত হবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি বলে যে, অলি-আল্লাহগণের নিকট প্রার্থনা করা এবং প্রচলিত ফাতেহা অনুষ্ঠান বেদাত ও হারাম। এর কারণ সে নিজে থেকে আবিষ্কার করল যে, উক্ত কাজের সাথে হিন্দুদের অমুক কাজের সাথে মিল রয়েছে এবং কোনো কাজের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হলে তা ফরজ-ওয়াজেবের মতো হয়ে যায়, এজন্য তা নিষেধ। তাছাড়া শিন্নির খানা সামনে রেখে দোয়া পাঠ

করা এবং ফাতেহা অনুষ্ঠানের জন্য কোনো জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা ইত্যাদি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তা সবই হারাম, শিরক ও কুফর। এসব অন্যায় ধারণার পাপ থেকে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আরে মিয়া সোনার চাঁদ হঠধর্মী, বলতে পার হাদিসটিসহ কোরানের কোথায় উক্ত কার্যাদির নিষেধাজ্ঞা আছে।

এ প্রসঙ্গে তোমাদের কিয়াস বা অনুধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা অনুমান ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। বস্তুত উক্ত পদ্ধতিতে যারা কোনো কিছুকে হারাম করে তারা নিজেরাই কোরান হাদিসের বিরোধিতা করছে। ফলে তাঁরাইতো কোরান হাদিসের আওতার বাইরে চলে গেছে। তাঁদের কথা গ্রহণীয় নয়। এ ধরনের মনগড়া কারণে কী করে হারাম প্রমাণিত হতে পারে?

প্রশ্ন নং ৪০

আম্বিয়া আউলিয়াগণের জন্য নজর-নেয়াজ, খানাপিনা, আসবাবপত্র ও রসদ ইত্যাদি উৎসর্গরূপে বিতরণ করে তাঁদের রূহ মোবারকের ওপর যে সওয়াব রেসানি হয় এবং খানাপিনা, রুটি ইত্যাদি সামনে রেখে সূরা ফাতেহা এবং দোয়াদরুদ পাঠ করা হয় ও তাঁর ওপর ফুঁক দেওয়া হয়, উহা কী? এবং লোকদের দাওয়াত করে তা খাওয়ানোর তাৎপর্যই বা কী?

উত্তর : ফাতেহা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে খানা ও সিন্নি সামনে রেখে দোয়া দরুদ পাঠ করলে বরকত হয়। এজন্য খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করতে হয় এবং এটা কোরান এবং ফাতেহা ও নেয়াজের অনুষ্ঠানে যাদেরকে মিলনের আহ্বান জানানো হয় তাঁরা গুপ্ত রহস্যের পথে টেলিফোনের মতো সমগ্র পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের রূহসমূহ দাওয়াত ও উৎসর্গ গ্রহণ করেন। আর খাদ্যে ফুঁক দিলে তাতে বিষ বা ক্ষতিকর কিছু থাকলে নষ্ট হয়ে যায় এজন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগীদের পানি ইত্যাদি ফুঁক দিয়ে পান করাতেন। এতে তাঁরা খুশি হন, কারণ তাঁরাও তা খান এবং আরাম অনুভব করেন। আল্লাহ বলেন,

لاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم يرزقون * فرحين *

"লা তাহসাবান্নাললাজিনা কুতিল ফিসাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল আহ্ ইয়ায়ু ইনদা রাব্বিহিম ইয়ারজুকুনা। ফারীহিন।"

"আল্লাহর পথে শহীদদের তোমরা মৃত মনে করো না, তাঁরা জীবিত তাঁদের প্রভুর নিকটে তাঁরা আহার করেন এবং আরামে আছেন।"

মোট কথা, শহীদগণ মৃত নন। অর্থাৎ আম্বিয়া আউলিয়াগণ জীবিত। তাঁরা আহার করেন এবং আরাম করেন। এখানে আরাম কথাটি ব্যাপক। প্রথমত এর অর্থ হতে পারে তাঁদের সত্তার মধ্যেই সান্ত্বনা রয়েছে, তা থেকে খুশি প্রকাশিত হয় এবং তদ্বারাই তাদের রূহ আরাম উপভোগ করে। দ্বিতীয়ত এর অর্থ এও হতে পারে

যে, অন্য বস্তু যথা পানাহার বা উপঢৌকন ইত্যাদির কারণে তাঁরা আরাম বোধ করেন। যিনি আরামে আছেন পানাহার ও উপহার উপঢৌকনে তাঁর আরও আরাম হয়। আর যিনি কষ্টে আছেন তাতে তাঁর কষ্ট দূর হয়। কারও যদি খাদ্যের অভাব থাকে আর কেউ যদি তাকে খাদ্য দান করে সে খুশি হয়। শুধু তাই নয়, খাদ্যের অভাবে যে মরার পথে খাদ্য পেলে সে বেঁচে যায়। এটা চাট্টিখানি কথা নয়।

উল্লেখ্য, দান করা সব সময় সুন্নত অর্থাৎ উত্তম ধর্মীয় নীতি। কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তিকে আহার করানো ফরজ অর্থাৎ বাধ্যতামলূক। এভাবে এহ্সান অর্থাৎ যে কোনো শুভ কাজ যা ঐচ্ছিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা ফরজ ও ওয়াজেবরূপেও গুরুত্ব লাভ করে, এর কারণও মূলেই নিহিত।

আল্লাহ্ বলেন,

قل ما انفقتم من خير فللو الددين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل *

"কূল মা আনফাকতুম মিন খাইরিন ফালিল অলিদাইনে ওয়াল আকরাবিনা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিনি ওয়াব নিস সাবিল।"

"বলুন তোমরা যে উত্তম বস্তু দান করো তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়, অনাথ, নিঃস্ব ও মুসাফিরদের জন্যই বটে।" (সূরা বাকারা) অর্থাৎ, হে রসূল (সাঃ) বলে দিন যে, তোমরা দান খয়রাতের দ্বারা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়, অনাথ, নিঃস্ব ও মুসাফিরদের প্রতি এহসান কর। এ একটি সাধারণ হুকুম। যা সব সময়ই দুটি অবস্থা হতে পারে। একটি ফরজ তথা বাধ্যতামূলক অপরটি ঐচ্ছিক উপকার বা দয়া প্রদর্শন। অসহায় ব্যক্তিকে এহসান বা দান করা ফরজ আর স্বাভাবিক অবস্থায় এহসান করা ঐচ্ছিক দান বা দয়া। যেসব ক্ষেত্রে এহসান দয়া এবং ফরজও বটে সেসব ক্ষেত্রে ফরজ সম্পাদনের সাথে সাথে দয়াও সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, এহসানকারী এবং এহসানপ্রাপ্ত এ দুইয়ের মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকার শর্ত নেই। মাতা-পিতা যদি মুসাফির গরিব, অনাথ ও নিঃস্ব হয় তাহলে তাদের প্রতি এহসান করা বড় ফরজ। এ এহসানে দয়া ও ফরজ দু-ই সামিল। সাধারণত মৃত ব্যক্তিগণ এ শ্রেণীভুক্ত। এরা প্রকৃতই শত শত বছরের মুসাফির মাতা-পিতাহীন, অনাথ এবং সহায় সম্বলহীন। আল্লাহ বলেন–

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا *

"ওয়া ইউতয়িমুনা তোয়ামা আলা হুববিহি মিসিকিনাও ওয়া ইয়াতিমাও ওয়া আসিরা।"

"তোমরা নিঃস্ব অনাথ এবং বন্দিদের মহব্বতের সাথে আহার দান কর।" (সূরা দাহর)। অতএব মৃতদের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের মুসাফির কঠোরভাবে বন্দী এবং অনাথ ও নিঃস্ব আর কে আছে। সুতরাং তাদের কল্যাণে দান সদকা প্রার্থনা ও শুভ কামনা করা

দরকার। আল্লাহ বলেন, وقولو للناس حسن "ওয়া কুলু লিন্নাসি হুসনা" "মানুষের জন্য কল্যাণের কথা বল।" অর্থাৎ, মানুষের জন্য কল্যাণের কথা বলো যাতে তাদের মঙ্গল হয়। অর্থাৎ তাঁদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করো যার বরকতে তাঁদের কষ্ট লাঘব হয় এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। ঐরূপ মৃত ব্যক্তিগণ জীবিতদের প্রেরিত ও শুভকর্মের বরকতের উসিলায় আরাম পেয়ে থাকে। এছাড়া মৃতদের আরতো কোনো সহায়ক নেই। অপর দিকে যারা কবরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত তাদের উদ্দেশে এহসান বা শুভ কার্যাদি সম্পাদন করা হলে, যারা তা করেন তাঁরা আল্লাহর রহমতরূপ অমূল্য নেয়ামতপ্রাপ্ত হন। এজন্য উক্ত মুক্ত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের এহসান রীতি চালু রাখা কেবল ফরজ নয় বড় ধরনের ফরজ।

এটি একটি বড় ধরনের নেয়ামত। কারণ কবরের বন্দিদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণ হলেন আম্বিয়া, আউলিয়া, শহীদ এবং পুণ্যাত্মা ও পুণ্যবান মহামানবগণ। তাঁরা আল্লাহ্র প্রতিচ্ছবি এবং তারই নূরে নূরময়। এজন্য আল্লাহ্ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দার, শৃঙ্খলা বিধায়ক এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁদের খুশিতে আল্লাহ্ খুশি তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও গজবের কারণ। তাঁদের খুশি করলে আল্লাহ্ খুশি হন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

ان الله وملئكته يصلون على النبيى يايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما *

"ইন্নাল্লাহা ওমালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলাননাবিয়্যে ইয়া আয়্যিউ হাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলাহি ওয়াসাল্লিমু তাসলিমা।"

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরুদ করেন, হে বিশ্বাসীগণ তোমরাও তাঁর ওপর দরুদ কর।" এর মর্মার্থ হল, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর এহসানের জ্যোতিতে নেয়ামতযুক্ত কালাম প্রকাশ করেন। হে মুমিনগণ তোমরাও তা কর। তাঁতে আমার গর্ববোধ হয়। এটা তোমাদেরও আনন্দ ও গর্বের বিষয় বটে। কারণ এর মধ্যে আমার হাকিকতের প্রকাশ এবং রহস্য সমগ্রের নির্দেশনা রয়েছে। যারা তাদের প্রতি মনোসংযোগ সহকারে তাদের কল্যাণ কামনায় এহসান তথা শুভ কার্যাদি করা পছন্দ করে তাঁরা আমার (আল্লাহ্র) মনোপুত বন্ধু।

অতএব এহেন ঔজ্জ্বল্যময় কাজের রশ্মি হতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। এরই বদৌলতে পয়গম্বরিসূত্রে বেলায়েতি ধারার কল্যাণে সারাবিশ্ব আজ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছে।

তোমরা আল্লাহর রহমত ও নেয়াতের দানের ব্যাপারে উদাসীন বা গাফেল থেকো না। তোমরাও সে দানের আকাঙ্ক্ষী ও আশিক হও। কারণ নবুয়তের আধার এবং প্রকাশের মাধ্যম, যে অলি এবং সদাত্মা ও সৎজন তারা আল্লাহর নেয়ামত এবং রহমতস্বরূপ কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বে বিরাজমান থাকবেন। তারা যেখানে শুভ

পদার্পণ করেন সেখানে তাদের পুণ্য ও পূর্ণ সত্তা থেকে দয়া ও রহমত বৃষ্টির মতো বর্ষিত হয়। যেখানে তাদের দয়া ও রহমতের বৃষ্টিপাত হয় সে স্থান পরম সত্তার আলোকরশ্মি এবং অদৃশ্য বরকতে ফুলের বাগানে পরিণত হয়। এটা কোনো বস্তুতে স্বচ্ছ কাচের ছায়া পড়লে ঝলমলিয়ে উঠার মতো। বস্তুতপক্ষে এটা ছায়ার ছায়া। স্বচ্ছ কাচে সূর্যের ছায়া পতিত হওয়ার ফলে তা আলোকোজ্জ্বল হওয়ার পর উক্ত কাচের সে আলো যখন অন্য বস্তুর উপর পড়ে তখন তা ঝলমলিয়ে উঠার মতো। অনুরূপভাবে নবী, অলি, সদাত্মা ও সৎজনদের ছায়া সমস্ত জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। তারা ইহলোকে থাকেন আর পরলোকে থাকেন সর্বাবস্থাতেই তারা সারা বিশ্বের জন্য রহমত। তবে রহমতের বিচারে বিশ্ববাসীর জন্য ইহলোকের তুলনায় তাদের অপরলোকের জীবন অধিক উপকারী।

উল্লেখ্য, যারা তাদের বিরোধী এ রহমত তাদের জন্য নয় বরং তাদের জন্য রয়েছে দুঃখ। আল্লাহ বলেন,

وللاخرة خير لك من الاولى *

"ওয়াল আখিরাতু খাইরুল্লাকা মিনাল উলা।" (সূরা আদ্‌দোহা)

"আপনার প্রথম থেকে পরের অবস্থা উত্তম।" এজন্য এ শ্রেণীর পরলোকবাসীদের কাছে দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ঐশী দয়ার আশায় প্রতীক্ষায় থাকা উত্তম কাজ।

তাদের বিশ্রামাগার ও বৈঠকখানাও রহমতের স্থান। কারণ এসব স্থানও বরকতের ও রহমতের উৎস পরম সত্তা– সূর্যরশ্মি যেমন কাচকে আলোকোজ্জ্বল করে তেমনি জ্যোতির্ময় করে রাখেন। এজন্য পৃথিবীতে বর্তমান তাদের মাজার, দরগাহ ও আস্তানাসমূহকে আল্লাহ তায়ালার রহমতের স্থান বলা হয়। ফেরেশতাগণ সর্বদা এগুলোর তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। এসব স্থান আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ বলেন,

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

"ওয়ামাই উই আজীম শায়াইরাল্লাহি ফা ইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব।"

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিদর্শনাদির যারা সম্মান করে এটা তাদের আন্তরিক আল্লাহ প্রীতি ও মনের ধার্মিকতার পরিচায়ক।"

প্রশ্ন নং ৪১

আম্বিয়া আউলিয়াগণের রূহ মোবারক যে পানাহার করেন তা কিভাবে?

উত্তর : আউলিয়া আম্বিয়াগণের রূহ মোবারক রূহদের পানাহারের নিয়ম এবং অবস্থা অনুযায়ী পানাহার করেন। রূহ অতি সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম নিয়মেই তাদের

পানাহার সম্পন্ন হয়। আহার্যের প্রতি সাগ্রহে তাকালেই তাদের পানাহার সম্পন্ন হয়। যেমন কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলেই তাঁদের চোখ তৃপ্ত হয় এবং সে সাথে তাদের জিহ্বাও স্বাদ গ্রহণ করে। এভাবে চোখের দ্বারা জিহ্বার মাধ্যমে তাঁদের পেট ভরে যায়। এতে করে অদৃশ্য সান্নিধ্যের অনুভূত তৃপ্তিতে রূপক ধরনের এক প্রকার পানাহার সম্পন্ন হয়। অন্যভাবেও রূপক পানাহার হতে পারে। যেমন কোনো এক ব্যক্তি যার নিজের আহার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তার সন্তানদের আহার প্রয়োজন আছে, এমতাবস্থায় আপনি যদি তাঁর সন্তানদের আহার করান তাহলে সে খুশি হবে। এটাও প্রকারান্তরে বা রূপক অর্থে তারই পানাহার। আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক মূলগত এবং মূল থেকে উৎপন্ন। এ কারণে অনাথ, নিঃস্ব এবং অসহায়দের কেউ খাওয়ালে তাঁর অভিভাবকগণ খুশি হয়। সুতরাং শাখা যখন মূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রকারান্তরে তাঁরা একীভূত। ফলে শাখা খেলে মূলের খাওয়া হয়। এমতাবস্থায় পানাহার পোশাক এবং টাকা-পয়সা দান অথবা সওয়াব পৌঁছানো শাখা বা মূল যার উদ্দেশেই করা হোক ফায়দা একই।

তবে সওয়াব পৌঁছানোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এত বেশি যে, বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কেউ যদি কারও নামে সওয়ার পৌঁছায়, তখন তা বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। যেমন কেউ যদি কারও নামে একটি পোশাক দান করে তাহলে যার নামে এ দান করা হল তাঁর নামে একটি নূরী পোশাক, অথবা এর সাথে আরও অনেক পোশাক এবং বেহেশত, বাগে জান্নাত, হুর, গেলমান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপকরণাদি সে পায়। এগুলো হল যে, যাকে সওয়াব পৌঁছায় তাদের মধ্যে আন্তরিক মহব্বত ও সম্মানবোধের প্রতিফল। মহব্বত ও সম্মানবোধ যার যত বেশি তাঁর পুণ্যকর্ম ও ছওয়াব পৌঁছানোর বিনিময়ও তত বেশি ও উত্তম।

উল্লেখ্য, "এহসানের বিনিময় এহসানই প্রাপ্য" –কোরানের এই মূল নীতির ভিত্তিতেই ছওয়াব রেসানির উক্তরূপ প্রতিদান হয়ে থাকে। ইহজগৎ থেকে যখন অপর জগতে কিছু পৌঁছানো হয়, তখন যার জন্য তা পাঠানো হল তাঁর তরফ থেকে প্রেরণকারী ও কিছু প্রাপ্য হয়ে যায়। এটা প্রেরকের উদ্দেশে প্রাপকের দান। এটা সালামের জবাবের মতো। সালামের জবাবে যেমন রূহের জগৎ থেকে পুরস্কারস্বরূপ রহমত বর্ষিত হয়, ছওয়াব রেসানির ক্ষেত্রেও তেমনি, যে সওয়াব পৌঁছায় সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যাদের নামে সওয়াব প্রেরণ করা হয় তারা যদি আম্বিয়া ও আউলিয়া অথবা যথার্থ মুর্শিদ হন তাহলে তাঁদের তরফ থেকে যে রহমত ও বরকত উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া যায় তা দুনিয়া ও আখেরাতের মূলধন। তাতে উভয় জগতে সুখ ও শান্তি হয়। তাদের এসব প্রতিদান ফেরেশতা হয়ে সওয়াব প্রেরকের জন্য দোয়া করে, কখনো তার সম্পদ ও ঈমানের হেফাজতকারীরূপে কাজ করে কখনও দুনিয়া আখেরাতের সম্পদ এবং বন্ধুরূপে কাজ করে, কখনো শত্রুর তলোয়ার এবং চরিত্রকে তাঁর সামনে স্পষ্ট করে দেয় আর কখনো মৃতের জীবন ও রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

মোট কথা, আলোচ্য রহস্যালোক থেকে দুনিয়াও আখেরাতের বহু ক্রিয়াকর্ম প্রকাশিত হয়। আল্লাহর ফজলপ্রাপ্ত তথা আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারীগণ জানেন যে, তার কত বড় ফজিলত। সারা পৃথিবীর হাজারও দেহপ্রাণ মিলেও এর প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের বলতেই হয় যে–

هل جزاء الاحسان الا الاحسان *

"হাল জাজাউল এহ্সান ইল্লাল এহ্সান।"

অর্থাৎ, "কল্যাণের বিনিময়ে অবশ্যই কল্যাণ লাভ হয়।" বস্তুত এহসান একটি মহৎ কাজ। এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অসীম। এবার নিয়াজের মূল বিষয়, নিয়াজমন্দি তথা প্রার্থনাকারীর নিকটে আস এবং ঐশী দানকে বুঝবার চেষ্টা করো। তাহলে জানতে পারবে যে, ঐশী দান একটি প্রকৃত সত্য তা মিথ্যা আর ক্ষণস্থায়ী নয়। যেমনি মিথ্যা নয় পিতা-মাতার মধ্যে বর্তমান সৃষ্টির উৎস। প্রকৃত গবেষকদের নিকট এটাও স্পষ্ট প্রমাণিত সত্য।

প্রশ্ন নং ৪২

আমাদের রাসূল (সাঃ)-এর রওজা মোনাওয়ারা এবং পবিত্র মাজার সৌধে এত সৌন্দর্য বিধান এবং জাঁকজমক কেন? এতে সোনারূপা, দামি মুক্তা, হীরকচূর্ণ, জড়োয়া রেশম, তশর গদি এবং গেলাফ ও চাদোয়া ঝাড়বাতি প্রভৃতিসহ ধারণাতীত সজ্জা সামগ্রী দ্বারা এই রওজা মোনাওয়ারার এত শাহী জাঁকজমক কেন?

উত্তর : সকল সম্মানের মালিক প্রভুর আদেশক্রমেই তাঁর রাসূলের (সাঃ) রওজা মোনাওয়ারার জাঁকজমক সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

وللاخرة خير لك من الاولى*

"ওয়ালাল আখিরাতু খাইরুল্লাকা মিনাল উ-লা। (সূরা আদ্দোহা)

"আপনার পূর্বাবস্থা থেকে পরের অবস্থা অবশ্যই উত্তম"। অর্থাৎ, আপনার ইহজাগতিক অবস্থাদি যা ছিল, তাঁর তুলনায় অপর জগতের অবস্থা আর ভালো হবে। রওজা মোনাওয়ারার অবস্থা তাঁর অপর জগতের অবস্থাদির একটা। রসূল (সাঃ) ইহজগতে খুবই গরিব অবস্থায় জীবনযাপন করেন। সে তুলনায় তাঁর বর্তমান অবস্থা ভালো। কোরানের উক্ত ঘোষণা তারই অগ্রিম সুসংবাদ। আলোচ্য জাঁকজমক তারই বাস্তবরূপ। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) নিজেই বলেছিলেন, হে আল্লাহ মদিনা-মোনাওয়ারাকে মক্কা বরং তাঁর চেয়েও অধিকতর বরকতময় করুন। বস্তুত তাই হয়েছে। কোরানের ভাষ্য মোতাবেক হযরতের রওজা মোনাওয়ারা তথা মদিনা মোনাওয়ারা আজ নূরে নূরে নূরময়। যদি তাই না হবে তাহলে কে এ পবিত্র রওজাকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেছে? আরে এতো মূলে যা আছে তাঁরই প্রকাশ।

নূরে পয়গাম্বরি তো সকলের জন্যই ভক্তি ও সম্ভ্রমের স্থান। এতে খান্নাসের প্রচারণার কোনো সুযোগ নেই। সত্তর হাজার ফেরেশতা সর্বদা এর হেফাজতে নিয়োজিত, এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কাফের আর ফাসেক ছাড়া কেউ এর বিরোধী হতে পারেন না। কারণ রওজা মোবারকের এ জাঁকজমক নতুন কিছু নয়। যুগ যুগ ধরে এ রীতি চলে এসেছে।

এবং তারকার মতো উজ্জ্বলরূপে তা আজও বিদ্যমান। পয়গাম্বরগণের মাজার বহু জাঁকজমকের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বর্তমান রয়েছে। ফেরেশতাগণ সর্বদা এর হেফাজতে রত। এরই বদৌলতে নবী-অলিগণের মাজার সবসময় জাঁকজমকপূর্ণ থাকে। যারা এর বিরোধিতা করে তাঁরা হল সে শ্রেণীর যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিতে যা উপলব্ধি করতে পারে না তাকে অস্বীকার করে এবং সে সম্পর্কে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله*

"বাল কাজ্জাবু বিমা লাম ইউহিতু বি-ইলমিহি ওয়াল্লাম্মা ইয়াতিহীম তাবিলাহু।"

অর্থাৎ, "কোনো বিষয় যখন তাদের জ্ঞানে ধরে না তখন তাঁরা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে।" অন্যত্র এক আয়াতে বলা হয়েছে–

واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم*

"ওয়া ইজ লাম ইয়াহতাদুবিহি ফাসাইয়াকুলুনা হাজা ইফকুন কাদিম।"

অর্থাৎ, "তারা যখন কোনো দিশা না পায় তখন বলে যে এটাতো পুরনো মিথ্যা।" সে যা হোক পুণ্যবান ব্যক্তিদের রওজা সর্বদা ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। এজন্য এগুলোকে সম্মান ও ভক্তি করা ওয়াজেব। তদুপরি অনুরূপ কবরবাসীদের প্রতি আদব দেখানো অত্যন্ত জরুরি। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ নিজেরাই পুণ্যবান। তার পরও তাদের প্রতি রয়েছে সদা সর্বদা নবী-অলিগণের পুণ্য দৃষ্টি– যাঁরা আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত তাদের মাধ্যমে সব সময়ই আল্লাহর রহমত ও বরকত অদৃশ্যভাবে জারি হয়। এজন্য তাদের সম্মান করা ওয়াজেব। এ কারণেই মাজার জিয়ারতের রীতি ধারা চলমান রয়েছে। আশিকগণের নিকট এর রহস্য ও তাৎপর্য আয়নার মতো পরিষ্কার। কারণ কোরান ও হাদিসের মর্মার্থ তাদের নিকট সুস্পষ্ট। তাই তারা বেয়াদব নয়। তাঁরা সবসময় মাজারের নূরের প্রতি সম্মান দেখায়। এমনকি তাঁরা জুতা পরিধান করে বাহাদুরির সাথে মাজারে প্রবেশ করে না। তাসাউফের হাদিসে তা হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে যারা আদববান তাদের জন্য আদব ও সম্মানই দলিল। কারণ তাদের অন্তরে কোরানের বক্তব্য সার প্রবেশ করেছে।

শুভ সমাপ্তি

লাতায়েফে শাফিয়াহ্

সূচি

মর্‌যিয়াদের শব্দ বিকৃতি আর ওহাবীদের বিকৃত ব্যাখ্যার জবাব ৪৮৫
একটি ইশতেহার ৫০৮
অন্যান্য প্রসঙ্গ ৫১১
দ্বিতীয় উপকারিতা ৫১২
অন্য একটি উপকারী কাজ ৫১৪
আর একটি উপকারী বিষয় ৫১৫
তৃতীয় উপকারিতা ৫১৬
'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'তে দলিল হিসেবে গৃহীত গ্রন্থাদির তালিকা ৫২১
ফাতেহার তাক্‌বীর ৫২৬
হযরত রাসূল (সঃ)-এর ফাতেহার নিয়ম ৫২৬
হযরত আলী (রাঃ) এর ফাতেহার নিয়ম ৫২৬
খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর ফাতেহা ৫২৭
ফাতেহা-এ-কান্দুরী ৫২৭
দুই ইমামের ফাতেহা ৫২৭
হযরত মীর মহিউদ্দীনের ফাতেহা ৫২৭
ফাতেহা-এ-হযরত শাহ শরফ বু আলী কলন্দর ৫২৭
হযরত খাজা খিজিরের ফাতেহা ৫২৮
হযরত কাজী শাহবুদ্দিনের ফাতেহা ৫২৮
হযরত শাহ মাদারের ফাতেহা ৫২৮
শবে বরাতের প্রদীপসমূহের উদ্দেশে ফাতেহা ৫২৮
কোরান খতমান্তে ফাতেহা ৫২৮
কবরে মৃতের জন্য উপদেশ ৫২৯
বুজুর্গ আলেমদের মন্তব্যাদি ৫২৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
মর্‌যিয়াদের শব্দ বিকৃতি আর ওহাবীদের বিকৃত ব্যাখ্যার জবাব

আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসান্তে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং যাঁদের সামান্যতম হলেও ইসলামের সৌন্দর্যবোধ আছে, বিশেষ করে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের নিকট এবং সাধারণভাবে সকল বিশ্বাসীর নিকট এ ফকিরের বিশেষ নিবেদন– অধুনা হিন্দুস্তান এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী বিষয়সমূহ দলাদলিতে পরিণত হয়েছে। বেলায়েত এবং হাকিকত তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঠিক পথ নির্দেশনামূলক পারলৌকিক বিষয়াদির আলোচনায় কিছু লোক নিজেদের মনগড়া কথা এবং অজ্ঞতার কারণে ঝগড়ার পথ অবলম্বন করেছে। কারণ মরহুম মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেব রফিকুস্‌সালেকীন, যাদুত্ তাক্‌ওয়া, নূরুল হুদা, কাওলুছ্ ছাবেত, রদ্দুল বেদাআ', হক্কুল ইয়াক্বীন, ইসতেকামাতে ফয়েজে আম, নুরুন্ আলা নূর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোর অনেক কথাই সঠিক নয়। বোধদৈন্যের কারণে তিনি অনেক নৈতিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে উল্টাপাল্টা লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ দরগোশ অর্থ কানের ভিতর আর তিনি করেছেন 'দরাজ গোশ' অর্থাৎ লম্বা কান। আর 'দম' অর্থ নিশ্বাস। আর তিনি করেছেন 'দুম' অর্থাৎ 'লেজ' ইত্যাদি। এ কারণে জনগণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। তাঁর অজ্ঞতাপ্রসূত সৃষ্ট কুফলসমূহ এবং এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট গণপ্রতিবাদসমূহ পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরা হল। উদ্দেশ্য হল, হক্কপন্থীগণ যেন তাঁকে ইনসাফের সাথে পর্যালোচনা করেন এবং এ ফকিরের কোনো ভুল পেলে তা এড়িয়ে না গিয়ে সংশোধন করে দেন। এটাই ধর্মের সৌন্দর্য এবং উত্তম ধর্মপন্থা। ধর্মকে অজ্ঞতা ও ওহাবী চিন্তার কালো পোশাকে আবৃত করাকে নূর ও কাশ্‌ফ ধারণা করা ধর্মসম্মত নয়।

গ্রন্থকার জনাব কেরামত আলী সাহেব এমন কতিপয় বিষয়কে সঠিক বলে দাবি করেছেন যেগুলোর পক্ষে 'আহলে হক্ক'দের কোনো উদ্ধৃতি নেই। উদাহরণ স্বরূপ ওহাবীদের বিরুদ্ধে যে সব হাদিস-দলিল উদ্ধৃত করেছেন তার দু একটা দলিল আবার রদ্দুল মুখতার, তৃতীয় খণ্ডের বিদ্রোহ পরিচ্ছেদের বরাত দিয়ে 'কাওলুছ ছাবেত'-এর অষ্টম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন– তা হল এই যে, খারেজীরা যাদের উপর লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালায় তাদেরকে তারা কাফের মনে করে একথা বলে উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, আমাদের সময়ে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীরা যারা মক্কা-মদিনা দখল করে, তারা প্রতারণামূলকভাবে নিজেদেরকে হাম্বলী মায্‌হাবের অনুসারী বলে দাবি করে। অপরদিকে তাদের বিশ্বাস হল যে, তারা মুসলিম এবং তাদের বিশ্বাসের বিরোধীরা মুশরিক। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা সুন্নী সম্প্রদায় ও তাদের নেতাদের হত্যা করা বৈধ মনে করে, যতদিন না আল্লাহ্ তাদের দর্পচূর্ণ করেন এবং তারা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

প্রতিরোধের মুখে ভীত ব্যক্তিরা তাদের দল ত্যাগ করে, অনেকে মারা যায়, আল্লাহ তাদের শহরগুলো ধ্বংস করেন এবং ১২৩৩ হিজরিতে সমাপ্ত যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর হাতে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

হেজাজের এলাকা বাদে অবশিষ্ট আরব অঞ্চলকে নয্‌দ বলা হয়। 'মিশকাতুল মাসাবিহর' ইয়ামেন ও সিরিয়া অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষাংশে ইবনে ওমর (রাঃ) এর বরাত ও বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নযদে হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা হবে এবং নয্‌দ থেকে শয়তানের সেনা ও তার সহযোগীদের উদ্ভব হবে। এ অধমের কথা হল, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুজেযা হিসেবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তা-ই হয়েছে। অতএব মুসলিমদের চিন্তা করা উচিত এবং ইনসাফের সাথে ভেবে দেখা দরকার যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পর ওহাবীরা ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কি উদ্ভব হয়েছে যারা বিশেষ করে মক্কা-মদিনার মুসলিমদের ওপর ওহাবীদের মতো অত্যাচার করেছে এবং যাদেরকে শয়তানের সেনা আখ্যা দেওয়া ঠিক মনে হবে, আর নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষ তা পাঠ করবে। আর এ পাঠ করাকে ওহাবীদের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষকে মুক্ত করা, মানুষের মন থেকে ওহাবীদের সৃষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করা ইতোমধ্যে যারা অন্যায় অপরাধ ও বেদআতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে এবং ধর্মের বিধানাবলি পালনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে, তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য যথেষ্ট?

অতঃপর প্রথমে 'রফিকুস্ সালেকীন' গ্রন্থ থেকে উদাহরণস্বরূপ কিছুটা আলোচনা করা যাক। উক্ত গ্রন্থের ১৩১৬ হিজরির সংস্করণের অষ্টম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে الله نور السموة والارض (আল্লাহু নূরুচ্ছাসামাওয়াতি ওয়াল আরদ্) অর্থাৎ, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর নূর বা জ্যোতি। এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর নূর তথা জ্যোতি সর্বত্র বর্তমান যেমনই আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা সর্বত্র বিরাজিত। কারণ আল্লাহর নূর তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত এবং তাঁর সত্তায় অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান। অতএব যেসব স্থানে তাঁর সত্তা বর্তমান সেসব স্থানে তাঁর নূরও অবশ্যম্ভাবীরূপে বিরাজমান এবং যেমনই তাঁর সত্তা সবকিছুকে আবেষ্টিত করে রেখেছে তেমনই তাঁর নূর দ্বারাও সবকিছু পরিবেষ্টিত ও পরিপুষ্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার সর্বত্র আল্লাহর নূর শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, আল্লাহর নূর সর্বত্র বিরাজিত। প্রশ্ন হল, উক্ত আয়াতে কোন শব্দের অর্থ 'আল্লাহর নূর'? এ আয়াত দ্বারা 'আল্লাহর নূর' বোঝায় না। বরং তাতে বোঝায় যে, আল্লাহ-ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। অর্থাৎ, আল্লাহ স্বীয় সত্তা ও গুণাবলিতে গুণান্বিত অর্থাৎ সত্তারূপে প্রকাশিত এবং সত্তা গুণাবলিরূপে বিরাজিত ও গুণান্বিত। এখানে গুণাবলি ও সত্তা একে অন্যের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, গুণাবলি যেমন সত্তার ফল তেমনই সত্তাও গুণাবলির ফল। হাকিকতের জগতে তথা চূড়ান্ত মূলে যা সত্তারূপে গুণ তা-ই গুণরূপে সত্তা হিসেবে বর্তমান এবং কেউ কারও

স্থলাভিষিক্ত বা উৎস নয়। এর অর্থ হল আল্লাহ আপন সত্তা ও গুণ, পবিত্রতা ও প্রজ্ঞা এবং শক্তি ও রহস্য সহকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর তথা জ্যোতিরূপে বিরাজমান। তা না হলে, দৃশ্যমান বস্তুগুলোর উৎস কী এবং কোথা থেকে এগুলোর সৃষ্টি? অতএব মূল উৎসের বিচারে দৃশ্যমান বস্তুগুলোও সে নূরই। তা হলে কোন নূর আবার এগুলোকে বেষ্টন করবে? যেখানে নূর থাকে সেখানে তার সত্তাও থাকে। সুতরাং সকল সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার সত্তা রয়েছে। এর আরও ব্যাখ্যা আল্লাহ জ্ঞাননির্ভর। হাদিসে নূরের পর্দার কথা উল্লেখ আছে। এটা মৌল সত্তার বিকাশের বর্ণনাত্মক ও প্রশংসাত্মক উপস্থাপনা।

উক্ত গ্রন্থকার সাহেব এর গূঢ় অর্থ এখনও বোঝেননি। শুধু তা-ই নয়। এর পরবর্তী আলোচনায় আল্লাহর সত্তার প্রমাণের ভিত্তিকেই তিনি অস্বীকার করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, আল্লাহ শব্দ দ্বারা এমন এক ব্যাপক এবং নিরেট নিভৃত ও একাকী সত্তাকে বোঝায় যা রঙ-রূপ, আকার-আকৃতি এবং স্থান প্রভৃতি থেকে পবিত্র ইত্যাদি। অপরদিকে ঐ একই গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় লেখক আল্লাহকে সর্বত্র বিরাজমান বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এ স্ববিরোধী বক্তব্যের ব্যাখ্যা কী? তাঁর পরিষ্কার করে বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহর কোন অবস্থাকে সব কিছু থেকে মুক্ত এবং একাকিত্ব বলে আখ্যা দেওয়া যায়? অথবা তিনি বলুন যে, আল্লাহ একাকী হলেন কী করে? এভাবে কল্পিত গালগল্প শুনিয়ে কত সম্প্রদায়কে বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার আরও উদাহরণ আছে।

উক্ত গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় মৌলভী কেরামত আলী সাহেব লিখেছেন যে, দৃষ্টিগোচর নূরকে চিন্তাশক্তির সাহায্যে এমনভাবে সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত করতে হবে যেন সে নূর সবকিছুকে নিজ বেষ্টনীর মধ্যে আনয়ন করে স্থানিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে অসীমে ব্যাপ্ত বলে মনে হয়। অর্থাৎ, মনে হবে আকাশ ও জমিন কিছুই নেই; সবই নূর আর নূর ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে স্থানিক বস্তুকে অস্থানিক মনে করেছেন। অর্থাৎ, দৃষ্টিগোচর ও উপলব্ধ নূরকে স্থানিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে মনে করেছেন। এজন্যই তিনি দৃষ্টিগোচর নূরকে চিন্তাশক্তির সাহায্যে স্থানিক সীমার বাইরে সম্প্রসারিত করার কথা বলেছেন। অথচ দৃষ্টি ও চিন্তার সাথে স্থানও সম্পৃক্ত এবং যা অস্থানিক তা রঙ-রূপ থেকে মুক্ত। তাহলে নূর কী করে অস্থানিক হবে? বস্তুত এসব অজ্ঞতার ফলশ্রুতি বৈ কিছু নয়।

উক্ত গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন গুণগত তাওহীদের সার কথা এই যে, অস্তিত্ববাদী ভাবুক মনে করে যে, বিশ্বের সমস্ত বস্তু এবং সৃষ্টি সবই আমাদের ভিতর থেকে উদ্‌গত। এ চিন্তা তার মধ্যে এমনভাবে উদ্রেক হয় যে, সে নিজ দেহকে অনেক বিশাল ও প্রশস্ত মনে করে এবং ভাবে যে, তার দেহের বিশালত্ব ও বিস্তৃতি বিশ্বের সমস্ত বস্তু থেকে আরশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং বিশ্বের সমস্ত বস্তু তার অন্তর্ভুক্ত। সৌরজগৎ, বস্তুজগৎ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জীবজন্তু ও মানবমণ্ডলী সবকিছুকেই সে তার দেহের অংশ মনে করে এবং এমতাবস্থায় কাশ্‌ফ অর্থাৎ রহস্যোদ্ভেদরূপে

আকাশমণ্ডলের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হয়, তার থেকে বহু দূরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার ভ্রমণ লাভ হয় এবং তার কাশ্‌ফ তথা রহস্যোদ্ভেদ বাস্তবের সাথেও মিলে যায়। কিন্তু পরম সত্যকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে এবং বিশ্বকে নিজের অংশ মনে করবে না। বরং প্রত্যয় রাখবে যে, আমার এ ধারণা অবাস্তব এবং এ আমার মোরাকাবা ও ধ্যানের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

এখানে বিচার্য বিষয় হল যে, গ্রন্থকার যাকে কাশ্‌ফে'র ফল এবং বাস্তব বলে উল্লেখ করেছেন, সে ধারণা কী করে অসঙ্গত হয়? বিশ্বসৃষ্টিকে আপন দেহের অংশবিশেষ মনে করতে নিষেধ করার অর্থ কি এ নয় যে, উক্তরূপ ভাবনা সঙ্গত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত অসঙ্গত ধারণা 'কাশ্‌ফ'র যথার্থ ও সঠিক ফলশ্রুতি কী করে হয়? এটাকে যদি মোরাকাবা ও ধ্যানের প্রতিক্রিয়া বলা হয়ও তাহলেও প্রশ্ন থাকে যে, যে মোরাকাবার ফল সত্য নয় এবং যে মোরাকাবা আত্মম্ভরিতায় আচ্ছন্ন সে মোরাকাবার কাশ্‌ফ বা রহস্যোদ্ভেদ হয় কি? যদি বলা হয় যে, এটা একমাত্র পরম সত্তার বিশ্বাসের ফল, তাহলে তাকে অসত্য ও অবাস্তব ভাবা যায় কীভাবে? এরূপ ক্ষেত্রে তাকে অবাস্তব এবং অনুমানভিত্তিক ধারণা মনে করা তো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তা অসত্যেরই শামিল। বস্তুত মোরাকাবা অবস্থাদির ফলশ্রুতিতে প্রতিফলিত সবকিছুই সত্য, যদিও ফলিত অবস্থার উৎস ও মর্ম সম্পর্কে সাধক সম্যক জ্ঞাত নন। সাধকের অন্তরে নিক্ষিপ্ত সবই সত্য, কারও কারও অন্তরে অবাস্তব প্রতিফলনও ঘটে। এটা ভীতি ও ধ্যানভঙ্গের কারণে হয়। তবে এটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিশ্বকে নিজ দেহের অংশবিশেষ মনে হওয়া আদি বীজের ফসলের মতো বৃক্ষ এবং এর ফল যেমন বীজ থেকে হয় তেমনই সকল বস্তুই আদি উৎসে বর্তমান। তাই হাদিসে আছে, দেহে যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই তা কখনো দেহকে প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করে না। মানুষের মনের ঠিক-বেঠিক এবং বাস্তব-অবাস্তব সব প্রতিক্রিয়াই সত্য, কারণ বিশ্বে যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই, কখনো তার কোনো প্রভাব কারও ওপর পড়বে না।

উক্ত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, রূহ বা আত্মা যখন আকাশ ও আরশ পরিভ্রমণ করে তখন আত্মার তথায় অবস্থান কষ্টকর বোধ হয়। এর কারণ হিসেবে উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখেন যে, ভারী বস্তু নিম্নগামী, এজন্য তার পতন ঠেকাবার উপায় হল আত্মার ঊর্ধ্বারোহণের সময়ে আকাশে একটি পথ চিন্তা করতে হবে এবং ঊর্ধ্বারোহণের পর আকাশে আত্মার অবস্থান ও স্থিতি নিশ্চিত করার জন্য চিন্তাশক্তির সাহায্যে উক্ত পথ বন্ধ করে দিবে, ইত্যাদি।

মোদ্দাকথা, মোরাকাবা অবস্থায় থেকেই মোরাকাবায় রত ব্যক্তিকে আত্মা যাতে আকাশ থেকে ফিরে আসতে না পারে সে চিন্তা ও পথ বন্ধ করতে হবে। প্রশ্ন হল, মোরাকাবা অবস্থায় আত্মার ফিরে আসার চিন্তা-ভাবনায় বিব্রত ও বিভ্রাটে থাকলে গ্রন্থকারের মোরাকাবা ও মোশাহেদা কী করে সার্থক হবে? মৌখিক যিকিরের সাথে (আলমে নাছুত) মানব জগতের সম্পর্ক। অতএব শয়তানের নষ্টামি ও অহঙ্কার থেকে তার গত্যন্তর নেই। কারণ সে সাধক হিসেবে নবিশ এবং আধ্যাত্মিক

বিষয়াদির ব্যাপারে তার সম্যক জ্ঞান নেই। কারণ এখনও সে এক 'জরবী' ও দুই 'জরবী' যিকিরে রত। যদিও কারও কারও কল্পনায় আকাশ ভ্রমণের চিন্তা আছে, সে চিন্তাও তাকে (আলমে নাছুত) মানবজগৎ ভ্রমণের মাধ্যমেই করতে হয় বলে তাতে অহঙ্কার অবশ্যম্ভাবী ও অবধারিত। এমতাবস্থায় অনুরূপ আচরণ বোধ করা কোনো অলির (আহলে বেলায়েত) পক্ষেই কি সম্ভব? আফসোস! মানব ও ফেরেশতার রূহানী জগতের মধ্যে রূহের জন্য আলমে নাছুত ও আলমে মালাকুতের মধ্যে কোনো পর্দা নেই। কারণ আমলে জাবারুতে রূহের অবস্থান; বরং তদূর্ধ্বেও রূহের অবস্থান রয়েছে।

উক্ত মৌলভী কেরামত আলী সাহেবের লেখা 'কাওলুছ ছাবেত' ছাপা ১৩১৮ হিজরি-এর ৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, পীরের সাথে যুক্ত ভক্তের আন্তরিক ভক্তিকে সুফিগণ শাইখ বা মুর্শিদের সাথে মনোসংযোগ বলে থাকেন। অজ্ঞরা এর ভুল অর্থ বুঝেছে এবং অন্যকে ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করছে। এরা তাদের শিখিয়েছে যে, যিকিরের সময়ে আপন পীরের অবিকল ছবি নিজের সামনে মনে করে যিকির করতে হবে। এটাকে তারা পীরের চেহারায় নিমগ্নতা বলে। অথচ কোনো পুস্তকে এরূপ বর্ণিত নেই। অথচ কাওলুল জামিল, সাবিলুর রেশাদ এবং নূরুন আলা নূর প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আপনারা দেখতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে কাওলুল জামিলের বক্তব্য লক্ষ করুন। তাতে বলা হচ্ছে– শাইখ বা মুর্শিদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হল, শাইখের সাথে সুদৃঢ় মনোসংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে। অতঃপর মুর্শিদের সঙ্গলাভ করে, অন্য সব চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এবং কেবল তাঁর মহব্বত ও ফয়েজ লাভের প্রক্রিয়ায় রত থাকবে, এ সময়ে উভয় চক্ষু বন্ধ রাখবে অথবা উভয় চক্ষু খোলা অবস্থায় মুর্শিদের দু চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে নিবদ্ধ রাখবে। এমতাবস্থায় কোনো প্রকার ফয়েজ বা প্রেরণা ও প্রভাব অনুভূত হলে আন্তরিক মহব্বতের সাথে তা অনুসরণ করবে এবং এ ফয়েজকে ধারণ করে রাখার জন্য যত্ন সহকারে সচেষ্ট থাকবে। মুর্শিদ যদি ভক্তের সম্মুখে সশরীরে হাজির না থাকেন, তা হলে আপন চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে তাঁর চেহারা কল্পনা করবে মহব্বত ও ভক্তিপূর্ণ অন্তরে। তা হলে তাঁর কল্পিত চেহারা থেকে সে উপকারই পাওয়া যাবে যা তার সঙ্গ ও সাহচর্য থেকে পাওয়া যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে, উক্ত গ্রন্থকার (মৌলভী কেরামত আলী) লিখেছেন যে, মুর্শিদের চেহারা কল্পনা করার কথা কোনো গ্রন্থে উল্লেখ নেই, তা যদি সত্য হয়, তা হলে কাওলুল জামিল ও সাবিলুর রেশাদ-এ যে শাইখের ধ্যান ও তাঁর সাথে মনোসংযোগ স্থাপন এবং মুর্শিদের দু চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে ধ্যান নিবদ্ধ করার অর্থ কী? এর অর্থ কি মুর্শিদের চেহারায় নিমগ্ন হওয়া নয়? বলবেন কি, এ মুর্শিদ কে এবং মুর্শিদে ধ্যান নিবদ্ধ করা বলতে কী বোঝায়? মুর্শিদ যদি দূরে অবস্থান করেন, এমনকি সশরীরে বর্তমান ও জিন্দা নাও থাকেন তা হলেও মুর্শিদ থেকে ফয়েজ

পাওয়া যায় এবং নবিশ আপন চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মুর্শিদের কল্পিত চেহারা থেকেও তাঁর সশরীর সঙ্গ এবং সাহচর্যের মতোই ফয়েজ পায়। এর অর্থ কী? এ কারণেই 'কাওলুল জামিল'-এ আধ্যাত্মিক সাধনায় মুর্শিদের ধ্যান এবং তাঁর সাথে মনোসংযোগ করাকে পূর্বশর্ত এবং প্রধান স্তম্ভ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হযরত আবদুর রহমান জামী বলেন, যিকির করে উপকার পাওয়ার জন্য মুর্শিদের ধ্যান করাই যথেষ্ট। আর এটাই সকল সাধনার সর্বোত্তম ও সহজতর পথ। পুনঃপুনঃ মুর্শিদের চেহারার ধ্যান করলে যিকির ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। সকল যিকিরের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ নেই। ঐশী রহস্যজ্ঞান সমৃদ্ধ আল্লামা নামে খ্যাত মাওলানা জয়নুদ্দীন খানী তাঁর 'উপদেশ' পুস্তকে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) থেকে নির্জন ধ্যান সাফল্যের আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন। শাইখের সাথে সদা মনোসংযোগ রক্ষা করা এর অন্যতম। অনুরূপভাবে 'জাওহারুস সলুক', 'কাশকুলু শরীফ', 'মাক্তুবাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী', 'মাকতুবাতে মিজি', 'হেদায়েতুত তালেবীন' এবং হযরত খাজা আহরার (রঃ)-এর পুস্তক 'এসবাতে রাবেতা' এবং অনুরূপভাবে হযরত কাজি ইউসুফ নাছেহ্ (রঃ) প্রভৃতি গ্রন্থেও মুর্শিদের ধ্যান ও মনোসংযোগের কথা উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় মৌলভী কেরামত আলী সাহেব কী করে লিখলেন যে, মুর্শিদের চেহারার ধ্যান করার কথা কোনো কেতাবে নেই। শুধু তা-ই নয়, নিজের পীর ও দাদা পীরকেও রেহাই দেননি। জ্ঞানের অভাবে যা তার মনে এসেছে, তাই লিখেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তাও লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ উক্ত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় 'আখবারুল আখ্ইয়ার' থেকে গ্রন্থকারের উদ্ধৃত প্রমাণগুলোর দু একটি সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা করছি।

ধ্যান প্রসঙ্গে 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থের বক্তব্য উদ্ধৃত করার ধারায় তিনি লিখেন, পঞ্চমত আপন শাইখের সাথে সদা মনোসংযোগ রক্ষা করে যিকির করতে হবে। এ মনোসংযোগ অর্থ মুর্শিদের অন্তরের সঙ্গে মুরিদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা। অর্থাৎ হাদিস পাঠ করার সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এবং ফেকাহ গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে ইমাম আজম (রহঃ)-এর সাথে যেমন একটি বাতেনী প্রেম ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ধ্যানের সময়ে তেমনই মুর্শিদের সাথেও একটি মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাই হল শাইখের সাথে মনোসংযোগ স্থাপন। সবটাই আলোচ্য গ্রন্থকারের (মৌলভী কেরামত আলী) কথা।

এখন প্রশ্ন হল, হাদিস পাঠ করার সময়ে রাসূল (সঃ)-এর সাথে এবং ফেকাহ গ্রন্থ পাঠ করার সময়ে ইমাম আজম (রহঃ)-এর সাথে পাঠকের যে মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, শাইখের সাথে মুরিদের মনোসংযোগও তা-ই; এটা উক্ত লেখক কোথায় পেলেন? যে শিক্ষকের কাছে হাদিস-ফেকাহ শিক্ষা করা হয়, তাঁর সাথে মনোসংযোগ অবশ্য প্রয়োজন; যিনি পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছেন তাঁর সাথে মনোসংযোগ আবশ্যকীয় নয়। অর্থাৎ কোনো গ্রন্থের লেখকের সাথে পাঠকের

মনোসংযোগ জরুরি নয়। যিনি যে জ্ঞানের সরাসরি গুরু বা মুর্শিদ সে বিষয়ে তাঁর সাথে মনোসংযোগ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু জ্ঞান তো মনের মুর্শিদ বা গুরু নয়, সে ক্ষেত্রে এ মনোসংযোগকে মুর্শিদের সাথে মনোসংযোগ কী করে বলা যায়, আর কীভাবেই বা একে মনোসংযোগ মনে করব? এ ধরনের মনোসংযোগের ফলে কী ধরনের যিকির বা জ্যোতি লাভ হয় অথবা এর উপর কিরূপ কার্যক্রম নির্ভরশীল, তা জানার উপায়ই বা কী?

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুর্শিদের চেহারা আল্লাহর সত্তাগত গুণে পরিপূর্ণ। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি দ্বারা আল্লাহর সাধকের সত্তা ও গুণাবলি রূহানী চুম্বকের আকর্ষণে আলোকিত হয়। অর্থাৎ সঠিক পথের সন্ধানে ধ্যানমগ্ন সাধকের মনমণ্ডলে মুর্শিদের চেহারা বিকশিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূহানী আকর্ষণ অগ্নিময় সীসার মতো হয়ে তার সামনে উদ্ভাসিত হবে এবং তার রূহের মধ্যে বিজলীর মতো চমকাতে থাকবে। এটা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও অভিজ্ঞতার কথা, ধারণা মাত্র নয়। নিছক ধারণা বা অনুমানের সাথে মুর্শিদের ধ্যানস্থ অন্তর ও উপলব্ধির কোনোই সম্পর্ক নেই।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য গ্রন্থকার গ্রন্থের এক স্থানে মন্তব্য করেছেন যে, অজ্ঞরা মনোসংযোগ-এর ভুল অর্থ বুঝেছে এবং যিকির করার সময়ে পীরের হুবহু চেহারা কল্পনায় নিজের সামনে রাখার জন্য মুরিদদের পরামর্শ দেয় ইত্যাদি। এখন গ্রন্থকারের জ্ঞানের বহর দেখুন। এখানে 'কল্পনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর কল্পনায় যে, ছবি বা চেহারা আসবে তা অবশ্যই কল্পিত ছবি হবে। তা কখনো মূল ছবি হতে পারে না। কল্পনা শব্দ দ্বারাই তো বোঝা যায় যে এটা কেবল মনে ধারণাকৃত ছবি। তবুও গ্রন্থকার ধ্যানে শাইখের চেহারা কল্পনা করতে নিষেধ করেছেন। তা হলে তিনি নিজে ধ্যানে কামানের কল্পনা করার পরামর্শ কেন দেন? এ ফকিরের মনে পড়ে, তিনি তাঁর কোনো এক পুস্তকে ধ্যানে সরাসরি কামানের কল্পনা করার উল্লেখ করেছেন এবং ধ্যানে তথা যিকিরের মোরাকাবায় কামানের ধ্যান করাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলেছেন। কামানের কল্পনা করার অর্থ হল, সাধক ধ্যানে কল্পনা করবে যে, তার বক্ষে কামানের একটি গুলি বিদ্ধ হয়েছে। তাতে তার বক্ষে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে এবং সে ছিদ্রটি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে গোটা দেহে সম্প্রসারিত হয়ে গেছে ইত্যাদি।

লক্ষণীয় যে, যে মুর্শিদের মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং ঐশী প্রেরণা বর্তমান যাঁর প্রভাব পয়গম্বরী প্রভাবের সম মর্যাদাপূর্ণ এবং শয়তানের নষ্টামি থেকে সুরক্ষিত সে মুর্শিদের ধ্যান নিষিদ্ধ করে উক্ত গ্রন্থকার (মৌলভী কেরামত আলী) মুরিদকে তা থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং এর উপকারিতার বিপরীত কথা লিখেছেন। অপরদিকে অসার লোহানির্মিত কামানের ধ্যান ও কল্পনা শেখান। অথচ তিনি জানেন না যে, শয়তান কামানের রূপ ধরতে পারে এবং এক গুলিতে পণ্ড করে দিতে পারে সব সাধনা। আর তিনিও হতে পারেন এর শিকার। বস্তুত তিনি তার শিকার হয়েই

আছেন। এজন্য নূরময় মুর্শিদের ধ্যান করা তাঁর অপছন্দ। অপরদিকে পছন্দ হল তাঁর কামানের রূপ কল্পনা।

বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর পথে যারা নেহায়েত মন্দ এবং সঠিক পথবঞ্চিত তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের মিথ্যাচার ও বিশ্বাসহীনতার সৃষ্টি হয়। আর মিথ্যাচার ডেকে আনে আধ্যাত্মিক মৃত্যু, কামানের কল্পনা করা, এর বারুদ ও আগুনের তোড়ে এর গুলি বক্ষভেদ করা, সে কল্পিত গুলির কল্পিত ছিদ্র দ্বারা কল্পনায় নিজ বক্ষকে নষ্ট করা, ক্রমান্বয়ে তা প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে তা সম্প্রসারিত করা এবং তাকে 'ফানা ফিল্লাহ' মনে করা কতই না দুঃখজনক। আল্লাহর সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ মিথ্যাচার এবং উদ্ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আপন আধ্যাত্মিক অবস্থার বিনষ্ট সাধন আবার তাকে 'ফানা ফিল্লাহ' মনে করা কোন ধরনের বেলায়েতের কাজ? এদের মনোভাব হল, মূর্দা যথা ইচ্ছা যাক, মোল্লার হালুয়া রুটি ঠিক থাক।

একটু ভাবুন। এ ধরনের আকিদা ও স্তরের লোকরা নূরী মুর্শিদের সমান কী করে হয়? বলুন তো, লোহার শিবলিঙ্গে কি জ্যোতি পতিত হয়? গুণগত জ্যোতি, না সত্তাগত জ্যোতি? সঠিক পথপ্রদর্শক জ্যোতি, না বাসেত্ব জ্যোতি? না অন্য কোনো জ্যোতির্ময় কিছুর জ্যোতি? যদি এর কোনোটাই না হয়, তা হলে কী কারণে আল্লাহর সাধনপথে অযথা চিন্তা করতে হবে, অবাস্তব ও মিথ্যা বা মিথ্যা কল্পনার দ্বারা আপন মনকে বিভ্রান্ত করতে হবে এবং নূরী মুর্শিদের মহব্বত ও ধ্যান, যা আল্লাহর সাথে মিলনের সার্থক ও ফলপ্রসূ পরীক্ষিত উপায়, তা ত্যাগ করতে হবে? বস্তুত যারা আল্লাহর সাধন পথে নূরী মুর্শিদের সাথে মনোসংযোগ স্থাপন করেনি, শয়তান তাদের মুর্শিদ সেজে তাদেরকে গোমরা করে। প্রবাদ আছে–"যার মুর্শিদ নেই তার মুর্শিদ হল শয়তান।" আল্লাহ সাধনে পীরই হলেন সত্য ও সঠিক পথের দিশারী এবং হাদী, এ ক্ষেত্রে কামান কল্পনার কোনোই প্রয়োজন নেই। কামানের এমন কোনো রূপ নেই যা শয়তান ধারণ করতে পারে না। অপরদিকে শয়তান মুর্শিদের রূপ ধারণ করতেই পারে না। এসব বিষয়ে আমার 'জামে নূর' দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

ধ্যানে কামান কল্পনার দ্বিতীয় দোষটি এই যে, নিজের ওপর কামান, গুলি অথবা তলোয়ারের আঘাত কল্পনা করা খারাপ ও অশুভ লক্ষণ। শুভ লক্ষণের পরিপন্থি। এর প্রতিক্রিয়া অশুভ। চুম্বকের প্রতিক্রিয়ার আলোকে চিন্তা করলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। জ্ঞানীদের কাছেও বিষয়টি গোপন নয়। উক্ত কথার সাথে যাদুকরেরও তেমন একটা তফাৎ নেই। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা– একদা পিঠেপিঠে সংযুক্ত অবস্থায় দুটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। জনৈক ব্যক্তি তলোয়ার দ্বারা উভয়কে আলাদা করে দেয়। তা দেখে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তারা সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকবে। অবশেষে তা-ই হয়েছে। তারা উভয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ারের আঘাতে মারা গেছে। এজন্যই নিয়ম হল যে, সন্তান জন্ম

হলে লোহা বা কোনো অস্ত্র দ্বারা নবজাতকের নাড়ি কাটা হয় না। কারণ তা হলে ভবিষ্যতে সন্তানের অমঙ্গল হতে পারে।

১৩০০ হিজরিতে কলকাতার মোহাম্মদী প্রেসে ছাপা 'হুক্কুল ইয়াক্কীন' পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় লেখক (মৌলভী কেরামত আলী) লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি ফাতেহার অনুষ্ঠানে মাতম করা বৈধ বলে হাদিস শোনাবে অথবা কোনো বেদআত কাজের বৈধতার সমর্থনে হাদিস বর্ণনা করবে সে ব্যক্তি দাজ্জাল– উক্ত গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন। অতএব কারও কবরে বাতি জ্বালানো, আলোকসজ্জা করা, চাদর ও শামিয়ানা টাঙানো, গম্বুজ নির্মাণ করা, কবর পাকা করা, তাতে কিছু লেখা বা পাথরে লিখে কবরে স্থাপন করা ইত্যাদি সবই বেদআত। তারই অন্য পুস্তিকা ১২৮১ হিজরিতে কলকাতা থেকে ছাপা 'রদ্দুল বেদআত'-এর ১২ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, এ দেশে মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতদের মধ্যে ফাতেহার অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো বেদআত দেখা যায় না। এর উদযাপনকারীরা এটাকে ন্যায় ও পুণ্যের কাজ মনে করে এবং তা থেকে তওবা করার কোনো ইচ্ছা তারা পোষণ করে না। 'উরস' ইত্যাদি এরই অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষণীয় যে, উক্ত লেখকের দাদা পীর হযরত শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) সাহেব সব সময়ই ফাতেহা ও উরস-এর অনুষ্ঠান করতেন। ফতুয়া আজিজী প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিবরণ রয়েছে। শাহ সাহেব মরহুম হাদিস দ্বারা 'উরস' এর মৌলিকত্ব প্রমাণ করেছেন। 'দোররে মনসুর' ও 'তফসীরে কাবরী' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হাদিস উদ্ধৃত রয়েছে। সে হাদিসটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক বছরের শেষে শহীদদের কবরস্থানে যেতেন এবং বলতেন, "তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ তার বিনিময়ে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের পরিণাম কতই সুন্দর।" চার খলিফাও অনুরূপ করেছেন। উক্ত শাহ সাহেব প্রত্যেক বছর তাঁর পিতা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রঃ)-এর 'উরস' করতেন। তাঁকে লক্ষ করে মৌলভী আবদুল করীম পাঞ্জাবী সাহেব লিখেছেন যে, তোমরা উরসকে ফরজ করে ফেলেছ। শাহ সাহেব এর জবাবে লিখেন, (১৩০০ হিজরিতে মুদ্রিত) 'জুবদাতুল নাসায়েহ' কেতাবের ৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, যাঁদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হচ্ছে তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগকারীদের অজ্ঞতাই এ অভিযোগের ভিত্তি। শরিয়ত দ্বারা নির্ধারিত না হলে কোনো কিছুকে কেউ ফরজ মনে করে না। পুণ্যবানদের কবরে কোরান পাঠ, দোয়া খায়ের ও শিন্নি বিতরণ যেমন পুণ্যের কাজ, কল্যাণের উদ্দেশে তাঁদের কবর যিয়ারত তেমনই শুভ ও উত্তম কাজ। আলেমদের মতে উরস উদ্‌যাপনের কারণ এই যে, ঐ দিন পুণ্যবান ব্যক্তিটি কর্মজগৎ থেকে প্রতিফলের জগতে প্রত্যাগমন করেছেন। তা ছাড়া শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং তাঁর পূর্বসূরিগণও উরস করতেন। গ্রাম-গঞ্জে পাওয়া যায় এমন অনেক কেতাবে এসবের প্রমাণ রয়েছে। আমাদের সময়ের কামেল ও হাক্কানী আলেম সমাজও এর পক্ষে রয়েছেন। মরহুম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভীর মাজমুউল ফতুয়া,

কেতাবে নাতিজা, ফতুয়া আজিজী, ফতুয়া ওদুদী, কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া ও আনোয়ারে সাত্বেয়াহ প্রভৃতি 'উরস' এর সমর্থনে বহু কেতাবে উদ্ধৃতি রয়েছে। এসব কেতাবের মধ্যে সিরাতে জাল্লি, গুনিয়াতুত তালেবীন, শরহে মায়ানিউল আছার, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, মুজমারাও, তাতার খানিয়া, মুলতাকাত, মাকতুবাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী, তফসীরে মুদারেক, তফসীরে বাইজাবী, তফসীরে কবীর, তফসীরে রুহুল বয়ান, তাহতাবী, আলমগীরী এবং শামী ইত্যাদি প্রধান প্রধান কেতাবগুলো উল্লেখযোগ্য। যে সব কেতাবের সাহায্যে 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ্' লেখা হয়েছে এ পুস্তকের পরিশিষ্টে সেগুলোর তালিকা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মিলাদের অনুষ্ঠান, তাতে কেয়াম করা, প্রচলিত উরস ও ফাতেহার অনুষ্ঠান করা, কবরে সৌধ ও গম্বুজ নির্মাণ, মৌলুদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা, সদকা খয়রাতের পুণ্য মৃতের কাছে পৌঁছা, তৃতীয়, চতুর্থ ও দশম ফাতেহা, বাৎসরিক ও অর্ধ বাৎসরিক চেহ্‌লাম, বিভিন্ন তারিখে স্ব স্ব স্থানে রূহের আগমন, বেদআতের প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও প্রমাণ করার উদ্দেশেই 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ্' কেতাবটি লেখা হয়। তাতে মক্কা-মদিনাসহ দেশ-বিদেশের অনেক আলেমের মন্তব্য ও দস্তখত রয়েছে। তাদের মধ্যে মরহুম শাহ হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব, জনাব মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব এবং জনাব মাওলানা আবদুল হক সাহেব, হিন্দুস্তানের অধিবাসী হিজরত করে মক্কা গিয়ে বসবাস করেন। তাঁর খুবই পরিচিত এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ চাহে তো এ পুস্তকের শেষাংশে মক্কা-মদিনার কয়েকজন মহান আলেমের মন্তব্যও উদ্ধৃত করা হবে। অন্যান্য আলেমদের মন্তব্যগুলো 'আনোয়ারে সাত্বেয়া'য় দেখতে পারেন। তাতে মিশর, বাগদাদ, ইস্তাম্বুল, পারস্য, ভারতবর্ষ, মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার প্রভৃতি দেশের আলেমদের উক্ত বিষয়াদি সমর্থনে এবং ওহাবিয়াত ধরনের বিষয়াদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মন্তব্য সহ দস্তখত রয়েছে।

এ অধম 'সফিনায়ে সফর' পুস্তকে সমকালীন মানুষদের উপকারার্থে পনেরোটি বিষয় গ্রহণ করেছি এবং সত্যসন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মন্তব্যসহ কয়েকজনের দস্তখত তাতে নিয়েছি। উক্ত বিষয়গুলো হল :

১. দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের পুণ্য অন্যকে পাঠালে পৌঁছে।
২. খাওয়া-দাওয়ার পর্বে বা শিন্নি উপলক্ষে ফাতেহা ও দোয়া-দরুদ পাঠ করা জায়েজ ও পুণ্যের কাজ।
৩. নির্ধারিত দিনটি ও তা উদযাপনের স্থান পবিত্র হওয়া প্রয়োজন।
৪. ধর্মীয় মুরব্বিদের নামে ফাতেহা পাঠ করা জায়েজ ও পুণ্যের কাজ।
৫. অলিদের জন্য মানত করা, খাবার খাওয়া ধনীদের জন্যেও জায়েজ।
৬. ফাতেহা পাঠ করার সময়ে হাত তোলা বৈধ।
৭. বাৎসরিক ফাতেহা অনুষ্ঠান এবং এজন্য দিন নির্ধারণ করা খারাপ নয়।
৮. মোস্তাহাব কাজ কখনো কখনো ওয়াজেব ও ফরজ হয়ে যায়।

৯. বৃহস্পতিবারে ফাতেহা পাঠের অনুষ্ঠান করার প্রমাণ আছে।
১০. দুই ঈদ, শবেবরাত, আশুরা প্রভৃতি যেসব দিবসে রূহ স্ব স্ব ঘরে প্রত্যাবর্তন করে সে সব দিবসে ফাতেহার অনুষ্ঠান করার প্রমাণ।
১১. মৌলুদের অনুষ্ঠানে কেয়াম করা সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর।
১২. 'উরস' এর প্রমাণ।
১৩. বেদআতের প্রকারভেদ।
১৪. সামাজিক রীতি-প্রথা পালন করা মন্দ নয়।
১৫. অধিক আলোকসজ্জা করায় দোষ তো নেই-ই বরং তাতে পুণ্য ও যথেষ্ট বরকত রয়েছে।

লক্ষ্ণৌর ফখরুল মাতাবে ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তক 'যাদুত্ তাকওয়া'-এর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় মৌলভী কেরামত আলী সাহেব লিখেছেন, প্রকৃত তাসাওফ অর্থ নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহতে মনোনিবেশ করা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে নিমগ্ন হওয়া এবং নিবদ্ধ থাকা। ত্বরিকতপন্থী শাইখ সম্প্রদায় তাসাওফের এরূপ অর্থই করেছেন। ফেকাহ, তাসাওফ ও কালাম শাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পৃক্ত। একটা ছাড়া অন্যটা সম্পূর্ণ হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না। ফেকাহ ছাড়া তাসাওফের অবয়ব তৈরি হয় না কারণ ফেকাহ ছাড়া আল্লাহর নির্দেশ জানা যায় না। অপরদিকে ফেকাহ ও তাসাওফ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। কারণ সনিষ্ঠ মনোনিবেশ ছাড়া কোনো কাজ সুসম্পন্ন হয় না। তবে তাসাওফ ও ফেকাহ কোনোটাই ঈমান ছাড়া শুদ্ধ হয় না। যেমন রূহ ও দেহ কোনোটাই একে অন্যটি ছাড়া অস্তিত্ব পায় না এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করে না। এ জন্য ইমাম মালেক (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাসাওফ গ্রহণ করেছে কিন্তু ফেকাহ গ্রহণ করেনি, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি কাফের। আর যে ব্যক্তি ফেকাহ গ্রহণ করেছে কিন্তু তাসাওফ গ্রহণ করেনি, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি ফাসেক। তবে যে ব্যক্তি উভয়টাকেই গ্রহণ করেছে সে ব্যক্তি অবশ্যই সঠিক পথে রয়েছে বা সত্যপ্রাপ্ত হয়েছে...ইত্যাদি।

এখন লেখক সাহেবের বক্তব্যের ধরনটা লক্ষ করুন। তিনি লিখেছেন যে, ফেকাহ, তাসাওফ এবং কালাম শাস্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পৃক্ত। একটা ছাড়া অন্যটা সম্পূর্ণ হয় না এবং পরিপূর্ণ রূপলাভ করে না ...ইত্যাদি। অতঃপর তিনি লিখেছেন যে, ফেকাহ ছাড়া তাসাওফ বোঝা যায় না এবং তাসাওফ ছাড়া ফেকাহ পূর্ণ হয় না। আর ফেকাহ ও তাসাওফ কোনোটাই শুদ্ধ হয় না ঈমান ছাড়া। যেমন রূহ ও শরীর কোনোটাই একটা অন্যটাকে ছাড়া অস্তিত্ব পায় না এবং পরিপূর্ণতা অর্জন করে না। এ কারণেই ঈমাম মালেক (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি তাসাওফ ধারণ করেছে কিন্তু ফেকাহ ধারণ করেনি সে ব্যক্তি কাফের, যে ব্যক্তি ফেকাহ ধারণ করেছে কিন্তু তাসাওফ ধারণ করেনি সে ব্যক্তি ফাসেক। এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেকাহ-ই হল ঈমান ও বিশ্বাস। কারণ যে জিনিস না থাকলে মানুষ কাফের হয় তা ঈমান ছাড়া আর কিছু নয়। অপরদিকে লেখক নিজেই তাসাওফকে ফেকাহর মূল

বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, তাসাওফ ছাড়া ফেকাহ পূর্ণ হয় না। কারণ নিষ্ঠা ও মনোযোগ থাকলেই তো যে কোনো কাজ শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়। এটাও তো উক্ত ইমামের বক্তব্যের পরিপন্থী হল। কারণ উক্ত ইমাম সাহেবের বক্তব্য তো এর বিপরীত।

উক্ত ইমাম সাহেবের এরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা কি বিশ্বাসযোগ্য? আর লেখকও কেনইবা নিজে বলতে অপারগ হলেন? অথচ এর পরই তিনি লিখেছেন যে, ফেকাহ এবং তাসাওফ ঈমান ছাড়া শুদ্ধ হয় না; যেমন রূহ ও শরীর... ইত্যাদি। এখানে ঈমাম সাহেবের বক্তব্যে ইমানের কোনো আলোচনা নেই; আছে ফেকাহ ও তাসাওফের কথা, আমরা যদি মেনে নেই যে, তাসাওফ ধারণ করার পরও কেউ কাফের হতে পারে তাহলে আহওয়াল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থাদি তাসাওফের বিষয়বস্তু কী করে হয়? অথচ লেখক হাল ও আহওয়ালকে ঈমান বলে উল্লেখ করেছেন। লেখক আবার 'নূরুল হুদা' পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, তাসাওফের আলোচ্য বিষয় হল আহওয়াল তথা সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থাদি। ঈমান, তাসদিক ও ইয়াকীন সবই আহওয়ালের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আহওয়াল যদি তাসাওফের মূল বিষয়ববস্তু হয় আর আহওয়ালই যদি হয় 'ঈমান' তাহলে ঈমান আহওয়ালের ওপর নির্ভরশীল আর কর্ম নির্ভরশীল ঈমানের উপর। সুতরাং ঈমান ছাড়া কোনো কর্ম শুদ্ধ নয়। অপরদিকে উপরে বলা হয়েছে যে, আহওয়াল ছাড়া ঈমান ও ইয়াকীন তথা দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। যেহেতু তাসাওফ ও ঈমান উভয়ই আহওয়ালের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু যে ব্যক্তি তা ধারণ করবে, তিনি কাফের হবেন এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক কথা ইমাম মালেক (রহঃ) বলবেন তা কী করে বিশ্বাসযোগ্য হয়?

তবে গ্রহণযোগ্য হত যদি বলা হত যে, যে ব্যক্তি তাসাওফ ধারণ না করে কেবল ফেকাহ ধারণ করে সে কাফের হবে। কারণ আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থা তাসাওফ ও ঈমান দুয়েরই মূল বিষয়বস্তু। মূল বস্তু ছাড়া তো ঈমান হতে পারে না। সুতরাং তাসাওফ ধারণ করেনি এরূপ ব্যক্তি তো কাফের হওয়ারই যোগ্য। বে-ঈমানকে যিন্দিক বা কাফের ও বিপথগামী বলা অন্যায় নয়। তাছাড়া তাকলিদি ঈমানদার অর্থাৎ নকল বিশ্বাসী ব্যক্তিও যিন্দিক বা কাফের হতে পারে। কারণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ বৈধ বা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তাকলিদপন্থীর উচিত তাসাওফ ধারণ করে তাকলিদি ঈমান থেকে মুক্তি লাভ করা। তা না করলে সে ব্যক্তি অবশ্যই যিন্দিক ও কাফের হবে। কারণ ফেকাহ্ শাস্ত্রে কাফের হওয়ার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং যে 'কুফর' থেকে কাফের প্রমাণিত হয়, সে ব্যক্তি কে? যার মধ্যে ঈমান ও ঈমানের মূল বর্তমান সে কাফের না যে তা থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ তাকলিদপন্থী সে কাফের? তবে, ফেকাহপন্থীরা কি তাকলিদি ঈমানদার? যদি তা হয়, তাহলে তা যে শুধু ঈমান নয়, তা তো ফেকাহপন্থীরাই বলেন। এমতাবস্থায় ইমাম মালেক (রহঃ) কী করে ঈমানদারকে কাফের আর কাফেরকে ঈমানদার

হওয়ার ধারণা পোষণ করতে পারেন? এটা হতেই পারে না। সম্ভবত কোনো অর্বাচীন তাঁর বক্তব্যকে উল্টা লিখেছে। আর যদি সত্যই তিনি তা বলে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন।

জনাব মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরীর ১২৮৬ হিজরিতে ছাপা 'নূরুল হুদা' পুস্তিকার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, মুকাল্লিদ তথা নকল বিশ্বাসী যখন তাসদিক তথা প্রত্যয় অর্জন করে তখন সে মুমিন হয়। কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তিতে মুমিন হয় না। যে ব্যক্তির তাসদিক তথা প্রত্যয় অর্জিত হয়নি সে আহলে সুন্নতদের মতে মুমিন নয়। তার দলিল হল, আহলে সুন্নতদের মতে বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য তাসদিক শর্ত। অপরদিকে মারেফাত ছাড়া তাসদিক অর্জিত হয় না। আর মারেফাত অর্জিত হয় না প্রমাণাদি ছাড়া... ইত্যাদি।

অপরদিকে উক্ত লেখক ইরফান তথা চাক্ষুষ পরিচয় দলিল তথা প্রমাণনির্ভর করেছেন। এটা অসঙ্গত ও অবান্তর। কারণ মারেফত অর্থ জ্ঞাত হওয়া। আর প্রমাণ দ্বারা প্রমাণসাপেক্ষ বিষয় প্রমাণ করাও দুষ্কর, তা দ্বারা কিছু সম্পর্কে জানা যেতে পারে, পরিচিত হওয়া যায় না। অতএব ইরফান ও দলিলের ব্যাখ্যাগত সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। বস্তুত গুণাবলিসহ সত্তাজ্ঞান বলতে যা বোঝায় কোনো বস্তুর সম্পর্কে সে স্বরূপ ও গুণাগুণ সম্পর্কে সে জ্ঞান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে বস্তুকে চেনা সম্ভব নয়, আর যখন উক্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সেরা হবে তখন ইলমে ইরফান দালিলিক প্রমাণের পরও যে অস্পষ্টতা থাকে তা দূর করে প্রমাণিতকে চিনতে পারে। এটাকে ইরফান বলা হয়। তা হলে সাধক আল্লাহর সত্তার সাথে পরিচিত হয়।

অতএব গ্রন্থকার লিখেছেন, কোনো ব্যক্তির যখন চাক্ষুষ জ্ঞান হল যে, তার একজন নির্মাতা আছেন এবং তিনিই সারা বিশ্বের নির্মাণকর্তা তখন সে তার তাকলিদের গণ্ডির মধ্যে থাকে না। এখানে গ্রন্থকার ঠিকই লিখেছেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার নির্মাতার পরিচয় পেয়ে যায়, তাহলে তিনি তার নিকট নির্দিষ্ট এবং পরিচিত হয়ে যান তখন সে ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকলিদের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। কারণ এক্ষেত্রে তার বিশ্বাসের ভিত্তি হল পরিচয় এবং প্রত্যয় যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে তিনি যে লিখলেন, 'কোনো নির্মাতা আছে' এটা তো একটি অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট কথা। বস্তুত এ ধরনের উপলব্ধি দ্বারা তো ইরফান, মারুফ ও স্পষ্টতার গণ্ডিতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাহলে সে ব্যক্তি তাকলিদের চৌহদ্দি পার হল কী করে? এটা অসঙ্গত বক্তব্য। অতঃপর তিনি এর ব্যাখ্যাও করেন এবং বলেন যে, এর উদাহরণ হল, কোনো এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল, তোমাদের স্রষ্টা কে? সে ব্যক্তি উত্তর দিল, আল্লাহ তা'য়ালা। আবার তাকে প্রশ্ন করা হল আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? সে উত্তর দিল, আল্লাহ তা'য়ালা। তা হলে সে মুকাল্লিদ অর্থাৎ নকল বিশ্বাসী হবে না। অতএব লেখকের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই ইরফানের মূল বিষয় এবং মর্মার্থ, তাঁর ধারণা মোটেই সঠিক নয়। কারণ

শ্রবণকর্তার শোনার উপর কারও ঈমান নির্ভরশীল নয়। কেননা শ্রবণ আর স্বীকারোক্তি দুটি ভিন্ন জিনিস। স্বীকারোক্তির জন্য শোনা শর্ত হলে ঈমানের জন্য অবশ্যই সাক্ষ্য শর্ত হত। লেখক স্বীকারোক্তিকে ঈমানের শর্ত থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা ঈমান হল আধ্যাত্মিক অবস্থা যা বলা ও শোনার ঊর্ধ্বে। তবে এখানে শ্রবণকারীর ঈমান আলোচ্য বিষয় নয় বরং জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির ঈমানের বিষয়টাই এখানে আলোচ্য। শ্রবণকারীর শোনার ওপর কারও ঈমান নির্ভরশীল নয় বরং ঈমান 'তাসদিক' এর ওপর নির্ভরশীল, যা ঈমানদারের আধ্যাত্মিক অবস্থা এবং যা ঈমানদারের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপতিত হয়। স্বয়ং ঈমানদারই এ অবস্থা সম্পর্কে জানেন এবং বোঝেন। অতএব শ্রবণকারীর শোনার ফলে স্বীকারোক্তিকারী কী করে তাকলিদের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে? এটা অপ্রাসঙ্গিক কথা।

অতএব বলা উচিত যে, প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমান কোনো দলিল সাক্ষী ছাড়াই অন্তর্স্থিত তাসদিকের নির্ধারিত স্থানে আপতিত হয়। এটা কোনো স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ ইকরার অর্থাৎ স্বীকারোক্তির পূর্বেই তাসদিক তথা মানসিক স্বীকৃতি হয়। সুতরাং তাসদিকের পর হাজার বার ইকরার করা হোক বা একবার করা হোক অথবা না-ই করা হোক, তাতে কোনো পরোয়া নেই। তবে তাসদিক একবারই যথেষ্ট, দ্বিতীয় বারের কোনো প্রয়োজন নেই। ঈমানের জন্য যদি ইকরার শর্ত হয়, তা হলে তা কতবার করতে হবে এবং আল্লাহর মাখলুকাতের সামনে যদি করতে হয় তা হলে পৃথিবীব্যাপী কী করতে হবে? অবশ্যই তা নয়। এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, তাসদিকের বিষয়বস্তু জ্ঞাত না হলে তাসদিক হবে না। অজ্ঞাত বস্তুর প্রতি বিশ্বাসটাই তাকলিদ। উল্লেখ্য, তাসদিকের জ্ঞান ও তা সংরক্ষণের জন্য আহওয়াল অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা অর্জন প্রয়োজন। উক্ত লেখক এখনও তাসদিক আর তাকলিদের মর্মার্থই বোঝেন নি। বিভিন্ন পুস্তক দেখে দেখে এসব লিখে থাকবেন। ফলে এর সীমা ও আদব রক্ষা করতে পারেন নি। একটু লক্ষ করুন, কোনো কোনো স্থানে তিনি নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। উক্ত পুস্তিকার ৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, অন্তর জ্যোতির্ময় না হলে নিজের এবং অন্যান্য বিশ্বের স্রষ্টার ক্রিয়াকর্ম, গুণাবলি এবং সত্তার অস্তিত্বের যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ বৈধ নয়। কারণ ঈমানের জন্য তাসদিক তথা অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় শর্ত। অথচ মুকাল্লিদের একটি শক্ত ধারণা হয় মাত্র। এটা সত্য যে, মুকাল্লিদের শক্ত ধারণা হয়। এ জন্য এটাকে তাকলিদ বলব। কিন্তু লেখকেরই কথা যে, ঈমানের স্বীকৃতির জন্য নিশ্চিত প্রমাণ আবশ্যক। এটাও তাঁরই কথা যে, আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থা অর্জিত না হলে তাসদিক হয় না। এমতাবস্থায় তাঁর কোন কথাটা ঠিক? জিজ্ঞাসিত ও জবাবদাতার জবাব থেকে জানা যাচ্ছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। এটা যদি ঈমান হয় তা হলে হিন্দু ও অগ্নিপূজক প্রমুখ তো প্রকৃত

ঈমানদার। কারণ তারাও তো এ কথার বাইরে নয়। আফসোস! লেখক মুমিন ও মুকাল্লিদকে একই মানে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও মুকাল্লিদ সমার্থক নয়। কারণ মুকাল্লিদের ঈমান হল অন্যের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর অনুমানভিত্তিক ধারণা।

আল্লাহ এক, সর্বপ্রকার উপমা, বন্ধন, কারণ ও স্থান সবকিছু থেকে পবিত্র এবং আকাশ ও পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি করেছেন, মুকাল্লিদ এ সব কীভাবে জানবে! তার তো না আছে আহওয়াল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থিতি, না আছে ইরফান তথা আত্মপরিচিতি। সে তো নিছক একটি অনুমানভিত্তিক ধারণার মুখাপেক্ষী। আর তাও তো সুস্থ বুদ্ধির ফসল নয়। কারণ যার ঈমানি ধ্যানে যে জিনিসের অবস্থিতি নেই সে জিনিসের কল্পনা করা অজ্ঞতা। অর্থাৎ যা অজানা, যার ধারণা, কল্পনা সম্ভব নয় এবং যা অজ্ঞাত সে বিষয়ে কীভাবে দৃঢ়বিশ্বাস হবে? বরং কোন জিনিস সংক্রান্ত বিশ্বাসের আপন দৃঢ় অবস্থানে আপতিত হওয়ার জন্য সে জিনিস স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাদিসহ জ্ঞাত হওয়া দরকার। তা না হলে কিসের ওপর ঈমান আনবে; তা তো কোনো বস্তুই নয়– যেমন ঘোড়ার আগুন।

বস্তুত আল্লাহর সগুণসত্তা যা আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তার জ্ঞান আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া কখনো তাসদিক হতে পারে না। অর্থাৎ, ঈমানদারের জন্য ঈমানের জ্ঞান আবশ্যক। আর তা-ই আহওয়াল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থিতি। অতএব, আহওয়ালে উত্তম-অধম স্তর হিসেবে ঈমানের স্তরে তারতম্য হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি শক্তিশালী আহওয়ালের অধিকারী তার ঈমানও শক্তিশালী এবং যথার্থ আর যে ব্যক্তি নিম্নস্তরের আহওয়ালের অধিকারী তার ঈমানকে বিলগাইব তথা অদৃশ্যে ঈমান বলা হয়। তবে তা-ও ঈমানে আহওয়াল বহির্ভূত শুহদী ঈমান অর্থাৎ চাক্ষুষ বিশ্বাস হলেও তা অদৃশ্যে ঈমানের মতোই তাকলিদি ঈমান।

উল্লেখ্য, শহুদ নিকট, প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অবস্থার নাম। শহুদের ক্ষেত্রেও উত্তম-অধম স্তর হিসেবে ঈমানের তারতম্য হয়। 'জামেনূর'-এ তার সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। মানসিক অবস্থা যে ঈমান, আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক তাও তাওলিদ এবং ইসলাম। বলা হচ্ছে-

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو اسلمنا ومايد خل الايمان فى قلوبكم -

("ক্বালাতিল আ'রাবু আমান্না, ক্বুল লাম তু'মেনু, ওয়ালাকিন ক্বূলু আস্‌লাম্‌না অমা ইয়াদ্‌খুলুল্ ঈমানা ফী ক্বুলুবি কূম্।")

অর্থাৎ, আরবরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি; বলুন, তোমরা ঈমান আননি, তবে তোমরা বল যে, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি বা ইসলাম এনেছি। কারণ, তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি। (সূরা হুজরাত-১৪)। মোদ্দাকথা আরবরা যখন বলল যে, আমরা ঈমান এনেছি তখন প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন, হে

মুহাম্মদ আপনি ওদের বলে দিন যে, তোমাদের এখনও ঈমান আনা হয়নি; বরং তোমরা আত্মসমর্পণ করেছ মাত্র, এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। অর্থাৎ তোমরা কেবল মুসলিম হয়েছ, ঈমানদার হওনি। কারণ তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আসলে অন্তরে প্রবেশ না করলে তা ঈমানই নয়। তবে তাতে ইসলাম হয়। এ কথা দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, মুসলিম মুকাল্লিদ বিল ঈমান অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে পরানুসারী। সুতরাং বোঝা গেল যে, ঈমানকে অন্তরে প্রবেশ করানোর জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন, তাও ঈমানের অন্যতম শর্ত। তবে তকলিদ তথা কেবল শ্রুতি অথবা প্রশংসা ও মর্যাদা সংক্রান্ত কাল্পনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস অর্জিত হয় তা বক্ষপটে আপতিত হয় এবং স্থায়ী হয় না; শঙ্কা, বিপদ অথবা অনিশ্চয়তার সময় তা উঠে যায়। যেমন হাঁড়ির পিঠে কোন জিনিস রাখলে থাকে না। আর ক্ষণিকের থাকাও কোনো থাকা নয়। একটু নাড়াতেই তা পড়ে যায়। অথবা রৌদ্রে তা শুকিয়ে যায়। এজন্য মুকাল্লিদদের ধর্ম ও ঈমান সদা টলটলায়মান। বস্তুত তাকলিদ এক প্রকার লবণাক্ত রসের মতো যা খাওয়ার যোগ্য নয়। ঈমানদার এ তাকলিদি অবস্থা অতিক্রম করার পর তাকলিদের অবসাদ থেকে নিস্কৃতি লাভ করে এবং তখন সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ এ অগ্রহণযোগ্য তাকলিদের কারণেই শত শত মুসলিম খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণ ধর্ম গ্রহণ করেছে। এসব লোক জানেই না যে, ধর্ম কি, ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং খ্রিষ্টবাদ আর হিন্দু ও মুসলিম কাকে বলে? এদের ঈমান, ঈমান নয়, তাকলিদ মাত্র। তারা জানে যে, শরিয়তে ঈমানের ক্ষেত্রে তাকলিদ বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও তারা তা মানে না।

উক্ত গ্রন্থকারের আরও কিছু বক্তব্যের ধরন লক্ষ করুন। 'মেফতাহুল জান্নাত' পুস্তকে ঈমানের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তার সারমর্ম হল- ঈমানের মূল উপাদান দুটি। যথা– (১) মৌখিক স্বীকারোক্তি ও (২) অন্তরের বিশ্বাস। তবে মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস না করলে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কাফের এবং আমাদের কাছে মুনাফেক। আর স্বীকার ও বিশ্বাস দুই করে সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন। এমতাবস্থায় গ্রন্থকারের কোন কথাটি সত্য? এখানে তিনি মৌখিক স্বীকারকারীদের কাফের ও মুনাফেক বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে যার অন্তরের বিশ্বাস নেই, কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তি আছে সে ব্যক্তি কাফের মুনাফেক। আর যার অন্তরে বিশ্বাস আছে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মুমিন। অতএব যে জিনিসের দ্বারা আল্লাহর কাছে মুমিন হয়, মানুষের কাছে সে ব্যক্তি মুমিন নয়, এ কথার ভিত্তি কী? তাহলে কি কাজ ও ঈমান মানুষকে জানানো ও প্রচার করা ঈমানের শর্ত ও মূল উপাদান? কারণ তার মতে স্বীকারোক্তি দ্বারাই ঈমানের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। অর্থাৎ তার বর্ণনা মতে বিশ্বাসজাত ঈমানটি কাল্পনিক বা ধারণামাত্র। তার অবশিষ্ট যথার্থতা স্বীকারোক্তি দ্বারা পূর্ণ হল। এ হিসেবে বোঝা যায়, মৌখিক স্বীকারোক্তিই ঈমানের

মূল ও মানদণ্ড। এজন্য তিনি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসজাত ঈমানকে কল্পিত আখ্যায়িত করেছেন।

গ্রন্থকারের অনুরূপ বক্তব্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। তাঁর রচনা 'মেফতাহুল জান্নাত' পুস্তকে তার বক্তব্যের লক্ষণীয় বিষয়টি হল– তিনি লিখেছেন প্রথম পরিচ্ছেদ ঈমানের বর্ণনায়, হে বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই অবগত হও যে, ঈমান হল সব পুণ্যকর্মের মাথা এবং সকল ইবাদতের মূল। আর বিশুদ্ধ ঈমান ছাড়া কোনো ইবাদত ও পুণ্যকর্ম বিশুদ্ধ হয় না এবং ঈমানের মূল উপাদান দুটি ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে ঈমানের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ঈমানের এমন কোনো পরিচয় তুলে ধরেননি যা দ্বারা ঈমানের কর্মস্থলের পরিচয় ও মর্মার্থ প্রতীয়মান হয়। কোনো বস্তুর সুস্পষ্ট জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সে বস্তুর বিভাজন এবং বিবরণ দেওয়া কী করে সম্ভব হয়? সম্ভবত তাঁর ঈমানের বিমূঢ়তাই তাঁর মুখে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি তাঁর 'নূরুল হুদা' পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজকে যেমনই কাজকর্ম বলা হয়, অন্তরের কাজকে তেমনই হাল ও আহওয়াল বলা হয় এবং ফেকাহ শাস্ত্রে যেভাবে কার্যাদির বর্ণনা করা হয় সেভাবেই তাসাওফে আহওয়াল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আহওয়াল তাসাওফের আলোচ্য বিষয়। ঈমান, তাসদিক, ইয়াকীন সবই এক এবং সবই আহওয়ালের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থকারের এ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অন্তরের কার্যাদি তথা আহওয়ালই ঈমান ও তাসদিক। তাঁর এ বক্তব্য সঠিক। কারণ কার্যাদি সম্পাদন ও হুকুম পালন করা মনোযোগ ছাড়া সম্ভব নয়। বরং মনের ওপরই কর্ম নির্ভর করে ঈমানের ন্যায়। ঈমান কর্মের ওপর নির্ভর করে না। বরং কর্মই ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। এবার লক্ষ করুন, লেখক সাহেব কীভাবে এ আকিদা থেকে আবার সরে যাচ্ছেন।

উক্ত পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, ত্বরিকতের পথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত অর্জিত হয়। ফলে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে দৃঢ়তা আসে। অতএব ত্বরিকত শরিয়তের কোঠায় প্রবেশের সিঁড়িস্বরূপ এবং ত্বরিকত শরিয়তের খাদেম। দরবেশী ও তাসাওফের মূল উদ্দেশ্যও এটাই।

এখন চিন্তার বিষয় হল এই যে, যা ঈমান ও বিশ্বাস তথা আহওয়াল তা কী করে শরিয়তের কোঠায় প্রবেশের সিঁড়ি ও খাদেম হয়? বরং যা মূল ও লক্ষ্য তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম হয়ে যাকে যেখানে আরোহণের জন্য সিঁড়ি প্রয়োজন হয়। আগে কামরা পরে সিঁড়ি এবং আগে প্রভু পরে তাঁর খাদেম প্রয়োজন। অর্থাৎ কর্মের পূর্বে ঈমান দরকার। গ্রন্থকার যাকে আহওয়াল এবং অনন্ত প্রভাব বলে উল্লেখ করেছেন। তা কী করে শরিয়তের কোঠায় গিয়ে ঠেকে গেল? তা হলে শরিয়তের সংজ্ঞা কী?

একি বিপদ যে, বার বার আহওয়ালে শহুদ অর্থাৎ সাধকের তত্ত্বে মগ্ন অবস্থাকে ইত্তেহাদ অর্থাৎ অদ্বিতীয় সত্তায় একীভূত ভাবা হচ্ছে। আক্ষেপ, তাওহীদ অহ্‌দাতে অজুদ অর্থাৎ অদ্বিতীয় সত্তায় একীভূত হওয়ার ব্যাপারে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই সে অজুদ, শহুদ, তাওহীদ এবং ইত্তেহাদ এর অর্থ কী করে বুঝবে? সাধনার ধারায় প্রথম হল সংকল্প বা ইচ্ছা, অতঃপর সাধনা, তারপর আহওয়াল, এরপর শহুদ এবং সর্বশেষ হল ইত্তেহাদ অর্থাৎ একীভূত হওয়া। যার চূড়ান্ত পরিণতি ও মর্মার্থ হল স্থবির ও নিশ্চলতা।

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি নিজেকে সাগরে উৎসর্গ করার ইচ্ছা করল এটা তার সংকল্প। অতঃপর সে সাগরের কূলে গেল, এটা তার চেষ্টা বা সাধনা। অতঃপর সে নৌকাযোগে সাগরের বুকে পৌঁছাল, এটা তার সাগর অবলোকন বা মুখোমুখি হওয়া। অতঃপর সাগরে হারিয়ে যাওয়াটা তার প্রাপ্তি এবং সব শেষে সাগরের সাথে হিম হয়ে জমে যাওয়াটা তার একাত্মতা। অতএব সাধনার ধারায়, এ বিভিন্ন অবস্থায়, যখন যে জ্যোতি প্রকাশিত হবে সে অনুযায়ী তার নামকরণ করা হবে। যথা কর্মজ্যোতি, ছায়াজ্যোতি, গুণজ্যোতি, সত্তাজ্যোতি এবং অনুরূপ হাজারো জ্যোতি জ্ঞান ও রকমারি অবস্থা তার থেকে প্রকাশিত হতে থাকবে। তবে এগুলোকে আল্লাহর গুণগত জ্যোতি বলা হলেও বস্তুত গুণের উৎস আল্লাহর সত্তা মূল থেকে ভিন্ন নয়।

সুফিদের পরিভাষায় 'শহুদ' একটি অবস্থার নাম যা গুণজ্যোতির প্রভাব ও প্রকাশ। কিন্তু ফানা তথা আত্মবিলীনান্তে যে অস্তিত্বটুকু অবশিষ্ট থাকে তা পরম সত্তারই প্রথম ক্ষেত্র। অতঃপর স্থবির নিশ্চলতা। এটা মোকামে বাক্কা অর্থাৎ স্থিতাবস্থার সারকথা। এখানে ফানা এবং বাক্কার কোনো অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে অস্তিত্ব আর অস্তিত্ব তথা জীবন আর জীবন। কেউ যদি হাজার বছরও চেষ্টা করে, তাহলেও এ অস্তিত্ব ফানা বা বিলুপ্ত হবার নয়। যে সত্তার অস্তিত্ব চিরন্তন কে তাকে ফানা করে? এটা পারে এমন কোনো প্রমাণ তো আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিষয়ের জ্ঞান একবার নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং তারপর যদি সে তা নিজে থেকে মুছে ফেলতে চায়, তা হলে সে কখনো তা পারবে না। হ্যাঁ, সে যদি কখনো তা ভুলে যায়, তাহলে সেটা হবে আলোর পরে অন্ধকারের মতো অর্থাৎ জ্ঞানের পর অজ্ঞতা, এটা বিলুপ্ত করা নয়। অতএব যে সাধক সত্তাপ্রাপ্ত ও একীভূত হতে পারে নি, সে তো সাধকই নয়। সে তো জ্ঞানশূন্য মূর্খমাত্র। বরং তাওহীদে ইত্তেহাদ অর্থাৎ একীভূত হওয়ার অস্বীকারকারী হিসেবে সে কাফের। কারণ সে স্রষ্টার সত্তার অস্বীকারকারী। আর পরম সত্তা ও তাঁর গুণাবলির অস্বীকারকারী আহওয়াল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থার অস্বীকারকারীও বটে। তবে সত্তার পরিচয় পাওয়া গেলে গুণাবলি যা তার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য এমনিতেই পরিচিত হয়ে যায়। অপরদিকে গুণাবলির পরিচয় ধরে সত্তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে কেবল তখনই যদি তাঁর ধ্যানে কামিল মুর্শিদ বর্তমান থাকেন। অন্যথায় হাজার

বছরও যদি গুণাবলিকে ধারণ করে রাখে এবং নিজেকে ফানা না করে তাহলে কখনো পরম সত্তার সন্ধান লাভ হবে না। এজন্য সাধক ব্যক্তিগণ তাজাল্লি অর্থাৎ জ্যোতিসমূহকে বিলুপ্ত করতে থাকেন। আবার যখন সত্তাপ্রাপ্ত হন তখন সেসব গুণাবলি তাঁর সামনে আবার ভেসে ওঠে। তখন আর এগুলোও বিলুপ্ত করা বা পরিহার করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে তখন এ গুণাবলির মধ্য দিয়েই পরম সত্তা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় এবং তখন তাঁকে বিলুপ্ত করার জন্য হাজার চেষ্টা করলেও তা বিলুপ্ত হবার নয়। যে বস্তুর বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব, তা সত্তা-ই নয়। অতএব যে ব্যক্তিসত্তা অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়ে গেছে সে অস্তিত্ব আল্লাহর, আল্লাহর সত্তার সাথে মজুদ তথা রক্ষিত হয়ে গেছে। তাঁকে নিত্য ও স্থায়ী বলাই যথার্থ হবে। কারণ অনুরূপ পরম সত্তায় পরিপূর্ণ একীভূত হওয়াই সকল অলির লক্ষ্য এবং উৎস। এমন কোনো অলি বা নবী নেই যার তাওহীদ ইত্তেহাদ তথা পরম সত্তায় মিলন হয় নি। কোরানের ঘোষণাটি লক্ষ করো; বলা হচ্ছে– وهو معكم اين ماكنتم (ওয়া হুয়া মাআ'কুম আইনামা কুন্‌তুম্) অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। (হাদীদ : ৪) কোরানের ঘোষণাকে এ গণিমত অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মহাসম্পদ মনে করো। এটা কালামে ইত্তেহাদি অর্থাৎ মিলন বাণী। তোমাদের যদি পছন্দ হয়, তাহলে এ মিলনমান যা নবী-অলিগণ লাভ করেছেন, তোমরাও নিজেদের সে সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে পার। তাহলে তোমাদের জন্যও এ মর্যাদা লাভ করা সহজ হবে। আর তোমরা যদি তা না পার তাহলে এ সংক্রান্ত যেসব রচনাবলি পাওয়া যায় তা গভীরভাবে অনুধাবন কর, তা হলে বুঝবে যে, এ বক্তব্য সেসব কবিতা ও কথার পিঠে লবণস্বরূপ যা মানুষ বুঝতে অক্ষম। তাঁদের উক্ত অসাধারণ বাক্যগুলো আমার অজানা হলেও আমি তার সৌজন্যবোধ থেকে বঞ্চিত নই। সে যাহোক, যারা লেখালেখি করেন অন্যের কথাকে নিজের বলে চালান, আবার তাতে হস্তক্ষেপ করেন, স্থানে স্থানে নিজ যোগ্যতা মোতাবেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, আমার বুঝে আসে না, কেন তাঁদের মধ্যে এরূপ আটা বা ময়দা দেখবার মনোবৃত্তি প্রবেশ করল। আক্ষেপ, পীর হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি অনুরূপ ভয়শূন্য হওয়া কি বৈধ? হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রা.) এবং হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী প্রমুখদের বক্তব্যকে নিজের ভ্রান্ত পথের সমর্থনে পেশ করা এবং ধূলাবৃত আবরণকে আকাশের মেঘ বলা কেমন কথা?

লক্ষণীয় যে, উক্ত গ্রন্থকার অজ্ঞ খরিদ্দারদের কাছে নকল স্বর্ণ বিক্রির মতো নিজ মুরিদদের জন্য বয়আ'ত নামে একটি মনগড়া শব্দ চালু করেছেন। এটাকে 'বয়আ'ত গ্রহণ বলা হয়। আবার তাকে 'অজীফা'র মতো পাঠ করান। তা এ রকম– আমি অমুক, অমুকের হাতে হাত রেখে চিশ্‌তিয়া, কাদরিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া এবং মোহাম্মদিয়া ত্বরিকা মতে বয়আ'ত করলাম। অমুকের হাতের স্থলে যিনি বয়আ'ত করান তার নাম বলা হয়। বলবেন কি এ বাক্যটি কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত? গ্রন্থকার তো হাদিসপন্থীদের বেদ'আতী এবং নিজের দাদাপীরকে

দাজ্জাল বলেছেন। দাজ্জাল তো কাফের। এমতাবস্থায় বয়আ'তে উচ্চারিত নিষ্ফল কথাগুলো যাতে কাঙ্ক্ষিত ত্বরিকাসমূহের নাম রয়েছে, সেসব ত্বরিকার কোন খলিফা অথবা খলিফার খলিফা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে পাঠ করান। এখন বলুন, এ দাজ্জাল কিনা? তওবা বা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য কোনো ছলনার প্রয়োজন আছে?

গ্রন্থকার 'নূরুল হুদা' পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, দরবেশি কোনো গ্রাস নয় যে, মুর্শিদ মুরিদের গলার ভিতর ঢেলে দিবেন। তিনি 'কওলুচ্ছাবেত' পুস্তকে লিখেছেন, যে ব্যক্তি শরিয়ত ও মারেফত উভয় প্রকার জ্ঞানে জ্ঞানী নয় তার কাছে বয়আ'ত গ্রহণ করা এবং তাকে খেলাফতনামা প্রদান করা বৈধ নয়। অনুরূপ ওহাবী, অমাযহাবী, ফরাজী, খারেজী এবং বেদ'আতী পীরজাদা যদি উভয় জ্ঞানে এবং মাশায়েখের মর্যাদাবঞ্চিত হয় তাদের কাছেও বয়আ'ত করা বৈধ নয়। বরং কেউ যদি অনুরূপ জাহেলের কাছে বয়আ'ত করেও থাকে তা হলে ঐ বয়আ'ত থেকে তওবা করা এবং তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তার ওপর ওয়াজিব। সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেন, واعرض عن الجاهلين (ওয়া আ'রাদু আ'নিল জাহিলীন) (আয়াত নং ১৯৯) অর্থাৎ, জাহেলদের থেকে নিবৃত্ত হও। এ ফকিরের মনে পড়ে আলোচ্য লেখক তাঁর কোনো এক পুস্তকে লিখেছেন যে, যে ব্যক্তির তাসাওফের জ্ঞান নেই সে যন্ত্রপাতিহীন ক্ষৌরকারের মতো এবং এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, লেখকের উক্ত নিষ্ফল বয়আ'ত বাক্যটি কি কোনো গ্রাস যে, দ্রুত তার সঙ্গে চার/পাঁচ ত্বরিকার বয়আ'ত সম্পন্ন করা হল? সাবাশ, এক দমে পাঁচ ত্বরিকা গলাধঃকরণ হয়ে গেল। অথচ বছরের পর বছরব্যাপীও এর যে কোনো একটি ত্বরিকার সফর ও সাধন শেষ করা দুষ্কর আর তা একদমে চূড়ান্ত। ভালো পীরজি তো বহুদিন থেকেই এ কাজ করছেন। তবে যে মুরিদকে আজই বয়আ'ত গলাধঃকরণ করানো হল সে এটাকে বাসি হতে না দিয়ে বরং অবিলম্বে অন্য লোকদের বয়আ'ত দ্বারা সম্মানিত করায় লিপ্ত হয়ে গেল। আচ্ছা দশটা লোক হাত করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে চারটি ত্বরিকার নামই তো যথেষ্ট ছিল। মোহাম্মদিয়া আবার কোন ত্বরিকার নাম, এর কার্যক্রম কী বা কোথায়, আমাদের দেখাবেন? আমার মনে পড়ে লেখক 'মোহাম্মদিয়া ত্বরিকা' নামকরণের এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, জনগণ জনাব সৈয়দ আহাম্মদ সাহেবকে মোহাম্মদিয়া ত্বরিকার নামকরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, প্রচলিত চারটি ত্বরিকাকে আমরা একত্রে মোহাম্মদিয়া ত্বরিকা নাম রেখেছি। কারণ, ঐ চারটি ত্বরিকার ওপর আমরা এভাবে আমল করি যেন চারটি ত্বরিকাই এক। আফসোস! যে যে ত্বরিকা স্ব স্ব রূপে বর্তমান, তা চারটি মিলে একটি হয় কী করে? তাহলে যার মাত্র দুটি ত্বরিকা হাসিল হয়েছে, তার নাম কি অর্ধ মোহাম্মদিয়া ত্বরিকা রাখা হবে? আর যার চারের অধিক ত্বরিকা হাসিল হয়েছে তার নাম কি ডবল মোহাম্মদিয়া ত্বরিকা রাখা হবে?

আসলে এটা একটা তামাশা। মূল কথা হল যে, ওহাবীরা নিজেদের 'মোহাম্মদিয়া' বলে থাকে। তারা প্রচার করে যে, আমাদের ত্বরিকা হল 'মোহাম্মদিয়া'। যাদের সন্দেহ হয় তারা 'তোহ্ফায়ে মোহাম্মদিয়া' ইত্যাদি দেখতে পারেন। অথচ তাতে না ক্রিয়াকর্মের কোনো পার্থক্য আছে, না তাদের নিজেদের নতুন সংযোজন আছে। অযথা ত্বরিকার নাম নিয়ে কী লাভ! প্রকৃতপক্ষে এটা যদি তাদের আবিস্কৃত নতুন কোনো ত্বরিকা হয়ে থাকে, তাহলে লেখকের মতে তা তো হারাম এবং এর অনুসারীগণ দাজ্জালের উত্তর কী? কারণ এটা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই এটা বেদআ'ত এবং বেদ'আত কাজ যে করে তাকে তিনি দাজ্জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া উল্লিখিত লেখকের সবগুলো পুস্তিকাই পরচর্চা, গালমন্দ ও বেহুদা কথায় পরিপূর্ণ। তাসাওফ ও বেলায়েতের আলোচনায় অন্যের দোষত্রুটির দিকে দৃষ্টি যায় কী করে? সময়টা তো এরূপ নয়। বস্তুত আরেফ ও কামেল ব্যক্তিগণ যখন কিছু লেখেন বা বর্ণনা করেন, তখন তারা নিজেকে সব ভালো-মন্দের থেকে আলাদা করে নেন এবং কেবলমাত্র আল্লাহর অনুকম্পার প্রতি নিবিষ্ট থাকেন। কাজটি যদি ফানা ফিল্লাহ ও বাক্কা বিল্লাহর মোকামের হয় তাহলে প্রত্যেকটি অক্ষরের মিলনের ফলে এবং বাস্তব লিপিরীতির ফলশ্রুতিতে তা থেকে তাওহীদ তথা ঐক্যের রচনাই বেরিয়ে আসবে। অথচ উক্ত লেখক সাহেবের জনৈক মুরিদ মুন্‌শি আবদুল আজিজ মুল্‌ফত্‌গঞ্জী সাহেবের বাংলা ভাষায় রচিত রুদ্দুল মুফসেদীন পুস্তিকায় যাতে আলোচ্য গ্রন্থকার জৌনপুরী সাহেবের কতিপয় মতামতসহ দস্তখত রয়েছে এবং যাকে তারা ফতুয়া বলে থাকেন, তাতে কলন্দরিয়া, মাজহারিয়া, শাদিয়া, মাদারিয়া, অজুদিয়া, শহুদিয়া প্রভৃতির মতো বড় বড় ত্বরিকার লোকদেরকে দোযখী, কাফের ও ফাসেক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তারা তা নন। তাহলে আলোচ্য গ্রন্থকার ও তাঁর মুরিদ কোন স্তরের বেলায়েত হাসিল করেছেন? শহুদ তো এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রেম, যা মা'শুকের গুণগত প্রতিফলনের মাধ্যমে ছায়া ও উপস্থিতরূপে মুখোমুখি হয়। তবে এটা আহওয়ালের মর্ম আর শহুদ হল তারই ফলন পর্যায়। এরপর সাধকের আহওয়ালের উৎস যখন বাস্তব হয়ে আসবে, তাঁর নাম হবে 'অজুদ' অর্থাৎ পরম সত্তা। অতএব ইতোমধ্যে যার সে 'অজুদ' অর্জিত হয়েছে, যে তার বিরুদ্ধে বলে সে মিথ্যাবাদী অথবা কাফের। কারণ সে প্রতিষ্ঠিত তথা যা প্রকৃত সত্যের অস্বীকারকারী এবং বিরোধী। এখানে সত্য অর্থ স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রকাশ যা স্বতঃসিদ্ধ সত্তার উৎস ও সার এবং মুর্শিদের একমাত্র মক্‌সুদ হলো তাতে নিজের প্রকাশ ঘটানো। মকসুদ হিসেবে পরম সত্তায় যখন প্রেমিকের সত্তা প্রকাশ পায় তখন তা ফানা ফিল্লাহর মানে পৌঁছে। আর পরবর্তী সত্তা যখন আদি সত্তায় প্রকাশিত হয় তখন তা হয় প্রকৃত বিকাশ। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ সত্তার বিকাশক্ষেত্র বান্দা আর বান্দার বিকাশক্ষেত্র হল স্বতঃসিদ্ধ সত্তা। এটাই হল স্বতঃসিদ্ধতার সূত্র। অর্থাৎ, মূলসমূহের স্থিতি এবং নশ্বর বস্তুসমূহের প্রকাশ

আদিস্তরে স্বতঃসিদ্ধ সত্তা থেকে না হলে এমন কোনো নাস্তিজগৎ থাকে না আল্লাহ ছাড়া, যা থেকে কোনো বস্তু প্রকাশ হতে পারে। অধিকন্তু এমন কোনো স্থান বা জায়গাও নেই যেখানে স্বতঃসিদ্ধ সত্তা মূলরূপে বর্তমান নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, দ্বিতীয় তথা নশ্বর বস্তুটি পূর্ব থেকেই অনাদি সত্তায় থাকা অপরিহার্য এবং অনাদি সত্তারও সবকিছুই আদি উৎস হওয়ার কারণে পরবর্তী বস্তুসমূহে প্রকাশ ও অবস্থান অনিবার্য। এটা কখনো ফানা বা বিলীন হবার নয়। অর্থাৎ বান্দার বিলীনান্তে যা অক্ষুণ্ন থাকে তা মূল স্বতঃসিদ্ধর ফসল এবং গোপনীয় অংশ; যেমন রূহ এবং রূহের রূহ অনাদি সত্তা। তা না হলে যে বস্তু আল্লাহ থেকে অস্তিত্বশীল নয় তা কোথা থেকে অস্তিত্ব লাভ করবে? বিশেষ করে স্রষ্টা এবং তাঁর খাস মাখলুকের মধ্যে একটি আদি রহস্যময় বিভেদ রয়েছে যা প্রেমরবিতে মনোযোগ প্রদানের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য সে উভয় পক্ষের এক পক্ষকে আশিক ও অপর পক্ষকে মা'শুক বলা হয়। এ কারণে একে অন্যের মাহবুব এবং প্রকাশস্থল হিসেবে গণ্য। গ্রন্থকার এর কাছেও যায় নি।

উক্ত পুস্তিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লেখেন, যখন বোঝা গেল যেসব আহওয়াল তথা আধ্যাত্মিক অবস্থাদি তাঁর সিফাত তথা গুণাবলি থেকে প্রকাশিত তখন কর্মসমূহে দৃষ্টি পড়ে না তাঁর গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি যায় গুণাবলি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং বান্দার গুণাবলিকে আল্লাহর গুণাবলির ছায়া মনে করা হয়। এতে বিবরণটা প্রায় সঠিক হয়। এটাকে গুণাবলির জ্যোতি বলা হয়। এ সময়ে সাধক তুষ্ট ও সমর্পিত অবস্থা ধারণ করে... ইত্যাদি।

এখন লেখকের উপলব্ধি, যোগ্যতা এবং সাধনা সিদ্ধি সম্পর্কে চিন্তা করুন; তিনি লিখেছেন, যখন বান্দার ওপর আল্লাহর গুণাবলি প্রকাশিত হয় সে অবস্থায় বান্দার গুণাবলিকে আল্লাহর গুণাবলির ছায়া মনে করা হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার মূলের অনুরূপই হয়। এ কারণে মূলের হুবহু প্রতিচ্ছায়াই আয়নাতে প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব বান্দার গুণ যদি আল্লাহর গুণের ছায়া হয় তাহলে সত্তা ও মূলও একে অন্যের ছবি ও ছায়াই হবে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার ছায়া বান্দার সত্তা এবং মূলের ছায়া মূল। যখন আল্লাহর ছায়া থেকেই সব সৃষ্টি এবং সৃষ্টিজগৎ হয় তাহলে তার উৎসমূল হবে ছায়া। এমতাবস্থায় কোনো বান্দা যদি তাতে ফানা ও মিলিত হয় তার নাম ফানা ফিল্লাহ হবে না, হবে 'ফানা ফিল আক্‌স' অর্থাৎ ছায়াতে বিলীন হওয়া। সুতরাং এটাও বলা সঙ্গত হবে না যে, যেখানে আল্লাহর নূর আছে সেখানে সত্তাও আছে। নূরে যদি সত্তাও থাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, নূর সূর্যের মতোই মৌলিকবস্তু উত্তপ্ত সীসা বা আয়না সূর্যরশ্মির বিপরীতে ধরলে তৎক্ষণাৎ তা থেকে আগুন বেরিয়ে আসবে। এতে জানা যায় যে, সূর্যের প্রকৃতি অগ্নিময় এবং এর সত্তায় আগুন বর্তমান। তা না হলে এর ছায়া থেকে কী করে আগুন বের হবে! এমতাবস্থায় ছায়া ও আগুন উভয় বস্তুর একই উৎসের সাথে সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। তা না হলে তা থেকে আগুন বের

হওয়া সম্ভব হত না। এ মৌল উৎসের ব্যাখ্যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা ইশারা করছেন, سنرهم ايا تنا فى الا فاق وفى انفسهم (সাতুরীহিম আয়াতিনা ফিল্ আফাক্কি ওয়া ফি আন্‌ফুসিহিম) অর্থাৎ, অচিরেই আমরা বিশ্বময় এবং তাদের নিজেদের আমাদের নিদর্শনাদি দেখাব। (সূরা হামিম সেজদা-৫১)। অর্থাৎ, তোমরা যেমনই দেখছ যে, সূর্যরশ্মি তোমাদের আশেপাশে চমকাচ্ছে তেমনই অচিরেই তোমাদের উত্তপ্ত আয়নারূপ আত্মায় আমাদের নিদর্শনাদি উদ্ভাসিত করব। এ ব্যাপারে তোমাদের সৌকর্য না থাকলে এ বিষয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে তাঁদের শরণাপন্ন হও। তাহলে এটা বোঝা তোমাদের জন্য কঠিন হবে না। আল্লাহ বলেন,

وفى الارض ايات للموقنين وفى انفسكم افلا تبصرون - (ওয়াফিল আরদি আয়াতিলিল্ মূক্কেনীন ওয়াফী আন্‌ফুসিকুম আফালা তুবছিরুন) অর্থাৎ, নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে নিদর্শনাদি বর্তমান তোমরা কি তা অবলোকন করো না। (সূরা বারায়াত-২০) তোমরা যদি এটা মান তাহলে এ বিষয়ে রাসূলের বাণীতে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তিনি বলেন, من عرف نفسه فقد عرف ربه (মান্ আ'রাফা নাফ্‌সাহু ফাক্বাদ আ'রাফা রাব্বাহু) অর্থাৎ, যে নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকেও চিনেছে। এ বাণীতে বিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণিত এবং মূলনীতির বিচারে যথার্থ। আল্লাহর নূর ও ছায়ার মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক আহলে ইয়াকীন তথা প্রত্যক্ষবিশ্ববাসীদের ছায়ার সাথেও একই রূপ সম্পর্ক। উত্তপ্ত কাচের ছায়া থেকে যেহেতু আগুনের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেহেতু সূর্যের ছায়া থেকে কাচে আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ অনস্বীকার্য। যেহেতু কাচের ছায়াটি সূর্যের ছায়ারই ছায়া, সেহেতু বস্তুত একই ছায়া দুভাবে পতিত হয়েছে মাত্র। এ হিসেবে 'ফানা ফিশ্ শাইখ' অর্থাৎ মুর্শিদে আত্মবিলীন ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহতে বিলীন হওয়ারই প্রতিবিম্ব এবং সংমিশ্রণ। মাওলানা রুমী বলেন– چونکه ذات چیر راکر دی قبول هم خدادرزاتت امد هم رسول - (চুকে জাতে পীরেরা কারদি কবুল। হাম খোদা দর জাতাত আমদ হাম রসূল।) পীরের সত্তা তুমি যবে করিলে গ্রহণ প্রবেশিল তোমাতে আল্লাহ রাসূল উভয় অনুক্ষণ। অতঃপর মাওলানা রুমী আরও স্পষ্ট করে বলেন, এর আরও বিশ্লেষণে কলম স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাধক জ্যোতিস্তর অতিক্রম করে সয়ম্ভুমূলে অধিষ্ঠিত হলে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণের ভাব উদয় হয়। এটা এ সোপানের চূড়ান্ত পর্যায়। অতপর আল্লাহর কৃপা লাভের সৌভাগ্য হলে মূলের পথে তার যাত্রা শুরু হবে।

গ্রন্থকার লিখেছেন যে, গুণজ্যোতি থেকে আত্মতুষ্টি ও সমর্পণ লাভ হয়। তিনি যিল্লুন্ শব্দের যে অর্থ লিখেছেন তা তো বোঝা গেল। কিন্তু প্রতিবিম্ব বা ছায়ার অর্থ সত্তা আয়ত্ত হলেই কেবল বোঝা যেতে পারে। অপরদিকে এটাও বোঝা গেল যে, আল্লাহ সত্তা ও গুণ উভয়রূপেই সৃষ্টিতে আবিষ্ট এবং বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব রূপে আল্লাহর সত্তায় বর্তমান। যেমন আগুনের দহন শক্তি

আগুনের মধ্যে বর্তমান থাকার নামই আগুন। তাছাড়াও আগুনের অনেক গুণ রয়েছে। সেগুলোকে ছায়া, প্রতিরূপ অথবা সত্তার বৈশিষ্ট্য যা-ই বলুন, যথার্থ হবে। উদাহরণস্বরূপ দাহ, ধুঁয়াচ্ছন্নতা, আলো এবং রঙ ইত্যাদি সবই আগুনের সত্তা থেকে প্রকাশিত হয়। একভাবে নয়; হাজারও ভাবে তা প্রকাশিত হয়। আগুনকে অন্য কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত করা হলে উভয়েরই রঙ-রূপ অবশ্যই বদল হবে। কখনো বদল হবে তার রঙ আবার বিভিন্নতা দেখা যাবে তার দাহিকা শক্তিতে। এমনকি কোনো কোনো সময়ে আগুনের তাপও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তাতে সৃষ্টি হয় শীতলতা। তখন তার গুণাগুণ ও ছায়াতেও পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তার প্রকৃতিতেও আসে তারতম্য।

মুহিত্ব বা বেষ্টনকারী অথবা আবিষ্ট অর্থ সমস্ত সৃষ্টির উৎসে আল্লাহ সত্তায় যুক্ত এবং সৃষ্টি বিলুপ্ত হলেও আল্লাহর পবিত্র সত্তা বর্তমান থাকে। والله بكلى شى محيط - (ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন মুহিত) অর্থাৎ বর্তমান, অবর্তমান, নতুন, পুরাতন, ভারী, হালকা, ব্যক্তি, নূর বা আগুন নির্বিশেষে সমস্ত বস্তুর মধ্যেই আল্লাহ তায়ালার আপন পবিত্র সত্তাসহ বর্তমান (সূরা নিসা-৪) এ বিষয়ে অধিক আলোচনা বা বিতর্কের কোনোই অবকাশ নেই। এ বিষয়ে কেউ কিছু লিখে থাকলে তিনি তার যোগ্যতা অনুসারেই লিখেছেন। তাই বলে যে কেউ কেউ এ বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে কেন? তবে যিনি আহলে হক্ব অর্থাৎ পরম সত্যের ধারক, এ বিষয়ে তিনি যা বলবেন এবং যেভাবেই বলবেন, সকলেই তা বুঝবে। এজন্য তাঁরা মুখ বন্ধ করে রাখেন। তাই তো রাসূল বলেন, من عرف الله كا لسانه (মান আরাফাল্লাহু কালিছানাহু) অর্থাৎ, যিনি আল্লাহর পরিচয় পেয়েছেন তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। আপন আধ্যাত্মিক অবস্থাই বলে দেয় যে, এ স্তরটি আলোচনার ঊর্ধ্বে।

একটি ইশতেহার

ফকিরের রচনা 'সফিনায়ে সফর' এবং 'জামেনূর' পুস্তকে কোরানের আয়াত। كل شئ اليه ترجعون (কুল্লি শাইয়িন ইলাইহি তুরজাউন)-এর স্থলে (কুল্লু সাইয়িন ইয়ার জিউইলা আছলিহি) كل شئ يرجع الى اصله লিখা হয়েছিল। এটা ফকিরের ভুল হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরীর কয়েকটি কেতাবের একটি ইশতেহার বাজারে ছাড়া হয়। ইশতেহারটির নাম দেওয়া হয় 'তোহ্‌ফায়ে কেরামতি'। তাতে লেখকের কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়, যা তিনি তাসাওফের ব্যাখ্যা এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান প্রসঙ্গে তাঁর কেতাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত কেতাবগুলো কোন প্রেসে ছাপা হয়েছে, ইশতেহারটিতে তা উল্লেখ নেই। এজন্য এখানেও প্রেসের নাম উল্লেখ করা হল না। এখানে তাঁর বাক্যগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

'তাযকিয়াতুল আকায়েদ'-এর ৭৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, قل كل يعمل على شاكلته (ক্বুল কুল্লুয়্যা'মালু আ'লা শাকেলাতিহি) অর্থাৎ হে রাসূল আপনি বলে দিন যে, প্রত্যেকেই নিজের মতো কাজ করে। অর্থাৎ বেলায়েতের মর্যাদা এক রকম আর নবুয়তের মর্যাদা আর এক রকম। এর দ্বারা কোনো আহাম্মক যেন বেলায়েতের মর্যাদাকে খাটো মনে না করে। কারণ আল্লাহর প্রেমের নাম হল 'বেলায়েত'। অতঃপর তিনি লিখছেন যে, বেলায়েতিপ্রাপ্ত অবস্থায় সাধক আল্লাহর প্রেমে ও মহব্বতে এমনই বেহুঁশ হয়ে যান যেমনই বেহুঁশ হয়ে যায় কাফের দুনিয়ার মহব্বতে। সুব্হানাল্লাহ! এটা কি খাঁটি মহব্বত?

'যাদুত্ তাক্ওয়া'র ১৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, সুফিদের জ্ঞানের বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আহওয়াল অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক অবস্থাদিই হল সুফিদের জ্ঞান। অর্থাৎ, তাসাওফ শাস্ত্রে আহওয়ালের আলোচনাও বর্ণনা হয়। যেহেতু আহওয়ালই মূল সেহেতু তা উত্তরাধিকারও বটে। তাসাওফের কেতাবসমূহে যে সব ইঙ্গিতমূলক বাক্যাদির বর্ণনা করা হয়, যথা– মিলন, বিচ্ছেদ, জ্যোতিভেদ, নির্জনতা, একাকীত্ব, জযবা, সত্তা প্রভাব, প্রত্যক্ষণ, বেহুঁশি, ইল্মুল ইয়াক্বীন, হাক্কুল ইয়াক্বীন, সময়, অনুপস্থিত, উপস্থিত, সুধার স্বাদ, মুখোমুখি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, পরস্পর প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি সব আহওয়ালে কলবি অর্থাৎ মনের বিভিন্ন অবস্থা। যাদুত্ তাকওয়ার ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখা হয়– তারই বক্তব্য, শোনো– কাশ্ফ এবং মোশাহেদাহ্ মূলত এই যে, অলি আব্দালগণের উপর জ্যোতির্ময় আল্লাহর কার্যাদি থেকে এমন সব বস্তু প্রকাশিত ও উন্মোচিত হয়, যা বুদ্ধিকে পরাজিত করে দেয় এবং সমস্ত স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতিকে করে দেয় ছিন্নভিন্ন। অর্থাৎ উক্ত অবস্থাদিতে স্বাভাবিক নিয়ম-নীতি ও রীতি-পদ্ধতির কথা স্মরণই থাকে না। অর্থাৎ সে অবস্থায় মাহবুবের শোভা দর্শন ছাড়া অন্য কিছুর খেয়াল ও হুঁশই থাকে না। উল্লেখ্য, আল্লাহর উক্ত কার্যাদি দু প্রকার জালাল অর্থাৎ তেজস্কর এবং জামাল অর্থাৎ স্নিগ্ধ ও শোভাকর। আল্লাহ তা'য়ালার জালাল ও আজমত গুণের প্রকাশকে 'কাশ্ফ্' বলা হয়। এ থেকে ভয়, অস্থিরতা ও অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং এমন ভীতির সঞ্চার হয় যে, তার হুঁশ থাকে না। তার মনকে আল্লাহর জালাল ও আজমত দখল করে ফেলে। ফলে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভয় ও অস্থিরতা প্রকাশ পায়। যেমন হাদিস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) এর বক্ষ মোবারকের ভিতর থেকে রান্নার উত্তপ্ত হাড়ির মতো শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা যেত। মাসায়েল তিরমিজির মা যাআ ফিল বাকাই রাসূল (সঃ) পরিচ্ছেদে হাদিসটি দ্রষ্টব্য।

লেখক তাঁর 'কাওলুচ্ছাবেত' পুস্তিকায় ১৫ পৃষ্ঠায় মাকতুবাতে মুজাদ্দেদির বরাত দিয়ে লিখেছেন, العلما وارث انبيا (আল উলামা ওয়ারিছু আম্বীয়া) অর্থাৎ, যে আলেম ইলমে আহকাম অর্থাৎ, জাহেরী বিদ্যা এবং ইলমে আসরার অর্থাৎ বাতেনী বিদ্যা উভয় বিদ্যায় বিদ্বান তিনি নবীর ওয়ারেছ; উক্ত উভয় বিদ্যায় যার জ্ঞান নেই সে আলেমই না। আর যেহেতু সে আলেম নয়, তার মুর্শিদের মর্যাদাও নেই। কিন্তু

যে ব্যক্তি পাঠ্য কেতাবাদি পাঠ করেনি, তবে উভয় বিদ্যায় বিদ্বান মুত্তাকি আলেমের সাথে থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি মুর্শিদ হতে পারেন এবং তাঁকে আলেম বলা হয়। এরূপই মনে হয়, বাকিটা 'কাওলুল জামিল'-এ দেখুন।

'কাওলুচ্ছাবেত'-এর ৪১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন, যে ব্যক্তি উভয় বিদ্যার আলেম নয় তার কাছে বয়আত গ্রহণ করা এবং তাকে খেলাফতনামা প্রদান করা জায়েজ নেই। অনুরূপ ওহাবী, লা মাযহাবী ফরাজী, খারেজী, বেদআতী, পীরজাদাও যদি উক্ত উভয় প্রকার বিদ্যায় আলেম না হয় এবং শাইখের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাদের কাছেও বয়আত গ্রহণ বৈধ নয়। বরং কোনো ব্যক্তি অনুরূপ জাহেলের হাতে বয়'আত করে থাকলে তা থেকে তওবা করা ওয়াজেব এবং বয়'আতকারীকে তার থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আ'রাফে বলেন, واعرض عن الجاهلين (ওয়া আ'রদা আনিল্ জাহেলীন) অর্থাৎ, জাহেলদের থেকে নিবৃত্ত হও।

উক্ত পুস্তিকার ১৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, ইল্মে মোকাশেফা দ্বারা অদৃশ্য বস্তু দেখা যায়। আমরা আইনুল ইলম এর ভূমিকা থেকে এর বর্ণনা দিচ্ছি; শোনো– তাতে বলা হয়েছে, পরকালের জন্য উপকারী গ্রহণযোগ্য বিদ্যা দু প্রকার। এর একটি ইল্মে মোকাশেফা। এটা এক প্রকার নূর যার ভিতর বাহির পবিত্র মুমিনের অন্তরে বিকশিত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তা মুমিনের অন্তরে ঢেলে দেন। ফলে এমনকি তিনি হযরত আবু বকরের (রাঃ) ঈমানের সমমানে পৌঁছে যান। তখন তিনি উক্ত নূরের দ্বারা অদৃশ্যকে দেখতে পান। এমনকি তাঁর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নূর প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সত্তা ও কার্যাদির প্রকৃত পরিচয় ও আখেরাতের প্রকৃত অবস্থাদি তার কাছে এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যেন তিনি তা চাক্ষুষ দেখছেন। ইল্মে মোকাশেফা প্রমাণিত বিদ্যা। হাদিসে আছে– যখন মানুষের অন্তরে নূর প্রবেশ করে তখন তার অন্তর প্রসারিত হয়ে যায়। এর পর তিনি লিখেছেন, ইল্মে মোকাশেফার ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এর ব্যাখ্যায় কোনো হাদিস পাওয়া যায় না। হাদিসে এতটা উল্লেখ আছে, এমন কিছু বিদ্যা রয়েছে, আল্লাহর মারেফতওয়ালাগণ ছাড়া কেউই তা জানে না। ইল্মে মোকাশেফা উত্তম ইল্ম এবং এ ইল্মই মকসুদ। কারণ ইল্মে মোকাশেফা আল্লাহর জাত, সিফাত এবং কার্যাদির সাথে সম্পৃক্ত।

উক্ত 'কাওলুচ্ছাবেত' এর ১২৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, দেখো! চিশ্তিয়া ও কাদ্রিয়া ত্বরিকার অগ্রজগণ যিক্রেজলি গ্রহণ করেছেন। মুর্শিদ-ই বরহক্ক-এর 'মলফুজাত সিরাতুল মুস্তাক্বীম'-এ বিস্তারিতভাবে তার উল্লেখ রয়েছে। এ অধম স্বল্প অবসরের লোকদের জন্য উচ্চৈস্বরে যিকির পদ্ধতি চালু রেখেছি। আমি নিজে যেসব শিষ্যকে যিকির চর্চা করাই তা নক্শবন্দিয়া ত্বরিকা অনুসারে করিয়ে থাকি এবং আমি নিজে তিনটি ত্বরিকাতেই মুরিদ ও মুরিদ করিয়ে থাকি। সুতরাং শিষ্যগণের

উচিত উচ্চৈঃস্বর এবং নিঃশব্দ উভয় পদ্ধতির যিকিরকে বৈধ এবং উত্তম মনে করা এবং মুর্শিদ যেভাবে তা'লিম দেবেন সেভাবেই যিকির করা এবং মোরাকাবায় মশগুল থাকা।

অন্যান্য প্রসঙ্গ

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, প্রতারক লোকদের অন্যের বক্তব্য বিকৃত করা এবং অদলবদল করে দেওয়ার মাত্রা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে; উদ্ধৃতি করে এবং বাক্য বাদ দিয়েই তারা ক্ষান্ত নয়, অনেক কেতাবের পরিচ্ছেদ ও উপ-পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তারা কেতাব থেকে সরিয়ে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'হেদায়েতুল ইসলাম' পুস্তকটির কথা আলোচনা করা যায়। এটা জনাব মরহুম মাওলানা আমানতুল্লাহ দেহলবীর হিন্দি ভাষায় লেখা একটি পুস্তক। সম্ভবত তিনি হযরত শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের পৌত্র। তাতে মহান অলিদের উদ্দেশে ফাতেহার উল্লেখ ছিল। যেমন ফাতেহা-ই-কন্দরী অর্থাৎ পয়গম্বর (সঃ) এর ঘরানা সাত পুণ্যবতী তথা হযরত বিবি ফাতেমা, আয়শা, হাফসা, হনুফা, জয়নব প্রমুখ এবং মহান অলিদের ফাতেহার নাম এবং তাতে নামাজের নিয়তের মতো নিয়ত করার কথা লেখা ছিল। সেসব নিয়তই তারা উক্ত কেতাব থেকে গায়েব করে দিয়েছে। এ শতাব্দীর পূর্বে যখন কেতাবাদি হিন্দি অক্ষরে ছাপা হত তখনকার অর্থাৎ ১২১৮ সনে ছাপা উক্ত কেতাবের একটি কপি বর্তমানে এ ফকিরের নিকট রয়েছে। তাতে ফাতেহার নিয়তের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের বদলাবদলির সামান্য নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল।

জনাব মরহুম হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেবের কতিপয় রচনার একটি সংকলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'কুল্লিয়াতে এম্‌দাদিয়াহ্‌'। এতে তাঁর লেখা 'রেসালা-ই-অহ্‌দাতে অজুদ' এবং 'রেসালা-ই-হাফ্‌তে মাসায়েল' দুটি পুস্তিকাই ওহাবীরা মুদ্রণের সময়ে উক্ত সংকলন থেকে বাদ দিয়েছে। কারণ এ দুটি কেতাবই ওহাবীদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তাতে অহদাতে অজুদকে বেলায়েতের মূল ও উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রেসালায়ে হাফ্‌তে মাসায়েলেও কয়েকটি বিষয় তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। যেমন তাতে মিলাদ অনুষ্ঠান, মিলাদে কেয়াম, ফাতেহা এবং উরস প্রভৃতির পক্ষে ফতুয়া রয়েছে। এ কারণে উক্ত দুটি পুস্তিকাই উক্ত সংকলন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংকলনের নামটি পূর্বে যা ছিল তা-ই রাখা হয়েছে। যার ইচ্ছা সংকলনটির প্রথম মুদ্রিত কপির সাথে ওহাবীদের মুদ্রিত কপি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

তাছাড়া তাদের সমালোচনার শেষ নেই। অসংখ্য স্থানে তারা কোরান ও হাদিসের তোয়াক্কা না করেই নিজেদের মতলব পেশ করেছে। তারা তাদের মতলব ও উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে গিয়ে হীনরূপে নিজেদের জেদ ও আত্মগর্বের পরিচয় দিয়েছে। লক্ষণীয় যে, তারা কোরানের সর্বত্র আরবি ض দোয়াদকে আরবি

উচ্চারণে পাঠ করে। কিন্তু সূরা ফতেহার ضالين ('দা-ল্লিন' এর ض) দোয়াদকে হিন্দি উচ্চারণে (জাদ) পড়ে থাকে। তাদের এ জেদ তারা নামাজেও বহাল রাখে। এ হল তাদের জেদ ও ঝগড়ার নমুনা। এবার তাদের প্রজ্ঞার কিছু নমুনা লক্ষ করুন। কোরানের বেশ কিছু আয়াত ও কয়েকটি হাদিসকে তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে ব্যবহার করেছে। ফলে সাধারণের ধারণা হতে পারে যে, তাদের বক্তব্যগুলো যথার্থ কোরানের আয়াত এবং হাদিসের অনুরূপ এবং এর অন্যথা করা কোরান ও হাদিসবিরোধী কাজ। তাদের লেখায় এসব হাদিসের ব্যাখ্যায়– স্থান, কাল অথবা প্রেক্ষিত মোটেই বিবেচনা করা হয়নি। রাসূলের অনেক বাণীই বিভিন্ন সময় ও অবস্থার সাথে যুক্ত। যেমন সম্মানার্থে দাঁড়ানো থেকে রাসূল (সঃ) কখনো কখনো সাহাবিদের বারণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য সম্মানের পুনরাবৃত্তি না করা, সালামের জবাব দেওয়ার মতো। অর্থাৎ কেউ একজনকে সালাম প্রদান করল, আর সেও সালাম দ্বারাই যদি এর জবাব দেয় তাহলে এক্ষেত্রে সালামের পুনরাবৃত্তি হল। অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন ও এর জবাব প্রদানের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। কথা ও কাজ দু ভাবেই এর প্রকাশ হতে পারে যাতে সঠিক সম্মান প্রদর্শন বোঝায়। রাসূল (সঃ) নিজেও হযরত ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন। অনুরূপ বহু হাদিস রয়েছে যা রাসূল (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব ও অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং এমনও অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলো তাঁর পারিবারিক অবস্থার সাথে যুক্ত। তাছাড়া কোরান ও হাদিস বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ ও উচ্চারিত হয়েছে এবং সমগ্র সৃষ্টির পরিচয় এর আওতাভুক্ত। বস্তুত প্রত্যেক বক্তব্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটাই আসল। সুতরাং সে আলোকেই তার বিশ্লেষণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো বক্তব্যের লক্ষ্য ঠিক না থাকলে সে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেউই অনুরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে পাত্তা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে কোরান ও হাদিসের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক, যদি তা উহার যথার্থ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক রেখে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় কেউ যদি কোরানের আয়াত অথবা কোনো হাদিসকে নিজের মেকি মতলবে ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা জনমনে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়, তাতে কিছুই আসে যায় না।

দ্বিতীয় উপকারিতা

মোরাকাবাতে মুর্শিদের চেহারা ধ্যান করলে উপকার হয়। কারণ মুরিদ যখন ধ্যানে আপন মুর্শিদের চেহারার মুখোমুখি হয় তখন তার ভিতর বিশ্বাস, প্রেম এবং ধ্যান শক্তি–এ তিনটি মনাকর্ষক ও মহৎগুণ সৃষ্টি হয়। এ তিনটি গুণ একই সঙ্গে যখন মুর্শিদের নূরী অন্তর এবং প্রেমের দৃঢ় ধ্যান রাজ্যের আওতায় প্রবেশ করে এবং এর প্রতিক্রিয়া মুরিদের অন্তরে এক প্রকার চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি জন্মলাভ করে এবং এর প্রতিক্রিয়া মুরিদের আত্মার মধ্য দিয়ে তার সমগ্র দেহে তরঙ্গায়িত হয়। তখন

আত্মাসহ মুরিদের সারা দেহ তা দ্বারা আলোকোদ্ভাসিত হয়। তাতে দিশারীরূপ ধ্যানের চাবির বদৌলতে মহামূল্যবান সম্পদ মুর্শিদের ইচ্ছার ভাণ্ডার খুলে যায় এবং মুর্শিদের ভিতর যে অনন্ত সম্পদ নিহিত রয়েছে মুরিদ তা থেকে অংশ পেতে শুরু করে। আতরের সুবাস দূর থেকেই পাওয়া যায় এবং অনুভবও করা যায়। অনুরূপভাবে বারুদ ও দিয়াশলাইর মধ্যে সুপ্ত আগুনের মতো মুর্শিদের ভিতরও নেয়ামতসমূহ মজুদ রয়েছে। এ কারণে যথাযোগ্য মুর্শিদের সত্তাও বারুদেরই মতো তেজদীপ্ত। এর সাথে প্রেমাগুন যুক্ত হলে তা আতশবাজির ন্যায় স্বীয় শক্তিতেই অন্যের মৃত্যু ঘটাতে পারে এবং পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারে। ধ্যানের দ্বারা প্রেমাগুন প্রজ্বলিত হয়। যে ধ্যান করে না সে প্রেম থেকে বঞ্চিত। প্রেমাগ্নি যখন মা'শুকের বারুদগ্নির সাথে মিলিত হয় তখনই প্রেমিক আতশবাজির আনন্দ অনুভব করে। আতশবাজির সময় যেমন রঙ-বেরঙ-এর ঝাড়ফুল এবং আলো বিচ্ছুরিত হয় তেমনই মুর্শিদের ধনাগারেও নানারূপে ইশ্‌কে এলাহীর নূর প্রজ্বলিত হয়। এটা মুর্শিদের রূহের প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্য। কোরানে আল্লাহর নামের সাথে সাথে যে সব অনুকম্পার কথা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সে রকম মুর্শিদের সত্তাও আল্লাহর সে সব মহত্ত্ব, পূর্ণতা এবং মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব মুর্শিদের সত্তার ধ্যান ও চর্যা করা হলে পবিত্র সূক্ষ্ম রূহের সূক্ষ্ম প্রভাব মুরিদের রূহ বা আত্মাকে প্রভাবিত করতে থাকে, যেমনই সিক্ত হয় ও ভিজে যায় জিহ্বা টক জিনিসের কথা স্মরণ হলে। অথবা যেমনই অশ্রুসিক্ত হয় চক্ষু প্রিয় সন্তানের মৃত্যু সংবাদে, প্রেম আন্দোলিত হয় মাশুকের স্মরণে এবং ক্রোধ বেড়ে যায় কারও প্রতি গোশশা হলে। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয় তার আত্মা প্রেম আগুনে দগ্ধ হয় এবং এর ফলে মাশুকের নূরী রঙ তার মধ্যে চমকাতে থাকে। আশিক ও মাশুকের মধ্যে এরূপ একাত্মতার সম্পর্ক অবশ্যই বর্তমান রয়েছে। তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক ভাব থাকতেই পারে না। এটা কারও কাছেই গোপন নেই যে, মূলের বিরোধী হয়ে মূলে পৌঁছা যায় না। প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব মূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মূলের দিকেই আকৃষ্ট। ইশ্‌কে এলাহীর উৎস স্বয়ং আল্লাহ ও পরমসত্তা বিধায় ইশ্‌ক বা প্রেম উক্ত সত্তারই গুণ ও ফল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ভক্ত তাঁর থেকে তিনি যে শক্তি সামর্থ্য, জ্ঞান গুণাবলি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হন তা সবই তাঁর সেই প্রেমাস্পদ আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত হয়। মাশুক সত্তার আকর্ষণ গুণেই এরূপ হয়। আল্লাহর সত্তার এ বৈশিষ্ট্যকে 'শরাফতে হক্ক' অর্থাৎ সত্যের সৌজন্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ 'শরাফতে হক্ক' প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি অতি সৌভাগ্যবান এবং শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অধিকারী। হযরত আদম (আঃ) এ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ 'শরাফতে হক্ক' এর প্রভাবে যার অন্তর আলোকিত হয়, তাঁর জ্ঞান গরিমা, গুণাবলি ও সত্তা সবই নূরময় রূপ ধারণ করে। ফলে তাঁর দেহও নূরময় হয়। এটাই মাশুকের প্রেমের মর্ম ও রূপায়ণ। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও বৈশিষ্টাবলি তাঁর প্রেমিকের সত্তায় রূপান্তরিত হয়। এ কারণেই তাঁকে 'ফানা ফিল্লাহ' অথবা 'বাকা বিল্লাহ' বলা হয়। অর্থাৎ তার দেহ-মন

মাশুকের সাথে লীন হয়ে স্থিতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, والذين جهدو افينا لنهد ينهم سبلنا (ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা) অর্থাৎ, 'যারা আমাতে সাধনা করে আমরা তাদের আমাদের পথগুলো প্রদর্শন করি'। (সূরা আন্‌কাবুত-৬৯)। অতএব মুর্শিদও অবশ্য আল্লাহর সে সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির অধিকারী হবেন। এমতাবস্থায় যেহেতু মুর্শিদ পরিপূর্ণরূপে তাওহিদি সত্তায় একাত্ম সেহেতু মুর্শিদের স্মরণ করলে আল্লাহরই স্মরণ হয়। এ জন্য ফানা ফিশশাইখ মুরিদের জন্য বেলায়েত। তাই তো মাওলানা রুমী বলেন, چونکه ذات پیر راکر دی قبول هم خدادر زاتت امد هم رسول - (চুকে জাতে পীরেরা কারদি কবুল। হাম খোদা দর জাতাত আমদ হাম রসূল।) অর্থাৎ, পীরের সত্তা যখন তুমি করলে কবুল, এসে গেছে তোমার সত্তায় আল্লাহ ও রাসূল। আল্লাহ, রাসূল এবং আপন শাইখ বা মুর্শিদের চূড়ান্ত অবস্থা এক ও অভিন্ন। তাই তো হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী বলেন, پیرتواست اول معبد تست(পীরে তুয়াসত্ আওয়াল মাবুদ তাসত্) অর্থাৎ, তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ। হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ তাঁর 'কাওলুল জামীল' পুস্তকে লিখেছেন, الركن العظيم ربطل القلب باشيخ وملاحظه صورته - قلت ان الله مظاهرة كثيرة مما من عابد غبيا اوزكيا وقد كان بهزاله صار معبود اله - (আররুকুনুল আযীমু রাবাতাল ক্বল্‌বে বিশ্‌শাইখি ওয়ামালা হাযাহু ছুরাতিহি ক্বালাত ইন্নাল্লাহা মাযাহিরাতু কাছিরাতু মিম্মা মান আ'বিদু গাবীয়া আওজাকিয়া ওয়াক্বাদ কানা বিহাযাআহু ছোয়ারা মা'বুদালাহু।) অর্থাৎ, প্রধান শর্ত হল, শাইখের সাথে মনোসংযোগ স্থাপন এবং তাঁর চেহারা নিরীক্ষণ। আমি বলি, আল্লাহর বহু প্রকাশ মাধ্যম আছে; তবে বোকা বা বিচক্ষণ আবেদ নয়। অথচ শাইখ তাঁর জুতাসহ মুরিদের মা'বুদ হয়ে আছেন।

অন্য একটি উপকারী কাজ

আপন পীর নিজ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিচারে মুরিদের আসল রাসূল, কারণ পীরই মুরিদের প্রকৃত পথ প্রদর্শক। আল্লাহর মূলতত্ত্বের পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পীর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত। রাসূল অর্থ প্রেরিত। অর্থাৎ সঠিক পথ প্রদর্শক। সুতরাং যার সামনে রাসূলের স্থলাভিষিক্ত উপস্থিত তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী রাসূল হলেন মুর্শিদ। আর নবী-রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বর্তমান নেই সে হেদায়েত তথা আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও প্রজ্ঞা বা পরিচয় জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালার সত্তাগত দীপ্ত ও ফসল তা থেকে সে বঞ্চিত। কারণ, সে রাসূলের প্রত্যক্ষ হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। কেননা কালের ব্যবধান তাঁর হেদায়েতের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। যেমন হযরত আদমের পিতৃত্ব। মূলত আদম (আঃ) সকল মানুষের পিতা হলেও সময়ের ব্যবধানে মানুষ তাঁর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। অতএব নিজের বর্তমান পিতাই আপন প্রকৃত পিতার

স্থলাভিষিক্ত। অতএব বান্দার হেদায়েতের জন্য মুর্শিদ বর্তমান এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলির দ্বারা বান্দার হেদায়েত হচ্ছে অর্থাৎ, আল্লাহর মূলত্ব সম্পর্কে অবগত ও তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে এবং নবী-রাসূলের হাকিকত অবহিত হচ্ছে যে, তাঁরা আমাদের পূর্বেকার পথ প্রদর্শক এবং সে ধারা আমাদের সাথে যুক্ত; ইতোপূর্বে আমরা কেবল তার নাম জানতাম। বর্তমানে যে তোমাকে পিতৃত্ব দিয়ে দুনিয়াতে হাজির করেছে, সে-ই তোমার আসল পিতা, পরম্পরার আদি পুরুষ নন। সুতরাং প্রত্যক্ষ সম্পর্কসূত্রে তোমার আপন পিতা যেমনই তোমার প্রকৃত পিতা তেমনই তোমাদের পূর্বে মুর্শিদ নবী-রাসূলের স্থলাভিষিক্ত বর্তমান মুর্শিদই তোমার প্রকৃত রাসূল। অতএব প্রকৃত রাসূল হলেন মুর্শিদ, সেহেতু সাবেক নবী-রাসূলগণ হলেন পরোক্ষ নবী-রাসূল। তাই তো মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর মাকতুবাতে লিখেন–
چیر تورسول حقیقی است که حقوق او حقوق بادیگران نسبت ندارند
(পীরে তু-রাসূল হাক্কিক্কী আসত্ কিহ্ হুক্কুক্ক আও হুক্কুক্ক বাদিগারানে নেসবতে নাদারান্দ) অর্থাৎ, তোমাদের পীর তোমাদের প্রকৃত রাসূল, তাঁদের অধিকারের সাথে অন্যদের অধিকারের সম্পর্ক নেই। কারণ মুর্শিদের অধিকার তাদের চেয়ে অধিক এবং অলঙ্ঘনীয়। এতে মনে হয় রাসূলও মুর্শিদের অবস্থানেই ছিলেন। অর্থাৎ উম্মতের নবী-রাসূলগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হেদায়েতের বিচারে মুর্শিদও বটেন। শুধু সংবাদ শোনানোর জন্য তাঁদের পাঠানো হয়নি। সংবাদ শোনানোতেই যদি ধর্ম সীমাবদ্ধ হত তা হলে ঈমান ও ইহ্সানের জ্ঞান প্রয়োজন হত না। আর আবশ্যক ছিল না উদ্দেশ্য নির্ধারণ যা সকল কর্মের বিশুদ্ধতা ও বৈধ্যতার পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আপন আপন মুর্শিদ রাসূলদের মর্যাদায় স্থলাভিষিক্ত।

আর একটি উপকারী বিষয়

বাতি উজ্জ্বল হোক বা অনুজ্জ্বল, মসজিদে হোক অথবা ঘরে, নৌকাতে হোক অথবা গলি, রাস্তা বা ময়াদানে যদি তা কল্যাণ বা উপকারের উদ্দেশে স্থাপিত হয় তাহলে তা রাখা বৈধ ও পুণ্যের কাজ। সেহেতু তা কবর বা মাজারে স্থাপন করাও বৈধ ও পুণ্যের কাজ। কারণ, হাদিস শরীফে আছে, অধিক আলোকিত স্থানে রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। হযরত গাউছে আজম তাঁর 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন'-এ এ হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। আমার 'সফীনা' পুস্তকে সে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে স্মরণীয় যে, ফেরেশতার অবতরণ রহমত বর্ষণের নিদর্শন। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং আলোকসজ্জাকারীকে দোয়া করেছেন। তিনি বলেন, তুমি প্রদীপ দ্বারা মসজিদকে আলোকিত করেছে, আল্লাহ তোমাকে আলোকিত করুন। হযরত আলী (রা.) হযরত উমরকে দোয়া করেছেন, "হে ইবনে খাত্তাব, আপনি প্রদীপ দ্বারা মসজিদ আলোকিত করেছেন, আল্লাহ আপনার কবরকে আলোকিত করুন।" সুতরাং আলোতে আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের

নিকট এটা আর গোপন নেই। তা ছাড়া বাহ্যিকভাবেও এর উপকারিতা সকলের কাছে সুস্পষ্ট। আলো দ্বারা সব রকম দৈহিক ও মানসিক ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মহামারির সময়ে রাতের অন্ধকারে অধিকতর আলোক জ্বালিয়ে রাখা শুভ লক্ষণ। যে স্থানের উপর রহমত থাকে তার অভ্যন্তরে এর বরকত প্রকাশিত হয় এবং যার ভিতরে বরকত আছে তার উপরেও তা পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ সত্তা ও আত্মার কল্যাণ দেহে প্রতিভাত হয়। এ জ্ঞান চরিত শাস্ত্র একাত্মচর্চার উপর নির্ভরশীল। এ জ্ঞানের সার-সংক্ষেপ কোরআন ও হাদিছের মগজ ও মর্মার্থ।

তৃতীয় উপকারিতা

জনাবে মরহুম মৌলভী রশিদ আহমদ গঙ্গোহী সাহেব 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র প্রতিবাদে 'বারাহীনে কাত্বেয়াহ' নামে একখানা কেতাব লিখেন। তবে মক্কা-মদীনাসহ বিভিন্ন শহর, ও দেশের আলেমবৃন্দ 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা অকপটে উক্ত কেতাবের বিশুদ্ধতার প্রশংসা করেন এবং সুন্দর সুন্দর মন্তব্য লিখে উহার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেন। এঁদের মধ্যে 'বারাহীনে কাত্বেয়াহ'র লেখকের মুর্শিদ জনাব মরহুম হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী সাহেবও 'বারাহীনে কাত্বেয়াহ'র অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ছটি সমালোচনা মন্তব্য লিখেছেন। তা থেকে দুটি এখানে উল্লেখ করা হল। এখানে এটা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, অধুনা তাঁর মুরিদ এবং মুরিদদের মুরিদ অনেকেই বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিরুদ্ধে, যা ধর্মেরও বিরোধী কথাবার্তা বলেছেন। যথা মিলাদ, কেয়াম, তস্বিহতাহ্লিল, কবর যিয়ারত এবং আনুষঙ্গিক কার্যাদির নানান বাহানা ও কিছু মনগড়া দলিল দ্বারা এই বলে দোষারোপ করছে যে এসব কার্যাদি উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রচার করছে যে, এসব কাজের মধ্যে কোরান-হাদিসের বাইরে তাঁদের নিজস্ব মতলব হাসিলের উদ্দেশ্য রয়েছে। এখন দেখুন উক্ত 'বারাহীনে কাতেয়াহ'র লেখক এবং তার সহযোগীদের সম্পর্কে তাদের মহান পীর কি বলেন। তিনি লিখেছেন, আমি এমদাদুল্লাহ আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও পথের সন্ধান প্রার্থনা এবং আমার প্রিয়তম পীরজি মৌলভী খলিল আহমদ আবনন্দি সাহেব এবং আমার প্রিয় মৌলভী হাসান দেওবন্দি সাহেবের খেদমতে সালাম ও বরকত নিবেদনান্তে হিন্দুস্থানের সব শহর-বন্দর, বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, দক্ষিণ গুজরাট, বোম্বে, পাঞ্জাব, রামপুর, রাজপুতনা, বাহওয়ালপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যে সব বিভ্রান্তিকর ও দুঃখজনক সংবাদাদি আমার কাছে আসছে তা শুনে আমি বিশেষভাবে মর্মাহত। দ্বিতীয়ত, 'বারাহীনে কাত্বেয়াহ' লিখে 'আনোয়ারে সাত্বেয়া'র বিরোধিতা করার কারণে ফেৎনার আগুন আরো জ্বলে ওঠেছে, এবং সব আলেম 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত কেতাবকে এমনই গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন যে, দেশের আলেমবৃন্দ এবং মুফতীগণ কেতাবটিকে সামগ্রিকভাবে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ।

বর্তমানে হিন্দুস্তানে অসংখ্য কুফরী মাযহাব এবং ইসলামের বিনাশকারী ধর্মবিরোধী বাতেল চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করছে। এসময়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে এসব বাতেলের প্রতিবাদ করা উচিৎ। এবং এ ক্ষেত্রে কোরান শরীফের বৈশিষ্ট্য ও ফজিলতসমূহ রাসূলুল্লাহর প্রশংসা ও চরিত্র মাধুর্য প্রচারের লক্ষ্যে সর্বত্র মিলাদের অনুষ্ঠান করা অতি উত্তম উপায় এবং প্রশংসনীয় মাধ্যম... ইত্যাদি।

মাওলানা মোহাম্মাদ আবদুল হক সাহারানপুরী সাহেবের প্রশংসাপূর্ণ অভিমত, 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' সম্পর্কে দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে– সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য; আহলে ইসলাম, কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ যাদের বহাল রাখবেন, তাদের সেবায় নিয়োজিত আমি অধম আবদুল হকের নিবেদন এই যে, আমলদার সুযোগ্য আলেম মৌলভী মোহাম্মাদ আবদুস সামী রামপুরী রচিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' এ অধমের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত লেখক প্রকৃতই ধর্মের জন্য পরিশ্রম করার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের বদৌলতে এমনভাবে কেতাবাদি রচনা করেছেন যা পাঠ করলে ঈমানদারের চোখে নূর ও অন্তরে ঈমান বৃদ্ধির সুখ অনুভূত হয়। তবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং অসত্যের পূজারীরা এটাকে অবজ্ঞা করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই তো অনুরূপ বাঁকা দৃষ্টির লোকেরা চাইলেই সূর্য কালো হয়ে যাবে না। তবে নূরের ঔজ্জ্বল্যে তাদের চোখের উপকার হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের অন্তরে আসবে পবিত্রতা। এমতাবস্থায় কোনো বাগ-বহুল ব্যক্তি যদি ফালতু বকবক করে আর লিখে কাগজ ময়লা করে তার নাম জবাব তাতে বিশ্বে তারই বাচালতা ও অসারতাই প্রমাণ হবে। জ্ঞানীগুণী এবং ধীমান ব্যক্তিদের উক্তরূপ দৃষ্টিহীনদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এরা নিজেদের বাতিল বক্রত্ব ও অজ্ঞতার বশে আলোকে অন্ধকার এবং সুন্নতকে বেদ'আত আখ্যা দেয়। ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায় এবং ন্যায়কে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। والله مقم نوره ولوكره القفرين وصلى الله تعاعلى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين - (ওয়াল্লাহু মুক্কিমু নুরুহু ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরীন ওয়াছাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খাইরি খালক্বিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আছহাবিহি আজমাইন।) অর্থাৎ, কাফেরেরা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তাঁর নূর পরিপূর্ণ করবেন। আল্লাহর প্রশংসান্তে তাঁর সৃষ্টির সেরা ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীদের ওপর রহমত বর্ষিত হোক।

হাজী এমদাদউল্লাহ বলেন, 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র অনেক বিষয়ে মনের থেকে একমত হয়ে আমি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি যদি উক্ত বিষয়ে অভ্রান্ত এবং ন্যায়ের পক্ষে থেকে থাকি তাহলে দেশ-বিদেশের আলেম সমাজ এবং আহলে ইসলাম সম্প্রদায় যেন তা গ্রহণ করেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আল্লাহ তায়ালা সে প্রার্থনা কবুল করেছেন। মক্কা-মদিনা ও অন্যান্য ইসলামী দেশের আলেম সমাজ এতে আলোচিত বিষয়সমূহ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন এবং

সামগ্রিকভাবেই কেতাবটি তাঁরা পছন্দ করেছেন। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে তিনি এরূপ গ্রহণযোগ্যতা দান করেন।

লাহোরের কাসুর জেলার প্রখ্যাত সুফি কোরান ও সুন্নাহ শাস্ত্রের মহান গবেষক এবং বিশেষজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহাজন মাওলানা আবু মোহাম্মাদ আবদুর রহমান গোলাম দস্তগীর সাহেব এ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হল :

আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর প্রতি দরুদ এজন্য যে তাঁরা এ অধমের অন্যতম ধর্মীয় বন্ধুর লেখা 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র বর্ণিত মিলাদ ও ফাতেহার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে মতামত লেখার জন্য দয়া করে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন। তবে এখন আমি অমৃতসরের জনৈক আর্য পণ্ডিত রচিত 'তাকযিবে বারাহীনে আহমদিয়া' নামক পুস্তকে আরোপিত মিথ্যাচার ও অপবাদের জবাব লেখায় ব্যস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে তাতে নিমগ্ন। অতএব আলোচ্য কেতাবটি সম্পর্কে আপাতত এটুকু লিখতে পারি যে, আমি অধম আরবি সংবাদপত্র 'শাফাউন সদুর' ৫ ডিসেম্বর ১৮৮০ সংখ্যায় জনাব মরহুম মগফুর সাহারানপুরী সাহেবের এ সংক্রান্ত লেখাটি পড়েছি। তিনি উক্ত কেতাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমার মতে উক্ত মরহুম মাওলানা হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি অনেক সুফি সাধকের আধ্যাত্মিক দয়ার দানে সমৃদ্ধ ছিলেন। উক্ত কেতাবটির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য তাঁর প্রশংসা-ই যথেষ্ট এবং এর পর আমার মতো অভাগা অধমের প্রশংসা এক্ষেত্রে আর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া অধম নিজেও মিলাদ করি এবং রূহের প্রতি 'ইসালে সওয়াব'কে আমি পাপ সংহারক মনে করি। আল্লাহ তায়ালা যুগনবীদের মতভেদ দূর করুন। আমীন! হে মহাপ্রভু, সৃষ্টির সেরা মহানবী এবং তাঁর সকল প্রিয়জনদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। ইতি- গোলাম দস্তগীর কাসুরী।

প্রকাশ থাকে যে, ইনিই সেই মৌলভী গোলাম দস্তগীর সাহেব যাঁর প্রশংসায় 'বারাহীনে কাত্বেয়াহ'র লেখক ভাওয়ালপুরের শাসনভার থাকা অবস্থায় লিখেছেন যে, 'ধর্মের সহায়ক এবং বেদআতী ও গোমরাহদের দমনকারী মাওলানা মৌলভী আবদুর রহমান গোলাম দস্তগীর কাসুরী সাহেবের দৃঢ় অবস্থান আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখবেন।' ফরীদ কোট থেকে ছাপা 'তাসরীহুল বাহাছ' পুস্তিকায় পৃষ্ঠা নং ১০ এ উক্ত উক্তিটি রয়েছে। এমতাবস্থায় 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র বক্তব্যের বিরোধিতা করা 'বারাহীনে কাতেয়াহ'র লেখকের জন্য অন্যায়। কারণ যাঁকে তিনি আলেমে রাব্বানী হিসেবে মানেন এবং নিজের লেখায় ধর্মদরদী বলে উল্লেখ করেন তিনিই 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'কে অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেছেন এবং এ নিয়ে ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভাওয়ালপুরে অনুষ্ঠিত তর্কযুদ্ধে 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'র পক্ষাবলম্বন করেন ও 'বারাহীনে কাতেয়াহ'র লেখক, তাঁর সমর্থক দেওবন্দী এবং অন্যান্য আলেমদের পরাস্ত করেন। রামপুরের সব পত্রপত্রিকায় এ খবর ছাপা হয়েছে।

সুদক্ষ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সুগভীর তত্ত্বজ্ঞ এবং বিশিষ্ট তথ্যবিশারদ প্রখ্যাত মাওলানা মোহাম্মাদ এ'জাজ হোসেন 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' সম্পর্কে লিখেছেন, সকল প্রশংসা তোমার; তোমার ক্ষমতা প্রদীপ্ত, সত্তা সুমহান সৃষ্টি নৈপুণ্য সুস্পষ্ট, শক্তি অনন্য এবং তুমি সৃষ্টির কল্যাণে দিবাকরের মতো সুস্পষ্ট আহ্বানকারী রাসূল প্রেরণ করেছ এবং তুমি তাঁর আলোচনাকে সমুচ্চ করেছ বলে মিলাদ মাহফিলকে কল্যাণের উসিলারূপে বৈধ করেছ আর অপমানিত করেছ মিলাদে কেয়াম বর্জনকারীকে। অথচ তা দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যদিও কেউ তা পালন করে আর কেউ করে না এবং সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির সেরা মহামানবের প্রতি এবং তাঁর সম্ভ্রান্ত সাথীবৃন্দ ও সম্মানিত পরিবারবর্গের ওপর। অতঃপর সৃষ্টির সেরা মহামানবের মহাজ্ঞানী আশিকদের প্রতি ভক্তি প্রকাশান্তে উল্লেখ্য যে, আমলদার আলেম, যুগজ্ঞানী, বেদআত দমনকারী সুন্নাতের অনুসারী মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মতত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞ, সাধকমনি, কামেলশ্রেষ্ঠ সেরা আলেম মৌলভী মোহাম্মাদ আবদুস্ সামী সাহেবের (আল্লাহ তাঁকে শান্তি দিন) মিলাদ ও ফাতেহা সম্পর্কিত রচনা 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' একখানা অত্যন্ত কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটি অনন্য, আলোচনা সারগর্ভ এবং পূর্বাপর নির্বাচিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম। এ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি বিশেষ ও নির্বিশেষ সকলকে আপন অনুগ্রহ ফয়েজ দ্বারা উপকৃত করেছেন। এর একটি কপি আমার হাতে এসেছে এবং আমি তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। কি অদ্ভুত তাঁর জবাব দান পদ্ধতি এবং বর্ণনারীতি। তিনি জবাবের ক্ষেত্রে বিরোধীদের গুরুজন যাঁদের বিরোধিতা করা তাদের জন্য হারাম, তাদের এ শ্রেণীর অনুসরণীয় ব্যক্তিদের বাণী দ্বারা দলিল দিয়েছেন। গ্রন্থকার দাঁতভাঙা জবাবের মাধ্যমে 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'কে নূরের সাগরে পরিণত করেছেন এবং উন্মুক্ত করেছেন এর বহু প্রস্রবণ। এরপরও যদি বিরোধীদের তৃপ্তি না হয় তাহলে তাদের আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

تهیدستن قسمت راچه - سرد از ار مبر کامل - که خضر ازاب حیات تشاه مبدار دسکندررا - (তাহিদাস্তান ক্বিস্মতরা চেহ্ ছরদ আজ আরম্বর কামেল। কিহ্ খিজির আজ আবেহায়াত তাশাহ মুবদারাদ সেকান্দররা।) অর্থাৎ, দুর্ভাগার কী লাভ হবে কামেলের পথ প্রদর্শনে, বাদশাহ-ই পিপাসার্ত খিজিরের আবেহায়াত পানে।

আল্লাহই উত্তম জবাব গ্রহণকারী। এক্ষেত্রে এটাই আমাদের তরফের বিরল জবাব। আমাদের শেষ নিবেদন সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম শেষ নবী ও তাঁর সাথীদের জন্য। ইতি–

আমি বান্দা আবু নোমান মহিউদ্দিন মোহাম্মাদ এজাজ হোসাইন মুজাদ্দেদী আল্লাহ তাকে, তাঁর মাতা-পিতা ও সকল মুসলিমকে শেষ নবীর অসিলায় ক্ষমা করুন।

ফেরেঙ্গি মহলের জনাব মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী সাহেবও উক্ত গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। তাঁর শিষ্য সাঈদুদ্দিন সাহেব সে কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, মাগফুর মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী সাহেবের প্রধান সত্যপরায়ণ শিষ্যদের অন্যতম সাহারানপুর জেলার রামপুর শহরের বাখিয়া শহরের বাসিন্দা পরহেজগার সুযোগ্য আলেম মাওলানা সাইদুদ্দিন আহমদ লিখেছেন–

দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর শেষ বান্দা মোহাম্মাদকে পাঠিয়ে মানুষের প্রতি কৃপা করেছেন এবং তাঁর আবির্ভাবকে করেছেন নয়নাভিরাম ও মনোমুগ্ধকর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের ওপর। একমাত্র এ সালাম ও দরুদই সেদিন আমাদের উপকারে আসবে যেদিন পিতা-মাতাগণ সন্তানদের উপকারে আসবে না এবং নবীগণও দায়িত্ব নেবেন না তাঁদের পূর্বপুরুষদের। অতঃপর আমি অধম বান্দা মোহাম্মাদ সাইদুদ্দিন বলছি যে, সুসাহিত্যিক মাননীয় মৌলভী মোহাম্মাদ আবদুস সামী রচিত 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' নামক পুস্তকটি অত্যন্ত উপকারী। সুতরাং আলেম সমাজ পুস্তকটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের গুরু প্রখ্যাত মৌলভী মোহাম্মাদ আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী প্রধান। আমি নিজে তাঁকে পুস্তকটি দিয়েছি। তিনি পুস্তকটির প্রশংসা করেছেন এবং এর আলোচনাকে সঠিক পথনির্দেশনামূলক বলে উল্লেখ করে বলেন, "এ কেতাবখানা আলোচ্য বিষয়ে সমুদয় বক্তব্যের সার সংকলন। গ্রন্থকার এতে সঠিক পথ ও লক্ষ্য অনুসরণ করেছেন এবং অন্যায় বক্তব্য ও বাড়াবাড়ি পরিহার করেছেন। নবী ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

আলোচ্য কেতাব সম্পর্কে দিল্লির প্রখ্যাত আলেমগণ বলেন :

১। আকায়েদুল ইসলাম ও তাফ্সীরে হাক্কানী'র প্রণেতা তর্কশাস্ত্র ও কালাম শাস্ত্রের উন্নয়নকারী, আকায়েদে ইসলামের প্রবর্তক প্রখ্যাত মোফাস্সেরে কোরান মৌলভী আবু মোহাম্মাদ আবদুল হক সাহেব লিখেছেন– "আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের দরুদান্তে, দয়ালু দয়াময় আল্লাহ'র নামে– আমি 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' দেখেছি এবং এর কিছু অংশ পাঠ করেছি। বস্তুতই এর লেখক পূর্ণ দক্ষতা এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। যদি অতিরঞ্জিত মনে না করেন তা হলে বলতে পারি, আলোচ্য বিষয়ে কেতাবটি অদ্বিতীয়।"

২। অনুরূপ দিল্লি থেকে হযরত আবদুল আজিজ দেহ্লভী (রঃ)-এর সুযোগ্য সাগরেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার মাওলানা করিমুল্লাহ সাহেবের পুত্র আল্লাহর বিধান ও নবীর সুন্নাহর নিষ্ঠাবান অনুসারী বিখ্যাত লেখক ও দূরদর্শী মাওলানা ইয়াকুব আলী সাহেব লিখেছেন– "আমি শ্রদ্ধেয় ও মান্যবর প্রাজ্ঞ মাওলানা আবদুস সামী প্রণীত মিলাদ ও ফাতেহা সংক্রান্ত কেতাব 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' পর্যালোচনা করেছি। আমার মতে, কেতাবটি বিশুদ্ধ, সুন্নী মাযহাবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য দলিলাদিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং এর সাথে যাঁরা একমত তাঁরা আমাদের দলভুক্ত। আর যে এর

বিরোধী সে পথভ্রষ্ট এবং তার বক্তব্য সঠিক নয়। তারা তো সঠিক হতেই পারে না। কারণ আলোচ্য কেতাবটি সুস্পষ্ট দলিলাদি, অকাট্য প্রমাণাদি, মহান বুজুর্গদের বর্ণিত আত্মিক লক্ষ্যসমূহ, আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট উদ্দেশ্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ। প্রার্থনা করি, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার ক্ষমতা দিন। অবশেষে সব প্রশংসা বিশ্বস্রষ্টা প্রভুর জন্য এবং দরুদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ, তাঁর সাহাবাগণ এবং পরিবারবর্গের জন্য। ইতি–

৩। বোম্বে থেকে আবেদ আরেফ বহু সাধকের গুরু, আত্মোৎসর্গকৃত অনেকের মুর্শিদ সুফি সাইয়েদ ঈমাদুদ্দীন আল-রেফায়ী, আমি আশা করি যার অনুপ্রেরণা আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত বহাল রাখবেন, তিনি লিখেছেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি রাসূল আল-আলামীনকে প্রেরণ করেছেন, সকল নবীর ওপর তাঁর সম্মান দিয়েছেন, তাঁর মিলাদকে বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ করেছেন, অবতীর্ণ করেছেন মুমিনদের 'ফাতেহা শাফিয়াহ' এবং দরুদ ও সালাম আমাদের নেতা পাপীদের সুপারিশকারী মোহাম্মদ, তাঁর হেদায়েতপ্রাপ্ত সাহাবাগণ ও পবিত্র পরিজনদের জন্য, অতঃপর আমি মহাজ্ঞানী মৌলভী মোহাম্মদ আবদুস সামী রচিত মূল্যবান গ্রন্থ 'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ' দেখেছি। এটি মিলাদ ও ফাতেহা সম্পর্কে লেখা। গ্রন্থটি মজবুত দলিলাদি ও ফেকাহভুক্ত বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ সংবলিত। আল্লাহ তাঁর শ্রম গ্রহণ করুন এবং তা মুসলিমদের জন্য উপকারী হোক। যারা মিলাদ মজলিসে বসে অথচ ফাতেহাকে অস্বীকার করে তারা পথভ্রষ্ট এবং ওহাবী। উত্তম তওবা গ্রহণকারী আল্লাহ তাদের তওবা গ্রহণ করুন। অবশেষে সব প্রশংসা বিশ্বস্রষ্টা প্রভুর জন্য...।"

'আনোয়ারে সাত্বেয়াহ'তে দলিল হিসেবে গৃহীত গ্রন্থাদির তালিকা

১। রদ্দে মোখ্তার।
২। রিসালাহ মা আহলুল গাইরিল্লাহ।
৩। খাযানাতুর রাওয়াইয়াত্।
৪। সহীহ্ বুখারী।
৫। এহ্ইয়াউল্ উলুম।
৬। তাওজিহ্।
৭। তাফ্সীরে বাইজাভী।
৮। বাহ্রে জান্নাত।
৯। ফতুয়া আলমগীরি।
১০। মাসায়েলে আরবাঈ'ন।
১১। মাদারেজুন নবুয়্যাত।
১২। মাদ্খাল।
১৩। গুফনিয়াতুত্ তালেবীন।
১৪। তাম্বিয়াতুল গাফেলীন।

১৫। শরহে মায়া'নিউল আছার।
১৬। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা।
১৭। শরহে মুসলিম নবুবী।
১৮। আক্দুল জাওহার।
১৯। তাক্ভিয়াতুল ঈমান।
২০। তাফ্সীরে আজিজী।
২১। মাক্তুবাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী।
২২। দর্রুল মাফিয়াহ।
২৩। তাফ্সীরে মাদারিক।
২৪। ফাতাওয়া সিরাজিয়াহ।
২৫। মাক্সাদে আশের।
২৬। সিরাতে জ্বলি।
২৭। মুহিম্মাতুল মায়ারিফ।
২৮। ফাওয়াইদুস্ সালেকীন।
২৯। ফতুয়ায়ে কাজী খান।
৩০। মুদেররাত।
৩১। তাতার খানিয়া।
৩২। ফাতাওয়া হুজ্জাত।
৩৩। মল্তা কাত।
৩৪। মাযরাউল হাসানত শরহে দালায়েলুল খায়রাত।
৩৫। কাশফুয যুফুন।
৩৬। সীরাতে মুস্তাকীম।
৩৭। শরহে সফরুস্ সা'দাত।
৩৮। সাবীলুর্ রেশাদ।
৩৯। আনোয়ারে মুহাম্মদী।
৪০। শামী।
৪১। কাশ্ফে আনোয়ার।
৪২। তায্কিরুল এখওয়ান।
৪৩। তাফ্সীরে রূহুল বয়ান।
৪৪। তাফ্সীরে কবীর।
৪৫। শরহে মাওয়াহেব।
৪৬। মায়ালেম।
৪৭। জামে' তিরমিজী।
৪৮। হুস্নুল মাক্সাদ ফি আমলিল মৌলুদ।
৪৯। মাওরাদুর রাবী ফি মৌলুদিন্নবী।

৫০। ফায়েযুল হারমাইন।
৫১। সীরাতে শামী।
৫২। উ'রফুত্ তা'রীফুল্ মৌলুদুশ্ শরীফ।
৫৩। মায়াতু মাসায়েল।
৫৪। মাজ্মুয়াহ রাসায়েলে আশারাহ।
৫৫। মাযাযানে আহ্মাদী।
৫৬। খোদা কি রহমত।
৫৭। ফাত্হুল মুবীন।
৫৮। সাফাদুস্ সায়েল।
৫৯। মৌলুদে কবীর।
৬০। মুস্লিম শরীফ।
৬১। বাহ্রুররায়েক।
৬২। মিশ্কাতুল মাসাবীহ্।
৬৩। সুনানে আবু দাউদ।
৬৪। হেদায়াহ্ প্রভৃতি।

পবিত্র মক্কা ও দেশ-বিদেশের যেসব আলেম উক্ত গ্রন্থের সত্যয়নকারী হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের নাম।

উল্লেখ্য, প্রত্যেকেই মন্তব্য সহকারে নিজ নিজ স্বাক্ষর করেছেন। তা উল্লেখ করলে এ গ্রন্থটি বড় হয়ে যাবে। এজন্য তাঁদের মন্তব্য ও বক্তব্য বাদ দিয়ে কেবল নামগুলো দেওয়া হল।

১। হানাফী মুফ্তি আবদুর রহমান সিরাজ।
২। হাসান তৈয়ব হানাফী।
৩। ইব্রাহীম আল ফাতান।
৪। আবদুর রহমান আফেন্দী।
৫। আবদুল মতলব।
৬। সাইয়েদ আবদুল্লাহ কোশক।
৭। শাফেয়ী মুফতি আহমদ দাহলান।
৮। মালেকী মুফ্তি মোহাম্মদ শারকী।
৯। মোহাম্মদ জারুল্লাহ।
১০। আহাম্মদ আবুল খায়ের।
১১। আহাম্মদ কামাল।
১২। হোসাইন গরীব।
১৩। হাসান হাম্বলী।
১৪। সালমান ঈসা।

১৫। আহাম্মদ আল দাগেস্তানী।
১৬। আবদুল কাদের শাখিনী।
১৭। মোহাম্মদ সাঈদ আল আদীব।
১৮। ইব্রাহিম তুমুসী।
১৯। আবদুর রহমান জামাল হানাফী।
২০। আবদুল কাদের খোকের।
২১। আবদুল কাদের শাম্স্।
২২। মোহাম্মদ সাঈদ।
২৩। আলী জাওদাহ।
২৪। আহাম্মদ আমীন।
২৫। শেখ ফেরদৌস।
২৬। মোহাম্মদ বিস সাইল।
২৭। আবদুল্লাহ জাওয়ারী।
২৮। সাইয়েদ উমর শাত্তি।
২৯। মান্শাভী।
৩০। আবদুল জাব্বার।
৩১। সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী।
৩২। আলী হারিরী।
৩৩। আলী-বিন-আবদুল্লাহ।
৩৪। মোহাম্মদ বিন-আবদুল্লাহ।
৩৫। আহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন খলীল।
৩৬। আবদুর রহমান সিরাজ।
৩৭। রাজী আঃ রহিম খালফবিন-ইব্রাহীম।
৩৮। মোহাম্মদ আবদুল হক।
৩৯। আবদুর রহমান আজমী।
৪০। আবদুল্লাহ মাশাত।
৪১। আবদুল্লাহ কামাশী।
৪২। মোহাম্মদ সয়ূতী।
৪৩। মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।
৪৪। আঃ মজিদ আল দাগেস্তানী।
৪৫। মোহাম্মদ রাজী।
৪৬। সাইয়েদ জামালুদ্দিন।
৪৭। সাইয়েদ আবদুল্লাহ বিন সাইয়েদ আহমদ।
৪৮। সাইয়েদ মোস্তফা।
৪৯। মোহাম্মদ বিন সালেম আয়েশ।

৫০। মোহাম্মদ বিন দাউদ।
৫১। আবদুর রহমান।
৫২। আবদুর রহমান বিন হাজারী।
৫৩। হাজী আবু বকর বাসিয়ূনী।
৫৪। আব্বাস বিন জাফর।
৫৫। আবুল বারাকাত।
৫৬। আলী রাহেস্তী।
৫৭। আহাম্মদ হাজারী।
৫৮। মোস্তফা আফিফী।
৫৯। মোহাম্মদ আমীন।
৬০। ইব্রাহীম বিন খেয়ার।
৬১। মোহাম্মদ বিন আহাম্মদ রেফাগী।
৬২। আহাম্মদ সিরাজ।
৬৩। মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীম হাশিরী।
৬৪। আলী বিন ইব্রাহীম আল জোবাইদী।
৬৫। মোহাম্মদ সালেহ।
৬৬। মোহাম্মদ বিন শেখ হোসাইন।
৬৭। আবদুল কাদের বিন মোঃ আলী।
৬৮। আবদুল কাদের মাশাত্ব।
৬৯। মোহাম্মদ সালেহ জাওয়ারী।
৭০। সোলেমান ওক্‌বাহ্‌।
৭১। মোহাম্মদ মুনসুর।
৭২। জাফর হোসাইনী আল বর্‌জন্‌জী।
৭৩। সাইয়েদ ইউসুফ।
৭৪। উমর বিন আলী।
৭৫। হাসান আদীব।
৭৬। আলী তাহান।
৭৭। আলী বিন মোহাম্মদ হাব্বাব।
৭৮। মোঃ সাঈদ বিন বছিল।
৭৯। মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ।
৮০। সাইয়েদ সালেম।
৮১। আহাম্মদ আল হানিফী।
৮২। মোহাম্মদ কাশেম।
৮৩। মোবারক বিন সাঈদ।
৮৪। আবদুর রহমান হাজারী।

৮৫। মোহাম্মদ সোলায়মান।
৮৬। মোহাম্মদ নূরে সোলেমানী।
৮৭। আবদুল আজিজ হাশেমী।
৮৮। মোহাম্মদ হামেদ।
৮৯। আলী বিন আহাম্মদ বাসেরীন।
৯০। আহাম্মদ আব্বাস।
৯১। আবদুর রহীম আল বারায়ী।
৯২। ইউসূফ রূমী।
৯৩। মোহাম্মদ হাশেম বিন হোসাইন আব্বাস বিন-জাফর বিন সিদ্দিক।
৯৪। মোহাম্মদ সালেহ।
৯৫। মোহাম্মদ উ'স্‌মান কুদ্দী।
৯৬। মোহাম্মদ মুহ্‌সিন।
৯৭। আবদুল্লাহ বিন আলী।
৯৮। আহাম্মদ ফাত্তাহ্‌।
৯৯। আহাম্মদ উস্‌মান।

ফাতেহার তাক্‌বীর

আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আক্‌বার, ওয়া লিল্লাহিল্‌ হাম্‌দ।

হযরত রাসূল (সঃ)-এর ফাতেহার নিয়ম

হে! জগৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির গৌরব বিশ্বের রহমত মানবকুলের সার শেষ নবী আহ্‌মাদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এবং তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবা, তাঁর আহলে বাইতগণ দয়া করে আমাদের এ নিয়াজ অর্থাৎ প্রার্থনা ও উৎসর্গ কবুল করুন – বলে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পাঠ করতে হবে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর ফাতেহার নিয়ম

হে! সৃষ্টির সর্বোচ্চ শিখর, প্রকৃতি গ্রন্থের শৃঙ্খলা, মহাকাশের চন্দ্র, অন্ধকার বিতাড়ক প্রধান নক্ষত্র, আপাদমস্তক মর্যাদার অধিকারী, অসাধারণত্বের সিঁড়িতে আসীন, ইমামত বেদী দিশারী, শরিয়তের শাহী মহলের কর্তা, ত্বরিকত সাগরের মাঝি, নবুয়তের জ্যোতিলোকের সৈন্য শক্তির প্রধান, নির্জন এককের নিকট সঙ্গী, বিকশিত এককের সাথী, ত্বরিকতপন্থীদের গুরু, কষ্টের উপশমকারী এলমে লাদুনীর শিক্ষক। দৈবজ্ঞান বিশারদ, উদয়াচলের অপূর্ব শুভ্রতা, অলৌকিকতার প্রকাশপট,

জয় বিজয়ের জনক প্রধান দশ জনের দ্বিতীয় ইমাম, হাওযে কাওছারের সাকীদের সরদার, উচ্চ প্রশংসার অধিকারী মানবশ্রেষ্ঠ আমীরুল মুমেনীন ইমামূল মুত্তাক্কীন আলী ইবনে আবি তালেব আল্লাহর বিজয়ী সিংহ এবং সকলের কামনার ধন আমার এ উৎসর্গ গৃহীত হোক – বলে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পাঠ করতে হবে।

খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর ফাতেহা

খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা জোহরা (রাঃ) এর যুগস্বীকৃত অসামান্য দরগাহে আমাদের মানত ও উৎসর্গ কবুল হোক – এ কামনা করে ফাতেহা পাঠ করতে হবে।

ফাতেহা-এ-কান্দুরী

পর্দানশীন মহিলাদের ভূষণ অবগুণ্ঠিত নারীদের মুকুট সর্ব হযরত বিবি ফাতেমা জোহরা, বিবি কামাল, বিবি রোকেয়া, বিবি হোনায়ফা, বিবি খুদিজা, বিবি হাফসা, বিবি জয়নব, বিবি আয়েশা, বিবি খাচ্ছা (রাঃ) সহ রাসূলের সব জান্নাতবাসিনী বিবিদের নিয়তে সূরা এখলাস এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করা।

দুই ইমামের ফাতেহা

নিষ্পাপ নিরপরাধ মজলুম দুই শহীদ হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসাইন এবং তাঁদের দুই পুত্র মোহাম্মদ হাসান ও আবদুল্লাহ হোসাইন যাঁরা কারবালা প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন নেয়াজ কবুল করেন বলে তাঁদের উদ্দেশে সূরা এখলাস সহ সূরা ফাতেহা পাঠ করা।

হযরত মীর মহিউদ্দীনের ফাতেহা

প্রার্থনাকারীদের কল্যাণের নিয়তে সাইয়েদ সুলতান খাজা মাখদুম গরীব বাদশাহ শাইখ দরবেশ অলি মাওলানা মীর মহিউদ্দীন, তাঁর পিতা সাইয়েদ সালেহ জঙ্গী, তাঁর মা বিবি দ্বিতীয় ফাতেমা তাঁর স্ত্রী বিবি নসীবাহ, তাঁর ভাই আবদুর রাজ্জাক এবং আবদুল ওহাব স্মরণে একবার সূরা ফাতেহা, পনেরো বার সূরা এখলাস এবং এগারো বার দরুদ পাঠ করা।

ফাতেহা-এ-হযরত শাহ শরফ বু আলী কলন্দর

সুলতানুল আশিক্কীন সেরা দার্শনিক হযরত শাহ শরফ আবু আলী কলন্দর এবং হযরত শাহ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মুনীরী, হযরত আহাম্মদ খান, হযরত মোবারক

খান প্রমুখ আল্লাহর পরিশুদ্ধ ব্যক্তিদের উসিলাতে মানত ও উৎসর্গাদি কবুলের নিয়তে সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে আয়াতুল কুরসী তিনবার, সূরা আল ইন্‌শিরাহ তিনবার, সূরা ফাতেহা তিনবার, সূরা এখলাস দশবার এবং দরুদ দশবার পড়তে হবে।

হযরত খাজা খিজিরের ফাতেহা

অভাবপূরণকারী এবং সৃষ্টির বিপদ ত্রাতা হযরত খাজা খিজিরের পবিত্র সত্তার শান্তি কামনা করে ফাতেহা পাঠ করা। অপরাধ ক্ষমাকারী রাসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ও অমুক অমুক পবিত্র আত্মাসমূহ এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত নূরুল্লাহগণের অছিলায় সকল মৃতদের, হকদারদের এবং প্রার্থীদের তথা সকল মুসলিম কবরবাসীদের রূহে এর সওয়াব পৌঁছে দিন বলে সূরা এখলাসসহ সূরা ফাতেহা পাঠ করা।

হযরত কাজী শাহবুদ্দিনের ফাতেহা

হযরত কাজী শাহবুদ্দীন, হযরত কাজী মালেকুদ্দীন, হযরত কাজী মঈনদ্দীন, হযরত কাজী ইমামুদ্দীন, হযরত কাজী হামিদুদ্দীন, হযরত কাজী ফরীদুদ্দীন এবং হযরত কাজী বোরহানুদ্দীন প্রমুখদের পবিত্র রূহে মানত ও উৎসর্গাদির পুণ্যসমূহ সসম্মানে পৌঁছানোর নিয়তে তিনবার সূরা ফাতেহা, তিনবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার সূরা ইন্‌শিরাহ, তিনবার সূরা এখলাস এবং দশবার দরুদ পাঠ করা।

হযরত শাহ মাদারের ফাতেহা

হযরত শাহ মাদারের আশেকিনদের পবিত্র রূহের ওপর তালেবে মাদার, মাদারে নূরানী, মাদারের হুরানী, মাদারে জহুরানী পীর বদিউদ্দিন জিন্দাশাহ মাদার (কুঃ ছেঃ) পবিত্র রূহ মোবারকে এবং পিতা আলী চাপি মাতা বিবি হাজেরার উপর উৎসর্গাদি পৌঁছানোর নিয়তে সূরা ফাতেহা একবার, সূরা এখলাছ তিনবার, দরুদ শরীফ তিনবার পাঠ করতে হবে।

শবে বরাতের প্রদীপসমূহের উদ্দেশে ফাতেহা

হে আল্লাহ! হযরত নূর নবী রাসূল (সঃ)-এর সম্মানার্থে ঈমান ও অন্তর উজ্জ্বলকারী শবে বরাতের প্রদীপগুলোকে কেয়ামতের দিনে নাজাতের উসিলা করুন এবং এদের জান্নাতে দাখেল করুন–

এ প্রার্থনায় সূরা এখলাস ও সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে।

কোরান খতমান্তে ফাতেহা

হে আল্লাহ! কোরান খতম, সূরা এখলাস ও সূরা ফাতেহা পাঠের সমস্ত পুণ্য হযরতে আরবি উম্মী নবী অন্ধকারের রবি, হেদায়েতের নূর উভয় কাবার মালিক, সকল

রাসূল, সকল মুমিন, পাপী-তাপীর সুপারিশকারী আমাদের নেতা, আমাদের মাওলা, আমাদের অলি, আমাদের অন্তরের পবিত্রতা, আমাদের অপরাধ ক্ষমার সুপারিশকারী, আমাদের চোখের মণি আবুল কাসেম মোহাম্মদ (স.), তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর অনুসারীগণ, তাঁর বংশধর এবং তাঁর পবিত্র আহলে বাইতদের সহ সকল নবী-রাসূলগণের অছিলায় অমুকের রূহে পৌঁছে দিন এবং আপনার আপন দয়া ও করুণায় তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

কবরে মৃতের জন্য উপদেশ

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর দু ফেরেশতা এলে ভয় পাবে না, চিন্তিত হবে না এবং বিশুদ্ধ ভাষা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে বলবে– আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর বল যে, আল্লাহ আমার রব বা প্রভু, ইসলাম হল আমার দ্বীন, হযরত মোহাম্মদ আমার নবী, কোরান আমার ইমাম, কা'বা আমার ক্বিব্‌লা, মুমিনগণ আমার ভাই, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাতে রয়েছে পুণ্য, আর যা হারাম করেছেন তাতে রয়েছে শাস্তি, পুণ্যে বেহেশত আর শাস্তি হল দোযখ, কেয়ামত আসন্ন এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবরবাসীদের আল্লাহ উঠাবেন।

এছাড়া অনেক ফাতেহা আছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল। ইচ্ছা হলে অন্যান্য কেতাব দেখতে পারেন। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরও জানতে পারবেন।

বুজুর্গ আলেমদের মন্তব্যাদি

মর্যিয়াদের শব্দ বিকৃত আর ওহাবীদের বিকৃত ব্যাখ্যার জবাবে লিখিত 'লাতায়েফে শাফিয়া'র বিশুদ্ধতা সমর্থনে বিজ্ঞ বুজুর্গ সত্যনিষ্ঠ আলেমদের দস্তখতসহ প্রশংসামূলক মন্তব্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আমি 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবখানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়েছি। এতে জনাব মৌলভী আলী জৌনপুরীর পুস্তকাদির জবাবে কিছু লেখা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা সঠিক। প্রকৃতপক্ষে মৌলভী জৌনপুরী সাহেব তাঁর রচনাবলি তথা 'যাদুত তাকওয়া', 'রাদ্দুল বেদাআ', 'কাওলুচ্ছাবেত' প্রভৃতির অধিকাংশ স্থানেই সত্যের বিপরীত কথা বলেছেন এবং আল্লাহর ভয়কে উপেক্ষা করে বিকৃত ও মনগড়া কথা নিয়ে আপন কেতাবসমূহে বাকবিতণ্ডা করেছেন।

স্বাক্ষর : বান্দা ফজলুল হক সুধারামী আফিআনহু।

'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবে যা কিছু লেখা হয়েছে, সবই সঠিক।

স্বাক্ষর : আবদুল গণি শাহ্‌বাজপুরী।

* উক্ত স্বাক্ষরকারী জনাব মৌলভী শাহ চৌধুরী আবদুল গণি সাহেব একজন বিশিষ্ট আলেম, নেতৃস্থানীয় দরবেশ এবং অলি, তিনি অত্যন্ত সাধু সুফি এবং হুঁশিয়ার ব্যক্তিত্ব। তিনি বরিশালের শাহ্‌বাজপুরের বাসিন্দা। তিনি মরহুম ওরমজান চৌধুরীর জামাতাও বটেন। উক্ত লাতায়েফে শাফিয়াহ সম্পর্কে উক্ত হযরত চৌধুরী সাহেব যে মন্তব্য করেছেন সর্বৈব সঠিক।

স্বাক্ষর : ফকীর তোফায়েল আহাম্মদ শাহ্‌বাজপুরী।

* মৌলভী আলী জৌনপুরীর রচনাবলির জবাবে 'লাতেয়েফে শাফিয়াহ'তে এর প্রণেতা যা লিখেছেন নিঃসন্দেহে তা সঠিক এবং এটা প্রকাশ করা ওয়াজেব।

'স্বাক্ষর : সাখাওয়াতুল্লাহ-বিন মরহুম জনাব হযরত শাহ্ আবদুল্লাহ সাহেব রায়পুরী।

* 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' একটি মৌলিক রচনা এবং প্রশংসনীয়।

স্বাক্ষর : ফকীর মোহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ।

* 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' একটি প্রেরণাদায়ক কেতাব। এর বক্তব্য নিঃসন্দেহে সঠিক।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ আমিনুদ্দীন ফরিদপুরী।

* জনাব মৌলভী কেরামত আলী সাহেবের জবাবে 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবে যা লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ যথার্থ ও সঠিক হয়েছে।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ, নিবাস- জাফরাবাদ।

স্বাক্ষর : আমীরুদ্দীন আহাম্মাদ, নিবাস- কালিকাপুর, মাদারীপুর।

স্বাক্ষর : আবদুল জাব্বার আফিআনহু/ নাসেরপুরী/ ফরিদপুরী।

* জনাব মাওলানা শাহ সাইয়েদ আবদুল খালেক সাহেব শ্যামপুর দরবারের পীর সাহেবের ছেলে। হোসাইন বংশের সূর্য শ্যামপুরে উদিত হয়েছে। সোবহানাল্লাহ! তাঁর বুজুর্গি কত বর্ণনা করব! তাঁর মহৎ গুণাবলি হিন্দুস্তান ও বাংলায় সূর্যের মতো উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে হোসাইনের বংশধর ব্যক্তিসত্তা বেলায়েতের আলোয় আলোকিত এটা এ বংশের বৈশিষ্ট্য। তিনি কেতাবি বিদ্যায় অদ্বিতীয়, তাঁর যোগ্যতার কাছে গোটা বাংলার জ্ঞান বিন্দুতুল্য। তিনি আলোচ্য 'লাতায়েফে শাফিয়া' কেতাবখানা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে শুনেছেন এবং আলী জৌনপুরীর ভূমিকাও মনোযোগ সহকারে দেখেছেন। কিন্তু বর্তমানে ক্ষীণদৃষ্টির কারণে অন্যকে নিম্ন বক্তব্যটি লিখতে বলেন– আমি আলী জৌনপুরীর রচনাবলির জবাবে লেখা– 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবখানা পড়িয়ে শুনেছি, এর বক্তব্য সঠিক।

স্বাক্ষর : সাইয়েদ আবদুল খালেক শ্যামপুরী।

* জনাব মাওলানা মৌলভী শামসুল আলম সাহেব একজন বিরাট যোগ্যতাসম্পন্ন উচ্চ বংশীয় লোক, তিনি ছিলেন সমাজে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তাঁর সম্ভ্রান্ত পিতা একজন আল্লাহভক্ত সুফি ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবটি মনোযোগ সহকারে পড়েন এবং আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পর জবাব সঠিক হয়েছে লিখে স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষর : শামসুল আলম উফিয়া আন্‌হু, শাহবাজপুরী দৌলত খান নামে পরিচিত।

* 'লাতায়েফে শাফিয়াহ'-এর জবাবগুলো সম্পূর্ণ সঠিক।

স্বাক্ষর : ফাদবী হাবিবুল্লাহ্ উফিআনহু মিরপুরী।

* আলোচ্য 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবে পীর সাহেব যা লিখেছেন, ঠিকই লিখেছেন।

স্বাক্ষর : ফাদবী আহাম্মদ শাহবাজপুরী।

* আমি 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবখানা পাঠ করেছি। এর জবাবে আলোচনাটি সঠিক এবং বিধানসম্মত।

স্বাক্ষর : ফাদবী মোহাম্মদ সা'দুল্লাহ্ সুধারামী।

* মুর্শিদ যেমন খাঁটি, জবাবও দিয়েছেন খাঁটি এবং যথার্থ।

স্বাক্ষর : ফকীর আবদুল্লাহ মক্কী-বিন হারুন সাহ্।

* আল-'শাফিয়াহ' কেতাবে জবাব হিসেবে যা লেখা হয়েছে, তা সঠিক।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, শমসেরাবাদ নিবাসী।

* নিঃসন্দেহে জবাবটি সঠিক হয়েছে।

স্বাক্ষর : শামসুদ্দীন আহাম্মদ লামচরী।

* আমি 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' পড়েছি, তা নিয়ে চিন্তা করেছি এবং তাতে লেখা জবাবগুলো সম্পূর্ণ সঠিক বলে আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

স্বাক্ষর : ফদবী আবদুল জাব্বার, কাটাখালী নিবাসী।

* এতে যা লেখা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা অভ্রান্ত।

স্বাক্ষর : ফাদবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজাকুরশিউর নিবাসী।

* 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবের জবাব সঠিক।

স্বাক্ষর : ফাদবী আহসানল্লাহ (উফিয়া আন্‌হু)।

* জবাব সঠিক।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চণ্ডিপুর।

* জনাব পীর দস্তগীর জামানার হাদী জনাব মরহুম মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের যে সব ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন তা ঠিক করেছেন এবং ফাতেহা কলন্দরী এবং বিন্নরী সম্পর্কে 'লাতায়েফে শাফিয়াহ'তে যা লিখেছেন পূর্ববর্তী অনেক কেতাবে তা যথার্থই উল্লেখ আছে, আমি নিজে তা দেখেছি।

স্বাক্ষর : ফাদবী মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মোমেনপুরী।

* জনাব পীরে কামেল 'লাতায়েফে শাফিয়াহ' কেতাবে যে সব দোষত্রুটি নির্দেশ করেছেন তা সঠিক এবং তুলনাহীন।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, শ্যামপারায়ী।

* অনন্য হাদী পীর সাহেব 'লাতায়েফে শাফিয়াহ'তে যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য এবং অপূর্ব।

স্বাক্ষর : মোহাম্মদ আবদুল মজিদ গাওহারবাগী।

* লেখক যা লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন।

স্বাক্ষর : ফকীর মুকবুল আহামাদ, চট্টগ্রামী, খাদেম নওয়া পাড়া দরগাহ।

* আল্লাহ গ্রন্থকারকে পুরস্কৃত করুন।

স্বাক্ষর : ফকীর মোহাম্মদ আবদুল আজিজ আলীপুরী।

মদিনা

কল্‌কী অবতারের ছফিনা

সূচি

হুয়াল গণি ৫৩৫
২য় সংস্করণ ৫৩৬
বচন ৫৩৭
কল্‌কী অবতার ৫৪১
দৃষ্টান্ত ৫৪২
দৃষ্টান্ত ৫৪৪
তৃতীয় সংস্করণ ৫৪৬
দ্বিতীয় কথা ৫৪৭
পেশগুই – ভবিষ্যৎ বাণী ৫৪৮
পেশগুই (ভবিষ্যৎ বাণী) ৫৪৯
নবী ছাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী । হাদীছ । ৫৫৩
কেয়ামতের নেশান ৫৫৪
নবী সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী ৫৫৪
মহরমের খোদবা ৫৫৬
ভাব ৫৬০
যাতনা ৫৬১
ভাব ৫৬১
কালের প্রতি ৫৬২
ভাব ৫৬২
উপদেশ ৫৬২
সাবধানতা ৫৬৩
করুণা ৫৬৪
ভাব ৫৬৪
ভাব ৫৬৫
গুরু ভক্তি ৫৬৬
বিলাপ ৫৬৭
ইস্তাহার ৫৬৭
দূরূহ শব্দের অর্থ ৫৭৩

হুয়াল গণি

চন্দন গৌরব মণি, আম্বুর সরন ।
শিকরে সম্বল সার, অন্নের বেঞ্জন ॥
আসু ফল পর বল, পরশ রতন ।
চৌক্ষের অঞ্জন জ্যোতি বন্ধুর চরণ ॥
তরঙ্গ তরুণ জলে, হুঁ হুঁ রব গায় ।
আকাশ পাতাল জুড়ে মেঘ বৃষ্টি যায় ॥
অধিকার যার রসে, তাঁর রসে রস ।
ডাড়িম্ব, কাঁঠাল, বেল, আম্র, আনারস ॥
মিষ্ট মুখে জিহ্বা চোষে অম্ল মুখে জল ।
বন্ধু পিতঃ সিদ্ধা গুরু সীমানা সরল ॥
এক রসে দুই পন্থা নহে কদাচন ।
সরল সীমানা নিত্য যাহার আসন ॥
শকুনীর দৃষ্ট জন্তু মোরদা অনিবার ।
দো সীমাতে শকুনীর ঘটে না আহার ॥
গঙ্গাজলে স্নানেতে, হবে পরিষ্কার ।
মনের আহ্লাদে ডুব দাও বারে বার ॥
সখিগণ মনোরসে যমুনার তীরে ।
আঁচল উড়ায়ে গাতি কলসী কঙ্কে ধীরে ॥
শারদা গমন গতি জল যমুনায় ।
বিলাস তরঙ্গ তনু ডুবি ডুবি নায় ॥
কোমর কমল ক্ষীণ পাছা উত্তোলন ।
বারে বারে ডুব নদে ভরিয়া বদন ॥
আনন্দ সময় এই আনন্দ সময় ।
আনন্দে বন্ধুর দেশে দাও পরিচয় ॥
আনন্দ হয়েছে যার আনন্দ এবার ।
এ আনন্দ বিনা নন্দ নহে হইবার ॥
বাজাও আনন্দ ডঙ্কা মধু পুরে যাও ।
বাজিলে নীরব ডঙ্কা করিবে না রাও ॥
বাজিলে নীরব ডঙ্কা বিলাসীবে ঘুম ।
সে ঘুম নীরব রবে সংসার নিজ্জুম ॥

২য় সংস্করণ

হিন্দুস্থানে দীন যবে হইল পতিত ।
দীনদার ছিল যারা হল সশঙ্কিত ॥
অলী-আল্লা ছিল যারা হিন্দ বাঙ্গালায় ।
রহিল দীনের নাম তাঁদের কৃপায় ॥
হিন্দুদের পূজা পাজা কার্য্য ব্যবহারে ।
মোছলেমের দীনদারী রহিতে না পারে ॥
কেবল পূজার ধুম মুরত আচার ।
মোছলেম ও হিন্দুর মধ্যে হল ব্যবহার ॥
ফারাক না ছিল তায় হিন্দু মোছলমান ।
কৃষ্ণলীলা রাধিকার সদা সাধ্য গান ॥
নরবলি মোছলেমেরে দিত সর্ব্বদায় ।
ভেজিলেন অলী নেক মদদ খোদায় ॥
প্রথম বাঙ্গালা দেশে বাজিদ বোস্তাম ।
কলন্দর মাদার পীর তার পরিণাম ॥
মুরিদ মানিক তাঁর আর বাওন পীর ।
শত শত অলীগণ হৈলা দস্তগীর ॥
মোরশেদের বিদ্যা নূরী করিয়া আসন ।
জেকেরের রোলে ডঙ্কা বাজায় আপন ॥
বাজিয়া উঠিল যবে দীনের বাজার ।
অন্ধকারে চন্দ্র যেন হল নমুদার ॥
বড় বড় রাজা আর বড় জমিদার ।
অবশেষে ধন্য-মান্য করিল তাঁহার ॥
দেখিয়া দীনের খুবি অন্য অন্য দীন ।
কেয়ামতে আগে তাঁর হয়ে গেল হীন ॥
মহাম্মদী নূর যদি হইল রৌশন ।
নূর পরে নূর রস সকল আসন ॥
সূর্য্য জ্যোতে তারাগণ দেখা নাহি যায় ।
নতশিরে অলী আগে নূর ধর্ম পায় ॥
শত শত গুণমানী ধরে সেই দীন ।
জগন্নাথে কবিরের রৈয়া গেছে চিন ॥
মাওলানা কবির নামে জগন্নাথ ধামে ।
খাইল তাহার পাক হিন্দু পরিণামে ॥
ভক্তি কথা লয়ে তারা ভক্তি করে খায় ॥

মুণি জন বিনা ভক্তি কে করে কথায় ॥
ভক্তি গুণে ভক্তি-রস এভব রঞ্জন ।
ভক্তি-গুণে মুক্তি-পথ মুনি মহাজন ॥
আজো সেই ভক্তি সেবা রহিয়াছে তাঁর ।
নহে যার নাই তার ধর্ম অধিকার ।
মধুর ভিতর মধু কে নাশিতে পারে ।
সত্য গুণী সত্য মুখে বলহে আদরে ॥
গুণে গুণী গাজী পীর বদরের গুণ ।
গাঙ্গের তরঙ্গ নদে অনন্ত ভুবন ॥

বচন

আমরা আছি পোলাপান, গাজী আছে নেগাবান ।
শ্রী গঙ্গা পাঁচ পীর বদর বদর ॥
গাং তীরে পাড়ি কালে হিন্দুর সন্তান ।
সকলে গাহিতে থাকে পঞ্চ পীর গান ॥
মেহের কালী মেলা ক্ষেত্রে আদরে মেহের ।
তার পরে করে যাহা করা করনের ॥
মেহের গেরামে সাহা রাস্তিন অলীর ।
মুহাম্মদী গুরু ধাম আসনে কালীর ॥
দেখিয়া তাঁহার গুণ হিন্দুর সন্তান ।
অনেকে করিয়া থাকে তাঁর গুণগান ॥
এই রূপে যথা যাহা আছে গুরুধাম ॥
হিন্দুর সন্তান করে তাহার প্রণাম ॥
বাকীয়তে মৃত্যু কালে বৈতরণী পার ।
মুহাম্মদী নাম লিয়া হয়েছে উদ্ধার ॥
তবে ওহে বল এবে হিন্দুর সন্তান ।
জগন্নাথ তব নহে আছে বিদ্যমান ॥
মনোপুরে জগন্নাথ নাহি আছে যার ।
জগন্নাথে গেলে নহে জগন্নাথ তার ॥
এস এবে জগন্নাথে সবে মিলে যাই ।
যেই দেশে তোমা বই আর কেহ নাই ॥
আমি হে তোমার হব, তুমি হে আমার ।
এস এস শ্রীক্ষেত্রে, হই ভব পার ॥
এক মনে দুই নাই, ধর্ম উপার্জ্জনে ।

ছাড়িলে নারদ চাল, পড়ে তাহা মনে ॥
সাধু হও সাধু চাও, সাধু অনুক্ষণ ।
পরকালে সাধে মত্ত, সাধুর আসন ॥
যে কালে তোমার দেশে ছিল মোসলমান ।
মোসলেমের দীন নামে, ছিল গাজী গান ॥
গাজীর গাহেন আর মাদারের বাঁশ ।
দীন নাম বলে এই আছিল প্রকাশ ॥
মোসলেমের মধ্যে এই রৈয়াছিল চিন ।
ইহা বৈ লোপ হয়ে গেল সব দীন ॥
তাতেই রৈয়াছে দীন, নূর মস্তফার ।
সে দীনের শান সেবা এবে দীনদার ॥
আসহে এছাই বন্ধু, করহে আদর ।
তোমার আমার ঘর একই সদর ॥
একেলা তোমার নহে, ইছা পয়গাম্বর ॥
ডেকেছি তাঁহারে আমি করিয়া আদর ॥
বক্ষস্থলে তাঁরে ধরে রেখেছি ভরিয়া ।
জ্বলিছে তাঁহার নূর, গুরুধামে গিয়া॥
তবে কেন আমাদেরে ভাবিতেছ ভীন ।
বন্ধু যার নাই তার কভু নহে দীন॥
বন্ধুর পিরীতি মনে, নাহি আছে যার ।
কেমনে সে হবে ভবে, বল দীনদার॥
ইছা নামে নমস্কার আমার সদায় ।
মুছা নাম সম্বোদিয়া রাখিনু মাথায়॥
যার গুণ অভিলাসী আমি চিরকাল ।
তাঁর হয়ে তুমি ভাব আমাকে জঞ্জাল॥
ভাল হতে চাও যদি ভাল জান সবে ।
ভাল ছিল কৃষ্ণদেব, ভাল মহাদেবে ।
কালাক নামেতে নবী মহাদেবে কয় ।
ছওদল হিন্দ নবী নামে নামে কৃষ্ণ পরিচয়॥
ছওদলের অর্থ কাল কৃষ্ণ অবতার ।
খবরেতে হিন্দুস্থান, ইসারা তাহার॥
সেখ আকবর লিখিলেন, ফছুছ কেতাবে ।
প্রতিমার নেক ছবি, নেক ছিল সবে॥
প্রতিমার ছবি সেবে, হবে গুনাগার ।
আগুন আতশী কাঁচ, দরকার আয়নার॥

যে জন নেকের নেক, নেক সমুদয় ।
তার মন নেক ভিন্ন, বদে মত্ত নয়॥
মন্দে যদি সন্দে হয়, মন্দ বলিবার ।
সন্দে স্থলে মন্দ সেই, নহে হইবার॥
নিজে যদি মন্দ হয় পারে বলিবারে ।
নিজে যদি নেক হয়, নহে কহিবারে॥
অন্যে যদি নেক হয়, বলা যায় তাঁরে ।
দেখিলে পরের গুনা, ছাপাইবে আড়ে॥
পরবদে মত্ত যেই, সেই বদকার ।
হবে না এমন বদ, কখন উদ্ধার॥
এমন বদের কথা, শুনা মহাপাপ ।
বদ নহে যেই দেলে, সেই দেল ছাপ॥
আদেশেন নবীবর আছহাবের তরে ।
পাইলাম এক রত্ন খোদার দরবারে॥
পৃথিবীতে হেন রত্ন নাহি আছে আর ।
দিব কারে নাহি জানি, ভাগ্যে আছে কার॥
বল দেখি সেই রত্ন তোমাদের দিলে ।
কোন নেক করিবেক, তাহার বদলে॥
সত্যপীর সিদ্দিক কন আমল নেকের ।
করি আর করাইব লোকের খাতের॥
কহেন ফারুক পীর যেহাদ আদি কাম ।
দুনিয়ার আরায়েস করিব হারাম॥
পীর গনি কন মাল করিব প্রদান ।
ভাল কামে ভাল নাম রাখিব নেসান॥
শের নূরী নিবেদিলা পশ্চাতে সবার ।
বদ পুশী কার্য্য চাই আল্লার বান্দার॥
একাম করিব আমি যাবৎ জীবন ।
নবী জিউ আলী শাহে বলেন তখন॥
লও রত্ন ধর হাতে খের্‌কা খেলাফত ।
হইল তোমার পরে, খতম মারফত॥
তোমা পরে বেলায়েত হইল খতম ।
পৌঁছিবে তোমার ভাগ্যে, তামাম আলম॥
গদ্দি-নিশী হবে তুমি নূর ইমানের ।
রহিবে তোমার নূর মুল্লুকে জাহের॥
লুদ্দনি চমক বুক তোমার ছফিনা ।

গঞ্জে-রাজা ছিনা তব এছরার গনিনা॥
আদেশ প্রভুর হেন আছিল আমায় ।
হেন বাক্য যেই বলে, খের্‌কা দিবে তায়॥
এবে হের আয়ব-পুশী রত্ন কিবা নয় ।
আয়ব-পুশী মহাপুণ্য পুণ্য সমুদয়॥
হেন পুণ্য মহাপুণ্য, আছে না সংসারে ।
আশু পুণ্য পরপুণ্য নহে তার ধারে॥
সর্বশাস্ত্রে এই ধর্ম অহঙ্কারহীন ।
হিংসা নাই যেই ধর্মে তারে বলি দীন॥
মহেসেনী নিবেদিলা মহাদেব তরে ।
আদেশিবে মহারাজ, ধর্ম বলে কারে॥
মহাদেব সম্বোদিয়া, পার্বতীরে কয় ।
হেন কথা শুনে মম মনে সুখ হয়॥
হেন কেহ জিজ্ঞাসে না ধর্ম ব্যবহার ।
জিজ্ঞাসিছে ধর্ম দীনে ধর্মের আচার॥
ধর্মধামে ধর্মা ধর্ম, ধর্ম সমুদয় ।
সে ঘরেতে ধর্ম নৈলে, তার ধর্ম নয়॥
যে ঘর প্রভুর যাত, ঐ ধর্মপুর ।
লয় হওয়া প্রভুসনে, সে ধর্ম মধুর॥
লয় হওয়া প্রভুসনে, ফানা কামালাত ।
এই ধর্ম এই দীন এই আখেরাত॥
কর ইহা পূজা পাজা অন্য নহে কার ।
অন্তর মানস সনে সকল খোদার॥
অর্চ্চনা মানস নহে দেবদেবী কায় ।
তোষামদ কহে তারে আচার পূজায়॥
যেন রাজা শনি হন প্রথম দিনের ।
রাজ্য ধর পাপ গ্রহ, শনি ঠাকুরের॥
তাই এই তোষামদ, করা হয় তার ।
খোদা বৈ মানসিক নহে হবে কার॥
যে পুজা মানস নাই সেই পূজা নয় ।
তামাসা অলীক আর রাজসিক চয়॥
খেলাভাবে পূজা আর, বৃথা ধুম-ধাম ।
রাজ লক্ষী অন্য পূজা নহে ধর্ম কাম॥
মানসিক ধর্ম বল, যেই ধর্ম নয় ।
অন্য নামে পূজা পাজা, বৃথা পরিচয়॥

ধর্মজ্ঞান নাহি যার, নহে সে মানস ।
মানস রসের নৈলে, নহে সেই রস॥
মহেসিনী শুনে যবে, এ ধর্ম সংবাদ ।
নতশিরে শ্রদ্ধারূপে কৈলা ধন্যবাদ॥
জাল শাস্ত্রে লেখা আছে আর গুরুতর ।
ধর্মপন্থা মহাদেব, আদেশ সুন্দর॥
মহাম্মদ আদেশ এই আদেশ খোদার ।
মানস একিন হয় ইমান বান্দার॥
যে একিনে প্রভু সনে মন-তন ফানা ।
লয় আর ফানা সেই স্বার্থ মূল জানা॥
ইহাই হাদিছ আর ইহাই কোরান ।
ইহাই ধর্মের পন্থা, এই মূল গেয়ান॥
এই জ্ঞানে মহাদেব, মহাম্মদে ভিন ।
নহে কিন্তু মূল দেশ, স্বার্থ মূল দীন॥
মূল যার মূল পদ মূলে মূলাধার ।
যার ধর্মে সেই ধর্মী হইবে উদ্ধার॥
ঋগ বেদে তাই তার বর্ণিত নিশান ।
ধর্ম দেব মান্যবরে কৈলাস সমান॥
যে নামের গুণে সবে হইবে উদ্ধার ।
আসিবেন শেষ দেব, পরে সবাকার॥
তার নামে 'ম' হরফ, প্রথম অক্ষর ।
'হ' হরফ মধ্যমেতে 'দ' তৎপর॥
গো-মাংস তাঁর ধর্মে, করিবে ভক্ষণ ।
না ধরিলে তার পানা হবে না মোচন॥

"কল্‌কী অবতার"

কল্‌কী পুরাণেতে লেখে কল্‌কী অবতার ।
আসিবেন উদ্ধারিতে, এ ভব সংসার॥
রাজ্য আদালত আর, রীতি ধর্ম কাম ।
লোভ হবে রবে শুধু ধর্ম মাত্র নাম॥
হীনে দিনে দিনে হীনে, ভাল মন্দ যত ।
শান্ত হবে মন্দ জন, ভাল জন হত॥
কান্দপরে পৈতা শুধু নামে ব্রাহ্মণ ।
চিম্‌টা হাতে ভস্ম অঙ্গে চোর মহাজন॥

দেশ জুড়ে হবে যবে, অন্যায় অত্যাচার ।
আসিবেন উদ্ধারিতে কল্‌কী অবতার॥
জনম লইবা সেই ব্রাহ্মণের ঘরে ।
কলিকালে সত্য যুগ বিস্তারিত তরে॥
সম্বল দ্বীপেতে জন্ম হইবে তাহার ।
বিষ্ণু ইস সুমতী নাম তার বাপ মার॥
ইস অর্থে খোদা আর বিষ্ণু বান্দাচয় ।
আব্দুল্লার এই মানী আরবেতে কয়॥
সুমতীর অর্থে মানী আমানতদার ।
আরবেতে এই অর্থ শব্দ ব্যবহার॥
আব্দুল্লা পিতার নাম, আমেনা মাতার ।
এই নাম পিতা-মাতা কল্‌কী অবতার॥
ব্রাহ্মণ অর্থে গুরু পীর খান্দানের ।
সৈয়দ কুলেতে জন্ম ব্যক্ত আরবের॥
সত্য যুগ পৃথিবীতে হবে বিস্তারিত ।
একাচারী হবে লোক পূর্ব রীতিনীতি॥
ছুঁই ছুছি রহিবে না হিন্দু মুসলমান ।
খাদ্য রস একসাথে সকল সমান॥

দৃষ্টান্ত

নবীজির সভা শিরে, এসে কোনজন ।
তিরস্কার করে পুন সকলে আপন॥
মুনাফিক লোক এই দেখি সমুদয় ।
নবীবর কোন সত্য কহিলে নিশ্চয়॥
আর এক বলে গিয়া দরে পয়গাম্বর ।
ভাল-মন্দ বৈঠকের মধ্যে নারী-নর॥
নূর-নবী প্রত্যুত্তরে কহেন নিশ্চয় ।
তুমি যাহা করিয়াছ সত্য পরিচয়॥
তারপরে দরবারে এসে একজন ।
বলে দেখি সবাপর নেকি বান্দাগণ॥
নবীবর প্রত্যুত্তরে বলে তার ঠাঁই ।
তুমি যাহা বলিয়াছ যথার্থই তাই॥
নবীবরে নিবেদিলা আছহাব তামাম ।
শুনি নাই কভু হেন আজব কালাম॥

কেউ বলে মুনাফেক কেউ বলে নেক ।
কেউ বলে ভাল-মন্দ, সভার অর্দ্ধেক॥
প্রত্যুত্তরে বুঝা যায় সত্য বলে তারা ।
তিনজন সত্য বল বলিছে কি তারা॥
নবীবর কন এই সত্যই সম্বল ।
দেখিয়াছ যাই তাই আপন আমল॥
যাহার নেকের চক্ষু দেখে সেই নেক ।
নেফাক যাহার দেলে দেখে মুনাফেক॥
নেক বদ যার ঠাঁই যত পরিমাণ ।
রৌশন তাহার মনে তেমন গেয়ান॥
গেয়ান দর্পণ মূলে যেই ছায়া পড়ে ।
দেলের দর্পণে তাহা দেখিবে নজরে॥
ভাল যেই তার ঠাঁই কেহু মন্দ নয় ।
সম্বন্ধ নেকের সনে নেকের বিষয়॥
পানি মধ্যে চিনি দিলে সব পানি চিনি ।
পোয়া চিনি মধু মিষ্ট, সের সের পানি॥
জল তলে তল শিরে সব জলময় ।
যদ্যপি সকল তনু উপরেতে রয়॥
মমিনের ইমানেতে ডুবে যদি শির ।
জল মগ্নে খুলে যায় তরঙ্গ নেকির॥
তরঙ্গ নেকির সনে যার অধিকার ।
দেখিবে নেকির ঢেউ সকল সংসার॥
পুত্রের আদর ধন মানস মাতার ।
গুনা কৈলা তবু পুত্র নহে গুনাগার॥
দয়া নদে মাতারস মিষ্ট সমুদয় ।
গুণ যার গান তার মাতার তনয়॥
পাপ দেখে গান যার নেক মিষ্ট গান ।
দয়া রস মধু গুণে, মাতা গুণবান॥
মাতা রস তনে যার করেছে আসন ।
করিম রহিম গুণ যার সিংহাসন॥
ডাহিনে রহম ঘর খোলা গেছে তাঁর ।
চক্ষু কর্ণ নাসা স্বরে হিত অনিবার॥
বামে বদ সে দ্বার রহিত হবে যার ।
নেক রস তার দেশ নিত্য অধিকার॥
দক্ষিণে জীয়ন আর উত্তরে মরণ ।

নেক বান্দা নিজ ঘরে করিবে স্মরণ॥
উত্তর অঞ্চল ঘর সেই বদ জন ।
কাল রূপ দর্পণেতে কাল ত্রিভুবন॥
দেল কালা কালা মুখ কালা সমুদয় ।
সে দর্পণ কাল রূপে কেহু ভাল নয়॥
নেক মনে নেক নূর যার অধিকার॥
সে দর্পণে নেক হেরে এ ভব সংসার॥
ফলিছে নেকের ফল কণ্টক বদনে ।
বিষাদে আস্বাদ নেক রাখিয়া যতনে॥

দৃষ্টান্ত

শাহেন শাহে অলী আলী খাজে মৈনদ্দিন ।
আজমিরে গুরুধামে চমকিছে দীন॥
হিন্দুস্থানে নর নারী হিন্দু মুসলমান ।
জেয়ারতে মন মগ্ন সকল প্রধান ॥
আকাশ প্রদীপ ন্যায় শোভা পদ্ম কর ।
করিছে দীনের বেলা সূর্য্যের পশর ॥
সে আলো হেরিলে লোভ হয় লভিবার ।
পদ্মকুলে অলি যেন গতি বার বার ॥
উরসে রসের দীন হলে নমুদার ।
প্রজা রূপে পদ্ম লোভে কুসুম মাঝার ॥
দলে দলে যাত্রীগণ নর নারী বর ।
গুরুধামে মেলা ক্ষেত্রে করেন পশর ॥
মাওলানা মৌলবীগণ হাফেজান কারী ।
সন্ন্যাসী ফকির পীর শহর বাজারি ॥
জেকের আজকার আর গান বাজাসুর ।
শতেক সহস্র মিলে বহু দূরা দূর ॥
কিন্তু ঐ হিন্দুস্থানে আছেন দস্তর ।
আম খাছ নারীগণ যান ভুরা ভুর ॥
মাওলানা মৌলবী আর হাফেজ কোরান ।
বিবীগণ তাঁহাদের যান সেই স্থান ॥
কিন্তু এক মাওলানায় নিজ পত্নী তরে ।
মানা করে একেবারে যাইতে মাজারে ॥
শুনিছে না সেই বিবী মানা পুরুষের ।

মাওলানা বলেন তবে বিবীর খাতের ॥
যাও যদি রোখা এক হাত নিয়া যাও ।
গদ্দিনিশী বসা যিনি তাঁহারে পৌঁছাও ॥
একথা বলিয়া রোখা দিল তার তরে ।
পৌঁছালেন পত্র নিয়া অলীর সদরে ॥
পত্র পড়ে সে মস্তান হাসে মিষ্ট হাস ।
বিবী বলে কেন হাস করহ প্রকাশ ॥
বলে নয় সেই কথা হবে না প্রকাশ ।
রোখা এক দেই আমি দিও মিঞা পাশ ॥
পরে যবে রোখা লিয়া আসিলেন ঘরে ।
পৌঁছাইলেন সেই রোখা আপন শহরে ॥
পত্র পত্রে সেই মিঞা মিষ্ট মিষ্ট হাসে ।
জিজ্ঞাসিলে কেন হাস মিঞার সম্পাসে ॥
মস্তান হাসিল যেন কেন হাস তুমি ।
কহ বন্ধু সেই কথা বুঝি নাহি আমি ॥
মিঞা বলে সেই বাক্যে তব কিবা কাম ।
বিবী বলে তাহা নৈলে হবে বে আরাম ॥
মিঞা বলে এই কথা লিখিনু মস্তানে ।
বহু নারী যাইতেছে তোমার সদনে ॥
মানা করে দিবে যেন নাহি যায় তাঁরা ।
আছিল রোখার মধ্যে এমনি মাজারা ॥
লিখিলেন রোখা সেই মম বরাবরে ।
আপন বিবীকে নাহি পার রাখিবারে ॥
অন্য অন্য নারীগণ হাজার হাজার ।
কেমনে শুনিবে মানা বলহে আমার ॥
তাই আমি হাসিলাম তাই হাসে সেই ।
হাসিলেন বিবীমিয়া কথা মধ্যে এই ॥
হুড় জঙ্গ ধর্ম বাদ হালাল হারাম ।
বলে অন্যে নাহি হেরে আপনার কাম ॥
নিজ রিপু, নফছয়ার নাহি শুনে বাত ।
অন্যের পুণ্যের জন্যে সাধনে দাওয়াত॥
এক নারী বশ যার না রহে সরায় ।
অন্যের দাওয়াত লজ্জা পুণ্যের আশায়॥
পুণ্য কামে শূন্য যেই রিপু ধর্ম তার ।
রিপু মদে মত্ত সেই রিপুর সংসার॥

একে অন্যে কহি যারে আকাঙ্ক্ষা যাহার ।
হবে না ধর্মের দেশ তার অধিকার॥
যে জন ধর্মের দেশ করিছে আসন ।
ধর্ম মদে সদা তার মত্ত মন তন॥

তৃতীয় সংস্করণ

হযরত মেহেদির এই সময় নিশ্চয় ।
জাহের হওন তান হালে পরিচয়॥
হাদিছ কোরানে যত আগামী খবর ।
দরবেশ অলীর বাক্য সেই বরাবর॥
কত সনে কত দিনে আলামত তার ।
কোন্ রূপে কোন্ দেশে আগমন আর॥
কে হবে সঙ্গের সঙ্গি, খলিফা ইয়ার ।
ফকির হবেন তার সঙ্গে মদদ্‌গার॥
বেলায়েত যেই দীনে নবী মস্তফায় ।
করিলেন করিবেন তার পায় পায়॥
লোপ হয়ে যেই দীন গেছে একেবারে ।
ইহকালে আসিবেন উদ্ধারিতে তারে॥
দীন নামে রহিয়াছে যেই মাত্র দীন ।
উদ্ধারিবা জানাইবা আনওয়ার একিন॥
সে নূরে উজ্জ্বল হবে এ ভব সংসার ।
এ সংসারে অন্ধকার রহিবে না আর॥
নূর দীনে অন্ধকার রহিতে না পারে ।
অন্ধকারে অন্ধকার নূর দিবে কারে॥
ধর্মজ্ঞান সার নূর ভাগ্য নহে যার ।
উদ্ধারিতে সাধ্য নহে কোন গুনাগার॥
অন্ধকার গৃহ আদি যথা অন্ধকার ।
সার নূর বিনা তাহা হবে না উদ্ধার॥
সেই নূর সেই দিন, সেই ধর্ম সার ।
যেই নামে মুহাম্মদ সে নাম খোদার॥
যে বিদ্যে পরম পন্থা হৈয়ে যাবে ভুল ।
কখনো এমন বিদ্যা, নহে ধর্ম মূল॥
তাই এ সংসার জুড়ে যত বিদ্যাবান ।
অধঃপাত বিনা কার নহে পরিত্রাণ॥

তাই তাহা উদ্ধারিতে আসিবেন অলী ।
শত শত বিদ্যাবান আন্ধার সকলি॥
নহে কেন হইবেন এবে আগমন ।
প্রজ্বলিত দীন যদি রহিত রৌসন॥
এলেম কপট এই দীন হতে দূর ।
প্রকাশ্য এলেমে নাহি ভিতরতে নূর॥
নূর পেতে শিখে যারা দূর পড়ে যায় ।
কপট এলেমে নূর পাইবে কোথায়॥
প্রেম রসে যাও এবে, মমিন সকল ।
পূর্ণ রস এস্ক বিনা পাইবে না ফল॥
এস্কের এলেম নৈলে নহে তার দীন ।
এস্কেনূর যার দেলে সে জন মমিন॥
সে এলেম নাহি যার নহে দীনদার ।
কপট এলেম তাই হাদিছ মাঝার॥
বিষম কপট বিদ্যা মূল নূর দীনে ।
হইবে না দীনদার এস্ক রস বিনে॥
তাই তান ইহকালে হবে আগমন ।
পৃথিবীর শেষ এই হইবে পতন॥
পতন হইতে আর বহু দেরী নাই ।
শেষ মূল আলামত সবে বলে যাই॥
নয় হাজার সন হেন পুরুষ আদম ।
ইহ ভবে আগমন কিছু বেশ কম॥
ষাইট গজ লম্বা যার অজুদ শরীর ।
এক গজ রহিছে না লোক পৃথিবীর॥
ষাইট গজে একগজ রহিতে না পারে ।
পিপীলিকা মত হবে কত দিন পরে॥
পিপীলিকা মত যদি হইবে মানুষ ।
কেমনে ব্রহ্মাণ্ড রবে কর দেখি হুঁশ॥
হয়ত মানুষ হবে পতন নিশ্চয় ।
নয়ত পৃথিবী হবে ফানা সমুদয়॥

দ্বিতীয় কথা

হিন্দুস্থানে মানুষের হবে কদ মাপ ।
ঐ দেশে আদমের বাস্তব্য প্রতাপ॥

হওন মরণ হবে যেই দেশে যার ।
সেই দেশ জুড়ে হবে নমুনা তাহার ।
আদমের কাল হতে মস্তফার কাল ।
বেশ কম কিছু হবে সাত হাজার সাল॥
ষাইট গজে তিন হাত রহিল শরীর ।
তাই ছিল ষাট গজে হাদিছ নবীর॥

হযরত আদমের শরীর এবং অন্যান্য অঙ্গগুলির মাপ ও পরিমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ

শরীর ..... ১২০ হাত
হস্ত ..... ৩৪ হাত
আঙ্গুলি ..... ৫.৫ হাত
পত্রপত্রি ..... ১৭ হাত

চলন ও ভ্রমণ

কদম প্রতি ..... ৫১ হাত
মাইল প্রতি ..... ৬৭ কদম
দিন প্রতি ..... ১৬৮০ মাইল
মাস প্রতি ..... ৬০৪৮০০ মাইল

এমন কোন নৌকা কিম্বা জাহাজ বোধহয় কোথাও নাই যে, যাহাতে তিনি সামাই হইতে পারেন ।

পেশগুই – ভবিষ্যৎ বাণী

স্বর্গীয় হযরত এমাম মহিয়াদ্দিন আরবী সাহেবের নিজকৃত ফতুয়াতে মক্কিয়া নামক কেতাবে অজারল মেহদী বলিয়া যে কতেকগুলি কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিত বিবরণ লিখা যাইতেছে । তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ওছমানিয়া রাজ্যের দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খাঁন ৩২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া মাজুল হইবেন এবং ঐ মাজুল হওয়ার অষ্টম বৎসর সময়ের মধ্যে আরও দুইজন সুলতান ক্রমাগত ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিতেই হযরত এমাম মেহদী কলকী অবতার প্রকাশ হইবেন । সেমতে সুলতান আবদুল হামিদ খান ঠিক ৩২ বৎসর কাল স্থিতি থাকিয়া তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন । অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৭৭ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৯০৯ সালে মাজুল হন ।

পুনরায় লিখিয়াছেন যে, হিজরী ৩৫ সনেই হযরত এমাম মেহদী সাহেব প্রকাশ হইবেন । আবার ঐ সেখ আরবী সাহেব ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন সুলতান মুহাম্মদ রশিদ তক্তনিশী হইল তাহার কিছু কালের মধ্যেই অর্থাৎ হিজরী ১৯ সনে

তাঁহার রাজত্বকালে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ঐ যুদ্ধেই পরাজয় হইবেন এবং ৩০ সনে কিঞ্চিত জয়লাভ করিবেন কিন্তু আবার ৩১ সাল হইতে পৃথিবী জুড়িয়া লড়াই উপস্থিত হইবে। এমন কি সমুদয় ইউরোপীয়ানদের একতা একেবারেই লোপ পাইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ ১৯ সনের বুলগিরিয়ান গীং শত সহস্র মুসলমানদিগকে অযথা হতাহত করিবে, বরং (আম কাতল সমুদয় সহকারে) একত্রে হতাহত করিবে, বরং ফলেও তাহাই হইয়াছে। এই হিসাবে সেখ (মং) সাহেবের পেশগুই অর্থাৎ (ভবিষ্যৎ বাণী) বর্ত্তমান সন হইতে ৫৮১ বৎসর হইয়াছে অর্থাৎ ৫৮১ বৎসর পূর্বেই বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লা সাহেবও লিখিয়াছেন এবং শাহ্ নিজামুদ্দিন আউলিয়া সাহেব (মং) এরূপই নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ১৩৩৫ হিজরী ও ১৩৪০ পর্যন্তই এমাম সাহেবের প্রকাশের শেষ পক্ষ নির্দ্ধার্য্য রহিয়াছে এবং ৪০ বৎসর অতিরিক্ত যে আর কেহ লিখিয়াছেন, এইরূপ দেখা যাইতেছে না। আবার জার্মানের কয় সাহেবের বড় মন্ত্রীর একজন প্রধান শীর্ষ ট্যালেষ্টট সাহেবের পেশগুই (ভবিষ্যৎ বাণীতে) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে ইংরেজী ১৯১২ সনে লড়াইর একটি মালা ফুটিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর কাল নদীতে একটি সুন্দরী ভাসমান, তাহার পশ্চাতে সমুদয় সংসার ধাবমান হইয়াছে, ইব্রানী ভাষায় তাহাকে গোগ মাগোগ কহে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, উনি ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব কোণে আপন রাজকার্য্য করিতেছেন। আবার আমি ইহাও দেখিতেছি যে দশ বৎসর কাল সময়ের মধ্যেই সমুদয় পৃথিবী তাঁহার শাসনে আসিবে। এবং তাঁহার ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম পৃথিবীতে বর্তমানে থাকিবে না। আমেরিকাবাসী পণ্ডিতগণ পুনরায় তৌরাত নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া হযরত এমাম সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করিয়াছেন যে, তৌরাতে ৬/২৭ আয়াতের শেষ ভাগে লিখিত আছে যে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের রাজ-রাজাদের মধ্যে একতা একেবারেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং পশ্চিম দেশবাসীগণ, পূর্বদেশবাসীগণকে হীন চক্ষে দৃষ্টিপাত করিত, সেই অহঙ্কার একেবারেই ভূমিসাৎ হইতে হইবে।

পেশগুই (ভবিষ্যৎ বাণী)

পূর্ব দেশীয় ৩২ কোটী নর-নারী এবং চীন ও জাপান একত্রিত হইয়া ঐ ইউরোপকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে। এবং হর মাগিদনের দিকে ধাবিত হইবে সেই সময় বিধর্মির এক ধর্ম ভিন্ন আর অন্য কোন ধর্ম পৃথিবীতে বর্তমান থাকিবে না। এবং দশ বৎসরের মধ্যে সমুদয় রাজ্য ঐ বিধর্মির হস্তগত হইবে। আবার ফার স্থানের জরতস্ত নামক আতস পূজক পণ্ডিতের বিধান মতে এই রূপই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফল কথা সমুদয় ভাগ্য খোদাতালার হস্তে নেস্ত রহিয়াছে। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে যে, কার্য্যের ফল তাহার ক্রিয়া ক্ষেত্রেই ফলিতে থাকে, কালের ফল কালেই ফলে। সময়

আসিলে বুঝিবার একটি উৎভাবনা হইয়া উঠে। কিন্তু কালের পরিমাণ যাহারা না জানেন কিম্বা কালের গৌরবে গৌরবান্বিত নহেন তাহাদের শুষ্ক চর্মের ন্যায় শরীর সমাজের কোন পক্ষপাতি নহে। আবার ইঞ্জিল নামক কেতাবে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, যেই ধর্মের গৌরব, অর্থাৎ সার পদার্থ অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে, সেই ধর্মই চিরস্থায়ী ধর্ম বটে। তাহার গৌরব পৃথিবীতে সোনাতন ধর্ম বা নূরী ধর্ম গুণে বিরাজমান থাকিবে। সুতরাং ঐ ধর্মাবলম্বীদের হস্তে বাইতুল মোকাদ্দেসের শাসন ও রক্ষণ নিয়ত স্থির রহিবে। আবার ঐ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, ঐ অটল ধর্মের শেষ পক্ষে উহার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই ব্যক্তিই ঐ অটল ধর্ম বলে অন্যান্য ধর্মগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া নিজ ধর্ম বল প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। তাহার বিকশিত হইবার লক্ষণ এই যে, আদম শুমারিতে ঐ ধর্মাবলম্বীদের হার গণনায় বিলক্ষণভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হার প্রায় দুয়ানা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সমুদয় জাতির মধ্যেই এক আনা কি দেড় আনা হারে লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ইহারই বা কারণ কি? অথচ হিন্দুজাতি সকল জাতি অপেক্ষা একেবারেই হ্রাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের হার গণনার দুয়ানা দুয়ানা হারে কমিয়া গিয়াছে। তবে কি ঐ জাতির গৌরব সত্বরই লোপ প্রাপ্ত হইবে? ফল কথা ইঞ্জিলের ভবিষ্যৎ বাণীর ফল উপস্থিতির বোধ হয় বর্তমান কালই যথার্থ। আবার হিন্দু ধর্মানুসারেও স্পষ্টরূপে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা কল্‌কী পুরাণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পৃথিবীতে কল্‌কী অবতারের বিরাজমান কিংবা আগমনকাল উপস্থিত হইতেই অন্য কোন ধর্ম বিশিষ্ট বা জাতির প্রথার সার্থকতা কিম্বা মর্যাদা স্থির থাকিতে পারিবে না। কারণ সোনাতন ধর্মের অস্তিত্বেই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম বিলোপ প্রাপ্তি হইবে। যেহেতু অন্যান্য ধর্মগুলি ঐ ধর্মের অস্তিত্বেই লোপ হইয়া সোনাতন বা নূরী ধর্মে নিরোপিত হইবে তখন যাবতীয় ধার্মিকগণ ঐ সত্য ধর্মের সাথে বিজড়িত হইয়া একচিত্তে ও সরল অন্তঃকরণে একাচার ও এক ধর্ম অবলম্বন করিবেন। যেহেতু ঐ ধার্মিকগণ পরকাল অনুরাগে মাতিয়া উঠিবে। সুতরাং ঘোর কাল নিদ্রার বন্ধন রসিগুলিকে একেবারেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতঃ চির জাগরিত হইয়া অক্লান্তির কুশাসনে আরোহণ করিবেন। আবার কেহু কেহু এ সোনাতন ধর্মকে ম্লেচ্ছ ধর্ম নামে উপাহিত করিয়াছে। মোস্‌লেম শব্দ হইতে ম্লেচ্ছ শব্দ "মোস্তাক" বাহির করা হইয়াছে। নতুবা ম্লেচ্ছ অন্য কোন শব্দকে বলিতে হইবে। কেহু কেহু ম্লেচ্ছ অর্থে পাহাড়ী ও খণ্ডলী জাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই কথার সার্থকতা কত দূর সত্য তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না কারণ ঐতিহাসিক প্রণালীতে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু ধর্ম পাহাড়ী বা খণ্ডলী লোক দ্বারাই ক্রমান্বয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতএব ঐ হিন্দু ধর্মের মর্যাদা স্থির থাকিতে পারে নাই। তবে যে ধর্মকে সোনাতন ধর্ম অথবা পরকাল সঞ্চয় বলিতে হইবে তাহাকে ঘৃণিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে কিম্বা

তাহার অস্তিত্ব রক্ষা না করিয়া গর্ত্তের সর্পের ন্যায় ঘোর নিদ্রায় মাতিয়া রহিলে আর কি প্রকারে নূরী ধর্মের সার্থকতা বজায় থাকিবে। হ্যাঁ অবশ্যই যদি কোন অসভ্য জাতি হইতে নূরী ধর্মের আদিত্বতা সৃষ্টি হইত কিম্বা অমূলজনক কোন কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে আজ ঐ পুরাতন ধর্মের নাম নূরী ধর্ম বা সোনাতন ধর্ম বলিতে হইত না। কারণ সভ্যশক্তি না থাকিলে কাহারও সভ্যতা গুণ বিশিষ্ট তাহা হইতে আকর্ষিত হইতে পারে না। দেখুন যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কিম্বা তাহার সোনাতন ধর্মকে অবহেলা বা নিন্দা করিতে অকুণ্ঠিত নহে তাহাদিগকে আজ দেখা যাইতেছে যে, ঐ ধর্মের কুহুকে পড়িয়া ঐ ধর্মাবতারের কোমল চরণ সেবা করিতে বৈরাগী হইয়াছেন। হে সভ্য তোমার সভ্যতা কস্মিনকালেও বঞ্চিত হইবে না, তোমার ঐ ধর্ম সোনাতন ধর্ম। উহাই পরকাল উদ্ধারের একমাত্র উপায়। কোরান বা অথর্ব্ব বেদানুসারে হযরত এমাম মেহদী সাহেব ঐ ধর্মপ্রথা শেষ করিবেন। ইহা কোরান ও নবী সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণীতে প্রকাশ হইয়াছে। হে মানবগণ আসুন, আজ আমরা এই তীর্থে যাত্রা করিয়া এক মেলায় বা এক মন্দিরে মহানন্দে পরম সুখে গান করি এবং এক মনে এক প্রাণে মিশিয়া যাই। 'জগতে আর কিছুই না থাকুক' একমাত্র বন্ধুত্বই থাকুক। হে বান্ধব। তোমার বান্ধবিতা ভিন্ন জগতে আর কি আছে? হে বান্ধব আস। বান্ধবিতাই পরকালের মহাধন। বান্ধবিতা ভিন্ন নিস্তারের আর অন্য কোন উপায় নাই তাই তুমি আমার বান্ধব হও আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া ডাকি। হে প্রিয়ে আস। আমরা মহানন্দে আপন আপন গৃহকার্য্য করি! ঘরের কলহ মহাদোষ। হে বান্ধব। বন্ধুর অনুগ্রহ সুধা ভক্ষণ কর। হে সখা। দেখত। সত্যই কি বন্ধু বৃক্ষে অমর ফল ফলিতেছে কি না। হাঁ প্রিয়ে। অবশ্যই প্রিয়ে কল্যাণে ঐ কল্প তরুর শাখায় অমর ফল ফলিয়াছে। "রে দোস্ত" মান থাকিলে দুস্তি কৈ। দোস্তের মান নাই, অপমান নাই, ঘৃণা নাই, অসত্যতা নাই, আছে মাত্র সরলতা। আবার এক হইতেই একতা স্থির হইয়াছে। একের শাখাই ২। ৩। ৪। ইত্যাদি অগণা ফল বলিয়া পরিচয় দিতেছে। উহার গোড়া এক, জোড়ায় দুই। জোড়া স্থলে গোড়, বিস্মরণ হইও না। রজ গুণ প্রথম গুণ নহে। অর্থাৎ রজ, সত্য, ত্বম, এই তিন গুণ বৃক্ষের শাখার ফল মাত্র। যেহেতু রজগুণের স্বার্থের স্বার্থি ব্যক্তি ধর্মদেব জন্ম করিয়া পরিণত করিতে অপারগ, তাই সত্য গুণ স্বার্থের রক্ষক বা পালন কর্ত্তা যে বিষ্ণু তাই তাহা দ্বারাই রক্ষা হইয়া থাকে। আবার যদি এই দুই গুণ বিশিষ্ট স্থূল পদার্থ গুলি ধ্বংস করিতে ত্বম গুণের প্রয়োজন হয়, তবে আবার রজ গুণ পদার্থের প্রথম গুণে ধর্মই যদি ঈশ্বর হন তবে বিষ্ণু কিম্বা মহাদেব আবার তাহারাই বা কেহ ঈশ্বর সর্বগুণে গুণী এবং তিনি অদ্বিতীয় পদার্থ। সর্ব গুণ ব্যতীত পৃথক পৃথক গুণে বা ২। ৩। ৪। ৫ কিংবা খণ্ড ও সীমাবদ্ধ গুণী ঈশ্বর হইতে পারে না। এই বিশ্বাসের ঐ ধর্মাবলম্বীদের পরকালীন রাস্তাগুলি রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে মোসলেম ধার্মিকগণেরও কতেকগুলি ভ্রান্তিপথ অবলম্বনে পরকালের পথ ক্রমান্বয়ে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ পুণ্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও পুণ্যবান

বলিয়া মনে করে না। সুতরাং নামাজ রোজার মূল পদার্থে একেবারেই অজ্ঞান। সেই জন্য ইসলাম ধর্মের স্বার্থ কিম্বা মূল পদার্থে যাহারা বিজ্ঞ তাঁহাদের কৃপায় ঐ ধর্ম বর্তমানেও সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহারাই সোনাতন ধার্মিক বা আউলিয়া দরবেশ অর্থাৎ সাধু ও ন্যায্য পথগামী বটেন। অথএব ঐ ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যেই এমাম মেহদী সাহেব এই জগতে আগমন করিবেন। হিন্দু গৃহে জন্ম হইলেই রাম নাম উচ্চারণ করিতে হয়। মুসলমানের বীর্যে জন্ম হইলেই আল্লা নাম জপ করিতে হয়। তবে কে জানে, কে কি হারে কোন গৌরবে ধর্ম রক্ষা হয়। আমি মহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছি। এবং এই সমুদ্র পার হইতে না পারিলে তটে দাঁড়াইলে আমিই বা কে, আমরাই বা কে? খোদা তুমি রক্ষাকর্তা, তুমি আমাদিগকে এই মহাসাগর হইতে উদ্ধার কর। আমিন। ফল কথা, খোদা এক বস্তু এবং সর্ব চূড়ান্ত এক অটল পদার্থ অর্থাৎ তিনি এইরূপে এক অদ্বিতীয় পদার্থ যে তাহার যোগ্য অন্য কোন জিনিষ আছে এরূপ কথা কখনও স্থির হইতে পারিবে না। সুতরাং প্রথম পদার্থ বা প্রথম অঙ্কই ঐশ্বরিক পদার্থের প্রথম গুণ। যেমন এক অঙ্কের অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের পূর্বে আর অন্য কোন অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইতে পারে না আবার ঐ অঙ্কের পর যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ অঙ্ক করিতে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে তাহাও এক সংখ্যক অঙ্কই থাকিবে। যথা ক্রান্তি, কাগ গং। তবে এক ব্যতীত আর অন্য কোন অঙ্ক নাই বলিলেই হইবে। আবার যখন এক গণিতে হয়, তখন ঐ অঙ্কই পদার্থ বলিয়া প্রকাশ হয়। পুনরায় যখন অবশিষ্টার্থে অমিল অঙ্ক থাকে তাহাকেও প্রকাশ এবং নিরাকার পদার্থ বলিতে হয়। ঐ অঙ্কই নিরাকার সার পদার্থ (মণি) বলিতে হইবে। এই জন্যই পবিত্র কোরানে কথিত আছে, "ওয়াল্লাহু বেকুল্লে সাইয়েন মুহিত" অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল পদার্থে বিরাজিত আছেন। আবার (ঐ পরম খোদা) সকল জিনিষের প্রথম পদার্থ বটেন। তাই কোরানে প্রথম বলিয়া বর্ণিত আছে। "হুয়াল আওয়াল" অর্থাৎ, খোদাই সকল জিনিষের প্রথম পদার্থ। "হুয়াল আখের" অর্থাৎ, তিনিই সকল বস্তুর শেষ পদার্থ। "হুয়াজ্জাহের" অর্থাৎ, প্রকাশ্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ তিনিই সর্বময় প্রকাশ্য। এই স্থলে অন্ধের সঙ্গে কোন তুলনা নাই। "হুয়াল বাতেন"। অর্থাৎ, তিনি অপ্রকাশক মূল ও স্থূল পদার্থ বটেন, অর্থাৎ আকার কিম্বা নিরাকার বলিতে হইলে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ অটলভাবে বর্তমান বা মৌজুদ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে গুণহীন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তাহারা আদৌ খোদার ব্যাখ্যা করিতে শিখেন নাই। বরং উহারা ধর্মকে ডাল-খিচুড়ি রূপে পাকাইয়া যথার্থ পথ হইতে ভ্রান্তিজনক জ্ঞানে পরমেশ্বরকে অপদার্থ বলিয়া নিরোপিত করিয়াছেন। আবার যাহারা এই অমূলক রহস্যের শ্রাদ্ধে কাতার দিয়া চলিয়াছেন, তাহারা আর কখনও জাগরিত হইতে শিখেন নাই। হে বন্ধু। গুরুপদ ভক্তি কর, ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। গুরুর মহিমা জানিতে পারিলে ধর্মের ফল প্রাপ্তি হইতে পারা যায়। তাই ইসলাম ধর্মের ফল গুরুর হস্তে অর্পণ করা গিয়াছে। ইহাই কোরান তত্ত্বজনক দীন মুহাম্মদী নূরী বা সোনাতন ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কাহারও

পর মুক্তির আর কোন পথ দেখা যাইতেছে না। তাই হিন্দু ধর্মের মূল শাস্ত্রও ইহারই পক্ষপাতি, যথা ঋগ-বেদ। আবার ইহুদী ধর্মের মূল শাস্ত্র তৌরিত কেতাব ও খৃষ্টান ধর্মের মূল শাস্ত্র ইঞ্জিল নামক গ্রন্থ দীন মুহাম্মদীরই পক্ষপাতি। অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে সকল ধর্মের শেষ পক্ষে যে অবতার আসিবেন তাহার নাম আহাম্মদ ও মুহাম্মদ। তাই তিনি তোমাদেরও ধর্মদেব, উহার ধর্মশাস্ত্র কোরান। অথর্ব্ববেদ – তাহার পক্ষপাতি না হইলে কাহারও কোন ধর্ম যোগ্য কিম্বা ফলবান হইতে পারে না কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করিয়া দেখি, তবে তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যে, অথর্ব্ববেদই মূল ধর্মের একমাত্র সঞ্চয় বলিতে হইবে। কেননা যখন উল্লিখিত বেদ ধর্ম মূল শাস্ত্রে পরিগণিত, আবার সকল শাস্ত্রই তাহার অনুকুলে দাড়াইয়া তাহার দোহাই দিতেছে। এখন যদি আমরা তাহা কর্ণপাত না করিয়া, কেবল অযথা সিদ্ধান্তে নীরব থাকি তাহা হইলে আমাদের আর পরকালের কোন উপায় আছে? কিন্তু এই বর্তমানে বিষয়গুলি উল্লেখ করা যে কোন গ্রন্থের কত অধ্যায়ে লেখা আছে, তাহা জায়গা বিশেষ উল্লেখ করা যাইবে।

নবী ছাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী। হাদীছ।

ছেহা ছেত্তা নামক ছয়টি কেতাবে
এই রূপেই বর্ণিত আছে।

হাদীছেতে কেয়ামত, আলামত যত।
লিখিলে সেসব কথা, হতে হয় হত ॥
ভূমিকম্পে মাটি ডেবে যাইবে যখন।
স্থানে স্থানে বহু দেশ হইবে পতন ॥
হইয়াছে যথা এবে, আগোচর নাই।
হিন্দ কি আমেরিকা দেশ, ইউরোপে তাই ॥
কত দেশ ডুবে ছিল, কত গেল তল।
উচা নীচা হল কত, কত হইল জল ॥
কত লোক মারা গেল কত পশুজাত।
দেশ দিগে হয় গেছে, লোকের সাক্ষাত।
ছুটিবে গরম হাওয়া, মরিবে পরান।
আমেরিকাতে এবে তাহা হ'ছে বিদ্যমান ॥
শত শত গাঁয় গাঁয় গরম হাওয়ায়।
পুড়ে গেল ঘর বাড়ী, অনেক জায়গায় ॥
কত লোক দেশ ছেড়ে পলাইল যারা।
সেই স্থানে জ্বৈলে পুড়ে, মরিলেক তারা ॥

তের ছদি এগার কি হবে বার সন।
বঙ্গদেশ উত্তরেতে গরমে মরণ ॥
এক লাল মেঘ সনে গরম তুফান।
বহু পরানীর তায়, উড়িল পরান ॥
মনুষ্য কি জীব জন্তু, জলে মরে মীন ॥
জল তত্ত্ব যে বাতাসে, হল সেই দিন ॥

কেয়ামতের নেশান

হাদীছ

রমজানের একমাস মধ্যেই শুক্রবার দিন চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণ হইবে বলিয়া "দারে কতুনী" নামক গ্রন্থে যে বর্ণিত আছে তাহাও প্রকাশ হইয়া গেল। যথা বাঙ্গালা সন ১৩০০ সনের ৯ই চৈত্র ১৩ই রমজান দিবা গত রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে। আবার ঐ সনের ২৪শে চৈত্র ২৮শে রমজান শুক্রবার দিন সূর্য্য গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। বাকি ছফিনা পুস্তকে দেখুন।

নবী সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী

পূর্ব দিগের এক অগ্নি, পশ্চিমের টান।
কেয়ামতের এই দেখ, প্রথম নিশান॥
এক অগ্নি নেকালিয়া, লোক টেনে নিবে।
পূর্ব হতে খিচে লিয়া, পশ্চিমে যাইবে॥
কেহু কেহু বলিয়াছেন সেই অগ্নি রেল।
সত্য বটে এই বাক্য, বুঝন মস্কেল॥
যে অগ্নি পসর হবে, উটের গলায়॥
সেই উট লোক দিকে টেনে নিয়া যায়॥
ইহাতেই বুঝা যায় সেই উট রেল।
ইসারা হাদিছ এই বুঝন মস্কেল॥
কেয়ামত আসিবে না বচন যৌবুন।
যে যাবত আরবেতে জ্বলিবে আগুন॥
বছ্‌রা হতে আরবেতে প্রচলিত রেল।
উট সনে এই অগ্নি হইবে তাবেল॥
আরবেতে এই অগ্নি তাবিল বুঝায়।
বছ্‌রা দামেস্ক মধ্যে রেল শুরু পায়॥

এলেম উঠিয়া যাবে, আগে কেয়ামত ।
মুল্লুক গরম হবে, জোরে জেহালত॥
যে বিদ্যার মধ্যে হবে, জাহেলী প্রকাশ ।
সে বিদ্যা নামের বিদ্যা করে সর্বনাশ॥
জাহের মৌখিক বিদ্যা, শিখন শিখান ।
পৃথিবী জুড়িয়া যবে হইবে বাখান॥
মেহদী আউলিয়া নূর হবেন জহুর ।
এই সে কপাট বিদ্যা নূর হতে দূর॥
যে বিদ্যা অধর্ম পথ সতত নিপুন ।
পৃথিবীতে তার গুণ রবে পুনাপুন॥
তার বলে বলীয়ান পৃথিবীর বল ।
ধর্ম নামে পরিণামে কার্য্য ফলাফল॥
সেই ফলে ইহকালে মাতিয়াছে যারা ।
এমামের নূর আগে হইবে আন্ধেরা॥
যদি ধর্ম তার মর্মে রহিবে নিশ্চয় ।
পাইবেন সার তার, ফলে পরিচয়॥
সূফী বিদ্যা বলে অলী মেহদী জোরওয়ার ।
সেই বল প্রকাশিবে পৃথিবী মাঝার॥
সংসার গোলজার হবে নূর অধিকার ।
বিলোপ হয়েছে যাহা দীন মুস্তফার॥
বেলায়াত শানে নূর হইবে জহুর ।
পৃথিবী রৌশন হবে নূর-আলানূর॥
বেলায়াত শানে শান মউদ এমাম ।
মেহদী বলিয়া নাম যার পরিণাম॥
তার পরে ইছা নবী হবেন প্রকাশ ।
বেলায়াত খতমের হইতে আকাশ॥
হামিদ নামে অলী হবে তাঁর নাম ।
কেয়ামত কত দিন রহিবে তামাম॥

নবী সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণীতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, এমাম মেহদী সাহেবের আগমনের কিছুকাল পূর্বে দুইটি অযথা লোক এমাম বলিয়া দাবি করিবেন কিন্তু বর্তমান কালে তাহাও প্রকাশ পাইল ঃ যেমন কাদইয়ানী সাহেব আর একজন আফ্রিকা বাসী সৈয়দ আহাম্মদ নামক কিন্তু উনি সৈয়দ সেনোছি নহেন ।

মহরমের খোদবা

প্রেম বিরহ মেঘ, ঘনাকাশে যার ।
পবন তরঙ্গ তার ভাঁটার জোয়ার॥
জোয়ারের জলে বাঁধ কেবা দিতে পারে ।
ধরাতে না ধরে জল বিলাস আষাঢ়ে॥
বিরহ আসনে যার মেঘের সঞ্চার ।
আকাশ-পাতাল জুড়ে তার অধিকার॥
যেহেতু যাহার সনে করেন বিলাস ।
তাহার আদর দেশ তার অভিলাষ॥
যে কালের যেই গুণ আদর তাহার ।
আকেঙ্কা ভুবনে তার হয় অধিকার॥
আম কালে আম রস, জাম কালে জাম ।
নারিকেল তাল, বেল, কাঁঠাল, বাদাম॥
যে বীজের সেই খুবী রবে চিরদিন ।
যে দিন যাহার জন্ম সেই তাঁর দিন॥
যে দিন যাহার শেষ হবে ভব লীলা ।
সে দিন তাহার গুণ, রবে ভব খেলা॥
হওন মরণ দুই গুণের বিষয় ।
ইহকাল পরকাল গুণ সমুদয়॥
সেই গুণ এই ভবে রহিয়াছে যার ।
স্মরণ রহিলে হয় তার অধিকার॥
যে ঘর স্মরণ যার মধু রসময় ।
কেমনে না পাবে স্বাদ আসিলে সময়॥
এসেছে সময় স্বাদ, দেলবর নবীর ।
আস আস অলীগণ আসেক আলীর॥
যেদিন আলীর তনু, মোস্তফার নাতী ।
আন্ধার করিয়া গেল পৃথিবীর বাতি॥
সে দিন স্মরিবে যেই স্মরণ যাঁহার ।
এই সে কঠিন কাল নবী মোস্তফার॥
এই যে বিষম কাল, ফাতেমা খাতুন ।
এই সে তোমার দীন হইল যুবন॥
এই সে তোমার কাল কাঁদিবে সদায় ।
এই সে তোমার নূর ফুরাইয়া যায়॥
এই যে তোমার যায়, কোলের কুমার ।

না হেরিবা ওগো মাগো না হেরিবা আর॥
হেরে লও ওগো মাতা আখের ভাণ্ডার।
দেখিবে না ওগো মাতা এ ভবেতে আর॥
মুখে হাসি, হাসি মুখী ফুরাইয়া যায়।
কাঁদিছে বিষাদ শোকে, নবী মোস্তফায়॥
আসিল বিষম দুঃখ, দুঃখ চিরকাল।
হইল নবীর বংশ সুখের কাঙ্গাল॥
ধনের কাঙ্গাল নহে আওলাদ নবীর।
কাঙ্গাল কাঙ্গালে হয় ফাতেমা বিবীর॥
ফাতেমা কাঙ্গাল তাই ছিদ্দিক কাঙ্গাল।
ওছমান কাঙ্গাল বন্ধু হারায় জামাল॥
রে ওমর আদরের ফুরাইল ধন।
আর না দেখিবি সাধে কোমল চরণ॥
জীবিতে স্মরণ কর জীবিতে মরণ।
আদরে সাধের রৌক সাধের স্মরণ॥
আদর যাহার সাধ বন্ধুর আদর।
সমান আদর তাঁর রবে বরাবর॥
শয়ন গমন যাঁর রবে না স্মরণ।
এ সংসারে কভু নহে সেই বন্ধু জন॥
আরম্ভিতে কাল সাল বৎসর প্রথম।
কি ক্ষণে আসিল কাল মাহে মহরম॥
কেন কাল মহরম, করিলি বিষাদ।
কি লাগিয়া হরে নিলি মনের আহ্লাদ॥
ওহে কাল ইহ ভবে, যত দিন রব।
মহরম কাল তুই, তোরে আমি কব॥
তাই তোরে কহিছেন কেন্দে মোস্তফায়।
মহরম কাল নাম রহিবে সদায়॥
কেয়ামত তক্ রবে, এ কাঁন্দন রোল।
হইবে না মোস্তফার, হাদিছ ওদুল॥
এ ভাবে ভাবুক যারা ভাবের কাঙ্গাল।
কাঁদিছে বন্ধুর ভাবে লুটাইছে মাল॥
না দিছে বিছানে গাও না থামিছে বুক।
হা হা কার রব রাও না করিছে সুখ॥
বরকতের দুই তনু ভব ছেড়ে যায়।
দেখ এসে তামসিক আখেরী বিদায়॥

গোলে তন হাসান সাহা ভব ছেড়ে যায়।
দেখ এসে তামসিক ভবের বিদায়॥
হলাহল বিষে গোল তনু ছেড়ে যায়।
দেখ এসে তামসিক ভবের বিদায়॥
নূরতন হোসেন আলী বরকতের ধন।
ভাই শোকে কারবালাতে হয়রে মরণ॥
এজিদ জল্লাদ তারে দাগা দিয়া মারে।
খানা পিনা বিনা নূর কারবালাতে মরে॥
না দিল খাইতে দানা তিরাসের জল।
জল্লাদ এজিদ হিয়া কেমন গরল॥
ঘরের বেগমগণ কারবালাতে যায়।
কোলের বালকগণ জল খেতে চায়॥
না দিল খাইতে জল, জল্লাদ এজিদ।
আহা কি গরল হিয়া, চরিত্র পলিদ॥
কোলের বালকগণ কোলে কান্দে মায়।
জল তিরাসে বুক-মুখ শুখাইয়া যায়॥
জল বিনা মীন গতি হইল মরণ।
হেনরূপ জল-পানে, কান্দে শিশুগণ॥
কোথা পানি দাও পানি, আমারে খেলাও।
যথা হতে পার মাগো আমাকে পেলাও॥
বাঁচিবে না তব বাছা, না পাইলে পানি।
কি লাগিয়া নাহি দাও, আমি নাহি জানি॥
কলেজা পুড়িয়া যায় জল বিনা হায়।
কোথা আছে মাতা, জল দাও না আমায়॥
মাতা কাঁদে আহা ধন, কোথা পাব পানি।
কে তোরে পিলাবে পানি, আহা পুত্র মনি॥
দুধের বালক দুধ নাহি পায় স্তনে।
শুখাইয়া গেল দুধ, খানা-পিনা বিনে॥
দুধ না পাইয়া শিশু, জল না খাইয়া।
প্রাণে মরিলা বাছা মুখ শুখাইয়া॥
শিশুগণ মরে হায়, প্রাণ জ্বৈলা যায়।
বিবীগণ কান্দে হায়, ছাতি ফেটে যায়॥
যেবা যথা শোক তনু, ঘরের বেগম।
না পাইয়া দানা পানি, নাকে বহে দম॥
বাহিরে মর্দ্দনা সব জলে মারা যায়।

জল-দেরে জল-দেরে ডাকে সর্বদায়॥
প্রাণ গেল, জল বিনে, এনে দেও জল ।
জল বিনা শুখাইয়া মরিল সকল॥
জল ডাক ডাকে সদা জলের কারণ ।
জল-দেরে জল-দেরে ওহে বন্ধুগণ॥
কোথায় লুকালি বন্ধু, পরানের জল ।
জল-দেরে জল-দেরে মরিল সকল॥
ঘামে সোর ভোর তনু শরীরের জল ।
জল বিনা জ্বৈলে গেল, বদন কোমল॥
এক বিন্দু জল যদি এবে বন্ধু পাই ।
কাফেরের হস্তে বন্ধু, প্রাণ বাঁচাই॥
কলেজা থামিতে নারি, জল বিনা হায় ।
আর দুঃখ ঘরে শিশু, জলে মারা যায়॥
হারে! কি অধর্য্য গতি, চরিত্র এজিদ ।
শিশুগণ সনে তব কি হইল জিদ॥
খাইতে না দিল খানা, পেয়াসের পানি ।
কেমন পাষাণ তুই, আমি নাহি জানি॥
সোনার পুতুল শিশু, দুঃখ কলেজায় ।
মা মা বলিয়া শিশু ডাকিছেন মায়॥
বাপের মোহন চুড়া, ক্ষুধা তনু তাপে ।
বা-বা বলিয়া শিশু, ডাকিছেন বাপে॥
সাধের দেলবর নাতি, ধুপ কারবালায় ।
না-না, বলিয়া শিশু ডাকিছে নানায়॥
বাহুবল এ সংসারে, ভাই বিনা নাই ।
ভাই ভাই, বলিয়া ভাই, ডাকিছেন ভাই॥
সম্বল সারথি, ভবে, অন্য কেহু নাই ।
আস আস ভাই ধন, পরানের ভাই॥
হলাহল বিষে তুমি, দিয়াছ পরান ।
আমাকে রাখিয়া গেলা, কার বিদ্যমান॥
বাহুবল সঙ্গ সাথি, কে হবে আমার ।
সমুদ্দুরে রক্ষা গতি, কে করে কেনার॥
রে সাধের মাতা পিতা, কোথা গেলি হায় ।
রক্ষা কর রক্ষা কর প্রাণ জ্বৈলে যায়॥
অনাথ করিয়া মাতা পলাইয়া যাও ।
বিষম কঠিনে মাগো, আমারে ত্বরাও॥

ফাতেমা আমার মাতা আমি মৈরে যাই ।
জগত জননী মাতা র'লি কোন ঠাঁই॥
মাতা-রস নদীতটে সবে জল খায় ।
তব পুত ওগো মাতা জলে মারা যায়॥
দয়া রসে তরি ডিঙ্গে, এনে দাও জল ।
খাইলে প্রাণ বাঁচে নাহিলে শীতল॥
দেখ এসে মা-জননী, তোমারে দেখাই ।
শিশুগণ গলাগলি, মরে এক ঠাঁই॥
না খাইয়া দানা পানি, না খাইয়া জল ।
মরিল মরিল প্রাণ, মরিল সকল॥
কোথা রলি মা জননী পরান দোসর ।
ভাই নাই সে অবধি, আমি একাশ্বর॥
আখেরী সরবত মাগো, পেলাইয়া যাও ।
কঠিন কারবালা মাঝে, তরঙ্গ দেখাও॥

ভাব

পাখীগণ চরাঞ্চলে, ঝাকে ঝাকে যায়রে ।
জলে-স্থলে যার যথা, সুখে আদার খায়রে॥
ডালে বৈসে মধু গান, খালে মাছ খায়রে ।
জল তিরাসে ঘন ঘন জল পানে যায়রে॥
ঝাকে ঝাকে পাখীগণ, সুখে আদার খায়রে ।
পবনে ধরিয়া তাও, শূন্যে পাখি ধায়রে॥
কেহ উড়ে কেহ পড়ে, কেহ আদার খায়রে ।
কি শোভায় সাজিছে পাখী, আকাশ মেঘ নয়রে॥
ঝাপড়ি ঝুপড়ি বৃক্ষের ডালে, বৈসে ঘুম যায়রে ।
আহা, সুখের পাখিরে, তুই উত্তরালি যায়রে॥
মুড়িয়া হেমন্ত ঋতু, দক্ষিণেতে যায়রে ।
দিক দিগাম্বর এলে উত্তরালি যায়রে ।
বসন্ত দক্ষিণ বায়ু দেশে চলে যায়রে ।
দেশের মন পড়ছে এবে, দেশে চলে যাওরে॥
সময়কালে এসে পাখি, চরে আদার খাওরে॥
এসেছিলে চলে গেলে, কেহু কার নয়রে॥
দিন চারি খেলা বেলা, কেবা কার হায়রে ।

যাতনা

হারে পাখী, দিয়া ফাঁকি, কোথা চলে যায়।
দেখা দিয়া কি লাগিয়া পালালি কোথায়॥
হারে সোনা, কে-রে টোনা করিল তোমায়।
হারে বন্ধু, ভব সিন্ধু, ত্যাগিলে আমায়॥
হারে বাছা, কেন সাচা রহিলা বিরলে।
হারে দুঃখ, দেখি মুখ, কহ কতুহলে॥
হারে সাধ, অপরাধ, কি হল আমার।
হারে ধন, পোড়ে মন, দেখি একবার॥
হারে মনু, দিও তনু, খঞ্জন রঞ্জনে।
হারে মনি, কুহু ধ্বনি রসের গঞ্জনে॥
হারে সত্য, তুমি তত্ত্ব, তোমারি আশায়।
হারে প্রাণ, দিও দান, দিন বয়ে যায়॥
ঠোঁটে ঠোঁটে কৈয় কথা, মুখে দিও হাস।
হারে কান্ত, দীন শান্ত, তুমি চির আশ॥

ভাব

জাগিয়া জাগিয়া আমায় দিও ডাক।
হাসিয়া হাসিয়া আমায় দিও বাক॥
ধরিয়া ধরিয়া আমায় দিও বোধ।
গলিয়া গলিয়া আমায় দিও শোধ॥
গলায় গলায় আমায় দিও বুক।
বচনে বচনে আমায় দিও মুখ॥
বাছিয়া বাছিয়া আমায় দিও ফল।
তিরাসে তিরাসে আমায় দিও জল॥
পলকে পলকে আমায় দিও তন।
হৃদয়ে হৃদয়ে আমায় দিও মন॥
মরিও আমার সনে জীবিত মরণ।
মরণে আমার তরে রাখিও স্মরণ॥

কালের প্রতি

জোয়ার ফিরিল উজান ধাইল, ত্বরায় আসিল জল।
কুসুম লতায়, পাতায় পাতায় ধরিল শাখায় ফল॥
সরল গগণে, নবীন রতনে, কাঞ্চন বরনে ফুল।
মোহতিউল্লাস, সুতেজ শুবাগ, মোহন আকাশ কুল॥
উদিত গগণে, বিলাশ ভাবনে, বসন্ত পবনে রস।
বিরসে সঞ্চারে, কামের কুমারে, যৌবন বিহারে রস॥
সাধের যৌবনে বিরহ তরুণে আকাশ ভুবনে চান।
যামিনী কমলে কামিনী সরলে তিমিরে উথলে বান॥
আকাশ মন্দিরে, সুকাল সমিরে, চন্দ্র ধীরে ধীরে যায়।
সুখের মিলনে সুখরস দিনে পূর্ণিমা পুরনে পায়॥
ধরায় শুকাল, ফিরিল অকাল, সাধের বিকাইল রস।
রসিক নাগরে, সুখের সাগরে, ডুবিয়া জোয়ারে বস॥
জগত জুড়িয়া, মোহন পুড়িয়া, সোনায় মুড়িয়া লাল।
বিলাস বদনে, খঞ্জন রঞ্জনে, তবল মোহনে তাল॥

ভাব

কামিনী কমল, পাইল সরল রায়।
বাজায় ঘুঙ্গুর, ঝুমুর-ঝুমুর যায়॥
বিলাস পতঙ্গে, বিরহ তরঙ্গে ঝাপ।
মধুর মন্তল বিচ্ছেদ অনল তাপ॥
প্রভাত যামিনী, কুকিলার ধ্বনি গায়।
নাগরী নাগর, রসের সাগর পায়॥
বিরহ উদাস মন, অভিলাষ যার।
গমন রমন, সাধের মিলন তার॥
গমন বিলাস, সাধের উল্লাস মন।
সাগর গভীরে, ডুবা ধীরে ধীরে ধন॥

উপদেশ

হারে বোকা, ধোকায় পড়ে র'লি এ সংসারে।
অসার সংসার মাঝে, সঙ্গি বল কারে॥
সঙ্গি হয়ে সঙ্গি যেই, হইতে না চায়।
এ সংসারে কেবা তোর, সঙ্গি বল কায়॥

পর হতে পর যেই, সঙ্গি হৈয়ে যায় ।
এ সংসারে সঙ্গি সাথি, পাইলে কোথায়॥
সঙ্গি সাথি বল যারে, সেত সঙ্গি নয় ।
খেলা বেলা দিন কত, কোলের তনয়॥
কোলে রাখি কোলে থাকি, অনিত্য সংসার ।
নাহি কোল দিবে কোল, কোল পাব কার॥
নিত্য কোল দিবে যিনি, তাঁর কোলে যাই ।
অনিত্য কোলের সাধ, আর আশা নাই॥
ওহে কোল তুমি কোল, রাখ মন কোলে ।
কোলে দিয়া রাখ নিত্য, নিত্য আত্ম বলে॥
আমার কোলের কোল, রাখ তুমি কোলে ।
কোল দিয়া রাখ ভাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের কোলে॥
যে ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে সাধ, দিছ তুমি কোল ।
কোলে বন্ধু রাখ মম, দিও দাসে কোল॥

সাবধানতা

সাবধান পরিত্রাণ, যাঁহার হৃদয় ।
সাবধান কৌতূহল, যার মনে লয়॥
সাবধান যাঁর মন, পাপের আসন ।
সাবধান মনোহর তাঁর সিংহাসন॥
সাবধান শান্তি যার, শান্তি মন মান ।
শান্ত শীল শান্ত মন শান্ত গুণ গান॥
সাবধান রসে মগ্ন, যাঁহার অন্তর ।
সাবধান বিরাজিত, মন মনোহর॥
আদি সার সাবধান যাহার অন্তরে ।
রস গুণে গান তাঁর সাধের ভাণ্ডারে॥
যথার্থ সাধের গুণ, যার সাবধান ।
ইহ ভবে কেবা আছে, তাঁহার সমান॥
উত্তম মোহন গুরু, গৌরব যাহার ।
কামের কদম্ব তরু, সাবধান তার॥
প্রেম সাধের ডিঙ্গে, পবন বাদাম ।
বিরহ তরঙ্গ নদে চলিতে আরাম॥
এব এবে সাবধানে সব মিলে যাই ।
মধু রবে সাধ পুরে রস গান গাই॥

করুণা

বল যার বল তাঁর নিজ বলা বল ।
নাহি যার নাহি তাঁর আশু নিত্য বল॥
যে জন সংসার বল তাঁর বলে বল ।
এ ইহ বল পর বল তাঁহারি সকল॥
যে দিল তোমায় বল, তাঁর বলে বল ।
অনিত্য নিত্যের সার যার নিত্য বল॥
যে জন নিত্যের বলে অধিকার বল ।
এ সংসার যার তার তাঁহারি সকল॥
তুমি তাঁর সে তোমার, তোমারি সকল ।
তুমি যার নাহি তাঁর নহে সত্য বল॥
আশু বল পর বল তোমারি সকল ।
সুগমনে সুভবনে তব নিত্যবল॥
হারে তুমি নিত্য তুমি তোমারি সকল ।
ধন-জন মান-কান, ইহা চির বল॥
বলে বলিয়ান যেই বলের আঁধার ।
যার বলে বল ধন, ভুবন সংসার॥

ভাব

কুকিলে কুকিলে কথা খঞ্জনে খঞ্জনে ।
বুল বুলে বুল বুলে রস মধুর গঞ্জনে॥
হীরামন রস বাণী হীরামন সনে ।
চন্দন রসের বাণী পাইলে চন্দনে॥
তুতি বাণী তুতি সনে ময়ূরে ময়ূর ।
কাগাতুর রস গান গানে কাগাতুর॥
মদ সুর মধু গান পাইলে মদন ।
বোতলে বোতলে গান গগনে গগন॥
গরমে গরমে গান পেয়ে গরম পোস ।
সরলে সরলে বাণী, হাঁসে হাস তোষ॥
তুরঙ্গে তুরঙ্গে মন কুরঙ্গ কুরঙ্গে ।
মাতঙ্গে মাতঙ্গে রস, পতঙ্গে পতঙ্গে॥
রসিক রসিক সঙ্গে অলী অলী সঙ্গে ।
কুসুম বিলাস তনু, যার মতে রঙ্গে॥

যার বন্ধু তার গান যাবে তার সঙ্গে ।
সঙ্গের আরতি যার তার রঙ্গে॥
এস রঙ্গ গুরু রঙ্গ কমল মন্দিরে ।
সৌরভে কুসুমে গান গাব ধীরে ধীরে॥
কেবা কার গান জানে, যার গান নাই ।
গাইছে গোকুল গান, পাগল কানাই॥
যে জন রসের কান্তে রাখিছে অন্তরে ।
কুকিলা বসন্ত রব গায় অনিবারে॥
কমল গলায় মালা, গাথিয়া গলায় ।
ভোমর অলির দলে গুণ গুণ গায়॥
এস এস অলিগণ গাই মধু গান ।
তোমার আমার তনু, একই পরান॥
তুমি কর ফুলে বাস আমি ফুল ধারে ।
সহায় সুগন্ধ তনু পাইব তোমারে॥

ভাব

অলিরে গাইও মুধু গান । ২
আমি মধু মূলে থাকি, মধু গান মনে রাখি,
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
কমল কাননে যেও, ডালে ডালে মধু দেও
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
নিয়ত পুষ্পের মাছি, যত দিন প্রাণে বাঁচি
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
অলি পাখি দলে দলে ঝাপ দিও মধু জলে
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
বিরহ কুঞ্জের বনে মাতিয়া বকুল সনে
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
ঝুমু ঝুমু হাত পায়, অলিগণ গান গায়
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
বিদ্ধিয়া হাতের তোড়া, নিশী পুষ্পে জোড়া ২
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
বিরহ মাতিলে কুলে আর না আসিব ফলে ।
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
বিরহির তনু জ্বলে, শীতল যমুনা জলে

অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
সময় থাকিতে যাও, পুষ্প রস মধু খাও
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২
শরীফি অলির দলে, খেও মধু কৌতুহলে
অলিরে গাইও মধু গান॥ ২

গুরু ভক্তি

কে তোরে দিল গো সাধ, বদন সুন্দর ।
কে তোরে দিল গো মনো, মন মনোহর॥
কে তোরে দিল গো প্রিয়, অনুরাগ বল ।
কে তোরে দিল গো চিত্ত নয়ন সরল॥
কে তোরে দিল গো মন বচন মধুর ।
লব লব হোট দোটি সোনার নেপুর॥
হাসিলে ভুলাতে পার, ত্রিভব মণ্ডল ।
কাঁদিলে ভুলাতে পার দিয়া চক্ষু জল ॥
কে তোরে দিল গো সেই ময়ূর পঞ্জর ।
নাক ভুরূ কেবা দিল, কামান খঞ্জর॥
সে কামান তীরে প্রিয় করিছ শিকার ।
খঞ্জর মারিয়া খুন খাও কলেজার॥
কে গো দিল প্রেম রশি, শিরে লম্বা কেশ ।
জলুপ, গুঙ্গড়ি, খোপা পাগল কর দেশ॥
কে দিল বান্ধব তোর হৃদয় কমল ।
হেরিলে মনির মন, করে টল মল॥
কে দিল গৌরব তোর মুলাম চরন ।
কেবা তোরে শিখাইল, খঞ্জন রঞ্জন॥
নাচিলে ভুলাতে পার, সয়াল সংসার ।
কেবা তোরে শিখাইল ইন্দ্র ব্যবহার॥
কেবা দিল লোল দেশে চন্দ্র পূর্ণিমার ।
পসর করিল জ্যোতি ভব অন্ধকার॥
কেবা দিল চক্ষু তারা ইন্দ্রিকা সম্পাস ।
রৌশন করিয়া দেশ, হেরিতে বিলাস॥
কেবা তোরে দেশ হতে বহির্গত করে ।
কেবা তোরে লিলাম্বিতে, আনিল সংসারে॥
কেবা তোরে শিখাইল, প্রেম আলিঙ্গন ।

কেমনে হইলি তুই রসের ভাজন॥
রস দিয়া মোহমগ্ন করিলি সংসার।
কেবা তোরে শিখাইল প্রিয় ব্যবহার॥
দেখাইয়া দেগো সখি হেরিব তাহায়।
লুকায়ে মন্দির দেহে রাখিলি কোথায়॥

বিলাপ

জ্বলে জ্বলে চক্ষু জ্বলে প্রাণ জ্বলে যায়।
চক্ষু জ্বলে স্রোত নদে, তনু ভেসে যায়॥
ডুবিল গভীর নদে, এ তনু সুন্দর।
ঝাম্পু ঝুম্প দিচ্ছে ডুব, কেন্দে মনুবর॥
কাঁদিছে পরমাত্মা, তনু তল যায়।
ডুবিল ডুবিল তরী, দিন বয়ে যায়॥
পাড়ি দিয়া তনুতরী, বেয়ে যাও দার।
অকুল সাগরে ডিঙ্গা, পাইতে কেনার॥
কেনারে রহিছ যারা কর ধন্যবাদ।
মহাজনে অবিলম্বে, দিও বিসংবাদ॥
দেখ এসে সাধুবর, ডিঙ্গা মারা যায়।
সরল সম্বলে তাঁরে, আনো কেনারায়॥

ইস্তাহার

কাদিয়ানী সাহেব বলিয়াছেন, "মানব মাত্রেই কেহ মৃত্যুর পর জীবিত হয় নাই।" অথবা কেয়ামত (মহা প্রলয়) পর্যন্ত বা ততোধিক কাল কেহ জীবদ্দশায় থাকিবেক না। তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা কোরান ও হাদিছে তদ্বিষয়ে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত আছে। পবিত্র কোরানে লিখিত আছে যে ইছা (আঃ) মৃতকে জীবন দান করিয়াছেন। হাদিছে আসিয়াছে যে, হযরত জরজিছ (আঃ) কে কাফেরগণ শত সহস্র বার বধ করিয়াছিল। কিন্তু সদা প্রভু তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জীবিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আউলিয়া আম্বিয়াগণের কেরামত দ্বারা শত সহস্র মৃত পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

'তারিখে তবরি' ও অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে বাদশাহ নৌশেরওয়া মৃত্যুর চল্লিশ বৎসর পর, আমাদের নবী সাহেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অশেষ পুণ্য বলে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া, জীবিতাবস্থায় কবর হইতে ইহ ভবে আগমন করতঃ আট বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া আবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে আমাদের নবী সাহেবের মাজেজায়ও কত মৃত জীবনপ্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি হযরত বড় পীর দস্তগীর সাহেবও নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে অনেক মৃতকে জীবন দান করিয়াছেন এবং কত লোক তাঁহার কেরামতে প্রাণত্যাগও করিয়াছে। পুনর্জ্জীবনের কথা কি কেবল হিন্দুরাই বলেন, হায়রে পোড়া অদৃষ্ট, এত ভ্রান্ত মতি হওয়া মেহদী দাবির মূলে কুঠারাঘাত নহে কি? যদি বল, মারিতে পারা যায়, কিন্তু বাঁচাইতে পারা যায় না, তবে দেখা যাইতেছে যে মারিতে পারিবার পক্ষত হাতে আছে। আর মারণ বাঁচান যখন খোদার কাজ, তখন একজনকে অন্যে কিরূপে বধ করে এবং তাহার দায়ে নিজের প্রাণ দিতে হয়? ভ্রাতঃ যদি এক বস্তু খাইয়া মরিতে পারে, তবে অন্য এক বস্তু খাইয়া কি বাঁচিতে পারা যায় না? তবে হযরত খেজের (আঃ) আবে-হায়াৎ খাইয়া কি ভুল করিয়াছিলেন? আর তিনি কি মরিয়া গিয়াছেন? আবার আছহাবে-কাহাফ্ যে কয়েকজন লোক একই নিদ্রায় কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবেন, তাহা কি কোরান বা হাদিছে আসে নাই? এতদ প্রমাণ তফছিরে রুহুল বয়ান, তফছিরে কবির ও তফছিরের হোছেনী প্রভৃতি পুস্তকে দেখুন। যে ব্যক্তি তছররোফে বেলায়েত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে খোদা প্রাপ্তি, পীড়া আরোগ্য করা, ধর্মদ্বেষী বা বিধর্মীকে ধর্ম পথে আনয়ন, পাপীর হৃদয় হইতে তমোরাশি বহিষ্কৃত করা ও তৎস্থানে ধর্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিত করা প্রভৃতিকে অসম্ভব কার্য বলিয়া নিজ পুস্তক লিখিয়াছেন তদ্রূপ ব্যক্তির মেহদীত্ব দাবি যে কতদূর সত্য তাহা কে বলিতে পারে? আমি তাঁহার কয়েক খানি আরবী পুস্তকে হিন্দি তর্জ্জমা সহ দেখিয়াছি তাহাতে তিনি আপনাকে মেহদী মৌউদ বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। আর তাহাতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সমূহকে তিনি মেসমেরিজ্‌ম বলিয়া উল্লেখ করতঃ উহাতে ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক বলিয়াছেন যে "আমি যদি উহা ভাল বাসিতাম তবে উহাতে প্রচুর উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম।" আবার তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে ঐ সমস্ত বৃথা পথে না যাইয়া কেবল মাত্র দোয়ার উপর নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তিনি দোয়ার প্রকারভেদও জানেন না। যেহেতু নবী সাহেব (সঃ) দম শুমারি তরিকার কথা বলিয়াছেন। তৎপ্রমাণ মেস্কাত ও ছেহা ছেত্তায় পাওয়া যায়। দিবা রাত্রিতে মনুষ্যের যত শ্বাস প্রশ্বাস বহে, তাহার সংখ্য মোফাচ্ছেবিন লোকেরা ২০০০ দুই হাজার সংখ্যায় ধার্য করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে উহার মর্ম যে অনেক প্রকার বুঝায় তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি কেবল মাত্র হস্তোত্তলনকেই দোয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার "আমি ইছা মছিহ্ বা ইমাম মেহদী" এরূপ আত্মপরিচয় দেওয়া, মেহদী মৌউদের সত্যতা কোন পুস্তকে আসিয়াছে? অধিকন্তু ছেহা ছেত্তায় হযরত মেহদীর চিহ্ন সম্বন্ধে লিখিত আছে যে সমুদয় লোকেরা তাঁহাকে ইমাম বলিয়া মান্য করিতে থাকিবেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্ম সংগোপন করিয়া আপনাকে ইমাম বলিয়া পরিচয় দিবেন না। পরন্তু লোকেরা তদীয় লক্ষণাদি দৃষ্টে তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। নবী সাহেব (সঃ) হাদিছে বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি আরব দেশে, আমার বংশধর ও

আমারই নামধারী হইবে, এবং তদীয় পিতা মাতার নামও আমার পিতা মাতার নামের সহিত একই হইবে। ছেহা ছেত্তা হাদিছে আরও লিখিত আছে যে, ঐ ইমামে আখেরি জামানের প্রকাশ পাইবার কিছু কাল পূর্বে দুই জন মিথ্যাবাদী লোক আপনাদিগকে ইমাম বলিয়া প্রকাশ করিবে। ঐ স্থলে ঘটনাও তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। দন্তহারা বাঘের ডাকই সার। নতুবা হীরা কখন রাস্তায় রাস্তায় ঢোল দিয়া নিজের পরিচয় দেয় না। সে নিজ গুণেই সর্বত্র আদরণীয় হইয়া থাকে, এবং সে বহু মূল্য বলিয়া সকলেই জানে। তদ্রুপ গুণী ব্যক্তিরা কখনই নিজ গুণের গর্বে স্ফীত হন না। হাদীস উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত কথা বলিয়াই তাহার সত্যতা দেখাইতেছে। সূর্য্যত ছোবে কাজেমের পরই উদয় হইয়া থাকে। কাদিয়ানী সাহেব মরিয়ম নাম্নী কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন নাকি? নতুবা তিনি ইছামছি হইলেন কি প্রকারে। তাহারওত প্রমাণ চাই। নবী সাহেব (সঃ) বলিয়াছেন যে, প্রকৃত ইমাম যিনি হইবেন, তিনি আরব দেশজাত, তাহার নাম আহাম্মদ তাহার পিতার নাম আব্দুল্লা ও মাতার নাম আমেনা। তবে কাদিয়ানী সাহেবেরও তাহাই নাকি। যদিও নবী সাহেব (সঃ) ঐ নির্দিষ্ট ইমাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মেহদী নাম দিয়াছেন, তাহাতে কোন ক্ষতির কারণ নাই। কেননা, মেহদী শব্দের অর্থ উপদেষ্টা এবং উহা কর্তৃকারক। এই নিমিত্তে তিনি বাক্যস্থলে ঐ শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। এবং উহাই বলা সঙ্গত। তবে তাই বলিয়াই কি তাহারা মরিযম বা আমেনার পুত্র ছিলেন। আবার জাল মেহদী সাহেব কোরানকেও আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি কোরানকে কল্পনাপ্রসূত বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তিই কি তাহার জাল প্রমাণে যথেষ্ট নহে? যদি আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিত তবেও তিনি হযরত জিবরিল (আঃ) কিরূপে নাজেল হন তাহার তত্ত্ব সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে পারিতেন। ফেরেস্তার আগমন কত প্রকার ও কি রূপ লোকের নিকট কি ভাবে আসিয়া থাকেন তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন। জীব মাত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা। উহাদের একের ক্ষমতায় অন্যের অধিকার নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী বা অলী নহে সে নবী অলী লোকের আধ্যাত্মিক বিদ্যার তর্ক করিবে কি রূপে। কাদিয়ানী সাহেব কূট তর্কের দ্বারা মীমাংসা না করিয়া কেন একবাক্যে কোরানের নজুল সম্বন্ধে তর্ক শেষ করিয়া দিলেন; ইহা কিরূপ জ্ঞানের ও বিবেচনার কার্য তাহা বুঝা যাইতেছে না।

এতদসত্ত্বেও তিনি আবার বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহার গ্রন্থের অসাধারণ ক্ষমতা। যিনি এই গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের সারতত্ত্ব উদ্ধারে সমর্থ হইবেন, তিনি ভুমণ্ডলে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। আর যিনি ঐ পুস্তক হইতে এক বর্ণ ভ্রম সপ্রমাণ করিতে পারিবেন, তিনি নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। তবে এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কাদিয়ানী সাহেব, আপনার পুস্তকের ভুরি ভুরি ভ্রম গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত টাকা আদায় করুন। বৃথা অঙ্গীকার করিয়া টাকার দায়ী হওয়া কোন দলিলে আসিয়াছে? যদি কোন স্থানে ভ্রম প্রমাণ বাহির হইয়া পড়ে, তবে কি

ঐ অঙ্গীকৃত টাকার দায়ী হইয়া দোযখে যাইতে হইবে না? ভুল ও খাতার সহিতই যখন মনুষ্যের সৃষ্টি, তখন ঐরূপ অঙ্গীকার করা কি পরহেজগারী; বরং ইহা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। সুতরাং এতগুলি কুপ্রবৃত্তির ফল যে অবশ্যই ফলিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি, ফলতঃ হাদিসে ইমাম মেহদী সাহেবের আগমনের ভবিষ্যৎ বলিতে যে দুই জন মিথ্যাবাদী মেহদীর কথা উল্লেখিত আছে, তাহারা আর কে? "ইসা মসির আগমন" নামক বাঙ্গালা পুস্তকের ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "কাদিয়ানী সাহেবের উপর ইমান না আনিলে নরকে যাইতে হইবে।" এরূপ গগণভেদী বাক্য লেখক কোথা হইতে বাহির করিলেন? আর উহা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? লেখক আবার ইহা লিখিয়াছেন যে "কাদিয়ানী সাহেবের জীবদ্দশায়ই তাহারই মতাবলম্বী প্রায় চারি লক্ষের উপর উঠিয়া ছিল, এবং বর্তমানে তাদের সংখ্যা ছয় লক্ষের উপর।" ছয় সাত লক্ষ লোকের নেতা হইলেই যদি ধর্ম প্রবর্ত্তক হন, আর তাঁহার ধর্মে আস্থা স্থাপন না করিলেই যদি পরিত্রাণ পাওয়া না যায়, তবে যেই ধর্মে কোটি কোটি লোক শান্তি লাভ করিতেছে, তিনি সে ধর্মকে তুচ্ছ করিতেছেন কেন? হিন্দু ধর্মের ভারতবর্ষে অন্যান্য বার কোটি লোক আছে। বৌদ্ধ ধর্মে ২৪ কোটির উপর এবং ব্রাহ্ম, শীখ, জৈন ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও ৬/৭ কোটির কম নহে। তবে উক্ত লেখক সাহেব উহা কোন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন? লিখক আরও লিখিয়াছেন যে মেহদী এবং ইছা একই ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তিই কাদিয়ানী সাহেব। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, "মোসলেম" নামক পুস্তকে এবনে মরিয়ম অর্থাৎ মরিয়ম নাম্নী কুমারী গর্ভজাত পুত্রের আগমন বিষয়ে স্পষ্ট হাদিস আসিয়াছে। তবে কাদিয়ানী সাহেব কি মরিয়মের পুত্র? আবার ছহি ছয় কেতাব ছেহা ছেত্তায় লিখিত আছে, হযরত আব্দুল্লা এবনে মাছ্উদ (জঃ) রওয়ায়েত করিয়াছেন, নবী সাহেব (সঃ) বলিয়াছেন, যে পর্যন্ত আরব দেশ আমার বংশ জাত, আমার নামীয় এক ব্যক্তির অধীন না হইবে সে পর্যন্ত পৃথিবী বিলুপ্ত হইবে না। এইরূপ অন্য এক হাদিছে সহি সনদের সহিত লিখিত আছে, পৃথিবীতে এক ধর্ম প্রচলিত হইবে। উহা খোদা তালার কৃপায় এমন এক ব্যক্তির দ্বারা পৃথিবীময় প্রচারিত হইবে, যিনি আমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার পিতা ও মাতার নাম আমার পিতা ও মাতার নামের সহিত এক হইবে। তখন ন্যায় ও শান্তিতে পৃথিবী পূর্ণ হইবে এবং অন্যায় অত্যাচার দূরীভূত হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যেই ব্যক্তি তখলিক (সৃষ্টি) বিষয় কিছু মাত্র জ্ঞান লাভ করে নাই, সেই ব্যক্তি কি প্রকারে জন্মোত্তর রহস্য ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং মূল স্রষ্টার শিরোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখুন? পবিত্র কোরান মজিদে লিখিত আছে, হযরত ছোলেমান (আঃ) জন্মান্তর রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত খোদা তালার নিকট প্রার্থনা করায় সদা প্রভু আদেশ করিয়াছিলেন, "তুমি কতকগুলি কবুতর জবেহ করিয়া, উহাদের অস্থি মাংস পৃথক করতঃ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ কর।" হযরত ছোলেমান (আঃ) ঈশ্বরাদেশ পালন করিলেন পর পক্ষিগণের নিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ শূন্য ভরে

আসিয়া নিজ নিজ শিরসহ দেহ গঠন করিল। এবং উহারা পুনর্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গিয়া বসিল। তখন সদা প্রভু খোদাতালা হযরত ছোলেমান (আঃ) কে বলিলেন– তুমি জন্মান্তর রহস্য জানিতে যে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে, এখন উহা তোমার সম্মুখে উদঘাটিত হইয়াছে কিনা? তখন তিনি নত জানু হইয়া কৃতাঞ্জলী পুটে ভক্তি গদ্‌গদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন– প্রভু? তুমিই প্রাণহীনকে প্রাণ দিতে এবং প্রাণীর প্রাণ হরণ করিতে সক্ষম। ত্রিজগত তোমার মহিমার সীমা দিতে পারে না। হযরত ছোলেমান (আঃ) নবী বলিয়া ঐ রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি নবী বা অলী নহে এবং তাঁহাদের ভাব বুঝিতে অক্ষম, সেই ব্যক্তি কি করিয়া জানিতে পারিল যে, হযরত ইছা (আঃ) আর ইহ ভবে সশরীরে আগমন করিতে পারিবেন না? তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বটে, তথাপি তিনি মৃত্যুর অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া আসিতে সক্ষম। নচেৎ যিনি মৃত্যুর পর পুনরাগমনে অক্ষম তিনি সুপারিশ বা প্রার্থনা করিয়া পাপীর উদ্ধার করিবেন কিরূপে? ফলতঃ মৃতের আত্মা সর্বত্র বিরাজমান বা যে কোন স্থানে উপস্থিত হইতে পারে। এই জ্ঞান কেবল আউলিয়াগণেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। উহাকে 'কাশফ' 'এলহাম' প্রভৃতি বলা হয়। যে ব্যক্তি ঐ ভাবের, লেশ মাত্র স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই, ঈদৃশ নিরল হৃদয় ব্যক্তি কেবল মাত্র রিপুর তাড়নায় বৃথা ছট্‌ফট্ করিয়া কি করিবে? আত্মা কখনও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না কারণ উহা লতিফ। সূক্ষ্মতম পদার্থ বিধায় জড় চক্ষুর গোচরীভূত হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বাক্য কিন্তু আত্মা যখন মোছবেতা হইতে প্রকাশ পায় তখন উহা দিব্য চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে একদা খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী (রহঃ) মিম্বরে বসিয়া সমাগত লোক দিগকে উপদেশ দিতেছিলেন ইতঃমধ্যে তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত পরেই আবার পূর্বের ন্যায় উপদেশ দান করতঃ পুনর্বার দাঁড়াইলেন। এইরূপে তিনি একশত বারেরও অধিক উঠিয়াছিলেন ও বসিয়াছিলেন। পরে কথা শেষ হইলে সকলে তাঁহার ঐ রূপে অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানিতে বিশেষ উৎসুক্য প্রকাশ করায় তিনি অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন– আমি দেখিতেছিলাম, আমার মোর্শেদ হযরত উস্‌মান হারুনী (কঃ) আমার দিকে আসিতেছেন। তদ্দর্শনে আমি অধীর হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। এবং এইরূপে আমি যত বার তাঁহাকে দেখিয়াছি ততবারই দাঁড়াইয়াছি। ইহা "তাজ কেরাতুল আউলিয়া" নামক পুস্তকে বাবা শেখ ফরিদ (কঃ) লিখিয়াছেন। বলুনতো এই দর্শন কিসের ফল? গুণী ভিন্ন গুণের পরিচয় অন্যে বিশ্বাস করে না। কারণ যাহার যেই ইন্দ্রিয় নাই তাহাকে সেই ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান কথায় বুঝান দুষ্কর। বিশেষতঃ লদুনি বিদ্যার জন্য তদপযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ের আবশ্যক। ঐ হৃদয়ে দিব্য চক্ষু সর্বদা উন্মিলীত থাকে। তবে যখন হযরত এমাম মেহদী সাহেবের ঐ ভাগ্য সর্বদা প্রসন্ন, তখন তাঁহার অন্তর, আত্মা, বুদ্ধি বল প্রভৃতি সমস্তই জ্যোতির্ম্ময়। সুতরাং ঐ ইমানের নূর যে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যালোকের ন্যায় সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করিবে তাহাতে সন্দেহ

কি, বাস্তবিক তখন সমুদয় লোকেরই হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন হইবে। তখন যদি তাহারা হযরত ইছার (আঃ) আত্মাকে মনুষ্যরূপে দেখে বা তাহা হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতেই আশ্চর্য্য কি। পক্ষান্তরে যাহাদের দিব্য চক্ষু ফুটে নাই তাহারা কেবল দিন কানা পাখীর মত অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দর্শন করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের দাবিটাই বড়। যদি গত বারের ধূমকেতু ঐ দাবিকারকের জন্যই আকাশে উদিত হইয়া থাকে, তবে আফ্রিকা দেশীয় সৈয়দ আহাম্মদ আবার কোন ধূমকেতু পাইয়াছেন? তিনিওতো মেহদী বলিয়া দাবি করিয়া বসিয়াছেন। এই সৈয়দ আহাম্মদ সেখ সেনৌসি নহেন। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁহার ৯৫,০০,০০০ পঁচানব্বই লক্ষ মুরিদ শিক্ষিত করা হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত নূরী ধর্মে দীক্ষিত, তাঁহাদের শুধু দাউন ধরা বয়াৎ নহে এবং তাহারা কোন দাবিও করেন না, পরন্তু হযরত এমাম মেহদীর আগমন ফলে সমস্ত পৃথিবী এক রাজার শাসনাধীন হইবে। এবং তাহাতে এক ধর্ম ও একাচার প্রবর্ত্তিত হইবে। আর এক রাজা বলিতে হযরত এমাম মেহদীকেই বুঝাইবে। ঐ সময় অতি নিকটবর্ত্তি হইয়াছে। শেখ সুব্‌নুসি নামক পুস্তকে লিখিত আছে। আবার পাঞ্জাববাসী মেহদী সাহেব (কাদিয়ানী সাহেব) নিজ পুস্তকে ইহাও লিখিয়াছেন আমিই যে প্রকৃত মেহদী তাহা নহে। বরং আমার পর আরও মেহদী আসিতে পারেন। ব্যস, এবার সব লেটা চুকিয়া গেল। তবে তাহার দাবিতে মূলে কান্তে বিদ্ধ নহে। এখন বলি যাহারা কেবল তাহার নাম শুনিয়াই ইমান আনিয়াছেন বা নিকটে গিয়া তাহাকে দেখিয়াছেন, তাহারা প্রকৃত পক্ষে তাহার ভাব উদ্ধার করিতে শিখিয়াছেন কিনা চারি পাঁচ লক্ষ লোকের অধিনায়ক হইলেই যদি মেহদী দাবি করিতে পারা যায় তবে ৯৫ লক্ষ লোকের নেতা যে সেরূপ দাবি করিতে শিখেন নাই, তাহারই বা কারণ কি। বলুনত এখন ইমানের মূলে কোন সিদ্ধান্তের রস দিলে ইমানের গাছ তাজা হইবে। ঝড়ে বানে কাউয়া মরে, ফকির বলে মোর কেরামত বাড়ে। বাপুহে, মেহদী হইলে এত লেখা লেখি কেন? কালে ত বৃক্ষের পরিচয় ফলেই দিবে। আর কাদিয়ানী সাহেব ঐ হাদিছ দেখিয়াছেন কিনা যাহা ছেহা ছেত্তায় আসিয়াছে উহাতে লিখিত আছে যে হযরত মেহদীর আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে দুইজন মিথ্যাবাদী লোক নিজেকে মেহদী বলিয়া পরিচয় দিয়া বহুলোক গোমরাহ (পথহারা) করিবে। ছেহা ছেত্তায় যে মেহদী সাহেবের চিহ্ন লিখিত আছে তাহা কাদিয়ানী সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায় কি? আর ঐ চিহ্নসমূহ এই, যথা–

১। পৃথিবীর যাবতীয় লোক একই ধর্ম ও আচারের আশ্রয়ে থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবে।

২। তাহার সময়ে প্রাণ হরণোপযোগী অস্ত্রসস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়া বাঘ ছাগ একত্রে কাল যাপন করিতে থাকিবে।

৩। লোক সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও জাতি বর্ণের ইতর বিশেষ থাকিবে না।

৪। মানব জাতি নিষ্পাপ অধিকার হইবে।

৫। এমাম সাহেব আরব দেশ বাসী আব্দুল্লা ও আমেনার পুত্র এবং সৈয়দ হাসমি বংশ জাত হইবে।

৬। তিনি যখন মদিনা হইতে মক্কার দিকে হেজরত করিয়া আসিবেন তখন একদল শত্রু তাহাকে বধ করিতে অস্ত্রসস্ত্র লইয়া আসিবে। তখন তাহার অভিশাপে তাহারা সদল বলে মৃত্তিকায় ধ্বসিয়া যাইবে। এবং তাহার এই কেরামত দেখিয়া সমুদয় মানব জাতি তাহাকে আখেরী ইমাম বলিয়া চিনিবে ও তাহার আশ্রয়ে আসিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের যাবতীয় অধিবাসী একত্রে একই ধর্মের আশ্রয়ে একই নেতার অধীনে, একপ্রাণ হইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতে থাকিবে।

নৌশেরওয়া বাদ্‌শা মৃত্যুর পর যে পৃথিবীতে পুনঃ আগমন করেন, সে বিষয়ে 'তারিখ তেবরির' বরাত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সহসা তাহাতে পাওয়া যায় নাই অন্যান্য গ্রন্থে আছে।

দূরূহ শব্দের অর্থ

শব্দ	অর্থ
অ	অন্নের = খাদ্যের খাওনের।
	অবতার = নবী, যাহার দ্বারা আসমানী হুকুম প্রকাশ পাইয়াছে।
আ	আসু = সহসা, ইহকাল।
	আয়বপুশী = অন্যের দোষ ঢাকিয়া রাখা।
	আকাংখা = প্রয়াস, অনুরাগ।
	আদম = আদি পুরুষ।
	আউলিয়া = বহুবচন যাহারা খোদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সাধু।
	আম্বুর = একটি সুগন্ধির নাম।
ই	ইসলাম = মন্য লওয়া, নতশীর হওয়া।
	ইঞ্জেল = ইছাইদের ধর্ম পুস্তক।
	ইমান = খোদার উপরে বিশ্বাস করা।
এ	এস্ক = বিরহ, প্রেম।
ক	কায়ছর = যে শিশুকে মৃত মাতার উদর ফাঁড়িয়া বাহির করা হয়।
	কল্প তরু = স্বর্গের বৃহৎ বৃক্ষ, যাহার আশ্রয়ে সমুদয় স্বর্গবাসিরা থাকিবেন।
	কুহুকে = ফাঁদে।
গ	গদ্দিনশীন = আসনে বসনে ওয়ালা।
	গুণ = ক্ষমতা, সার্থকতা।

ছ	ছিন্ন বিচ্ছিন্ন = খণ্ড খণ্ড।
ন	নফস = প্রাণীর শান্ত বিশিষ্ট রিপু।
	নূর = জ্যোতি, ঐশ্বরীক দর্পণ।
	নাসাশ্বর = নাকের শব্দ।
	নির্দ্ধারিত = স্থির।
	নূরত = নতুন, অঙ্কুর।
ত	তিবে = ইহুদিদিগের কেতাব।
	ত্বমোগুণ = ধ্বংস, লয় নেস্তিকরা।
	তৌরিত = তটে, পাড়ে।
দ	দেব = যে ঈশ্বরের কোন শক্তি ধারণ করিয়াছে।
	দরে = দরবারে, দ্বারে।
প	পত্নী = স্ত্রী, আওরত।
ফ	ফকির = খোদার বন্ধু বা প্রেমিক।
ধ	ধর্ম = দীন, পরকালীন পন্থা।
ব	বেঞ্জন = শান, তরকারি।
	বক্ষ স্থলে = বুক, ছিনা।
	বেলায়েত = মানসিক পন্থা, ঈশ্বর প্রাপ্তি রাস্তার গুণ বিশিষ্ট।
	বিলক্ষণ = উত্তম, নির্বিঘ্নে।
	বিলুপ্ত = গোমকার অপ্রকাশ।
	বশিষ্ট = মূহ, ইত্যাদি।
ম	মণি = মূল পদার্থ
	মোনাফিক = যে ব্যক্তি মনে কুরটনা রাখে, শয়তান পক্ষিয় মোখালেফী।
	মাওলানা = মুসলমানের বড় পণ্ডিত।
	মস্তান = যে খোদার প্রেমে উম্মাদ।
	মুস্তফা = ভালবাসা।
	মুহাম্মদ = যাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে।
	মন্ত্রী = উজির, নায়েব।
	মদিনা = মাঠ, লোকহীনদেশ, বনস্থ।
	মন্দির = দেবালয়, মসজেদ।
	মাজুল = উচ্ছেদ।
র	রোখা = পত্র, পত্রিকা।
	রজগুণ = জন্ম প্রণালী, পয়দায়েসের ক্ষমতা।
	রঙ্গ = টেউ, মৌজ।
ল	লয় = বিলুপ্ত, ফানা, নাস্তি করণ।
শ	শারদা গমন = ধীর চলন, সুন্দর চলন।

শ্রদ্ধা = ভক্তি ।
শান = গুণ, ক্ষমতা ।
শাস্ত্রে = ধর্মগ্রন্থে, ধর্ম পন্থায় ।

স সম্বোদিয়া = আদর করিয়া ।
সদনে = নিকটে
সংস্করণ = ভাগ, হিস্যা ।
সুতরাং = পরবর্তী ।
সত্যগুণ = নিশ্চিত যে গুণ স্থির থাকে ।

হ হারাম = নিষিদ্ধ, যাহা নিষেধ করা গিয়াছে ।
হাদিস = নবী সাহেবের বাক্য ।
হিন্দু = যাহারা সিন্ধু নদী পার হইয়া আসিয়াছে কিম্বা যাহার দুই বস্তু নাই তাহাকে হিন্দু বলে ।
হর মাগিদন = একটি স্থানের নাম ।

য যৌবন = আশ্চর্য্য ।

সমাপ্ত